সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী—সং ৬৩

গৌতমসূত্র

বা

ন্যায়দর্শন

ও

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

(বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত)

পঞ্চম খণ্ড

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ
কর্ত্তৃক অনুদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

—:০:—

কলিকাতা, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২।০, সাধারণ পক্ষে ২৸০

নিবেদন।

এইবার 'ন্যায়দর্শনে'র শেষ খণ্ড সমাপ্ত হইল। ১৩২০ বঙ্গাব্দে এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াই আমি যে মহা চিন্তাসাগরে নিপতিত হইয়াছিলাম, এত দিন পরে তাহার পরপারে পৌঁছিলাম। সেই অপার মহাসাগরের অতি দুর্লঙ্ঘ্য বহু বহু বিচিত্র তরঙ্গের ক্লেশময় আঘাতে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া এবং তাহার মধ্যে অনেক সময়ে শারীরিক, মানসিক ও পারিবারিক নানা দুরবস্থার প্রবল ঝটিকায় বিঘূর্ণিত এবং কোন কোন সময়ে মৃতপ্রায় হইয়াও যাঁহার করুণাময় কোমল হস্তের প্রেরণায় আমি জীবন লইয়া ইহার পরপারে পৌঁছিয়াছি, তাঁহাকে আজ কি বলিয়া প্রণাম করিব, তাহা জানি না। অন্ধ আমি, তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। বলহীন আমি, তাঁহাকে কখনও ধরিতেও পারি নাই। তাঁহার স্বরূপ বর্ণনে আমি একেবারেই অক্ষম। তাই ক্ষীণস্বরে বলিতেছি,—

যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁড়কদীগ্রামনিবাসী সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী মহানৈয়ায়িক ৺জানকীনাথ তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকটে 'ন্যায়দর্শন' অধ্যয়ন করিয়া যে সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাঁহার সেই সমস্ত উপদেশ এবং তাঁহার স্নেহময় আশীর্ব্বাদ মাত্র সম্বল করিয়া আমি এই অসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তিনি অনেক দিন পূর্ব্বে স্বর্গত হইয়াছেন। আজ আমি আমার সেই পিতার ন্যায় প্রতিপালক এবং প্রথম হইতেই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক পরমারাধ্য পরমাশ্রয় স্বর্গত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। দীন আমি, অযোগ্য আমি, তাঁহার যথাযোগ্য স্মৃতি রক্ষা করিতে অসমর্থ।

পরে যে সমস্ত মহামনা ব্যক্তির নানারূপ সাহায্যে এই গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেও আজ আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতেছি এবং অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে যথাসম্ভব এখানে তাঁহাদিগেরও নামাদির উল্লেখ করিতেছি।

১৩১১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে পাবনা 'দর্শন টোলে' অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আমার পাবনায় অবস্থানকালে পাবনার তদানীন্তন সরকারী উকিল, পাবনা 'দর্শন টোলে'র সম্পাদক ও সংরক্ষক "গায়ত্রী" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ শর্ম্মচৌধুরী মহোদয় প্রথমে আমাকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করেন। তিনি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ এবং দেশে শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের রক্ষা ও শাস্ত্রচর্চ্চার সাহায্য করিতে সতত স্বভাবতঃই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র পরিচয় ও কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকিলেও তিনি তাঁহার স্বভাবগুণেই পাবনায় আমাকে রক্ষা করিবার জন্য এবং আমার প্রতিষ্ঠার জন্য কত যে পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, অর্থদ্বারা, পুস্তকাদির দ্বারা এবং আমার বহু ছাত্র রক্ষার দ্বারা এবং আরও কত প্রকারে যে, আমার শাস্ত্রচর্চ্চার কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা যথাযথ বর্ণন করিবার কোন ভাষাই আমার নাই। তবে আমি এক কথায় মুক্তকণ্ঠে সত্যই বলিতেছি যে, সেই প্রসন্ননারায়ণের

প্রসন্নদৃষ্টি ব্যতীত আমার ন্যায় নিঃসহায় অযোগ্য ব্যক্তির কিঞ্চিৎ শাস্ত্রচর্চ্চার কোন আশাই ছিল না। তিনিই আমার এই কার্য্যের মূল সহায়।

কিন্তু সুদুর্লভ সহায় পাইয়াও এবং উৎসাহিত ও অনুরুদ্ধ হইয়াও নিজের অযোগ্যতাবশতঃ আমার পক্ষে এই কার্য্য অসাধ্য বুঝিয়া এবং এই গ্রন্থের বহু ব্যয়-সাধ্য মুদ্রণও অসম্ভব মনে করিয়া আমি প্রথমে এই কার্য্যারম্ভে সাহসই পাই নাই। পরে পাবনা কলেজের তদানীন্তন সংস্কৃতাধ্যাপক আমার ছাত্র শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম এ, বি এল, কাব্যতীর্থ, সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ প্রত্যহ আসিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বলেন যে, 'আপনি কিছু লিখিয়া দিলেই আমি তাহা লইয়া কলিকাতায় যাইয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, মহোদয়ের নিকটে উহা দিব। তিনি পরম বিদ্যোৎসাহী, বিশিষ্ট বোদ্ধা দার্শনিক, অগ্রেই তিনি তাঁহার সম্পাদিত "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকায় সাদরে উহা প্রকাশ করিবেন। এবং কালে পুস্তকাকারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের একটা ব্যবস্থাও তিনিই অবশ্য করিবেন। ফলে তাহাই হইয়াছিল। শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্রের অদম্য আগ্রহ ও অনুরোধে আমি প্রথমে অতিকষ্টে কিছু লিখিয়া তাঁহার নিকটে দিয়াছিলাম। ক্রমে কয়েক মাস "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে কিয়দংশ প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তদানীন্তন সুযোগ্য সম্পাদক, পরম বিদ্যোৎসাহী, টাকীর জমীদার, স্বনামখ্যাত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল মহোদয় উহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। পরে আমার পত্র পাইয়াই তিনি সাগ্রহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব করিলে স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় সাগ্রহে ঐ প্রস্তাবের বিশেষরূপ সমর্থন করেন। তাহার ফলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশ স্থিরীকৃত হয়। উক্ত মহোদয়দ্বয়ের আন্তরিক আগ্রহ, বিশেষতঃ রায় যতীন্দ্রনাথের অদম্য চেষ্টাই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল। রায় যতীন্দ্রনাথ ৺বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন। শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ সুস্থ শরীরে সুদীর্ঘজীবী হউন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশ স্থিরীকৃত হইলেই রায় যতীন্দ্রনাথ আমাকে প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সত্বর পাঠাইবার জন্য পাবনায় পত্র লেখেন। সুতরাং তখন আমি বাধ্য হইয়া বহু কষ্টে দ্রুত লিখিয়া প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তাই প্রথম খণ্ডে অনেক স্থলে ভাষার আধিক্য এবং কোন কোন স্থলে পুনরুক্তিও ঘটিয়াছে। কিন্তু রায় যতীন্দ্রনাথ তাহাতে কোন আপত্তিই করেন নাই। পরন্তু তিনি আমাকে বিস্তৃত ভাষায় লিখিবার জন্যই অনেকবার পত্র দিয়াছেন। সংক্ষেপে লিখিলে এই অতি দুর্ব্বোধ বিষয় কখনই সুবোধ হইতে পারে না, ইহাও পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষানুসারে, শিক্ষিত সমাজ যাহাতে ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়নভাষ্য বুঝিতে পারেন, বঙ্গভাষায় যেরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা উহা সুবোধ হয়, এই উদ্দেশ্যে আমাকে সরল ভাবে যে সমস্ত পত্র দিয়াছিলেন এবং আমি কলিকাতায় আসিলে সাহিত্য-পরিষদ্মন্দিরে সাক্ষাৎকারে আমাকে পুনঃ পুনঃ যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই

এখন আমার মনে হইতেছে। তিনি ৺বৈকুণ্ঠ গমনের কিছু দিন পূর্ব্বেও আমাকে সাগ্রহে অনেক দিন বলিয়াছিলেন, 'ন্যায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায় ভাল করিয়া লিখিতে হইবে, উহা অতি দুর্ব্বোধ। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও উহা ভাল বুঝিতে পারি নাই। আপনি যে কিরূপে উহার ব্যাখ্যা করিবেন, কিরূপে বাঙ্গালা ভাষায় উহা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইয়া দিবেন, তাহা দেখিবার জন্য এবং উহা বুঝিবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত আছি। ন্যায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায় না বুঝিলে ন্যায়-শাস্ত্র বুঝা হয় না। সংক্ষেপের কোন অনুরোধ নাই। আপনি বিস্তৃত ভাষায় যেরূপেই হউক, উহা বুঝাইয়া দিবেন। আপনি এখন হইতেই তাহার চিন্তা করুন।'

কিন্তু বিপন্ন না হইলে ত আমরা যাহা চিন্তনীয়, তাহার বিশেষ চিন্তা করি না। তাই রায় যতীন্দ্র-নাথের পুনঃ পুনঃ ঐ সমস্ত কথা শুনিয়াও তখন সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করি নাই। পরে সময়ের অল্পতাবশতঃ পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা কিছু সংক্ষেপে দ্রুত লিখিত হইয়াছে। তথাপি পঞ্চম অধ্যায়ে গৌতমোক্ত "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র তত্ত্ব বুঝাইতে এবং সে বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিভিন্ন মত ও বৌদ্ধ মতের আলোচনা করিতে আমি যথাশক্তি যথামতি চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহা সফল হইবে কি না, জানি না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে বিষয়ে রায় যতীন্দ্রনাথের মন্তব্য আর শুনিতে পাইলাম না।

এই পুস্তকের সম্পাদন কার্য্যে যে সমস্ত গ্রন্থ আবশ্যক হইয়াছে, তাহার অনেক গ্রন্থই আমার নাই। সুতরাং বহু কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক নানা সময়ে নানা স্থানে যাইয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ্য এই যে, কাশী গবর্ণমেণ্ট কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহাত্মা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শর্ম্ম-কবিরাজ এম এ মহোদয় এবং বোলপুর বিশ্ব-ভারতীর অধ্যক্ষ, নানাবিদ্যাবিশারদ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহোদয় এবং শান্তিপুর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভাগবতব্যাখ্যাতা আমার ছাত্র সুপণ্ডিত শ্রীমান্ রাধাবিনোদ গোস্বামী এবং আরও অনেক সদাশয় ব্যক্তি গ্রন্থাদির দ্বারা আমার বহু সাহায্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রথমোক্ত মহাত্মা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শর্ম্মকবিরাজ এম এ মহোদয় এই পুস্তক সম্পাদনের জন্য আমার অর্থ সাহায্যও কর্ত্তব্য বুঝিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইউ পি গবর্ণমেণ্ট হইতে কএক বৎসরের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, আমার অচিন্তিত আশাতীত উপকার করিয়াছেন। যদিও তিনি এ জন্য কিছুমাত্র প্রশংসা চাহেন না, তথাপি অবশ্যকর্ত্তব্যবোধে এবং আত্মতৃপ্তির জন্য এই প্রসঙ্গে আমি এখানে তাঁহার ঐ মহামহত্ত্বের ঘোষণা করিতেছি।

নানা স্থানে অনেক গ্রন্থ পাইলেও অনেক স্থলে যথাসময়ে আবশ্যক গ্রন্থ না পাওয়ায় যথাস্থানে অনেক কথা লিখিতে পারি নাই। তবে কোন কোন স্থলে পরে আবার সেই প্রসঙ্গে সে বিষয়ে যথা-সম্ভব আলোচনা করিয়াছি। কোন কোন স্থলে পরে আবার পূর্ব্বলিখিত বিষয়ের তাৎপর্য্য বর্ণন এবং সংশোধনও করিয়াছি; পাঠকগণ সূচীপত্র দেখিয়াও সে বিষয় লক্ষ্য করিবেন এবং "টিপ্পনী"র মধ্যে যেখানে যে বিষয়ে দ্রষ্টব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও সর্ব্বত্র অবশ্য দেখিবেন। অনেক স্থলেই বাহুল্যভয়ে অনেক বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের কথা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই। কিন্তু যে যে গ্রন্থে সেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিচার পাইয়াছি, তাহার যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়াছি।

যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু পাঠক, তাঁহারা সেই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহাদিগের অনুসন্ধানের অনেক সুবিধা হইবে এবং পরিশ্রমের লাঘব হইবে, ইহাই আমার ঐরূপ উল্লেখের উদ্দেশ্য।

আমি অনেক সময়েই দূরে থাকায় এবং আমার অক্ষমতাবশতঃ এই গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করিতে পারি নাই। তাই অনেক স্থলে অশুদ্ধি ঘটিয়াছে এবং শুদ্ধিপত্রেও সমস্ত স্থলের উল্লেখ করিতে পারি নাই। এই খণ্ডের শেষে শুদ্ধিপত্রের পরিশিষ্টে কতিপয় স্থলের উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকগণ শুদ্ধিপত্রে অবশ্যই দৃষ্টিপাত করিবেন। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত অবশ্য প্রকাশ্য এই যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালার সুযোগ্য পণ্ডিত কোটালীপাড়া-নিবাসী গৌতমকুলোদ্ভব শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রুফ্ সংশোধন করিয়াছেন। যদিও তিনি তাঁহার নিজ কর্ত্তব্যানুরোধেই এই কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি এই কার্য্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা ও অতি কঠোর পরিশ্রমের সাহায্য না পাইলে, আমার দ্বারা এই গ্রন্থ সম্পাদন সুসম্ভব হইত না এবং এই বৎসরেও এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত হইত না। তিনি নিজে প্রেসে যাইয়াও এই গ্রন্থের শীঘ্র সমাপ্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

আমার পাবনায় অবস্থানকালে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে আশ্বিন মাসে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। পরে আমি ৺কাশীধামের 'টীকমাণী' সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া পৌষ মাসে ৺কাশীধামে গেলে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ও ১৩৩২ বঙ্গাব্দে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং চতুর্থ খণ্ডের অনেক অংশ মুদ্রিত হয়। পরে আমি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিলে ঐ বৎসরেই চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়। নানা কারণে মধ্যে মধ্যে অনেক সময়ে এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ বন্ধ থাকায় ইহার সমাপ্তিতে এত বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু রায় যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহোদয় এবং বর্ত্তমান সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ বসু মহোদয় এবং সুযোগ্য সহকারী কর্ম্মচারী শ্রীমান্ সূর্য্যকুমার পাল এই গ্রন্থের শীঘ্র সমাপ্তির জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন। আর এই গ্রন্থের প্রকাশক সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহোদয়ের কথা কত বলিব। তিনি এই গ্রন্থের শীঘ্র সমাপ্তির জন্য প্রথম হইতেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। আমি কলিকাতায় আসিলে তিনি অনেক সময়ে নিজে আমার নিকটে আসিয়াও প্রুফ্ লইয়া গিয়াছেন। সরলতা ও নিরভিমানতার প্রতিমূর্ত্তি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীমান্ রামকমলের ভক্তিময় মধুর ব্যবহার এবং শীঘ্র এই গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য চিন্তা ও চেষ্টা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। ইতি

শ্রীফণিভূষণ দেবশর্ম্মা।

কলিকাতা, আশ্বিন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

সূত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সূচী

(চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিক)

দ্বিতীয় আহ্নিক।

টিপ্পনী ও পাদটীকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সূচী

(চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিক)

বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক

ন্যায়দর্শন

বাৎস্যায়নভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় আহ্নিক

ভাষ্য। কিন্নু খলু ভো যাবন্তো বিষয়াস্তাবৎসু প্রত্যেকং তত্ত্ব-জ্ঞানমুৎপদ্যতে? অথ ক্বচিদুৎপদ্যত ইতি। কশ্চাত্র বিশেষঃ? ন তাবদেকৈকত্র যাবদ্বিষয়মুৎপদ্যতে, জ্ঞেয়ানামানন্ত্যাৎ। নাপি ক্বচিদুৎপদ্যতে, যত্র নোৎপদ্যতে, তত্রানিবৃত্তো মোহ ইতি মোহশেষপ্রসঙ্গঃ। ন চান্যবিষয়েণ তত্ত্বজ্ঞানেনান্যবিষয়ো মোহঃ শক্যঃ প্রতিষেদ্ধুমিতি।

মিথ্যাজ্ঞানং বৈ খলু[1] মোহো ন তত্ত্বজ্ঞানস্যানুৎপত্তিমাত্রং, তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানং যত্র বিষয়ে প্রবর্ত্তমানং সংসারবীজং ভবতি, স বিষয়স্তত্ত্বতো জ্ঞেয় ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) যাবৎ বিষয়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আত্মা প্রভৃতি যতসংখ্যক প্রমেয় আছে, সেই সমস্ত প্রমেয়ের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রমেয়েই কি (মুমুক্ষুর) তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথবা কোন প্রমেয়বিশেষেই উৎপন্ন হয়? (প্রশ্ন) এই উভয় পক্ষে বিশেষ কি? (উত্তর) যাবৎ বিষয়ের এক একটি বিষয়ে অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কারণ, জ্ঞেয় বিষয় অর্থাৎ আত্মাদি প্রমেয় অসংখ্য। কোন বিষয়েও অর্থাৎ যে কোন আত্মা ও যে কোন শরীরাদি বিষয়েও তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। (কারণ, তাহা হইলে) যে বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন না হয়, সেই বিষয়ে মোহ নিবৃত্ত না হওয়ায় মোহের শেষাপত্তি হয় অর্থাৎ সেই সমস্ত বিষয়ে মোহ থাকিয়া যায়। কারণ, অন্যবিষয়ক তত্ত্ব জ্ঞান অন্যবিষয়ক মোহকে নিবৃত্ত করিতে পারে না।

১। "বৈ" শব্দঃ খলু পূর্ব্বপক্ষাক্ষমায়াং, "খলু" শব্দো হেত্বর্থে। অযুক্তঃ পূর্ব্বপক্ষো যস্মান্মিথ্যাজ্ঞানং মোহ ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

(উত্তর) পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত, যে হেতু মিথ্যাজ্ঞানই মোহ, তত্ত্বজ্ঞানের অনুৎপত্তি-মাত্র মোহ নহে। সেই মিথ্যাজ্ঞান যে বিষয়ে প্রবর্ত্তমান (উৎপদ্যমান) হইয়া সংসারের কারণ হয়, সেই বিষয়ই তত্ত্বতঃ জ্ঞেয়, অর্থাৎ সেই বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানই তদ্বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মোক্ষের কারণ হয়।

টিপ্পনী। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে "সংশয়", "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" পদার্থ পরীক্ষিত হইয়াছে। "প্রয়োজন" প্রভৃতি অবশিষ্ট অপরীক্ষিত পদার্থ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় হইলে ঐ সমস্ত পদার্থেরও পূর্ব্বোক্তরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয় পরীক্ষার পরেই "যত্র সংশয়ঃ"—(১।৭) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে।[১] এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, ন্যায়দর্শনের সর্ব্বপ্রথম সূত্রে যে, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় "প্রমেয়" পদার্থের অর্থাৎ আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ। প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ঐ প্রমেয়-তত্ত্বজ্ঞানের সম্পাদক ও রক্ষক বলিয়া উহা মোক্ষলাভের পরম্পরা-কারণ বা প্রযোজক। মহর্ষি ন্যায়দর্শনের "দুঃখ-জন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা তাঁহার ঐ তাৎপর্য্য বা সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। যথাস্থানে মহর্ষির যুক্তি ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে "অপবর্গ" পর্য্যন্ত প্রমেয়-পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। এখন এই দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে মহর্ষির পরীক্ষণীয় এই যে, আত্মা ও শরীর প্রভৃতি যে সমস্ত প্রমেয় কথিত হইয়াছে, উহাদিগের প্রত্যেকের তত্ত্বজ্ঞানই কি মুমুক্ষুর উৎপন্ন হয়, অথবা যে কোন প্রমেয় বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়? অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞানই কি মোক্ষের কারণ, অথবা যে কোন আত্মা ও যে কোন শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ? ভাষ্যকার প্রথমে প্রশ্নরূপে এই পূর্ব্বপক্ষের প্রকাশ করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিবার জন্য প্রশ্ন প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষে বিশেষ কি? অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞান, অথবা যে কোন আত্মা ও যে কোন শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ, এই উভয় পক্ষে

১। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে "যত্র সংশয়ঃ" ইত্যাদি সূত্রের উক্তরূপই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাষ্য ও বার্ত্তিকের ব্যাখ্যানুসারে অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, ৪০-৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতম তাঁহার প্রথম সূত্রোক্ত "প্রয়োজন" প্রভৃতি অনেক পদার্থের পরীক্ষা করেন নাই। সংশয় হইলে ঐ সমস্ত পদার্থের পরীক্ষাও যে কর্ত্তব্য, ইহা তাঁহার অবশ্য বক্তব্য। সুতরাং তিনি যে, "যত্র সংশয়ঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন এবং তাৎপর্য্যটীকাকারও তাঁহার নিজমতানুসারেই এখানে উক্ত সূত্রের ঐরূপই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ সূত্রের উক্তরূপই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার অন্য কারণে অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সূত্রে বহু অর্থের সূচনা থাকে, ইহা সূত্রের লক্ষণেও কথিত আছে। সুতরাং উক্ত দ্বিবিধ অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত সূত্রার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলে আর কোন বক্তব্য থাকে না।

যদি কোন বিশেষ না থাকে অর্থাৎ ঐ উভয় পক্ষের যে কোন পক্ষই যদি নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্ত বিচারের আবশ্যকতা থাকে না; কারণ, উহার যে কোন পক্ষই বলা যাইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের অবকাশই নাই। ভাষ্যকার এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনের জন্য পরে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ উহা মোক্ষলাভের কারণ বলা যায় না। কারণ, ঐ সমস্ত জ্ঞেয় বিষয় (আত্মাদি প্রত্যেক প্রমেয়) অনন্ত বা অসংখ্য। অর্থাৎ অনন্ত কালেও উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নহে, এ জন্য উহা মোক্ষলাভের কারণ বলা যায় না। আবার যে কোন আত্মাদি প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানও মোক্ষলাভের কারণ বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে অন্যান্য যে সমস্ত প্রমেয় বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে না, সেই সমস্ত প্রমেয় বিষয়ে মোহের নিবৃত্তি বা বিনাশ না হওয়ায় মোহের শেষ থাকিয়া যাইবে। কোন এক বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান তদ্‌ভিন্ন বিষয়ে মোহ নিবৃত্ত করিতে পারে না। মোহ থাকিলে তন্মূলক রাগ ও দ্বেষও অবশ্যই জন্মিবে। রাগ, দ্বেষ ও মোহ নামক দোষ থাকিলে জীবের সংসার অনিবার্য্য। সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষই যখন উপপন্ন হয় না, সুতরাং প্রমাণাদি তত্ত্বজ্ঞান বা প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞান যে মোক্ষের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত পূর্ব্বপক্ষ।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, যেহেতু মিথ্যাজ্ঞানই মোহ, তত্ত্বজ্ঞানের অনুৎপত্তি বা অভাব মোহ নহে, অতএব পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত। ভাষ্যে "বৈ" শব্দটি পূর্ব্বপক্ষের অযুক্ততাদ্যোতক। "খলু" শব্দটি হেত্বর্থ। ভাষ্যকারের উত্তরের তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদি বিষয়ে অথবা যে কোন আত্মাদি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই মোহ নহে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান যে নিজের অভাবরূপ অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিয়াই মোক্ষের কারণ হয়, তাহা নহে। কিন্তু সংসারের নিদান যে মিথ্যা জ্ঞান, তাহাই মোহ। ঐ মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ করিয়াই তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ হয়। ভাষ্যকার শেষে ইহা স্পষ্ট করিতে বলিয়াছেন যে, সেই মিথ্যাজ্ঞান যে বিষয়ে উৎপন্ন হইয়া সংসারের নিদান হয়, সেই বিষয়ই মুমুক্ষুর তত্ত্বতঃ জ্ঞেয়। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের নিজের আত্মা ও নিজের শরীরাদি বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই তাহার সংসারের নিদান। সুতরাং সেই মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ করিতে তাহার নিজের আত্মা ও নিজের শরীরাদিবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানই আবশ্যক। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান অনাবশ্যক। যাহা আবশ্যক, তাহা অসম্ভব নহে। শ্রবণ মননাদি উপায়ের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি মোক্ষলাভ করেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত। পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

প্রথম আহ্নিকে প্রমেয় পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, আবার মহর্ষির এই দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে এখানে "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, প্রমেয় পরীক্ষার পরে এই আহ্নিকে সেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পরীক্ষণীয়। অর্থাৎ ঐ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ কি? এবং উহার বিষয় কি? কিরূপে উহা উৎপন্ন হয়? কিরূপে উহা

পরিপালিত হয়? কিরূপে উহা বিবর্দ্ধিত হয়? ইহা অবশ্য বক্তব্য। সুতরাং ঐরূপে তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষাই এই আহ্নিকের প্রয়োজন। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"র টীকায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এখানে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ন্যায়দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান উদ্দিষ্টও হয় নাই, লক্ষিতও হয় নাই। সুতরাং মহর্ষি গোতম তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা করিতে পারেন না। উদ্দেশ ও লক্ষণ ব্যতীত পরীক্ষা হইতে পারে না। পরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় আহ্নিকের বিষয়-সাম্য না থাকিলে উহা এক অধ্যায়ের দুইটি অবয়ব বা অংশ হইতে পারে না। এতদুত্তরে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রেই তত্ত্বজ্ঞান উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং দ্বিতীয় সূত্রেই উহা লক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং এই আহ্নিকে ঐ তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা হইতে পারে। এবং এই অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে কার্য্যরূপ ছয়টি প্রমেয়ের পরীক্ষা করা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানও কার্য্যরূপই অর্থাৎ জন্য পদার্থ, সুতরাং প্রথম আহ্নিকের বিষয় ষট্ প্রমেয় এবং এই আহ্নিকের বিষয় তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যত্বরূপ সাম্যও আছে। তবে তত্ত্বজ্ঞান অপবর্গের কারণ বলিয়া অপবর্গের পরীক্ষার পূর্ব্বেই উহার পরীক্ষা করা উচিত, এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষার পূর্ব্বে যে সকল প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, সেই অপবর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রমেয়েরই পরীক্ষা কর্ত্তব্য, নচেৎ সেই তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা হইতে পারে না। তাই মহর্ষি প্রমেয়পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াই তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা করিয়াছেন।

ভাষ্য। কিং পুনস্তন্মিথ্যাজ্ঞানং? অনাত্মন্যাত্মগ্রহঃ—অহমস্মীতি মোহোঽহঙ্কার ইতি, অনাত্মানং খল্বহমস্মীতি পশ্যতো দৃষ্টিরহঙ্কার ইতি। কিং পুনস্তদর্থজাতং, যদ্বিষয়োঽহঙ্কারঃ? শরীরেন্দ্রিয়-মনোবেদনা-বুদ্ধয়ঃ।

কথং তদ্বিষয়োঽহঙ্কারঃ সংসারবীজং ভবতি? অয়ং খলু শরীরাদ্যর্থ-জাতমহমস্মীতি ব্যবসিত[1]স্তদুচ্ছেদেনাত্মোচ্ছেদং মন্যমানোঽনুচ্ছেদ-তৃষ্ণাপরিপ্লুতঃ পুনঃ পুনস্তদুপাদত্তে, তদুপাদদানো জন্মমরণায় যততে, তেনাবিয়োগান্নাত্যন্তং দুঃখাদ্বিমুচ্যত ইতি।

যস্তু দুঃখং দুঃখায়তনং দুঃখানুষক্তং সুখঞ্চ সর্ব্বমিদং দুঃখমিতি পশ্যতি, স দুঃখং পরিজানাতি। পরিজ্ঞাতঞ্চ দুঃখং প্রহীণং ভবত্যনুপাদানাৎ সবিষান্নবৎ। এবং দোষান্ কর্ম্ম চ দুঃখহেতুরিতি পশ্যতি। ন চাপ্রহীণেষু দোষেষু দুঃখপ্রবন্ধোচ্ছেদেন শক্যং ভবিতুমিতি দোষান্ জহাতি। প্রহীণেষু চ দোষেষু "ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধানায়ে"ত্যুক্তং।

১। এখানে নিশ্চয়ার্থক "বি" ও "অব" পূর্ব্বক "সো" ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে "ক্ত" প্রত্যয়ে "ব্যবসিত" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। জ্ঞানার্থ ধাতু ও গত্যর্থ ধাতুর মধ্যে পরিগৃহীত হওয়ায় এখানে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় নিষ্প্রমাণ নহে। ভাষ্যকারের উক্ত প্রয়োগও উহার সমর্থক।

প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখানি চ জ্ঞেয়ানি ব্যবস্থাপয়তি, **কর্ম্মচ দোষাংশ্চ প্রহেয়ান্।**

অপবর্গোঽধিগন্তব্যস্তস্যাধিগমোপায়স্তত্ত্ব-জ্ঞানং।

এবং চতসৃভির্বিধাভিঃ **প্রমেয়ং** বিভক্তমাসেবমানস্যাভ্যস্যতো ভাবয়তঃ সম্যগ্দর্শনং যথাভূতাববোধস্তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যতে।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) সেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞান কি? (উত্তর) অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি। বিশদার্থ এই যে, "আমি হই" এইরূপ মোহ অহঙ্কার, (অর্থাৎ) অনাত্মাকে (দেহাদিকে) "আমি হই" এইরূপ দর্শনকারী জীবের দৃষ্টি অহঙ্কার, অর্থাৎ ঐ অহঙ্কারই মিথ্যাজ্ঞান।

(প্রশ্ন) যদ্বিষয়ক অহঙ্কার, সেই পদার্থসমূহ কি? (উত্তর) শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বেদনা ও বুদ্ধি।

(প্রশ্ন) তদ্বিষয়ক অহঙ্কার সংসারের বীজ হয় কেন? (উত্তর) যেহেতু এই জীব শরীরাদি পদার্থসমূহকে "আমি হই" এইরূপ নিশ্চয়বিশিষ্ট হইয়া সেই শরীরাদির উচ্ছেদপ্রযুক্ত আত্মার উচ্ছেদ মনে করিয়া অনুচ্ছেদতৃষ্ণায় অর্থাৎ শরীরাদির চিরস্থিতি-বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই শরীরাদিকে গ্রহণ করে, তাহা গ্রহণ করিয়া জন্ম ও মরণের নিমিত্ত যত্ন করে, সেই শরীরাদির সহিত অবিয়োগবশতঃ দুঃখ হইতে অত্যন্ত বিমুক্ত হয় না।

কিন্তু যিনি দুঃখকে এবং দুঃখের আয়তনকে অর্থাৎ শরীরকে এবং দুঃখানুষক্ত সুখকে "এই সমস্তই দুঃখ", এইরূপে দর্শন করেন, তিনি দুঃখকে সর্ব্বতোভাবে জানেন। এবং পরিজ্ঞাত দুঃখ বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় অগ্রহণবশতঃ "প্রহীণ" অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয়। এইরূপ তিনি দোষসমূহ ও কর্ম্মকে দুঃখের হেতু, এইরূপে দর্শন করেন। দোষসমূহ পরিত্যক্ত না হইলে দুঃখপ্রবাহের উচ্ছেদ হইতে পারে না, এ জন্য দোষসমূহকে ত্যাগ করেন। দোষসমূহ (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) পরিত্যক্ত হইলে "প্রবৃত্তি (কর্ম্ম) প্রতিসন্ধানের অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের নিমিত্ত হয় না"—ইহা (প্রথম আহ্নিকের ৬৩ম সূত্রে) উক্ত হইয়াছে।

(অতএব মুমুক্ষু কর্ত্তৃক) প্রেত্যভাব, ফল ও দুঃখও জ্ঞেয় বলিয়া (মহর্ষি) ব্যবস্থাপন করিয়াছেন এবং কর্ম্ম ও প্রকৃষ্টরূপে হেয় দোষসমূহও জ্ঞেয় বলিয়া

ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। অপবর্গ (মুমুক্ষুর) অধিগন্তব্য (লভ্য), তাহার লাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান।

এইরূপ চারিটি প্রকারে বিভক্ত প্রমেয়কে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকে সম্যক্‌রূপে সেবাকারী (অর্থাৎ) অভ্যাসকারী বা ভাবনাকারী মুমুক্ষুর সম্যক্ দর্শন (অর্থাৎ) যথাভূতাববোধ বা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে যে মিথ্যাজ্ঞানকে মোহ বলিয়া জীবের সংসারের নিদান বলিয়াছেন, ঐ মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে এবং উহার বিরুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে নানা মতভেদ থাকায় ভাষ্যকার পরে নিজমত ব্যক্ত করিতে প্রথমে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সেই মিথ্যাজ্ঞান কি? তাৎপর্য্য-টীকাকার এখানে যথাক্রমে বৈদান্তিক, সাঙ্খ্য ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সম্মত তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া শেষে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন নিত্য আত্মার দর্শনকেই "বৃদ্ধ"গণ তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে ন্যায়মতের ব্যাখ্যায় তাহার পূর্ব্বোক্ত মতত্রয়ের খণ্ডন করিয়া ভাষ্য-কারোক্ত ন্যায়মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ মতকেই তিনি বৃদ্ধমত বলিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে নিজমত বলিয়াছেন যে, অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধিই মিথ্যাজ্ঞান। পরে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অনাত্মা দেহাদি পদার্থে "আমি" বলিয়া যে মোহ, উহা অহঙ্কার। পরে উহাই বুঝাইতে আবার বলিয়াছেন যে, জীব অনাত্মা দেহাদি পদার্থকে "আমি" বলিয়া যে দর্শন করিতেছে, অর্থাৎ দেহাদি জড় পদার্থকেই আত্মা বলিয়া যে মানস প্রত্যক্ষ করিতেছে, উহাই তাহার অহঙ্কার, উহাই মোহ, উহাই মিথ্যাজ্ঞান।

ভাষ্যকার এখানে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ পদার্থ বিষয়ে অহঙ্কারকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া জীবের সংসারের কারণ বলিয়াছেন, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য পরে প্রশ্নপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বেদনা ও বুদ্ধি। ভাষ্যকার প্রভৃতি সুখ ও দুঃখকে অনেক স্থানে "বেদনা" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি। এখানেও ভাষ্যকারোক্ত "বেদনা" শব্দের দ্বারা ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায়। বস্তুতঃ জীবমাত্রই শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন লাভ করিলে বুদ্ধি এবং সুখ ও দুঃখ লাভ করে। তখন হইতে ঐ শরীরাদি সমষ্টিকেই "আমি" বলিয়া বোধ করে। শরীরাদি ঐ সমস্ত পদার্থে তাহার যে ঐ আত্মবুদ্ধি, উহাই তাহার অহঙ্কার। ঐ অহঙ্কার তাহার সংসারের কারণ কেন হয়? ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে আবার প্রশ্নপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, জীব, শরীরাদি পূর্ব্বোক্ত পদার্থগুলিকেই "আমি" বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, ঐ শরীরাদির উচ্ছেদকেই আত্মার উচ্ছেদ বলিয়া মনে করে। আত্মার উচ্ছেদ কাহারও কাম্য নহে, পরন্তু উহা সকল জীবেরই বিদ্বিষ্ট। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শরীরাদি পদার্থের কখনও উচ্ছেদ না হউক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া জীবমাত্রই পুনঃ পুনঃ ঐ শরীরাদি গ্রহণ করে। সুতরাং জীবমাত্রই তাহার জন্ম ও মরণের জন্য নিজেই যত্ন করে। তাই পূর্ব্বোক্ত কারণ থাকিলে তাহার ঐ শরীরাদির সহিত বিয়োগ বা বিচ্ছেদ না হওয়ায় তাহার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, জীব-

মাত্রই তাহার শরীরাদি পদার্থকেই "আমি" বলিয়া বুঝে। অনাদি কাল হইতে তাহার ঐ শরীরাদি পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কারবশতঃই নানাবিধ কর্ম্মজন্য পুনঃ পুনঃ শরীরাদিপরিগ্রহরূপ সংসার হয়। সুতরাং জীবমাত্রই পূর্ব্বোক্তরূপ অহঙ্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম দ্বারা তাহার নিজের জন্ম ও মরণের কারণ হওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপ অহঙ্কার তাহার সংসারের কারণ হয়। উক্ত অহঙ্কারের বিপরীত তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত উহার উচ্ছেদ না হওয়ায় জীবের সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে না। এই বিষয়ে ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যটিপ্পনীতে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্তরূপ অহঙ্কারবিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানশূন্য জীবের সংসার হয়, ইহা প্রথমে বলিয়া, পরে অহঙ্কারশূন্য তত্ত্বজ্ঞানীর ঐ সংসার নিবৃত্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার "যস্ত" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যিনি দুঃখ এবং দুঃখের আয়তন নিজ শরীর ও সুখকে দুঃখ বলিয়া দর্শন করেন, তিনি দুঃখের তত্ত্ব বুঝিয়া, ঐ সমস্ত পদার্থকে বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় পরিত্যাগ করেন। এইরূপ রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষসমূহ এবং শুভাশুভ কর্ম্মকে দুঃখের হেতু বলিয়া দর্শন করেন। পূর্ব্বোক্ত দোষসমূহ পরিত্যক্ত না হইলে জীবের দুঃখপ্রবাহের উচ্ছেদ হইতেই পারে না—এ জন্য তিনি ঐ দোষসমূহকে পরিত্যাগ করেন। রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ বিনষ্ট হইলে তখন তাহার শুভাশুভ কর্ম্ম তাহার পুনর্জ্জন্মের কারণ হয় না, ইহা মহর্ষি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। সুতরাং সেই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সংসারনিবৃত্তি হওয়ায় তাহার অপবর্গ অবশ্যম্ভাবী।

ভাষ্যকার পূর্ব্বে মোহ ও তত্ত্বজ্ঞানকে যথাক্রমে সংসার ও মোক্ষের কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, এই জন্যই শুভাশুভ কর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি" এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ "দোষ" এবং "প্রেত্যভাব" "ফল" ও "দুঃখ" ও মুমুক্ষুর জ্ঞেয় বলিয়া মহর্ষি ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ সমস্ত পদার্থও মুমুক্ষুর অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া প্রমেয়বর্গের মধ্যে উহাদিগেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এবং সর্ব্বশেষে অপবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, অপবর্গই মুমুক্ষুর অধিগন্তব্য অর্থাৎ চরম লভ্য; অপবর্গের জন্যই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। কারণ, ঐ অপবর্গ লাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানলভ্য অপবর্গও মুমুক্ষুর জ্ঞেয়। অপবর্গলাভে অপবর্গের তত্ত্বজ্ঞানও আবশ্যক। সুতরাং অপবর্গও প্রমেয়মধ্যে উদ্দিষ্ট এবং লক্ষিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে। এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে (১৯ সূত্রে) (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ ও (১২) অপবর্গ -এই দ্বাদশ পদার্থকে "প্রমেয়" বলিয়াছেন এবং তাঁহার মতে ঐ দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান যে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহা তাঁহার "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার দ্বারা ভাষ্যকার প্রভৃতি বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকার ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রের ভাষ্যেও প্রথমে ঐ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। এখন কিরূপে সেই প্রমেয়-তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইবে, ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, চারিটি প্রকারে বিভক্ত পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রমেয়কে সম্যক্‌রূপে সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ উহাদিগের অভ্যাস বা উহাদিগের যথার্থ স্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে

"সম্যক্‌দর্শন" উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ঐ সমস্ত পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয়। উহাকেই বলে "যথাভূতাববোধ", উহাকেই বলে "তত্ত্বজ্ঞান"। ভাষ্যকার ঐ স্থলে বিশদবোধের জন্যই ঐরূপ একার্থ-বোধক শব্দত্রয়ের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সেবা, অভ্যাস ও ভাবনা একই পদার্থ হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রমেয় পদার্থবিষয়ে মুমুক্ষুর সুদৃঢ় ভাবনার উপদেশের জন্যই ঐরূপ পুনরুক্তি করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়-বিষয়ে নানা-প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণনা করিয়া, উহার বিপরীত জ্ঞানকেই সেই সমস্ত প্রমেয়-বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানই জীবের সংসারের নিদান এবং উহার বিপরীত জ্ঞান-রূপ তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এখন বুঝা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার এখানে আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থকে যে চারি প্রকারে বিভক্ত বলিয়াছেন, ঐ চারিটী প্রকার কি? ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভানুসারে কেহ বুঝিয়াছেন যে, ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত অহঙ্কারের বিষয় শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বেদনা ও বুদ্ধিরূপ প্রমেয়ই তাঁহার অভিপ্রেত প্রথম প্রকার। প্রেত্যভাব, ফল ও দুঃখরূপ প্রমেয় "জ্ঞেয়", উহা দ্বিতীয় প্রকার। কর্ম্ম ও দোষরূপ প্রমেয় "হেয়", উহা তৃতীয় প্রকার। অপবর্গ "অধিগন্তব্য", উহা চতুর্থ প্রকার। ইহাতে বক্তব্য এই যে, আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ই ত মুমুক্ষুর জ্ঞেয়, সুতরাং কেবল প্রেত্যভাব, ফল ও দুঃখ, এই তিনটী প্রমেয়কে ভাষ্যকার "জ্ঞেয়" বলিয়া একটি প্রকার বলিতে পারেন না। এবং দুঃখ ও দুঃখের হেতু সমস্ত প্রমেয়ই যখন "হেয়", তখন তিনি কেবল কর্ম্ম ও দোষরূপ প্রমেয়কে "হেয়" বলিয়া একটি প্রকার বলিতে পারেন না। পরন্তু ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বেদনা ও বুদ্ধির মধ্যে প্রথম প্রমেয় আত্মা ও চতুর্থ প্রমেয় ইন্দ্রিয়ার্থ নাই। সুতরাং আত্মা ও ইন্দ্রিয়ার্থ পূর্ব্বকথিত কোন প্রকারের অন্তর্গত না হওয়ায় আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়কে পূর্ব্বোক্তরূপ চারি প্রকার বলিয়া বুঝা যায় না, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক।

আমাদিগের মনে হয়, ভাষ্যকার আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়কে (১) হেয়, (২) অধিগন্তব্য, (৩) উপায় ও (৪) অধিগন্তা, এই চারি প্রকারে বিভক্ত বলিয়াছেন। আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে শরীর হইতে দুঃখ পর্য্যন্ত দশটি প্রমেয় "হেয়"। দুঃখের ন্যায় দুঃখের হেতুগুলিও হেয়, তাই ভাষ্যকার ঐ দশটি প্রমেয়কেই (১) "হেয়" বলিয়া একটি প্রকার বলিয়াছেন। হেয় ও হেয়হেতু, এই উভয়ই হেয়। ভাষ্যকার দুঃখের ন্যায় এখানে রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষসমূহকেও "প্রহেয়" বলিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যে শরীর হইতে দুঃখ পর্য্যন্ত দশটি প্রমেয়কেই ঐ দোষের হেতু বলিয়াছেন। সুতরাং হেয় ও উহার হেতু বলিয়া তাঁহার মতে শরীরাদি দশটী প্রমেয়ই "হেয়" নামক প্রথম প্রকার, ইহা বুঝা যায়। তাহার পরে চরম প্রমেয় অপবর্গ, "অধিগন্তব্য" অর্থাৎ মুমুক্ষুর লভ্য, উহা হেয় নহে, এই জন্য উহাকে (২) "অধিগন্তব্য" নামে দ্বিতীয় প্রকার প্রমেয় বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত শরীরাদি দশবিধ প্রমেয়ের অন্তর্গত যে বুদ্ধি, উহার মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানরূপ বুদ্ধিই হেয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানরূপ যে বুদ্ধি, তাহা ত হেয় নহে, উহা পূর্ব্বোক্ত অপবর্গলাভের উপায়—এই জন্য পৃথক্ করিয়া ঐ তত্ত্বজ্ঞানরূপ

বুদ্ধিকেই (৩) "উপায়" নামে তৃতীয় প্রকার প্রমেয় বলিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম প্রমেয় আত্মা, তিনি ঐ তত্ত্বজ্ঞানরূপ উপায় লাভ করিলে তাঁহার অধিগন্তব্য অপবর্গ লাভ করিবেন। সুতরাং তিনি "হেয়", "অধিগন্তব্য"ও "উপায়" হইতে পৃথক্ প্রকার প্রমেয়। তিনি "হেয়"ও নাহেন, "অধিগন্তব্য"ও নহেন, "উপায়"ও নহেন। তিনি "অধিগন্তা", সুতরাং তাঁহাকে ঐ নামে অথবা ঐরূপ অন্য কোন নামে চতুর্থ প্রকার প্রমেয় বলিতে হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপ চতুর্ব্বিধ প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানই মুমুক্ষুর আবশ্যক। কারণ, মুক্তিলাভ করিতে হইলে আমার হেয় ও লভ্য কি এবং তাহার লাভের উপায় কি, এবং আমি কে? ইহা যথার্থরূপে বুঝিতে হইবে। হেয় ও লভ্য কি, তাহা যথার্থরূপে না বুঝিলে উহার ত্যাগ ও লাভের উপায়ের জন্য প্রযত্নও সফল হয় না এবং সেই উপায় কি, তাহাও যথার্থরূপে না বুঝিলে তজ্জন্য যথার্থ প্রযত্ন হইতেও পারে না। এবং সেই ত্যাগ ও লাভের কর্ত্তা কে? অধিগন্তব্য বা পরমপুরুষার্থ মোক্ষ কাহার হইবে? তাহার স্বরূপ কি? ইহাও যথার্থরূপে না বুঝিলে সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশক তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতেই পারে না। সুতরাং মুক্তি হইতে পারে না। অতএব যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ঐ সকল বিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের ধ্বংস করিয়া মুমুক্ষুর মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়, ঐ সমস্ত পদার্থই প্রমেয় নামে কথিত হইয়াছে। আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত সেই দ্বাদশবিধ প্রমেয় পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকারে বিভক্ত।

এখানে স্মরণ করা অত্যাবশ্যক যে, ভাষ্যকার প্রথমসূত্রভাষ্যে আত্মাদি প্রমেয়বর্গেরই তত্ত্বজ্ঞান-জন্য মোক্ষলাভ হয়, ইহা বলিয়া উহা সমর্থন করিবার জন্য পরে বলিয়াছেন যে,—"হেয়ং তস্য নির্ব্বর্ত্তকং, হানমাত্যন্তিকং, তস্যোপায়োঽধিগন্তব্য ইত্যেতানি চত্বার্য্যর্থপদানি সম্যগ্ বুদ্ধ্বা নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতি" (প্রথম খণ্ড, ২২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সেখানে বার্ত্তিককারের ব্যাখ্যানুসারেই ভাষ্যকারোক্ত চারিটী "অর্থপদে"র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিকার উদয়নাচার্য্য প্রভৃতিও ঐ ব্যাখ্যার অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন[১]। কিন্তু সেখানে বার্ত্তিককার যে ভাষ্যকারোক্ত "হান" শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ

১। তচ্চৈতদুত্তরসূত্রেণানূদ্যত ইতি ভাষ্যং। হেয়হানোপায়াধিগন্তব্যভেদাচ্চত্বার্য্যর্থপদানি সম্যগ্ বুদ্ধ্বা নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতীতি। "হেয়ং" দুঃখং, "তস্য নির্ব্বর্ত্তক"মবিদ্যাতৃষ্ণে ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি। "হানং" তত্ত্বজ্ঞানং, "তস্যোপায়ঃ" শাস্ত্রং। "অধিগন্তব্যো" মোক্ষঃ। এতানি চত্বার্য্যর্থপদানি সর্ব্বাস্বধ্যাত্মবিদ্যাসু সর্ব্বাচার্য্যৈর্বর্ণ্যন্ত ইতি। —ন্যায়বার্ত্তিক।

নিঃশ্রেয়সহেতুভাবাভিধানস্য "অনু" পশ্চাৎ উদ্যতে "অনূদ্যতে"। তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদে হি সাক্ষাৎ তদ্বিষয়মিথ্যাজ্ঞানাদিনিবৃত্তিক্রমেণাপবর্গোৎপাদ ইতি দ্বিতীয়সূত্রেণানূদ্যতে। তদেতদ্ভাষ্যং "তচ্চৈত"দিত্যাদি। "অধিগচ্ছতী"-ত্যন্তমনূদ্য ব্যাচষ্টে "হেয়"মিতি। মিথ্যাজ্ঞানমাত্মাদিষু প্রমেয়েষু অবিদ্যা। তন্মূলং তৃষ্ণা। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ,—দ্বেষোঽপি দ্রষ্টব্যঃ। তন্মূলৌ চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। তদেতদ্ধেয়ং।

"হানং তত্ত্বজ্ঞানং", হীয়তে হানেন তৎসর্ব্বং। তস্য প্রমাণং তস্যোপায়ঃ শাস্ত্রং, অধিগন্তব্যো মোক্ষঃ। এবমবয়বান্ বিভজ্য তাৎপর্য্যমাহ "এতানী"তি। এতানি চত্বার্য্যর্থপদানি পুরুষার্থস্থানানি। ন কেবলং হেয়াধিগন্তব্যাদিভেদেন দ্বাদশবিধং প্রমেয়ং দর্শয়তস্তদ্বিষয়তত্ত্বজ্ঞানায় চ সোপকরণন্যায়াভিধানপ্রমাণব্যুৎপাদনং সূত্রকারস্য সম্মতমপি তু সর্ব্বেষামেবাধ্যাত্মবিদ্যামাচার্য্যাণামিতি তাৎপর্য্যমিত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা। [শেষ অংশ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

তত্ত্বজ্ঞানকে বলিয়াছেন তত্ত্বজ্ঞানসাধন প্রমাণ, এবং ঐ প্রমাণের উপায় বলিয়াছেন শাস্ত্র। তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিকার উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যার কারণ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বার্ত্তিককার প্রভৃতির উক্তরূপ ব্যাখ্যায় যে কষ্টকল্পনা আছে এবং নানা কারণে ঐরূপ ব্যাখ্যা যে সকলে গ্রহণ করিবেন না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভের দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায় যে, (১) হেয়, (২) হেয়হেতু, (৩) আত্যন্তিক হান অর্থাৎ হেয় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মুক্তি এবং উহার জন্য অধিগন্তব্য বা লভ্য (৪) "উপায়" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, এই চারিটী অর্থপদকে সম্যক্ বুঝিলে মোক্ষ লাভ করে। "হেয়" বলিয়া পরে "আত্যন্তিক হান" বলিলে যে, উহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত হেয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সরলভাবে বুঝা যায় এবং পরে উহার "উপায়" বলিলে উহার দ্বারা যে, পূর্ব্বোক্ত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় তত্ত্বজ্ঞানই সরলভাবে বুঝা যায়, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রেই সমস্ত আচার্য্যই যে, পূর্ব্বোক্ত চারিটী অর্থপদ বলিয়াছেন, ইহা বার্ত্তিককারও পূর্ব্বোক্ত স্থলে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য অধ্যাত্মবিদ্যাতে যে বার্ত্তিককারের ব্যাখ্যাত চারিটী অর্থপদই কথিত হইয়াছে, ইহা দেখা যায় না। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, এই মোক্ষশাস্ত্র (সাংখ্যশাস্ত্র) চিকিৎসাশাস্ত্রের ন্যায় চতুর্ব্যূহ। যেমন রোগ, আরোগ্য, রোগের নিদান ও ঔষধ, এই চারিটী ব্যূহ বা সমূহ চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, তদ্রূপ হেয়, হান এবং হেয়হেতু ও হানোপায়, এই চারিটী ব্যূহ মোক্ষশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কারণ, ঐ চারিটী মুমুক্ষুদিগের জিজ্ঞাসিত। তন্মধ্যে ত্রিবিধ দুঃখই (১) হেয়। উহার আত্যন্তিক নিবৃত্তিই (২) হান। অবিবেক বা অবিদ্যা (৩) হেয়হেতু। বিবেকখ্যাতি বা তত্ত্বজ্ঞানই (৪) হানোপায়। বৌদ্ধাদিশাস্ত্রেও পূর্ব্বোক্ত হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায়, এই চতুর্ব্যূহের উল্লেখ দেখা যায়। অন্যান্য আচার্য্যগণও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকেই "হান" বলিয়াছেন, এবং তত্ত্বজ্ঞানকেই উহার "উপায়" বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের ন্যায় আর কেহ যে, "হানং তত্ত্বজ্ঞানং, তস্যোপায়ঃ শাস্ত্রং" এইরূপ কথা বলিয়াছেন এবং বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় আর কেহ যে, অর্থপদের ব্যাখ্যা করিতে "তত্ত্বজ্ঞান" শব্দের প্রমাণ অর্থ বলিয়াছেন, ইহা দেখা যায় না। অবশ্য উদ্দ্যোতকর "উপায়" শব্দের দ্বারা শাস্ত্রকেই গ্রহণ করায় তজ্জন্যও বাচস্পতি মিশ্র "তত্ত্বজ্ঞান" শব্দের দ্বারা "তত্ত্বং জ্ঞায়তেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন প্রমাণকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের সাধন প্রমাণ শাস্ত্রেই উপদিষ্ট হওয়ায় শাস্ত্রকেই উহার উপায় বলা যায়। কিন্তু উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারোক্ত চারিটী অর্থপদের ব্যাখ্যা করিতে "হানং তত্ত্বজ্ঞানং" এই কথা লিখিয়াছেন কেন? এবং বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি মহামনীষিগণই বা উহার সমর্থন করিয়াছেন কেন? ইহা প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক।

ননু "হান"পদমাত্যন্তিকপদসমভিব্যাহারাদপবর্গে বর্ত্ততে, তৎ কথং তত্ত্বজ্ঞানমুচ্যতে ইত্যত আহ "হীয়তে হী"তি। করণব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্যানেন তত্ত্বজ্ঞানং বিবক্ষিতং। ভাবব্যুৎপত্ত্যা তু আত্যন্তিকপদসমভিব্যাহারাদপবর্গ ইত্যর্থঃ। তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি। (এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মুদ্রিত "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" ২৩৭—২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আমরা বুঝিয়াছি যে, ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যে "অপবর্গোঽধিগন্তব্যঃ" এই কথা বলায় তিনি প্রথম সূত্রভাষ্যেও চারিটী অর্থপদ বলিতে পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভে সর্ব্বশেষে "অধিগন্তব্য" শব্দের দ্বারা অপবর্গকেই প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রথম সূত্রেও "নিঃশ্রেয়স" শব্দের পরে "অধিগম" শব্দের প্রয়োগ থাকায় নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গই যে অধিগন্তব্য শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতিও ভাষ্যোক্ত "অধিগন্তব্য" শব্দের অন্য কোনরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। এখন যদি ভাষ্যকারোক্ত অধিগন্তব্য শব্দের দ্বারা অপবর্গই বুঝিতে হয়, তাহা হইলে আর সেখানে ভাষ্যকারোক্ত "হান" শব্দের দ্বারা অপবর্গ বুঝা যায় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া ভাষ্যকারের "আত্যন্তিকং হানং" এই কথার দ্বারা যদ্দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়, এইরূপ অর্থে তত্ত্বজ্ঞানই বুঝিতে হয়। এই জন্যই উদ্দ্যোতকর সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"হানং তত্ত্বজ্ঞানং"। বাচস্পতি মিশ্র আবার ঐ তত্ত্বজ্ঞান শব্দের অর্থ বলিয়াছেন প্রমাণ। অবশ্য তাঁহার ঐরূপ ব্যাখ্যার কারণ থাকিলেও উহা সর্ব্বসম্মত হইতে পারে না। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত স্থলে অধিগন্তব্য শব্দের দ্বারা অপবর্গকেই চতুর্থ অর্থপদ বলিয়া প্রকাশ করিলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত 'হান' শব্দের দ্বারা অন্য অর্থই যে বুঝিতে হইবে, ইহা স্বীকার্য্য। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "তস্যোপায়োঽধিগন্তব্য ইত্যেতানি চত্বার্য্যর্থপদানি" এই সন্দর্ভে অধিগন্তব্য শব্দটী উপায়ের বিশেষণ মাত্র, উহা অপবর্গ বোধের জন্য প্রযুক্ত হয় নাই, উহার পূর্ব্বে "হানমাত্যন্তিকং" এই কথার দ্বারাই তৃতীয় অর্থপদ অপবর্গ কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিলে ভাষ্যকারোক্ত ঐ "অধিগন্তব্য" শব্দটী ব্যর্থবিশেষণ হয়। ভাষ্যকার ঐ স্থলে আর কোন অর্থপদেরই ঐরূপ কোন অনাবশ্যক বিশেষণ বলেন নাই, পরন্তু চারিটী অর্থপদ বলিতে সর্ব্বশেষে অধিগন্তব্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক। এবং এখানে পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যে "অপবর্গোঽধিগন্তব্যঃ" এই কথার দ্বারা অপবর্গকেই যে তিনি অধিগন্তব্য বলিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্যক। এখানে পরে ঐ অপবর্গ লাভেরই উপায় বলিতে শেষে বলিয়াছেন, "তদধিগমোপায়স্তত্ত্বজ্ঞানং"। কিন্তু প্রথম সূত্রভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভে "তস্যোপায়ঃ" এই বাক্যের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আত্যন্তিক হানেরই উপায় বলিয়া সর্ব্বশেষে অধিগন্তব্য শব্দের দ্বারা চতুর্থ অর্থপদ অপবর্গই প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাষ্যকার ঐ স্থলে সর্ব্বশেষে অধিগন্তব্য শব্দের প্রয়োগ করিয়া "ইত্যেতানি চত্বার্য্যর্থপদানি" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করায় তাঁহার শেষোক্ত অধিগন্তব্যই যে তাঁহার বিবক্ষিত চতুর্থ অর্থপদ, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। ভাষ্যকার যে তাঁহার কথিত উপায়েরই বিশেষণমাত্র বোধের জন্য শেষে ঐ অধিগন্তব্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় না। ঐ স্থলে ঐরূপ বিশেষণ-প্রয়োগের কোনই প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়াই বার্ত্তিককার পূর্ব্বোক্ত স্থলে ভাষ্যকারোক্ত "হান" শব্দের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানই বুঝিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন "হানং তত্ত্বজ্ঞানং" এবং তিনি ভাষ্যকারোক্ত "হেয়ং তস্য নির্ব্বর্ত্তকং" এই বাক্যের দ্বারা হেয় দুঃখ এবং উহার জনক বা হেয়হেতু শরীরাদিকেও হেয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়া প্রথম অর্থপদ বলিয়াছেন। হেয় ও হেয়হেতুকে পৃথক্‌ভাবে দুইটী অর্থপদ বলিয়া গ্রহণ করিলে ভাষ্যকারোক্ত চারিটী অর্থপদের সংগতি হয় না, তাহা হইলে শেষোক্ত অপবর্গকে

গ্রহণ করিয়া অর্থপদ পাঁচটী হয়, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। তাই বার্ত্তিককার ঐ স্থলে লিখিয়াছেন,—"হেয়হানোপায়াধিগন্তব্য-ভেদাচ্চত্বার্য্যর্থপদানি"। পরে লিখিয়াছেন,—"এতানি চত্বার্য্যর্থপদানি সর্ব্বাস্বধ্যাত্মবিদ্যাসু সর্ব্বাচার্য্যৈর্বর্ণ্যন্তে"। তাৎপর্য্য-টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অর্থপদানি পুরুষার্থস্থানানি"। "অর্থ" শব্দের অর্থ প্রয়োজন, "পদ" শব্দের অর্থ স্থান। পুরুষের যাহা প্রয়োজন, তাহাকে বলে পুরুষার্থ। পরমপুরুষার্থ মোক্ষ পূর্ব্বোক্ত হেয় প্রভৃতি চারিটীতে অবস্থিত। কারণ, ঐ চারিটীর তত্ত্বজ্ঞান মুমুক্ষুর সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞান ধ্বংস করিয়া মোক্ষের কারণ হয়। তাই ঐ চারিটীকে "অর্থপদ" বা পুরুষার্থস্থান বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ স্থলে বার্ত্তিককারের শেষ কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, হেয় ও অধিগন্তব্যাদিভেদে দ্বাদশবিধ প্রমেয় প্রদর্শন করিয়া, সেই সেই প্রমেয়বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত সাঙ্গ ন্যায়কথন ও প্রমাণ ব্যুৎপাদন যে কেবল মহর্ষি গোতমেরই সম্মত, তাহা নহে। কিন্তু সমস্ত অধ্যাত্মবিৎ আচার্য্যগণেরই সম্মত, ইহাই পূর্ব্বোক্ত বার্ত্তিক সন্দর্ভের তাৎপর্য্য। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার প্রভৃতি পূর্ব্বে যে চারিটী অর্থপদ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে গোতমোক্ত শরীরাদি একাদশ প্রমেয়ও আছে। শরীরাদি দশটী প্রমেয় (১) হেয় এবং চরম প্রমেয় অপবর্গ (৪) অধিগন্তব্য। প্রথম প্রমেয় আত্মা ও চরম প্রমেয় অপবর্গ উপাদেয়। সুতরাং হেয় ও উপাদেয় ভেদে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়কে দুই প্রকারও বলা যায়। আবার হেয়, অধিগন্তব্য, উপায় ও অধিগন্তা, এই চারি প্রকারও বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যটীকাসন্দর্ভে "হেয়াধিগন্তব্যাদিভেদেন" এইরূপ পাঠই প্রকৃত মনে হয়। তাহা হইলে তাৎপর্য্যটীকাকারও পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যানুসারে দ্বাদশ প্রমেয়কে চতুর্ব্বিধই বলিয়াছেন বুঝা যায়। কেবল হেয় ও অধিগন্তব্য বলিলে শরীরাদি একাদশ প্রমেয়ের দুইটী প্রকারই বুঝা যায়। তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানরূপ বুদ্ধি ও প্রথম প্রমেয় আত্মা না থাকায় আরও দুইটী প্রকার বলিতে হয়। তাহা হইলে ভাষ্যকার যে, এখানে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়কে চারি প্রকারে বিভক্ত বলিয়াছেন, তাহারও উপপত্তি হয়। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বে যে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়কেই চারিটী অর্থপদ বলিয়া সেখানেও প্রমেয়ের পূর্ব্বোক্ত চারিটী প্রকারই বলিয়াছেন, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। পরন্তু বার্ত্তিককার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে উহা বুঝিবার বাধকও আছে। কারণ, সেখানে বার্ত্তিককার "উপায়" শব্দের দ্বারা শাস্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার সেখানে বার্ত্তিককারোক্ত "তত্ত্বজ্ঞান" শব্দের দ্বারা প্রমাণকে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ প্রমাণ ও শাস্ত্র প্রমেয়বিভাগে বিবক্ষিত নহে। পরন্তু প্রথম প্রমেয় আত্মা পূর্ব্বোক্ত চারিটী অর্থপদের মধ্যে নাই। সুতরাং পূর্ব্বে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়কেই যে চারিটী "অর্থপদ" বলা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চারিটী অর্থপদের মধ্যে শরীরাদি একাদশ প্রমেয় থাকায় ঐ সমস্ত প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানও যে মুক্তির কারণ, ইহাও ঐ কথার দ্বারা বলা হইয়াছে। সেখানে ভাষ্যকারের উহাই প্রধান বক্তব্য। আত্মার তত্ত্বজ্ঞান যে মুক্তির কারণ, ইহা সর্ব্বসম্মত। আত্মার ন্যায় শরীরাদি একাদশ প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানও যে মুক্তির কারণ এবং ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারাই যে, উহাও অনূদিত হইয়াছে, ইহা সমর্থন

করিতেই ভাষ্যকার প্রথম সূত্রভাষ্যে "হেয়ং" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভ বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে শেষে যে, উক্ত চারিটী অর্থপদ সমস্ত অধ্যাত্মবিদ্যায় সমস্ত আচার্য্য কর্ত্তৃক বর্ণিত, ইহা বলিয়াছেন, তাহাও অসত্য নহে। কারণ, সমস্ত মোক্ষশাস্ত্রেই হেয় ও অধিগন্তব্য বর্ণিত হইয়াছে এবং তত্ত্বজ্ঞান ও উহার উপায় শাস্ত্রও বর্ণিত হইয়াছে। মোক্ষশাস্ত্রের আচার্য্য দার্শনিক ঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞানের উপায় শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়াই "হেয়" প্রভৃতি বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে শাস্ত্রও অর্থপদের মধ্যে গণ্য। তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্ত বার্ত্তিক-সন্দর্ভের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সাঙ্গ ন্যায় কথন ও প্রমাণ-ব্যুৎপাদন মহর্ষি গোতমের ন্যায় সমস্ত অধ্যাত্মবিৎ আচার্য্যেরই সম্মত, ইহাই বক্তব্য বুঝা যায়। তাহা হইলে তাঁহার মতে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন প্রমাণকেই বার্ত্তিককার "তত্ত্বজ্ঞান" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বলা যায়। সে যাহা হউক, ফল কথা মোক্ষশাস্ত্রে যেমন বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতির কথিত (১) হেয়, (২) হান, (৩) হেয়হেতু ও (৪) হানোপায়, এই চতুর্ব্যূহ প্রতিপাদ্যরূপে কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ (১) হেয়, (২) হান, (৩) উপায় ও (৪) অধিগন্তব্য, এই চারিটীও "অর্থপদ"রূপে কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথম সূত্রভাষ্যে "হেয়ং" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সেই চারিটি অর্থপদই প্রকাশ করিয়াছেন। মোক্ষশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্যূহ তিনি ঐ স্থলে প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং বার্ত্তিককারের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থপদচতুষ্টয়-ব্যাখ্যা একেবারে অগ্রাহ্য বলা যায় না। বার্ত্তিককারের পূর্ব্বোক্ত "হানং তত্ত্বজ্ঞানং" এই ব্যাখ্যার গূঢ় কারণও পূর্ব্বে বলিয়াছি। উহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করা আবশ্যক। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য এই যে, প্রচলিত বার্ত্তিক গ্রন্থের যে পাঠ অনুসারে পূর্ব্বে ভাষ্যকারোক্ত "অর্থপদ"চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ঐ পাঠ বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের সময়েও যে বিবাদ ছিল, তখনও কোন কোন বার্ত্তিকপুস্তকে ঐ পাঠ ছিল না, ইহা তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের নিজের কথার[১] দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র নিঃসন্দেহে ঐ পাঠের উত্থাপন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই হেতুর দ্বারা উদয়নাচার্য্য সেখানে ঐ পাঠের প্রকৃতত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম মুদ্রিত তাৎপর্য্যটীকা গ্রন্থে ঐ অংশ দেখা যায় না। পরে এসিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে প্রকাশিত সটীক তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি গ্রন্থ নিম্নে (২৩৭ পৃষ্ঠায়) ঐ অংশ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও অশুদ্ধি আছে। তবে তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিকার উদয়নাচার্য্য ঐ অংশের টীকা করায় তাঁহার মতে বার্ত্তিক ও তাৎপর্য্যটীকার ঐ সমস্ত পাঠ যে প্রকৃত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু যাহারা বার্ত্তিককারের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যাকে যথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা বার্ত্তিকের পূর্ব্বোক্ত বিবাদাস্পদ পাঠকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও বার্ত্তিককারের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন। সুধীগণ ঐ স্থলে বার্ত্তিকাদি গ্রন্থের মূল সন্দর্ভগুলি দেখিয়া উক্ত বিষয়ে বিচার করিবেন।

১। অত্রচ "হেয়ে"ত্যাদ্যনুবাদবার্ত্তিকং ন ভাষ্যে বর্ত্তত ইত্যনাশঙ্কনীয়ং। টীকাকৃতা সিদ্ধবদুত্থাপিতত্বাৎ। কচিল্লিপ্যভাবস্য লেখকদোষেণাপ্যুপপত্তেঃ। অন্যথা ভাষ্যতাৎপর্য্যার্থানুবাদকত্বং"—ইত্যাদি তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি। ২৭৮ পৃষ্ঠা। অত্র ভাষ্যানুবাদত্বাদ্বার্ত্তিকমাপাততো ন যুক্তমিতি বার্ত্তিকমেবৈতন্ন ভাষ্যমিত্যাশঙ্ক্য নিরস্যতি অত্র চেতি। বর্দ্ধমানকৃত টীকা।

ভাষ্য। এবঞ্চ—

সূত্র। দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ॥১॥৪১॥

অনুবাদ। এইরূপ হইলেই "দোষনিমিত্ত"সমূহের অর্থাৎ শরীরাদি দুঃখ পর্য্যন্ত প্রমেয়সমূহের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়।

ভাষ্য। শরীরাদিদুঃখান্তং প্রমেয়ং দোষনিমিত্তং তদ্বিষয়ত্বান্মিথ্যাজ্ঞানস্য। তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং তদ্বিষয়মুৎপন্নমহঙ্কারং নিবর্ত্তয়তি, সমানে বিষয়ে তয়োর্ব্বিরোধাৎ। এবং তত্ত্বজ্ঞানাদ্‌"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ" ইতি। স চায়ং শাস্ত্রার্থসংগ্রহোঽনূদ্যতে নাপূর্ব্বো বিধীয়ত ইতি।

অনুবাদ। শরীরাদি দুঃখ পর্য্যন্ত প্রমেয় দোষনিমিত্ত; কারণ, মিথ্যাজ্ঞান সেই শরীরাদিবিষয়ক হয়। সেই এই তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ শরীরাদি দুঃখ পর্য্যন্ত প্রমেয়-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান সেই সমস্ত প্রমেয়বিষয়ক উৎপন্ন অহঙ্কারকে (মিথ্যাজ্ঞানকে) নিবৃত্ত করে। কারণ, একই বিষয়ে সেই তত্ত্বজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধ আছে। এইরূপ হইলে তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত "দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের উত্তরোত্তরের বিনাশ হইলে তদনন্তরের অর্থাৎ ঐ মিথ্যাজ্ঞানাদির অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত দোষাদির বিনাশপ্রযুক্ত অপবর্গ হয়।" সেই ইহা কিন্তু শাস্ত্রার্থসংগ্রহ অনূদিত হইয়াছে, অপূর্ব্ব (পূর্ব্বে অনুক্ত) বিহিত হয় নাই।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথমে যুক্তির দ্বারা এই সূত্রোক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করায় পরে "এবঞ্চ" বলিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যুক্তি অনুসারেই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, "দোষনিমিত্ত"গুলির তত্ত্বজ্ঞান প্রযুক্ত অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়। ভাষ্যকারের মতে এখানে বহুবচনান্ত "দোষনিমিত্ত" শব্দের দ্বারা শরীরাদি দুঃখপর্য্যন্ত প্রমেয়ই মহর্ষির বিবক্ষিত। বস্তুতঃ মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে (১৯ সূত্রে) আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত যে দ্বাদশ প্রমেয় বলিয়াছেন, তন্মধ্যে শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল ও দুঃখ, এই দশটী প্রমেয়ই দোষের নিমিত্ত। জীবের ঐ শরীরাদি থাকা পর্য্যন্তই তাঁহার রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ জন্মে। দোষও দোষান্তরের কারণ হয়। প্রথম প্রমেয় আত্মা ও চরম প্রমেয় অপবর্গকে দোষের নিমিত্ত বলা যায় না। কারণ, মুক্ত পুরুষের আত্মা ও অপবর্গ বিদ্যমান থাকিলেও কোন দোষ জন্মে না। সুতরাং শরীরাদি দুঃখপর্য্যন্ত দশটী প্রমেয়ই এই সূত্রে "দোষনিমিত্ত" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানরূপ বুদ্ধিই দোষের

সাক্ষাৎ নিমিত্ত। প্রথম অধ্যায়ে "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রে মিথ্যাজ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ব্বেই দোষের উল্লেখ করিয়া মহর্ষি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। শরীরাদি দুঃখপর্য্যন্ত প্রমেয়গুলি দোষের নিমিত্ত কেন হয়? ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন—মিথ্যাজ্ঞানের শরীরাদিবিষয়কত্ব। অর্থাৎ যে মিথ্যাজ্ঞান জীবের দোষের সাক্ষাৎ কারণ, উহা শরীরাদিবিষয়ক হওয়ায় তৎসম্বন্ধে ঐ শরীরাদি দোষের নিমিত্ত হয়। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে ঐ শরীরাদি দুঃখ-পর্য্যন্ত প্রমেয়বিষয়েও নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণনা করিয়া, উহার বিপরীত জ্ঞানগুলিকেই সেই শরীরাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন। এখানে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ঐ শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞান যে, তদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়, ইহা বলিয়াছেন; উহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার এখানে পরে বলিয়াছেন যে, যেহেতু একই বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধ আছে, অতএব শরীরাদিবিষয়ক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা সেই শরীরাদিবিষয়েই যে মিথ্যাজ্ঞানরূপ অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিবৃত্ত করে। অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। সুতরাং একই বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। পরজাত তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বজাত মিথ্যাজ্ঞানকে বিনষ্ট করে। শরীরাদিবিষয়ে আত্মবুদ্ধিরূপ যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহা ঐ শরীরাদিবিষয়ে অনাত্মবুদ্ধিরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই বিনষ্ট হয়। ঐ তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ মিথ্যাজ্ঞানের কিছুতেই নিবৃত্তি হইতে পারে না। এক বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অন্যবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। কারণ, একই বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। সুতরাং শরীরাদি দুঃখ পর্য্যন্ত প্রমেয়বিষয়েও যখন জীবের নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান আছে এবং তৎপ্রযুক্ত জীবের সংসার হইতেছে, তখন ঐ শরীরাদি-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানও তদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি করিয়া জীবের সংসারনিবৃত্তি বা মোক্ষের কারণ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। তাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ঐ শরীরাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ক অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়, ইহা বলিয়া শরীরাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানও যে মুমুক্ষুর আবশ্যক অর্থাৎ উহাও যে মুক্তির কারণ, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারাই যে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য ভাষ্যকার শেষে এখানে "এবং তত্ত্বজ্ঞানাৎ" এই বাক্যের প্রয়োগপূর্ব্বক মহর্ষির "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, এখানে মহর্ষি "দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ" এই সূত্রের দ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রার্থেরই অনুবাদ, ইহা অপূর্ব্ব বিধান নহে। অর্থাৎ পূর্ব্বে ঐ দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা যে শাস্ত্রার্থসংগ্রহ বা সংক্ষেপে শাস্ত্রার্থ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য এখানে এই সূত্রটি বলা হইয়াছে। যাহা অপূর্ব্ব অর্থাৎ মহর্ষি পূর্ব্বে যাহা বলেন নাই, এমন কোন নূতন সিদ্ধান্ত এই সূত্রের দ্বারা বলা হয় নাই। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে "দোষের" নিবৃত্তি হয়, দোষের নিবৃত্তি হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, ঐ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে "জন্ম"র নিবৃত্তি হয়, "জন্মের" নিবৃত্তি হইলে "দুঃখের" নিবৃত্তি হয়, সুতরাং তখন অপবর্গ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক কি? এবং কোন্ পদার্থবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান সেখানে মিথ্যাজ্ঞান শব্দের

দ্বারা বিবক্ষিত, ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানই যে মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক, ইহা যুক্তিসিদ্ধই আছে। কিন্তু কোন্ পদার্থবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহা দ্বিতীয় সূত্রে স্পষ্ট বলা হয় নাই। তাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। মহর্ষির এই অনুবাদের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় সূত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞান কেবল আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নহে। শরীরাদিবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানও সংসারের নিদান। সুতরাং উহাও ঐ সূত্রে মিথ্যাজ্ঞান শব্দের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছে। শরীরাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই উহার নিবর্ত্তক। এইরূপ নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান যে সংসারের নিদান, ইহা সিদ্ধই আছে। সুতরাং ঐ মিথ্যাজ্ঞান শব্দের দ্বারা নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানও পরিগৃহীত হইয়াছে। ঐ আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই সেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক। এইরূপ অপবর্গবিষয়ক নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানও অপবর্গ-লাভের ঘোর অন্তরায় হইয়া সংসারের নিদান হয়। সুতরাং অপবর্গবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা উহারও নিবৃত্তি করিতে হইবে। ফলকথা, যে সকল পদার্থবিষয়ে যেরূপ মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ, ঐ সমস্ত পদার্থবিষয়ে ঐ মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত তত্ত্বজ্ঞানই ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। মহর্ষি ঐ সমস্ত পদার্থকেই "প্রমেয়" নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। মহর্ষিকথিত প্রথম প্রমেয় জীবাত্মা। তাঁহার মতে জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন। তন্মধ্যে জীবের নিজশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাই নিজের আত্মা। সেই নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই তাহার সংসারের নিদান। সমস্ত আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান তাহার সংসারের নিদান নহে। কারণ, জীব তাহার নিজের শরীরাদিকেই তাহার আত্মা বলিয়া বুঝিয়া, ঐ মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ রাগদ্বেষাদি দোষ লাভ করিয়া, তজ্জন্য নানাবিধ শুভাশুভ কর্ম্মফলে নানাবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নানাবিধ সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে। সুতরাং তাহার সংসারের নিদান ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি করিতে তাহার নিজের আত্ম-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই আবশ্যক। তাহা হইলেই তাহার শরীরাদি অনাত্ম পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। সুতরাং নিজের আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই পূর্ব্বোক্তরূপ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। শ্রুতির দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্ত বুঝা যায়[১]। কিন্তু মহর্ষি গোতম যখন এই সূত্রের দ্বারা শরীরাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকেও মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে কেবল আত্মতত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ নহে। তাঁহার মতে প্রথম প্রমেয় আত্মার তত্ত্বজ্ঞান, ঐ আত্মাও শরীরাদি একাদশ প্রমেয়বিষয়ক (সমূহালম্বন তত্ত্বজ্ঞান) হইয়াই ঐ আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাই বলিতে হইবে। এই বিষয়ে অন্যান্য কথা এই আহ্নিকের শেষভাগে পাওয়া যাইবে।

১। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদি।—বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫।

"আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ"।

—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১২।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি কেহ কেহ মহর্ষি গোতমের প্রমেয়বিভাগসূত্রে (১।১।৯ সূত্রে) "আত্মন্" শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা, উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং "আত্মন্" শব্দের দ্বারা যে, ঐ উভয় আত্মাকেই গ্রহণ করা যায়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (চতুর্থ খণ্ড, ৬০—৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐ "আত্মন্" শব্দের দ্বারা কেবল জীবাত্মাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ন্যায়দর্শনে প্রমেয়মধ্যে এবং ষোড়শ পদার্থের মধ্যেই পরমাত্মা ঈশ্বরের বিশেষরূপে উল্লেখ হয় নাই কেন ? এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডে (৮৭—৯১ পৃষ্ঠায়) যথামতি কারণ বর্ণন করিয়াছি। সে সকল কথার সার মর্ম্ম এই যে, যে সমস্ত পদার্থবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান জীবের সংসারের নিদান হওয়ায় উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মুক্তির কারণ হয়, সেই সমস্ত পদার্থই মহর্ষি গোতম ন্যায়দর্শনে "প্রমেয়" নামে পরিভাষিত করিয়া বলিয়াছেন। জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর তাঁহার মতে জগতের নিমিত্তকারণ ও জীবাত্মা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন বলিয়াই স্বীকৃত। সুতরাং ঈশ্বরবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান তাঁহার মতে জীবের সংসারের নিদান না হওয়ায় তিনি প্রমেয়বিভাগসূত্রে প্রথমে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা কেবল জীবাত্মাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ফলকথা, তাঁহার মতে ঈশ্বর সামান্যতঃ প্রমেয় হইলেও "হেয়" ও "অধিগন্তব্য" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার প্রমেয় নহেন। সুতরাং ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান জীবের সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মুক্তির সাক্ষাৎকারণ না হওয়ায় তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পরিভাষিত "প্রমেয়" পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে মুমুক্ষুর পক্ষে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ঐ প্রমেয় পদার্থের যে মনন আবশ্যক, ঐ মননের নির্ব্বাহ ও তত্ত্ব-নিশ্চয় রক্ষার জন্যই এই ন্যায়দর্শনের প্রকাশ হইয়াছে। তাই উহার জন্যই ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থেরও উল্লেখপূর্ব্বক ঐ সমস্ত পদার্থেরও তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা কথিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন "প্রস্থান" অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য আছে। প্রস্থানভেদেই শাস্ত্রের ভেদ হইয়াছে। সংশয় প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পদার্থ ন্যায়শাস্ত্রেরই পৃথক্ প্রস্থান। উহা অন্য শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। কিন্তু অন্য শাস্ত্রেও ঐ চতুর্দ্দশ পদার্থ স্বীকৃত। এইরূপ ঈশ্বর প্রভৃতি বেদসিদ্ধ সমস্ত পদার্থ মহর্ষি গোতমেরও স্বীকৃত। তিনি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে "সিদ্ধান্তে"র উল্লেখ করায় সিদ্ধান্তরূপে ঈশ্বরেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে যে ভাবে প্রমাণাদি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তন্মধ্যে বিশেষরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ অনাবশ্যক। কারণ, তাঁহার মতে ঈশ্বর জীবের সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় কোন প্রমেয় নহেন; মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য তাদৃশ প্রমেয় মননের নির্ব্বাহক বিচারাঙ্গ কোন পদার্থও নহেন।

তবে কি মহর্ষি গোতমের মতে মুক্তিলাভে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানের কোন অপেক্ষা নাই ? কেবল তাঁহার পরিভাষিত জীবাত্মাদি প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানই কি মুক্তির কারণ ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গোতমের মতেও মুক্তিলাভে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান যে মুক্তি-লাভে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা শ্রৌত সিদ্ধান্ত। সুতরাং শ্রুতিপ্রামাণ্যসমর্থক মহর্ষি গোতমেরও যে উহা সম্মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "বেদাহমেতং পুরুষং পুরাণমাদিত্য-

বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ॥—(৩।৮) এই শ্রুতিবাক্যে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান যে, মুক্তিলাভে নিতান্তই আবশ্যক, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। মুক্তির অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পূর্ব্বে উক্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। (চতুর্থ খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফল কথা, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানও যে মুক্তিলাভে অত্যাবশ্যক, ইহা সমস্ত ন্যায়াচার্য্যগণেরই সম্মত। কারণ, উহা শ্রুতিসম্মত সত্য। এই জন্যই মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য তাঁহার ন্যায়কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে মুমুক্ষুর পক্ষে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্য ঈশ্বর মননের উপায় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় কারিকার টীকায় বরদরাজ প্রথমে পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন-পূর্ব্বক সমাধান করিয়াছেন যে,[১] পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার অনুগ্রহসহকৃত জীবাত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই মুক্তির কারণ। বরদরাজ উহা সমর্থন করিতে শেষে "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরঞ্চ" এবং "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে উক্ত শ্রুতির দ্বারা পরব্রহ্ম পরমাত্মা ও অপরব্রহ্ম জীবাত্মা, এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের জ্ঞানই মুক্তিলাভে আবশ্যক বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মহানৈয়ায়িক বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও ঐ স্থলে "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে" এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, পরব্রহ্ম পরমাত্মা ও অপরব্রহ্ম জীবাত্মা, এই উভয়ের জ্ঞানই যে মুক্তির কারণ বলিয়া শ্রুতিসিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মাকেই যে অপরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ইহা আর কেহই ব্যাখ্যা করেন নাই। ঐরূপ ব্যাখ্যার কোন মূলও পাওয়া যায় না। আমরা মৈত্রায়ণী উপনিষদে দেখিতে পাই,—"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ। শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি" ॥ (ষষ্ঠ প্র, ২২)। এখানে শব্দব্রহ্মকেই অপরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে দেখিতে পাই, —"এতদ্বৈ সত্যকাম পরমপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ" (৫।২)। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সগুণ ও নিগুর্ণ-ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্ম স্বীকার করিয়া, সগুণ ব্রহ্মকেই অপরব্রহ্ম বলিয়াছেন।—(বেদান্তদর্শন, চতুর্থ অঃ, তৃতীয় পাদ, ১৪শ সূত্রের শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য)। অবশ্য "ব্রহ্মন্" শব্দের দ্বারা কোন স্থলে জীবাত্মাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও কোন স্থলে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বেদান্তদর্শনের "সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ" (৪।৩।৯) এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মের সামীপ্য অর্থাৎ সাদৃশ্যবশতঃ জীবাত্মাতেও "ব্রহ্মন্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, এইরূপ অর্থও নৈয়ায়িকগণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, জীবাত্মাকেই অপরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সে যাহাই হউক, উক্ত সিদ্ধান্তে "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য প্রমাণ

১। ননু দেহাদিব্যতিরিক্তস্য নিত্যস্যাপরস্যাত্মনস্তত্ত্বজ্ঞানং সংসারনিদানতদ্বিষয়মিথ্যাজ্ঞানাদিনিবৃত্তিদ্বারেণ নির্ব্বাণকারণং বর্ণয়ন্তি। যথাহুঃ—"দুঃখজন্ম প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ" ইতি। বিবেচিতঞ্চায়"মাত্মতত্ত্ববিবেক" ইতি কিমনেন পরমাত্মনিরূপণেত্যত্রাহ "স্বর্গাপবর্গয়ো"রিতি। সাক্ষাৎকৃতপরমেশ্বর-প্রসাদসহকৃতমেবহি জীবাত্মজ্ঞানমপবর্গমাতনোতি। তথা চামনন্তি—"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরঞ্চ", "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি :—বরদরাজকৃত টীকা।

না হইলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদের "আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উক্ত সিদ্ধান্তে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করা যায়। বর্দ্ধমান উপাধ্যায় মুক্তিলাভে নিজের আত্মসাক্ষাৎ-কারের ন্যায় ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানকেও মুক্তির কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়া, শেষে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের পরম্পরাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে,[১] ঈশ্বরমনন মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়াই পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। উহার সম্পাদক ঈশ্বরমননের ন্যায় ঈশ্বরসাক্ষাৎ-কারও ঐরূপে পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। কারণ, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার ঈশ্বরবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিলেও উহা সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হওয়ায় মহর্ষি গোতমোক্ত প্রকারে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয় না। কিন্তু উহা গোতমোক্ত মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ "প্রমেয়"-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া মুক্তির প্রযোজক বা পরম্পরাকারণ হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য।

ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকারের সম্পাদক হইবে কিরূপে? ঈশ্বরের মননই বা কিরূপে নিজের আত্মসাক্ষাৎকারে উপযোগী হইবে? ইহার ত কোন যুক্তি নাই? ইহা চিন্তা করিয়া শেষে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, অথবা ঈশ্বরের মননরূপ উপাসনা করিলে তজ্জন্য একটী অদৃষ্টবিশেষ জন্মে, অথবা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানজন্যই অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই উহা মুক্তির কারণ হয়। শ্রুতির দ্বারা যখন ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মুক্তির হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন উহার উপপত্তির জন্য অদৃষ্টবিশেষই উহার দ্বাররূপে কল্পনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান কোন অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারাই মুক্তির হেতু হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। নচেৎ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হওয়ায়, উহা সেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তির কারণ হইতে না পারায় অন্য কোনরূপে মুক্তির কারণ হইতে পারে না। সুতরাং উহা অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারাই মুক্তির কারণ হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রাচীন টীকা-কার বরদরাজ কিন্তু ঐরূপ কল্পনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যখন ঈশ্বরসাক্ষাৎ-কারও মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তখন সাক্ষাৎকৃত পরমেশ্বরের অনুগ্রহ মুক্তির সহকারী কারণ, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝা যায়। পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে তখন তাঁহার অনুগ্রহে মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া, ঐ আত্মবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া উহা মুক্তির কারণ হয়। পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার অনুগ্রহের মহিমায় মুমুক্ষুর আবশ্যক জ্ঞানের উৎপত্তি ও অভিলষিতসিদ্ধি অবশ্যই হইতে পারে, এ বিষয়ে অন্য যুক্তি অনাবশ্যক। বস্তুতঃ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ......তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"—(মুণ্ডক, ২।২) এই শ্রুতিবাক্যে পরমেশ্বর-

১। ঈশ্বরমননঞ্চ মোক্ষহেতুঃ,"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি শ্রুত্যা স্বাত্মজ্ঞানস্যেব ঈশ্বরজ্ঞানস্যাপি তদ্ধেতুত্বপ্রতিপাদনাৎ, "যে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে" ইত্যত্র বেদনমাত্রস্য আকাঙ্ক্ষিতত্বেন প্রকৃতত্বাৎ, "শ্রোতব্যো মন্তব্য" ইত্যাদেরন্বয়াচ্চ। ঈশ্বরমননঞ্চ যদ্যপি মিথ্যাজ্ঞানোন্মূলনদ্বারা নোপযোগি, তথাপি স্বাত্মসাক্ষাৎকার এব উপ-যুজ্যতে। যদাহুঃ "সহি তত্ত্বতো জ্ঞাতঃ স্বাত্মসাক্ষাৎকারস্যোপকরোতী"তি। যদ্বা শ্রুত্যা তদ্ধেতুত্বে প্রমাপিতে তদনুপ-পত্ত্যাঽদৃষ্টমেব তদ্দ্বারং কল্প্যতে।—বর্দ্ধমানকৃত টীকা।

সাক্ষাৎকার যে "হৃদয়গ্রন্থি"র ভেদক, অর্থাৎ জীবের অনাদিসিদ্ধ মিথ্যাজ্ঞান বা তজ্জনিত সংস্কারের বিনাশক, ইহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরসাক্ষাৎকারও যে মুমুক্ষুর নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়াই মুক্তির কারণ হয়, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। তবে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার মুমুক্ষুর নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান না হওয়ায় উহা নিজের আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় সাক্ষাৎভাবে ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরসাক্ষাৎকার বা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া তদ্দ্বারাই সংসারনিদান ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। তাই প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলিয়া গিয়াছেন,—"স হি তত্ত্বতো জ্ঞাতঃ স্বাত্মসাক্ষাৎকার-স্যোপকরোতি"। অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকারের সহায় হয়। পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্যকারণভাব শ্রুতিসিদ্ধ হইলে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানজন্য অদৃষ্টবিশেষের কল্পনা অনাবশ্যক। বরদরাজ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর কোন প্রাচীন নৈয়ায়িকও ঐরূপ অদৃষ্টবিশেষের কল্পনা করেন নাই। "প্রকাশ" টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের শেষোক্ত "যদ্বা" কল্প বা চরম কল্পনায় তাঁহার নিজেরও আস্থা ছিল না, ইহাও বলা যায়। সে যাহাই হউক, ফলকথা, নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে পূর্ব্বোক্তরূপে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানও যে মুক্তির কারণ, ইহা স্বীকৃত সত্য। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য এই জন্যই তাঁহার "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে মুমুক্ষুর পক্ষে ঈশ্বরের মননরূপ উপাসনার নির্ব্বাহের জন্য বিবিধ তত্ত্ব বিচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিচারপূর্ব্বক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াও ঐ মননের সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রুতিতে জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মারও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে। পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁহারও যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য।

কোন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় উদয়নাচার্য্যের "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থানুসারে এক সময়ে ইহাও সমর্থন করিয়াছিলেন যে, কেবল ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ। তাঁহাদিগের কথা এই যে, ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় হইলেও যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হইতে পারে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা যদিও জীবাত্মাকেও বুঝা যায়, কিন্তু "বেদাহমেতং পুরুষং পুরাণমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"॥ এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মোক্ষের কারণ বলিয়া স্পষ্ট কথিত হওয়ায় "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই শ্রুতিবাক্যেও "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উদয়নাচার্য্যের ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের—"ন্যায়চর্চ্চেয়মীশস্য মননব্যপদেশভাক্। উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরাগতা॥"—এই কারিকাও সংগত হয়। কারণ, মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ হইলে তাহাতে পরমাত্মার মননরূপ উপাসনা অনাবশ্যক। নিজের আত্মার মনন না করিয়া উদয়নাচার্য্য পরমাত্মা পরমেশ্বরের মনন করিবেন কেন? সুতরাং তাঁহার মতেও পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারই যে মুক্তির কারণ, ইহাই বুঝা যায়। যদিও ঈশ্বরসাক্ষাৎকার মুমুক্ষুর নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান না হওয়ায় উহা ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক

হইতে পারে না, তথাপি স্বতন্ত্রভাবে উহা ঐ মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারের বিনাশের কারণ হয়, ইহা স্বীকার করা যায়। অথবা সংসারনিদান ঐ মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার নাশের জন্যই মুমুক্ষুর নিজের আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের আবশ্যকতা স্বীকার্য্য। কিন্তু মুক্তিলাভে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই কারণ। যদি বল, যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে তখন ঐ যোগজ সন্নিকর্ষজন্য সমগ্র বিশ্বেরই সাক্ষাৎকার হইবে। তাহা হইলে "তমেব বিদিত্বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "এব" শব্দের দ্বারা যে, অন্য পদার্থের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা সংগত হয় না। কারণ, যোগজ সন্নিকর্ষজন্য ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার কেবল ঈশ্বরমাত্রবিষয়ক নহে। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যে, যোগজ সন্নিকর্ষ-জন্য ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণরূপে কথিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। এতদুত্তরে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যাঁহারা মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকারকেই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিবেন, তাঁহা-দিগের মতেও ত ঐ আত্মসাক্ষাৎকার দেহাদিভেদবিষয়ক হওয়ায় কেবল আত্মবিষয়ক হইবে না। সুতরাং "তমেব বিদিত্বা" এই শ্রুতিবাক্যে তাঁহাদিগের মতেও "তৎ" শব্দের দ্বারা নিজের আত্মমাত্রের গ্রহণ কোনরূপেই সম্ভব নহে। বস্তুতঃ ঐ শ্রুতির উপক্রমে পুরাণ পুরুষ পরমেশ্বরেরই উল্লেখ হওয়ায় উহার পরার্দ্ধে "তৎ" শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরই যে বুদ্ধিস্থ, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং "তমেব বিদিত্বা" এই বাক্যের দ্বারা পরমেশ্বরবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষই গ্রহণ করিয়া, উহাকেই মুক্তির কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যোগজ সন্নিকর্ষজন্য ঐ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ কেবল পরমেশ্বরমাত্র-বিষয়ক। সুতরাং "তমেব" এই স্থলে "এব" শব্দ প্রয়োগের অনুপপত্তি নাই। আর ঐ "এব" শব্দকে "বিদিত্বা" এই পদের পরে যোগ করিয়া "তং বিদিত্বৈব" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া যে সমাধান, তাহা উভয় মতেই তুল্য। অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ের ন্যায় আমরাও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারি। কিন্তু ঐরূপ ব্যাখ্যা আমরা সংগত মনে করি না। কারণ, "তং বিদিত্বৈব" এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে ঐ শ্রুতিস্থ "এব" শব্দের সার্থক্য থাকে না। কারণ, উক্ত পক্ষে পরে "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এই বাক্যের দ্বারাই "এব" শব্দ প্রয়োগের ফলসিদ্ধি হইয়াছে। আমাদিগের মতে ঐ "এব" শব্দের অন্যত্র যোগ করিতে হয় না, উহার বৈয়র্থ্যও নাই। যদি বল, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি নানা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে, ঐ জ্ঞান ত কেবল ঈশ্বরবিষয়ক নহে? সুতরাং "তমেব বিদিত্বা" এই বাক্যে "এব" শব্দের উপপত্তি কিরূপে হইবে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি নানা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির কারণ, ইহা উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের অভেদচিন্তনরূপ যে যোগবিশেষ, উহার অভ্যাসের দ্বারা পরে ঈশ্বরমাত্রবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়, ইহাই ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্তরূপ ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ। সুতরাং "তমেব বিদিত্বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের যথাশ্রুতার্থেই সামঞ্জস্য হয়। নব্যনৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বোক্তরূপ বিচারের সহিত পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহার কোন প্রতিবাদ বা প্রশংসা করেন নাই।

উক্ত মতে বক্তব্য এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা যে পরমাত্মাই বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায় না। পরন্তু উহার পূর্ব্বে

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা জীবাত্মাই কথিত হওয়ায় সেখানে পরেও "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মাই গৃহীত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। অবশ্য শুদ্ধাদ্বৈতমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব অভেদবশতঃ পরমাত্মসাক্ষাৎকার হইলেই জীবাত্মসাক্ষাৎকার হয়। সুতরাং সেই মতে ঐ "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পরমাত্মা বুঝিলেও সামঞ্জস্য হইতে পারে। কিন্তু দ্বৈতবাদী পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িকসম্প্রদায়বিশেষের মতে উক্ত শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিলে সামঞ্জস্য হয় না। কারণ, জীবের নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান, যাহা তাহার সংসারের নিদান বলিয়া যুক্তি ও শাস্ত্রসিদ্ধ, ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য উহার বিপরীত জ্ঞানরূপ নিজের আত্মসাক্ষাৎকার যে মুমুক্ষুর অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা উক্ত সম্প্রদায়েরও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যে, মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হয় নাই, ইহা কিরূপে বলা যায়? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "তমেব বিদিত্বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও যে, কেবল পরমাত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাই বা কিরূপে বুঝা যায়? কারণ, মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকারও মুক্তির কারণ বলিয়া শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ। পরন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও "আত্মতত্ত্ববিবেক" ও "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" গ্রন্থে মুমুক্ষুর নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানকে তাহার সংসারের নিদান বলিয়া, উহার নিবর্ত্তক নিজের আত্মসাক্ষাৎকারকে মুক্তির কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে ঈশ্বর মননের উপদেশাদি করায় কেবল ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। সুতরাং তাঁহার মতেও মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নিজের আত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করিতেই ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। তাহার জন্য ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। তাই তিনি ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে বিচারপূর্ব্বক ঈশ্বর মননের উপদেশাদি করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। টীকাকার বরদরাজ ও বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহারাও উদয়নের মতে পরমাত্মসাক্ষাৎকারকেই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই।

গদাধর ভট্টাচার্য্য "মুক্তিবাদ" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশের পরে রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে "স হোবাচ নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" (২।৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা নিরতিশয় প্রিয় নিজের আত্মাই উপক্রান্ত হওয়ায় উহার পরভাগে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা নিজের আত্মাই বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুমুক্ষুর নিজের আত্মার সাক্ষাৎকারই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ এবং তাহার সম্পাদক ঐ আত্মার শ্রবণাদিই মুক্তির পরম্পরা কারণ, ইহাই বুঝা যায়। উহার দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ও শ্রবণ-মননাদি যে মুক্তির কারণ, ইহা বুঝা যায় না। যদি বল, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তাহা বুঝা না গেলেও "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি"

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বরসাক্ষাৎকারও যে মুক্তির কারণ, ইহা ত স্পষ্টই বুঝা যায়। এতদুত্তরে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার হইলে তখন তাঁহার মিথ্যাজ্ঞান-জন্য সংস্কার ও ধর্ম্মাধর্ম্মের উচ্ছেদ হওয়ায় মুক্তি হইয়াই যায়। সুতরাং তাঁহার ঐ মুক্তিতে আর পরমাত্মসাক্ষাৎকারকে কারণ বলিয়া স্বীকার করার কোন প্রয়োজন বা যুক্তি নাই। অতএব "তমেব বিদিত্বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-চিন্তনরূপ যোগাভ্যাস মুমুক্ষুর নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া, তদ্দ্বারা মুক্তিতে উপযোগী হয়। ঐ যোগাভ্যাস ব্যতীত মুমুক্ষুর নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার হয় না, এই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেই উক্ত শ্রুতিবাক্যে "এব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং "বিদ" ধাতুর দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অভেদ জ্ঞানরূপ যোগই প্রকটিত হইয়াছে। দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতে ঐ অভেদজ্ঞান আহার্য্য ভ্রমাত্মক হইলেও উহার অভ্যাস মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের এইরূপ তাৎপর্য্যই যুক্তিসিদ্ধ হইলে "তমেব বিদিত্বা" এই স্থলে "তং বিদিত্বৈব" এইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। তাহাতে "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এই পরভাগও ব্যর্গ হয় না। কারণ, ঐ পরভাগ পূর্ব্বোক্ত "এব" শব্দেরই তাৎপর্য্য প্রকাশের জন্য কথিত হইয়াছে। যেমন কালিদাস রঘুবংশে "মহেশ্বরস্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ" (৩।৪৯) এই বাক্যে "এব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াও পরে আবার "নাপরঃ" এই বাক্যের দ্বারা উহারই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। গদাধর ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বোক্তরূপে রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মত সমর্থন করিয়া, উক্ত মতে দোষ বলিতে কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, "যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তমধোক্ষজং" ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারই যোগাভ্যাসের ফল, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। সুতরাং মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকারকেই পূর্ব্বোক্ত যোগাভ্যাসের ফল বলিলে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধ হয়।

এখানে গদাধর ভট্টাচার্য্যের এইরূপই তাৎপর্য্য হইলে বিচার্য্য এই যে, পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকার অনেক যোগাভ্যাসের ফল, ইহা শাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বোক্ত মতবাদী রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতিরও স্বীকৃত। কিন্তু তাঁহারা যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদচিন্তারূপ যোগবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয় বলিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধ হইবে কেন? পরন্তু পূর্ব্বোক্ত মতবাদিগণ "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কেন যে পূর্ব্বোক্ত-রূপ তাৎপর্য্য কল্পনা করিতে গিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির মুক্তিলাভে অন্য কোন পন্থা নাই, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। উহার দ্বারা একমাত্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান বা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারই যে মুক্তির কারণ, মুক্তিলাভে আর কিছুই আবশ্যক নহে, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। পরন্তু মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার যে তাঁহার সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাও শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ হওয়ায় "তমেব বিদিত্বাঽতি-মৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যে, মুক্তির প্রতি উক্ত কারণেরও নিষেধ করা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাৎকার না হইলে মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার হইতে

পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান না হইলে আর কোন উপায়েই মুমুক্ষু নিজের আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন না, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিলে আর কোন বিরোধের আশঙ্কা থাকে না। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "তমেব" এই স্থলে "এব" শব্দের দ্বারা উহার পূর্ব্বে পুরাণ পুরুষ পরমাত্মার যে স্বরূপ কথিত হইয়াছে, সেই রূপেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, অন্য কোন কল্পিত রূপে তাঁহাকে জানিলে উহা মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করে না, ইহাই প্রকটিত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। ঐ "এব" শব্দের দ্বারা যে জীবাত্মার ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। অথবা সেই পুরাণ পুরুষ পরমাত্মার যাহা নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাহা যোগজসন্নিকর্ষবিশেষজন্য, কেবল সেই পরমাত্মবিষয়ক সক্ষাৎকার, তাহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যে "তমেব বিদিত্বা" এই বাক্যের দ্বারা বিবক্ষিত বলিয়া উক্ত স্থলে "এব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "বিদিত্বা" এই পদের পরে "এব" শব্দের যোগ করিয়া "তং বিদিত্বৈব" এইরূপ ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক এবং উক্ত শ্রুতিপাঠানুসারে ঐ শ্রুতির ঐরূপ তাৎপর্য্যও প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বর-প্রণিধান মুক্তির উপায়, ইহা কথিত হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু "তমেব বিদিত্বা" এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরসাক্ষাৎকার পর্য্যন্তই বিবক্ষিত, ইহাই বুঝা যায়। অবশ্য ঈশ্বর-প্রণিধানও মুক্তিজনক তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। মহর্ষি গোতমও পরে "তদর্থং যমনিয়মাভ্যামাত্মসংস্কারো যোগাচ্চাধ্যাত্মবিধ্যুপায়ৈঃ" (৪৬শ) এই সূত্রের দ্বারা মুক্তিলাভে যোগশাস্ত্রোক্ত "নিয়মের" অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানও যে আবশ্যক, ইহা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বর না থাকিলেও প্রমাণাদি ষোড়শ-পদার্থতত্ত্বজ্ঞান হইলেই তাঁহার মতে মুক্তি হইতে পারে, ইহা কখনই বলা যায় না; পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। পরন্তু পরমেশ্বরে পরাভক্তি ব্যতীত বেদবোধিত পরমাত্মতত্ত্বের যথার্থ বোধ হইতেই পারে না; সুতরাং ঐ ভক্তি ব্যতীত মুক্তিলাভ অসম্ভব, ইহা বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং বেদপ্রামাণ্যসমর্থক পরমভক্ত মহর্ষি গোতমেরও যে উহাই সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। তবে তাঁহার মতে ঐ পরাভক্তি মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বা চরম কারণ নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ। ঈশ্বরে পরাভক্তি ও তজ্জন্য তাঁহার তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঐ প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানের সম্পাদক হইয়া পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। ভক্তি যে জ্ঞানেরই সাধন এবং জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু এই জগতে নাই, জ্ঞান লাভ করিলেই শান্তিলাভ হয়, এই সমস্ত তত্ত্ব ভগবদ্গীতাতেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। অবশ্য পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী ভগবদ্গীতার টীকার সর্ব্বশেষে "গীতার্থসংগ্রহ" বলিয়া ভক্তিকেই মুক্তির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সেখানে পরমেশ্বরের অনুগ্রহলব্ধ আত্মজ্ঞানকে ঐ ভক্তির ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা হইলে ভক্তিজন্য আত্মজ্ঞান, তজ্জন্য মুক্তি, ইহাই ফলতঃ স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি আত্মজ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্যাপার কেবল ভক্তিকেই মুক্তির কারণ বলিতে পারেন নাই, ইহা

প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক। তিনি সেখানে ভগবদ্গীতার অনেক বচনের দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির ভেদ সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও দ্রষ্টব্য[১]। সে যাহা হউক, মূলকথা, মহর্ষি গোতমের মতেও মুক্তিলাভে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু তাঁহার মতে যে সকল পদার্থবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান জীবের সংসারের নিদান হওয়ায় উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎভাবে ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া, তদ্দ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়, সেই সমস্ত পদার্থকেই তিনি "প্রমেয়" নামে পরিভাষিত করিয়া. উহাদিগের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ সমস্ত প্রমেয় পদার্থের মনন নির্ব্বাহের জন্যই এই ন্যায়শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মুক্তিলাভে উহার পূর্ব্বে ও পরে আর যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা তাঁহার এই শাস্ত্রে বিশেষ বক্তব্য বা প্রতিপাদ্য নহে। সকল পদার্থ তাঁহার প্রকাশিত এই শাস্ত্রের "প্রস্থান"ও নহে। তাই তিনি মুক্তিলাভে প্রথমে নানা কর্ম্ম, ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান অত্যাবশ্যক হইলেও বিশেষরূপে তাহা বলেন নাই—শাস্ত্রান্তর হইতেই ঐ সমস্ত জানিতে হইবে। এই আহ্নিকের শেষে সংক্ষেপে তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা ব্যক্ত হইবে।

মুক্তির কারণ বিষয়ে আর একটী সুপ্রাচীন প্রসিদ্ধ মত আছে,—তাহার নাম "জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়বাদ"। এই মতে কেবল তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বা চরম কারণ নহে। কিন্তু শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-সহিত তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ঐ কর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান, এই উভয়ই তুল্যভাবে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। সুতরাং মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সামর্থ্য ও অধিকারানুসারে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানও কর্ত্তব্য। আচার্য্য শঙ্করের বহু পূর্ব্ব হইতেই সম্প্রদায়বিশেষ উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেষ্টা যামুনাচার্য্য উক্ত মতের সমর্থন ও প্রচার করেন। তাঁহার পরে রামানুজ বিশদ বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের বিশেষরূপ সমর্থন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার "বেদার্থসংগ্রহে" উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া শেষে পরমগুরু যামুনা-

১। ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ ॥

তথাহি "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন" ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তে-র্মোক্ষং প্রতি সাধকতমত্বশ্রবণাৎ, তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরমাত্রযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে। জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তং, "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধি-যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে"ইত্যাদিবচনাৎ। নচ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তং, "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ"—ইত্যাদৌ ভেদেন নির্দ্দেশাৎ। ন চৈবং সতি "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ে"তি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাজ্-জ্ঞানস্য, নহি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে জ্বালানামসাধনত্বমুক্তং ভবতি। কিঞ্চ "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" (শ্বেতাশ্বতর), "দেহান্তে দেবঃ পরমং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" (নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপনী ১।৭), "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (কঠ) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি তস্মাদ্ভগবদ্-ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধং।—স্বামিটীকার শেষ।

চার্য্যপাদের উক্তির দ্বারাও উহার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি শ্রীভাষ্যে তাঁহার ব্যাখ্যাত মতের প্রামাণিকত্ব ও অতিপ্রাচীনত্ব সমর্থন করিতে বেদান্তসূত্রের বোধায়নকৃত সুপ্রাচীন বৃত্তির উল্লেখ করায় বৃত্তিকার বোধায়নই প্রথমে বেদান্তসূত্রের দ্বারা উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, উক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে, "ঈশ" উপনিষদের "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" এই শ্রুতিবাক্যে অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু-তরণের উপদেশ থাকায় কর্ম্মও মুক্তির সাক্ষাৎকারণ। কারণ, ঐ "অবিদ্যা" শব্দের অর্থ বিদ্যাভিন্ন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, ইহাই বুঝা যায়। আর কোন অর্থ ঐ স্থলে সংগত হয় না। "বিদ্যা" শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। উহা ভক্তিরূপ ধ্যান বা "ধ্রুবানুস্মৃতি"। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কর্ম্মসহিত জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ, এই সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। বস্তুতঃ স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে এমন অনেক বচন পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা সরলভাবে উক্ত সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। নব্যনৈয়ায়িকাচার্য্য গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি"র শেষে প্রথমে উক্ত মত সমর্থন করিতে ভগবদ্গীতার "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ" (১৮।৪৫) ইত্যাদি বচন এবং বিষ্ণুপুরাণের "তস্মাত্তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ। তৎপ্রাপ্তিহেতুর্বিজ্ঞানং কর্ম্ম চোক্তং মহামতে॥" এই বচন এবং হারীতসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতং।" এই (১০ম) বচন এবং "জ্ঞানং প্রধানং নতু কর্ম্ম হীনং কর্ম্ম প্রধানং নতু বুদ্ধিহীনং। তস্মাদ্দ্বয়োরেব ভবেৎ প্রসিদ্ধির্ন হ্যেকপক্ষো বিহগঃ প্রয়াতি॥" ইত্যাদি শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্টও তাঁহার নিজমতানুসারে বহু বিচারপূর্ব্বক উক্ত মত সমর্থন করিতে অনেক শাস্ত্রবচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম যুক্তি এই যে, শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে শাস্ত্রানুসারে প্রত্যহ পাপ বৃদ্ধি হওয়ায় ঐরূপ ব্যক্তির মুক্তি হইতেই পারে না ("ন্যায়কন্দলী" ২৮৩—৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া, কেবল তত্ত্বজ্ঞানই অবিদ্যানিবৃত্তি বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তির সাক্ষাৎকারণ, এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ব্বে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানেরই সাধন হয়। প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে তত্ত্বজ্ঞানলাভে অধিকারই হয় না। সুতরাং কর্ম্ম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধির অভাবে তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় মুক্তিলাভ অসম্ভব,—এই তাৎপর্য্যেই শাস্ত্রে অনেক স্থানে কর্ম্মকে ঐরূপে মুক্তির সাধন বলা হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মও যে জ্ঞানের ন্যায় মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন, সুতরাং মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে। কারণ, শ্রুতিতে মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মত্যাগেরও বিধি আছে। এবং "ব্রহ্ম-সংস্থোঽমৃতত্বমেতি" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীই মুক্তি লাভ করেন, ইহা কথিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মপরিত্যাগজন্য পাপ বৃদ্ধিরও কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি পূর্ব্বাশ্রমে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া থাকেন। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই ব্রহ্মসূত্রে "অথ" শব্দের দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্তই সূচিত

হইয়াছে। পরন্তু "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "কর্ম্মভির্ম্মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ" ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কর্ম্ম দ্বারা যে মুক্তিলাভ হয় না, ইহাও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অবশ্য যাঁহারা জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী, তাঁহারা ঐ সমস্ত শ্রুতি-বাক্যে "কর্ম্মন্" শব্দের দ্বারা কাম্য কর্ম্মই ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় কেবল সন্ন্যাসাশ্রমীই মুক্তিলাভে অধিকারী, এই সিদ্ধান্তও স্বীকার করেন না। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর আরও বহু বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত "জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদে"র খণ্ডন করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার ভাষ্যে উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" ইত্যাদি (১১শ) শ্লোকের অবতারণার পূর্ব্বেও উক্ত মতের প্রকাশ ও সমর্থন করিয়া, পরে গীতার্থ পর্য্যালোচনার দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডনপূর্ব্বক উপসংহারে অতিবিশ্বাসের সহিত লিখিয়াছেন,—"তস্মাদ্গীতাশাস্ত্রে কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্তির্ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ। যথা চায়মর্থস্তথা প্রকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ"। ফলকথা, আচার্য্য শঙ্কর ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসিসম্প্রদায় সকলেই উক্ত জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদের প্রতিবাদই করিয়া গিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্যপ্রকরণের প্রথম সর্গেও "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং" ইত্যাদি (৭ম) শ্লোক দেখা যায়। কিন্তু সেখানে টীকাকার আনন্দবোধেন্দ্র সরস্বতী শঙ্করের সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য পরবর্ত্তী মণিকাচোপাখ্যান হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যোগবাশিষ্ঠেও কেবল তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই পরে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে "জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদ" যোগবাশিষ্ঠের সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। যোগ-বাশিষ্ঠের পাঠকগণ টীকাকারের ঐ কথাতেও লক্ষ্য করিবেন। মহর্ষি গোতমও জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়-বাদের কোন কথা বলেন নাই। পরন্তু তাঁহার "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্র ও এখানে এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার মতেও যে কেবল প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ, এই সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণও উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। "তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রথমে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদের সমর্থন করিলেও পরে তিনিও ঐ মত পরিত্যাগ করিয়া, কেবল তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ,—কর্ম্ম ঐ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া মুক্তির জনক, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন[১]। তাহা হইলে কর্ম্ম ও জ্ঞান যে, তাঁহার মতে তুল্যভাবেই মুক্তির জনক নহে, ইহা তিনি পরে স্বীকার করায় তাঁহাকে আর জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়বাদী বলা যায় না। তবে বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্ট যে, জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি মহর্ষি কণাদ বা প্রশস্তপাদের কোন উক্তির দ্বারা উক্ত মত সমর্থন করিতে পারেন নাই। বৈশেষিকসূত্র ও যোগসূত্রের দ্বারাও উক্ত মত বুঝা যায় না।

১। বস্তুতস্তু দৃঢ়ভূমিসবাসনমিথ্যাজ্ঞানোন্মূলনং বিনা ন মোক্ষ ইত্যুভয়বাদিসিদ্ধং "......কর্ম্মণাং তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারাপি মুক্তিজনকত্বসম্ভবাৎ, প্রমাণবত্তো গৌরবঞ্চ ন দোষায়"—ইত্যাদি ঈশ্বরানুমানচিন্তামণির শেষভাগ।

সাংখ্যসূত্রে উক্ত সমুচ্চয়বাদের খণ্ডনও দেখা যায়[১]। মূলকথা, তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির চরম কারণ, ইহাই বহুসম্মত সিদ্ধান্ত। অবশ্য ঐ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে আরও নানা মতের প্রকাশ হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিলাম না ॥ ১ ॥

ভাষ্য। **প্রসংখ্যানানুপূর্ব্বী তু খলু —**

অনুবাদ। "প্রসংখ্যানে"র অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের আনুপূর্ব্বী (ক্রম) কিন্তু (পরবর্ত্তী সূত্রদ্বারা কথিত হইতেছে)

সূত্র। দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সংকল্প-কৃতাঃ ॥২॥৪১২॥

অনুবাদ। রূপাদি বিষয়সমূহ "সংকল্পকৃত" অর্থাৎ মিথ্যাসংকল্পের বিষয় হইয়া দোষসমূহের নিমিত্ত অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের জনক হয়।

ভাষ্য। কামবিষয়া ইন্দ্রিয়ার্থা ইতি রূপাদয় উচ্যন্তে। তে মিথ্যা-সংকল্প্যমানা রাগ-দ্বেষ-মোহান্ প্রবর্ত্তয়ন্তি, তান্ পূর্ব্বং প্রসঞ্চক্ষীত। তাংশ্চ প্রসঞ্চক্ষাণস্য রূপাদিবিষয়ো মিথ্যাসংকল্পো নিবর্ত্ততে। তন্নিবৃত্তা-বধ্যাত্মং শরীরাদি প্রসঞ্চক্ষীত। তৎপ্রসংখ্যানাদধ্যাত্মবিষয়োঽহঙ্কারো নিবর্ত্ততে। সোঽয়মধ্যাত্মং বহিশ্চ বিবিক্তচিত্তো বিহরন্ মুক্ত ইত্যুচ্যতে।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থগুলি কাম অর্থাৎ অনুরাগের বিষয়, এ জন্য "রূপাদি" কথিত হয়। সেই রূপাদি, মিথ্যা সংকল্পের বিষয় হইয়া রাগ, দেষ ও মোহকে উৎপন্ন করে। সেই রূপাদি বিষয়সমূহকে প্রথমে "প্রসংখ্যান" করিবে। সেই রূপাদি বিষয়সমূহকে প্রসংখ্যানকারী মুমুক্ষুর রূপাদিবিষয়ক মিথ্যা সংকল্প নিবৃত্ত হয়। সেই মিথ্যা সংকল্পের নিবৃত্তি হইলে আত্মাতে শরীরাদিকে "প্রসংখ্যান" করিবে, অর্থাৎ সমাধির দ্বারা এই সমস্ত শরীরাদি আত্মা নহে, এইরূপ দর্শন করিবে। সেই শরীরাদির প্রসংখ্যানপ্রযুক্ত অধ্যাত্মবিষয়ক অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়। সেই এই ব্যক্তি অর্থাৎ যাঁহার পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কার নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনি আত্মাতে ও বাহিরে অনাসক্তচিত্ত হইয়া বিচরণ করত "মুক্ত" ইহা কথিত হন, অর্থাৎ ঐরূপ ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত বলে।

টিপ্পনী। শরীরাদি দুঃখপর্য্যন্ত দোষনিমিত্তসমূহের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়, সুতরাং ঐ তত্ত্বজ্ঞান মুমুক্ষুর অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা প্রথম সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে। এখন

১। জ্ঞানান্মুক্তিঃ॥ বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ॥ নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পৌ॥—সাংখ্যদর্শন, ৩য় অঃ, ২৩শ, ২৪শ, ২৫শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

ঐ তত্ত্বজ্ঞানের আনুপূর্ব্বী অর্থাৎ ক্রম কিরূপ ? কোন্ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রথমে কর্ত্তব্য, ইহা প্রকাশ করিতেই মহর্ষি এই দ্বিতীয় সূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্রথমে "প্রসংখ্যানানুপূর্ব্বী তু খলু" এই কথা বলিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"প্রসংখ্যানং সমাধিজং তত্ত্বজ্ঞানং"। প্রপূর্ব্বক "চক্ষ" ধাতু হইতে এই "প্রসংখ্যান" শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। উহার অর্থ—প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান। শ্রবণ ও মননের পরে সমাধিজাত তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট জ্ঞান, উহাই মুক্তির কারণ। উহা না হওয়া পর্য্যন্ত অনাদি মিথ্যাজ্ঞানের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে প্রসংখ্যান শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগদর্শনেও "প্রসংখ্যানেপ্যকুসীদস্য" ইত্যাদি—(৪।২৯) সূত্রে "প্রসংখ্যান" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ার্থগুলি কামবিষয়, এ জন্য "রূপাদি" কথিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম অধ্যায়ে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই যে পঞ্চ পদার্থ ইন্দ্রিয়ার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে, উহারা কামবিষয় বা কাম্য, এ জন্য রূপাদি নামে কথিত হয়। শাস্ত্রে অনেক স্থানে ঐ গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থগুলিই রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ, এই ক্রমে এবং ঐ সমস্ত নামে কথিত হইয়াছে। ঐ রূপাদি বিষয়গুলিতে যে সময়ে মিথ্যা সংকল্প বা মোহবিশেষ জন্মে, তখন উহারা ঐ সংকল্পানুসারে বিষয়বিশেষে রাগ, দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন করে। মুমুক্ষু সেই রূপাদি বিষয়সমূহকেই সর্ব্বাগ্রে প্রসংখ্যান করিবেন। অর্থাৎ রাগাদি দোষজনক বলিয়া প্রথমে ঐ সমস্ত বিষয়েরই তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিবেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহার যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সমাধিজাত তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ যে প্রসংখ্যান, তাহা রূপাদি বিষয়েই সুকর, এ জন্য প্রাথমিক সাধকের ঐ রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বসাক্ষাৎকারেই সর্ব্বাগ্রে প্রযত্ন কর্ত্তব্য। ভাষ্যকার উক্ত যুক্তি অনুসারে রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বসাক্ষাৎকারেরই প্রথম কর্ত্তব্যতা প্রকাশ করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বসাক্ষাৎকারজন্য ঐ রূপাদি বিষয়ে মিথ্যা সংকল্প বা মোহবিশেষ নিবৃত্ত হয়। তাহার পরে আত্মাতে শরীরাদির প্রসংখ্যান কর্ত্তব্য। তজ্জন্য আত্মবিষয়ে অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়। আত্মাতে শরীরাদির প্রসংখ্যান কি ? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে,—"এই শরীরাদি আত্মা নহে" এইরূপে যে ব্যতিরেক দর্শন, অর্থাৎ আত্মা ও শরীরাদির ভেদসাক্ষাৎকার, উহাই আত্মাতে শরীরাদির প্রসংখ্যান। উহাই মোক্ষজনক তত্ত্বজ্ঞান। শরীরাদি পদার্থে আত্মার ভেদ দর্শনই উপনিষদুক্ত আত্মদর্শন, ইহাই উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। ফলকথা, শরীরাদি দুঃখপর্য্যন্ত দোষনিমিত্ত যে সমস্ত প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানের কর্ত্তব্যতা প্রথম সূত্রে সূচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানই প্রথম কর্ত্তব্য। তাহার পরে শরীরাদি ও আত্মার তত্ত্বজ্ঞান কর্ত্তব্য। তত্ত্বজ্ঞানের এই ক্রম প্রদর্শনের জন্যই মহর্ষি এই দ্বিতীয় সূত্রটি বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকার প্রভৃতির তাৎপর্য্য।

ভাষ্যকার এই সূত্রে "সংকল্প" শব্দের দ্বারা যে মিথ্যা সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন, উহা তাঁহার মতে মোহবিশেষ, ইহা পূর্ব্বে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ১১শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উক্ত বিষয়ে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের মতভেদ ও বাচস্পতি মিশ্রের সমাধানও চতুর্থ খণ্ডে লিখিত

হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড, ৩২৭—২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বার্ত্তিককার পূর্ব্বে অনুভূত বিষয়ের প্রার্থনাকে "সংকল্প" বলিলেও এখানে তিনিও এই সূত্রোক্ত সংকল্পকে মোহবিশেষই বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে লিখিয়াছেন,—"সংকল্পঃ সমীচীনত্বেন ভাবনং, তদ্বিষয়ীকৃতা রূপাদয়ো দোষস্য রাগাদের্নিমিত্তং"। অর্থাৎ সম্যক্ কল্পনা বা সমীচীন বলিয়া যে ভাবনা, উহাই এখানে সূত্রোক্ত "সংকল্প"। রূপাদি বিষয়গুলি ঐরূপ ভাবনার বিষয় হইলে তখন উহারা রাগাদিদোষ উৎপন্ন করে। এখানে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাত ঐ সংকল্প পদার্থও যে মোহবিশেষ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভগবদ্গীতার "সংকল্পপ্রভবান্ কামান্" (৬।২৪) ইত্যাদি শ্লোকেও "সংকল্প" শব্দ ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার শঙ্কর ও টীকাকার শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি উহা ব্যক্ত না করিলেও আনন্দগিরি উহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"সংকল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ"। যাহা শোভন নহে, তাহাকে শোভন বলিয়া যে ভ্রম, তাহাকে বলে শোভনাধ্যাস। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী ঐ স্থলে সুব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন,—"সঙ্কল্প ইব সংকল্পো দৃষ্টেষ্বপি বিষয়েষু শোভনত্বাদি-দর্শনেন শোভনাধ্যাসঃ"। সুতরাং তাঁহার মতেও ভগবদ্গীতার ঐ শ্লোকোক্ত "সংকল্প" যে মোহবিশেষ বা ভ্রমজ্ঞানবিশেষ, এ বিষয়েও সংশয় নাই। কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ স্থলে লিখিয়াছেন,—"সংকল্প ইদং মে ভূয়াদিতি চেতোবৃত্তিঃ"। তাঁহার মতে "ইহা আমার হউক," এইরূপ আকাঙ্ক্ষাত্মক চিত্তবৃত্তিবিশেষই সংকল্প। বস্তুতঃ সংকল্প শব্দের ঐ অর্থই সুপ্রসিদ্ধ। ভগবদ্গীতার ঐ ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে ঐ সুপ্রসিদ্ধ অর্থেই সংকল্প শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু পরে ২৪শ শ্লোকে "সংকল্পপ্রভবান্ কামান্" এই স্থলে মোহবিশেষ অর্থেই সংকল্প শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বহুসম্মত। কারণ, মোহবিশেষ হইতেই কামের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এখানেও ভাষ্যকার প্রভৃতি সকলেই সূত্রকারোক্ত রাগাদির জনক সংকল্পকে মোহ-বিশেষই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে "মিথ্যা" শব্দের প্রয়োগ করিয়া সূত্রোক্ত "সংকল্প" শব্দের ঐ অর্থবিশেষ ব্যক্ত করিয়াছেন। বার্ত্তিককারও এখানে উহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, "এই সমস্ত রূপাদি আমারই" এইরূপে অসাধারণভাবে প্রতীতির জনক যে নিশ্চয় অর্থাৎ ঐরূপ ভ্রমবিশেষ, তাহাই রূপাদি বিষয়ের মিথ্যা সংকল্প। সুতরাং "এই সমস্ত আমারই নহে, উহা তস্কর, অগ্নি ও জ্ঞাতিবর্গসাধারণ" এইরূপে সাধারণ বলিয়া ঐ রূপাদি বিষয়ের প্রসংখ্যান করিতে হইবে। উহার দ্বারাই রূপাদিবিষয়ক পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা সংকল্প বা মোহবিশেষের নিবৃত্তি হয়।

ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলে আত্মবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার নিবৃত্তি হইলে, তখন তিনি আত্মাতে ও বাহিরে অনাসক্তচিত্তে বিচরণ করত মুক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ মুক্তির জন্য তখন তাঁহার আর কিছুই কর্ত্তব্য থাকে না। ঐরূপ ব্যক্তিকেই জীবন্মুক্ত বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবদ্গীতায় ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন,—"যতেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥" (৫।২৮)। টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ঐরূপ ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মুক্তই। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও এখানে সর্ব্বশেষে "জীবন্নে-

বহি বিদ্বান্ সংহর্ষায়াসাভ্যাং মুচ্যতে" এই শাস্ত্রবাক্য বা শাস্ত্রমূলক প্রাচীন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণার পূর্ব্বে যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মুক্তি দ্বিবিধ, পরা ও অপরা। তত্ত্বসাক্ষাৎকারের অনন্তরই কাহারও পরা মুক্তি অর্থাৎ বিদেহমুক্তি হয় না। কারণ, তাহা হইলে সেই তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তাঁহার পরিদৃষ্ট তত্ত্বের উপদেশ করিয়া যাইতে পারেন না। অতত্ত্বদর্শী ব্যক্তির উপদেশ শাস্ত্র হইতে পারে না - তত্ত্বদর্শীর উপদেশই শাস্ত্র। সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরাই জীবিত থাকিয়া শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বসাক্ষাৎকার মুক্তির চরম কারণ। সুতরাং তাঁহারাও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। উহা অপরা মুক্তি, ঐ অপরা মুক্তির নামই জীবন্মুক্তি। উদ্দ্যোতকর ইহা সমর্থন করিতে সেখানেও শেষে "জীবন্নেবহি বিদ্বান্" ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৭৫—৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সাংখ্যদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষেও "জীবন্মুক্তশ্চ" (৭৮) এই সূত্রের পরে ৫ সূত্রের দ্বারা জীবন্মুক্তের অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমে "উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ" (৭৯) এবং "ইতরথাহন্ধপরম্পরা" (৮১) এই সূত্রের দ্বারা জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ প্রকৃত তত্ত্বের উপদেষ্টা হইতে পারেন না; সুতরাং তত্ত্বদর্শী জীবন্মুক্তের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য, এই যুক্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং "শ্রুতিশ্চ" (৮০) এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি বা অনুমানপ্রমাণের ন্যায় শ্রুতিতেও যে, জীবন্মুক্তের অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ আছে, ইহা কথিত হইয়াছে। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে তজ্জন্য কর্ম্মক্ষয় হওয়ায় আর শরীরধারণ বা জীবন রক্ষা কিরূপে হইবে? এতদুত্তরে শেষে "চক্রভ্রমণবদ্ধৃতশরীরঃ" (৮২) এই সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, যেমন কুম্ভকারের কর্ম্মনিবৃত্তি হইলেও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজন্য বেগবশতঃ কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত স্বয়ংই চক্র ভ্রমণ করে, তদ্রূপ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরে সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় হইলেও এবং অন্য শুভাশুভ কর্ম্ম উৎপন্ন না হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মজন্য কিছু কাল পর্য্যন্ত শরীর ধারণ বা জীবন রক্ষা হয়। পরে "সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ" (৮৩) এই সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, তত্ত্বদর্শী জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগেরও অল্পাবশিষ্ট বিষয়সংস্কার থাকে, উহা তাঁহাদিগের শরীর ধারণের হেতু। কেহ কেহ ঐ "সংস্কার" শব্দের দ্বারা অবিদ্যাসংস্কার বুঝিয়া জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগেরও অবিদ্যা-সংস্কারের লেশ থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য কোন কোন গ্রন্থেও উক্ত মতান্তরের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু উক্ত মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অবিদ্যা কেবল জন্মাদিরূপ কর্ম্মবিপাকারম্ভেই কারণ। যোগদর্শনভাষ্যে ব্যাসদেবও ঐরূপই বলিয়া গিয়াছেন। প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগে অবিদ্যাসংস্কারের কোন আবশ্যকতা নাই। মূঢ় জীবের যে কর্ম্মফলভোগ, তাহাই অবিদ্যাসংস্কারসাপেক্ষ। তত্ত্বদর্শী জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের উৎকট রাগাদি না থাকায় তাঁহাদিগের সুখদুঃখভোগ প্রকৃত ভোগ নহে; কিন্তু উহা ভোগাভাস। পরন্তু তত্ত্বদর্শী জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগেরও অবিদ্যাসংস্কারের লেশ থাকিলে তাঁহাদিগেরও কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হইবে। সুতরাং তাঁহাদিগকে মুক্ত বলা যাইতে পারে না। পরন্তু তাঁহাদিগেরও অবিদ্যা থাকিলে তাঁহাদিগের তত্ত্বোপদেশ যথার্থ উপদেশ হইতে পারে

না। সুতরাং অন্ধপরম্পরাপত্তি-দোষ অনিবার্য্য। বিজ্ঞানভিক্ষু শেষ কথা বলিয়াছেন যে, জীবন্মুক্ত-দিগের অবিদ্যাসংস্কারের লেশ স্বীকারে কিছুমাত্র প্রয়োজন ও প্রমাণ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের বিষয়-সংস্কারলেশ অবশ্য স্বীকার্য্য। উহাই তাঁহাদিগের শরীর ধারণের হেতু। পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যসূত্রে "সংস্কারলেশ" শব্দের দ্বারা ঐ বিষয়সংস্কারলেশই কথিত হইয়াছে বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার ব্রহ্ম-মীমাংসাভাষ্যে উক্ত মত বিশদরূপে সমর্থন করিয়াছেন। মূলকথা, জীবন্মুক্তি শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ। সাংখ্যদর্শনের ন্যায় যোগদর্শনেও শেষে "ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ" (৪।৩০। এই সূত্রের দ্বারা জীব-ন্মুক্তি সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ব্যাসদেব সেখানে "ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা জীবন্মুক্তি সমর্থন করিয়াছেন। "জীবন্মুক্তিবিবেক" গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি কঠোপনিষদের "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" এই শ্রুতিবাক্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"॥ এই শ্রুতিবাক্য এবং বাশিষ্ঠ রামায়ণের অনেক বচন জীবন্মুক্তিবিষয়ে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (জীবন্মুক্তিবিবেক, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১৬২—১৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দত্তাত্রেয়প্রোক্ত "জীবন্মুক্তিগীতা" প্রভৃতি আরও নানা শাস্ত্রগ্রন্থে জীবন্মুক্তের স্বরূপাদি বর্ণিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ ছান্দোগ্য উপনিষদের "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" (৬।১৪।২) এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির যে মুক্তির জন্য আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না, কেবল প্রারব্ধ-কর্ম্মভোগের জন্যই তিনি কিছুকাল জীবিত থাকেন, এই সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে। ঐ শ্রৌত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবার জন্য বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের সর্ব্বশেষে—"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাঽথ সম্পদ্যতে" (১৯শ) এই সূত্রের দ্বারা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি ভোগদ্বারা প্রারব্ধ পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া মুক্ত হন, ইহা কথিত হইয়াছে। উহার পূর্ব্বে "অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ" (১৫শ) এই সূত্রের দ্বারাও ঐ শ্রৌত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম্ম দ্বিবিধ—(১) সঞ্চিত ও (২) প্রারব্ধ। যে কর্ম্মের কার্য্যের অর্থাৎ ফলের আরম্ভ হয় নাই, তাহার নাম সঞ্চিত কর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রে "অনারব্ধকার্য্যে" এই দ্বিবচনান্ত পদের দ্বারা ঐ সঞ্চিত পুণ্য ও পাপরূপ দ্বিবিধ কর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। তাই শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি "অনারব্ধকার্য্য" এই শব্দের দ্বারা ঐ দ্বিবিধ সঞ্চিত কর্ম্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন। আর যে কর্ম্মের কার্য্যের অর্থাৎ ফলের আরম্ভ হইয়াছে অর্থাৎ যে কর্ম্মদ্বারা সেই জন্মলাভ বা শরীরারম্ভ হইয়াছে, তাহার নাম প্রারব্ধ-কর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রানুসারে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ঐ কর্ম্মকে বলিয়াছেন—"আরব্ধকার্য্য"। পূর্ব্বোক্ত "ভোগেন ত্বিতরে" ইত্যাদি শেষ সূত্রে "ইতরে" এই দ্বিবচনান্ত পদের দ্বারা ঐ আরব্ধকার্য্য পুণ্য ও পাপরূপ দ্বিবিধ প্রারব্ধ কর্ম্মই গৃহীত হইয়াছে। যাহা পূর্ব্বোক্ত অনারব্ধকার্য্য সঞ্চিত কর্ম্মের ইতর, তাহাই আরব্ধকার্য্য প্রারব্ধ কর্ম্ম। উহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মান্তরসঞ্চিত এবং ইহজন্মেও তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত সঞ্চিত পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম্মই বেদান্তসূত্রোক্ত "অনারব্ধকার্য্য" সঞ্চিত কর্ম্ম। তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ চরম তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখনই ঐ সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। বেদান্তদর্শনে এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ও ঐ তাৎপর্য্যেই বলিয়াছেন,

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" (৪।৩৮)। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আরব্ধ-কার্য্য পুণ্য ও পাপরূপ প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগমাত্রনাশ্য। ভোগ ব্যতীত কোন কালেই উহার ক্ষয় হয় না। তাই ঐ প্রারব্ধ কর্ম্মকেই গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি"। বেদান্তদর্শনে পূর্ব্বোক্ত "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাঽথ সম্পদ্যতে" এই সূত্রের দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেও ভোগের দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে "ইতর" প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে, তাহার পরে দেহ-পাত হইলে বিদেহমুক্তি বা পরামুক্তি লাভ হইবে, এই সিদ্ধান্ত সুব্যক্ত হইয়াছে। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উক্ত সিদ্ধান্তের মূল। যাঁহারা শীঘ্রই প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় করিয়া বিদেহমুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যোগবলে কায়ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ভোগদ্বারা সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় করেন, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও অন্য প্রসঙ্গে ঐ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এইরূপ শাস্ত্রে "ক্রিয়মাণ," "সঞ্চিত" ও "প্রারব্ধ" এই ত্রিবিধ কর্ম্মবিভাগও দেখা যায়। দেবীভাগবতে ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মের পরিচয়াদি বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কর্ম্মকে "ক্রিয়মাণ" কর্ম্ম এবং অনেক-জন্মকৃত পুরাতন কর্ম্মকে সঞ্চিত কর্ম্ম এবং ঐ সঞ্চিত কর্ম্মসমূহের মধ্যেই দেহারম্ভকালে কাল-প্রেরিত হইয়া দেহারম্ভক কতকগুলি কর্ম্মবিশেষকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলা হইয়াছে (দেবীভাগবত, ৬।১০।৯, ১২।১২১।২২—৪ দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, যে কর্ম্মদ্বারা জীবের সেই জন্ম বা দেহবিশেষের সৃষ্টি হইয়াছে, উহা প্রারব্ধকর্ম্ম এবং উহা ভোগমাত্রনাশ্য। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও উহা ভোগ করিবার জন্য দেহ ধারণ করিয়া থাকেন. কারণ, ভোগ ব্যতীত কিছুতেই উহার ক্ষয় হয় না, ইহাই প্রাচীন সিদ্ধান্ত।

কিন্তু বিদ্যারণ্য মুনি "জীবন্মুক্তিবিবেক" গ্রন্থে (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১৩১ পৃষ্ঠায়) চরমকল্পে প্রারব্ধকর্ম্ম হইতেও যোগাভ্যাসের প্রাবল্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি উহা সমর্থন করিতে সেখানে বলিয়াছেন যে, যোগাভ্যাসের প্রাবল্যবশতঃই উদ্দালক, বীতহব্য প্রভৃতি যোগীদিগের যোগপ্রভাবে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ উপপন্ন হয়। পরে তিনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়া তদ্দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—"এই সংসারে সকলেই সম্যক্ অনুষ্ঠিত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মরূপ পুরুষকারের দ্বারা সমস্তই লাভ করিতে পারে"[১]। যোগবাশিষ্ঠের মুমুক্ষুপ্রকরণে দৈববাদীর নিন্দা ও শাস্ত্রবিহিত পুরুষকারের সর্ব্বসাধকত্ব বিশেষরূপে ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ পুরুষকার যে, অনর্থের কারণ, ইহাও কথিত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য মুনি তাঁহার "পঞ্চদশী" গ্রন্থে "তৃপ্তিদীপে" দৈবের প্রাধান্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন,— "অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্যদি। তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ॥" কিন্তু জীবন্মুক্তিবিবেক গ্রন্থে পরে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বচন দ্বারা বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার "অনুভূতিপ্রকাশ" গ্রন্থেও প্রারব্ধকর্ম্ম ও জীবন্মুক্তি বিষয়ে আরও বহু বহু কথা বলিয়াছেন। "জীবন্মুক্তিবিবেকে"র বহুবিজ্ঞ টীকাকার নানা প্রমাণ ও বিস্তৃত বিচারের দ্বারা

১। সর্ব্বমেবেহহি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে॥—যোগবাশিষ্ঠ—মুমুক্ষু প্রকরণ, চতুর্থ সর্গ।

বিরোধ ভঞ্জনপূর্ব্বক তাঁহার চরম সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, যদি যোগপ্রভাবে ভোগ ব্যতীতও প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হয়, তাহা হইলে "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি-শতৈরপি" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এবং "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার কিরূপে সামঞ্জস্য হইবে, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু যদি ভোগ ব্যতীতও যোগপ্রভাবেই সমস্ত প্রারব্ধ-কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়াও যোগীর কায়-ব্যূহনির্ম্মাণের প্রয়োজন কি? এবং যোগদর্শনে উহার উল্লেখ আছে কেন? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। যোগপ্রভাবে যোগীর যে কায়ব্যূহ নির্ম্মাণে সামর্থ্য জন্মে এবং ইচ্ছা হইলে তিনি অতি শীঘ্রই সমস্ত প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগের জন্য কায়ব্যূহ নির্ম্মাণ করেন, ইহা ত যোগশাস্ত্রানুসারে সকলেরই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে উদ্দালক ও বীতহব্য প্রভৃতি যে সমস্ত যোগী স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়াছি-লেন, তাঁহারাও নানা স্থানে অতি শীঘ্রই কায়ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভোগ দ্বারাই সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় করিয়াছিলেন, ইহাও ত অবশ্য বলা যাইতে পারে। তাঁহারা যে তাহাই করেন নাই, ইহা নির্ণয় করিবার কি প্রমাণ আছে? এইরূপ সর্ব্বত্রই ভোগদ্বারাই প্রারব্ধকর্ম্মবিশেষের ক্ষয় স্বীকার করিলে কোন অনুপপত্তি হয় না। নচেৎ "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি॥" "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের কিরূপে উপপত্তি হইবে? কেহ কেহ উক্ত স্মৃতিকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া উহার প্রামাণ্যই নাই, এইরূপ বিচারেরও অবতারণা করিয়াছেন। কারণ, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" এই (মুণ্ডক)-শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বকর্ম্মেরই নাশক, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং উহার বিরুদ্ধ কোন স্মৃতি প্রমাণ হইতে পারে না; এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু "তস্য তাবদেব চিরং" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য)-শ্রুতি-বাক্যের সহিত সমন্বয়ে উক্ত শ্রুতিবাক্যেও "কর্ম্মন্" শব্দের দ্বারা প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত কর্ম্মই বিবক্ষিত বুঝিলে উক্ত শ্রুতির সহিত উক্ত স্মৃতির কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্বোক্ত "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের দ্বারাও উক্তরূপ শ্রৌত সিদ্ধান্তই ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবদ্গীতার "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" (৪।৩৭) এই শ্লোকে ভাষ্যকার শঙ্কর ও শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণও সর্ব্বকর্ম্ম বলিতে প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত কর্ম্মই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি"র শেষে উক্ত বিষয়ে অনেক বিচার করিয়া, সর্ব্বশেষে তত্ত্বজ্ঞানকে সর্ব্বকর্ম্মনাশক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন[১]। তাঁহার মতে ভোগ তত্ত্বজ্ঞানেরই ব্যাপার। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই ভোগ উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা অবশিষ্ট প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশক হয়। সুতরাং "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" এই শ্রুতিবাক্য ও ভগবদ্গীতার "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" এই বাক্যে "কর্ম্মন্" শব্দের অর্থসংকোচ করা অনাবশ্যক। কিন্তু তাঁহার উক্ত মত পূর্ব্বোক্ত "ভোগেন ত্বিতরে" ইত্যাদি বেদান্ত-

১। উচ্যতে কর্ম্মণো ভোগনাশ্যত্বেহপি জ্ঞানস্য কর্ম্মনাশকত্বং। ভোগস্য তত্ত্বজ্ঞানব্যাপারত্বাৎ।—"ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি"র শেষ।

সূত্রবিরুদ্ধ হয় কি না, উক্ত সূত্রে "তু" শব্দের দ্বারা ভোগই প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশক, তত্ত্বজ্ঞান উহার নাশক নহে, ইহাই সূচিত হইয়াছে কি না, ইহা সুধীগণ প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিবেন।

অবশ্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মুমুক্ষুপ্রকরণে (৫।৬।৭।৮ সর্গে) ইহজন্মে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম প্রবল হইলে উহা প্রাক্তন কর্ম্মকে নিবৃত্ত করিতে পারে, ঐহিক শাস্ত্রীয় পুরুষকারের দ্বারা প্রাক্তন দৈবকে নিবৃত্ত করিয়া, ইহলোকে ও পরলোকে পূর্ণকাম হওয়া যায়, এই সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন প্রাক্তন অন্যান্য দৈবই শাস্ত্রীয় পুরুষকারের দ্বারা নিবৃত্ত হয়, ইহাই সেখানে তাৎপর্য্য বুঝিলে কোন শাস্ত্রবিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রানুসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে শ্রৌত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিতও বিরোধের কোন আশঙ্কা থাকে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের কোন বচন উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মতের বিচার বা সমর্থন না করিলেও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক বিদ্যারণ্য মুনি কেন তাহা করিয়াছেন, ইহাও চিন্তনীয়। পরন্তু শাস্ত্রবিহিত ঐহিক পুরুষকারের দ্বারা সমস্ত প্রাক্তন কর্ম্মেরই নিবৃত্তি হইতে পারে, ইহাই যোগবাশিষ্ঠের সিদ্ধান্ত হইলে ঐ শাস্ত্রীয় কর্ম্মবিশেষ ইহজন্মেই সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ সম্পাদন করিয়াই স্থলবিশেষে উহার বিনাশ সাধন করে, ইহাও তৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত কর্ম্মবিশেষ ইহ জন্মেই সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ জন্মাইয়া পরম্পরায় সমস্ত প্রারব্ধ নাশের কারণ হয়। আর যোগ-বাশিষ্ঠে যে, দৈববাদীর নিন্দা ও শাস্ত্রীয় পুরুষকারের প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে দৈবমাত্রবাদী অকর্ম্মা ব্যক্তিদিগের কর্ম্মে প্রবর্ত্তনই উদ্দেশ্য বুঝা যায়। কারণ, পূর্ব্বতন দেহোৎপন্ন দৈব না থাকিলেও কেবল শাস্ত্রীয় পুরুষকারের দ্বারাই ইহকালে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, ইহা আর্ষ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। উক্ত বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যে বেদমূলক প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন, উহার বিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত আর্ষ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পরন্তু যোগবাশিষ্ঠে যে শাস্ত্রীয় পুরুষকারের সর্ব্বসাধকত্ব ঘোষিত হইয়াছে, এবং প্রতিকূল দৈবধ্বংসের জন্য শাস্ত্রে যে নানাবিধ কর্ম্মের উপদেশ হইয়াছে, ঐ সমস্ত কর্ম্ম বা ঐহিক পুরুষকারও কি দৈব ব্যতীত হইতে পারে? এবং সকলেই কি বিশ্বামিত্র সাবিত্রী প্রভৃতির ন্যায় উৎকট তপস্যা করিতে পারে? প্রবল দৈবের প্রেরণা ব্যতীত ঐ সমস্ত কর্ম্মে কাহারও প্রবৃত্তিই জন্মে না। অনাদি সংসারে সকল জীবই দৈবের প্রেরণাবশতঃই পুরুষকার করিতেছে, ইহা পরম সত্য। শাস্ত্রীয় পুরুষকারও অপর দৈবকে অপেক্ষা করে। সুতরাং এই ভাবে দৈবের প্রাধান্যও সমর্থিত হয়। ফলকথা, সমস্ত কর্ম্মসিদ্ধিতেই পুরুষকারের ন্যায় দৈবও নিতান্ত আবশ্যক। তাই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তুল্যভাবেই বলিয়া গিয়াছেন,—"দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।"[১] ভারতের কবিও ভারতীয় শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন,—"প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা"।

১। দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকং।

মূল কথা, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের জন্য যে কিছুকাল জীবনধারণ করেন এবং ভোগ ব্যতীত যে কাহারই প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হয় না, ইহাই বহুসম্মত প্রাচীন সিদ্ধান্ত। অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুসারে গোবিন্দভাষ্যে পরম আতুর ভক্ত-বিশেষের সম্বন্ধে ভোগ ব্যতীতই শ্রীভগবানের কৃপায় সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয়, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন[১] এবং বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষোক্ত "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" এবং "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" এই সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যান্তর করিয়া শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের পক্ষপাত না থাকিলেও ভক্তবিশেষের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত আছে এবং উহা তাঁহার দোষ নহে,—পরন্তু গুণ। কিন্তু শ্রীভগবান্ পরম আতুর ভক্ত-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহ তাঁহার আত্মীয়বর্গকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিজের নিকটে লইয়া যান। তখন হইতে তাঁহার আত্মীয়বর্গই তাঁহার অবশিষ্ট প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ করে, ইহাই বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরে সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং উক্ত বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্যক[২]। সুতরাং স্থলবিশেষে অন্যের ভোগ হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম যে অবশ্য ভোগ্য, ভোগ ব্যতীত যে উহার ক্ষয় হইতেই পারে না, ইহা বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়েরও স্বীকৃত, সন্দেহ নাই। নচেৎ শ্রীভগবান্ কৃপাময় হইয়াও তাঁহার পরম আতুর ভক্তবিশেষকে নিজের নিকটে লইবার জন্য তাঁহার আত্মীয়বর্গকে ভোগের জন্য তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহ দান করিবেন কেন? বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই বা উহা সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন কেন? অবশ্য করুণাময় শ্রীভগবানের করুণাগুণে ভক্তবিশেষের পক্ষে সমস্তই হইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এখানে যে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে "মুক্ত" বলিয়াছেন, সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের জন্য কিছু কাল জীবনধারণ করিয়া অনাসক্তচিত্তে বিচরণ করেন এবং তাঁহার উপলব্ধ তত্ত্বের উপদেশ করেন, ইহাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ সমর্থন করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও উক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন[৩]। উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে

কেচিদ্দৈবাৎ স্বভাবাচ্চ কালাৎ পুরুষকারতঃ।
সংযোগে কেচিদিচ্ছন্তি ফলং কুশলবুদ্ধয়ঃ॥
যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১ম অঃ, ৩৪৯, ৫০, ৫১॥

১। ব্রহ্মৈকরতানাং পরমাতুরাণাং কেষাঞ্চিন্নিরপেক্ষাণাং বিনৈব ভোগমুভয়োঃ পুণ্যপাপয়োর্ব্বিশ্লেষঃ স্যাৎ।

২। তস্মাদতিপ্রেয়সাং স্বং দ্রষ্টুমার্ত্তানাং কেষাঞ্চিদ্ভক্তানাং স্বাপ্তিবিলম্বমসহিষ্ণুরীশ্বরস্তৎপ্রারব্ধানি তদীয়েভ্যঃ প্রদায় তান্ স্বান্তিকং নয়তীতি বিশেষাধিকরণে বক্ষ্যতে"।—বেদান্তদর্শন, চতুর্থ অঃ, প্রথম পাদের ১৭শ সূত্রের গোবিন্দ ভাষ্য।

৩। সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমণবদ্ধৃতশরীরঃ।—সাংখ্যকারিকা, (৬৭ম কারিকা)।

বেদান্তদর্শনের পূর্ব্বোক্ত "অনারব্ধকার্য্যে এবতু" (৪।১।১৫) ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, "অপিচ নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদা কঞ্চিৎকালং শরীরং ধ্রিয়তে ন বা ধ্রিয়তে"। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি কিছুকাল শরীর ধারণ করেন কি না, এই বিষয়ে বিবাদই করা যায় না। শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বশেষে চরমকথা বলিয়াছেন যে, শ্রুতি ও স্মৃতিতে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশের দ্বারা জীবন্মুক্তের লক্ষণই কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যাদি (৫৫শ) শ্লোকের দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরই স্বরূপবর্ণন হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ শ্লোকের টীকায় উহা সমর্থন করিতে মহর্ষি গোতমের এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সেখানে জীবন্মুক্তির শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিতে বৃহদারণ্যক উপনিষদের "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥" (৪।৪।৭) এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফলকথা, জীবন্মুক্তি বেদাদিশাস্ত্রসিদ্ধ। অনেক জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্তও দেহধারণ করিয়া বর্ত্তমান ছিলেন এবং এখনও অবশ্য অনেক জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত "অনারব্ধকার্য্যে এবতু" (৪।১।১৫) ইত্যাদি বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য-ভামতীতে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও হিরণ্যগর্ভ, মনু ও উদ্দালক প্রভৃতি দেবর্ষিগণের অবিদ্যাদি নিখিল ক্লেশনিবৃত্তি ও ব্রহ্মজ্ঞতা এবং শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞতা ও মহাকল্প, কল্প ও মন্বন্তরাদি কাল পর্য্যন্ত জীবনধারণ যে শ্রুত হয়, ইহারও উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন॥২॥

ভাষ্য। অতঃপরং কাচিৎ সংজ্ঞা হেয়া কাচিদ্ভাবয়িতব্যেত্যুপ-দিশ্যতে, নার্থ-নিরাকরণমর্থোপাদানং বা। কথমিতি ?

অনুবাদ। অনন্তর কোন্ সংজ্ঞা হেয়, কোন্ সংজ্ঞা চিন্তনীয়, ইহা উপদিষ্ট হইতেছে, অর্থের নিরাকরণ অথবা অর্থের গ্রহণ হইতেছে না (অর্থাৎ পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা বাহ্যবিষয়ের খণ্ডন বা সংস্থাপন করা হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে উপদেশ করা হইয়াছে।) (প্রশ্ন) কিরূপে ?

সূত্র। তন্নিমিত্তন্ত্ববয়ব্যভিমানঃ ॥৩॥৪১৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) সেই দোষসমূহের নিমিত্ত অর্থাৎ মূল কারণ কিন্তু অবয়বি-বিষয়ে অভিমান।

ভাষ্য। তেষাং দোষাণাং নিমিত্তন্ত্ববয়ব্যভিমানঃ। সা চ খলু স্ত্রীসংজ্ঞা সপরিষ্কারা পুরুষস্য, পুরুষসংজ্ঞা চ স্ত্রিয়াঃ সপরিষ্কারা, নিমিত্তসংজ্ঞা অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা চ। নিমিত্তসংজ্ঞা—রসনাশ্রোত্রং, দন্তৌষ্ঠং, চক্ষুর্নাসিকং।

অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা—ইত্থমোষ্ঠাবিতি। সেয়ং সংজ্ঞা কামং বর্দ্ধয়তি তদনুষক্তাংশ্চ দোষান্ বিবর্জ্জনীয়ান্, বর্জ্জনন্ত্বস্যাঃ।

ভেদেনাবয়বসংজ্ঞা—কেশ-লোম-মাংস-শোণিতাস্থি-স্নায়ু-শিরা-কফ-পিত্তোচ্চারাদিসংজ্ঞা, তামশুভসংজ্ঞেত্যাচক্ষতে। তামস্য ভাবয়তঃ কামরাগঃ প্রহীয়তে।

সত্যেব চ দ্বিবিধে বিষয়ে কাচিৎ সংজ্ঞা ভাবনীয়া কাচিৎ পরিবর্জ্জনীয়েত্যুপদিশ্যতে,—যথা বিষসম্পৃক্তেঽন্নেঽন্নসংজ্ঞোপাদানায় বিষসংজ্ঞা প্রহাণায়েতি।

অনুবাদ। সেই দোষসমূহের নিমিত্ত অর্থাৎ মূল কারণ কিন্তু অবয়বিবিষয়ে অভিমান। সেই অভিমান, যথা—পুরুষের সম্বন্ধে সপরিষ্কারা স্ত্রীসংজ্ঞা অর্থাৎ এই স্ত্রী সুন্দরী, এইরূপ বুদ্ধি, এবং স্ত্রীর সম্বন্ধে সপরিষ্কারা পুরুষসংজ্ঞা, অর্থাৎ এই পুরুষ সুন্দর, এইরূপ বুদ্ধি। এবং নিমিত্তসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা। নিমিত্তসংজ্ঞা যথা—রসনা ও শ্রোত্র, দন্ত ও ওষ্ঠ, চক্ষু ও নাসিকা (অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষের পরস্পরের রসনা, শ্রোত্র ও দন্তাদি বিষয়ে যে সামান্যজ্ঞান, তাহার নাম নিমিত্তসংজ্ঞা)। অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা যথা—দন্তসমূহ এই প্রকার,—ওষ্ঠদ্বয় এই প্রকার ইত্যাদি (অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষের দন্তাদিতে অন্য পদার্থের সাদৃশ্যমূলক আরোপবশতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ যে বুদ্ধি, তাহার নাম অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা)। সেই এই সংজ্ঞা কাম বর্দ্ধন করে এবং সেই কামানুষক্ত বিবর্জ্জনীয় দোষসমূহ বর্দ্ধন করে, এই সংজ্ঞার কিন্তু বর্জ্জন কর্ত্তব্য।

ভিন্নপ্রকার অবয়বসংজ্ঞা,—কেশ, লোম, মাংস, শোণিত, অস্থি, স্নায়ু, শিরা, কফ, পিত্ত ও উচ্চারাদি (মূত্রপুরীষাদি) সংজ্ঞা, সেই অবয়বসংজ্ঞাকে (পণ্ডিতগণ) "অশুভ সংজ্ঞা" ইহা বলেন। সেই অশুভসংজ্ঞাকে ভাবনা করিতে করিতে তাহার কাম-রাগ অর্থাৎ কামমূলক রাগ প্রহীণ (পরিত্যক্ত) হয়।

দ্বিবিধ বিষয়ই বিদ্যমান থাকিলেও কোন সংজ্ঞা ভাব্য, কোন সংজ্ঞা বর্জ্জনীয়, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে, যেমন বিষমিশ্রিত অন্নে অন্নসংজ্ঞা—গ্রহণের নিমিত্ত হয়, বিষসংজ্ঞা পরিত্যাগের নিমিত্ত হয়।

টিপ্পনী। রূপাদি বিষয়সমূহ মিথ্যাসংকল্পের বিষয় হইলে দোষের নিমিত্ত হয়, ইহা পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে। তদ্দ্বারা সর্ব্বাগ্রে ঐ রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানই কর্ত্তব্য, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রাগাদি দোষসমূহের মূল কারণ কি? এবং উহার নিবৃত্তির জন্য বর্জ্জনীয় ও চিন্তনীয় কি?

ইহা বলা আবশ্যক। তাই মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা অবয়বিবিষয়ে অভিমানকে দোষসমূহের মূলকারণ বলিয়া কোন্ সংজ্ঞা বর্জ্জনীয় ও কোন্ সংজ্ঞা চিন্তনীয়, ইহার উপদেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রের দ্বারা কোন সংজ্ঞা বর্জ্জনীয় এবং কোন সংজ্ঞা চিন্তনীয়, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বারা অর্থের অর্থাৎ বাহ্যবিষয় বা অবয়বীর খণ্ডন অথবা স্থাপন হয় নাই।

বস্তুতঃ মহর্ষি পরবর্ত্তী প্রকরণের দ্বারাই বিশেষ বিচারপূর্ব্বক অবয়বীর সংস্থাপন করায় প্রকরণানুসারে এই সূত্রে তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ উদ্দেশ্যই বুঝা যায়। কিন্তু অবয়বী না থাকিলে তদ্বিষয়ে অভিমান বলাই যায় না। সুতরাং যাঁহারা অবয়বী মানেন না, তাঁহাদিগের প্রত্যাখ্যান এই সূত্রের উদ্দেশ্য না হইলেও ফলে ইহার দ্বারা তাহাও হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। তবে অবয়বীর খণ্ডন বা সংস্থাপন যে এখানে মহর্ষির উদ্দেশ্য নহে, ইহা স্বীকার্য্য। বার্ত্তিককারও এখানে লিখিয়াছেন যে, যথাব্যবস্থিত বিষয়েই কিছু চিন্তনীয় ও কিছু বর্জ্জনীয়, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত সংকল্পই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বলিয়া সরলভাবে বুঝা যায়। তাহা হইলে অবয়বিবিষয়ে অভিমান পূর্ব্বসূত্রোক্ত সংকল্পের নিমিত্ত, ইহাই সূত্রার্থ বুঝা যায়। "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য নিজে উক্তরূপই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত সকলেই এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা রাগাদি দোষসমূহই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা প্রথমেই লিখিত হইয়াছে।

অবয়বিবিষয়ে অভিমান কিরূপ? ইহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যেমন পুরুষের পক্ষে সুন্দরী স্ত্রীতে সপরিষ্কারা স্ত্রীসংজ্ঞা এবং স্ত্রীর পক্ষে সুন্দর পুরুষে সপরিষ্কারা পুরুষসংজ্ঞা, ইহা তাহাদিগের অবয়বিবিষয়ে অভিমান। "সংজ্ঞা" বলিতে এখানে জ্ঞান বা বুদ্ধিবিশেষই বুঝা যায়। বার্ত্তিককারও এখানে শেষোক্ত "অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা"কে মোহ বলিয়া "সংজ্ঞা" শব্দের জ্ঞান বা বুদ্ধিবিশেষ অর্থই ব্যক্ত করিয়াছেন। "পরিষ্কার" শব্দের বিশুদ্ধতা অর্থ গ্রহণ করিলে উহার দ্বারা প্রকৃত স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের সৌন্দর্য্যই বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে সপরিষ্কারা স্ত্রীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা, এই কথার দ্বারা সৌন্দর্য্যবিষয়িণী স্ত্রীবুদ্ধি ও পুরুষবুদ্ধি বুঝা যায়। স্ত্রীবুদ্ধি ও পুরুষবুদ্ধিতে স্ত্রী ও পুরুষের শরীরের পরিষ্কার অর্থাৎ সৌন্দর্য্য বিষয় হইলে 'এই স্ত্রী সুন্দরী' এবং 'এই পুরুষ সুন্দর' এই প্রকার বুদ্ধি জন্মে। ঐ বুদ্ধিকে সপরিষ্কারা স্ত্রীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা বলা যায়। ঐ পরিষ্কার বা সৌন্দর্য্য তখন স্ত্রী ও পুরুষের আসক্তিরূপ বন্ধনের প্রয়োজক হওয়ায় যদ্দ্বারা ঐ বন্ধন হয়, এই অর্থে ঐ সৌন্দর্য্যকেও বন্ধন বলা যায়। তাই বার্ত্তিককার লিখিয়াছেন,—"পরিষ্কারো বন্ধনং।" কোন কোন পুস্তকে "পরিষ্কারশ্চ নিমিত্তসংজ্ঞা অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা চ" এইরূপ ভাষ্যপাঠ দেখা যায়। কিন্তু বার্ত্তিকের পাঠানুসারে উহা প্রকৃত পাঠ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বার্ত্তিককার পূর্ব্বোক্তরূপ

স্ত্রীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞার উল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন,—"*তত্রাপি চ দ্বে সংজ্ঞে—নিমিত্তসংজ্ঞা অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা চ।*" *স্ত্রীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের দন্তাদি বিষয়ে দন্তত্বাদি* নিমিত্ত নিবন্ধন দন্তত্বাদিরূপে যে বুদ্ধি, তাহাকে "নিমিত্তসংজ্ঞা" বলা হইয়াছে। এবং ঐ দন্তাদি বিষয়ে "দন্তসমূহ এই প্রকার", "ওষ্ঠদ্বয় এই প্রকার", ইত্যাদিরূপ যে বুদ্ধি, তাহাকে "অনুব্যঞ্জন-সংজ্ঞা" বলা হইয়াছে। মুদ্রিত "বৃত্তি"পুস্তকে যে "অনুরঞ্জনসংজ্ঞা" এইরূপ পাঠ এবং "অতএব ভাষ্যাদৌ পরিষ্কারবুদ্ধিরনুরঞ্জনসংজ্ঞা" ইত্যাদি পাঠ দেখা যায়, উহা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ভাষ্যাদি গ্রন্থে "অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা" এইরূপ পাঠই আছে। তাৎপর্য্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,[১] "ব্যঞ্জন" শব্দের অর্থ এখানে অবয়বীর অবয়বসমূহ। কারণ, অবয়বসমূহের সহিত অবয়বীর উপলব্ধি হয় অর্থাৎ অবয়বসমূহই সেই অবয়বীর ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। সুতরাং যদ্দ্বারা অবয়বী ব্যক্ত হয়, এই অর্থে "ব্যঞ্জন" শব্দের দ্বারা অবয়বীর অবয়বসমূহ বুঝা যায়। "অনু" শব্দের সাদৃশ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া "অনুব্যঞ্জন" শব্দের দ্বারা অবয়বসমূহের সাদৃশ্য বুঝা যায়। সেই সাদৃশ্যবশতঃই অবয়বসমূহে অন্য পদার্থের আরোপ হইয়া থাকে। যেমন দন্তসমূহে দাড়িম্ববীজের সাদৃশ্যবশতঃ তাহাতে দাড়িম্ববীজের আরোপ করিয়া এবং বিম্বফলের সহিত ওষ্ঠদ্বয়ের সাদৃশ্যবশতঃ তাহাতে বিম্বফলের আরোপ করিয়া যে সংজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষ জন্মে, উহাকে পূর্ব্বোক্ত অর্থে "অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা" বলা যায়। বার্ত্তিককারও "অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা"য় অন্য পদার্থের আরোপের উল্লেখ করিয়া ঐ সংজ্ঞাকে মোহ বলিয়াছেন এবং উহা রাগাদির কারণ বলিয়া বর্জ্জনীয়, ইহা বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যানুসারে তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পৃথ্বী ছন্দের একটি ও মালিনী ছন্দের একটি শৃঙ্গাররসাত্মক উৎকৃষ্ট কবিতার উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্ত "অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা"র উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকারোক্ত "অনুব্যঞ্জন-সংজ্ঞা"র কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি উহার উদাহরণ প্রকাশ করিতে শ্লোক লিখিয়াছেন,—"খেলৎখঞ্জননয়না পরিণতবিম্বাধরা পৃথুশ্রোণী। কমলমুকুলস্তনীয়ং পূর্ণেন্দুমুখী সুখায় মে ভবিতা"॥ পুরুষের পক্ষে কোন স্ত্রীতে ঐরূপ সংজ্ঞা বা বুদ্ধিবিশেষ কামাদিবর্দ্ধক হওয়ায় অনিষ্ট সাধন করে, সুতরাং উহা বর্জ্জনীয়। ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বোক্তরূপ স্ত্রীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা বলিয়া, পরে ঐ স্থলেই নিমিত্তসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা, এই সংজ্ঞাদ্বয়ের উল্লেখ ও উদাহরণ প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞা কাম ও কামমূলক বর্জ্জনীয় দোষসমূহ বর্দ্ধন করে। সুতরাং ঐ সংজ্ঞা যে বর্জ্জনীয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। তাই ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন, "বর্জ্জনম্বনয়োঃ"। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার যে সংজ্ঞা, যাহাকে মহর্ষি এই সূত্রে অবয়বিবিষয়ে অভিমান বলিয়াছেন, উহাই বর্জ্জনীয় বা হেয়, উহা ভাবনীয় বা চিন্তনীয় নহে। কারণ, উহার ভাবনায় কামাদির বৃদ্ধি হয়। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানার্থী উহা বর্জ্জন করিবেন।

ভাষ্যকার পরে "ভেদেনাবয়বসংজ্ঞা" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের

১। ব্যঞ্জনান্যবয়বিনোঽবয়বাস্তৈঃ সহোপলম্ভাৎ, তেষামনুব্যঞ্জনং তৎসাদৃশ্যং তেন তদারোপঃ।—তাৎপর্য্য-টীকা।

শরীরে কেশলোমাদি সংজ্ঞাকে ভিন্নপ্রকার "অবয়বসংজ্ঞা" বলিয়া উহার নাম "অশুভসংজ্ঞা" এবং ঐ সংজ্ঞাকে ভাবনা করিলে স্ত্রী ও পুরুষের কামমূলক রাগ বা আসক্তির ক্ষয় হয়, ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং ঐ অবয়বসংজ্ঞা বা অশুভসংজ্ঞাই যে ভাবনীয়, ইহাই ঐ কথার দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ স্ত্রী ও পুরুষের শরীরের সৌন্দর্য্যাদি চিন্তা না করিয়া যদি তাহাতে অবস্থিত কেশ, লোম, মাংস, রক্ত, অস্থি, স্নায়ু, শিরা, কফ, পিত্ত ও মূত্র পুরীষাদি পদার্থগুলির চিন্তা করা যায় এবং ঐ সংজ্ঞা বা কেশাদিবুদ্ধির পুনঃ পুনঃ ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে কামমূলক আসক্তি ক্ষয়ে ক্রমশঃ বৈরাগ্য জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। বিবেকী ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত "অশুভসংজ্ঞা"কেই ভাবনা করেন, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্যপ্রকরণে উহা নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে শ্লোক বলিয়াছেন,—"চর্ম্মনির্ম্মিতপাত্রীয়ং মাংসাসৃক্পূয়পূরিতা। অস্যাং রজ্যতি যো মূঢ়ঃ পিশাচঃ কস্ততোঽধিকঃ॥" পুরুষ স্ত্রীকে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে ক্রমশঃ তাহার স্ত্রীতে বৈরাগ্য জন্মে, সন্দেহ নাই। বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানার্থী নিজের দেহাদিতেও পূর্ব্বোক্তরূপ "অশুভসংজ্ঞা" ভাবনা করিবেন। এইরূপ কোপনীয় শত্রুতে দ্বেষবর্দ্ধক যে সংজ্ঞা বা বুদ্ধিবিশেষ, তাহাও বর্জ্জনীয়। বৃত্তিকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে শ্লোক বলিয়াছেন,—"মাং দ্বেষ্ট্যসৌ দুরাচার ইষ্টাদিষু যথেষ্টতঃ। কণ্ঠ-পীঠং কুঠারেণ ছিত্ত্বাঽস্য স্যাং সুখী কদা॥" অর্থাৎ এই দুরাচার সর্ব্বত্র স্বার্থের জন্য আমাকে দ্বেষ করে। আমি কুঠারের দ্বারা কবে ইহার কণ্ঠপীঠ ছেদন করিয়া সুখী হইব—এইরূপ বুদ্ধি দ্বেষবর্দ্ধক, সুতরাং উহা বর্জ্জনীয়। কিন্তু এ বিষয়ে অশুভসংজ্ঞাই ভাবনীয়। বৃত্তিকার উক্ত স্থলে অশুভসংজ্ঞার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে শ্লোক বলিয়াছেন,—"মাংসাসৃক্কীকসময়ো দেহঃ কিং মেঽপরাধ্যতি। এতস্মাদপরঃ কর্ত্তা কর্ত্তনীয়ঃ কথং ময়া॥" অর্থাৎ ইহার মাংস-রক্তাদিময় দেহ আমার সম্বন্ধে কি অপরাধ করিয়াছে? এই দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ যে কর্ত্তা, অর্থাৎ অচ্ছেদ্য অদাহ্য নিত্য আত্মা, তাহাকে আমি কিরূপে ছেদন করিব? এইরূপ বুদ্ধিই পূর্ব্বোক্ত স্থলে "অশুভসংজ্ঞা"। ঐ অশুভসংজ্ঞা ভাবনা করিলে ক্রমশঃ শত্রুতে দ্বেষ নিবৃত্ত হয়; সুতরাং উহাই ভাবনীয়। পূর্ব্বোক্ত দ্বেষবর্দ্ধক যে সংজ্ঞা, উহা বর্জ্জনীয়। বৃত্তিকার উহাকে "শুভসংজ্ঞা" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতিও ভাবনীয় সংজ্ঞাকে "অশুভ-সংজ্ঞা" বলায় বর্জ্জনীয়সংজ্ঞার প্রাচীন নাম "শুভসংজ্ঞা" ইহা বুঝা যায়।

বার্ত্তিকাদি গ্রন্থে ভাষ্যকারের "ভেদেনাবয়বসংজ্ঞা" ইত্যাদি সন্দর্ভের কোন ব্যাখ্যাদি পাওয়া যায় না। ঐ স্থলে ভাষ্যকারের প্রকৃত পাঠ কি, তদ্বিষয়েও সংশয় জন্মে। ভাষ্যে "বর্জ্জনমস্যা ভেদেন" এই পর্য্যন্তই বাক্য শেষ হইলে ভেদ করিয়া অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া বা বিশেষ করিয়া ঐ সংজ্ঞার বর্জ্জন কর্ত্তব্য, ইহা ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায়। অথবা পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞার ভেদ বা বিশেষ যে নিমিত্তসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা, তাহার সহিত ঐ সংজ্ঞার বর্জ্জন কর্ত্তব্য; ইহাও ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যাইতে পারে। আর যদি "বর্জ্জনমস্যাঃ" এই পর্য্যন্তই বাক্য শেষ হয়, তাহা হইলে পরে "ভেদেনাবয়বসংজ্ঞা" ইত্যাদি পাঠে "ভেদেন" এই স্থলে বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি বুঝিয়া ভেদ-

বিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবয়বসংজ্ঞা হইতে ভিন্ন প্রকার অবয়বসংজ্ঞা—কেশলোমাদিসংজ্ঞা, উহার নাম অশুভসংজ্ঞা, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। কারণ, ভাষ্যকার প্রথমে যে, নিমিত্তসংজ্ঞা বলিয়াছেন, উহাও বস্তুতঃ একপ্রকার অবয়বসংজ্ঞা। তাৎপর্য্যটীকাকারও প্রথমে ঐ নিমিত্তসংজ্ঞার ব্যাখ্যা করিতে স্ত্রীর দন্ত ওষ্ঠ নাসিকাদিকে অবয়ব বলিয়াছেন। এবং পরেও তিনি নিমিত্তসংজ্ঞাকেই "অবয়বসংজ্ঞা" বলিয়াছেন বুঝা যায়। সুতরাং ঐ নিমিত্তসংজ্ঞারূপ অবয়বসংজ্ঞা হইতে শেষোক্ত কেশলোমাদি অবয়বসংজ্ঞা ভিন্ন প্রকার, ইহা ভাষ্যকার বলিতে পারেন। "চরকসংহিতা"র শারীরস্থানের ৭ম অধ্যায়ে শরীরের সমস্ত অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের বর্ণন দ্রষ্টব্য। সুধীগণ এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন।

তবে কি[১] পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তসংজ্ঞারূপ অবয়বসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞার বিষয়ই নাই? কেবল শেষোক্ত অশুভসংজ্ঞার বিষয়ই আছে, অর্থাৎ যে সংজ্ঞা বর্জ্জনীয়, তাহার বিষয় পদার্থের অস্তিত্বই নাই, ইহাই কি স্বীকার্য্য? এতদুত্তরে সর্ব্বশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বর্জ্জনীয় সংজ্ঞার বিষয় এবং ভাবনীয় অশুভসংজ্ঞার বিষয়, এই দ্বিবিধ বিষয়ই বস্তুতঃ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সেই ব্যবস্থিত বিষয়েই কোন সংজ্ঞা ভাবনীয়, কোন সংজ্ঞা বর্জ্জনীয়, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন বিষমিশ্রিত অন্নে অন্নসংজ্ঞা, গ্রহণের নিমিত্ত হয়, বিষসংজ্ঞা পরিত্যাগের নিমিত্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, বিষমিশ্রিত অন্ন বা মধুতে বিষবুদ্ধি হইলে উহা পরিত্যাগ করে, অন্নাদিবুদ্ধি হইলে উহা গ্রহণ করে। ঐ স্থলে বিষ ও অন্নাদি, এই দ্বিবিধ বিষয়ই পরমার্থতঃ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু উহাতে বৈরাগ্যের নিমিত্ত বিষসংজ্ঞাই সেখানে গ্রহণ করিবে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীসংজ্ঞার বিষয় স্ত্রীপদার্থ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ সংজ্ঞার বিষয় হইয়া দ্বিবিধই আছে, তথাপি উহাতে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জনীয় সংজ্ঞার বিষয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত অশুভ সংজ্ঞার বিষয়ত্বই গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাবে তত্ত্বজ্ঞানার্থী সকল বিষয়েই বর্জ্জনীয়সংজ্ঞাকে পরিত্যাগ করিয়া ভাবনীয় অশুভসংজ্ঞাকে ভাবনা করিবেন। ঐ ভাবনার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার সেই বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিবে। ফলকথা, পূর্ব্বোক্তরূপ স্ত্রীসংজ্ঞা, পুরুষসংজ্ঞা এবং নিমিত্তসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জন-সংজ্ঞাই ঐরূপ স্থলে অবয়বিবিষয়ে অভিমান, উহাই সেই বিষয়ে রাগাদি দোষের নিমিত্ত, সুতরাং উহা বর্জ্জনীয়, ইহাই মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য ॥৩॥

তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১॥

১। তৎ কিমিদানীমবয়বানুব্যঞ্জনসংজ্ঞয়োর্বিষয়ো নাস্তি? অশুভসংজ্ঞাবিষয় এব পরমস্তীত্যত আহ, "সত্যে চ দ্বিবিধে বিষয়" ইতি। দ্বিবিধ এবাসৌ কামিনীলক্ষণো বিষয়স্তথাপি রাগাদিপ্রহাণার্থমবয়বাদিসংজ্ঞাগোচরত্বং পরিত্যজ্য অশুভসংজ্ঞাগোচরত্বমস্যোপাদীয়তে বৈরাগ্যোৎপাদনায়েত্যর্থঃ। অত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ যথা "বিষসংপৃক্তে" ইতি। নহি বিষমধুনী পরমার্থতো ন স্তঃ, অপিতু বৈরাগ্যায় বিষসংজ্ঞা তত্রোপাদীয়ত ইত্যর্থঃ—তাৎপর্য্যটীকা।

ভাষ্য। অথেদানীমর্থং নিরাকরিষ্যতাঽবয়বি-নিরাকরণমুপপাদ্যতে।*

অনুবাদ। অনন্তর এখন যিনি "অর্থ"কে নিরাকরণ করিবেন অর্থাৎ বাহ্য পদার্থের খণ্ডন যাঁহার উদ্দেশ্য, তৎকর্ত্তৃক অবয়বীর নিরাকরণ উপপাদিত হইতেছে। (অর্থাৎ মহর্ষি এখন তাঁহার যুক্তি অনুসারে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষরূপে অবয়বীর অভাব সমর্থন করিতেছেন)।

সূত্র। বিদ্যাঽবিদ্যাদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ ॥৪॥৪১৪॥

অনুবাদ। বিদ্যা ও অবিদ্যার (উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির) দ্বৈবিধ্য অর্থাৎ সদ্বিষয়কত্ব ও অসদ্বিষয়কত্ববশতঃ (অবয়বিবিষয়ে) সংশয় হয়।

ভাষ্য। সদসতোরুপলম্ভাদ্বিদ্যা দ্বিবিধা। সদসতোরনুপলম্ভাদবিদ্যাপি দ্বিবিধা। উপলভ্যমানেঽবয়বিনি বিদ্যাদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ। অনুপলভ্যমানে চাবিদ্যা-দ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ। সোঽয়মবয়বী যদ্যুপলভ্যতে অথাপি নোপলভ্যতে, ন কথঞ্চন সংশয়ান্মুচ্যতে ইতি।

অনুবাদ। সৎ ও অসতের উপলব্ধিবশতঃ বিদ্যা (উপলব্ধি) দ্বিবিধ। সৎ ও অসতের অনুপলব্ধিবশতঃ অবিদ্যাও (অনুপলব্ধিও) দ্বিবিধ। উপলভ্যমান অবয়বি-বিষয়ে বিদ্যার দ্বৈবিধ্যবশতঃ সংশয় হয়। অনুপলভ্যমান অবয়বিবিষয়েও অবিদ্যার দ্বৈবিধ্যবশতঃ সংশয় হয়। (তাৎপর্য্য) সেই এই অবয়বী যদি উপলব্ধ হয় অথবা উপলব্ধ না হয়, কোন প্রকারেই সংশয় হইতে মুক্ত হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে যে অবয়বিবিষয়ে অভিমানকে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়াছেন, সেই অবয়বিবিষয়ে সুপ্রাচীন কাল হইতেই বিবাদ থাকায় এখন এই প্রকরণের দ্বারা বিচারপূর্ব্বক অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, অবয়বীর অস্তিত্বই না থাকিলে তদ্বিষয়ে অভিমান বলাই যায় না। কিন্তু অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে হইলে তদ্বিষয়ে সংশয় প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করা আবশ্যক। তাই মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা অবয়বিবিষয়ে সংশয় সমর্থন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রগুলির দ্বারা অবয়বীর অভাবই সমর্থন করায় এই সূত্রে

---

* এখানে "অবয়ব্যুপপাদতে" এবং "অবয়বিন্যুপপাদ্যতে" এইরূপ পাঠই মুদ্রিত নানা পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু উহা প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা যায় না। এখানে তাৎপর্য্যটীকানুসারেই ভাষ্যপাঠ গৃহীত হইল। "তদেবং স্বমতেন প্রসংখ্যানোপদেশমুক্ত্বা পরাভিমতপ্রসংখ্যানং নিরাবর্ত্তুমুপক্রমতে—অথেদানীমর্থং নিরাকরিষ্যতা বিজ্ঞানবাদিনা অবয়বিনিরাকরণমুপপাদ্যতে"।—তাৎপর্য্যটীকা।

অবয়বিবিষয়ে সংশয়ই যে মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি পূর্ব্বপ্রকরণে নিজমতে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করিয়া, এখন যাঁহারা অবয়বীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং পরমাণুও স্বীকার করেন না, কেবল জ্ঞানমাত্রই স্বীকার করেন, সেই বিজ্ঞানবাদীদিগের অভিমত তত্ত্বজ্ঞান খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের মতানুসারে প্রথমে অবয়বীর নিরাকরণ উপপাদন করিতেছেন। কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত অবয়বসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা অর্থবিশেষেই হইতে পারে। কিন্তু জগতে অর্থমাত্রই অলীক, জ্ঞানের বিষয় "অর্থ" অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর বাস্তব কোন সত্তাই নাই। জ্ঞানই একমাত্র সৎপদার্থ। সুতরাং বাহ্য পদার্থের সত্তা না থাকায় তদ্‌বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সংজ্ঞাদ্বয় সম্ভবই হয় না। তাই মহর্ষি এখানে পুনর্ব্বার অবয়বিপ্রকরণের আরম্ভ করিয়া প্রথমে সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। পরে পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের যুক্তি খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বকথিত অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বসূত্রোক্ত অবয়বি-বিষয়ে অভিমান (স্ত্রীসংজ্ঞা পুরুষসংজ্ঞা প্রভৃতি) উপপাদিত হইয়াছে।

সূত্রে "বিদ্যা" শব্দের অর্থ উপলব্ধি এবং "অবিদ্যা" শব্দের অর্থ অনুপলব্ধি। "বিদ্যাঽবিদ্যা" এই দ্বন্দ্বসমাসের শেষোক্ত "দ্বৈবিধ্য" শব্দের পূর্ব্বোক্ত "বিদ্যা" ও "অবিদ্যা"শব্দের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহার দ্বারা বুঝা যায়, উপলব্ধি দ্বিবিধ এবং অনুপলব্ধিও দ্বিবিধ। দ্বিবিধ বলিতে এখানে (১) সদ্বিষয়ক ও (২) অসদ্বিষয়ক। অর্থাৎ সৎ বা বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রমবশতঃ উপলব্ধি হয়। যেমন তড়াগাদিতে বিদ্যমান জলের উপলব্ধি হয়, এবং মরীচিকায় ভ্রমবশতঃ অবিদ্যমান জলের উপলব্ধি হয়। সেই উপলব্ধি অসদ্‌বিষয়ক। এইরূপ ভূগর্ভস্থ জল বা রত্নাদি বিদ্যমান থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয় না, এবং অনুৎপন্ন বা বিনষ্ট ও শশশৃঙ্গাদি অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। সুতরাং অবয়বীর উপলব্ধি হইলেও ঐ উপলব্ধি কি বিদ্যমান অবয়বিবিষয়ক ? অথবা অবিদ্যমান অবয়বিবিষয়ক ? এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। তাহার ফলে অবয়বিবিষয়েই সংশয় উৎপন্ন হয়। এইরূপ অবয়বীর উপলব্ধি না হইলেও ঐ অনুপলব্ধি কি বিদ্যমান অবয়বীরই অনুপলব্ধি, অথবা অবিদ্যমান অবয়বীরই অনুপলব্ধি ? এইরূপ সংশয়বশতঃ শেষে অবয়বিবিষয়েই সংশয় জন্মে। উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বৈবিধ্যই ঐরূপে অবয়বিবিষয়ে সংশয়ের প্রযোজক হওয়ায় মহর্ষি সূত্র বলিয়াছেন,—"বিদ্যাঽবিদ্যাদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ"। ফলকথা, অবয়বী থাকিলে এবং না থাকিলেও যখন তাহার উপলব্ধি হইতে পারে, এবং ঐ উভয় পক্ষে তাহার অনুপলব্ধিও হইতে পারে, তখন উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বৈবিধ্যবশতঃ অবয়বীর অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় অবশ্যই হইতে পারে। ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ২৩শ সূত্রে শেষে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের পৃথক্ কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু বার্ত্তিককার প্রভৃতি ভাষ্যকারের ঐ ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নাই। এ বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে যথাস্থানে বার্ত্তিককার প্রভৃতির কথা লিখিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ২১৫—১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বার্ত্তিককার এখানেও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মতের উল্লেখ করিয়া

বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্বৈবিধ্য যে, সংশয়ের পৃথক্ কারণ নহে, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি এখানে অন্য কোন প্রকারে এই সূত্রের ব্যাখ্যান্তরও করেন নাই।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া, এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "বিদ্যা" শব্দের অর্থ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান। "অবিদ্যা" শব্দের অর্থ ভ্রমজ্ঞান। প্রমা ও ভ্রম-ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। সুতরাং ঐ দ্বৈবিধ্যবশতঃ অবয়বিবিষয়ে সংশয় জন্মে। কারণ, অবয়বীর জ্ঞান হইলে ঐ জ্ঞানে প্রমা ও ভ্রমজ্ঞানের সাধারণ ধর্ম্ম যে জ্ঞানত্ব, তাহার জ্ঞানবশতঃ এই জ্ঞান কি প্রমা অথবা ভ্রম? এইরূপে ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্য-সংশয় হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত শেষে অবয়বিবিষয়ে সংশয় জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে, কোন বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেই সেই বিষয়ের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, ঐ জ্ঞান যথার্থও হইতে পারে, ভ্রমও হইতে পারে। সুতরাং সেই জ্ঞান কি যথার্থ অথবা ভ্রম? এইরূপ সংশয়ও অবশ্যই হইতে পারে। তাহা হইলে সেই স্থানে সেই জ্ঞানের বিষয় পদার্থও তখন সন্দিগ্ধ হইয়া যায়। বৃত্তিকার এখানে জ্ঞানের প্রামাণ্যসংশয়কেই ঐ জ্ঞানবিষয়ের সংশয়ের হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথম অধ্যায়ে সংশয়সামান্যলক্ষণ-সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াও পরে জ্ঞানের প্রামাণ্যসংশয়কে বিষয়ের সংশয়ে হেতু বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

বৈশেষিক দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে মহর্ষি কণাদ অন্তর্বিষয়ক সংশয় ও উহার কারণ প্রদর্শন করিতে সূত্র বলিয়াছেন,—"বিদ্যাঽবিদ্যাতশ্চ সংশয়ঃ" (২০শ)। শঙ্কর মিশ্র শেষে এই সূত্রে "বিদ্যা" শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান এবং "অবিদ্যা" শব্দের অর্থ ভ্রমজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জ্ঞান কখনও বিদ্যা অর্থাৎ যথার্থ হয়, আবার কখনও অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রমও হয়। সুতরাং কোন বস্তু জ্ঞানের বিষয় হইলে ঐ বস্তু সৎ অথবা অসৎ? অথবা ঐ জ্ঞান যথার্থ, কি ভ্রম? এইরূপ সংশয় জন্মে। কিন্তু এখানেও ঐরূপ সংশয় সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানজন্যই হইয়া থাকে। উহার প্রতিও পৃথক্ কোন কারণ নাই।

শঙ্কর মিশ্র শেষে মহর্ষি গোতমের "সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেঃ" ইত্যাদি (১।১।২৩) সংশয়সামান্য-লক্ষণ-সূত্রের উদ্ধারপূর্ব্বক ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যে, ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়ের পৃথক্ কারণ বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত কণাদসূত্র-সম্মত নহে বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, মহর্ষি গোতমের "সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেঃ" ইত্যাদি সূত্রে "উপলব্ধি" ও "অনুপলব্ধি" শব্দের পরে "অব্যবস্থা" শব্দের প্রয়োগ আছে, এবং এই সূত্রে 'উপলব্ধি'বোধক "বিদ্যা" শব্দ ও অনুপলব্ধিবোধক "অবিদ্যা" শব্দের পরে "দ্বৈবিধ্য" শব্দের প্রয়োগ আছে। মহর্ষি কণাদের পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "দ্বৈবিধ্য" শব্দের প্রয়োগ নাই। মহর্ষি গোতমের এই সূত্রোক্ত "বিদ্যা"র দ্বৈবিধ্য ও "অবিদ্যা"র দ্বৈবিধ্য কিরূপে হইতে পারে এবং উহা কিরূপেই বা সংশয়ের প্রযোজক হইতে পারে, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। গোতমের এই সূত্রে "দ্বৈবিধ্য" শব্দের প্রয়োগ থাকায় বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই উভয়কেই তিনি দ্বিবিধ বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য হইলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার্য্য কি না, ইহাও সুধীগণ প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিবেন ॥৪॥

সূত্র। তদসংশয়ঃ পূর্ব্বহেতুপ্রসিদ্ধত্বাৎ ॥৫॥৪১৫॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হওয়ায় সেই [illegible] সংশয় হয় না।

ভাষ্য। তস্মিন্ননুপপন্নঃ সংশয়ঃ। কস্মাৎ? পূর্ব্বোক্তহেতূনামপ্রতিষেধাদস্তি দ্রব্যান্তরারম্ভ ইতি।

অনুবাদ। সেই অবয়বি-বিষয়ে সংশয় উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত অবয়বিসাধক হেতুসমূহের প্রতিষেধ (খণ্ডন) না হওয়ায় দ্রব্যান্তরের আরম্ভ অর্থাৎ অবয়ব হইতে পৃথক্ দ্রব্যের উৎপত্তি আছে অর্থাৎ উহা স্বীকার্য্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি এখন নিজমতানুসারে পূর্ব্বসূত্রোক্ত সংশয়ের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, অবয়বিবিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ে (২।১।৩৪।৩৫।৩৬) অনেক হেতুর দ্বারা অবয়বী "প্রসিদ্ধ" অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ করা হইয়াছে। যাহা সিদ্ধ পদার্থ, তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কারণ, যে পদার্থবিষয়ে সংশয় হইবে, সেই পদার্থের সিদ্ধি বা নিশ্চয় ঐ সংশয়ের প্রতিবন্ধক। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়বীর সাধক পূর্ব্বোক্ত হেতুগুলির খণ্ডন না হওয়ায় অবয়ব হইতে পৃথক্ দ্রব্য অবয়বীর যে আরম্ভ বা উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার্য্য। স্বীকার অর্থ প্রকাশের জন্য ভাষ্যকার অন্যত্রও "অস্তি" এই অব্যয় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা যায় (দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ॥৫॥

সূত্র। বৃত্ত্যনুপপত্তেরপি ন সংশয়ঃ ॥৬॥৪১৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) "বৃত্তির" অর্থাৎ অবয়বীতে অবয়বসমূহের এবং অবয়ব-সমূহে অবয়বীর বর্ত্তমানতা বা স্থিতির অনুপপত্তিবশতঃও (অবয়বীর নাস্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় অবয়বিবিষয়ে) সংশয় হয় না।

ভাষ্য। বৃত্ত্যনুপপত্তেরপি তর্হি সংশয়ানুপপত্তির্নাস্ত্যবয়বীতি।

অনুবাদ। তাহা হইলে "বৃত্তির" অনুপপত্তিপ্রযুক্তও সংশয়ের অনুপপত্তি, (যেহেতু) অবয়বী নাই।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা অবয়বীর নাস্তিত্ববাদীদিগের কথা বলিয়াছেন যে, যদি বল, অবয়বীর অস্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে সংশয়ের উপপত্তি হয় না, তাহা হইলে আমরা বলিব, অবয়বীর নাস্তিত্বই সিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে সংশয়ের উপপত্তি হয় না। কারণ, অবয়বী স্বীকার করিতে হইলে ঐ অবয়বীতে তাহার অবয়বসমূহ বর্ত্তমান থাকে, অথবা সেই অবয়বসমূহে সেই অবয়বী বর্ত্তমান থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অবয়বীতে

[illegible] না। তজ্জন্য অবয়বী নাই অর্থাৎ অবয়বী অলীক, ইহাই সিদ্ধ হওয়ায় ঐ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কারণ, অবয়বীর সিদ্ধি বা নিশ্চয় যেমন ঐ বিষয়ে সংশয়ের প্রতিবন্ধক, তদ্রূপ অবয়বীর অভাব নিশ্চয় বা অলীকত্ব নিশ্চয়ও ঐ বিষয়ে সংশয়ের প্রতিবন্ধক। ফলকথা, আপনাদিগের মতে যখন অবয়বী অলীক বলিয়াই নিশ্চিত, তখন আমাদিগের মতেও অবয়বি-বিষয়ে সংশয়ের উৎপত্তি না হওয়ায় ঐ বিষয়ে আর বিচার হইতে পারে না। অবয়বীর অভাব নিশ্চয় বা অলীকত্ব নিশ্চয়েই সূত্রোক্ত "বৃত্ত্যনুপপত্তি" সাক্ষাৎ প্রয়োজক। তাই ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সংশয়ানুপপত্তির্নাস্ত্যবয়বীতি"। কিন্তু সূত্রোক্ত "বৃত্ত্যনুপপত্তি" অবয়বীর অভাবনিশ্চয়ের প্রয়োজক হওয়ায় উহা পরম্পরায় সংশয়ানুপপত্তিরও প্রয়োজক বলিয়া এবং এখানে উহার উল্লেখের আবশ্যকতাবশতঃ সূত্রে ও ভাষ্যে উহা সংশয়ানুপপত্তির প্রয়োজকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে বার্ত্তিককার ও বৃত্তিকার "বৃত্ত্যনুপপত্তেরপি তর্হি সংশয়ানুপপত্তিঃ" এইরূপ সূত্রপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ন্যায়সূত্রোদ্ধার" গ্রন্থে "বৃত্ত্যনুপপত্তেরপি তর্হি ন সংশয়ঃ" এইরূপ সূত্রপাঠ দেখা যায়। কিন্তু "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" "বৃত্ত্যনুপপত্তেরপি ন সংশয়ঃ" এইরূপ ষড়াক্ষর সূত্রপাঠই গৃহীত হইয়াছে। সূত্রে "বৃত্তি" শব্দের অর্থ বর্ত্তমানতা বা অবস্থিতি ॥৩॥

ভাষ্য। তদ্বিভজতে—

অনুবাদ। তাহা বিভাগ করিতেছেন অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী কতিপয় সূত্রের দ্বারা বিশদ করিয়া বুঝাইতেছেন।

সূত্র। কৃৎস্নৈকদেশাবৃত্তিত্বাদবয়বানামবয়ব্যভাবঃ ॥

॥৭॥৪১৭॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) কৃৎস্ন ও একদেশে অর্থাৎ অবয়বীর সর্ব্বাংশে ও একাংশে অবয়বসমূহের বর্ত্তমানতার অভাববশতঃ অবয়বী নাই।

ভাষ্য। একৈকোঽবয়বো ন তাবৎ কৃৎস্নেঽবয়বিনি বর্ত্তেতে, তয়োঃ পরিমাণভেদাদবয়বান্তরসম্বন্ধাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। নাপ্যবয়ব্যেকদেশেন, ন হ্যস্যান্যেঽবয়বা একদেশভূতাঃ সন্তীতি।

অনুবাদ। (১) এক একটি অবয়ব সমস্ত অবয়বীতে থাকে না। যেহেতু সেই অবয়ব ও অবয়বীর পরিমাণের ভেদ আছে এবং (একাবয়বব্যাপ্ত ঐ অবয়বীতে) অন্য অবয়বের সম্বন্ধের অভাবের আপত্তি হয়। (২) অবয়বীর একদেশাবচ্ছেদেও অর্থাৎ এক এক অংশেও এক একটি অবয়ব থাকে না। যেহেতু এই অবয়বীর [illegible] অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন একদেশভূত অবয়ব নাই।

টিপ্পনী। "বৃত্ত্যনুপপত্তি"প্রযুক্ত অবয়বীর অভাব সিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে। এখন ঐ "বৃত্ত্যনুপপত্তি" কেন হয়? ইহা প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অবয়বীর সর্ব্বাংশে এবং একাংশেও তাহার অবয়বগুলির বৃত্তিত্ব বা বর্ত্তমানতা নাই। অর্থাৎ অবয়বীর সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়াই তাহাতে অবয়বগুলি বর্ত্তমান থাকে, ইহা যেমন বলা যায় না, তদ্রূপ অবয়বীর একাংশেই তাহার এক একটি অবয়ব বর্ত্তমান থাকে, ইহাও বলা যায় না। সুতরাং অবয়বীতে অবয়বসমূহের বর্ত্তমানতার কোনরূপ উপপত্তি না হওয়ায় অবয়বীর অভাব, অর্থাৎ অবয়বী নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, "অবয়বী" স্বীকার করিতে হইলে তাহা অবয়ববিশিষ্ট, অর্থাৎ তাহাতে তাহার অবয়বগুলি বর্ত্তমান থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন বৃক্ষকে অবয়বী এবং উহার শাখাদিকে উহার অবয়ব বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাহা হইলে বৃক্ষ শাখাদি অবয়ববিশিষ্ট অর্থাৎ বৃক্ষে শাখাদি আছে, ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে প্রশ্ন এই যে, ঐ বৃক্ষরূপ একটি অবয়বীর সর্ব্বাংশেই কি তাহার এক একটি অবয়ব থাকে? অথবা ঐ বৃক্ষরূপ অবয়বীর এক এক অংশে তাহার এক একটি অবয়ব থাকে? বৃক্ষরূপ অবয়বীর সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া তাহার এক একটি অবয়ব থাকে, ইহা বলা যায় না। কারণ, ঐ বৃক্ষরূপ অবয়বী, তাহার শাখাদি অবয়ব হইতে বৃহৎপরিমাণ। শাখাদি অবয়ব তদপেক্ষায় ক্ষুদ্রপরিমাণ। সুতরাং অবয়ব ও অবয়বীর পরিমাণের ভেদবশতঃ ঐ বৃক্ষের কোন অবয়বই সমস্ত বৃক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া তাহাতে থাকিতে পারে না। বৃক্ষের সর্ব্বাংশে তাহার কোন অবয়বেরই "বৃত্তি" অর্থাৎ বর্ত্তমানতা সম্ভব নহে। ক্ষুদ্রপরিমাণ দ্রব্য তদপেক্ষায় মহৎপরিমাণ দ্রব্যের সর্ব্বাংশে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক অবয়ব অবয়বীর সর্ব্বাংশে বর্ত্তমান আছে, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। ভাষ্যকার উক্ত পক্ষ সমর্থন করিতে আরও একটি হেতু বলিয়াছেন যে, কোন অবয়ব যদি সেই অবয়বীর সর্ব্বাংশেই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই অবয়বীতে অন্য অবয়বের সম্বন্ধাভাবের প্রসঙ্গ হয়। অতএব অবয়বীতে তাহার সর্ব্বাংশে কোন অবয়ব নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্য এই যে, যদি অবয়বীর সর্ব্বাংশেই তাহার অবয়বের বর্ত্তমানতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে যে অবয়ব অবয়বীর সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান আছে, সেই অবয়বের সহিতই ঐ অবয়বীর সম্বন্ধ স্বীকার্য্য। অন্য অবয়বের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ অবয়বী সেই এক অবয়বদ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় তাহাতে অন্য অবয়বের স্থান হইতে পারে না। কোন আসনের সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া কেহ উপবেশন করিলে তাহাতে যেমন অন্য ব্যক্তির সংযোগসম্বন্ধ সম্ভব হয় না, তদ্রূপ অবয়বীতে তাহার সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া কোন অবয়ব বর্ত্তমান থাকিলে তাহাতে অন্য অবয়বের সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। সুতরাং তাহাতে অন্য অবয়বের সম্বন্ধ নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা ত স্বীকার করা যাইবে না।

যদি পূর্ব্বোক্ত কারণে বলা যায় যে, অবয়বীর একদেশ বা একাংশেই তাহাতে অবয়বগুলি বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ এক একটি অবয়ব, ঐ অবয়বীর এক এক অংশে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ত

আর পূর্ব্বোক্ত অনুপপত্তি ও আপত্তি নাই। কিন্তু এই দ্বিতীয় পক্ষও বলা যায় না। কারণ, যে সমস্ত পদার্থকে ঐ অবয়বীর একদেশ বলিবে, ঐ সমস্ত পদার্থ ত উহার অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ সমস্ত অবয়ব ভিন্ন ইহার একদেশ বলিয়া পৃথক্ অবয়ব ত নাই। তাৎপর্য্য এই যে, কোন অবয়ব যদি অবয়বীর একদেশে থাকে, ইহা বলিতে হয়, তাহা হইলে সেই অবয়ব সেই অবয়বরূপ একদেশেই থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক অবয়বই সেই সেই অবয়বরূপ একদেশ বা অংশবিশেষেই অবয়বীতে বর্ত্তমান থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, কোন পদার্থই নিজে যেমন নিজের আধার হয় না, তদ্রূপ অন্য আধারে থাকিতেও নিজেই নিজের অবচ্ছেদকও হয় না। ফলকথা, অবয়বীর একদেশে যে অবয়ব ঐ অবয়বীতে থাকিবে, ঐ অবয়ব হইতে ভিন্ন পদার্থ যদি ঐ একদেশ হয়, তাহা হইলেই উহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু উহা হইতে ভিন্ন একদেশভূত অবয়ব ত নাই। অবশ্য বৃক্ষাদি অবয়বীর ভিন্ন ভিন্ন বহু অবয়ব আছে। কিন্তু তন্মধ্যে এক অবয়ব অন্য অবয়বরূপ একদেশে—সেই অবয়বীতে বর্ত্তমান আছে, ইহা ত বলা যাইবে না। কারণ, বৃক্ষের নিম্নস্থ শাখা উহার উচ্চস্থ শাখারূপ প্রদেশে ঐ বৃক্ষে আছে, ইহা সম্ভবই নহে। সুতরাং বৃক্ষের সেই নিম্নস্থ শাখা সেই শাখারূপ একদেশেই ঐ বৃক্ষে থাকে, ইহাই দ্বিতীয় পক্ষে বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা ত বলা যায় না। বার্ত্তিককার এই পক্ষে শেষে পূর্ব্ববৎ ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি কোন অবয়ব সেই অবয়বরূপ একদেশেই ঐ অবয়বীতে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও উহা কি সেই অবয়বের সর্ব্বাংশে অথবা একাংশে অবয়বীতে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বক্তব্য। কিন্তু পূর্ব্ববৎ উহার কোন পক্ষই বলা যাইবে না। উক্ত উভয় পক্ষেই পূর্ব্বোক্তরূপ দোষ অনিবার্য্য। সুতরাং অবয়ব অবয়বীতে তাহার একদেশে বর্ত্তমান থাকে, এই দ্বিতীয় পক্ষও কোনরূপে সমর্থন করা যায় না। সুতরাং অবয়বীতে কোনরূপেই অবয়বসমূহের বৃত্তি বা বর্ত্তমানতার উপপত্তি না হওয়ায় অবয়বী নাই, ইহাই সিদ্ধ হয় ॥৭॥

ভাষ্য। অথাবয়বেম্বেবাবয়বী বর্ত্ততে—

অনুবাদ। যদি বল, অবয়বসমূহেই অবয়বী বর্ত্তমান থাকে, (এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন)—

সূত্র। তেষু চাবৃত্তেরবয়ব্যভাবঃ ॥৮॥৪১৮॥

অনুবাদ। সেই অবয়বসমূহেও (অবয়বীর) বর্ত্তমানতা না থাকায় অবয়বী নাই।

ভাষ্য। ন তাবৎ প্রত্যবয়বং বর্ত্ততে, তয়োঃ পরিমাণভেদাৎ, দ্রব্যস্য চৈকদ্রব্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপ্যেকদেশৈঃ, সর্ব্বেষ্বন্যাবয়বাভাবাৎ। তদেবং ন যুক্তঃ সংশয়ো নাস্ত্যবয়বীতি।

অনুবাদ। প্রত্যেক অবয়বে (অবয়বী) বর্ত্তমান থাকে না। যেহেতু সেই অবয়ব ও অবয়বীর পরিমাণের ভেদ আছে এবং দ্রব্যের অর্থাৎ অবয়বী বলিয়া স্বীকৃত বৃক্ষাদি দ্রব্যের একদ্রব্যত্বের আপত্তি হয় (অর্থাৎ বৃক্ষাদিদ্রব্য তাহার প্রত্যেক অবয়বরূপ এক এক দ্রব্যে অবস্থিত হওয়ায় উহা একদ্রব্যাশ্রিত, ইহা স্বীকার করিতে হয়)। একদেশসমূহে সমস্ত অবয়বেও (এক অবয়বী) বর্ত্তমান থাকে না, যেহেতু অন্য অবয়ব নাই। (অর্থাৎ বৃক্ষাদি অবয়বীর একদেশগুলিই তাহার অবয়ব, উহা হইতে পৃথক্ কোন অবয়ব তাহার নাই)। সুতরাং এইরূপ হইলে (অবয়বি-বিষয়ে) সংশয় যুক্ত নহে, (কারণ) অবয়বী নাই।

টিপ্পনী। অবয়ববিবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, অবয়বীতে তাহার অবয়বসমূহ বর্ত্তমান থাকে, ইহা ত আমরা বলি না। কিন্তু অবয়বসমূহেই অবয়বী বর্ত্তমান থাকে, ইহাই আমরা বলি। "অবয়বী" বলিলে অবয়বের সম্বন্ধবিশিষ্ট, এই অর্থই বুঝা যায়। অবয়ব ও অবয়বীর আধারাধেয়ভাব সম্বন্ধ আছে। তন্মধ্যে অবয়বই আধার, অবয়বী আধেয়। সুতরাং অবয়বীতে তাহার অবয়বগুলি কোনরূপে বর্ত্তমান থাকিতে না পারিলেও অবয়বগুলিতেই অবয়বী বর্ত্তমান থাকে, এই সিদ্ধান্তে কোন অনুপপত্তি বা আপত্তি না থাকায় অবয়বী নাই, ইহা আর সমর্থন করা যায় না। এতদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা আবার পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহেও অবয়বীর "বৃত্তি" বা বর্ত্তমানতা সম্ভব না হওয়ায় ঐ পক্ষও বলা যায় না, সুতরাং অবয়বী নাই। অবয়বসমূহেও অবয়বীর বর্ত্তমানতা কেন সম্ভব নহে ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পূর্ব্ববৎ প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ অবয়বী তাহা হইতে ক্ষুদ্রপরিমাণ প্রত্যেক অবয়বে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। কারণ, ক্ষুদ্রপরিমাণ দ্রব্য কখনই বৃহৎপরিমাণ দ্রব্যের আধার হইতে পারে না। পরন্তু তাহা স্বীকার করিলে অবয়বীর একদ্রব্যত্ব বা একদ্রব্যাশ্রিতত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ, অবয়বগুলি পৃথক্ পৃথক্ এক একটি দ্রব্য। ঐ এক এক দ্রব্যেই যদি সম্পূর্ণ অবয়বীর বর্ত্তমানতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঐ অবয়বী যে একদ্রব্যাশ্রিত, এক দ্রব্যেই উহার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ভাষ্যে "একং দ্রব্যং আশ্রয়ো যস্য" এই অর্থে "একদ্রব্য" শব্দটি বহুব্রীহি সমাস। উহার অর্থ একদ্রব্যাশ্রিত। সুতরাং "একদ্রব্যত্ব" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—একদ্রব্যাশ্রিতত্ব। অবয়বী একদ্রব্যাশ্রিত, ইহা স্বীকার করিলে অবয়বী সেই একদ্রব্যজন্য, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহা স্বীকার করিলে দোষ কি ? ইহা বুঝাইতে বার্ত্তিককার পূর্ব্ববৎ এখানে বলিয়াছেন যে, যে অবয়বটি অবয়বীর আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিবে, ঐ অবয়বই সেই অবয়বীর জনক, ইহাই তখন বলিতে হইবে। তাহা হইলে সেই অবয়বীর সর্ব্বদা উৎপত্তির আপত্তি হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার এই আপত্তির কারণ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, একাধিক দ্রব্যের পরস্পর সংযোগেই এক অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, সেই একাধিক অবয়বরূপ দ্রব্যই সেই অবয়বীর আধার ও উপাদান-কারণ হয়, ইহা স্বীকার

করা যায়। তাহা হইলে সেই একাধিক দ্রব্যের পরস্পর সংযোগের উৎপত্তির কারণ সর্ব্বদা সম্ভব না হওয়ায় সর্ব্বদা অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা বলা যায়। কিন্তু যদি পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক অবয়বকেই অবয়বীর আশ্রয় বলিয়া ঐ স্থলে প্রত্যেক অবয়বকেই পৃথক্ ভাবে ঐ অবয়বীর উপাদান-কারণ বলিতে হয়, তাহা হইলে আর উহার উৎপত্তিতে অনেক অবয়বের সংযোগের কোন অপেক্ষা না থাকায় এক অবয়বজন্যই সর্ব্বদা সেই অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, ঐ অবয়বীর জনক সেই অবয়বমাত্র যে পর্য্যন্ত আছে, সে পর্য্যন্ত উহার উৎপত্তি কেন হইবে না? বার্ত্তিককার শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথানুসারে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য আরও বলিয়াছেন যে, অবয়ববিবাদী যে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুক নামক অবয়বীর উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, ঐ পরমাণু তাঁহার মতে নিত্য বলিয়া উহার বিনাশ নাই। সুতরাং কারণের বিনাশজন্য দ্ব্যণুকের বিনাশ হয়, ইহা তিনি বলিতে পারেন না। কারণের বিভাগজন্যই দ্ব্যণুকের নাশ হয়, ইহাও তিনি বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে ঐ দ্ব্যণুক নামক অবয়বী যদি উহার অবয়ব পরমাণুতে পৃথক্ ভাবেই বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট প্রত্যেক পরমাণুই যদি তাঁহার মতে ঐ দ্ব্যণুকের আশ্রয় হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পরমাণুই পৃথক্ ভাবে ঐ দ্ব্যণুকের উপাদান-কারণ হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আর উহাতে পরমাণুদ্বয়ের পরস্পর সংযোগের অপেক্ষা না থাকায় সংযুক্ত পরমাণুদ্বয়ের বিভাগকেও দ্ব্যণুক নাশের কারণ বলা যায় না। সুতরাং তাঁহার উক্ত পক্ষে দ্ব্যণুক নাশের কোনই কারণ সম্ভব না হওয়ায় দ্ব্যণুকের অবিনাশিত্বরূপ নিত্যত্বের আপত্তি হয়। কিন্তু দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হওয়ায় উহাকে অবিনাশী নিত্য বলা যায় না। উৎপত্তিবিশিষ্ট ভাব পদার্থ অবিনাশী, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। অবয়ববিবাদীরাও দ্ব্যণুকের অবিনাশিত্ব স্বীকার করেন না।

যদি বলা যায় যে, অবয়বী তাহার প্রত্যেক অবয়বে পৃথক্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকে না, কিন্তু সমস্ত অবয়বেই তাহার এক এক অংশের দ্বারা বর্ত্তমান থাকে। ভাষ্যকার এই দ্বিতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে পূর্ব্ববৎ বলিয়াছেন যে, অবয়বীর যে সমস্ত অবয়ব, তাহাই ত উহার একদেশ বা একাংশ এবং যাহাকে অবয়বীর একদেশ বলা হয়, তাহা উহার অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন বৃক্ষের শাখা বৃক্ষের একটি অবয়ব, উহাকেই বৃক্ষের একদেশ বলা হয়। ঐ একদেশরূপ শাখা হইতে ভিন্ন অবয়বরূপ কোন শাখা বৃক্ষে নাই। সুতরাং বৃক্ষের শাখাদি সমস্ত অবয়বে এক এক দেশে বা ঐ শাখাদিরূপ এক এক অংশে বৃক্ষরূপ অবয়বী বর্ত্তমান থাকে, ইহা বলা যায় না। উহা বলিতে হইলে ঐ সমস্ত একদেশকে বৃক্ষরূপ অবয়বীর জনক শাখাদি অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়ব বলিতে হয়। কিন্তু তাহা ত বলা যাইবে না। কারণ, বৃক্ষের একদেশ ঐ সমস্ত শাখাদি হইতে পৃথক্ কোন শাখাদি বৃক্ষে নাই। অতএব অবয়বসমূহেও যখন অবয়বীর বর্ত্তমানতা কোনরূপে সম্ভব হয় না, তখন অবয়বী নাই, অবয়বী অলীক, ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং অবয়বিবিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। অবয়ববিবাদীরাও অলীক বিষয়ে সংশয় স্বীকার করেন না ॥৮॥

সূত্র। পৃথক্ চাবয়বেভ্যোঽবৃত্তেঃ ॥১॥৪১৭॥

অনুবাদ। এবং অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ স্থানেও (অবয়বীর) "বৃত্তি" অর্থাৎ বর্ত্তমানতা না থাকায় অবয়বী নাই।

ভাষ্য। "অবয়ব্যভাব" ইতি বর্ত্ততে। ন চায়ং পৃথগবয়বেভ্যো বর্ত্ততে, অগ্রহণান্নিত্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মান্নাস্ত্যবয়বীতি।

অনুবাদ। "অবয়ব্যভাবঃ" ইহা (পূর্ব্বসূত্রে) আছে, অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্র হইতে ঐ পদটি এই সূত্রে অনুবৃত্ত হইতেছে। (সূত্রার্থ) এই অবয়বী অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ স্থানেও বর্ত্তমান নাই। যে হেতু (অন্যত্র) প্রত্যক্ষ হয় না এবং নিত্যত্বের আপত্তি হয় (অর্থাৎ অনাধার অবয়বী স্বীকার করিলে উহার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়) অতএব অবয়বী নাই।

টিপ্পনী। যদি কেহ বলেন যে, অবয়বী তাহার অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ কোন স্থানেই বর্ত্তমান থাকে, ইহাই স্বীকার করিব,—অবয়বসমূহে বর্ত্তমান না থাকিলেই যে অবয়বী অলীক, ইহা কেন হইবে? এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষসমর্থক মহর্ষি আবার এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ কোন স্থানেও অবয়বী বর্ত্তমান থাকে না, অতএব অবয়বী নাই। অবয়ব ব্যতিরেকে অন্যত্র অবয়বী নাই, ইহা কিরূপে বুঝিব? ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন,—"অগ্রহণাৎ"। অর্থাৎ অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ কোন স্থানে অবয়বীর প্রত্যক্ষ না হওয়ায় অন্যত্রও অবয়বী নাই, ইহা বুঝা যায়। বার্ত্তিককার ঐ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"অবয়বব্যতিরেকেণান্যত্র বর্ত্তমান উপলভ্যেত?" অর্থাৎ অবয়বী যদি অবয়ব ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানে তাহার প্রত্যক্ষ হউক? কিন্তু তাহা ত হয় না। অবয়ব ব্যতিরেকে কেহই অবয়বীর প্রত্যক্ষ করে না। অবয়বিবাদী পরিশেষে যদি বলেন যে, আচ্ছা, অবয়বী কোন স্থানে বর্ত্তমান না হইলেই বা ক্ষতি কি? আমরা অগত্যা অনাধার অবয়বীই স্বীকার করিব? এ জন্য ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, —"নিত্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ"। অর্থাৎ তাহা হইলে অবয়বীর নিত্যত্বাপত্তি হয়। কারণ, যে দ্রব্যের কোন আধার নাই, যাহা কোন দ্রব্যে বর্ত্তমান থাকে না, সেই অনাধার দ্রব্যের নিত্যত্বই অবয়বিবাদীরা স্বীকার করেন। যেমন গগন প্রভৃতি নিত্যদ্রব্য। কিন্তু অবয়বীর নিত্যত্ব তাঁহারাও স্বীকার করেন না। ফলকথা, অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্রূপে কোন স্থানে অবয়বীর বৃত্তি বা বর্ত্তমানতাও কোন-রূপেই উপপন্ন না হওয়ায় অবয়বিনামক জন্য দ্রব্য কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু অবয়বীর অভাব বা অলীকত্বই সিদ্ধ হয়।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদি বল, অবৃত্তি বা অনাধার অবয়বীই স্বীকার করিব? এই জন্য পূর্ব্বপক্ষসমর্থক মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা আবার বলিয়াছেন যে, অবয়ব-

সমূহ হইতে পৃথক্ অবয়বী নাই। কেন নাই? এতদুত্তরে সূত্রশেষে বলা হইয়াছে "অবৃত্তেঃ"। অর্থাৎ অবয়বীর "বৃত্তি" বা কোন স্থানে বর্ত্তমানতা না থাকায় তাহার নিত্যত্বের আপত্তি হয়। বৃত্তিকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, অথবা অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে সর্ব্বাংশে অথবা একাংশে থাকে না, কিন্তু স্বস্বরূপেই থাকে, ইহা বলিলে পূর্ব্বপক্ষবাদী এই সূত্রের দ্বারা ঐ পক্ষেও নিজ মত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ অবয়বী নাই। কারণ, "অবৃত্তেঃ" অর্থাৎ যেহেতু অবয়বীর বৃত্তি বা বর্ত্তমানতা নাই। অবয়বী কোন স্থানে বর্ত্তমান না থাকিলে উহা অনাধার দ্রব্য হওয়ায় উহার নিত্যত্বের আপত্তি হয়। বৃত্তিকার পূর্ব্বোক্ত সপ্তম ও অষ্টম সূত্রকে ভাষ্যকারের বাক্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন এবং অনেকের মতে উহা মহর্ষির সূত্র, ইহাও শেষে বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সপ্তম সূত্রের অবতারণায় ভাষ্যকার "তদিভজ্যতে" এই বাক্যের প্রয়োগ করায় এবং এই সূত্রের ভাষ্যারম্ভে অষ্টম সূত্র হইতে "অবয়ব্যভাবঃ" এই পদের অনুবৃত্তির উল্লেখ করায় সুপ্রাচীন ভাষ্যকারের মতে যে ঐ দুইটী ন্যায়সূত্র, এ বিষয়ে সংশয় হয় না। তথাপি বৃত্তিকারের যে, কেন ঐ বিষয়ে সংশয় ছিল, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। মুদ্রিত "ন্যায়বার্ত্তিক" পুস্তকে "পৃথক্ চাবয়বেভ্যোঽবয়ব্যবৃত্তেঃ" এইরূপ সূত্রপাঠ দেখা যায়॥ ৯॥

সূত্র। ন চাবয়ব্যবয়বাঃ ॥১০॥৪২০॥

অনুবাদ। অবয়বী অবয়বসমূহও নহে অর্থাৎ অবয়বসমূহে অবয়বীর ভেদের ন্যায় অভেদও আছে, ইহাও বলা যায় না।

ভাষ্য। ন চাবয়বানাং ধর্ম্মোঽবয়বী, কস্মাৎ? ধর্ম্মমাত্রস্য ধর্ম্মিভিরবয়বৈঃ পূর্ব্ববৎ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ পৃথক্ চাবয়বেভ্যো ধর্ম্মিভ্যো ধর্ম্মস্যাগ্রহণাদিতি সমানং।

অনুবাদ। অবয়বী অবয়বসমূহের ধর্ম্মমাত্রও নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু ধর্ম্মমাত্রের অর্থাৎ ধর্ম্মমাত্র বলিয়া স্বীকৃত অবয়বীর ধর্ম্মী অবয়বসমূহের সহিত পূর্ব্ববৎ সম্বন্ধের উপপত্তি হয় না এবং ধর্ম্মী অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ স্থানে ধর্ম্ম অবয়বীর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সমান অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা পূর্ব্ববৎ এই পক্ষেরও অনুপপত্তি সিদ্ধ হয়।

টিপ্পনী। কাহারও মতে অবয়বী অবয়বসমূহের ধর্ম্মমাত্র, কিন্তু উহা অবয়বসমূহ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থও নহে, অত্যন্ত অভিন্ন পদার্থও নহে। কারণ, অত্যন্ত ভিন্ন এবং অত্যন্ত অভিন্ন পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একে অপরের ধর্ম্ম বা ধর্ম্মী হয় না। ঐরূপ পদার্থদ্বয়ের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হইতে পারে না। সুতরাং অবয়বী অবয়বসমূহ হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে, কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে। তাহা হইলে অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে কথঞ্চিৎ অভেদ-সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে, ইহাও বলা যাইতে পারে। সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাদি সম্প্রদায়ও সূত্রাদি অবয়ব হইতে বস্ত্রাদি অবয়বীর আত্যন্তিক ভেদ

স্বীকার করেন নাই। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্ট প্রভৃতিও উহা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতেই উক্ত বিষয়ে নানা বিচার ও মতভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় অবয়ব ও অবয়বীর অভেদবাদী। কোন কোন সম্প্রদায় ভেদাভেদবাদী। অসৎকার্য্যবাদী সম্প্রদায় আত্যন্তিক ভেদবাদী। এখানে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনের জন্য সর্ব্বশেষে মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত মতেরও খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অবয়বী অবয়বসমূহও নহে। অর্থাৎ উহা অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন হইয়াও যে অভিন্ন, ইহাও বলা যায় না। অবশ্য অবয়বী যদি অবয়বসমূহের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে কেহ উহাকে অবয়বসমূহ হইতে কথঞ্চিৎ অভিন্নও বলিতে পারেন। কিন্তু অবয়বী অবয়বসমূহের ধর্ম্ম হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা সমর্থন করিতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত হেতুর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অবয়বী যদি অবয়বসমূহের ধর্ম্মমাত্র হয়, তাহা হইলেও ত ধর্ম্ম অবয়বসমূহে উহার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অবয়ব-সমূহে যে অবয়বী কোনরূপেই বর্ত্তমান হয় না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মী অবয়ব-সমূহের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধের উপপত্তি না হওয়ায় অবয়বী অবয়সমূহের ধর্ম্ম, ইহাও বলা যায় না। আর যদি কেহ বলেন যে, অবয়বী অবয়বসমূহের ধর্ম্মই বটে, কিন্তু উহা ধর্ম্মী অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্‌রূপে বা পৃথক্ স্থানেই বর্ত্তমান থাকে। এতদুত্তরে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মী অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ রূপে বা পৃথক্ স্থানে উহার ধর্ম্ম অবয়বীর যে প্রত্যক্ষ হয় না, এই হেতু পূর্ব্ববৎ এই মতেও তুল্য। অর্থাৎ ঐ হেতুর দ্বারা ধর্ম্ম অবয়বী যে, ধর্ম্মী অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ স্থানে বর্ত্তমান থাকে না, ইহা পূর্ব্ববৎ সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই মতেও পূর্ব্ববৎ ঐ কথা বলা যায় না। অবয়বসমূহের ধর্ম্ম অবয়বী কোন স্থানেই বর্ত্তমান থাকে না, উহার কোন আধার নাই, ইহা বলিলে পূর্ব্ববৎ উহার নিত্যত্বের আপত্তি হয়, ইহাও এখানে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন। এবং পরে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অবয়বী সমস্ত অবয়বে একদেশে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বলিলে অবয়বী অবয়বসমূহ মাত্র, ইহাই ফলতঃ স্বীকৃত হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার বার্ত্তিককারের ঐ কথার গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবয়বী অবয়বসমূহে একদেশে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বলিলে অবয়বীর সেই একদেশগুলি অবয়বসমূহে বর্ত্তমান থাকে কি না, ইহা বক্তব্য। একদেশগুলি যদি অবয়বসমূহে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ঐ একদেশগুলিই বস্তুতঃ অবয়বী, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঐ একদেশগুলি নানা পদার্থ, উহা অবয়বসমষ্টি হইতে কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। সুতরাং অবয়বী ঐ একদেশ বা অবয়বসমষ্টি মাত্র, ইহাই ফলতঃ স্বীকৃত হয়। বার্ত্তিককার সর্ব্বশেষে আরও বলিয়াছেন যে, অবয়বী এক অবয়বে একদেশে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বলিলে কোন এক অবয়বের প্রত্যক্ষ হইলেই তৎস্থানে সেই অবয়বীর প্রত্যক্ষ হউক? কিন্তু তাহা ত হয় না। যেমন বস্ত্রের অবয়ব সূত্ররাশির মধ্যে একটি সূত্রের প্রত্যক্ষ হইলে কখনই বস্ত্রের প্রত্যক্ষ হয় না।

তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্ত মতবিশেষের উল্লেখ ও সমর্থনপূর্ব্বক উহার খণ্ডনার্থ এই সূত্রের অবতারণা করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতানুসারে উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়বীতে অবয়বসমূহের ভেদের ন্যায় অভেদও আছে, ইহা বলা যায় না। কারণ, ভেদের অভাব অভেদ,

অভেদের অভাব ভেদ। সুতরাং উহা পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া কখনই একাধারে থাকিতে পারে না। পরন্তু যদি অবয়বী ও অবয়বসমূহের আত্যন্তিক অভেদই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবয়বীকে অবয়বসমূহের ধর্ম্ম বলা যায় না। কারণ, আত্যন্তিক অভিন্ন পদার্থদ্বয়ের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হইতে পারে না। সুতরাং অবয়বী ও অবয়বসমূহের আত্যন্তিক ভেদই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে অবয়বীকে অবয়বসমূহের ধর্ম্মও বলা যাইতে পারে। কারণ, যেমন আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেও কোন কোন পদার্থের কার্য্যকারণভাব স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেও কোন কোন পদার্থবিশেষের ধর্ম্মধর্ম্মিভাবও স্বীকার্য্য। সুতরাং অবয়বী অবয়বসমূহ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ, কিন্তু উহার ধর্ম্ম, ইহাই স্বীকার্য্য হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষ অনিবার্য্য। কারণ, অবয়বী যে অবয়বসমূহে কোনরূপেই বর্ত্তমান হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অবয়বী অবয়বসমূহে কোনরূপে বর্ত্তমান হইতে না পারিলে উহা অবয়বসমূহের ধর্ম্ম হইতে পারে না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবয়বী ও অবয়বসমূহ যে অভিন্ন পদার্থ, অর্থাৎ ঐ উভয়ের তাদাত্ম্য বা অভেদই সম্বন্ধ, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কেহ সূত্রকেই বস্ত্র বলিয়া এবং স্তম্ভকেই গৃহ বলিয়া বুঝে না। পরন্তু অভেদ সম্বন্ধে আধারাধেয় ভাবেরও উপপত্তি হয় না। সূত্র ও বস্ত্র অভিন্ন, কিন্তু সূত্র ঐ বস্ত্রের আধার, ইহা বলা যায় না। চতুর্থ খণ্ডে সৎকার্য্যবাদের সমালোচনায় উক্ত বিষয়ে অন্যান্য কথা দ্রষ্টব্য ॥ ১০॥

সূত্র। একস্মিন্ ভেদাভাবাদ্ভেদশব্দপ্রয়োগানুপপত্তেরপ্রশ্নঃ ॥১১॥৪২১॥

অনুবাদ। (উত্তর) এক পদার্থে ভেদ না থাকায় ভেদ শব্দ প্রয়োগের অনুপপত্তিবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত) প্রশ্ন হয় না।

ভাষ্য। কিং প্রত্যবয়বং কৃৎস্নোঽবয়বী বর্ত্ততে অথৈকদেশেনেতি নোপপদ্যতে প্রশ্নঃ। কস্মাৎ? **একস্মিন্ ভেদাভাবাদ্ভেদশব্দপ্রয়োগানুপপত্তেঃ।** কৃৎস্নমিত্যনেকস্যাশেষাভিধানং, একদেশ ইতি নানাত্বে কস্যচিদভিধানং। তাবিমৌ কৃৎস্নৈকদেশশব্দৌ ভেদবিষয়ৌ নৈকস্মিন্নুপপদ্যেতে, ভেদাভাবাদিতি।

অনুবাদ। কি প্রত্যেক অবয়বে সমস্ত অবয়বী বর্ত্তমান থাকে? অথবা একদেশ দ্বারা বর্ত্তমান থাকে? এই প্রশ্ন উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু এক পদার্থে ভেদ না থাকায় ভেদ শব্দ প্রয়োগের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, "কৃৎস্ন" এই শব্দের দ্বারা অনেক পদার্থের অশেষ কথন হয়। "একদেশ"

এই শব্দের দ্বারা নানাত্ব অর্থাৎ পদার্থের ভেদ থাকিলে কোন একটি পদার্থের কথন হয়। সেই এই "কৃৎস্ন" শব্দ ও "একদেশ" শব্দ ভেদবিষয়, একমাত্র পদার্থে উপপন্ন হয় না। কারণ, ভেদ নাই। অর্থাৎ অবয়বী একমাত্র পদার্থ, সুতরাং তাহাতে "কৃৎস্ন" শব্দ ও "একদেশ" শব্দের প্রয়োগ উপপন্ন না হওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত সপ্তম সূত্র হইতে চারি সূত্র দ্বারা অবয়বী নাই অর্থাৎ অবয়বী অলীক, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, এখন তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে এই সূত্র ও পরবর্ত্তী দ্বাদশ সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। সপ্তম সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা বলা হইয়াছে যে, অবয়বসমূহ সমস্ত অবয়বীতে বর্ত্তমান থাকে না এবং অবয়বীর একদেশেও বর্ত্তমান থাকে না, অতএব অবয়বী নাই। কিন্তু অবয়বীতে যে তাহার অবয়বসমূহ বর্ত্তমান থাকে, ইহা মহর্ষি গোতম ও তন্মতানুবর্ত্তী কাহারই সিদ্ধান্ত নহে। তাঁহাদিগের মতে সমবায়িকারণেই সমবায় সম্বন্ধে তাহার কার্য্য বর্ত্তমান থাকে। অবয়বসমূহই অবয়বীর সমবায়িকারণ। সুতরাং ঐ অবয়বসমূহেই সমবায় সম্বন্ধে অবয়বী বর্ত্তমান থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তেও পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করিবেন যে, কি প্রত্যেক অবয়বে সমস্ত অবয়বীই বর্ত্তমান থাকে? অথবা একদেশের দ্বারা বর্ত্তমান থাকে? এতজ্জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঐরূপ প্রশ্নই হয় না। কারণ, বৃক্ষাদি অবয়বীগুলি পৃথক্ পৃথক্ এক একটি পদার্থ। যে কোন একটি অবয়বীকে গ্রহণ করিয়া ঐরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। কারণ, তাহাতে ভেদ নাই। অনেক পদার্থেই পরস্পর ভেদ থাকে, একমাত্র পদার্থে উহা থাকে না। সুতরাং তাহাতে ভেদ শব্দ প্রয়োগের উপপত্তি না হওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, "কৃৎস্ন" শব্দের দ্বারা অনেক পদার্থের অশেষ বলা হইয়া থাকে। এবং "একদেশ" শব্দের দ্বারা অনেক পদার্থের মধ্যে কোন একটী বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ পদার্থ অনেক হইলে সেখানেই ঐ সমস্ত পদার্থের সমস্তকে বলিবার জন্য "কৃৎস্ন" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং ঐ স্থলে তন্মধ্যে কোন একটি পদার্থ বক্তব্য হইলেই "একদেশ" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং "কৃৎস্ন" শব্দ ও "একদেশ" শব্দ ভেদ শব্দ বা ভেদবিষয়। অর্থাৎ পদার্থের ভেদ স্থলেই ঐ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং বৃক্ষাদি এক একটি অবয়বী গ্রহণ করিয়া কোন অবয়বীতেই "কৃৎস্ন" শব্দ ও "একদেশ" শব্দের প্রয়োগ উপপন্ন হয় না। কারণ, এক পদার্থ বলিয়া ঐ অবয়বীর ভেদ নাই। যাহা বস্তুতঃ এক, তাহাতে "কৃৎস্ন" ও "একদেশ" বলা যায় না। অবশ্য এক অবয়বীরও অনেক অবয়ব থাকায় সেই অবয়বসমূহে "কৃৎস্ন" শব্দের প্রয়োগ এবং উহার মধ্যে কোন অবয়ব গ্রহণ করিয়া "একদেশ" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী যে, এক অবয়বীকেই গ্রহণ করিয়া তাহাতেই "কৃৎস্ন" শব্দ ও "একদেশ" শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক ঐরূপ প্রশ্ন করিবেন, তাহা কোনরূপেই হইতে পারে না, ইহাই উত্তরবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য।

ফলকথা, পৃথক্ পৃথক্ এক একটি অবয়বী তাহার সমবায়িকারণ অবয়বসমূহে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে। তাহাতে "কৃৎস্ন" ও "একদেশে"র কোন প্রসঙ্গ নাই। যেমন দ্রব্যে দ্রব্যত্ব জাতি এবং ঘটাদি দ্রব্যে ঘটত্বাদি জাতি নিরবচ্ছিন্নরূপেই সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ অবয়বসমূহেও অবয়বী নিরবচ্ছিন্নরূপেই সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং অবয়বী অবয়ব-সমূহেও কোনরূপে বর্ত্তমান থাকে না, ইহা বলিয়া অবয়বী নাই, অবয়বী অলীক, ইহা কখনই সমর্থন করা যায় না ॥১১॥

ভাষ্য। অন্যাবয়বাভাবান্নৈকদেশেন বর্ত্ততে ইত্যহেতুঃ—

অনুবাদ। অন্য অবয়ব না থাকায় (অবয়বী) একদেশ দ্বারা বর্ত্তমান থাকে না, ইহা অহেতু অর্থাৎ হেতু হয় না।

সূত্র। অবয়বান্তরভাবেঽপ্যবৃত্তেরহেতুঃ ॥১২॥৪২২॥*

অনুবাদ। (উত্তর) অন্য অবয়ব থাকিলেও (অবয়বীর) অবর্ত্তমানতাবশতঃ ("অবয়বান্তরাভাবাৎ" ইহা) অহেতু অর্থাৎ উহা হেতু হয় না।

ভাষ্য। অবয়বান্তরাভাবাদিতি। যদ্যপ্যেকদেশোঽবয়বান্তরভূতঃ স্যা-ত্তথাপ্যবয়বেঽবয়বান্তরং বর্ত্তেত, নাবয়বীতি। অন্যাবয়বভাবেঽপ্যবৃত্তে-রবয়বিনো নৈকদেশেন বৃত্তিরন্যাবয়বাভাবাদিত্যহেতুঃ।

বৃত্তিঃ কথমিতি চেৎ? একস্যানেকত্রাশ্রয়াশ্রিতসম্বন্ধলক্ষণা প্রাপ্তিঃ। আশ্রয়াশ্রিতভাবঃ কথমিতি চেৎ? যস্য যতোঽন্যত্রাত্মলাভানুপপত্তিঃ স আশ্রয়ঃ। ন কারণদ্রব্যেভ্যোঽন্যত্র কার্য্যদ্রব্যমাত্মানং লভতে। বিপর্য্যয়স্তু কারণদ্রব্যেষ্বিতি। নিত্যেষু কথমিতি চেৎ? অনিত্যেষু দর্শনাৎ সিদ্ধং। নিত্যেষু দ্রব্যেষু কথমাশ্রয়াশ্রিতভাব ইতি চেৎ? অনিত্যেষু দ্রব্যগুণেষু দর্শনাদাশ্রয়াশ্রিতভাবস্য নিত্যেষু সিদ্ধিরিতি।

তস্মাদবয়ব্যভিমানঃ প্রতিষিধ্যতে নিঃশ্রেয়সকামস্য, নাবয়বী, যথা রূপাদিষু মিথ্যাসঙ্কল্পো ন রূপাদয় ইতি।

অনুবাদ। "অবয়বান্তরাভাবাৎ" এই বাক্য অহেতু। (কারণ) যদিও অবয়-

* মুদ্রিত অনেক পুস্তকে এবং "ন্যায়বার্ত্তিক" ও "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" এই স্থলে "অবয়বান্তরাভাবেঽপি" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু উহা যে প্রকৃত পাঠ নহে, ইহা এই সূত্রের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায়। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও উহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

বান্তরভূত একদেশ থাকে, তাহা হইলেও অবয়বে অন্য অবয়বই থাকিতে পারে, অবয়বী থাকিতে পারে না। (সূত্রার্থ) অন্য অবয়ব থাকিলেও অবয়বীর অবর্ত্তমানতাবশতঃ (অবয়বসমূহে) অবয়বীর একদেশদ্বারা বর্ত্তমানতা নাই, (সুতরাং) "অন্যাবয়বাভাবাৎ" ইহা অহেতু [অর্থাৎ অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে একদেশ দ্বারাও বর্ত্তমান থাকে না, এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদী যে "অন্যাবয়বাভাবাৎ" এই হেতুবাক্য বলিয়াছেন, উহা হেতু হয় না। কারণ, ঐ অবয়বীর একদেশ হইতে ভিন্ন অবয়ব থাকিলেও এক অবয়বে অপর অবয়বই থাকিতে পারে, তাহাতে অবয়বী থাকিতে পারে না। সুতরাং উক্ত হেতুর দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর সাধ্যসিদ্ধি হয় না, উহা হেতুই হয় না]।

(প্রশ্ন) বৃত্তি কিরূপ,ইহা যদি বল? (উত্তর) অনেক পদার্থে এক পদার্থের আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধরূপ প্রাপ্তি অর্থাৎ সমবায়নামক সম্বন্ধ। আশ্রয়াশ্রিত ভাব কিরূপ, ইহা যদি বল? (উত্তর) যে পদার্থ হইতে অন্যত্র যাহার আত্মলাভের অর্থাৎ উৎপত্তির উপপত্তি হয় না, সেই পদার্থ তাহার আশ্রয়। কারণদ্রব্য হইতে অন্যত্র অর্থাৎ জন্য দ্রব্যের সমবায়িকারণ অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থেই জন্যদ্রব্য আত্মলাভ করে না অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কারণদ্রব্যসমূহে বিপর্য্যয় [অর্থাৎ কারণদ্রব্যসমূহ, (অবয়ব) জন্যদ্রব্যে (অবয়বীতে) উৎপন্ন হয় না, উহা হইতে অন্যত্র উৎপন্ন হয়, সুতরাং জন্যদ্রব্য কারণদ্রব্যের আশ্রয় নহে] (প্রশ্ন) নিত্যপদার্থে কিরূপ, ইহা যদি বল? (উত্তর) অনিত্য পদার্থবিশেষে দর্শনবশতঃ সিদ্ধ হয়। বিশদার্থ এই যে, (প্রশ্ন) নিত্যদ্রব্যসমূহে কিরূপে আশ্রয়াশ্রিতভাব সিদ্ধ হয়, ইহা যদি বল? (উত্তর) অনিত্য দ্রব্য ও গুণপদার্থসমূহে আশ্রয়াশ্রিতভাবের দর্শনবশতঃ নিত্য দ্রব্য ও গুণে আশ্রয়াশ্রিত ভাবের সিদ্ধি হয়।

অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তির পক্ষে অবয়বিবিষয়ে অভিমানই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অবয়বী নিষিদ্ধ হয় নাই। যেমন রূপাদি বিষয়ে মিথ্যাসংকল্পই নিষিদ্ধ হইয়াছে, রূপাদি বিষয় নিষিদ্ধ হয় নাই।

টিপ্পনী। অবয়বী তাহার নিজের সর্ব্বাবয়বে একদেশ দ্বারাও বর্ত্তমান থাকে না—এই পক্ষ সমর্থন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদী হেতুবাক্য বলিয়াছেন,—"অন্যাবয়বাভাবাৎ"। পূর্ব্বোক্ত অষ্টম সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারাও পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্য বুঝিতে পারা যায়। কারণ, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর কোন হেতুবাক্য যে হেতু হয় না, ইহা সমর্থন করিতে "অবয়বান্তরভাবেঽপ্যবৃত্তেঃ" এই কথার দ্বারা অন্য

অবয়ব থাকিলেও অবয়বী তাহার নিজের অবয়বসমূহে একদেশদ্বারা বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর "অন্যাবয়বাভাবাৎ" এই হেতুবাক্যকেই গ্রহণ করিয়া মহর্ষি যে, এই সূত্রের দ্বারা উহাকেই অহেতু বলিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকারও প্রথমে মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়া মহর্ষির এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এবং পরে ভাষ্যারম্ভে "অন্যাবয়বাভাবাৎ" এই পূর্ব্বোক্ত হেতুবাক্যের অর্থানুবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "অবয়বান্তরাভাবাদিতি"। সূত্রোক্ত "অহেতু" শব্দের পূর্ব্বে ঐ বাক্যের যোগ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির "অবয়বান্তরভাবেঽপ্যবৃত্তেঃ" এই কথার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যদিও অবয়বান্তরভূত একদেশ থাকে, তাহা হইলেও অবয়বে সেই অবয়বান্তরই থাকিতে পারে, তাহাতে অবয়বী থাকিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, অবয়বী তাহার নিজের অবয়বসমূহে একদেশ দ্বারা বর্ত্তমান থাকে না, ইহা সমর্থন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদী হেতু বলিয়াছেন,—অবয়বান্তরাভাব। অর্থাৎ অবয়বী যে সমস্ত অবয়বে একদেশ দ্বারা বর্ত্তমান থাকিবে, সেই সমস্ত অবয়বই তাহার একদেশ,উহা হইতে ভিন্ন কোন অবয়ব তাহার একদেশ নাই। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, উহা হইতে ভিন্ন কোন অবয়ব থাকিলে সেই একদেশ দ্বারা অবয়বী তাহার সর্ব্বাবয়বে বর্ত্তমান থাকিতে পারে, ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বীকার করেন। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন যে, অবয়বীর সেই সমস্ত অবয়ব ভিন্ন আর অবয়ব নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তাহা থাকিলেও ত তদ্দ্বারা অবয়বী তাহার সর্ব্বাবয়বে বর্ত্তমান হইতে পারে না। কারণ, সেই অবয়বীর পৃথক্ কোন অবয়ব স্বীকার করিলে সেই পৃথক্ অবয়বই উহার অন্যান্য অবয়বে বর্ত্তমান থাকিতে পারে; তাহাতে অবয়বী বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি অনুসারে অবয়বীর অন্য অবয়ব থাকা না থাকা, উভয় পক্ষেই অবয়বে অবয়বীর বর্ত্তমানতা সম্ভব হয় না। সুতরাং তিনি যে, অবয়বী তাহার সর্ব্বাবয়বে একদেশদ্বারাও বর্ত্তমান থাকে না, এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতে "অন্যাবয়বাভাবাৎ" এই হেতুবাক্য বলিয়াছেন, উহা হেতু হয় না।

পূর্ব্বোক্ত (১১শ ১২শ) দুই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি কেবল পূর্ব্বপক্ষবাদীর বাধক যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজমতে অবয়বীতেই তাহার অবয়বসমূহ বর্ত্তমান থাকে, অথবা অবয়বসমূহেই অবয়বী বর্ত্তমান থাকে এবং সেই বর্ত্তমানতা কিরূপ? তাহা মহর্ষি এখানে বলেন নাই। ন্যায়দর্শনের সমান তন্ত্র বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ তাহা বলিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার নিজে এখানে পরে আবশ্যক বোধে প্রশ্নপূর্ব্বক মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অনেক পদার্থে এক পদার্থের আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধরূপ যে প্রাপ্তি, তাহাই ঐ উভয়ের বৃত্তি বা বর্ত্তমানতা। "প্রাপ্তি" শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। প্রাচীন কালে সম্বন্ধ বুঝাইতে "প্রাপ্তি" শব্দের প্রয়োগ হইত। প্রকৃত স্থলে অবয়বসমূহই অবয়বীর আশ্রয়, অবয়বী তাহার আশ্রিত। সুতরাং অবয়বসমূহেই অবয়বী বর্ত্তমান থাকে। ঐ স্থলে আশ্রয় ও আশ্রিতের সম্বন্ধরূপ প্রাপ্তি সমবায় নামক সম্বন্ধ। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে লিখিয়াছেন,—"বৃত্তিরবয়বেষু আশ্রয়াশ্রিতভাবঃ সমবায়াখ্যঃ সম্বন্ধঃ।" আশ্রয়াশ্রিত ভাব কিরূপে বুঝা যায়? এতদুত্তরে ভাষ্যকার পরে

বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থে যাহার উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ যে পদার্থেই যাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই পদার্থই তাহার আশ্রয়। জন্য দ্রব্যের সমবায়িকারণ যে সমস্ত দ্রব্য অর্থাৎ ঐ জন্য দ্রব্যের অবয়বসমূহ, তাহাতেই ঐ জন্য দ্রব্য অর্থাৎ অবয়বী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; উহা হইতে অন্য কোন দ্রব্যে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং অবয়বীর সমবায়িকারণ অবয়বসমূহই তাহার আশ্রয়। কিন্তু সেই অবয়বসমূহ অবয়বী দ্রব্যে উৎপন্ন না হওয়ায় অবয়বী দ্রব্য সেই অবয়বসমূহের আশ্রয় নহে। অবয়বসমূহ ও তজ্জন্য অবয়বী দ্রব্যের এই যে আশ্রয়াশ্রিতভাব, ইহা ঐ উভয়ের সমবায়নামক সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ অবয়বসমূহে যে অবয়বী আশ্রিত বা বর্ত্তমান হয়, তাহাতে উভয়ের কোন সম্বন্ধ আবশ্যক। কিন্তু ঐ উভয়ের সংযোগসম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। কারণ, সংযোগসম্বন্ধ স্থলে দ্রব্যদ্বয়ের "যুতসিদ্ধি" থাকে অর্থাৎ অসংযুক্ত ভাবেও ঐ দ্রব্যদ্বয়ের বিদ্যমানতা থাকে। কিন্তু অবয়বসমূহ ও অবয়বীর অসম্বদ্ধ ভাবে কখনই বিদ্যমানতা সম্ভব হয় না। অবয়বসমূহ ও অবয়বীর কখনও বিভাগ হয় না। সুতরাং অবয়ব ও অবয়বীর সংযোগসম্বন্ধ কখনই উপপন্ন হয় না। তাই মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, "যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে।" "ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ" (বৈশেষিক-দর্শন, ৭ম অঃ, ২য় আঃ, ১৩শ ও ২৬শ সূত্র)। ফলকথা, অবয়বসমূহরূপ কারণ এবং অবয়বী দ্রব্যরূপ কার্য্যের অন্য কোন সম্বন্ধ উপপন্ন না হওয়ায় সমবায়সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য, ইহাই মহর্ষি কণাদের সিদ্ধান্ত। শেষোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় "উপস্কার"কার শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, উক্ত সূত্রে "কার্য্যকারণয়োঃ" এই বাক্যটি উপলক্ষণ অর্থাৎ প্রদর্শনমাত্র। উহার দ্বারা কার্য্য ও কারণ ভিন্ন অনেক পদার্থও মহর্ষি কণাদের বিবক্ষিত। কারণ, কার্য্য-কারণভাবশূন্য অনেক পদার্থেরও সমবায় সম্বন্ধেই আশ্রয়াশ্রিতভাব স্বীকার করিতে হইবে। অন্য কোন সম্বন্ধে তাহা সম্ভব হয় না। যেমন গো প্রভৃতি দ্রব্যে যে গোত্ব প্রভৃতি জাতি বিদ্যমান আছে, তাহা সমবায় ভিন্ন অন্য কোন সম্বন্ধে উপপন্ন হয় না। শঙ্কর মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে শেষে প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদের উক্তি[১] উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কথিত যুক্তি অনুসারে বিচার দ্বারা সমবায় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। এবং তিনি যে পূর্ব্বেই "প্রত্যক্ষময়ূখে" বিচার দ্বারা "সমবায়প্রতিবন্দি" নিরাস করিয়াছেন, ইহাও সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন। "সমবায়" সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে তুল্যযুক্তিতে অভাব পদার্থের "বৈশিষ্ট্য" নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধও স্বীকার করিতে হয়, এইরূপ আপত্তিও "সমবায়প্রতিবন্দি"। ভাট্ট সম্প্রদায় ঐ "বৈশিষ্ট্য" নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিতেন, ইহা বলিয়া শঙ্কর মিশ্র "উপস্কারে" উক্ত মতেরও সংক্ষেপে খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি "প্রত্যক্ষময়ূখেই" বিশেষ বিচার করিয়া, উক্ত বিষয়ে সমস্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের "তত্ত্বচিন্তামণি"র শঙ্কর মিশ্রকৃত টীকার নাম "চিন্তামণিময়ূখ"। তন্মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষখণ্ডের টীকাই "প্রত্যক্ষময়ূখ"নামে কথিত হইয়াছে; উহা শঙ্কর মিশ্রের পৃথক্ কোন গ্রন্থ নহে। মূলকথা,

১। অযুতসিদ্ধানামাধার্য্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহেতি প্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ — প্রশস্তপাদ-ভাষ্যশেষে সমবায়পদার্থনিরূপণ দ্রষ্টব্য। "অসম্বদ্ধয়োরাধারাধেয়ভাবাসিদ্ধেঃ।"—উপস্কার।

প্রকৃত স্থলে অবয়বসমূহে যে অবয়বীদ্রব্য বিদ্যমান থাকে, তাহা কোন সম্বন্ধ ব্যতীত সম্ভব হয় না। কিন্তু সংযোগাদি অন্য কোন সম্বন্ধও ঐ স্থলে স্বীকার করা যায় না। তাই মহর্ষি কণাদ সমবায় নামক অতিরিক্ত একটি নিত্যসম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত যুক্তি অনুসারে মহর্ষি গোতমও উহা স্বীকার করিয়াছেন, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। কারণ, তিনিও কণাদের ন্যায় আরম্ভ-বাদই সমর্থন করিয়াছেন এবং অসৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিয়া উপাদানকারণ ও কার্য্যের আত্যন্তিক ভেদই সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে "অনেকদ্রব্যসমবায়াৎ" (১।৩৮) ইত্যাদি সূত্রেও "সমবায়" সম্বন্ধবোধক সমবায় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদও ঐরূপ সূত্রই বলিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড—১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আরও নানা কারণে মহর্ষি গোতমও যে সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকার করিতেন, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাদি সম্প্রদায় "সমবায়" সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যসূত্রকার বলিয়াছেন,—"ন সমবায়োঽস্তি প্রমাণাভাবাৎ" (৫।৯৯)। পরবর্ত্তী সূত্রে তিনি সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা অনুমানপ্রমাণ নাই, ইহা সমর্থন করিয়া প্রমাণাভাব সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু উহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে (১২।১৩) দুই সূত্রের দ্বারাও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ প্রভৃতি সমবায় সম্বন্ধের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কণাদসূত্রোক্ত যুক্তির সমালোচনাদি করিয়া বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সমবায় সম্বন্ধ খণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের বহু আচার্য্য উক্ত বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়া সমবায় সম্বন্ধ সমর্থন করায় শঙ্করাচার্য্যের মত সমর্থনের জন্য মহানৈয়ায়িক চিৎসুখ মুনি "তত্ত্বপ্রদীপিকা" (চিৎসুখী) গ্রন্থে সমবায়সমর্থক প্রশস্তপাদ, উদয়নাচার্য্য, শ্রীধর ভট্ট, বল্লভাচার্য্য, বাদীশ্বর, সর্ব্বদেব ও শিবাদিত্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া সমবায় সম্বন্ধের কোন লক্ষণই বলা যায় না এবং তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই, ইহা বিস্তৃত সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঐ বিচার সুধীগণের অবশ্য পাঠ্য। বাহুল্যভয়ে তাঁহার সেই সমস্ত বিচারের প্রকাশ ও আলোচনা করিতে পারিলাম না।

চিৎসুখ মুনির কথার প্রত্যুত্তরে সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, সম্বন্ধিভিন্ন যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহাই সমবায়, ইহাই সমবায় সম্বন্ধের লক্ষণ বলা যাইতে পারে। গগনাদি নিত্যপদার্থে যে সম্বন্ধে অভাব পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা ঐ গগনাদিস্বরূপ ; সুতরাং উহা অভাবপদার্থের সম্বন্ধী অর্থাৎ আশ্রয় হওয়ায় নিত্যসম্বন্ধ হইলেও সম্বন্ধিভিন্ন নহে। অতএব ঐ সম্বন্ধ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। আকাশাদি বিভু পদার্থের পরস্পর নিত্য সংযোগসম্বন্ধ স্বীকার করিলে ঐ সম্বন্ধ পূর্ব্বোক্ত সমবায়-লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ নিত্য সংযোগ প্রমাণসিদ্ধ হয় না। কারণ, উহা স্বীকার করিলে নিত্য বিভাগও স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু চিৎসুখমুনির প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারা নিত্য-সংযোগ সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেও উহার সম্বন্ধত্ব স্বীকার করা যায় না। বিশিষ্টবুদ্ধির জনক না হওয়ায় উহার সম্বন্ধত্বই নাই। আর যদি উহার সম্বন্ধত্বও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সমবায়লক্ষণে সংযোগভিন্নত্ব বিশেষণ প্রবেশ করিয়াও উক্ত অতিব্যাপ্তিরূপ দোষ বারণ করা যাইতে

পারে। সমবায় সম্বন্ধের যে, কোন লক্ষণই বলা যায় না, ইহা বলা যাইতে পারে না। আর চিৎসুখমুনি যে ভাবে বিচার করিয়া সমস্ত লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলে তাঁহার ঐ সমস্ত বিচারই অসম্ভব হয়, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক।

সমবায় সম্বন্ধে প্রমাণ কি ? এতদুত্তরে নৈয়ায়িকসম্প্রদায় অনেক স্থলে সমবায়সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, ইহাই বলিয়াছেন এবং তাঁহারা উক্ত সম্বন্ধের সাধক অনুমানপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন। "ন্যায়লীলাবতী" গ্রন্থে বৈশেষিক বল্লভাচার্য্য বৈশেষিক মতে সমবায়ের প্রত্যক্ষতা অস্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে অনুমানপ্রমাণই প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" প্রভৃতি নব্য গ্রন্থেও সেইরূপ অনুমানই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অনুমান বা যুক্তির সার মর্ম্ম এই যে, গুণ, কর্ম্ম ও জাতি-বিষয়ক যে বিশিষ্ট জ্ঞান, তাহা বিশেষ্য ও বিশেষণের কোন সম্বন্ধবিষয়ক। কারণ, ঐরূপ কোন সম্বন্ধকে বিষয় না করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে না। যেমন কোন শুক্ল ঘটে চক্ষুঃসংযোগ হইলে "এই ঘট শুক্লরূপবিশিষ্ট" এইরূপ যে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে, তাহাতে ঐ ঘট ও তাহার শুক্ল রূপের কোন সম্বন্ধও অবশ্যই বিষয় হয়। কিন্তু ঘট ও তাহার রূপের কখনই বিভাগ সম্ভব না হওয়ায় ঐ উভয়ের সংযোগসম্বন্ধ কিছুতেই বলা যায় না। ঐ উভয়ের তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধও বলা যায় না। কারণ, ঘট ও তাহার রূপ অভিন্ন পদার্থ নহে। কারণ, অভিন্ন পদার্থ হইলে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষকালে উহার সেই রূপেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অন্ধ ব্যক্তিও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘট প্রত্যক্ষকালে উহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন করে না ? সুতরাং ঘট এবং তাহার রূপ ও তদ্গত রূপত্বাদি জাতি যে অভিন্ন পদার্থ, ইহা বলা যায় না ; ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট জ্ঞানে "সমবায়" নামক অতিরিক্ত একটী সম্বন্ধই বিষয় হয়, সমবায় সম্বন্ধেই ঘটে শুক্ল রূপ থাকে, ইহাই স্বীকার্য্য।

সমবায়বিরোধীদিগের চরম কথা এই যে, সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলে উহা কোন্ সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে ? কোন্ সম্বন্ধ বিষয় করিয়া তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে ? ইহাও ত বলিতে হইবে। অন্য কোন সম্বন্ধ স্বীকার করিলে সেই সম্বন্ধ আবার কোন্ সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে ? ইহাও বলিতে হইবে। এইরূপে অনন্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইলে অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য। যদি স্বরূপসম্বন্ধেই সমবায়সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, ইহাই শেষে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়, তাহা হইলে গুণ, কর্ম্ম ও জাতি প্রভৃতিও স্বরূপসম্বন্ধেই বিদ্যমান থাকে, ইহাই বলিব। অবয়ব ও অবয়বীর এবং দ্রব্য ও গুণাদির স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করিলেই উপপত্তি হইতে পারে। অতিরিক্ত একটি সমবায় নামক সম্বন্ধ কল্পনার কোন কারণই নাই। এতদুত্তরে সমবায়বাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, ঘটাদি দ্রব্যে যে রূপাদি গুণ ও কর্ম্মাদি বিদ্যমান থাকে, তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধেই থাকে বলিলে ঐ সম্বন্ধ কাহার স্বরূপ, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলা যায় না। কারণ, ঘটাদি দ্রব্যও অনন্ত, তাহার গুণকর্ম্মাদিও অনন্ত। অনন্ত পদার্থকেই স্বরূপসম্বন্ধ বলিয়া কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আমাদিগের স্বীকৃত সমবায় নামক যে অতিরিক্ত সম্বন্ধ, তাহা সর্ব্বত্র এক। সুতরাং উহা স্বাত্মক স্বরূপসম্বন্ধেই বিদ্যমান থাকে, ইহা অবশ্যই বলা যায়। কারণ, ঐ স্বরূপসম্বন্ধ

সেই এক সমবায় হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ। তাহার সম্বন্ধও উহা হইতে অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং ঐরূপ স্থলে অনবস্থা বা কল্পনাগৌরবের কোন আশঙ্কা নাই। পরন্তু যে স্থলে অন্য সম্বন্ধের বাধক আছে, অন্য কোন সম্বন্ধ সম্ভবই হয় না, সেই স্থলেই বাধ্য হইয়া স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। গুণ ও কর্ম্মাদি পদার্থের সমবায় নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধই অনুভবসিদ্ধ ও সম্ভব, সুতরাং ঐ স্থলে স্বরূপসম্বন্ধ বলা যায় না। কিন্তু অভাবপদার্থস্থলে আমরা যে স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছি, তাহা অনেক স্থলে অভাবের অনন্ত আধারস্বরূপ হইলেও স্বীকার্য্য। কারণ, ঐ স্থলে সমবায়সম্বন্ধ বলা যায় না। ঐরূপ অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ স্বীকারও করা যায় না। পরবর্ত্তী কালে নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি অভাব পদার্থের ভাট্টসম্মত "বৈশিষ্ট্য" নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরেও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রভৃতি উক্ত সম্বন্ধের অনুপপত্তি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য শঙ্কর মিশ্র যে প্রত্যক্ষময়ূখে উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া সমবায়সম্বন্ধের বাধক নিরাস করিয়া গিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে ইহাও বক্তব্য যে, সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে যদি তুল্য যুক্তিতে অভাব পদার্থের "বৈশিষ্ট্য" নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার্য্যই হয় এবং উহা প্রমাণসিদ্ধই হয়, তাহাতে সমবায়সম্বন্ধের খণ্ডন হয় না, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" গ্রন্থে রঘুনাথ শিরোমণি সমবায়সম্বন্ধ এবং উহার নানাত্ব স্বীকার করিয়াই অভাবের "বৈশিষ্ট্য" নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে ইহাও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, অভাব পদার্থের বৈশিষ্ট্য নামক সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া স্বরূপসম্বন্ধই স্বীকার করিলে সমবায়সম্বন্ধের উচ্ছেদ হয়। কারণ, সমবায় স্থলেও স্বরূপসম্বন্ধই বলা যাইতে পারে।

পরন্তু কেবল ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ই যে সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, আর কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ই উহা স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা সকলেই সমবায় সম্বন্ধের সাধক যুক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহাও সত্য নহে। প্রতিভার অবতার মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকরও ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের ন্যায় ব্যক্তি হইতে ভিন্ন জাতির সমর্থন করিয়া জাতি ও ব্যক্তির সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই[১]। তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক মহামনীষী শালিকনাথ "প্রকরণপঞ্চিকা" গ্রন্থে "জাতি-নির্ণয়" নামক তৃতীয় অধ্যায়ে বিচারপূর্ব্বক প্রভাকরের মতের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে অবয়বীর খণ্ডনে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিবিকল্পাদিরও উল্লেখ করিয়া বিচার দ্বারা খণ্ডনপূর্ব্বক অবয়বীরও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। শালিকনাথের উক্ত গ্রন্থে অবয়বী এবং সমবায়ের সমর্থনে গুরু প্রভাকরের যুক্তিই বর্ণিত হইয়াছে।

ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত কথায় অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে যে, গগনাদি নিত্য দ্রব্যের আশ্রয় কোন

১। "সমবায়শ্চ ন বয়ং কাশ্যপীয়া ইব নিত্যমপেমঃ" ইত্যাদি "প্রকরণপঞ্চিকা"—২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বৈশেষিকদর্শনের সপ্তম অধ্যায়ের শেষ সূত্রের "উপস্কার" দ্রষ্টব্য।

অবয়ব না থাকায় উহার উপাদানকারণ বা কোন কারণই নাই। সুতরাং ঐ সমস্ত দ্রব্যে আশ্রয়াশ্রিতভাব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? আশ্রয়াশ্রিতভাব না থাকিলেও ত পদার্থের সত্তা স্বীকার করা যায় না। কারণ, যে পদার্থের কোন আশ্রয় বা আধার নাই, তাহার অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। তাই ভাষ্যকার শেষে নিজেই উক্তরূপ প্রশ্ন করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, অনিত্য দ্রব্যাদিতে যখন আশ্রয়াশ্রিতভাব দেখা যায়, তখন তদ্দৃষ্টান্তে নিত্য দ্রব্যাদিতেও উহা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ দ্রব্যত্বাদি হেতুর দ্বারা উহা নিত্য দ্রব্যাদিতে অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং স্বীকার্য্য। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, গগনাদি নিত্য দ্রব্যের সমবায়সম্বন্ধে কোন আশ্রয় বা আধার না থাকিলেও কালিক সম্বন্ধে মহাকালই উহার আশ্রয় আছে। সুতরাং গগনাদি নিত্য দ্রব্যেরও আশ্রয়াশ্রিতভাব অসম্ভব নহে। কালিক সম্বন্ধে মহাকাল যে, নিত্যদ্রব্য গগনাদিরও আধার, ইহা প্রাচীন মত বলিয়া ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারাও বুঝা যায়। কারণ, উক্ত মত স্বীকার না করিলে এখানে ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় না। নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চাননও কিন্তু উক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া, তদনুসারে গঙ্গেশোক্ত ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১]। নিত্যদ্রব্যের সমবায়সম্বন্ধে আশ্রয়াশ্রিতভাব না থাকিলেও নিত্য দ্রব্য ও তদ্‌গত নিত্যগুণ পরিমাণাদির সমবায় সম্বন্ধেই আশ্রয়াশ্রিতভাব আছে। এইরূপ যে যুক্তির দ্বারা দ্রব্য ও গুণের আশ্রয়াশ্রিতভাব সিদ্ধ হয়, সেই যুক্তির দ্বারা কর্ম্ম ও জাত্যাদি পদার্থের সম্বন্ধেও আশ্রয়াশ্রিত ভাব সিদ্ধ হয়। ঘটত্বাদি জাতি ও "বিশেষ" নামক নিত্য পদার্থও উহাদিগের আশ্রয় দ্রব্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধেই বর্ত্তমান থাকে। মহর্ষি কণাদের উক্ত সিদ্ধান্ত ও তাঁহার কথিত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক ষট্‌পদার্থ যে মহর্ষি গোতমেরও সম্মত, ইহা ভাষ্যকারের উক্তির দ্বারাও সমর্থিত হয় (প্রথম খণ্ড—১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার উপসংহারে মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতএব মুমুক্ষুর পক্ষে অবয়বিবিষয়ে অভিমানই নিষিদ্ধ হইয়াছে—অবয়বী নিষিদ্ধ হয় নাই। তাৎপর্য্য এই যে, এখানে অবয়বীর বাধক যুক্তি খণ্ডিত হওয়ায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধক যুক্তি কথিত হওয়ায় অবয়বীর অসত্তা বলা যায় না এবং উহার অলীকত্বজ্ঞানকেও তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় না। তাই মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় সূত্রে অবয়বিবিষয়ে অভিমানকেই রাগাদি দোষের মূল কারণ বলিয়া, ঐ অভিমানকে বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, যেমন পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রে মিথ্যাসংকল্পের বিষয় রূপাদিকে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়া, ঐ মিথ্যাসংকল্পকেই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, রূপাদি বিষয়কে প্রতিষেধ করা হয় নাই, তদ্রূপ অবয়বিবিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ অভিমানকেই প্রতিষেধ করা হইয়াছে—অবয়বী সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিষেধ করা হয় নাই। কারণ, অবয়বী ও

১। অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্য আশ্রিতত্বমিহোচ্যতে।—ভাষাপরিচ্ছেদ। আশ্রিতত্বং সমবায়াদিসম্বন্ধেন বৃত্তিমত্ত্বং। বিশেষণতয়া নিত্যানামপি কালাদৌ বৃত্তেঃ।—বিশ্বনাথকৃত সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। "স্বরূপসম্বন্ধেন গগনাদের্বৃত্তিমত্ত্বমতেতু" ইত্যাদি। রঘুনাথ শিরোমণিকৃত ব্যাপ্তিসিদ্ধান্তলক্ষণদীধিতি।

রূপাদি বিষয় প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ। উহা পরমার্থতঃ বিদ্যমান আছে। সুতরাং উহাদিগের অসত্তা বা অলীকত্ব সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

পরবর্ত্তী বৌদ্ধসম্প্রদায় মহর্ষি গোতমের খণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত মতই বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হীনযানসম্প্রদায়ের অন্তর্গত সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থ স্বীকার করিয়াই উহাকে পরমাণুপুঞ্জ বলিতেন। তাঁহাদিগের মতে পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন পৃথক্ অবয়বী নাই। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতেরই খণ্ডন করিয়া অতিরিক্ত অবয়বীর সংস্থাপন করিয়াছেন। সেখানে মহর্ষির সূত্রের দ্বারাও উক্ত মতকেই পূর্ব্বপক্ষরূপে বুঝিতে পারা যায়। এখানে মহর্ষির পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারাও উক্ত মতেরই আবার সমর্থন ও খণ্ডন বুঝা যায়। অবশ্য বিজ্ঞানবাদীরাও অবয়বী মানিতেন না। কিন্তু তাঁহারা পরমাণুও অস্বীকার করিয়া জ্ঞানকেই একমাত্র সৎপদার্থ বলিয়া সমর্থন করিতেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই প্রকরণে বিজ্ঞানবাদীকেই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির পরবর্ত্তী সূত্র ও ভাষ্যকারের বিচারের দ্বারা তাহা বুঝা যায় না। সে যাহাই হউক, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই যে, নানা প্রকারে অবয়বীর খণ্ডন করিয়া মহর্ষি গোতম ও বাৎস্যায়নের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। বৌদ্ধ যুগে অপর কোন নৈয়ায়িক ন্যায়দর্শনের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলি রচনা করিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ কল্পনার কোন প্রমাণই নাই। ভাষ্যকারের পরবর্ত্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অবয়বীর খণ্ডন করিতে আরও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করায় তৎকালে মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষ বিচার দ্বারা ঐ সমস্ত যুক্তিও খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানেও পরে তাঁহাদিগের আর একটি বিশেষ কথার উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি অতিরিক্ত অবয়বী থাকে, তাহা হইলে উহাতে অবয়বের রূপ হইতে পৃথক্ রূপ থাকা আবশ্যক। নচেৎ উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, রূপশূন্য দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু অবয়বীতে অবয়বের রূপ হইতে পৃথক্ কোন রূপ দেখা যায় না। সুতরাং অবয়ব হইতে অতিরিক্ত অবয়বী নাই। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অবয়বীর যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তাহাতে পৃথক্ রূপও অবশ্যই আছে। অবয়বের রূপ হইতে পৃথক্ ভাবে তাহার প্রত্যক্ষ না হইলেও উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। উহা স্বীকার না করিলে অবয়বীর সার্ব্বজনীন প্রত্যক্ষের অপলাপ হয়। অবশ্য অবয়বীর প্রত্যক্ষের ন্যায় অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাহারও রূপের প্রত্যক্ষ স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই রূপপ্রযুক্তই অবয়বীর প্রত্যক্ষ বলা যায় না। কারণ, অন্য দ্রব্যের রূপপ্রযুক্ত রূপশূন্য দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইলে বৃক্ষাদি দ্রব্যের রূপপ্রযুক্ত ঐ বৃক্ষাদিগত বায়ুরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু বৃক্ষাদি অবয়বীর যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা যখন পরমাণুপুঞ্জ বা অলীক হইতেই পারে না, তখন উহাতে অবয়বের রূপ হইতে পৃথক্ রূপ অবশ্যই আছে, এবং সেই অবয়বের রূপই সেই অবয়বীর রূপের অসমবায়িকারণ, এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্যকারণভাব স্বীকার করায় পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু যিনি অবয়বীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া উহার রূপান্তর নির্দ্দেশ করিতে বলিবেন, তাঁহার

সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইবে। কারণ, অবয়বীর রূপান্তর-নির্দ্দেশ করিতে বলিলে অবয়বীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই লইতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্তহানি হওয়ায় নিগ্রহ অনিবার্য্য।

উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবয়বের রূপজন্য অবয়বীর পৃথক্ রূপ সমর্থন করিতে শেষে কোন কোন অবয়বীতে চিত্ররূপও স্বীকার করিয়াছেন। নীল পীতাদি পৃথক্ পৃথক্ বিজাতীয় রূপবিশিষ্ট সূত্রসমূহের দ্বারা যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, সেই বস্ত্ররূপ অবয়বীতে নীল পীতাদি কোন বিশেষ রূপ জন্মিতে পারে না। কারণ, উহার উপাদানকারণ সূত্রসমূহে সর্ব্বত্রই নীল পীতাদি কোন বিশেষ রূপ নাই। অব্যাপ্যবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপও জন্মিতে পারে না। কারণ, রূপ মাত্রই ব্যাপ্যবৃত্তি। অর্থাৎ রূপ নিজের আশ্রয়-দ্রব্যকে ব্যাপ্ত করিয়াই থাকে, ইহাই দেখা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রে "চিত্র" নামে বিজাতীয় ব্যাপ্যবৃত্তি একটি রূপবিশেষই জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। অন্য নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে পূর্ব্বোক্ত ঐ বস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নীল পীতাদি ভিন্ন ভিন্ন অব্যাপ্যবৃত্তি রূপবিশেষই জন্মে। সেই রূপসমষ্টিই "চিত্র" বলিয়া প্রতীত হয় এবং "চিত্র" নামে কথিত হয়। উহার কোন রূপই ঐ বস্ত্রের সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া না থাকায় ঐ সমস্ত রূপ সেখানে অব্যাপ্যবৃত্তি। উক্ত বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই এইরূপ মতভেদ আছে। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্ট "বৈয়াকরণলঘুমঞ্জুষা" গ্রন্থে শেষোক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের টীকাকার তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের পূর্ব্বে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র শেষোক্ত মতের খণ্ডন করিয়া এখানে "চিত্র" রূপেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রূপত্ব হেতুর দ্বারা নীল পীতাদি সমস্ত রূপেরই ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। রূপ কখনই অব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং নীল পীতাদি নানা রূপবিশিষ্ট সূত্রসমূহ-নির্ম্মিত বস্ত্রে "চিত্র" নামে একটি ব্যাপ্যবৃত্তি পৃথক্ রূপই আমরা স্বীকার করি। তাহা হইলে বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ঐ স্থলে অবয়বীর রূপান্তরের যে অনুপপত্তির সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও থাকে না। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার নিজমতপ্রতিপাদক "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্রের খণ্ডিত ঐ মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। উহা তাঁহারই নিজের উদ্ভাবিত নব্য মত নহে। তিনি রূপমাত্রই ব্যাপ্যবৃত্তি, এইরূপ নিয়ম অস্বীকার করিয়া পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রাদিতে সূত্রাদি অবয়বের নীল পীতাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপ-জন্য অব্যাপ্যবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন নীলপীতাদি রূপবিশেষই স্বীকার করিয়া, সেই রূপসমষ্টিই "চিত্র" বলিয়া প্রতীত ও "চিত্র" নামে কথিত হয়, ইহাই বলিয়াছেন। তিনি রূপমাত্রেরই ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব নিয়ম অস্বীকার করিয়া উক্ত মত সমর্থন করিতে "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" গ্রন্থে শেষে শাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক নীল বৃষের লক্ষণ-বোধক বচনটী[১]ও উদ্ধৃত

১। লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ।
শ্বেতঃ খুরবিষাণাভ্যাং স নীলবৃষ উচ্যতে॥

"শুদ্ধিতত্ত্বে" স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের উদ্ধৃত শঙ্খবচন। এখন প্রচলিত মুদ্রিত "শঙ্খসংহিতা"য় উক্ত বচন দেখা যায় না। "লিখিতসংহিতা"য় পারিভাষিক নীল বৃষের লক্ষণ-বোধক অন্যরূপ বচন (১৪শ) দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন। স্মৃতি ও পুরাণে অনেক স্থানে ঐ পারিভাষিক নীল বৃষের উল্লেখ দেখা যায়[১]। উহার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপের সত্তা শাস্ত্রে কথিত হওয়ায় রূপমাত্রই ব্যাপ্যবৃত্তি, এইরূপ অনুমান শাস্ত্রবাধিত, ইহাই রঘুনাথ শিরোমণির চরম বক্তব্য। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি উক্ত মত সমর্থন করিলেও জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ উহা স্বীকার করেন নাই। "তর্কামৃত" গ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং "সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী"তে বিশ্বনাথ পঞ্চানন এবং "তর্কসংগ্রহে" অন্নংভট্ট প্রভৃতি চিত্ররূপই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণির "পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণে"র টীকাকারদ্বয়ও চিত্ররূপবাদী প্রাচীন মতের যুক্তি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসু ঐ টীকাদ্বয় এবং "তর্কসংগ্রহ"-দীপিকার নীলকণ্ঠী টীকার ব্যাখ্যা "ভাস্করোদয়া" দেখিলে উক্ত বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত মতভেদের যুক্তি ও বিচার জানিতে পারিবেন॥১২॥

ভাষ্য। ''সর্ব্বাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধে''রিতি প্রত্যবস্থিতোঽপ্যেতদাহ—

অনুবাদ। "সর্ব্বাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ" (২।১।৩৪) এই সূত্রের দ্বারা (পূর্ব্বপক্ষবাদী) "প্রত্যবস্থিত" হইয়াও অর্থাৎ দৃশ্যমান ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জমাত্র, উহা হইতে ভিন্ন কোন অবয়বী নহে, এই মতে উক্ত সূত্রের দ্বারা দোষ কথিত হইলেও (পূর্ব্বপক্ষবাদী আবার) ইহা অর্থাৎ পরবর্ত্তিসূত্রোক্ত উত্তর বলিতেছেন—

সূত্র। কেশসমূহে তৈমিরিকোপলব্ধিবত্তদুপলব্ধিঃ॥ ॥১৩॥৪২৩॥

অনুবাদ। "তৈমিরিক" অর্থাৎ "তিমির" নামক নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির কেশসমূহ বিষয়ে প্রত্যক্ষের ন্যায় সেই পরমাণুসমূহের প্রত্যক্ষ হয়।

ভাষ্য। যথৈকৈকঃ কেশস্তৈমিরিকেণ নোপলভ্যতে, কেশসমূহস্তূপলভ্যতে, তথৈকৈকোঽণুর্নোপলভ্যতে, অণুসমূহস্তূপলভ্যতে, তদিদমণুসমূহবিষয়ং গ্রহণমিতি।

অনুবাদ। যেমন "তৈমিরিক" ব্যক্তি কর্ত্তৃক এক একটি কেশ প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু কেশসমূহ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ (চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক) এক একটি পরমাণু প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু পরমাণুসমূহ প্রত্যক্ষ হয়, সেই এই প্রত্যক্ষ পরমাণুসমূহবিষয়ক।

১। এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥
—"[illegible]সংহিতা" ১০ম শ্লোক। মৎস্যপুরাণ, ২২শ অ., ৬ষ্ঠ শ্লোক।

টিপ্পনী। মহর্ষি পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে "সর্ব্বাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ" এই সূত্রের দ্বারা যে যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম সূত্রের দ্বারা তাহা স্মরণ করাইয়া, পরে কতিপয় সূত্রের দ্বারা অবয়বি-বিষয়ে বাধক যুক্তির উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। এখন যিনি অবয়বী অস্বীকার করিয়া দৃশ্যমান ঘটাদি পদার্থকে পরমাণুপুঞ্জমাত্র বলিয়াই সমর্থন করিয়াছিলেন, সেই পূর্ব্বপক্ষবাদী অন্য একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা মহর্ষি-কথিত অবয়বীর সাধক পূর্ব্বোক্ত যুক্তির খণ্ডন করায়, তাহারও উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করা এখানে আবশ্যক বুঝিয়া, এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর সেই কথা বলিয়াছেন যে, যেমন যাহার চক্ষু তিমির-রোগগ্রস্ত, ঐ ব্যক্তি ক্ষীণদৃষ্টিবশতঃ একটি কেশ দেখিতে না পাইলেও কেশপুঞ্জ দেখিতে পায়, তদ্রূপ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা এক একটি পরমাণু দেখিতে না পাইলেও পরমাণুপুঞ্জ অর্থাৎ সংযুক্ত পরমাণুসমূহ দেখিতে পায়। দৃশ্যমান ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু উহা পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক। তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে "সর্ব্বাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ" (২।১।৩৪) এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যদি অবয়বী সিদ্ধ না হয় অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী না থাকে, তাহা হইলে কোন পদার্থেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণু অতীন্দ্রিয় পদার্থ; সুতরাং উহার প্রত্যক্ষ অসম্ভব। ঘটাদি পদার্থ যদি বস্তুতঃ পরমাণুমাত্রই হয়, তাহা হইলে কোনরূপেই উহার প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না। সর্ব্বজনসিদ্ধ প্রত্যক্ষের অপলাপ করাও যায় না। প্রত্যক্ষ না হইলে তন্মূলক অন্যান্য জ্ঞানও হইতে পারে না। সুতরাং ঘটাদি পদার্থ যে, পরমাণুপুঞ্জ হইতে ভিন্ন প্রত্যক্ষযোগ্য স্থূল অবয়বী, ইহা স্বীকার্য্য। মহর্ষি উহার পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা সেখানে ইহাও বলিয়া আসিয়াছেন যে, যদি বল—দূরস্থ সেনা ও বনের ন্যায় পরমাণুসমূহের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুগুলি সমস্তই অতীন্দ্রিয়। কোনরূপেই উহাদিগের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্বাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ" এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্ব-পক্ষবাদীকে মহর্ষি প্রত্যবস্থান করিলেও অর্থাৎ তাঁহার মতে দোষ বলিলেও তিনি যখন আবার অন্য একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রত্যক্ষের উপপত্তি সমর্থন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই কথারও উল্লেখ-পূর্ব্বক মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সমর্থন করা আবশ্যক। তাই মহর্ষি এখানে আবার দুইটি সূত্রের দ্বারা তাহাই করিয়াছেন। সপ্রয়োজন পুনরুক্তির নাম অনুবাদ, উহা পুনরুক্তি-দোষ নহে, ইহাও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষে মহর্ষি বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও এই সূত্রের অবতারণা করিতে "প্রত্যবস্থিতোঽপ্যেতদাহ" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োজনই ব্যক্ত করিয়াছেন বুঝা যায়। প্রথম অধ্যায়ের শেষে "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন,—"প্রত্যবস্থানং দূষণাভিধানং"। অর্থাৎ "প্রত্যবস্থান" শব্দের ফলিতার্থ দোষকথন। তাহা হইলে যাহাকে তাহার মতে দোষ বলা হয়, তাহাকে "প্রত্যবস্থিত" বলা যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বোক্ত সূত্রের দ্বারাই "প্রত্যবস্থিত" হইয়াছেন। তথাপি আবার অন্য একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তাঁহার মতে পরমাণুপুঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। "তৈমিরিক" ব্যক্তির কেশপুঞ্জবিষয়ক প্রত্যক্ষই তাঁহার সেই দৃষ্টান্ত। "সুশ্রুতসংহিতা"র উত্তরতন্ত্রের

প্রথম অধ্যায়ে এবং মাধব করের "নিদান" গ্রন্থেও "তিমির" নামক নেত্র-রোগের নিদানাদি কথিত হইয়াছে। "তিমির" শব্দের উত্তর স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়-নিষ্পন্ন "তৈমির" শব্দের দ্বারাও ঐ "তিমির" রোগ বুঝা যায়। যাহার ঐ রোগ জন্মিয়াছে, তাহাকে "তৈমিরিক" বলা হয়। তাহার ঐ রোগবশতঃ দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় ক্ষুদ্র এক একটি কেশের প্রত্যক্ষ না হইলেও অনেক কেশ সংযুক্তাবস্থায় কোন স্থানে থাকিলে সেই কেশপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইলে ক্ষুদ্র দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু স্থূল হইলে প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অন্যত্রও দেখা যায়। যেমন বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবকের ন্যায় ক্ষুদ্র অক্ষর দেখিতে পারেন না, কিন্তু স্থূল অক্ষর দেখিতে পারেন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে আমরা প্রত্যেক পরমাণু দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু অনেক পরমাণু একত্র সংযুক্ত হইলে সেই পরমাণুপুঞ্জ আমরা দেখিতে পাই। পূর্ব্বোক্ত তৈমিরিক ব্যক্তির কেশপুঞ্জ প্রত্যক্ষের ন্যায় আমাদিগের পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমাদিগের ঘটাদি পদার্থবিষয়ক যে প্রত্যক্ষ, তাহা বস্তুতঃ পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক। সুতরাং উহার অনুপপত্তি নাই। ভাষ্যকার উপসংহারে পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ মূল সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন ॥১৩॥

সূত্র। স্ববিষয়ানতিক্রমেণেন্দ্রিয়স্য পটুমন্দভাবাদ্-বিষয়গ্রহণস্য তথাভাবো নাবিষয়ে প্রবৃত্তিঃ ॥১৪॥৪২৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) নিজ বিষয়কে অতিক্রম না করিয়া ইন্দ্রিয়ের পটুতা ও মন্দতাবশতঃ বিষয়-প্রত্যক্ষের "তথাভাব" অর্থাৎ পটুতা ও মন্দতা হয়; অবিষয়ে অর্থাৎ যে পদার্থ সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হয় না।

ভাষ্য। যথাবিষয়মিন্দ্রিয়াণাং পটুমন্দভাবাদ্বিষয়গ্রহণানাং পটুমন্দভাবো ভবতি। চক্ষুঃ খলু প্রকৃষ্যমাণং নাবিষয়ং গন্ধং গৃহ্লাতি, নিকৃষ্যমাণঞ্চ ন স্ববিষয়াৎ প্রচ্যবতে। সোঽয়ং তৈমিরিকঃ কশ্চিচ্চক্ষুর্ব্বিষয়ং কেশং ন গৃহ্লাতি, গৃহ্লাতি চ কেশসমূহং, উভয়ং হ্যতৈমিরিকেণ চক্ষুষা গৃহ্যতে। পরমাণবস্ত্বতীন্দ্রিয়া ইন্দ্রিয়াবিষয়ভূতা ন কেনচিদিন্দ্রিয়েণ গৃহ্যন্তে, সমুদিতাস্তু গৃহ্যন্তে ইত্যবিষয়ে প্রবৃত্তিরিন্দ্রিয়স্য প্রসজ্যেত। ন জাত্বর্থান্তরমণুভ্যো গৃহ্যত ইতি। তে খল্বিমে পরমাণবঃ সন্নিহিতা গৃহ্যমাণা অতীন্দ্রিয়ত্বং জহতি। বিযুক্তাশ্চাগৃহ্যমাণা ইন্দ্রিয়বিষয়ত্বং ন লভন্ত ইতি। সোঽয়ং দ্রব্যান্তরানুৎপত্তাবতিমহান্ ব্যাঘাত ইত্যুপপদ্যতে দ্রব্যান্তরং, যদ্‌গ্রহণস্য বিষয় ইতি।

সঞ্চয়মাত্রং বিষয় ইতি চেৎ ? ন, সঞ্চয়স্য সংযোগভাবাত্তস্য চাতীন্দ্রিয়াশ্রয়স্যাগ্রহণাদযুক্তং। সঞ্চয়ঃ খল্বনেকস্য সংযোগঃ, স চ গৃহ্যমাণাশ্রয়ো গৃহ্যতে, নাতীন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ। ভবতি হীদমনেন সংযুক্তমিতি, তস্মাদযুক্তমেতদিতি।

গৃহ্যমাণস্যেন্দ্রিয়েণ বিষয়স্যাবরণাদ্যনুপলব্ধিকারণমুপলভ্যতে।

তস্মান্নেন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাদনুপলব্ধিরণূনাং, যথা নেন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাচ্চক্ষুষা-ঽনুপলব্ধির্গন্ধাদীনামিতি।

অনুবাদ। যথাবিষয়ে অর্থাৎ স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়েই ইন্দ্রিয়সমূহের পটুতা ও মন্দতাবশতঃ বিষয়ের প্রত্যক্ষসমূহের পটুতা ও মন্দতা হয়। যেহেতু প্রকৃষ্ট চক্ষুও নিজের অবিষয় গন্ধকে গ্রহণ করে না। নিকৃষ্ট চক্ষুও নিজ বিষয় হইতে প্রচ্যুত হয় না [অর্থাৎ উহাও কেবল তাহার নিজের গ্রাহ্য বিষয়েরই প্রত্যক্ষ জন্মায়। তাহার অগ্রাহ্য গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না]। সেই এই অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত কোন তৈমিরিক ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় একটি কেশ প্রত্যক্ষ করে না,—কিন্তু কেশসমূহ প্রত্যক্ষ করে। "অতৈমিরিক" (তিমিররোগশূন্য) ব্যক্তি কর্ত্তৃক চক্ষুর দ্বারা উভয়ই অর্থাৎ প্রত্যেকটি কেশ এবং কেশপুঞ্জ, এই উভয়ই গৃহীত হয়। কিন্তু পরমাণুগুলি সমস্তই অতীন্দ্রিয় (অর্থাৎ) ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভূতই নহে বলিয়া কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয় না। "সমুদিত" অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত বা পুঞ্জীভূত পরমাণুসমূহই গৃহীত হয়—ইহা বলিলে অবিষয়ে অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে, এমন পদার্থে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি প্রসক্ত হউক ? (কারণ, পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে) কখনও পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ গৃহীত হয় না। (পরন্তু পূর্ব্বোক্ত মতে) সেই এই সমস্ত পরমাণুগুলিই সন্নিহিত অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট হইয়া গৃহ্যমাণ (প্রত্যক্ষবিষয়) হওয়ায় অতীন্দ্রিয়ত্ব ত্যাগ করে এবং বিযুক্ত অর্থাৎ বিভক্ত বা বিশ্লিষ্ট হইয়া গৃহ্যমাণ না হওয়ায় ইন্দ্রিয়বিষয়ত্ব লাভ করে না, অর্থাৎ তখন আবার ঐ সমস্ত পরমাণুই অতীন্দ্রিয় হয়। দ্রব্যান্তরের অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি না হইলে সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ অতি মহান্ ব্যাঘাত (বিরোধ) হয়, এ জন্য যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এমন দ্রব্যান্তর (অবয়বী) উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়।

(পূর্ব্বপক্ষ) সঞ্চয়মাত্র বিষয় হয় অর্থাৎ পরমাণুগুলি প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না,

কিন্তু উহাদিগের সঞ্চয়ই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না,—(কারণ) সঞ্চয়ের সংযোগরূপতাবশতঃ এবং অতীন্দ্রিয়াশ্রিত সেই সংযোগের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় অযুক্ত। বিশদার্থ এই যে, অনেক দ্রব্যের সংযোগই সঞ্চয়, সেই সংযোগও "গৃহ্যমাণাশ্রয়" হইলেই অর্থাৎ যাহার আশ্রয় বা আধার গৃহ্যমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়, এমন হইলেই গৃহীত হয়। "অতীন্দ্রিয়াশ্রয়" অর্থাৎ যাহার আধার অতীন্দ্রিয়, এমন সংযোগ গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয় না। যেহেতু "এই দ্রব্য এই দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত" এইরূপেই (সংযোগের প্রত্যক্ষ) হয়। অতএব ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমাধানও অযুক্ত।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহ্যমাণ বিষয়েরই (কোন স্থলে) অনুপলব্ধির কারণ আবরণাদি উপলব্ধ হয় [অর্থাৎ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক কোন আবরণাদি থাকাতেই প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, যে দ্রব্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহার সম্বন্ধেই কোন স্থলে প্রত্যক্ষ-প্রতিবন্ধক আবরণের উপলব্ধি হয়। অতীন্দ্রিয় পরমাণুর সম্বন্ধে উহা বলা যায় না]।

অতএব যেমন চক্ষুর দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত নহে, তদ্রূপ পরমাণুসমূহের অপ্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বপক্ষবাদীর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তমূলক পূর্ব্বসূত্রোক্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে এই সূত্রদ্বারা সর্ব্বসম্মত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়সমূহের নিজ নিজ বিষয় ব্যবস্থিত আছে। সকল বিষয়ই সকল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য না হওয়ায় ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়ব্যবস্থা সকলেরই স্বীকৃত সত্য। সুতরাং যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রিয় পটু বা প্রকৃষ্ট হইলেই তজ্জন্য সেই বিষয়-প্রত্যক্ষও পটু বা প্রকৃষ্ট হয় এবং সেই ইন্দ্রিয় মন্দ বা নিকৃষ্ট হইলেই তজ্জন্য সেই বিষয়-প্রত্যক্ষও মন্দ বা নিকৃষ্ট হয়। কিন্তু যে বিষয় যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যই নহে, তাহাতে ঐ ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিই হয় না। ভাষ্যকার একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এখানে মহর্ষির ঐ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রকৃষ্ট চক্ষুও গন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মায় না এবং নিকৃষ্ট অর্থাৎ রোগাদিবশতঃ ক্ষীণশক্তি চক্ষুও নিজ বিষয় হইতে প্রচ্যুত হয় না। অর্থাৎ উহাও উহার নিজের অবিষয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মায় না। কারণ, ইন্দ্রিয় যেমনই হউক, কোন কালেই নিজের অবিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পটুতাবশতঃই তাহার নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষ পটু হয়। মন্দতাবশতঃই তাহার নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষ মন্দ হয়। উদ্দ্যোতকর পটু ও মন্দ প্রত্যক্ষের স্বরূপ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সামান্য, বিশেষ ও তদ্বিশিষ্ট সেই সম্পূর্ণ বিষয়টির প্রত্যক্ষই পটু প্রত্যক্ষ। আর সেই বিষয়টির সামান্যমাত্রের আলোচনই তাহার মন্দ প্রত্যক্ষ। মহর্ষি এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, তৈমিরিক ব্যক্তি একটি কেশ দেখিতে পায় না, কিন্তু

কেশপুঞ্জ দেখিতে পায়—এই দৃষ্টান্তে প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, ইহা সমর্থন করা যায় না। কারণ, কেশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ। তৈমিরিক ব্যক্তি তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্যবশতঃ একটি কেশ প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও তিমিররোগশূন্য ব্যক্তিগণ প্রত্যেক কেশ ও কেশপুঞ্জ, উভয়েরই প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং প্রত্যেক কেশ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবিষয় পদার্থ নহে। কিন্তু পরমাণুগুলি সমস্তই অতীন্দ্রিয় পদার্থ—উহা কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষ বিষয় কেশ উহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সমুদিত অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত পরমাণুসমূহের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বলিলেও ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। কারণ, যে পদার্থ কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে, তাহা পরস্পর সংযুক্ত হইলেও ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের মতে পরমাণুসমূহ ভিন্ন কোন দ্রব্যান্তরের প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ, তাঁহারা সেই দ্রব্যান্তর অর্থাৎ আমাদিগের সম্মত পৃথক্ অবয়বী স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রত্যেক পরমাণু যে অতীন্দ্রিয় পদার্থ, ইহা তাঁহারাও স্বীকার করেন। যদি তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলেও উহারা সন্নিহিত অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত হইলে তখন আর অতীন্দ্রিয় থাকে না। তখন উহারা অতীন্দ্রিয়ত্ব ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা লাভ করে। কিন্তু উহারা বিযুক্ত বা বিশ্লিষ্ট হইলে তখন আবার অতীন্দ্রিয় হয়। ভাষ্যকার এই কথার উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, পরমাণু হইতে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি অস্বীকার করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ সমাধান করিতে গেলে অতি মহান্ ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধ হয়। কারণ, অতীন্দ্রিয়ত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। উহা একাধারে কখনই থাকিতে পারে না। সুতরাং পরমাণুতে কোন সময়ে অতীন্দ্রিয়ত্ব ও কোন সময়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব কখনই সম্ভব নহে। পূর্ব্বোক্তরূপ বিরোধবশতঃ উহা কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। সুতরাং পরমাণু হইতে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই দ্রব্যান্তর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল অবয়বীই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলেও উহা হইতে ভিন্ন অবয়বীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা স্বীকারে কোন বিরোধ নাই। ফলকথা, ঘটাদি দ্রব্যের সর্ব্বজনসিদ্ধ প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে ভিন্ন অবয়বী স্বীকার্য্য, ইহাই মহর্ষির মূল বক্তব্য।

পূর্ব্বপক্ষবাদী শেষে যদি বলেন যে, পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ পরস্পর সংযুক্ত পরমাণুসমূহেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমরা বলিব যে, পরমাণুর যে সঞ্চয়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। পরমাণুগুলি সঞ্চিত বা মিলিত হইলে তখন তাহাদিগের ঐ সঞ্চয়মাত্রই প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। ভাষ্যকার শেষে এই কথারও উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, উহাও বলা যায় না। কারণ, পরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগই উহাদিগের "সঞ্চয়"; উহা ভিন্ন উহাদিগের "সঞ্চয়" বলিয়া আর কোন পদার্থ হইতে পারে না। কিন্তু ঐ সংযোগের আশ্রয় যদি অতীন্দ্রিয় পদার্থ হয়, তাহা হইলে তদাশ্রিত ঐ সংযোগেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যে সংযোগের আশ্রয় বা আধার গৃহ্যমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, সেই সংযোগেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ও হইতে পারে। কারণ, যে দ্রব্যদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ জন্মে, সেই দ্রব্যদ্বয়কে প্রত্যক্ষ করিয়াই "এই দ্রব্য

এই দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত" এইরূপে সেই সংযোগের প্রত্যক্ষ করে। সেই দ্রব্যদ্বয়ের প্রত্যক্ষ ব্যতীত ঐরূপে তদ্গত সেই সংযোগের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং পরমাণুগুলি যখন অতীন্দ্রিয়, তখন তদ্গত সংযোগেরও প্রত্যক্ষ কোনরূপেই সম্ভব নহে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত সমাধানও অযুক্ত।

পূর্ব্বপক্ষবাদী অগত্যা শেষে যদি বলেন যে, যেমন ভিত্তি প্রভৃতি কোন আবরণ বা ঐরূপ অন্য কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে সেখানে ঘটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ আবরণাদি প্রতিবন্ধকবশতঃই পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না। বস্তুতঃ পরমাণু প্রত্যক্ষের অযোগ্য বা অতীন্দ্রিয় পদার্থ নহে। উহারা পরস্পর সংযুক্ত হইলে তখন আবরণাদি প্রতিবন্ধকের অপগম হওয়ায় তখন উহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়। ভাষ্যকার শেষে উক্ত অসৎকল্পনারও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহ্যমাণ হয়, অর্থাৎ অনেক স্থানে যে পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই পদার্থেরই কোন স্থানে আবরণাদিকে অপ্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া বুঝা যায়। অর্থাৎ সেই পদার্থেরই কোন স্থানে প্রত্যক্ষ না হইলে সেখানেই প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকরূপে আবরণাদি স্বীকার করা যায়। কিন্তু যে পদার্থের কোন কালে কুত্রাপি কাহারই প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার সম্বন্ধে আবরণাদি কল্পনা করা যায় না। পরমাণুর কোন কালে কুত্রাপি কাহারই প্রত্যক্ষ না হওয়ায় উহা অতীন্দ্রিয় পদার্থ, ইহাই সিদ্ধ আছে। উহা অতীন্দ্রিয় নহে, কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উহা কোন পদার্থের দ্বারা আবৃত আছে, অথবা বিযুক্তাবস্থায় উহার প্রত্যক্ষের কোন প্রতিবন্ধক অবশ্যই থাকে, সংযুক্তাবস্থায় আবার সেই প্রতিবন্ধক থাকে না, এইরূপ কল্পনায় কিছুমাত্র প্রমাণ নাই এবং উহা অসম্ভব।

ভাষ্যকার উপসংহারে পূর্ব্বসূত্রোক্ত দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিতে মহর্ষির এই সূত্রোক্ত মূল যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অতএব যেমন চক্ষুর দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ কাহারই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত নহে, তদ্রূপ পরমাণুসমূহের যে প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাও কাহারও ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত নহে। তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি বিষয়গুলি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই নহে, এই জন্যই চক্ষুর দ্বারা কোন ব্যক্তিরই কোন কালে ঐ গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। তৈমিরিক ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্যবশতঃ যেমন একটি কেশের প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ সকল ব্যক্তিরই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্যবশতঃই চক্ষুর দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা যেমন কোনরূপেই বলা যাইবে না, তদ্রূপ সকল ব্যক্তিরই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্যবশতঃই প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাও কোনরূপেই বলা যাইবে না। কিন্তু পরমাণুগুলি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অবিষয় বা অতীন্দ্রিয় বলিয়াই কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাই স্বীকার্য্য। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২।১।৩৫শ সূত্রে) "নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাং" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মত-খণ্ডনে যে মূলযুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এই সূত্রেও ঐ মূল যুক্তিই অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বসূত্রোক্ত দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিয়া অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পরমাণুপুঞ্জবাদী তৎকালীন বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমস্ত কথারই খণ্ডন করিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১ম আ০, ৩৬শ সূত্রভাষ্যে) এবং এই সূত্রের ভাষ্যে উক্তরূপ বিচার

করিয়াছেন। কিন্তু পরমাণুপুঞ্জবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে শেষে অনেকে বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন যে, সংযুক্ত পরমাণুসমূহই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে প্রতিক্ষণে পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ হইলেও অসংযুক্ত ভাবে প্রত্যেক পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যক্ষ সম্ভবই নহে। কারণ, স্বতন্ত্রভাবে অসংযুক্ত অবস্থায় উহার কোন স্থানে সত্তাই নাই। ভদন্ত শুভগুপ্ত এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ মহাদার্শনিক শান্ত রক্ষিতের "তত্ত্বসংগ্রহ"র পঞ্জিকাকার বৌদ্ধ মহাদার্শনিক কমলশীলের উক্তির দ্বারা জানা যায়[1]। শান্ত রক্ষিতও "তত্ত্বসংগ্রহে" তাঁহার সম্মত বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্য ভদন্ত শুভগুপ্তের উক্ত মতও খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন[2]। তিনি বলিয়াছেন যে, পরমাণুসমূহ যদি সংযুক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয় এবং ঐ অবস্থায় স্বরূপতঃই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা হইলে আর উহাদিগের নিরংশত্ব থাকে না। অর্থাৎ পরমাণুসমূহের যে অংশ নাই, ইহা আর বলা যায় না। কারণ, সংযুক্ত পরমাণুসমূহেরই উৎপত্তি হইলে প্রত্যেক পরমাণুই উহার অংশ হওয়ায় উহা নিরংশ হইতে পারে না। আর যদি ঐ পরমাণুসমূহ নিরংশই হয়, তাহা হইলে উহা মূর্ত্ত হইতে পারে না। মূর্ত্ত না হইলেও উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব সংযুক্ত হইয়াই পরমাণুসমূহ উৎপন্ন হয়, ইহা বলিলে উহা সাংশ ও মূর্ত্ত, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আর উহাকে পরমাণু হইতে অভিন্ন বলা যাইবে না। পরমাণু হইতে ভিন্ন সাংশ পদার্থ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তহানি হইবে। এখানে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের "সমুদিতাস্তু গৃহ্যন্তে" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্ত মতেরও খণ্ডন হইয়াছে। কারণ, তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে পরমাণু হইতে ভিন্ন কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু পরমাণুসমূহ প্রত্যেকেই অতীন্দ্রিয় বলিয়া সংযুক্ত হইয়াও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহা স্বভাবতঃই অতীন্দ্রিয়, তাহাই আবার কোন অবস্থায় লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, ইহা কখনই সম্ভব নহে। অতীন্দ্রিয়ত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। সুতরাং পরমাণুসমূহ সংযুক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এই মতও সমর্থন করা যায় না। ভাষ্যকারের দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত বিচারের দ্বারাও উক্ত মতের খণ্ডন বুঝা যায়॥১৪॥

১। অথাপি স্যাৎ সমুদিতা এবোৎপদ্যন্তে বিনশ্যন্তি চেতি সিদ্ধান্তান্নৈকৈকপরমাণুপ্রতিভাস ইতি, যথোক্তং ভদন্ত-শুভগুপ্তেন,—"প্রত্যেকপরমাণূনাং স্বাতন্ত্র্যে নাস্তি সম্ভবঃ। অতোঽপি পরমাণূনামেকৈকাপ্রতিভাসনং" ॥ ইতি। তদেতদনুত্তরমিতি দর্শয়ন্নাহ, "সাহিত্যেনাপী"তি।—তত্ত্ব-সংগ্রহপঞ্জিকা।

২। সাহিত্যেনাপি জাতাস্তে স্বরূপেণৈবভাসিনঃ।
তাদবস্থানংশরূপত্বং নচেতাসু দশাস্বমী।
লব্ধাপচয়পর্য্যন্তং রূপং তেষাং সমস্তি চেৎ।
কথং নাম ন তে মূর্ত্তা ভবেয়ুর্বেদনাদিবৎ ॥

—তত্ত্বসংগ্রহ ।। গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ—৫৫১ পৃষ্ঠা।

সূত্র। অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গশ্চৈবমাপ্রলয়াৎ ॥ ॥১৫॥৪২৫॥

অনুবাদ। পরন্তু এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গ "প্রলয়" অর্থাৎ সর্ব্বাভাব পর্য্যন্ত (অথবা পরমাণু পর্য্যন্ত) হইবে [অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বকথিত যুক্তি অনুসারে অবয়বীর ন্যায় অবয়বেরও অবয়বে সর্ব্বথা বর্ত্তমানত্বের অভাববশতঃ অবয়বেরও অভাব সিদ্ধ হওয়ায় একেবারে সর্ব্বাভাব অথবা পরমাণুমাত্র স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষের বিষয় না থাকায় প্রত্যক্ষের অভাবে পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বকথিত "বৃত্তি-প্রতিষেধ" সম্ভবই হয় না। আশ্রয়ের অভাবে উহার অস্তিত্বই থাকে না]।

ভাষ্য। যঃ খল্ববয়বিনোঽবয়বেষু বৃত্তিপ্রতিষেধাদভাবঃ সোঽয়মবয়বস্যাবয়বেষু প্রসজ্যমানঃ সর্ব্বপ্রলয়ায় বা কল্পেত, নিরবয়বাদ্বা পরমাণুতো নিবর্ত্তেত। উভয়থা চোপলব্ধিবিষয়স্যাভাবঃ, তদভাবাদুপলব্ধ্যভাবঃ। উপলব্ধ্যাশ্রয়শ্চায়ং বৃত্তিপ্রতিষেধঃ—স আশ্রয়ং ব্যাঘ্নন্নাত্মঘাতায় কল্পত ইতি।

অনুবাদ। অবয়বসমূহে অবয়বীর বর্ত্তমানত্বের অভাবপ্রযুক্ত যে অভাব, সেই ইহা অবয়বসমূহে অবয়বের সম্বন্ধেও (বর্ত্তমানত্বের অভাবপ্রযুক্ত) প্রসজ্যমান (আপাদ্যমান) হইয়া সকল পদার্থের অভাবের নিমিত্ত সমর্থ হইবে অর্থাৎ উহা সর্ব্বাভাবেরই সাধক হইবে, অথবা নিরবয়ব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হইবে। উভয় প্রকারেই অর্থাৎ সর্ব্বাভাব অথবা পরমাণুমাত্র, এই উভয় পক্ষেই প্রত্যক্ষের বিষয়ের অভাব, সেই বিষয়াভাবপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষের অভাব হয়। কিন্তু এই "বৃত্তি-প্রতিষেধ" অর্থাৎ অবয়বীর অভাব সমর্থন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত অবয়বসমূহে অবয়বীর সর্ব্বথা বর্ত্তমানত্বাভাব প্রত্যক্ষাশ্রিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ব্যতীত উহা সম্ভবই হয় না, (সুতরাং) সেই বৃত্তিপ্রতিষেধ আশ্রয়কে (প্রত্যক্ষকে) ব্যাহত করায় আত্মনাশের নিমিত্তই সমর্থ হয়। [অর্থাৎ সর্ব্বাভাব অথবা পরমাণুমাত্র স্বীকার্য্য হইলে প্রত্যক্ষের উচ্ছেদ হওয়ায় তন্মূলক "বৃত্তিপ্রতিষেধ" সম্ভবই হয় না। কারণ, উহা নিজের আশ্রয় প্রত্যক্ষকে উচ্ছেদ করিয়া নিজেরই উচ্ছেদ করে, উহার অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং উহা অবয়বীর অভাবের সাধক হইতেই পারে না]।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থনে তাঁহার দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত মূল যুক্তির সমর্থন করিয়া, এখন তদনুসারে এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত বাধক যুক্তির খণ্ডনে তাঁহার বক্তব্য চরম কথা বলিয়াছেন যে, অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে সর্ব্বাংশেও বর্ত্তমান থাকে না, একদেশের দ্বারাও বর্ত্তমান থাকে না, অতএব অবয়বী নাই, ইত্যাদি কথার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদী যেরূপ অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গ উদ্ভাবন করিয়াছেন, ঐরূপ অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গ "প্রলয়" অর্থাৎ সর্ব্বাভাব পর্য্যন্ত হইবে। অর্থাৎ উক্তরূপ যুক্তি অনুসারে অবয়বীর ন্যায় অবয়বেরও অভাব সিদ্ধ হইলে সর্ব্বাভাবই সিদ্ধ হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে অবয়বীর অভাব সমর্থন করিয়া অবয়বের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঐ অবয়ব সম্বন্ধেও ঐরূপে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ অবয়বগুলি কোথায় কিরূপে বর্ত্তমান থাকে? যদি এক অবয়ব অন্য অবয়বে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাস্য এই যে, উহা কি সর্ব্বাংশে বর্ত্তমান থাকে, অথবা একাংশের দ্বারা বর্ত্তমান থাকে? পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে উহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে পারিবেন না। সুতরাং উক্ত যুক্তি অনুসারে অবয়বীর ন্যায় অবয়বেরও অভাব স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য। ভাষ্যকার ইহাই প্রকাশ করিতে সূত্রকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় প্রথমে বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহে অবয়বী কোনরূপেই বর্ত্তমান হইতে পারে না, এই যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অবয়বীর অভাব সমর্থন করিয়াছেন, উহা তাঁহার ঐ যুক্তি অনুসারে অবয়বসমূহে অবয়বের সম্বন্ধেও প্রসক্ত হইয়া সর্ব্বাভাবের নিমিত্ত সমর্থ হইবে অর্থাৎ উহা সর্ব্বাভাবের সাধক হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত যুক্তি অনুসারে যদি অবয়বসমূহে অবয়বীর অভাব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অবয়বসমূহে অবয়বের অভাবও সিদ্ধ হইবে। তাহা হইলে অবয়বী ও অবয়ব, উভয়ই না থাকায় একেবারে সর্ব্বাভাবই সিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, ঘটাদি অবয়বীর ন্যায় উহার অবয়ব এবং তাহার অবয়ব প্রভৃতি যে সমস্ত অবয়ব তোমাদিগের মতে সাবয়বত্ববশতঃ অবয়বী বলিয়াও স্বীকৃত, তাহা ত পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে আমরাও স্বীকার করি না। আমাদিগের মতে ঐ সমস্ত অবয়বও নাই। কিন্তু আমরা পরমাণু স্বীকার করি। আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থ সমস্তই পরমাণুপুঞ্জমাত্র। পরমাণু নিরবয়ব পদার্থ। সুতরাং তাহার অংশ না থাকায় সর্ব্বাংশ ও একাংশ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে পরমাণুর অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই কথা মনে করিয়া তদনুসারে দ্বিতীয় বিকল্প বলিয়াছেন,—"নিরবয়বাদ্বা পরমাণুতো নিবর্ত্তেত"। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহে অবয়বীর সর্ব্বথা বর্ত্তমানত্বের অনুপপত্তিবশতঃ পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অবয়বীর অভাবপ্রসঙ্গের আপত্তি করিয়াছেন, উহা (১) সর্ব্বাভাব হইতে নিবৃত্ত হইবে, অথবা (২) পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হইবে, অথবা (৩) কুত্রাপি নিবৃত্ত হইবে না, এই তিনটি পক্ষ উক্ত বিষয়ে সম্ভব হয়। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিকল্পকে আশ্রয় করিয়াই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রথম বিকল্পের অনুপপত্তি সমর্থন করিয়া, দ্বিতীয় বিকল্পের অনুপপত্তি বুঝাইতে প্রথমে লিখিয়াছেন,—"উপলক্ষণঞ্চৈতদাপ্রলয়াদিতি—আপরমাণো-

রিত্যপি দ্রষ্টব্যং।" অর্থাৎ এই সূত্রে "আপ্রলয়াৎ" এই বাক্যটি উপলক্ষণ। উহার দ্বারা পরে "আপরমাণোর্ব্বা" এই বাক্যও মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বুঝিতে হইবে। বার্ত্তিককারও এখানে পরে "নিরবয়বাদ্বা পরমাণুতো নিবর্ত্তেত" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় বিকল্পও এখানে সূত্রকারের বুদ্ধিস্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত বিকল্পদ্বয়ের উল্লেখপূর্ব্বক মহর্ষির নিগূঢ় মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত উভয় পক্ষেই প্রত্যক্ষের বিষয় না থাকায় প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না। কারণ, যদি একেবারে সর্ব্বাভাবই স্বীকৃত হয়, জগতে কোন পদার্থই না থাকে, তাহা হইলে কাহার প্রত্যক্ষ হইবে? উক্ত মতে প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক কোন জ্ঞানই ত থাকে না। আর যদি পরমাণুমাত্রই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও প্রত্যক্ষের বিষয়াভাবে প্রত্যক্ষ থাকে না। কারণ, পরমাণু অতীন্দ্রিয় পদার্থ, উহার প্রত্যক্ষ অসম্ভব। প্রত্যক্ষ না থাকিলে তন্মূলক অন্য জ্ঞানও থাকে না। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী যে, অবয়বসমূহে অবয়বীর সর্ব্বথা বর্ত্তমানত্বের অভাব বলিয়াছেন, উহা প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোনরূপেই বলা যায় না। একেবারে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে তন্মূলক অন্যান্য জ্ঞানও অসম্ভব হওয়ায় অবয়বী কি তাহার অবয়বসমূহে সর্ব্বাংশে বর্ত্তমান থাকে অথবা একাংশের দ্বারাই বর্ত্তমান থাকে? এইরূপ বিকল্পই করা যায় না। সুতরাং অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে কোনরূপেই বর্ত্তমান থাকে না, ইহা নির্দ্ধারণ করাও যায় না। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বকথিত অবয়বসমূহে অবয়বীর যে বৃত্তিপ্রতিষেধ, উহা নিজের আশ্রয় প্রত্যক্ষকে ব্যাহত করায় নিজের বিনাশেরই কারণ হয়, অর্থাৎ উহা নিজের অস্তিত্বেরই ব্যাঘাতক হয়। সুতরাং উক্ত মতে উহা অবয়বীর অভাবের সাধক কিরূপে হইবে? অর্থাৎ যে "বৃত্তি-প্রতিষেধ" প্রত্যক্ষ ব্যতীত সম্ভবই হয় না, প্রত্যক্ষ যাহার আশ্রয়, তাহা যদি ঐ প্রত্যক্ষের উচ্ছেদেরই কারণ হয়, তাহা হইলে উহার নিজের উচ্ছেদেরও কারণ হইবে। উহার অস্তিত্বই সম্ভব হইবে না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী উহাকে অবয়বীর অভাবের সাধকরূপে উল্লেখ করিতেই পারেন না। অন্যান্য কথা পরবর্ত্তী সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে॥১৫॥

ভাষ্য। অথাপি—*

সূত্র। ন প্রলয়োঽণুসদ্ভাবাৎ ॥১৬॥৪২৬॥

অনুবাদ। "প্রলয়" অর্থাৎ সর্ব্বাভাব নাই, যেহেতু পরমাণুর অস্তিত্ব আছে।

ভাষ্য। অবয়ববিভাগমাশ্রিত্য বৃত্তিপ্রতিষেধাদভাবঃ প্রসজ্যমানো নিরবয়বাৎ পরমাণোর্নিবর্ত্ততে ন সর্ব্বপ্রলয়ায় কল্পতে। নিরবয়বত্বন্তু পরমাণোর্ব্বিভাগেঽল্পতরপ্রসঙ্গস্য যতো নাল্পীয়স্তত্রাবস্থানাৎ। লোষ্টস্য

---

* "অথাপী"তি অপি চেত্যর্থঃ। অপিচ প্রলয়মভ্যুপেত্যোদ"মা প্রলয়া"দিতি, বস্তুতস্তু "ন প্রলয়োঽণুসদ্ভাবাৎ"। —তাৎপর্য্যটীকা।

১। নিরবয়বত্বে প্রমাণমাহ "নিরবয়বত্বন্তু পরমাণো"রিতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

খলু প্রবিভজ্যমানাবয়বস্যাল্পতরমল্পতমমুত্তরমুত্তরং ভবতি। স চায়মল্পতর-প্রসঙ্গো যস্মান্নাল্পতরমস্তি যঃ পরমোঽল্পস্তত্র নিবর্ত্ততে, যতশ্চ নাল্পীয়োঽস্তি, তং পরমাণুং প্রচক্ষ্মহে ইতি।

অনুবাদ। অবয়ব-বিভাগকে আশ্রয় করিয়া "বৃত্তিপ্রতিষেধ"প্রযুক্ত (অবয়ব-পরম্পরার) অভাব প্রসজ্যমান হইয়া নিরবয়ব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হয়, (সুতরাং) সর্ব্বাভাবের নিমিত্ত সমর্থ হয় না [অর্থাৎ পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহার আর পূর্ব্বোক্তরূপে "বৃত্তিপ্রতিষেধ"প্রযুক্ত অভাব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং পরমাণুর অস্তিত্ব অব্যাহত থাকায় সর্ব্বাভাব সিদ্ধ হয় না]। পরমাণুর নিরবয়বত্ব কিন্তু বিভাগ করিলে অল্পতরপ্রসঙ্গের যে দ্রব্য হইতে অতি ক্ষুদ্র নাই, সেই দ্রব্যে অবস্থানপ্রযুক্ত সিদ্ধ হয়। যেমন বিভজ্যমানাবয়ব অর্থাৎ যাহার অবয়বের বিভাগ করা হয়, সেই লোষ্টের উত্তর উত্তর অল্পতর ও অল্পতম হয়। সেই এই অল্পতরপ্রসঙ্গ, যাহা হইতে অল্পতর নাই, যাহা পরম অল্প অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহাতে নিবৃত্ত হয়। যাহা হইতে অতিক্ষুদ্র নাই, সেই পদার্থকে আমরা পরমাণু বলি।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে মহর্ষি "প্রলয়" অর্থাৎ সর্ব্বাভাব স্বীকার করিয়াই পূর্ব্বসূত্রে "আপ্রলয়াৎ" এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ যুক্তিতে পরমাণুর অভাব সিদ্ধ না হওয়ায় সর্ব্বাভাব সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্বপক্ষবাদীও পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করায় মহর্ষি তাঁহার মতে "প্রলয়" বলিতেও পারেন না। তাই মহর্ষি পরে আবার এই সূত্র দ্বারা বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ প্রলয় নাই। কারণ, পরমাণুর অস্তিত্ব আছে। ফলকথা, মহর্ষি পরে এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসূত্র-সূচিত প্রথম পক্ষ ত্যাগ করিয়া, তাঁহার বুদ্ধিস্থ দ্বিতীয় পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া, ঐ পক্ষেও পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর পূর্ব্বকথিত "বৃত্তিপ্রতিষেধে"র অনুপপত্তি সূচনা করিয়া গিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও মহর্ষির এই সূত্রানুসারেই পূর্ব্বসূত্রভাষ্যে পরে "নিরবয়বাদ্বা পরমাণুতো নিবর্ত্তেত" এই দ্বিতীয় বিকল্পের উল্লেখ করিয়া, ঐ পক্ষেও প্রত্যক্ষ সম্ভব না হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত "বৃত্তিপ্রতিষেধ" যে উপপন্নই হয় না, আশ্রয়ের ব্যাঘাতক হওয়ায় উহার যে অস্তিত্বই থাকে না, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারও সূত্রকারের ন্যূনতা পরিহারের জন্য পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ঐ সূত্রে "আপ্রলয়াৎ" এই বাক্যটি উপলক্ষণ; উহার দ্বারা উহার পরে "আপরমাণোর্ব্বা" এই বাক্যও মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, অবয়ববিভাগকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে "বৃত্তিপ্রতিষেধ"প্রযুক্ত অবয়ব-পরম্পরার যে অভাবের প্রসক্তি বা আপত্তি হয়, ঐ অভাব নিরবয়ব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় সর্ব্বাভাবের নিমিত্ত সমর্থ হয় না, অর্থাৎ উহা সর্ব্বাভাবের সাধন করিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে,

অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে কোনরূপে বর্ত্তমান হয় না অর্থাৎ অবয়বীতে সর্ব্বথা বর্ত্তমানত্বাভাবই পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বকথিত "বৃত্তিপ্রতিষেধ"। উহা স্বীকার করিলে সেই অবয়বীর অবয়বসমূহেরও বিভাগকে আশ্রয় করিয়া সেই সমস্ত অবয়বও তাহার অবয়বে কোনরূপে বর্ত্তমান হয় না, ইহা বলিয়া পূর্ব্ববৎ "বৃত্তিপ্রতিষেধ"প্রযুক্ত সেই অবয়বসমূহের অভাব সিদ্ধ হইলেও ঐ অভাব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ অবয়বের বিভাগকে আশ্রয় করিয়া সেই অবয়বের অবয়ব, তাহার অবয়ব, তাহার অবয়ব প্রভৃতি অবয়বপরম্পরাকে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত "বৃত্তিপ্রতিষেধ"প্রযুক্ত পরমাণুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবয়বপরম্পরার অভাবই সিদ্ধ হইতে পারে, পরমাণুর অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহাতে পূর্ব্বোক্ত "বৃত্তিপ্রতিষেধ" সম্ভবই হয় না। পরমাণু তাহার অবয়বে কিরূপে বর্ত্তমান হয়? এইরূপ প্রশ্নই করা যায় না। ভাষ্যকার এখানে "নিরবয়বাৎ পরমাণোর্নিবর্ত্ততে" এই বাক্যে "নিরবয়বাৎ" এই হেতুগর্ভ বিশেষণ-পদের দ্বারা পরমাণুর নিরবয়বত্ব প্রকাশ করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ে হেতু প্রকাশ করিয়াছেন। এখন যদি পরমাণুর অভাব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাভাব সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্বোক্ত মতেও পরমাণুর অস্তিত্ব অব্যাহত থাকায় সকল পদার্থেরই অভাব বলা যায় না। তাই মহর্ষি পরে আবার নিজেই বলিয়াছেন,—"ন প্রলয়োঽণুসদ্ভাবাৎ"। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন অদৃশ্য দ্ব্যণুক এবং দৃশ্য দ্রব্যের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্রব্যও অনেক স্থানে "অণু" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। অভিধানেও "লব," "লেশ", "কণ" ও "অণু" শব্দ এক পর্য্যায়ে উক্ত হইয়াছে[১]। মহর্ষি নিজেও তৃতীয় অধ্যায়ে "মহদণুগ্রহণাৎ" (১।৩১) এই সূত্রে প্রত্যক্ষযোগ্য ক্ষুদ্র দ্রব্যবিশেষ অর্থেও "অণু" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রে "অণু" শব্দ যে নিরবয়র অতীন্দ্রিয় পরমাণু তাৎপর্য্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা এখানে বক্তব্য বিষয়ে প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ৩৬শ সূত্রেও "নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাং" এই উত্তর-বাক্যে "অণু" শব্দের দ্বারা পরমাণুকেই গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং কেবল "অণু" শব্দ যে ন্যায়সূত্রে পরমাণু তাৎপর্য্যেও প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকার পূর্ব্বে যে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিয়াছেন, তাহা কিরূপে বুঝিব? পরমাণুর নিরবয়বত্ব বিষয়ে যুক্তি বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, কোন দ্রব্যের এবং তাহার অবয়বগুলির বিভাগ করিলে সেই বিভক্ত অবয়বগুলি পর পর পূর্ব্বাপেক্ষায় ক্ষুদ্র হয়। পরে যাহা হইতে আর ক্ষুদ্র নাই, যাহার আর বিভাগ হয় না, সেই দ্রব্যেই ঐ ক্ষুদ্রতরত্ব প্রসঙ্গের অবস্থান হয় অর্থাৎ সেই পর্য্যন্তই ক্ষুদ্রতরত্ব প্রসঙ্গ হয়। উহার পরে আর কোন অবয়ব না থাকায় উহা হইতে আর ক্ষুদ্রতর দ্রব্য সম্ভব হয় না, এ জন্য পরমাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝাইয়া পরমাণুর স্বরূপ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, একটি লোষ্টের অবয়বসমূহের যখন পর পর বিভাগ করা হয়, তখন প্রথম বিভক্ত অবয়ব ঐ লোষ্ট অপেক্ষায় ক্ষুদ্রতর হয়, তাহার অবয়ব উহা হইতে ক্ষুদ্রতম হয়। এইরূপে উত্তর উত্তর অর্থাৎ পর পর বিভক্ত দ্রব্যগুলি ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম হয়। এইরূপে যতই বিভাগ করা যায়, ক্রমশঃ

১। স্ত্রিয়াং মাত্রা ত্রুটিঃ পুংসি লব-লেশ-কণাণবঃ।—অমরকোষ. বিশেষ্যনিঘ্নবর্গ, ৬২ম শ্লোক।

পূর্ব্বাপেক্ষায় ক্ষুদ্র দ্রব্যই উদ্ভূত হয়। কিন্তু ঐ যে ক্ষুদ্রতর বা ক্ষুদ্রতমত্বের প্রসঙ্গ, উহার অবশ্য কোন স্থানে নিবৃত্তি আছে। ঐরূপ বিভাগ করিতে করিতে এমন স্থানে পৌঁছিবে, যাহার আর বিভাগ হয় না। সুতরাং সেই স্থানেই অর্থাৎ যে দ্রব্যের আর বিভাগ হয় না, যাহা হইতে আর ক্ষুদ্র নাই, সেই নিরবয়র দ্রব্যেই পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্রতরত্ব প্রসঙ্গের নিবৃত্তি হয়। সেই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র নিরবয়ব দ্রব্যই পরমাণু।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ চরম কল্পে পূর্ব্বসূত্রকে পূর্ব্বপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবয়বিবাদীর প্রলয় পর্য্যন্ত অবয়বাবয়বিপ্রবাহ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রলয়ে সমস্ত পৃথিব্যাদির বিনাশ হওয়ায় পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইতে পারে না। মহর্ষি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে এই সূত্র দ্বারা বলিয়াছেন যে, "প্রলয়" অর্থাৎ সমস্ত পৃথিব্যাদির নাশ হয় না। কারণ, পরমাণুর অস্তিত্ব থাকে। সুতরাং ঐ নিত্য পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয়। "ন্যায়সূত্র-বিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্যও বৃত্তিকারের এই চরম ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য মহর্ষির পূর্ব্বসূত্রটিকে পূর্ব্বপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা উত্তরপক্ষের ব্যাখ্যা করিলে মহর্ষির বক্তব্য সুগম ও সুসংগত হয়। কিন্তু মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে "চ" শব্দের প্রয়োগ করায় উহার দ্বারা তিনি যে, পূর্ব্বোক্ত মতে দোষান্তরই সূচনা করিয়াছেন অর্থাৎ অন্যরূপে পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বকথিত যুক্তি খণ্ডনের জন্যই যে তিনি ঐ সূত্রটি বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। মনে হয়, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ পূর্ব্বসূত্রে "চ" শব্দের প্রতি মনোযোগ করিয়াই উহাকে পূর্ব্বপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই। তাই পূর্ব্বোক্তরূপেই পূর্ব্বসূত্র ও এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বৃত্তিকারও প্রথমে পূর্ব্বসূত্রকে পূর্ব্বপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই ॥ ১৬ ॥

সূত্র। পরং বা ত্রুটেঃ ॥১৭॥৪২৭॥*

অনুবাদ। "ত্রুটি"র অর্থাৎ দৃশ্য দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম "ত্রসরেণু" নামক ক্ষুদ্র দ্রব্যের পরই পরমাণু।

ভাষ্য। অবয়ববিভাগস্যানবস্থানাদ্দ্রব্যাণামসংখ্যেয়ত্বাৎ ত্রুটিত্বনিবৃত্তিরিতি।

অনুবাদ। অবয়ববিভাগের অনবস্থানবশতঃ সাবয়ব দ্রব্যসমূহের অসংখ্যেয়ত্ব-প্রযুক্ত ত্রুটিত্বনিবৃত্তি হয় [অর্থাৎ যদি লোষ্ট প্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব-

---

* অথানস্ত এবায়মবয়বাবয়বিবিভাগঃ কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ "পরং বা ত্রুটেঃ"। ত্রুটিস্ত্রসরেণুরিত্যনর্থান্তরং। "জালসূর্য্যমরীচিস্থং ত্রসরেণু রজঃ স্মৃতং"। যদি ত্রুটেঃ পরং দ্বিত্রিপদকেঽবয়ববিভাগো ন ব্যবতিষ্ঠতে, ততোঽবয়ববিভাগস্যানবস্থানাদ্দ্রব্যাণামসংখ্যেয়ত্বাৎ ত্রুটিত্বনিবৃত্তিঃ, ত্রুটিরপি সুমেরুণা তুল্যপরিমাণঃ স্যাৎ। ন খল্বনন্তাবয়বত্বে কশ্চিদ্বিশেষ ইত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

বিভাগের কোন স্থানে অবস্থান না হয়, যদি ঐ বিভাগের শেষই না থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত দ্রব্য অসংখ্যেয় অর্থাৎ অনন্তাবয়ব হওয়ায় যাহা "ত্রুটি" নামক দৃশ্য ক্ষুদ্র দ্রব্য, উহার ত্রুটিত্বই থাকে না]।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত সিদ্ধান্তে অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে যে, অবয়বাবয়বিবিভাগ অনন্ত, অর্থাৎ উহার অন্ত বা শেষ নাই, ইহা কেন বলা যায় না? অর্থাৎ সমস্ত অবয়বেরই বিভাগ থাকায় সমস্ত অবয়বেরই অবয়ব আছে। সুতরাং যাহা পরমাণু বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, তাহারও অবয়ব আছে এবং ঐ অবয়বেরও অবয়ব আছে। এইরূপে অবয়ববিভাগের কুত্রাপি বিশ্রাম বা নিবৃত্তি না থাকিলে নিরবয়ব পরমাণু কিরূপে সিদ্ধ হইবে? মহর্ষি এই জন্যই শেষে আবার এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "অণু" অর্থাৎ পরমাণুর পরিচয় প্রকাশ করিয়া, তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তে যুক্তি সূচনা করিতে বলিয়াছেন যে, "ত্রুটি"র পরই পরমাণু। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পরমাণুই এই সূত্রে মহর্ষির লক্ষ্য। তাই এই সূত্রে "পর" শব্দের দ্বারা ঐ পরমাণুরই পরিচয় সূচিত হইয়াছে বুঝা যায়। এবং "পর" শব্দের দ্বারা মহর্ষির মতে "ত্রুটি"ই যে পরমাণু নহে, উহার পরে উহা হইতে ভিন্ন পদার্থই পরমাণু, ইহাও সূচিত হইয়াছে। "বা" শব্দের অর্থ এখানে অবধারণ। উহার দ্বারা "ত্রুটি"র অবয়ববিভাগের যে বিশ্রাম বা নিবৃত্তি আছে, তাহার অবধারণ করা হইয়াছে। "ত্রুটি" শব্দের দ্বারা ঐ অবধারণের যুক্তি সূচিত হইয়াছে। অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র দ্রব্যবিশেষকে "ত্রুটি" বলা হয়, উহারও অবয়ব বিভাগের যদি কুত্রাপি বিশ্রাম বা নিবৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে উহাকে "ত্রুটি"ই বলা যায় না, উহার ত্রুটিত্বই থাকে না। মহর্ষি "ত্রুটি" শব্দের দ্বারাই পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তির সূচনা করিয়া নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ যুক্তি প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়ববিভাগের যদি অবস্থান অর্থাৎ কোন স্থানে অবস্থিতি বা বিশ্রাম না থাকে, অর্থাৎ যদি "ত্রুটি" নামক ক্ষুদ্র দ্রব্যেরও অবয়বের অবয়ব, তাহার অবয়ব, তাহার অবয়ব, এইরূপে অনন্ত অবয়ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাবয়ব দ্রব্যমাত্রেরই অসংখ্য অবয়ব হওয়ায় অসংখ্যেয়তাবশতঃ ত্রুটিত্বই থাকে না। বার্ত্তিককার উক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়ববিভাগ অনন্ত হইলে যাহা "ত্রুটি" নামক ক্ষুদ্র দ্রব্য, তাহা "অমেয়" হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সংখ্যা, পরিমাণ ও গুরুত্ববিশিষ্ট "ত্রুটি" নামক দ্রব্যে কিরূপ গুরুত্ব আছে ও কত সংখ্যক পরমাণুর দ্বারা উহা গঠিত হইয়াছে, ইহা অবধারণ করা যায় না। কারণ, উহার অন্তর্গত পরমাণুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায় না। সুতরাং যেমন অসংখ্য পরমাণুর দ্বারা গঠিত হিমালয় পর্ব্বত অমেয়, তদ্রূপ ত্রুটিও অমেয় হইয়া পড়ে। কিন্তু "ত্রুটি"ও যে, হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় অসংখ্য পরমাণুগঠিত, সুতরাং অমেয়, ইহা ত কেহই বলিতে পারেন না। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র মহর্ষির যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যদি "ত্রুটি" অর্থাৎ "ত্রসরেণু" নামক ক্ষুদ্র দ্রব্যের পরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবয়বেই অবয়ব-বিভাগ ব্যবস্থিত না হয়, তাহা হইলে উহার অনবস্থানপ্রযুক্ত সাবয়ব দ্রব্যসমূহ অসংখ্যেয় বা অনন্তাবয়ববিশিষ্ট হওয়ায় "ত্রুটি"র ত্রুটিত্বই থাকে না এবং তাহা হইলে ত্রুটিও সুমেরু পর্ব্বতের সহিত তুল্যপরিমাণ হইয়া পড়ে। কারণ, উক্ত মতে সুমেরু পর্ব্বতের

অবয়বপরম্পরার যেমন সংখ্যা করা যায় না, উহার অন্ত নাই, তদ্রূপ "ত্রুটি"রও অবয়বপরম্পরার অন্ত না থাকিলে সুমেরু ও ত্রুটির পরিমাণগত কোন বিশেষ থাকে না। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র শারীরকভাষ্যের "ভামতী" টীকাতেও (২।২।১১) "পরমাণুকারণবাদ" বুঝাইতে পরমাণুর নিরবয়বত্ব সমর্থনে বলিয়াছেন যে, পরমাণুর অবয়ব থাকিলে অনন্তাবয়বত্ববশতঃ সুমেরু পর্ব্বত ও রাজসর্ষপের তুল্যপরিমাণাপত্তি হয়। পরমাণুকারণবাদ সমর্থন করিতে অন্যান্য গ্রন্থকারও পরমাণুর সাবয়বত্বপক্ষে উক্ত চরম আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। (চতুর্থ খণ্ড, ২৭শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কেহ কেহ এই সূত্রোক্ত "ত্রুটি" শব্দের অর্থ দ্ব্যণুক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, ত্রুটির পরই অর্থাৎ দ্ব্যণুকের অর্দ্ধাংশই পরমাণু। অবশ্য এই ব্যাখ্যায় প্রকৃতার্থ সুগম হয়। কিন্তু "ত্রুটি" শব্দের দ্ব্যণুক অর্থে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি প্রামাণিক ব্যাখ্যাকারগণ ত্রসরেণুকেই ত্রুটি বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে যে দ্ব্যণুক নামক দ্রব্য জন্মে, ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে ত্রসরেণু নামক দৃশ্য দ্রব্য জন্মে। গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্য্যকিরণের মধ্যে যে সূক্ষ্ম রেণু দেখা যায়, তাহাকেই মন্বাদি ঋষিগণ ত্রসরেণু বলিয়াছেন। মনুসংহিতায় ঐ পরিমাণকে দৃশ্য পরিমাণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বলিয়া কথিত হইয়াছে[১]। পরে আট ত্রসরেণু এক লিক্ষা, তিন লিক্ষা রাজসর্ষপ, তিন রাজসর্ষপ গৌর সর্ষপ, ইত্যাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণবিশেষের সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও ঐরূপ নানা পরিমাণের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও প্রথমে গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্য্যকিরণের মধ্যস্থ দৃশ্যমান রেণুকেই ত্রসরেণু বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অপরার্ক টীকা ও "বীরমিত্রোদয়" নিবন্ধে উক্ত বচনের ব্যাখ্যায় ন্যায়-বৈশেষিক-শাস্ত্র-সম্মত ত্রসরেণুই যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে[২]। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও এখানে তাঁহার কথিত ত্রসরেণুর স্বরূপ ব্যক্ত করিতে যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ বচনের পূর্ব্বার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে দ্রব্যের পরিমাণ বা গুরুত্ববিশেষেরই "ত্রসরেণু" প্রভৃতি পরিভাষা উক্ত হইয়াছে[৩] এবং শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন কালবিশেষের

১। জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥—মনুসংহিতা, ৮ম অঃ. ১৩২ শ্লোক।

২। জালসূর্য্যমরীচিস্থং ত্রসরেণু রজঃ স্মৃতং।
তেঽষ্টৌ লিক্ষা তু তাস্তিস্রো রাজসর্ষপ উচ্যতে॥—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, আচার অধ্যায়, রাজধর্ম্ম-প্রকরণ—৩৬০ম শ্লোক।

গবাক্ষপ্রবিষ্টাদিত্যকিরণেষু যৎ সূক্ষ্মং বৈশেষিকোক্তনীত্যা দ্ব্যণুকত্রয়ারব্ধং দৃশ্যতে রজঃ, তৎ ত্রসরেণুরিতি মন্বাদিভিঃ স্মৃতং॥—অপরার্ক টীকা।

গবাক্ষপ্রবিষ্টাদিত্যকিরণেষু যৎ সূক্ষ্মং বৈশেষিকোক্তরীত্যা দ্ব্যণুকত্রয়ারব্ধং রজো দৃশ্যতে তৎ ত্রসরেণুরিতি মন্বাদিভিঃ স্মৃতং॥—বীরমিত্রোদয়, ২৯৪ পৃষ্ঠা।

৩। "জালান্তরগতৈঃ সূর্য্যকরৈর্বংশী বিলোক্যতে।
ত্রসরেণুশ্চ বিজ্ঞেয়স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ।
ত্রসরেণোস্তু পর্য্যায়নাম্না বংশী নিগদ্যতে"॥—পরিভাষাপ্রদীপ. ১ম খণ্ড॥

স্বরূপ বুঝাইতে ঐ কালের পরমাণু, অণু, ত্রসরেণু ও ত্রুটি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও প্রথম শ্লোকে[১] জন্য দ্রব্যের চরম অংশকে পরমাণু বলিয়া পার্থিবাদি পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। টীকাকার বীর রাঘবাচার্য্য প্রভৃতি কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিলেও প্রাচীন টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী, বিজয়ধ্বজতীর্থ, বল্লভাচার্য্য এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উক্ত শ্লোকে "পরমাণু" শব্দের দ্বারা কাল ভিন্ন পার্থিবাদি পরমাণুই গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রচলিত ন্যায়-বৈশেষিক মতানুসারে গবাক্ষরন্ধ্রে দৃশ্যমান ত্রসরেণুর ষষ্ঠ অংশই যে পরমাণু, ইহাও ঐ স্থানে লিখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত শ্লোকের চতুর্থ পাদে "নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ" এই বাক্যের দ্বারা শ্রীধর স্বামী পরমাণুসমূহকেই এক অবয়বী বলিয়া ভ্রম হয়, বস্তুতঃ পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন পৃথক্ কোন অবয়বী নাই, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পঞ্চম স্কন্ধের "যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ" এই[২] বাক্যের দ্বারা যে অবয়বীর নিরাকরণপূর্ব্বক উক্ত সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া তাঁহার উক্তরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার টীকার ব্যাখ্যা করিতে "দীপিনী" টীকায় রাধারমণদাস গোস্বামীও উক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বল্লভাচার্য্য ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি টীকাকারগণ উক্ত শ্লোকের চতুর্থ পাদের অন্যরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা পরমাণুসমষ্টিকেই যে অবয়বী বলিয়া ভ্রম হইতেছে, বস্তুতঃ উহা হইতে ভিন্ন অবয়বী নাই, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে অদ্বৈতমতানুসারেই পরমাণুসমূহকে অবিদ্যাকল্পিত বলা হইয়াছে, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। এবং উক্ত শ্লোকের চতুর্থ পাদে "যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ" এই বাক্যের দ্বারা যে, পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন অবয়বীর অসত্তাই কথিত হইয়াছে, ইহাও নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন করা যায় না। পরন্তু পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী না থাকিলে ঘটাদি বাহ্য পদার্থের যে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও স্মরণ করা আবশ্যক। বেদান্তদর্শনেও "নাভাব উপলব্ধেঃ" (২।২।২৮) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বাহ্য পদার্থের অলীকত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্তদর্শনের ঐ সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারাও ঘটাদি অবয়বী যে অলীক নহে এবং পরমাণুসমষ্টিরূপও নহে, ইহা স্বীকার্য্য হইলে শ্রীমদ্ভাগবতেরও উহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে অদ্বৈতমতানুসারে পরমাণু ও অবয়বী, সমস্তই অবিদ্যা-কল্পিত। শ্রীধর স্বামিপাদের ঐ ব্যাখ্যা অদ্বৈতমতানুসারেই এবং কার্য্য ও কারণের অভেদ পক্ষ গ্রহণ করিয়াই সংগত করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও পরমাণু ও অবয়বীর ব্যবহারিক সত্তা অবশ্যই আছে। অদ্বৈত-মতেও উহা একেবারে অসৎ বা অলীক নহে। সুধীগণ শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকের সমস্ত টীকা দেখিয়া ইহার বিচার করিবেন।

১। চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা।
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ।—শ্রীমদ্ভাগবত।৩।১১।১।

২। এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্তমসন্নিধানাৎ পরমাণবো যে।
অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতাস্তে যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, ১২শ অঃ ৯ম শ্লোক।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে এই সূত্রে "বা" শব্দের বিকল্প অর্থ গ্রহণ করিয়া চরম কল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ত্রুটি হইতে পর অর্থাৎ সূক্ষ্ম পরমাণু, অথবা ত্রুটিতেই বিশ্রাম, এই বিকল্পই সূত্রকারের অভিমত। "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও এখানে বৃত্তিকারের সমস্ত ব্যাখ্যারই অনুবাদ করিয়া, পরে "নব্যাস্তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা অভিনব ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ত্রুটের্হেতোঃ পরং পরসর্গীয়ং জন্যদ্রব্যমিত্যর্থঃ"। অর্থাৎ সূত্রে "পর" শব্দের দ্বারা প্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টিতে প্রথম যে দ্রব্য জন্মে, তাহাই বিবক্ষিত। ঐ দ্রব্য ত্রুটিহেতুক অর্থাৎ ত্রসরেণুই উহার উপাদান কারণ। ঐ ত্রসরেণুরও যে অবয়ব আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। উহার সাবয়বত্বসাধক হেতু অপ্রয়োজক। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ পরে রঘুনাথ শিরোমণির মতানুসারেই উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বুঝা যায়। কারণ, রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" গ্রন্থে[১] "ত্রুটি" অর্থাৎ ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম সমর্থন করিয়া পরমাণু ও দ্ব্যণুক অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, চাক্ষুষ দ্রব্যত্ববশতঃ ত্রসরেণুরও অবয়ব আছে, ইত্যাদি প্রকারে অনুমান করিতে গেলে ঐরূপ অনুমান দ্বারা অনন্ত অবয়বপরম্পরা সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হয়। সুতরাং যখন কোন দ্রব্যে বিশ্রাম স্বীকার করিতেই হইবে, তখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম স্বীকার করা উচিত। ঐ ত্রসরেণুই নিত্য নিরবয়ব দ্রব্য। উহাতে প্রত্যক্ষজনক নিত্য মহত্ত্বই আছে। তথাপি অন্যান্য দ্রব্য হইতে অপকৃষ্টপরিমাণ বা ক্ষুদ্র পরিমাণপ্রযুক্তই উহাকে "অণু" বলিয়া ব্যবহার হয়। কারণ, মহৎ পদার্থেও মহত্তম পদার্থ হইতে ক্ষুদ্র-পরিমাণ-প্রযুক্ত অণু বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমও তৃতীয় অধ্যায়ে "মহদণুগ্রহণাৎ" (১।৩৩) এই সূত্রে প্রত্যক্ষযোগ্য ক্ষুদ্র দ্রব্যেও "অণু" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, রঘুনাথ শিরোমণির সমর্থিত উক্ত মত গোতম-মতবিরুদ্ধ। কারণ, মহর্ষি গোতম অতীন্দ্রিয় পরমাণুই স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে ৩৬শ সূত্রে "নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাং" এই বাক্যের দ্বারা তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি পরে এখানে চরম কল্পে ত্রসরেণুকেই পরমাণু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে ঘটাদি দ্রব্যকে যাঁহারা পরমাণুপুঞ্জ বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে তিনি ঘটাদি দ্রব্যের অপ্রত্যক্ষের আপত্তি করিতে পারেন না। কারণ, ত্রসরেণুই পরমাণু হইলে উহা অতীন্দ্রিয় নহে। গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্য্যকিরণের মধ্যে যে সূক্ষ্ম রেণু দেখা যায়, তাহাই "ত্রসরেণু", ইহা মন্বাদি ঋষিগণও বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং উহার প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায় পুঞ্জীভূত ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষ অবশ্যই হইতে পারে। তাহা হইলে মহর্ষি আর কোন্ যুক্তির দ্বারা অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিবেন? তাহা বলা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু মহর্ষি এখানে তাহা কিছুই বলেন নাই। সুতরাং তিনি যে, শেষে কল্পান্তরেও ত্রসরেণুকেই পরমাণু বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে "ত্রুটি"

১। পরমাণুদ্ব্যণুকয়োশ্চ মানাভাবঃ, ত্রুটাবেব বিশ্রামাৎ। ত্রুটিঃ সমবেতা চাক্ষুষদ্রব্যত্বাদ্ঘটবৎ, তে চ সমবায়িনঃ সমবেতাশ্চাক্ষুষদ্রব্যসমবায়িত্বাদিতি চাপ্রয়োজকং। অন্যথা তাদৃশসমবায়িসমবায়িত্বাদিভিরনবস্থিততৎসমবায়িপরম্পরাসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। অণুব্যবহারশ্চাপকৃষ্টপরিমাণনিবন্ধনো [illegible] মহত্ত্বমাদায়[illegible]।—পদার্থতত্ত্বনিরূপণ।

অর্থাৎ "ত্রসরেণু" হইতে ভিন্ন অতীন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যই পরমাণু, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তিনি এই সূত্রে "পর" শব্দের দ্বারাও তাহাই সূচনা করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। মূলকথা, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে কল্পান্তরে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলেও উহা মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত নহে, ইহা স্বীকার্য্য। রঘুনাথ শিরোমণি স্বাধীন ভাবে তাঁহার নিজের মত সমর্থন করিলেও মহর্ষি গোতমের এই সূত্রের দ্বারা উক্ত মতের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করা যায় না। বিশ্বনাথ "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"তে কিন্তু মহর্ষি গোতম-সম্মত অতীন্দ্রিয় পরমাণুর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত মতের উল্লেখ-পূর্ব্বক প্রতিবাদই করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিয়াছেন যে, ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম স্বীকার করিলে উহার মহৎ পরিমাণকেও নিত্য বলিতে হইবে। কিন্তু অপকৃষ্ট মহৎ পরিমাণ সর্ব্বত্রই অনেক-দ্রব্যবত্তা প্রযুক্ত উৎপন্ন পদার্থ, ইহা দেখা যায়। সুতরাং উহা নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং উহার পরে অতীন্দ্রিয় পরমাণুতেই বিশ্রাম স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্বনাথ শেষে মহর্ষি গোতমের এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার মতবিরুদ্ধ মতেরও কেন ব্যাখ্যা করিয়াছেন? ইহা সুধীগণ বিচার করিবেন। ন্যায়দর্শনের সমানতন্ত্র বৈশেষিক দর্শনেও পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্বই মহর্ষি কণাদের সিদ্ধান্ত। "চরক-সংহিতাতে"ও পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্বের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়[১]। পরন্তু এখানে ইহাও বক্তব্য এই যে, রঘুনাথ শিরোমণির স্বীকৃত ও সমর্থিত পূর্ব্বোক্ত মত তাঁহারই উদ্ভাবিত নহে। কারণ, ন্যায়বার্ত্তিকে প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরের উক্তির দ্বারা বুঝা যায় যে, বাৎসী-পুত্র বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে[২] কোন সম্প্রদায় গবাক্ষরন্ধ্রে দৃশ্যমান ত্রসরেণুকেই পরম অণু অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, তাঁহাদিগের মতে ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গোতমোক্ত দোষের পরিহার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মতে ঘটাদি দ্রব্য দৃশ্যমান ত্রসরেণুপুঞ্জ মাত্র; সুতরাং উহার প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি নাই। উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, গোতম মত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, ত্রসরেণু ভেদ্য, অর্থাৎ উহার ভেদ বা বিভাগ আছে। সুতরাং উহাকে পরমাণু বলা যায় না। কারণ, পরমাণু অভেদ্য। যাহার ভেদ বা বিভাগ করা যায় না, যাহার আর অংশ নাই, তাহাই ত পরমাণু। ত্রসরেণুর যে বিভাগ বা অংশ আছে, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যেহেতু উহা অস্মদাদির বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য, অতএব ঘটের ন্যায় উহারও বিভাগ আছে। উদ্দ্যোতকরের প্রদর্শিত ঐ অনুমানকে গ্রহণ করিয়াই পরবর্ত্তী গোতম মতব্যাখ্যাতা নৈয়ায়িকগণ "ত্রসরেণুঃ সাবয়বঃ চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপে অনুমান দ্বারা ত্রসরেণুর সাবয়বত্ব সমর্থন করিয়াছেন। ত্রসরেণুর অবয়ব থাকিলে তাহারও অবয়ব আছে। কারণ, যাহা চাক্ষুষ দ্রব্যের অবয়ব, তাহারও সাবয়বত্ব ঘটের অবয়বে সিদ্ধ আছে। সুতরাং

১। "শরীরাবয়বাস্তু পরমাণুভেদেনাপরিসংখ্যেয়া ভবন্ত্যতিবহুত্বাদতিসৌক্ষ্ম্যাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ" ইত্যাদি।—শারীরস্থান, ৭ম অঃ, শেষ ২৪শ।

২। একে তু বাতায়নচ্ছিদ্রদৃশ্যং ত্রুটিং পরমাণুং বর্ণয়ন্তি, তন্ন যুক্তং, তস্য ভেদবত্ত্বাৎ। অভেদ্যঃ পরমাণুর্ভিদ্যতে চ ত্রুটিঃ। কথমবগম্যতে ভিদ্যতে ত্রুটিরিতি? দ্রব্যত্বে সত্যস্মদাদিবাহ্যকরণপ্রত্যক্ষত্বাদ্ঘটবদিতি" ইত্যাদি—দ্বিতীয় অঃ, প্রথম আহ্নিকে "সাধ্যত্বাদবয়বিনি সন্দেহঃ"—এই সূত্রের বার্ত্তিক (২৩২ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

"ত্রসরেণোরবয়বঃ সাবয়বঃ ঘটাবয়ববৎ" এইরূপে অনুমান দ্বারা ত্রসরেণুর অবয়বেরও অবয়ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঐরূপে তাহারও অবয়ব সিদ্ধ করিতে গেলে অনন্ত অবয়বপরম্পরার সিদ্ধির আপত্তিমূলক অনবস্থা-দোষ হয়, তাহাতে সুমেরু পর্ব্বত ও সর্ষপের তুল্যপরিমাণাপত্তি দোষও হয়। এ জন্য ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়বেই বিশ্রাম স্বীকার করিয়া, উহাকেই পরমাণু বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ যখন কোন দ্রব্যে অবয়ববিভাগের বিশ্রাম বা নিবৃত্তি স্বীকার করিতেই হইবে, তখন ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়বে বিশ্রাম স্বীকার করার বাধা কি আছে? ঘটাদিদ্রব্য ত্রসরেণু অপেক্ষায় অনেক বড়, সুতরাং তাহার অবয়বের অবয়বও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় তাহারও অবয়ব অবশ্য স্বীকার্য্য এবং উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু ত্রসরেণুর অবয়বের যে অবয়ব, তাহারও অবয়ব স্বীকারের কোন কারণ নাই। আর যদি পূর্ব্বোক্তরূপে অনুমান করিয়া তাহারও অবয়ব সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলেও নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্ব খণ্ডিত হইবে না। কারণ পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে বাধ্য হইয়া যখন কোন স্থানে অবয়ব-বিভাগের বিশ্রাম বা নিবৃত্তি স্বীকার করিতেই হইবে, তখন সেই দ্রব্যই নিরবয়ব পরমাণু বলিয়া সিদ্ধ হইবে। সুতরাং ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়বে বিশ্রাম স্বীকার করিয়া উহাই পরমাণু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক, ঐ দ্ব্যণুকের অবয়বই পরমাণু। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে প্রথমে যে দ্ব্যণুকেরই উৎপত্তি হয়, ইহা প্রশস্তপাদের উক্তির দ্বারাও প্রাচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝা যায় (প্রশস্তপাদভাষ্য, ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্‌-বাচস্পতি মিশ্র "ভামতী" গ্রন্থে বেদান্তদর্শনের "মহদ্দীর্ঘবদ্বা" (২।২।১১) ইত্যাদি সূত্রের অবতারণায় যে বৈশেষিকসম্প্রদায়সিদ্ধ পরমাণুবাদপ্রক্রিয়ার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনিও দ্ব্যণুকের অবয়বকেই পরমাণু বলিয়া এবং দ্ব্যণুকত্রয়াদি হইতেই ত্র্যণুকাদির উৎপত্তি হয় বলিয়া বৈশেষিকসম্প্রদায়ের পরম্পরাপ্রাপ্ত যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ভট্ট এবং "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে ঐ সমস্ত যুক্তিরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ("ন্যায়কন্দলী" ৩২ পৃষ্ঠা ও "ন্যায়মঞ্জরী" ৫০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

"ভামতী" গ্রন্থে শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রের সুব্যক্ত যুক্তির সার মর্ম্ম এই যে, বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান হইতে পারে না। কারণ, কোন ঘটের নির্ব্বাহক পরমাণুগুলিকেই যদি ঐ ঘটের উপাদান-কারণ বলা যায়, তাহা হইলে মুদ্গরপ্রহার দ্বারা ঐ ঘট চূর্ণ করিলে তখন একেবারে তাহার উপাদান-কারণ ঐ সমস্ত পরমাণুগুলিরই পরস্পর বিভাগ হইবে। কারণ, তাহা না হইলে ঐ স্থলে ঐ ঘটের বিনাশ হইতে পারে না। উপাদান-কারণের বিভাগ বা বিনাশ ব্যতীত জন্য দ্রব্যের বিনাশ হয় না। কিন্তু যদি মুদ্গর প্রহারের পরেই সমস্ত পরমাণুরই বিভাগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তখন আর কিছুরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, সেই বিভক্ত পরমাণুসমূহ সমস্তই অতীন্দ্রিয়। কিন্তু মুদ্গর প্রহারের দ্বারা ঘট চূর্ণ বা বিনষ্ট হইলেও তখন শর্করাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, ঘট চূর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইলেও তখন একেবারে পরমাণু-গুলির পরস্পর বিভাগ হয় না। অতএব ঐ সমস্ত পরমাণুই ঐ ঘটের উপাদান-কারণ নহে। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমেই ক্রমশঃ ঘটের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাই স্বীকার্য্য। (তৃতীয় খণ্ড, ৯৫

পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান-কারণ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইলে পরমাণুত্রয়ের সংযোগেও কোন দ্রব্যান্তর জন্মে না, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পরমাণুত্রয়েরও বহুত্ব আছে। সুতরাং প্রথমে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগেই দ্ব্যণুক নামক দ্রব্য জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। কিন্তু ঐ দ্ব্যণুকদ্বয়ের সংযোগে কোন দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ঐ দ্রব্যান্তর ব্যর্থ হয়। কারণ, ঐ দ্রব্যান্তর আর একটি দ্ব্যণুকবিশেষই হয়, উহা পূর্ব্বজাত দ্ব্যণুক হইতে স্থূল হইতে পারে না। কারণ, উপাদান-কারণের বহুত্ব ও মহৎপরিমাণাদি যাহা যাহা জন্য দ্রব্যের স্থূলত্ব বা মহৎপরিমাণের উৎপাদক হয়,[1] দ্ব্যণুকদ্বয়ে তাহার কিছুই নাই। দ্ব্যণুকদ্বয়ে বহুত্বও নাই, মহৎপরিমাণও নাই, "প্রচয়" নামক সংযোগবিশেষও নাই। সুতরাং দ্ব্যণুকদ্বয়জাত দ্রব্যান্তরে মহত্ত্ব বা স্থূলত্বের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় উহার উৎপত্তি নিষ্ফল হয়। দ্ব্যণুকের পরে আবার অপর দ্ব্যণুকবিশেষের উৎপত্তি স্বীকার অনাবশ্যক। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে প্রথমে দ্ব্যণুক নামক অবয়বীর উৎপত্তি হইলে, উহার পরে ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগেই "ত্র্যণুক" নামক অবয়বীর উৎপত্তি হয়। এইরূপ দ্ব্যণুকচতুষ্টয়াদির সংযোগে "চতুরণুক" প্রভৃতি অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। দ্ব্যণুকত্রয়ে বহুত্ব সংখ্যা থাকায় উহা হইতে উৎপন্ন ত্র্যণুক বা ত্রসরেণুর স্থূলত্ব অর্থাৎ মহৎপরিমাণ জন্মিতে পারে। সেখানে উপাদান-কারণ, দ্ব্যণুকত্রয়ের বহুত্ব সংখ্যাই ঐ মহৎপরিমাণের কারণ। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, শ্রীধর ভট্ট ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ অনেক স্থানে ত্রসরেণুকে "ত্র্যণুক" শব্দের দ্বারাও উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরমাণুর ন্যায় দ্ব্যণুকেরও মহত্ত্ব না থাকায় দ্ব্যণুককেও "অণু" বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনটি "অণু" অর্থাৎ দ্ব্যণুকের সংযোগে উৎপন্ন, এইরূপ অর্থে "ত্রসরেণু"কে "ত্র্যণুক"ও বলা যায়। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও ঐরূপ অর্থেই তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু উহার "ত্রসরেণু" নামই প্রসিদ্ধ। মন্বাদি সংহিতাতেও ঐ নামেরই উল্লেখ আছে। কেহ কেহ "ত্রিভিঃ সহিতো রেণুঃ" এই অর্থে "ত্রসরেণু" শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া পরমাণুত্রয় সহিত রেণু অর্থাৎ যে রেণুতে অবয়বরূপে তিনটি পরমাণু থাকে, তাহাই "ত্রসরেণু" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বলিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ ব্যুৎপত্তিতে কোন প্রমাণ নাই। মনে হয়, গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্য্যকিরণের মধ্যে যে রেণু পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করে বলিয়া "ত্রস" অর্থাৎ চরিষ্ণু বা জঙ্গম, তাহাকে ঐ জন্যই "ত্রসরেণু" বলা হইয়াছে। "ত্রস" শব্দের জঙ্গম অর্থে প্রমাণ ও প্রয়োগ, তৃতীয় খণ্ডের ২৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সে যাহাই হউক, মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক এবং ঐ দ্ব্যণুকের অবয়বই নিরবয়ব পরমাণু এবং নিরবয়বত্ববশতঃ ঐ পরমাণু নিত্য, ইহাই ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। সুতরাং এই সূত্রে সর্ব্বনাম "পর" শব্দের দ্বারা ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়বই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহাই বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়

১। কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ॥ বেদান্তদর্শনের (২।২।১১শ সূত্রের) শারীরক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের উদ্ধৃত কণাদসূত্র। কিন্তু এখন প্রচলিত বৈশেষিকদর্শনে ঐরূপ সূত্র নাই। ঐ স্থানে "কারণবহুত্বাচ্চ" (৭।১।৯) এইরূপ সূত্র দেখা যায়। শঙ্কর মিশ্রের অনেক পূর্ব্বেই আচার্য্য শঙ্করের উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত কণাদসূত্র বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা উক্ত সূত্রের "উপস্কার" দেখিলেই বুঝা যাইবে।

আহ্নিকে "নাণুনিত্যত্বাৎ" (২৩শ) এই সূত্রের দ্বারা এবং পরবর্ত্তী "অন্তর্ব্বহিশ্চ" ইত্যাদি বিংশ সূত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্বই যে, মহর্ষি গোতমের সম্মত, সুতরাং মহর্ষি কণাদের ন্যায় তিনিও যে, আরম্ভবাদেরই সমর্থক, ইহাও বুঝা যায় (৪র্থ খণ্ড, ১৫৯—৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তিনি এই অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে "ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যাৎ" (১১শ) এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত আরম্ভবাদের প্রকাশও করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে পরমাণু যে, নিরবয়ব ও নিত্য এবং ঐ পরমাণু হইতেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তানুসারেই নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে প্রথমে দ্ব্যণুকনামক অবয়বীর উৎপত্তি এবং ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে "ত্রসরেণু" বা "ত্র্যণুক" নামক অবয়বীর উৎপত্তি হয়, ইহা পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তির দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি স্বাধীন ভাবে ত্রসরেণুতে বিশ্রাম স্বীকার করিলেও গৌতম-মতব্যাখ্যাতা পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহা করেন নাই। "ত্রসরেণুর" ষষ্ঠ ভাগই যে পরমাণু, এ বিষয়ে একটি বচনও পূর্ব্বকাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। "ন্যায়কোষে"ও উক্ত বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে[১]। "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র টীকায় দাক্ষিণাত্য মহাদেব ভট্ট গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্য্যকিরণের মধ্যে দৃশ্যমান রেণুকে "দ্ব্যণুক" বলাই উচিত বলিয়া শেষে যে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিষ্প্রমাণ ও প্রমাণবিরুদ্ধ। মন্বাদি ঋষিগণ যে, ঐ রেণুকে "ত্রসরেণু" বলিয়াছেন এবং তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র যে, এই সূত্রোক্ত "ত্রুটি" ও ত্রসরেণু একই পদার্থ বলিয়া উহার স্বরূপবোধক যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের পূর্ব্বার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। "ত্রুটি" শব্দের অর্থ অতিক্ষুদ্র, ইহা অভিধানেও কথিত হইয়াছে। তদনুসারেও দৃশ্য পদার্থের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেই ত্রসরেণুকেও "ত্রুটি" বলা যায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিশেষ করিয়া ঐ ত্রসরেণুকেই "ত্রুটি" বলিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি ও অন্যান্য নৈয়ায়িকও ত্রসরেণু অর্থেই "ত্রুটি" শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে যে "ত্রসরেণু"র পরে "ত্রুটি"র উল্লেখ হইয়াছে, তাহা কালবিশেষের সংজ্ঞা। অর্থাৎ সেখানে কালবিশেষকেই ত্রসরেণু ভিন্ন "ত্রুটি" নামে প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং উহা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে।

মূলকথা, মহর্ষি এই সূত্রে "ত্রুটি" শব্দের দ্বারা নিরবয়ব অতীন্দ্রিয় পরমাণুর অস্তিত্বে পূর্ব্বোক্ত-রূপ যুক্তি সূচনা করিয়া, ঘটাদি অবয়বী যে, ঐ পরমাণুপুঞ্জমাত্র নহে—কারণ, তাহা হইলে উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ না হইলেও পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বকথিত "বৃত্তিপ্রতিষেধ"ও সম্ভব হয় না, সুতরাং উহার দ্বারা অবয়বীর অভাব সমর্থন করাও সম্ভবই হয় না, ইহাও সূচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্য প্রসঙ্গে অবয়বীর অস্তিত্ব বিষয়ে সাধক যুক্তি প্রকাশ করিলেও তদ্বিষয়ে অন্যান্য বাধক যুক্তির খণ্ডন ব্যতীত উহা সিদ্ধ হইতে পারে না। সুপ্রাচীন কাল হইতেই অবয়বীর অস্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে। যোগদর্শনের ব্যাস-ভাষ্যেও অবয়বীর অস্তিত্ব বিষয়ে বিচার

১। জালসূর্য্যমরীচিস্থং যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
তস্য ষষ্ঠতমো ভাগঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে॥

ও সমর্থন দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণেও (৩।১৮) বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং অবয়বীর অস্তিত্ব বিবাদগ্রস্ত বা সন্দিগ্ধ হইলেও মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় সূত্রে অবয়বিবিষয়ে অভিমানকে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়া উপদেশ করিতে পারেন না। তাই তিনি ঐ সূত্রের পরেই এখানে এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়া অবয়বিবিষয়ে বাধক যুক্তির উল্লেখপূর্ব্বক উহার খণ্ডন দ্বারা আবার অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী প্রকরণের দ্বারা নিরবয়ব নিত্য পরমাণুর অস্তিত্বের বাধক যুক্তির খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অবয়বীর অস্তিত্ব সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন ॥১৭॥

অবয়বাবয়বিপ্রকরণ সমাপ্ত ॥২॥

ভাষ্য। অথেদানীমানুপলম্ভিকঃ সর্ব্বং নাস্তীতি মন্যমান আহ—

অনুবাদ। অনন্তর এখন সমস্ত পদার্থই নাই অর্থাৎ অবয়বীর ন্যায় পরমাণুও নাই, উপলব্ধিও বস্তুতঃ নাই, এই মতাবলম্বী "আনুপলম্ভিক" (সর্ব্বশূন্যতাবাদী) বলিতেছেন-

সূত্র। আকাশব্যতিভেদাত্তদনুপপত্তিঃ ॥১৮॥৪২৮॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) "আকাশব্যতিভেদ" প্রযুক্ত অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে আকাশের সহিত সংযোগ প্রযুক্ত তাহার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিরবয়ব পরমাণুর উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। তস্যাণোর্নিরবয়বস্যানুপপত্তিঃ। কস্মাৎ? **আকাশ-ব্যতিভেদাৎ।** অন্তর্ব্বহিশ্চাণুরাকাশেন সমাবিষ্টো ব্যতিভিন্নঃ। ব্যতিভেদাৎ সাবয়বঃ, সাবয়বত্বাদনিত্য ইতি।

অনুবাদ। সেই নিরবয়ব পরমাণুর উপপত্তি হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) "আকাশব্যতিভেদ"-প্রযুক্ত। বিশদার্থ এই যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে আকাশ কর্ত্তৃক সমাবিষ্ট হইয়া ব্যতিভিন্ন অর্থাৎ অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে আকাশের সহিত সংযুক্ত। ব্যতিভেদপ্রযুক্ত সাবয়ব, সাবয়বত্বপ্রযুক্ত অনিত্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি এখন নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্বের বাধক যুক্তি খণ্ডন করিয়া, উহার অস্তিত্ব সুদৃঢ় করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত নিরবয়ব পরমাণুর উপপত্তি বা সিদ্ধি হয় না। এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা নিরবয়ব পরমাণুই যে মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহা তাঁহার এই বিচারের দ্বারাই বুঝা যায়। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রে যে, তিনি নিরবয়ব পরমাণুর কথাই বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, তাহা বলিলেই তিনি এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা ঐ নিরবয়ব পরমাণুকেই

গ্রহণ করিতে পারেন। নিরবয়ব পরমাণুর সিদ্ধি কেন হয় না? ইহা সমর্থন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদী হেতু বলিয়াছেন—"আকাশব্যতিভেদাৎ"। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে যে আকাশের সমাবেশ অর্থাৎ সংযোগবিশেষ আছে, উহাই এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত "আকাশব্যতিভেদ"। এই ব্যতিভেদ আছে বলিয়া পরমাণু সাবয়ব, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ উহার অবয়ববিশেষ। উহার সহিত আকাশের সংযোগ স্বীকার্য্য হইলে ঐ অবয়বের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে পরমাণু যে সাবয়ব পদার্থ, ইহা স্বীকার করিতে হইবেই। অর্থাৎ পরমাণু স্বীকার করিতে গেলে উহারও অবয়ব স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং উহার অনিত্যত্বও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সাবয়ব দ্রব্য নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ বাধক যুক্তিবশতঃ নিরবয়ব নিত্য পরমাণুর সিদ্ধি হয় না। ভাষ্যকার প্রথমে উক্ত মতকে "আনুপলম্ভিকে"র মত বলিয়া এই পূর্ব্বপক্ষসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। যিনি "উপলম্ভ" অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি কোন জ্ঞানেরই বাস্তব সত্তা মানেন না, সুতরাং পরমাণুও মানেন না, এতাদৃশ সর্ব্বশূন্যতাবাদীকে "আনুপলম্ভিক" বলা যায়। ভাষ্যকার "আনুপলম্ভিক" শব্দের প্রয়োগ করিয়া পরে "সর্ব্বং নাস্তীতি মন্যমানঃ" এই বাক্যের দ্বারা উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাভাববাদী, তিনিই এখানে ভাষ্যকারোক্ত "আনুপলম্ভিক"। তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি এই যে, পরমাণুর অবয়ব না থাকিলে পরমাণু তাহার অবয়বে কিরূপে বর্ত্তমান থাকে? এইরূপ প্রশ্ন করা যায় না। সুতরাং পরমাণু তাহার অবয়বে কোনরূপেই বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, ইহা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত "বৃত্তিপ্রতিষেধ" প্রযুক্ত পরমাণুর অভাব সিদ্ধ করা যায় না। কিন্তু যদি পরমাণুর অবয়ব আছে, ইহা সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে ঐ যুক্তিতে তাহারও অবয়ব প্রভৃতি অবয়বপরম্পরা সিদ্ধ করিয়া ঐ পরমাণু ও তাহার অবয়বপরম্পরা নিজ নিজ অবয়বে কোনরূপেই বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, ইহা সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত "বৃত্তিপ্রতিষেধ" প্রযুক্ত ঐ পরমাণু ও উহার অবয়বপরম্পরারও অভাব সিদ্ধ করা যাইবে। তাহা হইলে আর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকে না—"সর্ব্বং নাস্তি" ইহাই সিদ্ধ হয়। মহর্ষি পূর্ব্বে "সর্ব্বমভাবঃ" ইত্যাদি (৪।১।৩৭) সূত্রের দ্বারা যে মতের প্রকাশ করিয়াছেন, উহা হইতে এখানে এই মতের অবশ্যই বিশেষ আছে। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার সেই স্থলের ন্যায় এখানেও "শূন্যতাবাদে"র কথাই বলিয়াছেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। চতুর্থ খণ্ড—১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥১৮॥

সূত্র। আকাশাসর্ব্বগতত্বং বা ॥১৯॥৪২৯॥

অনুবাদ। পক্ষান্তরে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "আকাশব্যতিভেদ" নাই, ইহা বলিলে আকাশের অসর্ব্বগতত্ব (অসর্ব্বব্যাপিত্ব) হয়।

ভাষ্য। অথৈতন্নেষ্যতে—পরমাণোরন্তর্নাস্ত্যাকাশমিত্যসর্ব্বগতত্বং প্রসজ্যতে ইতি।

অনুবাদ। আর যদি ইহা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে পরমাণুর অভ্যন্তরে আকাশ নাই, এ জন্য (আকাশের) অসর্ব্বগতত্ব প্রসক্ত হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে "আকাশব্যতিভেদ"কে হেতু করিয়া পরমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন করিয়াছেন, উহা অস্বীকার করিলে ত তিনি আর নিজ মত সমর্থন করিতে পারেন না, তাই তিনি ঐ পক্ষে এই সূত্রের দ্বারা পরেই বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে আকাশের সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। অর্থাৎ আমরা আকাশাদি কিছুই না মানিলেও তোমরা যখন আকাশকে সর্ব্বগত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছ, এবং পরমাণুকেও মূর্ত্ত দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তখন পরমাণুর অভ্যন্তরেও আকাশের সংযোগ তোমাদিগের স্বীকার্য্য। কারণ, তোমাদিগের মতে সমস্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগই সর্ব্বগতত্ব। সুতরাং পরমাণুর অভ্যন্তরের সহিত আকাশের সংযোগ না থাকিলে উহার সর্ব্বগতত্ব থাকে না। উহার অসর্ব্বগতত্বেরই আপত্তি হয়। কিন্তু উহা স্বীকার করিলে তোমাদিগের সিদ্ধান্তহানি হইবে। সুতরাং পরমাণুর অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগেও আকাশের সংযোগ অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় তোমাদিগের মতেও পরমাণুর সাবয়বত্ব অনিবার্য্য ॥১৯॥

সূত্র। অন্তর্ব্বহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনাদকার্য্যে তদভাবঃ ॥২০॥৪৩০॥

অনুবাদ। (উত্তর) "অন্তর্" শব্দ ও "বহিস্" শব্দের দ্বারা জন্য দ্রব্যের কারণান্তর অর্থাৎ উপাদান-কারণ অবয়ববিশেষ কথিত হওয়ায় অকার্য্য দ্রব্যে (নিত্যদ্রব্য পরমাণুতে) তাহার অভাব (অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ না থাকায় তাহার সহিত আকাশের সংযোগ বলাই যায় না। সুতরাং ঐ হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ করা যায় না)।

ভাষ্য। "অন্ত"রিতি পিহিতং কারণান্তরৈঃ কারণমুচ্যতে। "বহি"রিতিচ ব্যবধায়কমব্যবহিতং কারণমেবোচ্যতে। তদেতৎ কার্য্যদ্রব্যস্য সম্ভবতি, নাণোরকার্য্যত্বাৎ। অকার্য্যে হি পরমাণাবন্তর্ব্বহিরিত্যস্যাভাবঃ। যত্র চাস্য ভাবোঽণুকার্য্যং তৎ, ন পরমাণুঃ। যতো হি নাল্পতরমস্তি, স পরমাণুরিতি।

অনুবাদ। "অন্তর্" এই শব্দের দ্বারা কারণান্তরগুলির দ্বারা "পিহিত" অর্থাৎ বহির্ভাগস্থ অবয়বগুলির দ্বারা ব্যবহিত কারণ (মধ্যভাগস্থ উপাদান-কারণ অবয়ববিশেষ) কথিত হয়। "বহিস্" এই শব্দের দ্বারাও ব্যবধায়ক অব্যবহিত কারণই অর্থাৎ যাহা মধ্যভাগের ব্যবধায়ক, কিন্তু অন্য কোন অবয়ব দ্বারা ব্যবহিত নহে, সেই বহির্ভাগস্থ অবয়ববিশেষই কথিত হয়। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "অন্তর্"

শব্দ ও "বহিস্" শব্দের বাচ্য অবয়বরূপ উপাদান-কারণ, জন্য দ্রব্যের সম্বন্ধে সম্ভব হয়, অকার্য্যত্ব অর্থাৎ অজন্যত্ব বা নিত্যত্ব প্রযুক্ত পরমাণুর সম্বন্ধে সম্ভব হয় না। যেহেতু "অকার্য্য" পরমাণুতে অর্থাৎ যাহার উৎপত্তিই হয় না, যাহা কোন কারণের কার্য্যই নহে, আমাদিগের সম্মত সেই পরমাণু নামক নিত্যদ্রব্যে অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ, ইহার অভাব। যাহাতে কিন্তু এই অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের "ভাব" অর্থাৎ সত্তা আছে, তাহা পরমাণুর কার্য্য অর্থাৎ পরমাণু হইতে ক্রমশঃ উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি জন্য দ্রব্য, পরমাণু নহে। যেহেতু যাহা হইতে সূক্ষ্মতর নাই, অর্থাৎ যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম দ্রব্য, যাহার কোন অবয়ব বা অংশই নাই, তাহাই পরমাণু।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, "অন্তর্" শব্দ ও "বহিস্" শব্দ জন্য-দ্রব্যের উপাদান-কারণ অবয়ববিশেষেরই বাচক। সুতরাং নিত্য দ্রব্য পরমাণুতে "অন্তর্" শব্দ ও "বহিস্" শব্দের বাচ্য সেই উপাদান-কারণ থাকিতে পারে না। পরমাণুর সম্বন্ধে "অন্তর" শব্দ ও "বহিস্" শব্দের যথার্থ প্রয়োগই হইতে পারে না। সূত্রে "অন্তর্" ও "বহিস্" এই দুইটি অব্যয় শব্দের দ্বারা মহর্ষি ঐ দুইটি শব্দকেই এখানে প্রকাশ করিয়াছেন এবং সূত্রত্ববশতঃই উহার পরে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। উত্তরবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী পরমাণুর সাবয়বত্ব সাধন করিতে যে "আকাশব্যতিভেদ"কে হেতু বলিয়াছেন, উহা অসিদ্ধ। কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের সহিত আকাশের সংযোগই তাঁহার অভিমত "আকাশব্যতিভেদ"। কিন্তু পরমাণুর অভ্যন্তরও নাই, বহির্ভাগও নাই। সুতরাং তাহার সহিত আকাশের সংযোগ সম্ভবই নহে। যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহার সহিত সংযোগও অলীক। সুতরাং উহার দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ নাই কেন? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পরমাণু অকার্য্য অর্থাৎ নিত্যদ্রব্য, তাহার কোন কারণই না থাকায় "অন্তর্" শব্দ ও "বহিস্" শব্দের বাচ্য যে উপাদানকারণবিশেষ, তাহাও নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ, জন্য দ্রব্যের সম্বন্ধেই সম্ভব হয়। কারণ, জন্যদ্রব্যের অবয়ব আছে। ঐ সমস্ত অবয়বই তাহার উপাদান বা সমবায়িকারণ। তন্মধ্যে যাহা বাহ্য অবয়বের দ্বারা আচ্ছাদিত বা ব্যবহিত, তাহাই "অন্তর্" শব্দের বাচ্য, তাহাকে মধ্যাবয়ব বলা যায়। আর যাহা ঐ মধ্যাবয়বের ব্যবধায়ক বা আচ্ছাদক, এবং অন্য অবয়বের দ্বারা ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত নহে, তাহাই "বহিস্" শব্দের বাচ্য, তাহাকে বাহ্যাবয়ব বলা যায়। সুতরাং "অন্তর্" শব্দ ও "বহিস্" শব্দের বাচ্য যে পূর্ব্বোক্ত উপাদানকারণ, যাহাকে অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ বলা হয়, তাহা নিত্যদ্রব্য পরমাণুর সম্বন্ধে কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। যাহাতে উহা আছে, তাহা পরমাণুর কার্য্য দ্ব্যণুক প্রভৃতি সাবয়ব জন্যদ্রব্য, তাহা ত পরমাণু নহে। কারণ, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অর্থাৎ যাহার আর অবয়ব নাই, তাহাই পরমাণু।

বার্ত্তিককার এখানে বিশদ বিচারের জন্য বলিয়াছেন যে, যিনি "আকাশব্যতিভেদ"প্রযুক্ত পরমাণু অনিত্য, ইহা বলিতেছেন, তাঁহাকে ঐ "ব্যতিভেদ" কি, তাহা জিজ্ঞাস্য। যদি পরমাণু ও আকাশের সম্বন্ধমাত্রই "আকাশব্যতিভেদ" হয়, তাহা হইলে উহা পরমাণুর অনিত্যতার সাধক হয় না। আর যদি সম্বন্ধ বা সংযোগমাত্রই পরমাণুর অনিত্যতার সাধক হয়, তাহা হইলে "আকাশ"শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ। পরন্তু পরে "সংযোগোপপত্তেশ্চ" এই সূত্রের দ্বারা উহা কথিত হওয়ায় এখানেও আবার উহাই বলিলে পুনরুক্তি-দোষ হয়। সুতরাং পরমাণু ও আকাশের সম্বন্ধমাত্র অথবা সংযোগমাত্রই "আকাশব্যতিভেদ" নহে। যদি বল যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে সম্বন্ধ অথবা পরমাণুর অবয়বের সহিত আকাশের সম্বন্ধই "আকাশব্যতিভেদ", কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, পরমাণু নিত্যদ্রব্য, তাহার অবয়ব নাই। যদি বল, পরমাণুর অবয়বসমূহের বিভাগই "আকাশব্যতিভেদ" অর্থাৎ আকাশ পরমাণুর অবয়বগুলিকে ভেদ করিয়া উহাদিগের যে বিভাগ জন্মায়, তাহাই "আকাশব্যতিভেদ"—কিন্তু ইহাও সম্ভব নহে। কারণ, পরমাণু নিত্যদ্রব্য, তাহার অবয়বই নাই। জন্য দ্রব্যের অবয়ব থাকায় তাহারই বিভাগ হইতে পারে। পরন্তু পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলেও ত আকাশ তাহার বিভাগের কারণ হয় না। কারণ, ঐ বিভাগ কর্ম্মজন্য। তাহাতে আকাশ নিমিত্ত নহে। যদি বল, অভ্যন্তরে যে ছিদ্র, তাহাই "ব্যতিভেদ"; কিন্তু ইহাও এখানে বলা যায় না। কারণ, সাবয়ব যে দ্রব্যের মধ্যে অবয়ব নাই, সেই দ্রব্যের মধ্যস্থানকেই ছিদ্র বলে। কিন্তু পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহার ছিদ্র সম্ভবই হয় না। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার কথিত "আকাশব্যতিভেদ"কে যাহাই বলিবেন, তাহাই তাঁহার সাধ্যসাধক হয় না। কারণ, যাহা ব্যভিচারী বা অসিদ্ধ, তাহা কখনও সাধ্যসাধক হয় না। বার্ত্তিককার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী "সর্ব্বগতত্ব" শব্দের অর্থ না বুঝিয়াই পক্ষান্তরে আকাশের অসর্ব্বগতত্বের আপত্তি বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ আপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, সমস্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগই সর্ব্বগতত্ব। মূর্ত্ত দ্রব্য পরমাণুর সহিতও আকাশের সংযোগ থাকায় তাহার সর্ব্বগতত্ব অব্যাহতই আছে। পরমাণুর অভ্যন্তরে ঐ সংযোগ না থাকায় আকাশের সর্ব্বগতত্ব থাকে না, ইহা বলা যায় না। কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তরই নাই। যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহার সহিত সংযোগ অসম্ভব, এবং অলীক পদার্থ সর্ব্বশব্দের বাচ্যও নহে। সুতরাং যে সমস্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের সত্তা আছে, তাহাই "সর্ব্ব"শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আকাশের সর্ব্বগতত্বের কোন হানি হইতে পারে না। উদয়নাচার্য্যের "আত্মবিবেকে"র টীকায় নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও উদয়নের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় ঐরূপ কথাই লিখিয়াছেন[১]। তিনি আকাশের সহিত পরমাণুর অভ্যন্তরে সংযোগকেই "আকাশব্যতিভেদ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া পরমাণুর অভ্যন্তর অলীক বলিয়াই উহা সম্ভব নহে, ইহা বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য সেখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর "পরমাণুঃ সাবয়বঃ" এই

১। আকাশেন পরমাণোর্ব্যতিভেদঃ অভ্যন্তরে সংযোগঃ, অভ্যন্তরাভাবাদেব অসম্ভবী। সর্ব্বগতত্বন্তু বিভূনাং সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগিতামাত্রং। নিরবয়বস্য অণোঃ পরমাণুশব্দার্থত্বাৎ "পরমাণুঃ সাবয়বঃ" ইতি প্রতিজ্ঞাপদয়োর্ব্যাঘাত ইত্যর্থঃ।—আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি।

প্রতিজ্ঞাবাক্যে "পরমাণুঃ" এবং "সাবয়বঃ" এই পদদ্বয়ের যে ব্যাঘাত বলিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন যে, যিনি পরমাণু মানেন না, তিনি উহাকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিতেই পারেন না। আর যদি তিনি পক্ষগ্রহণের অনুরোধে বাধ্য হইয়া উহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে "সাবয়বঃ" এই পদের দ্বারা উহাকে সাবয়ব বলিতে পারেন না। কারণ, নিরবয়ব অণুই পরমাণু শব্দের অর্থ। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী ঐরূপ প্রতিজ্ঞাই করিতে পারেন না। অন্যান্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে॥ ২০॥

সূত্র। শব্দ-সংযোগ-বিভবাচ্চ সর্ব্বগতং ॥২১॥৪৩১॥

অনুবাদ। শব্দ ও সংযোগের "বিভব" অর্থাৎ আকাশে সর্ব্বত্র উৎপত্তিবশতঃই (আকাশ) সর্ব্বগত।

ভাষ্য। যত্র ক্বচিদুৎপন্নাঃ শব্দা বিভবন্ত্যাকাশে তদাশ্রয়া ভবন্তি। মনোভিঃ পরমাণুভিস্তৎকার্য্যৈশ্চ সংযোগা বিভবন্ত্যাকাশে। নাসংযুক্ত-মাকাশেন কিঞ্চিন্মূর্ত্তদ্রব্যমুপলভ্যতে, তস্মান্নাসর্ব্বগতমিতি।

অনুবাদ। যে কোন প্রদেশে উৎপন্ন সমস্ত শব্দই আকাশে সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ) আকাশাশ্রিত হয়। সমস্ত মন, সমস্ত পরমাণু ও তাহার কার্য্যদ্রব্য-সমূহের (দ্ব্যণুকাদি জন্য দ্রব্যের) সহিত সংযোগও আকাশে সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয়। আকাশের সহিত অসংযুক্ত কোন মূর্ত্ত দ্রব্য উপলব্ধ হয় না। অতএব আকাশ অসর্ব্বগত নহে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী পক্ষান্তরে আকাশের যে, অসর্ব্বগতত্বের আপত্তি বলিয়াছেন, তাহা পরিহার করিতে মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শব্দ ও সংযোগের বিভববশতঃই আকাশ সর্ব্বগত, ইহা সিদ্ধ হয়। "বিভব" শব্দের অর্থ এখানে বিশিষ্ট উৎপত্তি অর্থাৎ সর্ব্বত্র উৎপত্তি। অর্থাৎ যে কোন প্রদেশেই শব্দ উৎপন্ন হইলে ঐ শব্দ আকাশেই সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয়। আকাশই সর্ব্বত্র শব্দের সমবায়িকারণ বলিয়া আশ্রয়। তাই শব্দমাত্রই আকাশাশ্রিত হয়। ভাষ্যকার "বিভবন্ত্যাকাশে" এই বাক্য বলিয়া উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তদাশ্রয়া ভবন্তি"। সেই আকাশ যাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে "তদাশ্রয়" শব্দের দ্বারা বুঝা যায় আকাশাশ্রিত। তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বত্রই শব্দ উৎপন্ন হওয়ায় সর্ব্বত্রই তাহার আশ্রয় আকাশ আছে, ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ, আকাশ ব্যতীত কুত্রাপি শব্দ জন্মিতে পারে না। সর্ব্বত্র আকাশই শব্দের সমবায়ি-কারণ বলিয়া আশ্রয়। সুতরাং সর্ব্বদেশে সর্ব্বত্রই যখন শব্দ উৎপন্ন হইতেছে, তখন সর্ব্বত্র আকাশের সত্তাও স্বীকার্য্য। তাই আকাশকে সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও আকাশের সর্ব্বগতত্ব ও নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত-রূপেই বুঝিতে পারা যায়। (চতুর্থ খণ্ড, ১৬১—৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এইরূপ শব্দের ন্যায় সংযোগের "বিভব"বশতঃও আকাশের সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে জীবের সমস্ত মন এবং পার্থিবাদি সমস্ত পরমাণু এবং উহার কার্য্য দ্ব্যণুকাদি জন্য দ্রব্যসমূহের সহিত সংযোগকে সূত্রোক্ত "সংযোগ" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সমস্ত সংযোগও আকাশে সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয়। আকাশের সহিত সংযুক্ত নহে, এমন কোন মূর্ত্ত দ্রব্যের উপলব্ধি হয় না। অতএব আকাশ অসর্ব্বগত হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযোগই সর্ব্বগতত্ব। নববিধ দ্রব্যের মধ্যে পার্থিবাদি পরমাণু এবং তাহার কার্য্য দ্ব্যণুকাদি সমস্ত জন্য দ্রব্য এবং মন, এইগুলিই মূর্ত্তদ্রব্য। ঐ সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সর্ব্বত্রই আকাশের সংযোগ থাকায় আকাশের সর্ব্বগতত্বের হানি হয় না। পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ অলীক বলিয়া উহার সহিত সংযোগ অসম্ভব। কিন্তু পরমাণুর সহিত আকাশের সংযোগ অবশ্যই আছে। অতএব আকাশের অসর্ব্বগতত্বের আপত্তি হইতে পারে না। বার্ত্তিককারের মতে এখানে "সর্ব্বসংযোগশব্দবিভবাচ্চ সর্ব্বগতং" ইহাই সূত্রপাঠ। সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযোগই তিনি "সর্ব্বসংযোগ" শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার মতে "শব্দসংযোগবিভবাচ্চ" এইরূপই সূত্রপাঠ বুঝা যায়। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" এবং "ন্যায়সূত্রোদ্ধারে"ও "শব্দসংযোগবিভবাচ্চ" এইরূপই সূত্রপাঠ আছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐরূপই সূত্রপাঠ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শব্দ ও সংযোগের যে "বিভব" অথবা শব্দজনক সংযোগের যে বিভব, অর্থাৎ সার্ব্বত্রিকত্ব, তৎপ্রযুক্ত আকাশ সর্ব্বগত, ইহা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ সর্ব্বদেশেই শব্দের উৎপত্তি হওয়ায় সর্ব্বদেশেই শব্দজনক সংযোগ স্বীকার্য্য। সুতরাং আকাশের সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগিত্বরূপ সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয়। রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্যও বৃত্তিকারের পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বিবিধ ব্যাখ্যারই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। আকাশের ও আত্মার সর্ব্বগতত্ব সমর্থনে বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ সূত্র বলিয়াছেন,—"বিভবান্মহানাকাশস্তথাচাত্মা (৭।১।২২)। শঙ্কর মিশ্র এই সূত্রোক্ত "বিভব" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযোগ। কিন্তু মহর্ষি গোতমের এই সূত্রে "বিভব" শব্দের পূর্ব্বে "সংযোগ" শব্দের প্রয়োগ থাকায় "বিভব" শব্দের ঐরূপ অর্থ বুঝা যায় না। তাই বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বিভবঃ সার্ব্বত্রিকত্বং" ॥২১॥

সূত্র। অব্যূহাবিষ্টম্ভ-বিভুত্বানি চাকাশধর্ম্মাঃ ॥২২॥৪৩২॥

অনুবাদ। কিন্তু অব্যূহ, অবিষ্টম্ভ ও বিভুত্ব আকাশের ধর্ম্ম [অর্থাৎ কোন সক্রিয় দ্রব্যের দ্বারা আঘাত করিলেও আকাশের আকারান্তরের উৎপত্তি (ব্যূহ) হয় না এবং আকাশের সহিত সংযোগবশতঃ কোন সক্রিয় দ্রব্যের ক্রিয়ানিরোধও (বিষ্টম্ভ) হয় না। সুতরাং আকাশের বিভুত্ব ও (সর্ব্বব্যাপিত্ব) সিদ্ধ হয়]।

ভাষ্য। সংসর্পতা প্রতিঘাতিনা দ্রব্যেণ ন ব্যূহ্যতে—যথা কাষ্ঠে-

নোদকং। কস্মাৎ ? নিরবয়বত্বাৎ। সংসর্পচ্চ প্রতিঘাতি দ্রব্যং ন বিষ্টভ্নাতি, নাস্য ক্রিয়াহেতুং গুণং প্রতিবধ্নাতি। কস্মাৎ ? অস্পর্শত্বাৎ। বিপর্য্যয়ে হি বিষ্টম্ভো দৃষ্ট ইতি—স ভবান্ স্পর্শবতি দ্রব্যে দৃষ্টং ধর্ম্মং বিপরীতে নাশঙ্কিতুমর্হতি।

অনুবাদ। সম্যক্ ক্রিয়াবিশিষ্ট অর্থাৎ অতিবেগজন্য ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রতিঘাতি-দ্রব্য কর্ত্তৃক (আকাশ) ব্যূহিত হয় না অর্থাৎ আকারান্তর প্রাপ্ত হয় না, যেমন কাষ্ঠ কর্ত্তৃক জল ব্যূহিত হয়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) নিরবয়বত্বপ্রযুক্ত (অর্থাৎ) আকাশের অবয়ব না থাকায় উহা ব্যূহিত হইতে পারে না এবং (আকাশ) সম্যক্ ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রতিঘাতি দ্রব্যকে বিষ্টব্ধ করে না। (অর্থাৎ) ঐ দ্রব্যের ক্রিয়ার কারণ গুণকে (বেগাদিকে) প্রতিবদ্ধ করে না। (প্রশ্ন)—কেন ? (উত্তর) স্পর্শশূন্যতা-প্রযুক্ত। (অর্থাৎ আকাশের স্পর্শ না থাকায় আকাশ কোন সক্রিয় দ্রব্যের ক্রিয়ার কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিতে পারে না)। যেহেতু বিপর্য্যয় থাকিলে অর্থাৎ অস্পর্শত্বের অভাব (স্পর্শবত্তা) থাকিলে বিষ্টম্ভ দেখা যায়। সেই আপনি অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যে দৃষ্ট ধর্ম্মকে (বিষ্টম্ভকে) বিপরীত দ্রব্যে অর্থাৎ স্পর্শশূন্য দ্রব্যে আশঙ্কা করিতে পারেন না।

টিপ্পনী। আপত্তি হইতে পারে যে, আকাশ যদি সর্ব্বগত হয়, তাহা হইলে যেমন জলমধ্যে কাষ্ঠাদি নিঃক্ষেপ করিলে অথবা নৌকাদি আনিলে ঐ জলের ব্যূহন হয়, তদ্রূপ সক্রিয় প্রতি-ঘাতিদ্রব্যমাত্রেরই সংযোগে সর্ব্বত্র আকাশের ব্যূহন কেন হয় না ? এবং আকাশ সর্ব্বত্র গমনকারী মনুষ্যাদির গমনক্রিয়ার কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিয়া ঐ গমনক্রিয়া রুদ্ধ করে না কেন ? তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপ আপত্তির নিবারক বলিয়াই এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে "ব্যূহনে"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোৎপন্ন দ্রব্যের আরম্ভক সংযোগ নষ্ট করিয়া দ্রব্যা-ন্তরের আরম্ভক সংযোগের উৎপাদনই ব্যূহন। (তৃতীয় খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যেমন জলমধ্যে কাষ্ঠাদি নিঃক্ষেপ করিলে তখন সেই জলের আরম্ভক অবয়বসংযোগ নষ্ট হয় এবং তখন সেই জলের অবয়বেই পরস্পর অন্য সংযোগ উৎপন্ন হয় ; তজ্জন্য সেখানে তজ্জাতীয় অন্য জলেরই উৎপত্তি হয়। সেখানে ঐ কাষ্ঠাদি কর্ত্তৃক সেই অন্য জলের আরম্ভক অবয়বসংযোগের যে উৎপাদন, উহাই ব্যূহন। কিন্তু আকাশে উহা হয় না। অর্থাৎ আকাশে কাষ্ঠাদি নিঃক্ষেপ করিলেও তাহার কোন অংশে কিছু-মাত্র আকারের পরিবর্ত্তন হয় না। ভাষ্যকার "ন ব্যূহ্যতে" এই বাক্যের দ্বারা উহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এবং পরে "যথা কাষ্ঠেনোদকং" এই বাক্যের দ্বারা ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া উহা বুঝাইয়াছেন। অত্যল্প ক্রিয়াবিশিষ্ট যে কোনরূপ দ্রব্যের সংযোগে আকাশে পূর্ব্বোক্ত "ব্যূহনের" প্রসক্তি বা আপত্তি হয় না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"সংসর্পতা প্রতিঘাতিনা দ্রব্যেণ"। "সং"পূর্ব্বক "সৃপ"

ধাতুর অর্থ সম্যক্ গতি। সুতরাং উহার দ্বারা অতিবেগজন্য ক্রিয়াবিশেষও বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে "সংসর্পৎ" শব্দের দ্বারা ঐরূপ ক্রিয়াবিশিষ্ট, ইহা বুঝা যায়। পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম দ্রব্যে অতিবেগজন্য ক্রিয়াবিশেষ উৎপন্ন হইলেও উহার সংযোগে আকাশে ব্যূহনের আপত্তি করা যায় না। কারণ, ঐরূপ সূক্ষ্মদ্রব্য প্রতিঘাতী দ্রব্য নহে। কাষ্ঠাদি প্রতিঘাতী দ্রব্য কর্তৃক আকাশে ব্যূহন কেন হয় না? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"নিরবয়বত্বাৎ"। অর্থাৎ আকাশের অবয়ব না থাকায় তাহাতে ব্যূহন হইতে পারে না। দ্রব্যান্তরের জনক অবয়বসংযোগের উৎপাদনরূপ ব্যূহন নিরবয়ব দ্রব্যে সম্ভবই নহে। সুতরাং "অব্যূহ" আকাশের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এবং আকাশ, পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিঘাতী কোন দ্রব্যেরই বিষ্টম্ভ করে না। সুতরাং "অবিষ্টম্ভ"ও আকাশের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অবিষ্টম্ভ কি? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে নিজেই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঐ দ্রব্যের ক্রিয়ার কারণ বেগাদি গুণের অপ্রতিবন্ধই 'অবিষ্টম্ভ'। ভাষ্যকার তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাকে "অবিঘাত" নামে উল্লেখ করিয়া সেখানেও ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য সেখানেই ব্যক্ত হইয়াছে (তৃতীয় খণ্ড, ১২৩-২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মূল কথা, আকাশ ভিত্তি প্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যের ন্যায় মনুষ্যাদির গমনাদিক্রিয়ার কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিয়া ঐ গমনাদিক্রিয়া রুদ্ধ করে না। কেন করে না? এতদুত্তরে ভাষ্যকার হেতু বলিয়াছেন "অস্পর্শত্বাৎ"। পরে তিনি উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অস্পর্শত্বের বিপর্য্যয় (অভাব) স্পর্শবত্ব থাকিলেই বিষ্টম্ভ দেখা যায়। অর্থাৎ ভিত্তি প্রভৃতি স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যই মনুষ্যাদির গমনাদির ক্রিয়ার কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিয়া ঐ ক্রিয়া রুদ্ধ করে, ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যেই যে বিষ্টম্ভ দৃষ্ট হয়, নিঃস্পর্শ দ্রব্য আকাশে তাহার আপত্তি করিতে পারেন না। বার্ত্তিককার এখানে "স ভবান্ সাবয়বে স্পর্শবতি দ্রব্যে" এইরূপ পাঠ লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারেরও ঐরূপ পাঠ হইতে পারে। কিন্তু বার্ত্তিক-কার অব্যূহ ও অবিষ্টম্ভ, এই উভয় ধর্ম্ম সমর্থন করিতেই "অস্পর্শত্বাৎ" এই একই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ভাষ্যকারের ন্যায় "নিরবয়বত্বাৎ" এই হেতুবাক্য বলেন নাই। ভাষ্যকার যে ক্রিয়া হেতু গুণ বলিয়াছেন, তাহা প্রশস্তপাদোক্ত গুরুত্বাদি গুণের মধ্যে কোন গুণ[১]। পূর্ব্বোক্ত "অব্যূহ" ও "অবিষ্টম্ভ" আকাশের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায় আকাশের বিভুত্বও নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয়। আকাশ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মত্রয়বিশিষ্ট বলিয়াই প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে কাহারও স্বেচ্ছানুসারে নিয়োগ এবং প্রতিষেধও উপপন্ন হয় না (তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম আহ্নিকের ৫১শ সূত্র দ্রষ্টব্য।) এই সূত্রের "চ" শব্দটি "তু" শব্দের সমানার্থ।

ভাষ্য। **অণ্বয়বস্যাণুতরত্ব-প্রসঙ্গাদণুকার্য্যপ্রতিষেধঃ। সাবয়বত্বে চাণোরণ্বয়বোহণুতর ইতি প্রসজ্যতে। কস্মাৎ? কার্য্য-**

১। গুরুত্ব-দ্রবত্ব-বেগ-প্রযত্ন-ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংযোগবিশেষাঃ ক্রিয়াহেতবঃ।—প্রশস্তপাদভাষ্য, কাশী সংস্করণ, ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কারণ-দ্রব্যয়োঃ পরিমাণভেদদর্শনাৎ। তস্মাদণ্ববয়বস্যাণুতরত্বং। যস্তু সাবয়বোঽণুকার্য্যং তদিতি। তস্মাদণুকার্য্যমিদং প্রতিষিধ্যত ইতি।

কারণবিভাগাচ্চ কার্য্যস্যানিত্যত্বং নাকাশব্যতিভেদাৎ।

লোষ্টস্যাবয়ব-বিভাগাদনিত্যত্বং নাকাশসমাবেশাদিতি।

অনুবাদ। (উত্তর) পরমাণুর অবয়বের অণুতরত্ব-প্রসঙ্গবশতঃ অণুকার্য্যের অভাব, অর্থাৎ পরমাণুরূপ কার্য্য নাই। বিশদার্থ এই যে, পরমাণুর সাবয়বত্ব হইলে পরমাণুর অবয়ব অণুতর অর্থাৎ ঐ পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্র, ইহা প্রসক্ত হয়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু কার্য্যদ্রব্য ও কারণদ্রব্যের পরিমাণ-ভেদ দেখা যায়। অতএব পরমাণুর অবয়বের অণুতরত্ব (প্রসক্ত হয়)। কিন্তু যে পদার্থ সাবয়ব, তাহা পরমাণুর কার্য্য অর্থাৎ পরমাণু হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি দ্রব্য। অতএব এই অণুকার্য্য অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত পরমাণুরূপ কার্য্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে।

পরন্তু কারণের বিভাগপ্রযুক্ত কার্য্যের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, "আকাশব্যতিভেদ"-প্রযুক্ত নহে। (যথা) লোষ্টের অবয়ববিভাগ-প্রযুক্তই অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, আকাশের সমাবেশপ্রযুক্ত নহে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী শেষে বলিতে পারেন যে, পরমাণু নিত্য হইতে পারে না। কারণ, জগতে পদার্থ থাকিলে সেই সমস্ত পদার্থই কার্য্য অর্থাৎ জন্য হইবে। সুতরাং পরমাণু থাকিলে উহাও কার্য্য। তাহা হইলে "পরমাণুরনিত্যঃ কার্য্যত্বাদ্ঘটবৎ" এইরূপে অনুমান দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্বই সিদ্ধ হইবে। ভাষ্যকার ইহা মনে করিয়া পরে এখানে উক্তরূপ অনুমানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পরমাণু কার্য্য হইতে পারে না। পরমাণুরূপ কার্য্য নাই। সুতরাং পরমাণুতে কার্য্যত্ব হেতুই অসিদ্ধ হওয়ায় উক্তরূপ অনুমানের দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যে "অণুকার্য্যপ্রতিষেধঃ" এবং "অণুকার্য্যমিদং" এই দুই স্থলে "অণুকার্য্য" শব্দটি কর্ম্মধারয় সমাস। "অণুকার্য্যং তৎ" এই স্থলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। ভাষ্যে এখানে পরমাণু তাৎপর্য্যেই "অণু" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। পরমাণুরূপ কার্য্য নাই কেন, ইহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যদি পরমাণু কার্য্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য উহার অবয়ব স্বীকার করিয়া সেই অবয়বকে পরমাণুর উপাদান বা সমবায়িকারণ বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে সেই সমবায়িকারণ অবয়ব যে অণুতর, অর্থাৎ ঐ পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্র, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, সর্ব্বত্রই কার্য্যরূপ দ্রব্য ও কারণরূপ দ্রব্যের পরিমাণভেদ দেখা যায়। কার্য্যদ্রব্য অপেক্ষায় তাহার কারণদ্রব্য যে অবয়ব, তাহা ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে। সুতরাং পরমাণুরূপ কার্য্যের অবয়ব যে উহা হইতে ক্ষুদ্রই হইবে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে সেই অবয়বের অবয়ব এবং তাহার অবয়ব, ইত্যাদিরূপে অনন্ত অবয়বপরম্পরা স্বীকার করিয়া সূক্ষ্ম পরিমাণের কুত্রাপি বিশ্রাম নাই, সর্ব্বাপেক্ষা

সূক্ষ্ম কোন দ্রব্য নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ এবং সুমেরুপর্ব্বত ও সর্ষপের তুল্যপরিমাণাপত্তি-দোষ অনিবার্য্য। পরন্তু তাহা হইলে "পরমাণু" শব্দের প্রয়োগই হইতে পারে না। কারণ, যাহা অণুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহাকেই পরমাণু বলা হইয়া থাকে। নচেৎ "পরম" এই বিশেষণ-পদের প্রয়োগ ব্যর্থ। কিন্তু যদি সমস্ত অণুরই অবয়ব থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্ত অবয়বই তাহার কার্য্য অণু হইতে অণুতর হইবে। সর্ব্বাপেক্ষায় অণু অর্থাৎ যাহা হইতে আর অণুতর নাই, এমন কিছুই থাকিবে না। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদী কাহাকে পরমাণু বলিবেন? তিনি "পরমাণু" শব্দের দ্বারা যাহাকেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহাই তাঁহার মতে যখন সাবয়ব, তখন তাহা ত সর্ব্বাপেক্ষায় অণু হইবে না? সর্ব্বাপেক্ষায় অণু না হইলেও আমরা তাহাতে "পরমাণু" শব্দের মুখ্য প্রয়োগ স্বীকার করিতে পারি না। কুত্রাপি মুখ্য প্রয়োগ সম্ভব না হইলে গৌণ প্রয়োগও বলা যায় না। ভাষ্যকার "অণুতরত্বপ্রসঙ্গাৎ" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অনুপপত্তিরও সূচনা করিয়াছেন। মূলকথা, পরমাণুরূপ কার্য্য নাই, উহা হইতেই পারে না। যাহা পরমাণু, তাহা অবশ্যই নিরবয়ব। সুতরাং তাহা উৎপন্ন হইতেই পারে না। অতএব তাহাতে কার্য্যত্ব হেতুই অসিদ্ধ হওয়ায় ঐ হেতুর দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু পরমাণুত্ব হেতুর দ্বারা সমস্ত পরমাণুতে নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হওয়ায় নিরবয়ব দ্রব্যত্ব হেতুর দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্বই সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, যাহা পরমাণু, তাহা সাবয়ব হইতেই পারে না। যাহা সাবয়ব, তাহা পরমাণুর কার্য্য দ্ব্যণুকাদি দ্রব্য। ভাষ্যকার "যস্তু সাবয়বঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্তরূপ অনুমানেরও সূচনা করিয়াছেন বুঝা যায়। অর্থাৎ যাহা নিরবয়ব নহে, তাহা পরমাণু নহে—যেমন দ্ব্যণুকাদি, এইরূপে ব্যতিরেকী উদাহরণের দ্বারা পরমাণুত্ব হেতুতে নিরবয়বত্বের ব্যাপ্তি-নিশ্চয়বশতঃ "পরমাণুর্নিরবয়বঃ পরমাণুত্বাৎ" এইরূপে পরমাণুতে নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হয়। সমস্ত পরমাণুতে নিরবয়বত্বের অনুমানে পরমাণুত্বও হেতু হইতে পারে।

ভাষ্যকার শেষে পরমাণুর বিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্বও যে সিদ্ধ হয় না, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কারণের বিভাগপ্রযুক্তই কার্য্য দ্রব্যের বিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। আকাশব্যতিভেদপ্রযুক্ত উহা সিদ্ধ হয় না। যেমন লোষ্টের অবয়ববিভাগপ্রযুক্তই উহার বিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, লোষ্টমধ্যে আকাশ-সমাবেশ-প্রযুক্ত উহা সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন বিনষ্ট লোষ্টের অবয়বরূপ উপাদান-কারণের বিভাগ হওয়ায় উহার বিনাশ স্বীকার করা যায়, লোষ্টমধ্যে আকাশসমাবেশ আছে বলিয়াই যে উহার বিনাশ সিদ্ধ হয়, তাহা নহে। এইরূপ পরমাণুতে আকাশসমাবেশ আছে বলিয়া যে উহার বিনাশ সিদ্ধ হয়, তাহা বলা যায় না। অর্থাৎ পরমাণুর সহিত আকাশের সংযোগমাত্রই যদি আকাশব্যতিভেদ হয়, তাহা হইলে উহা পরমাণুতে অবশ্যই আছে। কিন্তু উহার দ্বারা পরমাণুর বিনাশিত্ব সিদ্ধ হয় না। পরমাণুর অবয়ব না থাকায় অবয়বরূপ কারণের বিভাগ সম্ভব না হওয়ায় লোষ্টের ন্যায় উহার বিনাশিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। নিরবয়ব পরমাণুবিরোধী পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের অন্যান্য বিশেষ কথা ও তাহার উত্তর পরবর্ত্তী তিনটি সূত্রে পাওয়া যাইবে ॥২২॥

সূত্র। মূর্ত্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপত্তেরবয়ব-সদ্ভাবঃ ॥ ॥২৩॥৪৩৩॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) কিন্তু, মূর্ত্ত অর্থাৎ স্পর্শবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যসমূহের "সংস্থান" অর্থাৎ আকৃতির সত্তা থাকায় (পরমাণুসমূহের) অবয়বের সত্তা আছে।

ভাষ্য। পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পর্শবতাং সংস্থানং ত্রিকোণং চতুরস্রং সমং পরিমণ্ডলমিত্যুপপদ্যতে। যত্তৎ সংস্থানং সোঽবয়বসন্নিবেশঃ। পরিমণ্ডলাশ্চাণবস্তস্মাৎ সাবয়বা ইতি।

অনুবাদ। স্পর্শবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যসমূহেব অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের ত্রিকোণ, চতুরস্র, সম, পরিমণ্ডল, এই সমস্ত "সংস্থান" আছে। সেই যে "সংস্থান," তাহা অবয়বসমূহের সন্নিবেশ অর্থাৎ বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আকৃতি। পরমাণু-সমূহ কিন্তু "পরিমণ্ডল" অর্থাৎ পরিমণ্ডলাকৃতিবিশিষ্ট, অতএব সাবয়ব।

টিপ্পনী। মহর্ষি পরমাণুর সাবয়বত্ব-সাধনে পূর্ব্বোক্ত হেতু (আকাশব্যতিভেদ) খণ্ডন করিয়া এখন এই সূত্রের দ্বারা অপর হেতুর উল্লেখপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষরূপে পরমাণুসমূহের সাবয়বত্ব সমর্থন করিয়াছেন। "সংস্থানে"র উপপত্তি অর্থাৎ সংস্থানবত্তা বা আকৃতিমত্তাই সেই অপর হেতু। "সংস্থান" বলিতে অবয়বসমূহের সন্নিবেশ অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগ। যেমন বস্ত্রের উপাদান-কারণ সূত্রসমূহের যে পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগ, যাহা ঐ বস্ত্রের অসমবায়ি কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাই ঐ বস্ত্রের "সংস্থান"। উহাকেই আকৃতি বলে। উহা গুণ পদার্থ। সূত্রে "উপপত্তি" শব্দের অর্থ এখানে সত্তা। পরমাণুসমূহে সংস্থানের সত্তা আছে, অতএব অবয়বের সদ্ভাব অর্থাৎ সত্তা আছে। কারণ, অবয়ব না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত সংস্থান বা আকৃতি থাকিতে পারে না, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য। পরমাণুসমূহে যে সংস্থান আছে, তাহা কিরূপে বুঝিব ? তাই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মূর্ত্ত দ্রব্যমাত্রেরই সংস্থান আছে। যে পরিমাণ কোন পরিমাণ হইতে অপকৃষ্ট, তাহাকে "মূর্ত্তি" ও "মূর্ত্তত্ব" বলা হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা ভিন্ন পৃথিব্যাদি সমস্ত দ্রব্যেই ঐ মূর্ত্তি বা মূর্ত্তত্ব আছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে মনকে ত্যাগ করিয়া স্পর্শবিশিষ্ট মূর্ত্ত দ্রব্য অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়কেই সূত্রোক্ত "মূর্ত্তিমৎ" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পর্শবতাং"। কারণ, মূর্ত্তত্ব বা পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু স্পর্শশূন্য মনেও আছে। তাহাতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর উহাতেও সংস্থানবত্তার সাধন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। কেবল স্পর্শবত্ত্ব হেতু গ্রহণ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য ; উহাতে লাঘবও আছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য মনে হয়। সূত্রোক্ত "মূর্ত্তি"বিশিষ্ট বা মূর্ত্ত দ্রব্যকেই পরিচ্ছিন্ন দ্রব্য বলে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, স্পর্শবিশিষ্ট

পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যসমূহের অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু, এই ভূতচতুষ্টয়ের ত্রিকোণ, চতুরস্র, সম, ও পরিমণ্ডল অর্থাৎ বর্ত্তুল, এই সমস্ত "সংস্থান" আছে। পরমাণুসমূহে "পরিমণ্ডল" নামক সংস্থান আছে। তাই পরে পরমাণুসমূহকে পরিমণ্ডল বলিয়াছেন। যদিও পূর্ব্বোক্ত ত্রিকোণ প্রভৃতি সংস্থানেরই প্রকারবিশেষ। সুতরাং ত্রিকোণত্ব প্রভৃতি ঐ সংস্থান বা আকৃতিরই ধর্ম্ম। কিন্তু ঐ আকৃতিবিশিষ্ট দ্রব্যকেও "ত্রিকোণ" প্রভৃতি বলা হয়। অর্থাৎ যে দ্রব্যের সংস্থান ত্রিকোণ, তাহাতে ঐ ত্রিকোণত্ব ধর্ম্মের পরম্পরা সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া, সেই দ্রব্যকেও ত্রিকোণ বলা হয়। এবং যে দ্রব্যের সংস্থান "পরিমণ্ডল", তাহাকেও পরিমণ্ডল বলা হয়। সেখানে 'পরিমণ্ডল' শব্দের অর্থ পরিমণ্ডলাকৃতিবিশিষ্ট। ভাষ্যকার ঐ অর্থেই পরে পরমাণুসমূহকে পরিমণ্ডল বলিয়াছেন এবং তজ্জন্যই ঐ স্থলে পুংলিঙ্গ "পরিমণ্ডল" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ, ঐ স্থলে "পরিমণ্ডল" শব্দ পরমাণুর বিশেষণবোধক। মূলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদী পরমাণুতে পরিমণ্ডলাকৃতি আছে, ইহা বলিয়াই পরমাণুরও সাবয়বত্ব সমর্থন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর কিন্তু এখানে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন,—"সাবয়বাঃ পরমাণবো মূর্ত্তিমত্বাদিতি, সংস্থানবত্ত্বাচ্চ সাবয়বা ইতি"। অর্থাৎ তাহার মতে পরমাণুসমূহের সাবয়বত্ব-সাধনে মূর্ত্তিমত্ত্ব অর্থাৎ মূর্ত্তত্ব বা পরিচ্ছিন্নত্ব প্রথম হেতু, এবং সংস্থানবত্ত্ব দ্বিতীয় হেতু, ইহাই এখানে পূর্ব্বপক্ষসমর্থক মহর্ষির তাৎপর্য্য। কিন্তু সূত্রপাঠ ও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা সরলভাবে ইহা বুঝা যায় না। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাখ্যায় সংস্থানবত্ত্ব হেতুর দ্বারাই পরমাণুসমূহের সাবয়বত্ব সাধন করিয়াছেন। পরমাণুসমূহের ঐ সংস্থানের নাম "পরিমণ্ডল"। ন্যায়-বৈশেষিকমতে পরমাণুর যে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ, তাহাকেই "পরিমণ্ডল" বলা হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ "নিত্যং পরিমণ্ডলং" (৭।১।২০) এই সূত্রের দ্বারা পরমাণুর পরিমাণকেই "পরিমণ্ডল" বলিয়া নিত্য বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ ও ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরভট্ট প্রভৃতি উহাকে "পারিমাণ্ডল্য" বলিয়াছেন। কণাদসূত্রোক্ত "পরিমণ্ডল" শব্দের উত্তর স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ে ঐ "পারিমাণ্ডল্য" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার এই সূত্রে "চ" শব্দকে "তু" শব্দের সমানার্থক বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের নিবর্ত্তক বলিয়াছেন ॥২৩॥

সূত্র। সংযোগোপপত্তেশ্চ ॥২৪॥৪৩৪॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) এবং সংযোগের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরমাণুসমূহে সংযোগের সত্তা বা সংযোগবত্তাপ্রযুক্ত (পরমাণুসমূহের) অবয়বের সত্তা আছে।

ভাষ্য। মধ্যে সন্নণুঃ পূর্ব্বাপরাভ্যামণুভ্যাং সংযুক্তস্তয়োর্ব্যবধানং কুরুতে। ব্যবধানেনানুমীয়তে পূর্ব্বভাগেন পূর্ব্বেণাণুনা সংযুজ্যতে,

পরভাগেন পরেণাণুনা সংযুজ্যতে। যৌ তৌ পূর্ব্বাপরৌ ভাগৌ তা-বস্যাবয়বৌ। এবং সর্ব্বতঃ সংযুজ্যমানস্য সর্ব্বতো ভাগা অবয়বা ইতি।

অনুবাদ। মধ্যস্থানে বর্ত্তমান পরমাণু পূর্ব্ব ও অপর অর্থাৎ ঐ পরমাণুর পূর্ব্ব-দেশস্থ ও পশ্চিমদেশস্থ পরমাণুদ্বয় কর্ত্তৃক সংযুক্ত হইয়া, সেই পরমাণুদ্বয়ের ব্যবধান করে। ব্যবধানের দ্বারা অনুমিত হয়—(ঐ মধ্যস্থ পরমাণু) পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বপরমাণু কর্ত্তৃক সংযুক্ত হয়, পরভাগে অপর পরমাণু কর্ত্তৃক সংযুক্ত হয়। সেই যে, পূর্ব্ব-ভাগ ও অপরভাগ, তাহা এই পরমাণুর অবয়ব। এইরূপ সর্ব্বত্র অর্থাৎ অধঃ ও ঊর্দ্ধ প্রভৃতি দেশেও (অন্য পরমাণু কর্ত্তৃক) সংযুজ্যমান হওয়ায় সেই পরমাণুর সর্ব্বত্র ভাগ (অর্থাৎ) অবয়বসমূহ আছে।

। মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর চরম হেতুর উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ব-পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বসূত্র হইতে "অবয়বসদ্ভাবঃ" এই বাক্যের অনুবৃত্তি এখানে মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে "সংযোগোপপত্তেশ্চাবয়বসদ্ভাবঃ" ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত বাক্য বুঝা যায়। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ এখানে সত্তা বা বিদ্যমানতা। তাহা হইলে সংযোগিত্বই এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত হেতু বুঝা যায়। তাই বার্ত্তিককার প্রথমেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সাবয়বত্বং সংযোগিত্বাদিতি সূত্রার্থঃ"। পরে তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রে "সংস্থান" শব্দের দ্বারা সংযোগবিশেষই হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে। কারণ, অবয়ব-সংযোগবিশেষই "সংস্থান" শব্দের অর্থ। কিন্তু এই সূত্রে "সংযোগ" শব্দের দ্বারা সংযোগমাত্রই হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং পুনরুক্তি-দোষ হয় নাই। বস্তুতঃ এই সূত্রের দ্বারা সরলভাবে পূর্ব্বপক্ষ বুঝা যায় যে, যে হেতু পরমাণুতে সংযোগ জন্মে,—কারণ, পরমাণুবাদীদিগের মতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুক নামক অবয়বীর উৎপত্তি হয়, অতএব পরমাণু সাবয়ব। কারণ, নিরবয়ব দ্রব্যে সংযোগ জন্মিতে পারে না। সংযোগ জন্মিলেই কোন অবয়ববিশেষের সহিতই উহা জন্মে। সুতরাং পরমাণুর অবয়ব না থাকিলে তাহাতে সংযোগোৎপত্তি হইতেই পারে না। "পরমাণুকারণবাদ" খণ্ডন করিতে শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও উক্ত যুক্তির দ্বারা নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগ খণ্ডন করিয়া উক্ত মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্বেই ন্যায়দর্শনে পূর্ব্বপক্ষরূপে পরমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন করিতে এই সূত্রে উক্ত যুক্তির উল্লেখ হইয়াছে। পরে বিজ্ঞানবাদী ও সর্ব্বশূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় নানারূপে উক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া উহার দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সাধন করিতে বহু প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এখানে পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, কোন একটি পরমাণু মধ্যস্থানে বর্ত্তমান আছে, এমন সময়ে তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম স্থানস্থ অর্থাৎ বামস্থ ও দক্ষিণস্থ দুইটি পরমাণু আসিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া, পরমাণুর

ব্যবধান করে। ঐ ব্যবধানের দ্বারা অবশ্যই অনুমান করা যায় যে, সেই মধ্যস্থ পরমাণু তাহার পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বস্থ পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়, এবং পরভাগে পশ্চিমস্থ পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়। তাহা হইলে সেই মধ্যস্থ পরমাণুর পূর্ব্বভাগ ও অপরভাগ সিদ্ধ হওয়ায় উহার দুইটি অবয়বই সিদ্ধ হয়। কারণ, সেই পূর্ব্বভাগ ও অপর ভাগকে তাহার অবয়বই বলিতে হইবে। এইরূপ সেই মধ্যস্থ পরমাণুর অধঃ ও উর্দ্ধ প্রভৃতি স্থানস্থ পরমাণুর সহিতও তাহার সংযোগ হওয়ায় উহার সর্ব্বত্রই "ভাগ" অর্থাৎ অবয়ব আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত রূপে সমস্ত পরমাণুতেই ঐরূপে অন্যান্য পরমাণুর সংযোগ হওয়ায় সেই সংযোগবত্ত্ব হেতুর দ্বারা সমস্ত পরমাণুই সাবয়ব, অর্থাৎ সমস্ত পরমাণুরই নানা অবয়ব আছে, ইহা সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি বুঝাইতে "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর "ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগাৎ" ইত্যাদি বৌদ্ধ কারিকা উদ্ধৃত করিয়া উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, একটি পরমাণু একই সময়ে ছয়টি পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হওয়ায় ষড়ংশ, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, একই স্থানে ছয়টি সংযোগ হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ হইয়া থাকে। আর যদি ঐ পরমাণুর একই প্রদেশে ছয়টি পরমাণুর ছয়টি সংযোগ জন্মে, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ" অর্থাৎ ঐ সাতটি পরমাণুর পরস্পর সংযোগে যে পিণ্ড উৎপন্ন হইবে, তাহা পরমাণুমাত্রই হয়, অর্থাৎ উহা স্থূল হইতে পারে না। সুতরাং দৃশ্য হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থাকিলেই তাহার সহিত অন্যান্য পরমাণুর সংযোগবশতঃ উৎপন্ন দ্রব্যের প্রথিমা বা বিস্তৃতি হইতে পারে। কিন্তু পরমাণুর কোন প্রদেশ না থাকিলে তাহা হইতে পারে না। একই প্রদেশে বহু পরমাণুর সংযোগ হইলেও তাহা হইতে পারে না। বস্তুতঃ একই প্রদেশে অনেক সংযোগ জন্মিতেই পারে না এবং পরমাণুর কোন প্রদেশ বা অবয়ব না থাকিলে তাহার সহিত বহু পরমাণুর সংযোগই জন্মিতে পারে না। কিন্তু মধ্যস্থানে বর্ত্তমান একটি পরমাণুর চতুষ্পার্শ্ব এবং অধঃ ও উর্দ্ধ, এই ছয় দিক্ হইতে ছয়টি পরমাণু আসিয়া যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে যখন ঐ পরমাণুর নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সেই ছয় পরমাণুর সহিত সেই পরমাণুর যুগপৎ সংযোগবশতঃ উহার যে ছয়টি অংশ বা অবয়ব আছে, ইহা স্বীকার্য্য। তাই বলা হইয়াছে, "ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা। ষণ্ণাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ॥"

উদ্দ্যোতকর এখানে "অয়মেবার্থঃ কারিকয়া গীয়তে" এই কথা বলিয়া বিজ্ঞানমাত্রবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি" গ্রন্থের "বিংশতিকা" কারিকার অন্তর্গত উক্ত কারিকাই উদ্ধৃত করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ঐ গ্রন্থে উক্ত কারিকার তৃতীয় পাদে "ষণ্ণাং সমানদেশত্বাৎ" এইরূপ পাঠ আছে। ঐ পাঠই যে প্রকৃত, ইহা বসুবন্ধুর নিজের ব্যাখ্যার দ্বারাও নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। সুতরাং এখানে "ন্যায়বার্ত্তিক" পুস্তকে মুদ্রিত "ষণ্ণাং সমানদেশত্বে" এইরূপ পাঠ এবং "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" (বৌদ্ধদর্শনে) মাধবাচার্য্যের উদ্ধৃত ঐ কারিকায় "তেষামপ্যেকদেশত্বে" এইরূপ পাঠ প্রকৃত নহে। ন্যায়বার্ত্তিকে পরে উদ্দ্যোতকরের "ষণ্ণাং সমানদেশত্বাদিতিবাক্যং" এইরূপ উক্তিও দেখা যায়। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত কারিকায় অন্যরূপ পাঠ, সংশোধকের অনবধানতামূলক সন্দেহ নাই। উদ্দ্যোতকর

পরেও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে বসুবন্ধুর "বিংশতিকা কারিকা"র অন্তর্গত তৃতীয় কারিকার[1] প্রতিপাদ্য বিষয়ের খণ্ডন পূর্ব্বক সপ্তম কারিকার পূর্ব্বার্দ্ধ[2] উদ্ধৃত করিয়া উহার ব্যাখ্যা প্রকাশপূর্ব্বক নিজ সিদ্ধান্তে দোষ পরিহার করিয়াছেন। সুতরাং উদ্দ্যোতকর যে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর "বিংশতিকা কারিকার"ও প্রতিবাদ করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বসুবন্ধু বিজ্ঞানবাদের প্রধান আচার্য্য অসঙ্গের কনিষ্ঠ সহোদর। তিনি প্রথমে হীনযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অন্তর্গত সর্ব্বাস্তিবাদী বৈভাষিকসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পরে জ্যেষ্ঠ অসঙ্গ কর্ত্তৃক বিজ্ঞানবাদী যোগাচারমতে দীক্ষিত হইয়া মহাযানসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন। প্রখ্যাত বৌদ্ধনৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ তাঁহারই প্রধান শিষ্য। তিনিও প্রথমে নাগদত্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হীনযানসম্প্রদায়েই প্রবিষ্ট ছিলেন। পরে বসুবন্ধুর পাণ্ডিত্যাদি-প্রভাবে মহাযানসম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব অভ্যুদয়ে তিনিও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানবাদেরই সমর্থন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হীনযানসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বিজ্ঞান ভিন্ন বাহ্য পদার্থের সত্তা সমর্থন করিয়া ঐ বাহ্য পদার্থকে পরমাণুপুঞ্জমাত্র বলিতেন। বসুবন্ধু "বিংশতিকা কারিকা"র দ্বারা বিজ্ঞানবাদ সমর্থন করিতে পরমাণু খণ্ডন করিয়া উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে "ত্রিংশিকা-বিজ্ঞপ্তি কারিকা"র দ্বারা বিজ্ঞানবাদ সমর্থন করিয়াছেন। বৌদ্ধাচার্য্য স্থিরমতি উহার ভাষ্য করিয়া বিশদভাবে বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সহিত বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু প্রভৃতির তৎকালে অতি প্রবল বিবাদ ঘটিয়াছিল, ইহা তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত গ্রন্থের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সম্মত বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বিষয় খণ্ডন করিতে বসুবন্ধু বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত বিষয় বৈশেষিকাদি মতানুসারে অবয়বিরূপ একও বলা যায় না; অনেক পরমাণুও বলা যায় না; সংহত অর্থাৎ পুঞ্জীভূত বা মিলিত পরমাণুসমষ্টিও বলা যায় না। কারণ, পরমাণুই সিদ্ধ হয় না। কেন সিদ্ধ হয় না? তাই পরে "ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগাৎ" ইত্যাদি কারিকার দ্বারা নিরবয়ব পরমাণুর অসিদ্ধি সমর্থন করিয়াছেন। হীনযানসম্প্রদায়ের সংরক্ষক কাশ্মীরীয় বৈভাষিকগণ পরমাণুর সংঘাতে সংযোগ স্বীকার করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে সংহত বা পুঞ্জীভূত পরমাণুসমূহে সংযোগ হইতে পারে। বসুবন্ধু পরে উক্ত মতেরও খণ্ডন করিতে "পরমাণোরসংযোগে" ইত্যাদি কারিকার দ্বারা বলিয়াছেন যে, যখন প্রত্যেক পরমাণুতেই সংযোগ অসম্ভব, তখন উহার সংঘাতেও সংযোগ হইতে পারে না। কারণ, উক্ত মতে ঐ সংঘাত বা সমষ্টিও নিরবয়ব প্রত্যেক পরমাণু হইতে কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। বসুবন্ধু পরে "দিগ্‌ভাগভেদো যস্যাস্তি" ইত্যাদি কারিকার

১। দেশাদি নিয়মঃ সিদ্ধঃ স্বপ্নবৎ প্রেতবৎ পুনঃ।
সন্তানানিয়মঃ সর্ব্বৈঃ পূয়নদ্যাদিদর্শনে ॥৩॥—বিংশতিকা কারিকা ॥

২। কর্ম্মণো বাসনান্যত্র ফলমন্যত্র কল্প্যতে।
তত্রৈব নেষ্যতে যত্র বাসনা কিং নু কারণং ॥৭॥—বিংশতিকা কারিকা ॥

দ্বারা পরমাণুর একত্ব যে সম্ভব হয় না এবং পরমাণু নিরবয়ব হইলে ছায়া ও আবরণ সম্ভবই হয় না, ইহাও বলিয়াছেন[১]। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

বসুবন্ধুর অনেক পরে সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিতও "তত্ত্বসংগ্রহ" পুস্তকে পরমাণুখণ্ডনে বসুবন্ধুর যুক্তিবিশেষের সমর্থন করিয়াছেন[২]। পরে তিনি তাঁহার মূল যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাহা একস্বভাবশূন্য এবং

১। ন তদেকং ন চানেকং বিষয়ঃ পরমাণুশঃ। ন চ তে সংহতা যস্মাৎ পরমাণুর্ন সিধ্যতি ॥১১
ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা। ষণ্ণাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ ॥১২॥
পরমাণোরসংযোগে তৎসংঘাতেঽস্তি কস্য সঃ। ন চানবয়বত্বেন তৎসংযোগো ন সিধ্যতি ॥১৩॥
দিগ্‌ভাগভেদো যস্যাস্তি তস্যৈকত্বং ন যুজ্যতে। ছায়াবৃতী কথং বাঽন্যো ন পিণ্ডশ্চেন্ন তস্য তে ॥১৪॥
—বসুবন্ধুকৃত বিংশতিকাকারিকা ॥

ষড়্‌ভ্যো দিগ্‌ভ্যঃ ষড়্‌ভিঃ পরমাণুভির্যুগপদ্‌যোগে সতি পরমাণোঃ ষড়ংশতা প্রাপ্নোতি। একস্য যো দেশস্তত্রান্যস্যাসম্ভবাৎ। অথ যত্রৈকস্য পরমাণোর্দেশঃ স এব ষণ্ণাং ?—তেন সর্ব্বেষাং সমানদেশত্বাৎ সর্ব্বঃ পিণ্ডঃ পরমাণুমাত্রঃ স্যাৎ পরস্পরাব্যতিরেকাদিতি ন কশ্চিৎ পিণ্ডো দৃশ্যঃ স্যাৎ। নৈব হি পরমাণবঃ সংযুজ্যন্তে, নিরবয়বত্বাৎ ॥১২॥

মা ভূদেষ দোষপ্রসঙ্গঃ, সংহতাস্তু পরস্পরং সংযুজ্যন্ত ইতি কাশ্মীরবৈভাষিকাস্ত ইদং প্রষ্টব্যাঃ, যঃ পরমাণূনাং সংঘাতো ন স তেভ্যোঽর্থান্তরমিতি পরমাণোরসংযোগে "তৎসংঘাতেঽস্তি কস্য সঃ" সংযোগ ইতি বর্ত্ততে। "ন চানবয়বত্বেন তৎসংযোগো ন সিধ্যতি" (১৩)। অথ সংঘাতা অপ্যন্যোন্যং ন সংযুজ্যন্তে, ন তর্হি পরমাণূনাং নিরবয়বত্বাৎ সংযোগো ন সিধ্যতীতি বক্তব্যং, সাবয়বস্যাপি হি সংঘাতস্য সংযোগানভ্যুপগমাৎ। তস্মাৎ পরমাণুরেকং দ্রব্যং ন সিধ্যতি, যদি চ পরমাণোঃ সংযোগ ইষ্যতে যদি বা নেষ্যতে ॥১৩॥

"দিগ্‌দেশভেদো যস্যাস্তি তস্যৈকত্বং ন যুজ্যতে"। অন্যো হি পরমাণোঃ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগো যাবদধোদিগ্‌ভাগ ইতি। দিগ্‌ভাগভেদে সতি কথং তদাত্মকস্য পরমাণোরেকত্বং যোক্ষ্যতে। "ছায়াবৃতী কথং বা"—যদ্যেকৈকস্য পরমাণোর্দিগ্‌ভাগভেদো ন স্যাদাদিত্যোদয়ে কথমন্যত্র ছায়া ভবত্যন্যত্রাতপঃ। নহি তস্যান্যঃ প্রদেশোঽস্তি যত্রাতপো ন স্যাৎ। আবরণঞ্চ কথং ভবতি পরমাণোঃ পরমাণ্বন্তরেণ, যদি দিগ্‌ভাগভেদো নেষ্যতে। নহি কশ্চিদপি পরমাণোঃ পরভাগোঽস্তি, যত্রাগমনাদন্যেনান্যস্য প্রতিঘাতঃ স্যাৎ। অসতি চ প্রতিঘাতে সর্ব্বেষাং সমানদেশত্বাৎ সর্ব্বঃ সংঘাতঃ পরমাণুমাত্রঃ স্যাদিত্যুক্তং। কিমেবং পিণ্ডস্য তে ছায়াবৃতী, ন, পরমাণোরিতি,—কিং খলু পরমাণুভ্যোঽন্যঃ পিণ্ড ইষ্যতে, যস্য তে স্যাতাং, নেত্যাহ "অন্যো ন পিণ্ডশ্চেন্ন তস্য তে" (১৪)। যদি নান্যঃ পরমাণুভ্যঃ পিণ্ড ইষ্যতে, ন তে তস্যেতি সিদ্ধং ভবতি" ইত্যাদি। (উদ্ধৃত কারিকাত্রয়ের বসুবন্ধুকৃত বৃত্তি)। প্যারিসে মুদ্রিত লেভি সাহেবের সম্পাদিত "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি" দ্রষ্টব্য।

২। সংযুক্তং দূরদেশস্থং নৈরন্তর্য্যব্যবস্থিতং।
একাণ্বভিমুখং রূপং যদণোর্মধ্যবর্ত্তিনঃ ॥
অণ্বন্তরাভিমুখ্যেন তদেব যদি কল্প্যতে।
প্রচয়ো ভূধরাদীনামেবং সতি ন যুজ্যতে ॥
অণ্বন্তরাভিমুখ্যেন রূপঞ্চেদন্যদিষ্যতে।
কথং নাম ভবেদেকঃ পরমাণুস্তথা সতি ॥
—"তত্ত্বসংগ্রহ", গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, ৫৫৬ পৃষ্ঠা।

অনেকস্বভাবশূন্য, অর্থাৎ যাহা একও হইতে পারে না, অনেকও হইতে পারে না, তাহা সৎ পদার্থ নহে। তাহা অসৎ—যেমন গগনপদ্ম। পরমাণু একস্বভাবও নহে, অনেকস্বভাবও নহে। সুতরাং উহা গগনপদ্মের ন্যায় অসৎ[১]। পরমাণুবাদীদিগের মতে কোন পরমাণুই অনেক নহে। কিন্তু কোন পরমাণু একও হইতে পারে না। শান্ত রক্ষিত ইহা সমর্থন করিতে বসুবন্ধুর ন্যায় প্রত্যেক পরমাণুরই যে অধঃ ও উর্দ্ধ প্রভৃতি দিগ্‌ভাগে ভেদ আছে, সুতরাং উহার একত্ব সম্ভব নহে, ইহা বুঝাইয়াছেন। শান্ত রক্ষিতের উপযুক্ত শিষ্য মহামনীষী কমলশীল "তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা"য় বহু বিচার করিয়া শান্ত রক্ষিতের যুক্তি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে পরমাণু-বাদী বৈভাষিকসম্প্রদায়ের মধ্যে মতত্রয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, পরমাণুসমূহ পরস্পর সংযুক্তই থাকে, ইহা এক সম্প্রদায়ের মত। অপর সম্প্রদায়ের মত এই যে, পরমাণুসমূহ সতত সান্তরই থাকে অর্থাৎ কোন পরমাণুই অপর পরমাণুকে স্পর্শ করে না। অন্য সম্প্রদায়ের মত এই যে, পরমাণুসমূহ যখন নিরন্তর হয়, অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে ব্যবধান থাকে না, তখন উহাদিগের "স্পৃষ্ট" এই সংজ্ঞা হয়। তন্মধ্যে ভদন্ত শুভ গুপ্ত প্রথমোক্ত মতের সমর্থক। পরমাণুসমূহের পরস্পর সন্নি-ধান হইলেও সংযোগ জন্মে না, কোন পরমাণুই অপর পরমাণুকে স্পর্শ করে না, এই দ্বিতীয় মতটী আমরা অনেক দিন হইতে শুনিতেছি। কিন্তু উহা কাহার মত, তাহা কমলশীলও ব্যক্ত করিয়া বলেন নাই। তৃতীয় মতও দ্বিতীয় মতের অনুরূপ। পূর্ব্বোক্ত মতত্রয়েই মধ্যবর্ত্তী পরমাণু অন্যান্য বহু পরমাণুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে দিগ্‌ভাগে সেই পরমাণুর ভেদ স্বীকার্য্য। নচেৎ প্রচয় বা স্থূলতা হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুবাদীদিগের মতে পরমাণুর অংশ বা অবয়ব নাই। শান্ত রক্ষিতের কারিকার ব্যাখ্যার দ্বারা কমলশীল ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন এবং উহা সমর্থন করিতে বসুবন্ধুর "দিগ্‌ভাগভেদো যস্যাস্তি তস্যৈকত্বং ন যুজ্যতে" এই কারিকার্দ্ধও সেখানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি উক্ত বিষয়ে ভদন্ত শুভ গুপ্তের সমাধানের উল্লেখ করিয়াও খণ্ডন করিয়াছেন। পরে অতি সূক্ষ্ম প্রদেশই পরমাণু, উহার অবয়ব কল্পনা করিলে সেই সমস্ত অবয়বও অতি সূক্ষ্মই হইবে, অনবস্থা হইলেও ক্ষতি নাই, ইহাও অপর সম্প্রদায়ের মত বলিয়া প্রকাশ করিয়া শান্ত রক্ষিতের কারিকার দ্বারা উক্ত মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থ "তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা" পাঠ করিলে পরমাণুবাদী বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কত প্রকারে যে পরমাণুর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের দীর্ঘকাল যাবৎ কিরূপ বিবাদ চলিয়াছিল, নানা দিক্ হইতে নানা প্রকারে বাহ্যাস্তিত্ববাদের প্রবল প্রতিবাদে হীনযান-সম্প্রদায় কিরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিজ্ঞানবাদের প্রচারক মহাযান-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ পরমাণুর অবয়ব সমর্থনে আরও অনেক হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়-বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যের "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র টীকায় নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির উদ্ধৃত "ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগাৎ" ইত্যাদি কারিকার পরার্দ্ধে অন্যান্য

১। অনতিশয়যোগোক্তঃ পরমাণুর্বিপশ্চিতাং।
একানেকস্বভাবেন শূন্যত্বাদ্বিয়দজ্জবৎ॥—তত্ত্বসংগ্রহ, ৫০৮ পৃষ্ঠা।

হেতুরও উল্লেখ দেখা যায়; পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। ফলকথা, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় নানা হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সাধন করিয়াছেন। সর্ব্বাভাববাদীও ঐ সমস্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পরমাণুর অবয়বপরম্পরা সিদ্ধ হইলে সেই সমস্ত অবয়বও তাহার অবয়বে কোনরূপে বর্ত্তমান হইতে পারে না, সুতরাং পরমাণু নাই, এইরূপে পূর্ব্ববৎ বিচার করিয়া পরমাণুর অভাব সাধন করাই বিজ্ঞানবাদীর ন্যায় সর্ব্বাভাববাদীরও গূঢ় উদ্দেশ্য। অতঃপর পরমাণুর পূর্ব্বোক্ত বাধক যুক্তিসমূহের খণ্ডন পাওয়া যাইবে।

ভাষ্য। যত্তাবৎ **মূর্ত্তিমতাং সংস্থানোপপত্তেরবয়বসদ্ভাব** ইতি, অত্রোক্তং, কিমুক্তং? **বিভাগেঽল্পতরপ্রসঙ্গস্য যতো নাল্পীয়স্তত্র নিবৃত্তেঃ,—অণ্বয়বস্য চাণুতরত্ব-প্রসঙ্গাদণুকার্য্য-প্রতিষেধ** ইতি।

যৎ পুনরেতৎ "সংযোগোপপত্তেশ্চে"তি—

স্পর্শবত্ত্বাদ্ব্যবধানমাশ্রয়স্য চাব্যাপ্ত্যা ভাগভক্তিঃ, উক্তঞ্চাত্র। স্পর্শবানণুঃ স্পর্শবতোরণ্বোঃ প্রতিঘাতাদ্ব্যবধায়কো ন সাবয়বত্বাৎ। স্পর্শবত্ত্বাচ্চ ব্যবধানে সত্যণুসংযোগো নাশ্রয়ং ব্যাপ্নোতীতি ভাগভক্তির্ভবতি ভাগবানিবায়মিতি। উক্তঞ্চাত্র—"**বিভাগেঽল্পতর-প্রসঙ্গস্য যতো নাল্পীয়স্তত্রাবস্থানাৎ" তদবয়বস্য চাণুতরত্ব-প্রসঙ্গাদণুকার্য্যপ্রতিষেধ** ইতি।

অনুবাদ। (উত্তর) মূর্ত্ত দ্রব্যসমূহের সংস্থানবত্ত্বপ্রযুক্ত (পরমাণুর) অবয়ব আছে, এই যে (পূর্ব্বপক্ষ কথিত হইয়াছে), এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে। (প্রশ্ন) কি উক্ত হইয়াছে? (উত্তর) "বিভাগ হইলে ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের যাহা হইতে ক্ষুদ্রতর নাই, তাহাতেই নিবৃত্তিপ্রযুক্ত" এবং "পরমাণুর অবয়বের অণুতরত্বপ্রসঙ্গবশতঃ পরমাণুরূপ কার্য্য নাই," ইহা উক্ত হইয়াছে।

আর এই যে, সংযোগবত্ত্ব-প্রযুক্ত (পরমাণুর) অবয়ব আছে, ইহার (উত্তর)— স্পর্শবত্ত্বপ্রযুক্ত ব্যবধান হয় এবং আশ্রয়ের অব্যাপ্তিবশতঃ ভাগভক্তি হয়। এই বিষয়েও উক্ত হইয়াছে।

বিশদার্থ এই যে, স্পর্শবিশিষ্ট পরমাণু স্পর্শবিশিষ্ট পরমাণুদ্বয়ের প্রতিঘাত-প্রযুক্ত ব্যবধায়ক হয়, সাবয়বত্বপ্রযুক্ত ব্যবধায়ক হয় না। এবং স্পর্শবত্ত্বপ্রযুক্ত ব্যবধান হইলে পরমাণুর সংযোগ আশ্রয়কে (পরমাণুকে) ব্যাপ্ত করে না, এ জন্য

ভাগভক্তি আছে (অর্থাৎ) এই পরমাণু ভাগবিশিষ্টের ন্যায় হয়। এ বিষয়েও (পূর্ব্বে) উক্ত হইয়াছে —"বিভাগ হইলে ক্ষুদ্রতরপ্রসঙ্গের যাহা হইতে ক্ষুদ্রতর নাই, তাহাতে অবস্থানপ্রযুক্ত" এবং "সেই পরমাণুর অবয়বের অণুতরত্বপ্রসঙ্গবশতঃ পরমাণুরূপ কার্য্য নাই।"

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত "মূর্ত্তিমতাঞ্চ" ইত্যাদি সূত্র এবং "সংযোগোপপত্তেশ্চ" এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি পরে আবার যে পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন, পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা তিনি তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বেই এখানে স্বতন্ত্রভাবে ঐ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন। ভাষ্যকার আরও অনেক স্থলে স্বতন্ত্রভাবে পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিয়া, পরে মহর্ষির উত্তরসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে প্রথমে প্রথমোক্ত "মূর্ত্তিমতাঞ্চ" ইত্যাদি (২৩শ) সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কি উক্ত হইয়াছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ সূত্র এবং দ্বাবিংশ সূত্রের ভাষ্যশেষে পরমাণুর নিরবয়বত্ব-সাধক যে যুক্তি বলিয়াছেন, তাহাই যথাক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন। ষোড়শ সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার পরমাণুর নিরবয়বত্বসাধক যুক্তি বলিয়াছেন যে, জন্য দ্রব্যের বিভাগ হইলে সেই বিভক্ত দ্রব্যগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হয়। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের অবশ্যই কোন স্থানে অবস্থান বা নিবৃত্তি আছে। সুতরাং যাহা হইতে আর ক্ষুদ্র নাই, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহাতেই তাহার নিবৃত্তি স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সেই দ্রব্য যে নিরবয়ব, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, সেই দ্রব্যেরও অবয়ব থাকিলে তাহাতে ক্ষুদ্রতরপ্রসঙ্গের নিবৃত্তি বলা যায় না। কিন্তু ক্ষুদ্রতরপ্রসঙ্গের কোন স্থানে নিবৃত্তি স্বীকার না করিলে অনবস্থাদি দোষ অনিবার্য্য। দ্বাবিংশ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ অবয়ব ঐ পরমাণু হইতে অবশ্য ক্ষুদ্রতর বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে আবার সেই অবয়বেরও অবয়ব উহা হইতেও ক্ষুদ্রতর বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে অনন্ত অবয়বপরম্পরা স্বীকার করিয়া পরমাণুর কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে কোন পদার্থকেই পরমাণু বলা যায় না। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অণু, অর্থাৎ যাহা হইতে আর অণু বা সূক্ষ্ম নাই, তাহাই ত "পরমাণু" শব্দের অর্থ। সুতরাং যাহাকে পরমাণু বলিবে, তাহার আর অবয়ব নাই। সুতরাং তাহা কার্য্য অর্থাৎ অন্য কোন অবয়বজন্য পদার্থ নহে, ইহাই স্বীকার্য্য। ফলকথা, পূর্ব্বোক্তরূপ সুদৃঢ় যুক্তির দ্বারা যখন পরমাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, তখন পরমাণুর যে সংস্থান নাই, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং পরমাণুতে সংস্থানবত্ত্ব হেতুই অসিদ্ধ হওয়ায় উহার দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের চরম তাৎপর্য্য।

ভাষ্যকার পরে "যৎ পুনরেতৎ · সংযোগোপপত্তেশ্চেতি" ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা সংযোগবত্ত্বপ্রযুক্ত পরমাণুর অবয়ব আছে, এই শেষোক্ত পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করিয়া "স্পর্শবত্ত্বাদ্ব্যবধানং" ইত্যাদি "উক্তঞ্চাত্র" ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা উহারও উত্তর বলিয়াছেন। পরে ভাষ্যলক্ষণানুসারে "স্পর্শবানণুঃ" ইত্যাদি

সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথারই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভের পরে "উক্তঞ্চাত্র" এই কথার দ্বারা যাহা তাঁহার বিবক্ষিত, পরে "উক্তঞ্চাত্র" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উহাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহা প্রকাশ করিবার জন্যই পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "উক্তঞ্চাত্র" এই কথার পুনরুল্লেখ করিতে হইয়াছে। ভাষ্যকার "সংযোগোপপত্তেশ্চ" এই সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে যেরূপ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে উহার খণ্ডন করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, মধ্যস্থ পরমাণু যে, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ পরমাণুদ্বয়ের ব্যবধায়ক হয়, তাহা ঐ পরমাণুত্রয়ের স্পর্শবত্ত্ব-প্রযুক্ত, সাবয়বত্বপ্রযুক্ত নহে। অর্থাৎ পরমাণুর স্পর্শ থাকায় মধ্যস্থ পরমাণুতে উভয় পার্শ্বস্থ পরমাণুর প্রতীঘাত বা সংযোগবিশেষ জন্মে। তৎপ্রযুক্তই ঐ মধ্যস্থ পরমাণু সেই পার্শ্বস্থ পরমাণুদ্বয়ের ব্যবধান করে। ঐ ব্যবধানের দ্বারা ঐ পরমাণুর যে অবয়ব আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয় না। কারণ, ঐ ব্যবধান অবয়বপ্রযুক্ত নহে। অবয়ব না থাকিলেও স্পর্শবত্ত্বপ্রযুক্তই ঐ ব্যবধান হইতে পারে এবং ঐ স্থলে তাহাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের উভয় পার্শ্বে ঐরূপ দ্রব্যদ্বয় উপস্থিত হইলেই তাহার ব্যবধান হইয়া থাকে। সুতরাং পরমাণুর অবয়ব না থাকিলেও স্পর্শ আছে বলিয়া তাহারও ব্যবধান হয়। কিন্তু অন্যান্য সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ যেমন তাহার আশ্রয় দ্রব্যকে ব্যাপ্ত করে না, তদ্রূপ পরমাণুর সংযোগও পরমাণুকে ব্যাপ্ত করে না। সংযোগের স্বভাবই এই যে, উহা কুত্রাপি নিজের আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না, এ জন্য পরমাণুর ভাগ অর্থাৎ অংশ বা অবয়ব না থাকিলেও উহাতে ভাগের "ভক্তি" আছে। অর্থাৎ পরমাণু ভাগবান্ (সাবয়ব) দ্রব্যের সদৃশ হয়। যে পদার্থ তথাভূত নহে, তাহার তথাভূত পদার্থের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে ঐ সাদৃশ্যবিশেষই "ভক্তি" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বে ঐ "ভক্তি" শব্দের ঐরূপই অর্থ বলিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও (৭।২।৬ সূত্রে) "ভক্তি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ "ভক্তি" শব্দ হইতেই "ভাক্ত" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ন্যায়দর্শনেও (২।২।১৫ সূত্রে) "ভাক্ত" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মূলকথা, অন্যান্য সাবয়ব পদার্থের সংযোগ যেমন তাহার আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না, তদ্রূপ পরমাণুর সংযোগও পরমাণুকে ব্যাপ্ত করে না। এইরূপ সাদৃশ্যবশতঃই পরমাণু সাবয়ব না হইলেও সাবয়বের ন্যায় কথিত হয়। পূর্ব্বোক্তরূপ সাদৃশ্যই উহার মূল। ভাষ্যকার পরমাণুর পূর্ব্বোক্তরূপ সাদৃশ্যকেই তাহার "ভাগভক্তি" বলিয়াছেন। অর্থাৎ ভাগ (অংশ) নাই, কিন্তু ভাগবান্ পদার্থের সহিত ঐরূপ সাদৃশ্য আছে, উহাকেই বলিয়াছেন "ভাগভক্তি"। ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যুক্তি প্রকাশ করিবার জন্য "উক্তঞ্চাত্র" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "উক্তঞ্চাত্র" এই কথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ সূত্রের ভাষ্যে এবং দ্বাবিংশ সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বে পরমাণুর নিরবয়বত্বসাধক যে যুক্তি বলিয়াছি, তদ্দ্বারাই পরমাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হওয়ায় এবং পূর্ব্বপক্ষবাদী সেই পূর্ব্বোক্ত যুক্তির খণ্ডন করিতে না পারায় আর কোন হেতুর দ্বারাই পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে যখন জন্য দ্রব্যের বিভাগের কোন এক স্থানে নিবৃত্তি স্বীকার করিতেই হইবে, কোন দ্রব্যকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিতেই

হইবে, তখন আর তাহার অবয়ব স্বীকার করাই যাইবে না। সুতরাং তাহাকে কার্য্য বলাও যাইবে না। অতএব পরমাণু নিরবয়ব হইলেও তাহাতেও সংযোগোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। সংযোগবত্ত্বপ্রযুক্ত তাহার সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না ॥২৪॥

ভাষ্য। "মূর্ত্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপত্তেঃ" "সংযোগোপপত্তেশ্চ" পরমাণূনাং সাবয়বত্বমিতি হেত্বোঃ—

সূত্র। অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থানুপপত্তেশ্চাপ্রতিষেধঃ॥ ॥২৫॥৪৩৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) মূর্ত্ত দ্রব্যসমূহের সংস্থানবত্ত্বপ্রযুক্ত এবং সংযোগবত্ত্বপ্রযুক্ত পরমাণুসমূহের সাবয়বত্ব,—এই পূর্ব্বপক্ষে হেতুদ্বয়ের অনবস্থাকারিত্ববশতঃ এবং অনবস্থার অনুপপত্তিবশতঃ (পরমাণুসমূহের নিরবয়বত্বের) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। যাবন্মূর্ত্তিমদ্‌যাবচ্চ সংযুজ্যতে, তৎ সর্ব্বং সাবয়বমিত্যনবস্থাকারিণাবিমৌ হেতূ। সা চানবস্থা নোপপদ্যতে। সত্যামনবস্থায়াং সত্যৌ হেতূ স্যাতাং। তস্মাদপ্রতিষেধোঽয়ং নিরবয়বত্বস্যেতি।

বিভাগস্য চ বিভজ্যমানহানির্নোপপদ্যতে—তস্মাৎ প্রলয়ান্ততা নোপপদ্যত ইতি।

অনবস্থায়াঞ্চ প্রত্যধিকরণং দ্রব্যাবয়বানামানন্ত্যাৎ পরিমাণভেদানাং গুরুত্বস্য চাগ্রহণং, সমানপরিমাণত্বঞ্চাবয়বাবয়বিনোঃ পরমাণ্বয়ববিভাগাদূর্দ্ধমিতি।

অনুবাদ। যত বস্তু মূর্ত্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ মূর্ত্ত এবং যত বস্তু সংযুক্ত হয়, সেই সমস্তই সাবয়ব, ইহা বলিলে এই হেতুদ্বয় অনবস্থাকারী অর্থাৎ অনবস্থাদোষের আপাদক হয়। সেই অনবস্থাও উপপন্ন হয় না। অনবস্থা "সতী" অর্থাৎ প্রামাণিকী হইলে (পূর্ব্বোক্ত) হেতুদ্বয় "সত্য" অর্থাৎ পরমাণুর সাবয়বত্বসাধক হইতে পারিত। অতএব ইহা (পরমাণুর) নিরবয়বত্বের প্রতিষেধ নহে।

বিভাগের সম্বন্ধে কিন্তু "বিভজ্যমানহানি" অর্থাৎ বিভাগাধারদ্রব্যের অভাব উপপন্ন হয় না। অতএব বিভাগের প্রলয়ান্ততা উপপন্ন হয় না। অনবস্থা হইলে কিন্তু প্রত্যেক আধারে দ্রব্যের অবয়বের অনন্ততাবশতঃ পরিমাণভেদের এবং গুরুত্বের

জ্ঞান হইতে পারে না এবং পরমাণুর অবয়ববিভাগের পরে অবয়ব ও অবয়বীর তুল্য-পরিমাণতা হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি শেষে এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "মূর্ত্তিমতাঞ্চ" ইত্যাদি সূত্রোক্ত এবং "সংযোগোপপত্তেশ্চ" এই সূত্রোক্ত হেতুদ্বয় যে পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধক হইতে পারে না, সুতরাং উহার দ্বারা পরমাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডন হয় না, ইহা বলিয়া তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও প্রথমে "হেত্বোঃ" ইত্যন্ত সন্দর্ভের অধ্যাহার করিয়া মহর্ষির এই সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "হেত্বোঃ" এই বাক্যের সহিত সূত্রের প্রথমোক্ত "অনবস্থাকারিত্বাৎ" এই বাক্যের যোগই তাঁহার অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে এবং সূত্রের শেষোক্ত "অপ্রতিষেধঃ" এই বাক্যের পূর্ব্বে "পরমাণূনাং নিরবয়বত্বস্য" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে মহর্ষির বক্তব্য বুঝা যায় যে, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত "সংস্থানবত্ব" ও "সংযোগবত্ব" এই হেতুদ্বয় অনবস্থাদোষের আপাদক এবং ঐ অনবস্থাও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার্য্য নহে, অতএব উহার দ্বারা পরমাণুসমূহের নিরবয়বত্বের প্রতিষেধ অর্থাৎ সাবয়বত্ব সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার পরে সূত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যত বস্তু মূর্ত্ত এবং যত বস্তু সংযোগ-বিশিষ্ট, সেই সমস্তই সাবয়ব, এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়া মূর্ত্তত্ব অথবা সংস্থানবত্ব এবং সংযোগ-বত্ব হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ করিতে গেলে উহার দ্বারা পরমাণুর অবয়বের অবয়ব এবং তাহারও অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বপরম্পরার সিদ্ধির আপত্তি হওয়ায় অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য। সুতরাং উক্ত হেতুদ্বয় অনবস্থাকারী হওয়ায় উহা পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধক হইতে পারে না। অবশ্য অনবস্থা প্রমাণ দ্বারা উপপন্ন হইলে উহা দোষ নহে, উহা স্বীকার্য্য। কিন্তু এখানে ঐ অনবস্থার উপপত্তিও হয় না। তাই মহর্ষি পরে এই সূত্রেই বলিয়াছেন,—"অনবস্থানুপপত্তেশ্চ।" ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, অনবস্থা "সতী" অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ হইলে উক্ত হেতুদ্বয় "সত্য" অর্থাৎ সাধ্যসাধক হইতে পারিত। কিন্তু উহা প্রমাণসিদ্ধ হয় না। এখানে মহর্ষির ঐ কথার দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ অনবস্থা যে দোষ নহে, উহা স্বীকার্য্য, এই সিদ্ধান্তও সূচিত হইয়াছে। তাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ প্রামাণিক অনবস্থা দোষ নহে, ইহা বলিয়া অনেক স্থলে উহা স্বীকারই করিয়া গিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রামাণিক অনবস্থাকে অনবস্থাদোষই বলেন নাই। তিনি এ জন্য অনবস্থার লক্ষণবাক্যে "অপ্রামাণিক" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, আমরাও বিভাগকে অনন্ত বলি না। আমাদিগের মতে বিভাগ প্রলয়ান্ত। অর্থাৎ জন্য দ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে যেখানে প্রলয় বা সর্ব্বাভাব হইবে, আর কিছুই থাকিবে না, সেখানেই বিভাগের নিবৃত্তি হইবে। সুতরাং পরমাণুর অবয়বের ন্যায় তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বপরম্পরার সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর বিভাগ করিতে গেলে যেখানে আর কিছুই থাকিবে না, সেখানে আর অবয়বসিদ্ধি সম্ভবই হইবে না। ভাষ্যকার এ জন্য তাঁহার পূর্ব্বকথিত অনবস্থা সমর্থনের জন্য পরে বলিয়াছেন যে, বিভাগ প্রলয়ান্ত,

ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, যাহার বিভাগ হইবে, সেই বিভাজ্যমান দ্রব্য বিদ্যমান না থাকিলে ঐ বিভাগ থাকিতে পারে না। বিভাজ্যমান দ্রব্যের হানি (অভাব) হইলে সেই চরম বিভাগের আধার থাকে না। সুতরাং বিভাগ কোথায় থাকিবে? অতএব বিভাগ স্বীকার করিতে হইলে উহার আধার সেই দ্রব্যও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সেই দ্রব্যেরও বিভাগ গ্রহণ করিয়া ঐরূপে বিভাগকে অনন্তই বলিতে হইবে। তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য।

পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, ঐ অনবস্থা স্বীকারই করিব? উহা স্বীকারে দোষ কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, অনবস্থা স্বীকার করিলে প্রত্যেক আধারে দ্রব্যের অবয়ব অনন্ত হওয়ায় ঐ সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ-ভেদ ও গুরুত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। অর্থাৎ জন্য দ্রব্যে যে নানাবিধ পরিমাণ ও গুরুত্ববিশেষ আছে, তাহা ঐ সমস্ত দ্রব্যের অবয়বপরম্পরার ন্যূনাধিক্য বা সংখ্যাবিশেষের নির্ণয় দ্বারাই বুঝা যায়। কিন্তু যদি ঐ সমস্ত দ্রব্যের অবয়ব-পরম্পরার অন্তই না থাকে, তাহা হইলে উহার পরিমাণবিশেষ ও গুরুত্ববিশেষ বুঝিবার কোন উপায়ই থাকে না। ভাষ্যকার শেষে আরও বলিয়াছেন যে, পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ অবয়ববিভাগের পরে অবয়ব ও অবয়বীর তুল্যপরিমাণত্বেরও আপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিয়া, সেই অবয়বেরও বিভাগ স্বীকার করিলে অর্থাৎ অনন্ত অবয়ব-পরম্পরা স্বীকার করিলে ঐ সমস্ত অবয়বকে অবয়বীও বলিতে হইবে। কারণ, যাহার অবয়ব আছে, তাহাকেই অবয়বী বলে। তাহা হইলে ঐ সমস্ত অবয়ব ও অবয়বীকে তুল্যপরিমাণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ঐ সমস্ত অবয়বেরই অনন্ত অবয়বপরম্পরা স্বীকৃত হইয়াছে। যদি অবয়ব ও অবয়বী, উভয়ই অনন্তাবয়ব হয়, তাহা হইলে ঐ উভয়েরই তুল্যপরিমাণত্ব স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা ত স্বীকার করা যায় না। কারণ, অবয়বী হইতে তাহার অবয়ব ক্ষুদ্রপরিমাণই হইয়া থাকে, ইহা অন্যত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ অবয়ব পরমাণু হইতে ক্ষুদ্র, এবং তাহার অবয়ব উহা হইতেও ক্ষুদ্র, ইহাই স্বীকার্য্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা স্বীকার করিলে উহা সম্ভবই হয় না। কারণ, সমস্ত অবয়বেরই অনন্ত অবয়ব থাকিলে ঐ সমস্তই তুল্যপরিমাণ হয়। মূল কথা, পূর্ব্বোক্ত অনেক দোষবশতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ অনবস্থা কোনরূপেই উপপন্ন না হওয়ায় উহা স্বীকার করা যায় না। অতএব পরমাণুতেই বিভাগের নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে উহার নিরবয়বত্বই সিদ্ধ হওয়ায় আর কোন হেতুর দ্বারাই উহার সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। উহাতে সাবয়বত্বের অনুমানে সমস্ত হেতুই দুষ্ট, ইহাই এখানে মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য। মহর্ষি পূর্ব্বপ্রকরণে "পরং বা ত্রুটেঃ" এই শেষ সূত্রে "ত্রুটি" শব্দের প্রয়োগ করিয়া যে যুক্তির সূচনা করিয়াছেন, এই প্রকরণের এই শেষ সূত্রের দ্বারা সেই যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। মহর্ষির এই সূত্রানুসারেই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সংরক্ষক আচার্য্যগণ পরমাণুর সাবয়বত্ব পক্ষে অনবস্থাদি দোষের উল্লেখপূর্ব্বক পরমাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর পরমাণুর নিরবয়বত্বসাধক পূর্ব্বোক্ত যুক্তি বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য এখানে বলিয়াছেন যে, জন্য দ্রব্যের বিভাগের অন্ত বা নিবৃত্তি কোথায়? ইহা বিচার করিতে গেলে

ঐ বিভাগ (১) পরমাণ্বন্ত অথবা (২) প্রলয়ান্ত অথবা (৩) অনন্ত, এই পক্ষত্রয় ভিন্ন আর কোন পক্ষ গ্রহণ করা যায় না। কারণ, উহা ভিন্ন আর কোন পক্ষই নাই। কিন্তু যদি ঐ বিভাগকে "প্রলয়ান্ত"ই বলা যায়, তাহা হইলে প্রলয় অর্থাৎ একেবারে সর্ব্বাভাব হইলে তখন বিভজ্যমান কোন দ্রব্য না থাকায় ঐ চরম বিভাগের কোন আধার থাকে না; বিভাগের অনাধারত্বাপত্তি হয়। কিন্তু অনাধার বিভাগ হইতে পারে না। সুতরাং "প্রলয়ান্ত" এই পক্ষ কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। বিভাগ "অনন্ত" এই তৃতীয় পক্ষে অনবস্থা-দোষ হয়। তাহাতে ত্রসরেণুর অমেয়ত্বাপত্তি ও তন্মূলক সুমেরু ও সর্ষপের তুল্যপরিমাণাপত্তি দোষ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সুতরাং বিভাগ "পরমাণ্বন্ত" এই প্রথম পক্ষই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ পরমাণুতেই বিভাগের নিবৃত্তি হয়। পরমাণুর আর বিভাগ হয় না। সুতরাং পরমাণুর যে অবয়ব নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে আর কোন হেতুর দ্বারা পরমাণুতে সাবয়বত্ব সাধন করা যায় না। কারণ, নিরবয়ব পরমাণু স্বীকার করিয়া তাহাকে সাবয়ব বলাই যাইতে পারে না। সুতরাং "পরমাণুঃ সাবয়বঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যে দুইটি পদই ব্যাহত হয়। "আত্মতত্ত্ব-বিবেক" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যও শেষে ঐ কথা বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর "সাবয়ব" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যে পদদ্বয়ের ব্যাঘাত বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পরমাণু সাবয়ব, ইহা বলিলে পরমাণুকে কার্য্যবিশেষই বলা হয়। কিন্তু কার্য্যত্ব ও পরমাণুত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। যাহা পরমাণু, তাহা কার্য্য হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, যদি বল, প্রত্যেক পরমাণু তৎপূর্ব্বজাত অপর পরমাণুর কার্য্য। প্রতিক্ষণে এক পরমাণু হইতেই অন্য এক পরমাণুর উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইহা বলিলেও কোন পরমাণুকেই সাবয়ব বলিতে পারিবে না। পূর্ব্বোক্ত ঐ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগই করিতে হইবে। কারণ, যাহার অবয়ব অনেক, তাহাকেই সাবয়ব বলা হয়। যদি বল, পরমাণুর কার্য্যত্বই আমাদিগের সাধ্য, পরমাণু-জন্যত্বই হেতু। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, একমাত্র কারণজন্য কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কার্য্য জন্মিতেছে, কিন্তু তাহার কারণ একটিমাত্র পদার্থ, ইহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। পরন্তু তাহা হইলে সর্ব্বদাই পরমাণুর কারণ যে কোন একটি পরমাণু থাকায় সর্ব্বদাই উহার উৎপত্তি হইবে। কোন সময়েই উহার প্রাগভাব থাকিবে না। কিন্তু যাহার প্রাগভাবই নাই, তাহার উৎপত্তিও বলা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকারেও পরমাণুর কার্য্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু যদি এক পরমাণুকেই পরমাণুর কারণ বলিয়া এবং ঐ কারণকেই অবয়ব বলিয়া পরমাণুকে সাবয়ব বল, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, তোমাদিগের মতে কোন পদার্থই এক ক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী না হওয়ায় কার্য্য পরমাণুর উৎপত্তিকালে পূর্ব্বজাত সেই কারণ-পরমাণুটি না থাকায় তোমরা ঐ পরমাণুকে সাবয়ব বলিতে পার না। কারণ, যাহা অবয়ব সহিত হইয়া বিদ্যমান, তাহাই ত "সাবয়ব" শব্দের অর্থ। পরমাণুর উৎপত্তিকালে তাহার অবয়ব বিনষ্ট হইলে তাহাকে সাবয়ব বলা যায় না। অতএব তোমাদিগের মতে "সাবয়ব" শব্দের অর্থ কি? তাহা বক্তব্য। কিন্তু তোমরা তাহা বলিতে পার না। উদ্দ্যোতকর পরে "মূর্ত্তিমত্ত্বাৎ সাবয়বঃ পরমাণুঃ" এই বাক্যবাদীকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, তোমার মতে পরমাণু যদ্দ্বারা মূর্ত্তিমান্, ঐ মূর্ত্তিপদার্থ কি? এবং উহা কি

পরমাণু হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন পদার্থ? যদি বল, রূপাদিবিশেষই মূর্ত্তি, তাহা হইলে তুমি পরমাণুকে মূর্ত্তিমান্ বলিতে পার না। কারণ, তোমার মতে সর্ব্বাপকর্ষপ্রাপ্ত রূপাদিই পরমাণু। উহা হইতে ভিন্ন কোন পরমাণু তুমি স্বীকার কর না। তাহা হইলে পরমাণু মূর্ত্তিমান্, ইহা বলিলে রূপাদি রূপাদিবিশিষ্ট, এই কথাই বলা হয়। কিন্তু তাহাও বলা যায় না। পরন্তু তাহা বলিলে ঐ "মূর্ত্তি" শব্দের উত্তর "মতুপ্" প্রত্যয়ও উপপন্ন হয় না। কারণ, ভিন্ন পদার্থ না হইলে "মতুপ্" প্রত্যয় হয় না। ফলকথা, পরমাণুর মূর্ত্তি যে, পরমাণু হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ মূর্ত্তি কি? তাহা এখন বক্তব্য। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বে পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, পরমহ্রস্ব ও পরম অণু, এই ষট্ প্রকার পরিমাণকে "মূর্ত্তি" বলিয়াছেন। তন্মধ্যে পরমহ্রস্বত্ব ও পরমাণুত্ব পরমসূক্ষ্ম দ্রব্যেই থাকে। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহা বলিয়া আকাশাদি সর্ব্বব্যাপী দ্রব্যে পরমমহত্ত্ব ও পরমদীর্ঘত্ব, এই পরিমাণদ্বয় গ্রহণ করিয়া অষ্টবিধ পরিমাণ বলিয়াছেন। শেষোক্ত পরিমাণদ্বয় "মূর্ত্তি" নহে, ইহাও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ কিন্তু উদ্দ্যোতকরের পরিমাণ-বিভাগ স্বীকার না করিয়া অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, এই চতুর্ব্বিধ পরিমাণই বলিয়াছেন। সাংখ্যসূত্রকার তাহাও অস্বীকার করিয়া (৫ম অঃ, ৯০ সূত্রে) পরিমাণকে দ্বিবিধই বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের যে পরিমাণ, উহাই মূর্ত্তি বা মূর্ত্তত্ব বলিয়া ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায় পরমাণু ও মনেও উহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উহা তাঁহাদিগের মতে সাবয়বত্বের সাধক হয় না। কারণ, মূর্ত্ত দ্রব্য হইলেই যে তাহা সাবয়ব হইবে, এমন নিয়ম নাই। উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, "সংস্থানবিশেষবত্ত্ব" হেতু পরমাণুতে অসিদ্ধ। কারণ, সংস্থান-বিশেষবত্ত্ব ও সাবয়বত্ব একই পদার্থ। সুতরাং উহার দ্বারাও পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি বল, পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের পূর্ব্বোক্ত পরিমাণই "সংস্থান" শব্দের অর্থ। কিন্তু তাহা হইলে প্রথমে "মূর্ত্তিমত্বাৎ" এই বাক্যের দ্বারাই ঐ হেতু কথিত হওয়ায় আবার "সংস্থানবিশেষবত্বাচ্চ" এই হেতুবাক্যের পৃথক্ প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। সুতরাং "মূর্ত্তি" ও "সংস্থান" যে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্বীকৃতই হওয়ায় পরে আবার উহা অভিন্ন পদার্থ, ইহা বলা যায় না।

উদ্দ্যোতকর পরে পরমাণুর নিরবয়বত্বসাধক মূল যুক্তির পুনরুল্লেখপূর্ব্বক "ষট্কেন যুগপদ্-যোগাৎ" ইত্যাদি কারিকার উদ্ধার ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়া উক্ত বাধক যুক্তি খণ্ডন করিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, মধ্যস্থ পরমাণুর উর্দ্ধ, অধঃ এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ছয়টী পরমাণুর সহিত যে সমস্ত সংযোগ জন্মে, তন্মধ্যে দুই দুইটী পরমাণু গ্রহণ করিয়া বিচার করিলে বক্তব্য এই যে, সেই মধ্যস্থ পরমাণুটীর পূর্ব্বস্থ পরমাণুর সহিত যে সংযোগ জন্মে, উহা কেবল সেই দুইটী পরমাণুতেই জন্মে, পশ্চিমস্থ পরমাণুতে জন্মে না। এবং মধ্যস্থ পরমাণুর পশ্চিমস্থ পরমাণুর সহিত যে সংযোগ জন্মে, উহাও কেবল সেই উভয় পরমাণুতেই জন্মে, পূর্ব্বস্থ পরমাণুর সহিত জন্মে না। এইরূপে ঐ স্থলে সমস্ত সংযোগই ভিন্নদেশস্থ হওয়ায় সমানদেশস্থ বলিয়া যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা করা যায় না। আর যদি ঐ স্থলে সেই মধ্যস্থ পরমাণুতেই যুগপৎ ছয়টি পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সেই মধ্যস্থ পরমাণুর প্রদেশ বা বিভিন্ন অবয়ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

কারণ, ঐরূপ স্থলে সেই এক পরমাণুতেই ষট্‌পরমাণুর সংযোগ একই স্থানে স্বীকার করা যায়। তাহাতে ঐ সংযোগের সমানদেশত্ব স্বীকার করিলেও ঐ পরমাণুসমূহের সমানদেশত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত আপত্তি হইতে পারে না। বস্তুতঃ যে দিকে পরমাণুতে অপর পরমাণুর সংযোগ জন্মে, সেই দিক্‌কেই ঐ পরমাণুর প্রদেশ বলিয়া কল্পনা করা হয়। কিন্তু পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহার বাস্তব কোন প্রদেশ থাকিতে পারে না। কারণ, জন্য দ্রব্যের উপাদান-কারণ অবয়ব-রূপ দ্রব্যই "প্রদেশ" শব্দের মুখ্য অর্থ। মহর্ষি নিজেও দ্বিতীয় অধ্যায়ে "কারণদ্রব্যস্য প্রদেশ-শব্দেনাভিধানাৎ" (২।১৭) এই সূত্রের দ্বারা তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে পরমাণুর সম্বন্ধে কল্পিত প্রদেশ গ্রহণ করিয়া তাহার সাবয়বত্ব সিদ্ধ করা যায় না। উদ্দ্যোতকর পরে "দিগ্-দেশভেদো যস্যাস্তি তস্যৈকত্বং ন যুজ্যতে" এই কারিকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, আমরা ত পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ স্বীকার করি না। পরমাণুর পূর্ব্বদিকে এক প্রদেশ, পশ্চিমদিকে অপর প্রদেশ, ইত্যাদিরূপে পরমাণুতে দিগ্‌দেশভেদ নাই। দিকের সহিত পরমাণুর সংযোগ থাকায় ঐ সমস্ত সংযোগকেই পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ বলিয়া কল্পনা করিয়া পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ বলা হয়। কিন্তু মুখ্যতঃ পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ নাই। দিকের সহিত পরমাণুর সংযোগ থাকিলেও পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, উহাতে অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত বসুবন্ধুর (১৪শ) কারিকায় কিন্তু "দিগ্‌ভাগভেদো যস্যাস্তি" এইরূপ পাঠ আছে। বসুবন্ধু উক্ত কারিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরমাণুর পূর্ব্বদিগ্‌ভাগ, অধোদিগ্‌ভাগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দিগ্‌ভাগ আছে। সুতরাং তৎস্বরূপ পরমাণুর একত্ব সম্ভব নহে। যদি প্রত্যেক পরমাণুরই দিগ্‌ভাগভেদ না থাকে, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ে কোন স্থানে ছায়া এবং কোন স্থানে আতপ কিরূপে থাকে ? কারণ, উহার অন্য প্রদেশ না থাকিলে সেখানে ছায়া থাকিতে পারে না এবং দিগ্‌ভাগভেদ না থাকিলে এক পরমাণুর অপর পরমাণুর দ্বারা আবরণও হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর কোন অপর ভাগ না থাকিলে সেই ভাগে অপর পরমাণুর সংযোগবশতঃ প্রতিঘাত হইতে পারে না। প্রতিঘাত না হইলে সমস্ত পরমাণুরই সমানদেশত্ববশতঃ সমস্ত পরমাণুসংঘাত পরমাণুমাত্রই হয়, উহা স্থূল পিণ্ড হইতে পারে না। ফলকথা, প্রত্যেক পরমাণুরই যদি দিগ্‌ভাগভেদ অর্থাৎ ছয় দিকে সংযোগবশতঃ ব্যক্তিভেদ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে ছয়টী পরমাণুই বলিতে হয়। সুতরাং কোন পরমাণুরই একত্ব থাকে না। তাৎপর্য্যটীকাকারও ঐরূপই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে উদ্দ্যোতকর যে, "দিগ্‌ভাগভেদো যস্যাস্তি" এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তবে তিনি ঐ স্থলে পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ খণ্ডন করিয়াও নিজমত সমর্থন করিয়াছেন এবং ছায়া ও আবরণকেও পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধকরূপে উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মূর্ত্তত্ব ও স্পর্শবত্ত্বপ্রযুক্তই ছায়া ও আবরণ হইয়া থাকে, উহাতে অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। স্পর্শবিশিষ্ট মূর্ত্ত দ্রব্যই অন্য দ্রব্যকে আবৃত করে, ইহাই দেখা যায়। ঐ আবরণে তাহার অবয়ব প্রযোজক নহে। কোন দ্রব্যে অপর দ্রব্যের সম্বন্ধের প্রতিষেধ করাই "আবরণ" শব্দের অর্থ। যেখানে অল্পসংখ্যক তৈজস পরমাণুর আবরণ হয়, সেখানে ছায়া বোধ

হইয়া থাকে। উদ্দ্যোতকর পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, যেখানে অল্প তেজঃপদার্থ থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বতঃ সম্পূর্ণরূপে আলোকের অভাব থাকে না, সেই স্থানীয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম "ছায়া" বলিয়া কথিত হয়, এবং যেখানে তেজঃ পদার্থ সর্ব্বতো নিবৃত্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষের যোগ্য বিশিষ্ট আলোক যেখানে কুত্রাপি নাই, সেই স্থানীয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম "অন্ধকার" নামে কথিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্তরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মকেই লোকে "ছায়া" নামে প্রকাশ করে এবং পূর্ব্বোক্তরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মকেই লোকে "অন্ধকার" নামে প্রকাশ করে। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মই যে ছায়া ও অন্ধকার পদার্থ, তাহা নহে। উদ্দ্যোতকরও এখানে তাহাই বলেন নাই। কারণ, তিনিও প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের অষ্টম সূত্রের বার্ত্তিকে ভাষ্যকারের ন্যায় ছায়া যে দ্রব্যপদার্থ নহে, কিন্তু অভাব পদার্থ, এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ন্যায়-বৈশেষিকমতানুসারে অন্ধকার যে কোন ভাব পদার্থের অন্তর্গত হয় না, কিন্তু উহা তেজঃ পদার্থের অভাব, ইহা বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মূলকথা, দিগ্‌দেশভেদ এবং ছায়া ও আবরণকে হেতু করিয়া তদ্দ্বারাও পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাও উদ্দ্যোতকর বুঝাইয়াছেন। বৈশেষিকদর্শনের "অবিদ্যা" (৪।১।৫) এই সূত্রের "উপস্কারে" শঙ্কর মিশ্রও পূর্ব্বপক্ষরূপে পরমাণুর সাবয়বত্ব সাধনে "ছায়াবত্ত্বাৎ" এবং "আবৃতিমত্ত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে মুদ্রিত পুস্তকে "আবৃত্তিমত্ত্বাৎ" এই পাঠ এবং টীকাকারের "আবৃত্তিঃ স্পন্দনভেদঃ" এই ব্যাখ্যা ভ্রম-কল্পিত। "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"সংযোগব্যবস্থাপনেনৈব ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগাদ্দিগ্‌দেশভেদাচ্ছায়াবৃতিভ্যামিত্যাদয়ো নিরস্তাঃ"। অর্থাৎ নিরবয়ব পরমাণুতে সংযোগের ব্যবস্থাপন করায় তদ্দ্বারাই যুগপৎ ষট্ পরমাণুর সহিত সংযোগ, দিগ্‌দেশভেদ এবং ছায়া ও আবরণ প্রভৃতি হেতু নিরস্ত হইয়াছে। টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি ঐ স্থলে "ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগাৎ" ইত্যাদি যে কারিকাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,[১] তাহার পরার্দ্ধে দিগ্‌দেশভেদ এবং ছায়াও আবরণ ও পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধকরূপে কথিত হইয়াছে। এবং উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভানুসারে তৎকালে বিজ্ঞানবাদী কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত যে, উক্তরূপ করিবার দ্বারাই তাঁহার বক্তব্য সমস্ত হেতু প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রঘুনাথ শিরোমণি সেখানে উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া উদয়নাচার্য্যের উক্ত সন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে ঐ সমস্ত হেতুর দ্বারা কেন যে পরমাণুর "সাংশতা" বা সাবয়বত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,[২] যে দ্রব্যে সংযোগ জন্মে, সেই দ্রব্যের স্বরূপই অর্থাৎ সেই দ্রব্যই ঐ সংযোগের সমবায়িকারণ। উহার

১। ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা।
দিগ্‌দেশভেদতশ্ছায়াবৃতিভ্যাঞ্চাস্য সাংশতা॥"

২। তদেতন্নিরস্যতি "সংযোগে"তি। স্বরূপনিবন্ধনং সংযোগিত্বং নাংশমপেক্ষতে। যুগপদনেকমূর্ত্তসংযোগিত্ব-ঞ্চানেকদিগবচ্ছেদেনাবিরুদ্ধং। প্রাচ্যাদিব্যপদেশোঽপি প্রতীচ্যাদ্যসংযোগিত্বে সতি প্রাচ্যাদিসংযোগিত্বাৎ। সাবয়বেঽপি দীর্ঘদণ্ডাদৌ মধ্যবর্ত্তিনমপেক্ষ্য প্রাচ্যাদিব্যবহারবিরহাৎ। ছায়াপি যদি প্রামাণিকী, তদা তেজোগতিপ্রতিবন্ধক-সংযোগভেদাৎ। এতেনাবরণং ব্যাখ্যাতং।—"আত্মতত্ত্ব-বিবেক" দীধিতি।

অংশ বা অবয়ব উহাতে কারণই নহে। সুতরাং সংযোগ দ্রব্যের অংশকে অপেক্ষা করে না। সুতরাং নিরবয়ব পরমাণুতেও সংযোগ জন্মিতে পারে। যুগপৎ অনেক মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগও ভিন্ন ভিন্ন দিগ্‌বিশেষে হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, সংযোগমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। কারণ, যে দিগ্‌বিশেষে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ জন্মে, সেই দিগ্‌বিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়াতেই ঐ সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব উপপন্ন হয়। কোন প্রদেশ বা অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্ন না হইলেই যে সংযোগ ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে, ইহা ত বলা যাইবে না। তবে আর নিরবয়ব দ্রব্যে সংযোগ হইতে পারে না, ইহা কোন্ প্রমাণে বলা যাইবে? অবশ্য সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ সর্ব্বত্রই অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্নই হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্দ্বারা সংযোগ-মাত্রই অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্ন, এইরূপ অনুমান করা যায় না। নিরবয়ব আত্মা ও মনের সংযোগ স্বীকার্য্য হইলে ঐরূপ অনুমানের প্রামাণ্যই নাই। ফলকথা, নিরবয়ব দ্রব্যেরও পরস্পর সংযোগ স্বীকারে কোন বাধা নাই। ঐ সংযোগের আশ্রয় পরমাণু প্রভৃতি দ্রব্যের অবয়ব না থাকায় উহা অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু দিগ্‌বিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়ায় উহার অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব উপপন্ন হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি শেষে পরমাণুতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রভৃতি ব্যবহারেরও উপপাদন করিয়া দিগ্‌দেশভেদ যে, পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধক হয় না, ইহা বুঝাইয়াছেন এবং পরে বলিয়াছেন যে, যদি পরমাণু-প্রযুক্ত কোন স্থানে ছায়া প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় অথবা পরমাণুতে ছায়া প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বলিব যে, পরমাণুতে তেজঃ পদার্থের গতিপ্রতিবন্ধক কোন সংযোগবিশেষপ্রযুক্তই ঐ ছায়ার উপপত্তি হয় এবং তৎপ্রযুক্তই আবরণেরও উপপত্তি হয়। উহাতে পরমাণুর অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। সুতরাং ছায়া ও আবরণ পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধক হয় না। এ বিষয়ে উদ্দ্যোতকরের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর পরে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ পরমাণুতে যে, ক্রিয়াবত্ব প্রভৃতি হেতুর দ্বারা সাবয়বত্ব সাধন করিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত হেতুও নানা-দোষদুষ্ট, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, যাঁহারা ঐ সমস্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে ঐ সমস্ত হেতু অনিত্যত্বের জনকও নহে, ব্যঞ্জকও নহে, ইহা বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে চরম কথা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীরা পূর্ব্বোক্ত কোন পদার্থই প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া না বুঝিলে তাঁহাদিগের মতে ঐ সমস্ত পদার্থেরই সত্তা না থাকায় তাঁহারা পরমত খণ্ডনের জন্য ঐ সমস্ত পদার্থ গ্রহণ করিতেই পারেন না। যে পদার্থ নিজের উপলব্ধই নহে, তাহা খণ্ডনের জন্যও ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আর যদি তাঁহারা ঐ সমস্ত পদার্থ প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়াই পরপ্রতিপাদনের জন্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ত উহা স্বমতসিদ্ধই হইবে। ঐ সমস্ত পদার্থকে আর পরপক্ষসিদ্ধ বলা যাইবে না। বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় কিন্তু অপরপক্ষ-সম্মত প্রমাণাদি পদার্থ অবলম্বন করিয়াই বিচার করিয়াছেন এবং নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহা-দিগের মতে প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার বাস্তব নহে। সুমেরু ও সর্ষপের বিষম-পরিমাণত্বাদি ব্যবহারও কাল্পনিক। অনাদি মিথ্যা সংস্কারের বৈচিত্র্যবশতঃই জগতে বিচিত্র মিথ্যা ব্যবহারাদি চলিতেছে।

সুতরাং তদ্দ্বারা পরমাণু প্রভৃতি বস্তু সিদ্ধি হইতে পারে না। পরবর্ত্তী প্রকরণে তাঁহাদিগের এই মূল মত ও তাহার খণ্ডন পাওয়া যাইবে।

নিরবয়ব পরমাণু সমর্থনে ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের সমস্ত কথার সার মর্ম্ম এই যে, প্রমাণের সত্তা ব্যতীত কেহ কোন সিদ্ধান্তই স্থাপন করিতে পারেন না। কারণ, বিনা প্রমাণে বিপরীত পক্ষও স্থাপন করা যায়। অতএব প্রমাণের সত্তা সকলেরই স্বীকার্য্য। প্রমাণ দ্বারা নিরবয়ব পরমাণু সিদ্ধ হওয়ায় উহার সংযোগও সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, জন্য দ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে যে স্থানে ঐ বিভাগের নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে, তাহাই পরমাণু। তাহাতে সংযোগ সম্ভব না হইলে বিভাগ থাকিতে পারে না। কারণ, যে দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগই হয় নাই, তাহার বিভাগ হইতে পারে না। সুতরাং পরমাণুদ্বয়ের সংযোগও অবশ্যই স্বীকার্য্য। ঐ সংযোগ কোন প্রদেশবিশেষাবচ্ছিন্ন না হইলেও দিগ্‌বিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়ায় উহাও অব্যাপ্যবৃত্তি। সংযোগমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, এইরূপ নিয়ম সত্য। কিন্তু সংযোগমাত্রই কোন প্রদেশবিশেষাবচ্ছিন্ন, এই নিয়ম সত্য নহে। কারণ, নিরবয়ব আত্মা ও মনের পরস্পর সংযোগ অবশ্য স্বীকার্য্য। কোন পরমাণুর চতুষ্পার্শ্ব এবং অধঃ ও ঊর্দ্ধ, এই ছয় দিক্ হইতে ছয়টী পরমাণুর সহিত যুগপৎ সংযোগ হইলেও ঐ সংযোগ সেই সমস্ত দিগ্‌বিশেষাবচ্ছিন্নই হইবে। তদ্দ্বারা পরমাণুর ছয়টী অবয়ব সিদ্ধ হয় না এবং ঐ স্থলে সেই সাতটী পরমাণুর যোগে কোন দ্রব্যবিশেষেরও উৎপত্তি হয় না। কারণ, বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান-কারণ হয় না। এ বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্রের কথিত যুক্তি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং "পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ" এই কথার দ্বারা বসুবন্ধু যে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও করা যায় না। কারণ, ঐ স্থলে কোন দ্রব্যপিণ্ডই জন্মে না। দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে যে ত্রসরেণু নামক পিণ্ড জন্মে, তাহাতে ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের বহুত্ব সংখ্যাই মহৎ পরিমাণ উৎপন্ন করে। কারণ, উপাদান-কারণের বহুত্বসংখ্যাও জন্য দ্রব্যের প্রথিমা অর্থাৎ মহৎ পরিমাণের অন্যতম কারণবিশেষ। পরমাণু-দ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন দ্ব্যণুক নামক দ্রব্যে ঐ মহৎ পরিমাণের কোন কারণই না থাকায় উহা জন্মে না। সুতরাং ঐ দ্ব্যণুকও অণু বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হইলেও তজ্জন্য দ্রব্যের প্রথিমা হইতে পারে না, এই কথাও অমূলক। প্রত্যেক পর-মাণুরই দিগ্‌ভাগভেদ আছে, সুতরাং কোন পরমাণুই এক হইতে পারে না, এই কথাও অমূলক। কারণ, প্রত্যেক পরমাণুর সম্বন্ধে ছয় দিক্ থাকিলেও তাহাতে পরমাণুর ভেদ হইতে পারে না। অর্থাৎ তদ্দ্বারা প্রত্যেক পরমাণুই ষট্‌পরমাণু, ইহা কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রত্যেক পরমাণুই এক। সুতরাং পরমাণু একও নহে, অনেকও নহে, ইহা বলিয়া গগন-পদ্মের ন্যায় উহার অলীকত্বও সমর্থন করা করা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত পরমাণু বিচারে আস্তিকসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন করিবেন যে, "নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ" (৫।৮৭) এই সাংখ্যসূত্রে পরমাণুর কার্য্যত্ব শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া পরমাণুর অনিত্যত্বই সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং পরমাণুতে যে কার্য্যত্ব হেতুই অসিদ্ধ এবং উহা যে নিত্য, ইহা কিরূপে বলা যায়? যাহা শ্রুতিসিদ্ধ, তাহা ত কেবল তর্কের দ্বারা অস্বীকার করা যাইবে না?

এতদুত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, পরমাণুর কার্য্যত্ব বা জন্যত্ববোধক কোন শ্রুতি-বাক্য দেখা যায় না। সাংখ্যসূত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ ভট্টের উদ্ধৃত "প্রকৃতিপুরুষাদন্যৎ সর্ব্বমনিত্যং" এই বাক্য যে প্রকৃত শ্রুতিবাক্য, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষুও পরমাণুর জন্যত্ববোধক কোন শ্রুতিবাক্য দেখাইতে পারেন নাই। তাই তিনি পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, যদিও কালবশে লোপাদিপ্রযুক্ত আমরা সেই শ্রুতি দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আচার্য্য কপিলের উক্ত সূত্র এবং মনুস্মৃতিবশতঃ ঐ শ্রুতি অনুমেয়। তিনি পরে মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের "অণ্ব্যো মাত্রাবিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাঞ্চ যাঃ স্মৃতাঃ" (২৭শ) ইত্যাদি বচনটি উদ্ধৃত করিয়া উক্ত বচনের দ্বারা যে, পরমাণুর ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রসম্মত নিত্যত্ব নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা নিজ মতানুসারে বুঝাইয়াছেন। মনুস্মৃতিতে শ্রুতির সিদ্ধান্তই কথিত হওয়ায় উক্ত মনু-বচনের সমানার্থক কোন শ্রুতিবাক্য অবশ্যই ছিল বা আছে, ইহা অনুমান করিয়া পরমাণুর কার্য্যত্ববোধক সেই শ্রুতিবাক্যকে তিনি অনুমেয় শ্রুতি বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত মনু-বচনে "মাত্রা" শব্দের দ্বারা সাংখ্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত পঞ্চতন্মাত্রা গ্রহণ করিয়া, উহারই বিনাশিত্ব কথিত হইয়াছে। এবং প্রথমে ঐ "মাত্রা"রই বিশেষণ-বোধক "অণ্বী" শব্দের প্রয়োগ করিয়া উহাকে অণুপরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। ঐ স্থলে পরমাণু অর্থে "অণু" শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। "লঘ্বী মাত্রা" এইরূপ প্রয়োগের ন্যায় "অণ্বী মাত্রা" এই প্রয়োগে গুণবাচক "অণু" শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গে "অণ্বী" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং উহার দ্বারা দ্রব্যাত্মক পরমাণু গ্রহণ করা যায় না। মেধাতিথি প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণও উক্ত বচনের দ্বারা বিজ্ঞান ভিক্ষুর ন্যায় কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। সাংখ্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত পঞ্চ তন্মাত্রার বিনাশ কথিত হইলেও তদ্দ্বারা ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত পরমাণুর বিনাশিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, ন্যায় বৈশেষিক-সম্মত নিত্য পরমাণু ঐ পঞ্চতন্মাত্রাও নহে, উহা হইতে উৎপন্নও নহে। ফল কথা, উক্ত মনুবচনের দ্বারা ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত পরমাণুর কার্য্যত্ব বা জন্যত্ববোধক শ্রুতির অনুমান করা যায় না। পরন্তু বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রথমে যে আচার্য্য কপিলের বাক্যের দ্বারা ঐরূপ শ্রুতির অনুমান করিয়াছেন, তাহাও নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, উক্ত সাংখ্যসূত্রটি যে, মহর্ষি কপিলেরই উচ্চারিত, ইহা বিবাদগ্রস্ত। পরন্তু যদি উক্ত কপিল-সূত্রের দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ববোধক শ্রুতিবাক্যের অনুমান করা যায়, তাহা হইলে আচার্য্য মহর্ষি গোতমের সূত্রের দ্বারাও পরমাণুর নিত্যত্ববোধক শ্রুতিবাক্যের অনুমান করা যাইবে না কেন? মহর্ষি গোতমও দ্বিতীয় অধ্যায়ে "নাণুনিত্যত্বাৎ" (২।২৪) এই সূত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত "অন্তর্ব্বহিশ্চ" ইত্যাদি (২০শ) সূত্রে পরমাণুকে "অকার্য্য" বলিয়াছেন। মহর্ষি কণাদও "সদকারণবন্নিত্যং" (৪।১।১) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি কপিলের বাক্যের দ্বারা শ্রুতির অনুমান করা যায়, কিন্তু মহর্ষি গোতম ও কণাদের বাক্যের দ্বারা তাহা করা যায় না, ইহা বলিতে গেলে কোন দিনই বিবাদের অবসান হইবে না। বেদ-প্রামাণ্যসমর্থক মহর্ষি গোতম ও কণাদ বুদ্ধিমাত্রকল্পিত কেবল তর্কের দ্বারা ঐ সমস্ত অবৈদিক সিদ্ধান্তেরও সমর্থন

করিয়া গিয়াছেন, ইহাও কোনরূপে বলা যায় না। কারণ, মহর্ষি গোতম তৃতীয় অধ্যায়ে "শ্রুতি-প্রামাণ্যাচ্চ" (১।৩১) এই সূত্রের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণই নহে, ইহা তাঁহারও সিদ্ধান্তরূপে সূচনা করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্য ও বৈশেষিকাচার্য্যগণও শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমানের অপ্রামাণ্যই সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তাই মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি"র পঞ্চম স্তবকে ন্যায়মতানুসারে ঈশ্বর বিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার ঐ অনুমান যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, পরন্তু শ্রুতিসম্মত, ইহা দেখাইতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "বিশ্বত-শ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতঃ পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥" (৩।৩) এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তিনি উক্ত শ্রুতিবাক্যে "পতত্র" শব্দের দ্বারা মহর্ষি গোতম-সম্মত নিত্য পরমাণুকেই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,[১] পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐ নিত্য পরমাণুসমূহে অধিষ্ঠান করতঃ সৃষ্টির নিমিত্ত উহাদিগের দ্ব্যণুকাদিজনক পরস্পর সংযোগ উৎপন্ন করেন। ঐ শ্রুতিবাক্যে "পতত্রৈঃ পরমাণুভিঃ "সংজনয়ন্" সমুৎপাদয়ন্ "সংধমতি" সংযোজয়তি" এইরূপ ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে তিনি বলিয়াছেন যে, পরমাণুসমূহ সতত গমন করিতেছে, উহারা গতিশীল। এ জন্য "পতন্তি গচ্ছন্তি" এই অর্থে পতধাতুনিষ্পন্ন "পতত্র" শব্দ পরমাণুর সংজ্ঞা। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতি-বাক্যে "পতত্র" শব্দের দ্বারা পরমাণুই কথিত হইয়াছে। ফলকথা, উদয়নাচার্য্যের মতে উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্বও সিদ্ধ হওয়ায় উহার নিত্যত্বসাধক অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, পরন্তু শ্রুতিসম্মত। অবশ্য উদয়নাচার্য্যের উক্তরূপ শ্রুতিব্যাখ্যা অন্য সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। উহা সর্ব্বসম্মত ব্যাখ্যা হইতেও পারে না। কিন্তু তিনি যে, তাঁহার ব্যাখ্যাত গোতম মতের শ্রুতিবিরুদ্ধতা স্বীকার করেন নাই, পরন্তু উহা শ্রুতিসম্মত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। শ্রুতিব্যাখ্যায় মতভেদ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে। উদয়নাচার্য্য যেমন উক্ত শ্রুতিবাক্যে "পতত্র" শব্দের দ্বারা পরমাণুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্রূপ স্বমত সমর্থনের জন্য অন্যান্য দার্শনিকগণও অনেক স্থলে শ্রুতিস্থ অনেক শব্দের দ্বারা কষ্টকল্পনা করিয়া অনেক অপ্রসিদ্ধ অর্থেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও অস্বীকার করা যাইবে না। তন্মধ্যে কাহার কোন্ ব্যাখ্যা প্রকৃত, কোন্ ব্যাখ্যা কাল্পনিক, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে সেই ভগবান্ বেদপুরুষের বহু সাধনা করা আবশ্যক। কেবল লৌকিক বুদ্ধি ও লৌকিক বিচারের দ্বারা নির্ব্বিবাদে কোন দিনই উহার নির্ণয় হইতে পারে না।

এখন এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার এই প্রকরণের প্রারম্ভে "আনুপলম্ভিক"কেই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়া সেখানে যাহার মতে "সর্ব্বং নাস্তি"অর্থাৎ কোন পদার্থেরই সত্তা নাই, তাহাকেই "আনুপলম্ভিক" বলিয়াছেন। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ঐ স্থলে আনুপলম্ভিকের মতে

১। ষষ্ঠেন পরমাণুরূপ-প্রধানাধিষ্ঠেয়ত্বং,—তেহি গতিশীলত্বাৎ পতত্রব্যপদেশাঃ,—পতন্তীতি। সং ধমতি সং জনয়ন্নিতিচ ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ। তেন সংযোজয়তি সমুৎপাদয়ন্নিত্যর্থঃ।—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, পঞ্চম স্তবক, তৃতীয় কারিকার ব্যাখ্যার শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

শূন্যতাই সকল পদার্থের তত্ত্ব, ইহা বলিয়াছেন এবং তিনি প্রথম আহ্নিকের "সর্ব্বমভাবঃ" (৪।১।৩৭) ইত্যাদি সূত্রোক্ত মতকেও শূন্যতাবাদীর মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই শূন্যতাবাদের প্রাচীন কালে নানারূপে ব্যাখ্যা হইয়াছিল। তজ্জন্য শূন্যতাবাদীদিগের মধ্যেও সম্প্রদায়ভেদ ও মতভেদ হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন শূন্যবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, কোন পদার্থের অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, ইহাই তাঁহার সম্মত শূন্যবাদ। সুতরাং কোন পদার্থের অস্তিত্বই নাই, একেবারে "সর্ব্বং নাস্তি", এই মত একপ্রকার শূন্যতাবাদ নামে কথিত হইলেও উহা নাগার্জ্জুনের ব্যাখ্যাত শূন্যবাদ নহে; যে মতে "সর্ব্বং নাস্তি" উহাকে সর্ব্বাভাববাদও বলা যাইতে পারে। এই সর্ব্বাভাববাদিগণও বিজ্ঞানবাদীদিগের যুক্তিকে আশ্রয় করিয়াই পরমাণুর অভাব সমর্থন করিয়াছিলেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "আনুপলম্ভিক"কেই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন। পূর্ব্বে "সর্ব্বমভাবঃ" (৪।১।৩৭) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা যে সকল পদার্থের অসত্তাবাদের বিচার ও খণ্ডন হইয়াছে, উহা "অসদ্‌বাদ" নামেও কথিত হইয়াছে। উক্ত মতে সমস্ত ভাব পদার্থই অসৎ, ইহা ব্যবস্থিত। অর্থাৎ ভাবপদার্থ বলিয়া যে সমস্ত পদার্থ প্রতীত হইতেছে, উহা অভাবই, ইহাই এক প্রকার একান্তবাদ বলিয়া সেখানে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। উক্ত মতে অসৎ পদার্থেরই বাস্তব উপলব্ধি হয়, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার এই প্রকরণের প্রারম্ভে যাহাকে "আনুপলম্ভিক" বলিয়াছেন, তাহার মতে উপলব্ধি পদার্থও বস্তুতঃ নাই, ইহা ঐ "আনুপলম্ভিক" শব্দের দ্বারাও বুঝা যায়। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত মত হইতে তাহার মতে যে কিছু বিশেষ আছে, ইহাও বলা যায়। সুধীগণ এ বিষয়ে প্রণিধান করিবেন। পরে ইহা আরও ব্যক্ত হইবে॥২৫॥

নিরবয়ব-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৩॥

ভাষ্য। যদিদং ভবান্ বুদ্ধীরাশ্রিত্য বুদ্ধিবিষয়াঃ সন্তীতি মন্যতে, মিথ্যাবুদ্ধয় এতাঃ। যদি হি তত্ত্ব-বুদ্ধয়ঃ স্যুর্ব্বুদ্ধ্যা বিবেচনে ক্রিয়মাণে যাথাত্ম্যং বুদ্ধিবিষয়াণামুপলভ্যেত ?

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) এই যে আপনি নানা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধির বিষয়সমূহ আছে, ইহা স্বীকার করিতেছেন, এই সমস্ত মিথ্যাবুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রম। কারণ, যদি ঐ সমস্ত বুদ্ধি তত্ত্ববুদ্ধি (যথার্থ বুদ্ধি) হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিতে গেলে তখন বুদ্ধির বিষয়সমূহের যাথাত্ম্য (প্রকৃত স্বরূপ) উপলব্ধ হউক ?

সূত্র। বুদ্ধ্যা বিবেচনাত্তু ভাবানাং যাথাত্ম্যানুপলব্ধিস্তন্ত্বপকর্ষণে পটসদ্ভাবানুপলব্ধিবত্তদনুপলব্ধিঃ॥ ॥২৬॥৪৩৬॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে তৎপ্রযুক্ত ভাব-

সমূহের অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় বলিয়া স্বীকৃত সমস্ত পদার্থেরই যাথাত্ম্যের (স্বরূপের) উপলব্ধি হয় না। তন্তুর অপকর্ষণ করিলে অর্থাৎ বস্ত্রের উপাদান বলিয়া স্বীকৃত সূত্রগুলির এক একটি করিয়া বিভাগ করিলে বস্ত্রের অস্তিত্বের অনুপলব্ধির ন্যায় সেই অনুপলব্ধি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পদার্থেরই স্বরূপের অনুপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। যথা অয়ং তন্তুরয়ং তন্তুরয়ং তন্তুরিতি প্রত্যেকং তন্তুষু বিবিচ্যমানেষু নার্থান্তরং কিঞ্চিদুপলভ্যতে যৎ পটবুদ্ধের্বিষয়ঃ স্যাৎ। যাথাত্ম্যানুপলব্ধেরসতি বিষয়ে পটবুদ্ধির্ভবন্তী মিথ্যাবুদ্ধির্ভবতি, এবং সর্ব্বত্রেতি।

অনুবাদ। যেমন ইহা সূত্র, ইহা সূত্র, ইহা সূত্র—এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যেকে সমস্ত সূত্রগুলি বিবিচ্যমান হইলে তখন আর কোন পদার্থ উপলব্ধ হয় না—যাহা বস্ত্রবুদ্ধির বিষয় হইবে। যাথাত্ম্যের অনুপলব্ধিবশতঃ অর্থাৎ সমস্ত সূত্রগুলির এক একটি করিয়া অপকর্ষণ করিলে তখন বস্ত্রের স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় অসৎ বিষয়ে জায়মান বস্ত্রবুদ্ধি মিথ্যাবুদ্ধি হয়। এইরূপ সর্ব্বত্রই মিথ্যাবুদ্ধি হয়।

টিপ্পনী। সূত্রে "তু" শব্দের দ্বারা প্রকরণান্তরের আরম্ভ সূচিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির মতে এই প্রকরণের নাম "বাহ্যার্থভঙ্গনিরাকরণপ্রকরণ"। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে জ্ঞান ভিন্ন উহার বিষয় বাহ্য পদার্থের সত্তা নাই, এই বিজ্ঞানবাদই প্রধানতঃ এই প্রকরণের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "যদিদং ভবান্" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতে লিখিয়াছেন,—"বিজ্ঞানবাদ্যাহ"। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার মতে এই প্রকরণে বিজ্ঞানবাদীই যে পূর্ব্বপক্ষবাদী, ইহা বুঝা যায় না। পরন্তু তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "আনুপলম্ভিক" বা সর্ব্বাভাববাদীই পূর্ব্বপক্ষবাদী, ইহাই বুঝা যায়। ভাষ্যকার এখানে প্রথমে "যদিদং ভবান্" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা যে যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, উহা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "আনুপলম্ভিকে"র পরিগৃহীত চরম যুক্তি বলিয়াও গ্রহণ করা যায়। তাই ভাষ্যকার এখানে বিশেষ করিয়া অন্য পূর্ব্বপক্ষবাদীর উল্লেখ করেন নাই। পরবর্ত্তী ৩৭শ সূত্রের ভাষ্যটিপ্পনীতে ইহা ব্যক্ত হইবে।

মহর্ষি পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে এই সূত্রে প্রথমে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থেরই স্বরূপের অনুপলব্ধি হয়। পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেমন সূত্রসমূহের অপকর্ষণ করিলে বস্ত্রের অস্তিত্বের অনুপলব্ধি, তদ্রূপ সর্ব্বত্র সমস্ত পদার্থেরই স্বরূপের অনুপলব্ধি। ভাষ্যকার সূত্রার্থ-ব্যাখ্যায় মহর্ষির ঐ দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা

করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন কোন বস্ত্রের উপাদান সূত্রগুলিকে এক একটি করিয়া ইহা সূত্র, ইহা সূত্র, ইহা সূত্র, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে সর্ব্বশেষে ঐ সমস্ত সূত্র ভিন্ন আর কিছুরই উপলব্ধি হয় না। সুতরাং সেখানে "বস্ত্র" এইরূপ বুদ্ধির বিষয় কিছুই নাই, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, যদি ঐ সমস্ত সূত্র হইতে ভিন্ন বস্ত্র বলিয়া কোন পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে ঐ স্থলে অবশ্যই তাহার স্বরূপের উপলব্ধি হইত। কিন্তু ঐ স্থলে বস্ত্রের স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় ইহা স্বীকার্য্য যে, বস্ত্র অসৎ। অসৎ বিষয়েই "বস্ত্র" এইরূপ বুদ্ধি জন্মে। সুতরাং উহা ভ্রমাত্মক বুদ্ধি। অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে বস্ত্রের স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় সূত্র হইতে ভিন্ন বস্ত্র বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহা স্বীকার করিলেও সূত্রের যখন স্বরূপের উপলব্ধি হয়, তখন সূত্রের সত্তা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সূত্রবুদ্ধিকে মিথ্যাবুদ্ধি বলা যাইবে না। ভাষ্যকার এই জন্য শেষে বলিয়াছেন, "এবং সর্ব্বত্র"। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, যেমন সূত্রগুলিকে পূর্ব্বোক্ত-রূপ বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে শেষে আর বস্ত্রের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ ঐ সমস্ত সূত্রের অবয়ব বা অংশগুলিকেও এক একটী করিয়া বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে শেষে ঐ সমস্ত সূত্রেরও স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এবং সেই সমস্ত অংশের অংশগুলিকেও পূর্ব্বোক্তরূপে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে শেষে উহাদিগেরও স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এইরূপে সর্ব্বত্রই কোন বস্তুরই স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় সকল বস্তুই অসৎ। সুতরাং সকল বস্তুবিষয়ক জ্ঞানই ভ্রম, ইহা স্বীকার্য্য। বার্ত্তিককার পূর্ব্বপক্ষবাদীর চরম অভিসন্ধি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপে বস্ত্রের অবয়ব সূত্র এবং তাহার অবয়ব অংশু এবং তাহার অবয়ব প্রভৃতি পরমাণু পর্য্যন্ত বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে যেমন ঐ সমস্ত পদার্থের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ পরমাণুসমূহেরও অবয়ব প্রভৃতির ঐরূপে বিবেচন করিলে শেষে প্রলয় অর্থাৎ সর্ব্বাভাবই হয়। সুতরাং সকল পদার্থেরই অসত্ত্বাবশতঃ সমস্ত বুদ্ধিই ভ্রম, ইহা স্বীকার্য্য। সর্ব্বাভাববাদীও অবয়ববিভাগকে "প্রলয়ান্ত" বলিয়া পরমাণুর অভাব সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বপ্রকরণে তাঁহার অন্য যুক্তির সমর্থন ও খণ্ডন হইয়াছে। পরে এই প্রকরণে সকল পদার্থের অসত্ত্বাসমর্থক পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারাও পুনর্ব্বার তাঁহার উক্ত মত পূর্ব্বপক্ষরূপে সমর্থিত হইয়াছে, ইহাও বার্ত্তিককারের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার, ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের "যদিদং ভবান্" ইত্যাদি প্রথমোক্ত সন্দর্ভের দ্বারা বিজ্ঞানবাদেরই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, বস্ত্র যদি সূত্র হইতে ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে সূত্র হইতে ভিন্নরূপেই বস্ত্রের উপলব্ধি হইত। এইরূপ সূত্রের অবয়ব অংশু এবং তাহার অবয়ব প্রভৃতি এবং পরমাণুও পূর্ব্বোক্তরূপে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে উহাদিগের পৃথক্ কোন স্বরূপের উপলব্ধি না হাওয়ায় স্থূল বা ক্ষুদ্র কোন বাহ্য বস্তুই বস্তুতঃ নাই। সমস্ত বুদ্ধিই নিজের অবাহ্য আকারকে বাহ্যত্বরূপে বিষয় করায় মিথ্যাবুদ্ধি। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে মহাযানসম্প্রদায়ের পরিপোষক যোগাচারসম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদেরই সমর্থন ও প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কথা পরে ব্যক্ত হইবে। বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিতে বৌদ্ধ গ্রন্থ "লঙ্কাবতারসূত্রে"ও মহর্ষি গোতমের এই সূত্রোক্ত যুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" মহামনীষী মাধবাচার্য্য বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিতে

"লঙ্কাবতারসূত্রে"র ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন[১]। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বেও ঐ সমস্ত মতের প্রচার ও নানা প্রকারে সমর্থন হইয়াছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব ॥২৬॥

সূত্র। ব্যাহতত্বাদহেতুঃ ॥২৭॥৪৩৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যাহতত্ব প্রযুক্ত অহেতু [অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী যে সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলব্ধিকে তাঁহার নিজমতের সাধক হেতু বলিয়াছেন, এবং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনকে উহার সাধক হেতু বলিয়াছেন, উহা ব্যাহত অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া হেতু হয় না]।

ভাষ্য। যদি বুদ্ধ্যা বিবেচনং ভাবানাং, ন সর্ব্বভাবানাং যাথাত্ম্যানুপলব্ধিঃ। অথ সর্ব্বভাবানাং যাথাত্ম্যানুপলব্ধির্ন বুদ্ধ্যা বিবেচনং। ভাবানাং বুদ্ধ্যা বিবেচনং যাথাত্ম্যানুপলব্ধিশ্চেতি ব্যাহন্যতে। তদুক্ত-"মবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গশ্চৈবমাপ্রলয়া"দিতি।

অনুবাদ। যদি পদার্থসমূহের বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলব্ধি হয় না। আর যদি সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলব্ধি হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন হয় না। (অতএব) পদার্থসমূহের বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন এবং স্বরূপের অনুপলব্ধি ব্যাহত অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ হয়। "অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গশ্চৈবমাপ্রলয়াৎ" (১৫শ) এই সূত্রের দ্বারা তাহা উক্ত হইয়াছে। [অর্থাৎ উপলব্ধির বিষয়াভাবে উপলব্ধি না থাকিলে আশ্রয়ের অভাবে কোন হেতুই যে থাকে না, সুতরাং কোন হেতুর দ্বারা অভিমত সিদ্ধি যে সম্ভবই হয় না, ইহা ঐ সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে]।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত হেতু হেতুই হয় না। কারণ, উহা ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে সকল পদার্থেরই স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, এই কথা বলিয়া সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলব্ধিকেই উহার অভাবের সাধক হেতু বলিয়াছেন এবং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনকে সেই অনুপলব্ধির সাধক হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ উভয় হেতু পরস্পর বিরুদ্ধ। ভাষ্যকার এই বিরোধ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যদি বুদ্ধির দ্বারা সকল পদার্থের বিবেচন হয়, তাহা

১। তদুক্তং ভগবতা লঙ্কাবতারে—বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্য্যতে।
অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দর্শিতাঃ ॥
ইদং বস্তুবলায়াতং যদ্বদন্তি বিপশ্চিতঃ।
যথা যথার্থাশ্চিন্ত্যন্তে বিশীর্য্যন্তে তথা তথা ॥—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন।

হইলে স্বরূপের অনুপলব্ধি থাকে না। কারণ, বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন হইলে স্বরূপের উপলব্ধিই হয়। কোন পদার্থের স্বরূপ না থাকিলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন হইতেই পারে না। স্বরূপের অনুপলব্ধি হইলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনও হয় না। সুতরাং পদার্থসমূহের বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন ও স্বরূপের অনুপলব্ধি একত্র সম্ভব না হওয়ায় উহা পরস্পর বিরুদ্ধ। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদী পদার্থসমূহের বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনকে হেতুরূপে স্বীকার করায় স্বরূপের উপলব্ধি স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং পদার্থের স্বরূপ স্বীকার করিতেও তিনি বাধ্য হওয়ায় তাঁহার অভিমত সিদ্ধি হইতে পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে পদার্থকে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিয়া তাহার স্বরূপের অনুপলব্ধি সমর্থন করিবে, ঐ পদার্থকে কোন পদার্থবিশেষ হইতেই বিবেচন করিতে হইবে। যে পদার্থ হইতে ঐ বিবেচন হয়, তাহাকে ঐ বিবেচনের "অবধি" বলা হয়। ঐ "অবধি" না থাকিলে সেই বিবেচন হইতেই পারে না। সুতরাং ঐ বিবেচন-নির্ব্বাহের জন্য যে পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য, ঐ পদার্থেরই স্বরূপের উপলব্ধি ও সত্তা তাঁহার অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই পদার্থের কোন স্থানে অবস্থান স্বীকার না করিলে অনবস্থা-দোষ ও তন্মূলক অন্যান্য দোষ অনিবার্য্য। ফলকথা, পূর্ব্বোক্তরূপে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন স্বীকার করিতে গেলেই ঐ বিবেচনের "অবধি" কোন পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন ও সকল পদার্থের অনুপলব্ধি পরস্পর বিরুদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত ১৫শ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, উপলব্ধির বিষয় না থাকিলে উপলব্ধিরও অভাব হওয়ায় সেই উপলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া যে হেতু সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা আশ্রয়ের ব্যাঘাতক হওয়ায় আত্মঘাতী হয়, উহা আত্মলাভ করিতেই পারে না। ভাষ্যকার এখানেও তাঁহার ঐ যুক্তি স্মরণ করাইবার জন্য শেষে পূর্ব্বোক্ত ঐ সূত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন। বার্ত্তিককার সর্ব্বশেষে ইহাও বলিয়াছেন যে,[১] পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্বমভাবঃ" (৪।১।৩৭) ইত্যাদি সূত্রোক্ত মতে যে দোষ বলিয়াছি, তাহা এখানেও বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত মতে যে ব্যাঘাতচতুষ্টয় প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা এই মতেও আছে। এই সূত্রোক্ত ব্যাঘাতের ন্যায় সেই ব্যাঘাতচতুষ্টয়ও এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্বমত-সিদ্ধির বাধক। বার্ত্তিককারের পূর্ব্বপ্রদর্শিত সেই ব্যাঘাতচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা চতুর্থ খণ্ডে ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥২৭॥

সূত্র। তদাশ্রয়ত্বাদপৃথগ্গ্রহণং ॥২৮॥৪৩৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) তদাশ্রিতত্ত্ববশতঃ অর্থাৎ কার্য্যদ্রব্যের কারণ-দ্রব্যাশ্রিতত্ত্ব-বশতঃ (কারণ-দ্রব্য হইতে) পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হয় না।

ভাষ্য। কার্য্যদ্রব্যং কারণ-দ্রব্যাশ্রিতং, তৎকারণেভ্যঃ পৃথঙ্-নোপলভ্যতে। **বিপর্য্যয়ে পৃথগ্গ্রহণাৎ**। যত্রাশ্রয়াশ্রিতভাবো নাস্তি,

---

১। যশ্চ "সর্ব্বমভাবো ভাবেম্বিতরেতরাপেক্ষসিদ্ধে"রিত্যেতস্মিন্ বাদে দোষ উক্তঃ স ইহাপি দ্রষ্টব্য ইতি। —ন্যায়বার্ত্তিক।

তত্র পৃথগ্‌গ্রহণমিতি। বুদ্ধ্যা বিবেচনাত্তু ভাবানাং পৃথগ্‌গ্রহণমতীন্দ্রিয়েষ্বণুষু। যদিন্দ্রিয়েণ গৃহ্যতে তদেতয়া বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানমন্যদিতি।

অনুবাদ। কার্য্যদ্রব্য কারণদ্রব্যাশ্রিত, সে জন্য কারণ-দ্রব্যসমূহ হইতে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধ (প্রত্যক্ষ) হয় না। যেহেতু বিপর্য্যয় থাকিলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিপরীত স্থলেই পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হয়। (তাৎপর্য্য) যে স্থলে আশ্রয়াশ্রিতভাব নাই, সেই স্থলে পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হয়। কিন্তু পদার্থসমূহের (বস্ত্রাদি পদার্থের) বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনপ্রযুক্ত অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমূহ বিষয়ে পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হয়। (তাৎপর্য্য) যাহা (বস্ত্রাদি) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা এই বুদ্ধির দ্বারা বিবিচ্যমান হইয়া অন্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন বলিয়া গৃহীত হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই আপত্তি করিবেন যে, বস্ত্রাদি দ্রব্য যদি তাহার উপাদান সূত্রাদি হইতে ভিন্ন পদার্থ ই হয়, তাহা হইলে ঐ সূত্রাদি দ্রব্যকে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে বস্ত্রাদি দ্রব্যের পৃথক্ উপলব্ধি হউক? কিন্তু তাহা ত হয় না। কুত্রাপি সূত্র হইতে পৃথক্‌রূপে বস্ত্রের প্রত্যক্ষ হয় না। এতদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তদাশ্রিতত্ববশতঃ পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হয় না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে সূত্রাদি দ্রব্যকে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিয়া বস্ত্রাদি দ্রব্যের স্বরূপের অনুপলব্ধি বলিয়াছেন, ঐ সূত্রাদি দ্রব্যই এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা মহর্ষির বুদ্ধিস্থ এবং সেই সূত্রাদি দ্রব্য যাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে "তদাশ্রয়" শব্দের দ্বারা তদাশ্রিত, এই অর্থ ই মহর্ষির বিবক্ষিত। সূত্রাদি দ্রব্য হইতে বস্ত্রাদি দ্রব্যের যে পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হয় না, মহর্ষি এই সূত্রে তাহার হেতু বলিয়াছেন—তদাশ্রিতত্ব। ভাষ্যকার মহর্ষির যুক্তি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, কার্য্যদ্রব্য কারণদ্রব্যাশ্রিত, এই জন্যই ঐ কারণ-দ্রব্য হইতে কার্য্যদ্রব্যের পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হয় না। কারণ, উহার বিপরীত স্থলেই অর্থাৎ যে স্থানে উভয় দ্রব্যের আশ্রয়াশ্রিতভাব নাই, সেই স্থলেই উভয় দ্রব্যের পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, যে সমস্ত সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি হয়, ঐ সমস্ত সূত্র সেই বস্ত্রের উপাদান কারণদ্রব্য। বস্ত্র উহার কার্য্যদ্রব্য। উপাদান-কারণ-দ্রব্যেই কার্য্যদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। সুতরাং কার্য্যদ্রব্য তাহার উপাদান-কারণেই সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। উপাদান-কারণই কার্য্যদ্রব্যের আশ্রয় হওয়ায় সূত্রসমূহ বস্ত্রের আশ্রয় এবং বস্ত্র উহার আশ্রিত। সূত্র ও বস্ত্রের ঐ আশ্রয়াশ্রিতভাব আছে বলিয়াই সূত্র হইতে বস্ত্রের পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হয় না। কারণ, বস্ত্রে চক্ষুঃসংযোগকালে উহার আশ্রয় সূত্রেও চক্ষুঃসংযোগ হওয়ায় সূত্রেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এবং ঐ সমস্ত সূত্রেই বস্ত্রের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সূত্র হইতে ভিন্ন কোন স্থানে বস্ত্রের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু গো এবং অশ্বাদি দ্রব্যের ঐরূপ আশ্রয়াশ্রিতভাব না থাকায় পৃথক্‌রূপেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সূত্র হইতে বস্ত্রের অপৃথক্ গ্রহণ কি? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে কএকটী পক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, সূত্র হইতে ভিন্ন স্থানে বস্ত্রের অদর্শনই ঐ অপৃথক্‌গ্রহণ

বলিতে হইবে। কিন্তু উহা সূত্র ও বস্ত্রের অভেদের সাধক হয় না। কারণ, বস্ত্র সূত্র হইতে ভিন্ন পদার্থ হইলেও সূত্রকে আশ্রয় করিয়া তাহাতেই বিদ্যমান থাকে, এই জন্যই উহা হইতে ভিন্ন স্থানে বস্ত্রের অদর্শন হয়। সুতরাং সূত্র ও বস্ত্রের ভেদ সত্ত্বেও ঐরূপ অপৃথক্‌গ্রহণের উপপত্তি হওয়ায় উহার দ্বারা সূত্র ও বস্ত্রের অভেদ সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে সূত্র হইতে বস্ত্রের পৃথক্‌গ্রহণ না হইলেও ঐ সূত্র হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত বিবেচন করিলে পরমাণুসমূহ হইতে ঐ বস্ত্রের পৃথক্‌গ্রহণ অবশ্যই স্বীকার্য্য। কারণ, পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়। বস্ত্রের প্রত্যক্ষস্থলে সূত্রের প্রত্যক্ষ হইলেও পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং অনুমানসিদ্ধ সেই সমস্ত পরমাণু হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্ত্র যে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে উহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ ঐ বুদ্ধির দ্বারাই বিবিচ্যমান হইয়া অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন বলিয়াই গৃহীত হয়। পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলেও বস্ত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে তাহার ভেদ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কারণ, ভেদের প্রত্যক্ষে আধারের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাই অপেক্ষিত। ঐ ভেদের প্রতিযোগীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা না থাকিলেও উহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। এখানে ভাষ্যকারের শেষ কথার দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্ত তাঁহার সম্মত বুঝা যায়॥২৮॥

সূত্র। প্রমাণতশ্চার্থ-প্রতিপত্তেঃ ॥২৯॥৪৩৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) এবং যেহেতু প্রমাণের দ্বারা পদার্থের উপলব্ধি হয় (অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতু অহেতু)।

ভাষ্য। বুদ্ধ্যা বিবেচনাদ্‌ভাবানাং যাথাত্ম্যোপলব্ধিঃ। যদস্তি যথাচ, যন্নাস্তি যথাচ, তৎ সর্ব্বং প্রমাণত উপলব্ধ্যা সিধ্যতি। যাচ প্রমাণত উপলব্ধিস্তদ্‌বুদ্ধ্যা বিবেচনং ভাবানাং। তেন সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বে চ প্রাণিনাং ব্যবহারা ব্যাপ্তাঃ। পরীক্ষমাণো হি বুদ্ধ্যাঽধ্যবস্যতি ইদমস্তীদং নাস্তীতি। তত্র সর্ব্বভাবানুপপত্তিঃ।

অনুবাদ। বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনপ্রযুক্ত পদার্থসমূহের স্বরূপের উপলব্ধি (স্বীকার্য্য)। কারণ, যে বস্তু আছে ও যে প্রকারে আছে, এবং যাহা নাই ও যে প্রকারে নাই, সেই সমস্ত, প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধিপ্রযুক্ত সিদ্ধ হয়। যাহা কিন্তু প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি, তাহাই সকল পদার্থের বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন। তদ্দ্বারা সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বকর্ম্ম ও প্রাণিগণের সমস্ত ব্যবহার ব্যাপ্ত অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন থাকে। কারণ, পরীক্ষক ব্যক্তি "ইহা আছে," "ইহা নাই" ইহা বুদ্ধির দ্বারাই নিশ্চয় করে। তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সত্য অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে সকল পদার্থের অনুপপত্তি (অসত্তা) নাই।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত "ব্যাহতত্বাদহেতুঃ" (২৭শ) এই সূত্র হইতে "অহেতুঃ" এই পদের অনুবৃত্তি এই সূত্রে মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত ঐ সূত্রে পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতুকে মহর্ষি বিরুদ্ধ বলিয়া অহেতু বলিয়াছেন। শেষে এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃত কথা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ হেতুই অসিদ্ধ। সুতরাং উহা অহেতু। ঐ হেতু অসিদ্ধ কেন? ইহা বুঝাইতে এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি বলিয়াছেন যে, যেহেতু প্রমাণ দ্বারা পদার্থের উপলব্ধি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনপ্রযুক্ত সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলব্ধিকে তাঁহার স্বমতের সাধক হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনপ্রযুক্ত সকল পদার্থের স্বরূপের উপলব্ধিই স্বীকার্য্য হইলে ঐ হেতু তাঁহার নিজের কথানুসারেই অসিদ্ধ হইবে। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিতে মহর্ষির অভিমত যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে বস্তু আছে এবং যে প্রকারে অর্থাৎ যেরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া আছে, এবং যাহা নাই এবং যে প্রকারে অর্থাৎ যেরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া নাই, সেই সমস্তই প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধিপ্রযুক্তই সিদ্ধ হয়, প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি ব্যতীত কোন বস্তুরই সত্তা ও অসত্তা প্রভৃতি কিছুই সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্বপক্ষবাদীও বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন স্বীকার করিয়া প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, প্রমাণ দ্বারা যে উপলব্ধি, তাহাই ত বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন। এবং সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বকর্ম্ম ও সমস্ত জীবব্যবহার উহার দ্বারা ব্যাপ্ত। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন আছে। উহা ব্যতীত শাস্ত্র, কর্ম্ম ও জীবব্যবহার কিছুই হইতে পারে না। পরীক্ষক অর্থাৎ তত্ত্ব-নির্ণয়কারী ব্যক্তিও "ইহা আছে" এবং "ইহা নাই", ইহা বুদ্ধির দ্বারাই নির্ণয় করেন। সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন সকলেরই অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় প্রমাণ দ্বারা বস্তুস্বরূপের উপলব্ধি হয় না, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। সুতরাং সকল পদার্থের অসত্তা হইতে পারে না। কারণ, প্রমাণ দ্বারা বস্তুস্বরূপের যথার্থ উপলব্ধিই স্বীকার্য্য হইলে সেই সমস্ত বস্তুর সত্তাই সিদ্ধ হয়। বস্তুস্বরূপের অনুপলব্ধি অসিদ্ধ হওয়ায় ঐ হেতুর দ্বারা সকল বস্তুর অসত্তা সিদ্ধ হইতে পারে না। এখানে ভাষ্যকারের শেষ কথার দ্বারা তিনি যে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাভাববাদী "আনুপলম্ভিক"কেই পূর্ব্বপক্ষবাদিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যের দ্বারা ইহা আরও সুস্পষ্ট বুঝা যায়। ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রানুসারেই ভাষ্যারম্ভে বলিয়াছেন,—"প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ"। বার্ত্তিককার সেখানে লিখিয়াছেন যে, "প্রমাণতঃ" এই পদে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির সমস্ত বচনের অর্থ প্রকাশের জন্যই "তসিল্" প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। বার্ত্তিককারের তাৎপর্য্য সেখানেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মহর্ষির এই সূত্রেও "প্রমাণতঃ" এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা বার্ত্তিককারের পূর্ব্বকথিত উদ্দেশ্য গ্রহণ করা যায়॥ ২৯॥

সূত্র। প্রমাণানুপপত্ত্যুপপত্তিভ্যাং ॥৩০॥৪৪০॥

অনুবাদ। (উত্তর) প্রমাণের সত্তা ও অসত্তাপ্রযুক্ত (সর্ব্বাভাবের উপপত্তি হয় না)।

ভাষ্য। এবঞ্চ সতি সর্ব্বং নাস্তীতি নোপপদ্যতে, কস্মাৎ? **প্রমাণানুপপত্ত্যুপপত্তিভ্যাং**। যদি সর্ব্বং নাস্তীতি প্রমাণমুপপদ্যতে, সর্ব্বং নাস্তীত্যেতদ্ব্যাহন্যতে। অথ প্রমাণং নোপপদ্যতে সর্ব্বং নাস্তীত্যস্য কথং সিদ্ধিঃ। অথ প্রমাণমন্তরেণ সিদ্ধিঃ, সর্ব্বমস্তীত্যস্য কথং ন সিদ্ধিঃ।

অনুবাদ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা বস্তুস্বরূপের উপলব্ধি স্বীকার্য্য হইলে "সমস্ত বস্তু নাই" ইহা উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) প্রমাণের অনুপপত্তি ও উপপত্তিপ্রযুক্ত। (তাৎপর্য্য) যদি "সমস্ত বস্তু নাই" এই বিষয়ে প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে "সমস্ত বস্তু নাই" ইহা ব্যাহত হয়। আর যদি প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে "সমস্ত বস্তু নাই" ইহার সিদ্ধি কিরূপে হইবে? আর যদি প্রমাণ ব্যতীতই সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে "সমস্ত বস্তু আছে" ইহার সিদ্ধি কেন হয় না?

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্বাভাববাদ" খণ্ডন করিতে শেষে এই সূত্রের দ্বারা চরম কথা বলিয়াছেন যে, প্রমাণের অনুপপত্তি ও উপপত্তিপ্রযুক্ত সমস্ত বস্তুই নাই, ইহা উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির বিবক্ষিত ঐ সাধ্য প্রকাশ করিয়া মহর্ষির সূত্রবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক উহার হেতু প্রকাশ করিয়াছেন। পরে মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত বস্তুই নাই, অর্থাৎ জগতে কোন পদার্থই নাই, এই বিষয়ে যদি প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে সেই প্রমাণ-পদার্থের সত্তা থাকায় সকল পদার্থের অসত্তা থাকিতে পারে না। প্রমাণের সত্তা ও সমস্ত পদার্থের অসত্তা পরস্পর বিরুদ্ধ। আর যদি সকল পদার্থ নাই, এই বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে কিরূপে উহা সিদ্ধ হইবে? প্রমাণ ব্যতীত কিছু সিদ্ধ হইতে পারে না। সর্ব্বাভাববাদী যদি বলেন যে, প্রমাণ ব্যতীতই উহা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থই আছে, ইহা কেন সিদ্ধ হইবে না? প্রমাণ ব্যতীত সকল পদার্থের অসত্তা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু সত্তা সিদ্ধ হইবে না, ইহার কোন কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রমাণের সত্তা ও অসত্তা, এই উভয় পক্ষেই যখন পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাভাববাদের উপপত্তি হয় না, তখন কোনরূপেই উহা উপপন্ন হইতে পারে না। প্রমাণের উপপত্তি অর্থাৎ সত্তা এবং অনুপপত্তি অর্থাৎ অসত্তা, এই উভয়ই উক্ত মতের অনুপপত্তি বা অসিদ্ধির প্রয়োজক হওয়ায় মহর্ষি এই সূত্রে ঐ উভয়কেই হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি স্বেচ্ছানুসারে প্রথমে "অনুপপত্তি" শব্দের প্রয়োগ করিলেও ভাষ্যকার "উপপত্তি" পদার্থই প্রথম বুদ্ধিগ্রাহ্য বলিয়া প্রথমে উহাই গ্রহণ করিয়াছেন ॥৩০॥

সূত্র। স্বপ্ন-বিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানঃ॥ ॥৩১॥৪৪১॥

মায়া-গন্ধর্ব্বনগর-মৃগতৃষ্ণিকাবদ্বা ॥৩২॥৪৪২॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ভ্রমের ন্যায় এই প্রমাণ ও প্রমেয়-বিষয়ক ভ্রম হয়।

অথবা মায়া, গন্ধর্ব্বনগর ও মরীচিকা-প্রযুক্ত ভ্রমের ন্যায় এই প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রম হয়।

ভাষ্য। যথা স্বপ্নে ন বিষয়াঃ সন্ত্যথ চাভিমানো ভবতি, এবং ন প্রমাণানি প্রমেয়ানি চ সন্ত্যথচ প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানো ভবতি।

অনুবাদ। যেমন স্বপ্নাবস্থায় বিষয়সমূহ নাই অথচ "অভিমান" অর্থাৎ নানা-বিষয়ক ভ্রম হয়, এইরূপ প্রমাণ ও প্রমেয়সমূহও নাই, অথচ প্রমাণ ও প্রমেয়-বিষয়ক ভ্রম হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা যে চরম কথা বলিয়াছেন, তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদীর চরম কথা এই যে, প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ বস্তুতঃ নাই এবং প্রমেয়ও নাই। সুতরাং বাস্তব প্রমাণের দ্বারা কোন বাস্তব প্রমেয়সিদ্ধিও হয় না। প্রমাণ-প্রমেয়ভাবই বাস্তব নহে। কিন্তু উহা অনাদি সংস্কারপ্রযুক্ত কল্পনামূলক। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নানা বিষয়ের যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহা ঐ সমস্ত বিষয়ের সত্তা না থাকায় 'অসদ্‌বিষয়ক বলিয়া ভ্রম, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থায় "ইহা প্রমাণ" ও "ইহা প্রমেয়", এইরূপে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহাও ভ্রম। কারণ, প্রমাণ ও প্রমেয় সৎপদার্থ নহে। অসৎ বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহা অবশ্যই ভ্রম। আপত্তি হইতে পারে যে, জাগ্রদবস্থায় যে অসংখ্য বিষয়জ্ঞানজন্য লোকব্যবহার চলিতেছে, উহা স্বপ্নাবস্থার বিষয়জ্ঞান হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। সুতরাং তদ্‌দৃষ্টান্তে জাগ্রদবস্থার সমস্ত বিষয়জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না। এ জন্য পূর্ব্বোক্ত মতবাদীরা শেষে বলিয়াছেন যে, জাগ্রদবস্থাতেও যে বহু বহু ভ্রমজ্ঞান জন্মে, ইহাও সর্ব্বসম্মত। ঐন্দ্রজালিক মায়া প্রয়োগ করিয়া বহু অসদ্‌বিষয়ে দ্রষ্টার ভ্রম উৎপন্ন করে। এবং আকাশে গন্ধর্ব্ব-নগর না থাকিলেও কোন কোন সময়ে গন্ধর্ব্বনগর বলিয়া ভ্রম হয় এবং মরীচিকায় জলভ্রম হয়, ইহা ত সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং জাগ্রদবস্থার ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, সুতরাং প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞানও ভ্রম, ইহা অবশ্য বলিতে পারি। মহর্ষি এখানে পূর্ব্বোক্ত দুইটী সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্য ও বার্ত্তিকে "মায়া-গন্ধর্ব্ব" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা দেখা যায় না; সুতরাং উহা প্রকৃত ন্যায়সূত্র কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র এখানে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনের জন্য "মায়া-গন্ধর্ব্ব" ইত্যাদি বাক্যের পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন এবং তিনি "ন্যায়সূচীনিবন্ধে"ও উহা সূত্রমধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। মিথিলেশ্বরসূরি নব্য বাচস্পতি মিশ্রও "ন্যায়সূত্রোদ্ধারে" "মায়াগন্ধর্ব্ব" ইত্যাদি সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। পরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও উহা সূত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও পরবর্ত্তী ৩৫শ সূত্রের ভাষ্যে মায়া, গন্ধর্ব্বনগর ও মৃগতৃষ্ণিকার ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা সমস্ত জ্ঞানেরই যে ভ্রমত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরে বার্ত্তিককারও "মায়াগন্ধর্ব্বনগর-

মৃগতৃষ্ণিকাদ্বা” এই বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে উহা যে, মহর্ষি গোতমেরই সূত্র, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত “স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ” ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্য দ্বারাই ঐ দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ ব্যক্ত হওয়ায় ভাষ্যকার পৃথক্ করিয়া আর উহার ভাষ্য করেন নাই, ইহাই এখানে বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার তৃতীয় অধ্যায়েও এক স্থানে মহর্ষি গোতমের দুইটী সূত্রের মধ্যে প্রথম সূত্রের ভাষ্য করেন নাই (তৃতীয় খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এবং পরেও স্পষ্টার্থ বলিয়া কোন সূত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই এবং ব্যাখ্যা না করার পূর্ব্বোক্তরূপ কারণও তিনি সেখানে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৪৮শ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

এখানে ইহা অবশ্য বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ই যে প্রথমে উক্ত মায়াদি দৃষ্টান্তের উদ্ভাবন ও উল্লেখ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মত সমর্থন করিয়াছিলেন, তদনুসারেই পরে ন্যায়দর্শনে উক্ত সূত্রদ্বয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা কোনরূপেই নির্ণয় করা যায় না। কারণ, সুপ্রাচীন কাল হইতেই ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা নানা মতের সমর্থন ও প্রচার হইয়াছে। মৈত্রী উপনিষদেও চতুর্থ প্রপাঠকে দেখা যায়, “ইন্দ্রজালমিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাদর্শনং” ইত্যাদি। অদ্বৈতবাদী বৈদিকসম্প্রদায়ও শ্রুতি অনুসারে কোন কোন অংশে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বিবর্ত্তবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তবে তাঁহারা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতানুসারে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু উহার প্রতিবাদই করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতমতনিষ্ঠ আধুনিক কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও যে এখানে মহর্ষি গোতমের উক্ত দুইটী সূত্রের উল্লেখ করিয়া, তদ্দ্বারা মহর্ষি গোতমকেও অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা একেবারেই অমূলক। কারণ, মহর্ষি গোতম এখানে উক্ত দুইটী পূর্ব্বপক্ষসূত্র বলিয়া, পরে কতিপয় সূত্রের দ্বারা উহার খণ্ডনই করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার সমর্থিত অন্যান্য সমস্ত সিদ্ধান্তও অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধ কি না, তাহাও প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক। তৃতীয় খণ্ডে আত্মপরীক্ষার শেষে এবং চতুর্থ খণ্ডে কএক স্থানে এ বিষয়ে যথামতি আলোচনা করিয়াছি। সুধীগণ নিরপেক্ষভাবে উহার বিচার করিবেন ॥৩১॥৩২॥

সূত্র। হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ ॥৩৩॥৪৪৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) হেতুর অভাববশতঃ অসিদ্ধি [অর্থাৎ অত্যাবশ্যক হেতুর অভাবে কেবল পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতের সিদ্ধি হইতে পারে না]।

ভাষ্য। স্বপ্নান্তে বিষয়াভিমানবৎ প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানো ন পুনর্জ্জাগরিতান্তে বিষয়োপলব্ধিবদিত্যত্র হেতুর্নাস্তি,—হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ। স্বপ্নান্তে চাসন্তো বিষয়া উপলভ্যন্ত ইত্যত্রাপি হেত্বভাবঃ।

প্রতিবোধেঽনুপলম্ভাদিতি চেৎ? প্রতিবোধবিষয়োপলম্ভাদপ্রতিষেধঃ। যদি প্রতিবোধেঽনুপলম্ভাৎ স্বপ্নে বিষয়া ন

সন্তীতি, তর্হি ন ইমে প্রতিবুদ্ধেন বিষয়া উপলভ্যন্তে, উপলম্ভাৎ সন্তীতি।
বিপর্য্যয়ে হি হেতুসামর্থ্যং। উপলম্ভাৎ সদ্ভাবে সত্যনুপলম্ভাদভাবঃ সিধ্যতি। উভয়থা ত্বভাবে নানুপলম্ভস্য সামর্থ্যমস্তি। যথা প্রদীপস্যাভাবাদ্রূপস্যাদর্শনমিতি তত্র ভাবেনাভাবঃ সমর্থ্যত ইতি।

স্বপ্নান্তবিকল্পে চ হেতুবচনং। "স্বপ্নবিষয়াভিমানব"দিতি ব্রুবতা স্বপ্নান্তবিকল্পে হেতুর্ব্বাচ্যঃ। কশ্চিৎ স্বপ্নো ভয়োপসংহিতঃ, কশ্চিৎ প্রমোদোপসংহিতঃ, কশ্চিদুভয়বিপরীতঃ, কদাচিৎ স্বপ্নমেব ন পশ্যতীতি। নিমিত্তবতস্তু স্বপ্নবিষয়াভিমানস্য নিমিত্তবিকল্পাদ্বিকল্পোপপত্তিঃ।

অনুবাদ। স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ভ্রমের ন্যায় প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রম হয়, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় বিষয়ের উপলব্ধির ন্যায় নহে— এই বিষয়ে হেতু নাই, হেতুর অভাববশতঃ সিদ্ধি হয় না। এবং স্বপ্নাবস্থায় অসৎ বিষয়সমূহই উপলব্ধ হয়, এই বিষয়েও হেতুর অভাব।

(পূর্ব্বপক্ষ) "প্রতিবোধ" অর্থাৎ জাগরণ হইলে অনুপলব্ধিবশতঃ, ইহা যদি বল? (উত্তর) জাগরণে বিষয়ের উপলব্ধিবশতঃ প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ এই যে, যদি জাগরণ হইলে (স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়সমূহের) উপলব্ধি না হওয়ায় স্বপ্নে বিষয়সমূহ নাই অর্থাৎ অসৎ, ইহা বল, তাহা হইলে "প্রতিবুদ্ধ" (জাগরিত) ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই যে, সমস্ত বিষয় উপলব্ধ হইতেছে, উপলব্ধিবশতঃ সেই সমস্ত বিষয় আছে অর্থাৎ সৎ, ইহা স্বীকার্য্য। যেহেতু বিপর্য্যয় থাকিলে হেতুর সামর্থ্য থাকে। বিশদার্থ এই যে, উপলব্ধিপ্রযুক্ত সত্তা (বিপর্য্যয়) থাকিলে অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত অভাব সিদ্ধ হয়। কিন্তু উভয়থা অভাব হইলে অর্থাৎ বিষয়ের উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, এই উভয় পক্ষেই বিষয়ের অভাব সিদ্ধ হইলে অনুপলব্ধির (বিষয়াভাব সাধনে) সামর্থ্য থাকে না। যেমন প্রদীপের অভাবপ্রযুক্ত রূপের দর্শনাভাব হয়, এ জন্য সেই স্থলে "ভাবে"র দ্বারা অর্থাৎ কোন স্থলে প্রদীপের সত্তাপ্রযুক্ত রূপ দর্শনের সত্তার দ্বারা "অভাব" (প্রদীপাভাবপ্রযুক্ত রূপদর্শনাভাব) সমর্থিত হয়।

এবং "স্বপ্নান্ত বিকল্পে" অর্থাৎ স্বপ্নের বিবিধ কল্প বা বৈচিত্র্যে হেতু বলা আবশ্যক। বিশদার্থ এই যে, "স্বপ্নে বিষয়ভ্রমের ন্যায়" এই কথা যিনি বলিতেছেন, তৎকর্ত্তৃক স্বপ্নের বৈচিত্র্যে হেতু বক্তব্য। কোন স্বপ্ন ভয়ান্বিত, কোন স্বপ্ন আনন্দান্বিত, কোন

স্বপ্ন ঐ উভয়ের বিপরীত, অর্থাৎ ভয় ও আনন্দ, এই উভয়শূন্য,--কদাচিৎ স্বপ্নই দেখে না।

কিন্তু স্বপ্নে বিষয়ভ্রম নিমিত্তবিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ কোন নিমিত্ত বা হেতুবিশেষ-জন্য হইলে তাহার হেতুর বৈচিত্র্যবশতঃ বৈচিত্র্যের উপপত্তি হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, হেতুর অভাববশতঃ সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে হেতু না থাকায় তাঁহার ঐ মতের সিদ্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষি-কথিত "হেত্বভাবে"র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ভ্রমের ন্যায় প্রমাণ-প্রমেয়-বিষয়ক জ্ঞান ভ্রম, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় বিষয়োপলব্ধির ন্যায় উহা যথার্থ নহে, এই বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে কোন হেতু নাই এবং স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি হয়, সেই সমস্ত বিষয় যে অসৎ, এই বিষয়েও তাহার মতে কোন হেতু নাই। এবং স্বপ্নের যে বিকল্প অর্থাৎ বৈচিত্র্য, তাহারও হেতু বলা আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে তাহারও কোন হেতু নাই। ভাষ্যকারের প্রথম কথার তাৎপর্য্য এই যে, স্বপ্নাবস্থার সমস্ত জ্ঞান যে ভ্রম, ইহা পরে উহার বাধক কোন জ্ঞান ব্যতীত প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং জাগ্রদবস্থার জ্ঞানকেই উহার বাধক বলিতে হইবে। তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত ভ্রমজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। তাহা হইলে জাগ্রদবস্থার সেই যথার্থ জ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞান যথার্থ, ইহাও ত বলিতে পারি। জাগ্রদবস্থার যথার্থ জ্ঞানের ন্যায় প্রমাণ-প্রমেয়-বিষয়ক জ্ঞান যথার্থ নহে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার ভ্রমজ্ঞানের ন্যায় উহা ভ্রম, এ বিষয়ে কোন হেতু নাই। ভাষ্যে "স্বপ্নান্ত" ও "জাগরিতান্ত" শব্দের অর্থ স্বপ্নাবস্থা ও জাগরিতাবস্থা। ঐ স্থলে অবস্থা অর্থে "অন্ত" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকারও ইহাই লিখিয়াছেন। উপনিষদেও "স্বপ্নান্ত" ও "জাগরিতান্ত" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়[১]। কিন্তু সেখানে আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। বস্তুতঃ "স্বপ্ন" নামক ভ্রমজ্ঞানই স্বপ্নাবস্থা। কদাচিৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের "ইহা আমি দেখিয়াছি" এইরূপে স্বপ্নাবস্থাতেই স্মরণ হয়। উহা স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নের অন্তে জন্মে, এ জন্য ঐ স্মরণাত্মক জ্ঞানবিশেষ "স্বপ্নান্তিক" নামে কথিত হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ "তথা স্বপ্নঃ" এবং "স্বপ্নান্তিকং" (৯।২।৭।৮) এই দুই সূত্রের দ্বারা আত্মমনঃসংযোগবিশেষ ও সংস্কারবিশেষজন্য "স্বপ্ন" ও "স্বপ্নান্তিক" জন্মে, ইহা বলিয়াছেন। তদনুসারে বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ তাহার কথিত চতুর্ব্বিধ ভ্রমের মধ্যে চতুর্থ স্বপ্নকে আত্মমনঃসংযোগবিশেষ ও সংস্কার-বিশেষজন্য অবিদ্যমান বিষয়ে মানস প্রত্যক্ষবিশেষ বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত "স্বপ্নান্তিক" নামক জ্ঞান স্মৃতি, উহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং উহা স্বপ্নজ্ঞান নহে, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। ন্যায়াচার্য্য-গণের মতেও স্বপ্নজ্ঞান অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষবিশেষ, উহা স্মৃতি নহে। প্রশস্তপাদ ঐ স্বপ্নকে

১। স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি।—কঠোপনিষৎ, ৪র্থ বল্লী। স্বপ্নান্তং স্বপ্নমধ্যং স্বপ্নবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। তথা জাগরিতান্তং জাগরিতমধ্যং জাগরিতবিজ্ঞেয়ঞ্চোভৌ স্বপ্নান্তজাগরিতান্তৌ।—শঙ্করভাষ্য।

(১) সংস্কারের পটুতা বা আধিক্যজন্য, (২) ধাতুদোষজন্য এবং (৩) অদৃষ্টবিশেষজন্য—এই ত্রিবিধ বলিয়াছেন। কামী অথবা ক্রুদ্ধ ব্যক্তি যে সময়ে তাহার প্রিয় অথবা দ্বেষ্য ব্যক্তিকে ধারাবাহিক চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হয়, তখন তাহার ঐ সমস্ত চিন্তা বা স্মৃতিসন্ততিই সংস্কারের আধিক্য-প্রযুক্ত প্রত্যক্ষাকার হয় অর্থাৎ সেই চিন্তিত বিষয় স্বপ্নজ্ঞানের জনক হয়। ধাতুদোষজন্য স্বপ্ন ঐরূপ নহে। তাহাতে পূর্ব্বে কোন চিন্তার অপেক্ষা নাই। যেমন বাতপ্রকৃতি অথবা বাত-দূষিত ব্যক্তি স্বপ্নে আকাশ-গমনাদি দর্শন করে। পিত্তপ্রকৃতি অথবা পিত্তদূষিত ব্যক্তি স্বপ্নে অগ্নি-প্রবেশ ও স্বর্ণপর্ব্বতাদি দর্শন করে। শ্লেষ্মপ্রকৃতি অথবা শ্লেষ্মদূষিত ব্যক্তি নদী, সমুদ্র প্রতরণ ও হিমপর্ব্বতাদি দর্শন করে। প্রশস্তপাদ পরে বলিয়াছেন যে, নিজের অনুভূত অথবা অননুভূত বিষয়ে প্রসিদ্ধ পদার্থ অথবা অপ্রসিদ্ধ পদার্থ বিষয়ে শুভসূচক গজারোহণ ও ছত্রলাভাদিবিষয়ক যে স্বপ্ন জন্মে, তাহা সমস্তই সংস্কার ও ধর্ম্মজন্য এবং উহার বিপরীত অশুভসূচক তৈলাভ্যঞ্জন ও গর্দ্দভ, উষ্ট্রে আরোহণাদিবিষয়ক যে স্বপ্ন জন্মে, তৎসমস্ত অধর্ম্ম ও সংস্কারজন্য। শেষে বলিয়াছেন যে, অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ একেবারে অজ্ঞাত পদার্থ বিষয়ে অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্তই স্বপ্ন জন্মে। দার্শনিক-চূড়ামণি মহাকবি শ্রীহর্ষও নৈষধীয় চরিতে বলিয়াছেন,—"অদৃষ্টমপ্যর্থমদৃষ্টবৈভবাৎ করোতি সুপ্তি-র্জ্জনদর্শনাতিথিং" (১৷৩৯)। দময়ন্তী নলরাজাকে পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ না করিয়াও স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, ইহা শ্রীহর্ষ উক্ত শ্লোকে "অদৃষ্টবৈভবাৎ" এই হেতুবাক্যের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতমের সূত্রানুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ পূর্ব্বানুভূত বিষয়েই সংস্কারবিশেষজন্য স্বপ্ন সমর্থন করিয়াছেন। একেবারে অজ্ঞাত বিষয়ে সংস্কারের অভাবে স্বপ্ন জন্মিতে পারে না। প্রশস্তপাদও স্বপ্নজ্ঞানে "স্বাপ" নামক সংস্কারকে কারণ বলিয়াছেন। নল রাজা দময়ন্তী কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অদৃষ্ট হইলেও অজ্ঞাত ছিলেন না। তদ্বিষয়ে দময়ন্তীর শ্রবণাদি জ্ঞানজন্য সংস্কার পূর্ব্বে অবশ্যই ছিল। ফলকথা, একেবারে অজ্ঞাত বিষয়েও যে স্বপ্নজ্ঞান জন্মে, ইহা বাৎস্যায়ন প্রভৃতির সম্মত নহে। পরবর্ত্তী সূত্রে ইহা ব্যক্ত হইবে। তবে স্বপ্নজ্ঞান যে ভ্রম, ইহা সর্ব্বসম্মত। কারণ, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলি স্বপ্নকালে দ্রষ্টার সম্মুখে বিদ্যমান না থাকায় স্বপ্নজ্ঞান অসদ্‌বিষয়ক অর্থাৎ অবিদ্যমানবিষয়ক। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে উহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলি যে অলীক, এ বিষয়ে তাঁহার মতে কোন সাধক হেতু নাই। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, যদি বল, স্বপ্নের পরে জাগরণ হইলে তখন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলির উপলব্ধি না হওয়ায় ঐ সমস্ত বিষয় যে অলীক, ইহা সিদ্ধ হয়। তৎকালে বিষয়ের অভাব সাধনে পরে জাগ্রদবস্থায় অনুপলব্ধিই হেতু। কিন্তু ইহা বলিলে জাগ্রদবস্থায় অন্যান্য সময়ে নানা বিষয়ের উপলব্ধি হওয়ায় সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতিষেধ বা অভাব হইতে পারে না। সেই সমস্ত বিষয়কে সৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। কারণ, অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত বিষয়ের অসত্তা সিদ্ধ করিতে হইলে উপলব্ধিপ্রযুক্ত বিষয়ের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, যেহেতু বিপর্য্যয় থাকিলেই হেতুর সামর্থ্য থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষ-বাদী যে অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত অসত্তা বলিয়াছেন, উহার বিপর্য্যয় বা বৈপরীত্য হইতেছে—উপলব্ধি-

প্রযুক্ত সত্তা। উহা স্বীকার না করিলে অনুপলব্ধির দ্বারা বিষয়ের অভাব সাধন করা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে স্বপ্নের পরে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অনুপলব্ধিস্থলের ন্যায় জাগ্রদবস্থায় অন্যান্য সময়ে নানা বিষয়ের উপলব্ধিস্থলেও যখন সেই সমস্ত বিষয়ের অভাবই স্বীকৃত, তখন স্বপ্নস্থলে পরে অনুপলব্ধি হেতুর দ্বারা তিনি স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অসত্তা সিদ্ধ করিতে পারেন না। তাঁহার মতে ঐ অনুপলব্ধি হেতু বিষয়ের অভাব সাধনে সমর্থ নহে। কারণ, তাঁহার মতে উপলব্ধি হইলেও বিষয়ের সত্তা নাই। ভাষ্যকার পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেমন অন্ধকারে প্রদীপের অভাবপ্রযুক্ত রূপ দর্শন না হওয়ায় সেখানে প্রদীপের সত্তাপ্রযুক্ত রূপ দর্শনের সত্তা আছে বলিয়াই তদ্দ্বারা সেই রূপদর্শনাভাব সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে প্রদীপ থাকিলে রূপ দর্শন হইয়া থাকে, এ জন্যই প্রদীপের অভাবপ্রযুক্ত যে রূপ-দর্শনাভাব, ইহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু যদি ঐ স্থলে প্রদীপ থাকিলেও রূপ দর্শন না হইত, তাহা হইলে প্রদীপের অভাব রূপ দর্শনাভাবের সাধক হেতু হইত না। বস্তুতঃ ঐ স্থলে প্রদীপের সত্তা রূপদর্শনের হেতু বলিয়াই প্রদীপের অসত্তা রূপের অদর্শনের হেতু বলিয়া স্বীকার করা যায়। এইরূপ জাগ্রদবস্থায় নানা বিষয়ের উপলব্ধি ঐ সমস্ত বিষয়ের সত্তার সাধক হইলেই স্বপ্নের পরে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অনুপলব্ধি ঐ সমস্ত বিষয়ের অসত্তার সাধক হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে ঐ অনুপলব্ধি ঐ সমস্ত বিষয়ের অসত্তার সাধক হেতু হয় না। সুতরাং তাঁহার মতে ঐ বিষয়ে কোন হেতু নাই।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে স্বপ্ন-বিকল্পেরও কোন হেতু নাই। বিকল্প বলিতে বিবিধ কল্প বা নানাপ্রকারতা অর্থাৎ বৈচিত্র্য। কোন স্বপ্নে তৎকালে ভয় জন্মে, কোন স্বপ্নে আনন্দ জন্মে, কোন স্বপ্নে ভয়ও নাই, আনন্দও নাই, এইরূপে স্বপ্নের যে বৈচিত্র্য এবং উহার মধ্যে কোন সময়ে যে, ঐ স্বপ্নের নিবৃত্তি, এ বিষয়ে অবশ্য হেতু বলিতে হইবে। কারণ, হেতু ব্যতীত উহার উপপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে যখন কোন পদার্থেরই সত্তা নাই, তখন তিনি উক্ত বিষয়ে কোন হেতু বলিতে পারেন না। তাঁহার মতে উক্ত বিষয়ে কোন হেতু নাই। কিন্তু "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" এই কথা বলিয়া যখন তিনি স্বপ্ন স্বীকার করিয়াছেন, তখন ঐ স্বপ্নের বৈচিত্র্যের হেতু কোন পদার্থ স্বীকার করিতেও তিনি বাধ্য। তাহা হইলে সেই নিমিত্ত বা হেতুর বৈচিত্র্যবশতঃ স্বপ্নের বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে। আমাদিগের মতে সেই হেতুর সত্তা ও বৈচিত্র্য থাকায় উহা উপপন্ন হয়। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে তাহা উপপন্ন হয় না। সুতরাং হেতুর অভাববশতঃ তাঁহার মতের সিদ্ধি হয় না ॥৩৩॥

সূত্র। স্মৃতি-সংকল্পবচ্চ স্বপ্নবিষয়াভিমানঃ ॥ ॥৩৪॥৪৪৪॥

অনুবাদ। এবং স্বপ্নে বিষয়ভ্রম স্মৃতিও সংকল্পের ন্যায় (পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক)।

ভাষ্য। পূর্ব্বোপলব্ধবিষয়ঃ। যথা স্মৃতিশ্চ সংকল্পশ্চ পূর্ব্বোপ-

লব্ধবিষয়ৌ, ন তস্য প্রত্যাখ্যানায় কল্পেতে, তথা স্বপ্নে বিষয়গ্রহণং পূর্ব্বোপলব্ধবিষয়ং ন তস্য প্রত্যাখ্যানায় কল্পত ইতি। এবং **দৃষ্টবিষয়শ্চ স্বপ্নান্তো জাগরিতান্তেন।** যঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং পশ্যতি, স এব জাগ্রৎ স্বপ্নদর্শনানি প্রতিসন্ধত্তে ইদমদ্রাক্ষমিতি। **তত্র জাগ্রদ্‌বুদ্ধিবৃত্তিবশাৎ স্বপ্নবিষয়াভিমানো মিথ্যেতি ব্যবসায়ঃ।** সতি চ প্রতিসন্ধানে যা জাগ্রতো বুদ্ধি-বৃত্তিস্তদ্বশাদয়ং ব্যবসায়ঃ স্বপ্নবিষয়াভিমানো মিথ্যেতি।

উভয়াবিশেষে তু সাধনানর্থক্যং। যস্য স্বপ্নান্তজাগরিতান্তয়োরবিশেষস্তস্য "স্বপ্নবিষয়াভিমানব"দিতি সাধনমনর্থকং, তদাশ্রয়প্রত্যাখ্যানাৎ।

অতস্মিংস্তদিতি চ ব্যবসায়ঃ প্রধানাশ্রয়ঃ। অপুরুষে স্থাণৌ পুরুষ ইতি ব্যবসায়ঃ স প্রধানাশ্রয়ঃ। ন খলু পুরুষেঽনুপলব্ধে পুরুষ ইত্যপুরুষে ব্যবসায়ো ভবতি। এবং স্বপ্নবিষয়স্য ব্যবসায়ো হস্তিনমদ্রাক্ষং পর্ব্বতমদ্রাক্ষমিতি প্রধানাশ্রয়ো ভবিতুমর্হতি।

অনুবাদ। পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক অর্থাৎ সূত্রোক্ত স্বপ্নবিষয়াভিমান পূর্ব্বানুভূত সৎপদার্থবিষয়ক। (তাৎপর্য্য) যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক হওয়ায় সেই বিষয়ের প্রত্যাখ্যানের নিমিত্ত সমর্থ হয় না, তদ্রূপ স্বপ্নে বিষয়জ্ঞানও পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক হওয়ায় সেই বিষয়ের প্রত্যাখ্যানের নিমিত্ত সমর্থ হয় না। অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞানও তাহার বিষয়ের অসত্তা সাধন করিতে পারে না।

এইরূপ হইলে "স্বপ্নান্ত" অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞানরূপ স্বপ্নাবস্থা জাগরিতাবস্থা কর্ত্তৃক দৃষ্টবিষয়কই হয় (অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায় যে বিষয় দৃষ্ট বা জ্ঞাত হইয়াছে, স্বপ্নজ্ঞানে তাহাই বিষয় হয়)। যে ব্যক্তি নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই জাগ্রত হইয়া "ইহা দেখিয়াছিলাম" এইরূপে স্বপ্নদর্শনগুলি প্রতিসন্ধান (স্মরণ) করে। তাহা হইলে অর্থাৎ ঐ প্রতিসন্ধান হইলে জাগ্রত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিবশতঃ অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তিবশতঃ স্বপ্নে বিষয়াভিমান মিথ্যা, এইরূপ নিশ্চয় হয়। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিসন্ধান হইলেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে স্বপ্নদর্শনের স্মরণপ্রযুক্তই জাগ্রত ব্যক্তির যে বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তি হয়, তৎপ্রযুক্ত "স্বপ্নে বিষয়াভিমান মিথ্যা" এই নিশ্চয় জন্মে।

উভয়ের অবিশেষ হইলে কিন্তু সাধনের আনর্থক্য হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহার মতে স্বপ্নাবস্থা ও জাগরিতাবস্থার বিশেষ নাই, তাঁহার "স্বপ্নে বিষয়াভিমানের ন্যায়" এই সাধন অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্ত-বাক্য নিরর্থক হয়। কারণ, তাঁহার আশ্রয়ের প্রত্যাখ্যান হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি ঐ স্বপ্নজ্ঞানের আশ্রয় যথার্থজ্ঞান একেবারেই স্বীকার করেন না।

তদ্‌ভিন্ন পদার্থে "তাহা," এইরূপ রূপব্যবসায় কিন্তু প্রধানাশ্রিত। তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ ভিন্ন স্থাণুতে "পুরুষ" এইরূপ ব্যবসায় অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নিশ্চয় জন্মে, তাহা প্রধানাশ্রিত। যে হেতু, পুরুষ অনুপলব্ধ হইলে অর্থাৎ কখনও বাস্তব পুরুষের যথার্থ প্রত্যক্ষ না হইলে পুরুষ ভিন্ন পদার্থে "পুরুষ" এইরূপ নিশ্চয় (ভ্রম) হয় না। এইরূপ হইলে "হস্তী দেখিয়াছিলাম," "পর্ব্বত দেখিয়াছিলাম" এইরূপে স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ের নিশ্চয়ও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য [অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানই ভ্রমজ্ঞানের আশ্রয় হওয়ায় প্রধান জ্ঞান। সুতরাং কোন স্থলে ঐ প্রধান জ্ঞান না হইলে তদ্বিষয়ে ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে না। স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়-নিশ্চয়ও তদ্বিষয়ে যথার্থজ্ঞান ব্যতীত সম্ভব হয় না]।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে পরে এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বপ্নে বিষয়ভ্রম স্মৃতিও সংকল্পের তুল্য। ভাষ্যকার সূত্রশেষে "পূর্ব্বোপলব্ধবিষয়ঃ" এই পদের পূরণ করিয়া মহর্ষির বুদ্ধিস্থ তুল্যতা বা সাদৃশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাহার বিষয় পূর্ব্বে উপলব্ধ হইয়াছে, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে ঐ পদের দ্বারা পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক, এই অর্থ বুঝা যায়। তাহা হইলে সূত্রশেষে ঐ পদের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পূর্ব্বানুভূত পদার্থবিষয়ক, তদ্রূপ স্বপ্নে বিষয়াভিমান অর্থাৎ স্বপ্ননামক ভ্রমজ্ঞানও পূর্ব্বানুভূত-পদার্থবিষয়ক। ভাষ্যকার অন্যত্র "সংকল্প"কে মিথ্যাজ্ঞানবিশেষ বলিলেও এখানে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনারূপ ইচ্ছাবিশেষই যে "সংকল্প" শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা তাঁহার সূত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়। কারণ, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনারূপ সংকল্পই নিয়মতঃ পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক হইয়া থাকে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে "সংকল্প" শব্দের দ্বারা জ্ঞানবিশেষ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাত ঐ অর্থ প্রসিদ্ধ নহে। প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা সমুচিত নহে। ন্যায়দর্শনে পূর্ব্বে আরও অনেক সূত্রে "সংকল্প" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনাকেই সংকল্প বলিয়াছেন। এ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০ পৃষ্ঠা এবং চতুর্থ খণ্ডে ৩২৭—২৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে মহর্ষির বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পূর্ব্বানুভূত পদার্থবিষয়ক হওয়ায় উহা তাহার সেই সমস্ত বিষয়ের অসত্তা সাধন করিতে পারে না, তদ্রূপ স্বপ্ন-

জ্ঞানও পূর্ব্বানুভূত পদার্থবিষয়ক হওয়ায় উহা তাহার বিষয়ের অসত্তা সাধন করিতে পারে না। অর্থাৎ স্মৃতি ও সংকল্পের ন্যায় স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ও অসৎ বা অলীক হইতে পারে না। কারণ, স্বপ্ন-জ্ঞানের পূর্ব্বে ঐ বিষয় যথার্থজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় উহা সৎ পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। স্বপ্নজ্ঞান কিরূপে পূর্ব্বানুভূত-পদার্থবিষয়ক হয়? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞান সদ্বিষয়ক হইলে "স্বপ্নান্ত" অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞানরূপ স্বপ্নাবস্থা জাগরিতাবস্থা কর্ত্তৃক দৃষ্টবিষয়কই হয়, ইহা স্বীকার্য্য। অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায় যে বিষয় দেখিয়াছে বা জানিয়াছে, স্বপ্নাবস্থায় তাহাই বিষয় হওয়ায় উহা পূর্ব্বানুভূত পদার্থবিষয়কই হইয়া থাকে। ভাষ্যে "দৃষ্টবিষয়শ্চ" এই স্থলে "চ" শব্দের অর্থ অবধারণ। দৃষ্ট হইয়াছে বিষয় যাহার, এই অর্থে "দৃষ্টবিষয়" শব্দে বহু-ব্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে। যদিও জাগ্রৎ ব্যক্তিই সেই বিষয়ের দ্রষ্টা, তথাপি তাহার জাগরিতাবস্থায় ঐ বিষয়ের দর্শন হওয়ায় তাহাতেই সেই বিষয়দর্শনের কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষা করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "জাগরিতান্তেন"। যাহা কর্ত্তা নহে, কিন্তু কর্ত্তার কার্য্যের সহায়, তাহাতেও প্রাচীনগণ অনেক স্থলে কর্ত্তৃত্বের বিবক্ষা করিয়া সেইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও অন্যত্র ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ১৭৪—৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুপ্ত হইয়া স্বপ্ন দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই জাগরিত হইয়া "আমি ইহা দেখিয়াছিলাম" এইরূপে ঐ স্বপ্নদর্শন স্মরণ করে। তাৎপর্য্য এই যে, যে বিষয়ে স্বপ্নদর্শন হয়, সেই বিষয়টি পূর্ব্বানুভূত না হইলে তদ্বিষয়ে সংস্কার জন্মিতে পারে না। সংস্কার না জন্মিলেও তদ্বিষয়ে স্বপ্নদর্শন এবং ঐ স্বপ্নদর্শনের পূর্ব্বোক্তরূপে স্মরণ হইতে পারে না। কিন্তু যখন তদ্বিষয়ে স্বপ্নদর্শনের পূর্ব্বোক্তরূপে স্মরণ হয় এবং ঐ স্মরণে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের ন্যায় সেই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও বিষয় হয়, তখন সেই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়েও সংস্কার স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে তদ্বিষয়ে পূর্ব্বানুভবও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বানুভব সংস্কারের কারণ। অতএব স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়গুলি যে জাগরিতাবস্থায় দৃষ্ট বা অনুভূত, ইহা স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার এখানে "যঃ সুপ্তঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যুক্তিও স্মরণ করাইয়াছেন যে, একই আত্মা স্বপ্নদর্শন হইতে উহার স্মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী না হইলে স্বপ্নদর্শনের স্মরণ করিতে পারে না। স্মরণের দ্বারা যে চিরস্থায়ী এক আত্মা সিদ্ধ হয়, এবং অতীত জ্ঞানের স্মরণে যে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই পদার্থ-ত্রয়ই বিষয় হয়, ইহা ভাষ্যকার তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মূলকথা, স্বপ্নজ্ঞান পূর্ব্বানুভূত-পদার্থবিষয়ক। সুতরাং জাগরিতাবস্থায় যে বিষয় দৃষ্ট বা অনুভূত, সেই সৎপদার্থই স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় উহা অসৎ অর্থাৎ অলীক নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বপ্নজ্ঞান অসদ্বিষয়ক হইলেই অসদ্বিষয়কত্ব হেতুর দ্বারা উহার ভ্রমত্ব নিশ্চয় করা যায়। কিন্তু যদি উহা সদ্বিষয়কই হয়, তাহা হইলে উহার ভ্রমত্ব নিশ্চয় কিরূপে হইবে? স্বপ্নজ্ঞান যে ভ্রম, ইহা ত উভয় পক্ষেরই সম্মত। ভাষ্যকার এই জন্য পরেই বলিয়াছেন যে, স্বপ্ন-দর্শনের পূর্ব্বোক্তরূপে স্মরণ হইলেই জাগ্রৎ ব্যক্তির বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তিবশতঃ তাহার ঐ স্বপ্নজ্ঞান মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম, এইরূপ নিশ্চয় জন্মে। অর্থাৎ তখন জাগ্রৎ ব্যক্তির এইরূপ বুদ্ধি-

বিশেষের উৎপত্তি হয় যে, আমি যে বিষয় দেখিয়াছিলাম, তাহা কিছুই এখানে নাই। এখানে অবিদ্যমান বিষয়েই আমার ঐ জ্ঞান হইয়াছে। তাই আমি এখানে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি করিতেছি না। এইরূপ বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তি হওয়ায় তাহার পূর্ব্বজাত স্বপ্নজ্ঞান যে ভ্রম, ইহা নিশ্চয় হয়। কারণ, যে স্থানে যে বিষয় নাই, সেই স্থানে সেই বিষয়ের জ্ঞানই ভ্রম। স্বপ্ন-দ্রষ্টা যে স্থানে নানা বিষয়ের উপলব্ধি করে, সেই স্থানে সেই সমস্ত বিষয়ের অভাবের বোধ হইলেই তাহার সেই পূর্ব্বজাত স্বপ্নজ্ঞানের ভ্রমত্বনিশ্চয় অবশ্যই হইবে। উহাতে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অলীকত্বজ্ঞান অনাবশ্যক। ফলকথা, স্বপ্নজ্ঞান অলীকবিষয়ক নহে। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার নিকটে অবিদ্যমান পদার্থ উহাতে বিষয় হওয়ায় ঐ অর্থেই কোন কোন স্থানে উহাকে অসদ্‌বিষয়ক বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, স্বপ্নজ্ঞান পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক হইলেও তাহার বিষয়ের সত্তা সিদ্ধ হয় না। কারণ, আমাদিগের মতে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম। সুতরাং সমস্ত বাহ্য বিষয়ই অসৎ বা অলীক। জাগ্রদবস্থায় যে সমস্ত বিষয়ের ভ্রমজ্ঞান হয়, তজ্জন্যই ঐ সমস্ত বিষয়ে সংস্কার জন্মে। সেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞানজন্য অনাদি সংস্কারবশতঃই স্বপ্নজ্ঞান ও তাহার স্মরণ হয়। উহার জন্য বিষয়ের সত্তা স্বীকার অনাবশ্যক। ভাষ্যকার এ জন্য পরে পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্ত মতের মূলোচ্ছেদ করিতে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নজ্ঞান ও জাগরিতজ্ঞানের বিশেষ না থাকিলে অর্থাৎ ঐ উভয় জ্ঞানই ভ্রম হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" এই দৃষ্টান্তবাক্য নিরর্থক হয়। কারণ, তিনি স্বপ্নজ্ঞানের আশ্রয় কোন যথার্থ জ্ঞান স্বীকার করেন না। তাৎপর্য্য এই যে, যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যখন যথার্থজ্ঞান একেবারেই মানেন না, তখন তাঁহার মতে স্বপ্নজ্ঞান জন্মিতেই পারে না। সুতরাং উহাও অলীক। সুতরাং তাঁহার "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" এই যে সাধন, অর্থাৎ তাঁহার উক্ত মতের সাধক দৃষ্টান্তবাক্য, তাহা নিরর্থক। উহার কোন অর্থও নাই, উহার দ্বারা তাঁহার মতসিদ্ধিও হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার মতে স্বপ্নজ্ঞানই জন্মিতে পারে না। ভাষ্যকার পরে ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যাহা তাহা নহে, তাহাতে "তাহা" এইরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান প্রধান-জ্ঞানাশ্রিত। যেমন স্থাণু (শাখা-পল্লবশূন্য বৃক্ষ) পুরুষ নহে, কিন্তু তাহাতে কোন সময়ে পুরুষ বলিয়া যে ভ্রম জন্মে, উহা পূর্ব্বে বাস্তব পুরুষে যথার্থ পুরুষ-বুদ্ধিরূপ প্রধান-জ্ঞানাশ্রিত। কারণ, যে ব্যক্তি কখনও বাস্তব পুরুষ দেখে নাই, তাহার স্থাণুতে পুরুষ-বুদ্ধি জন্মিতে পারে না। কারণ, স্থাণুর সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে তখন তাহাতে বাস্তব পুরুষের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত সেই বাস্তব পুরুষের স্মরণ হয়। তাহার পরে "ইহা পুরুষ" এইরূপে স্থাণুতে পুরুষ-ভ্রম হয়। কিন্তু পূর্ব্বে পুরুষবিষয়ক সংস্কার না থাকিলে তখন পুরুষের স্মরণ হইতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ ভ্রমও হইতে পারে না। অতএব ঐরূপ ভ্রমজ্ঞানের নির্ব্বাহের জন্য ঐ স্থলে পুরুষবিষয়ক যে সংস্কার আবশ্যক, উহার জন্য পূর্ব্বে বাস্তব পুরুষবুদ্ধিরূপ যথার্থ জ্ঞান আবশ্যক। স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধি হইতে বাস্তব পুরুষে পুরুষবুদ্ধি প্রধান জ্ঞান, এবং উহা ব্যতীত ঐ ভ্রমজ্ঞান জন্মিতেই পারে না, এ জন্য ভাষ্যকার ঐ ভ্রমজ্ঞানকে প্রধানাশ্রিত বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কথা বিশদভাবে বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের যুক্তি সেখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮১—৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, স্থাণুতে পুরুষ-বুদ্ধির ন্যায় সমস্ত ভ্রমজ্ঞানই প্রধানাশ্রিত, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকার উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে উপসংহারে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির যে, "হস্তী দেখিয়াছিলাম," "পর্ব্বত দেখিয়াছিলাম," এইরূপে স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ের ব্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে, উহাও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে স্বপ্নজ্ঞানের ন্যায় জাগরিতাবস্থার সমস্ত জ্ঞানও ভ্রম। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপে স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ের যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে, যাহা স্বীকার না করিলে পূর্ব্বপক্ষবাদীও স্বপ্নজ্ঞানের উৎপত্তি বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন না, সেই জ্ঞানও তাঁহার মতে ভ্রম বলিয়া উহাও প্রধানাশ্রিত অবশ্যই হইবে। তাঁহার মতে ঐ জ্ঞানেরও ভ্রমত্ববশতঃ উহাও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য হয়। তাই বলিয়াছেন,—"প্রধানাশ্রয়ো ভবিতুমর্হতি"। প্রধান জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান যাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে "প্রধানাশ্রয়" শব্দের দ্বারা বুঝা যায় প্রধানাশ্রিত। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত কারণে স্বপ্নজ্ঞানের আশ্রয় প্রধানজ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে জাগরিতাবস্থায় যথার্থজ্ঞান স্বীকার করিতেই হইবে। সেই যথার্থ জ্ঞানের বিষয় সৎপদার্থই স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় স্বপ্নজ্ঞান পূর্ব্বানুভূত সৎপদার্থবিষয়কই হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, যাহা পূর্ব্বে যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, তাহা অসৎ অর্থাৎ অলীক হইতে পারে না। অলীক বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান কেহই স্বীকার করেন না, তাহা হইতেই পারে না। সুতরাং যথার্থ জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে তাহার বিষয়ের সত্তাও অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত মত কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে অবশ্যই আপত্তি হয় যে, যাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভূত হয় নাই, এমন অনেক বিষয়েও স্বপ্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও নানা বিচিত্র দুঃস্বপ্ন ও সুস্বপ্নের বর্ণন দেখা যায়—যাহার অনেক বিষয়ই পূর্ব্বানুভূত নহে। "ঐতরেয় আরণ্যকে"র তৃতীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে "অথ স্বপ্নাঃ পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হন্তি, বরাহ এনং হন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মরণসূচক দুঃস্বপ্ন ও তাহার শান্তি কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণে ত্রিজটার বিচিত্র স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ শাস্ত্রে আরও নানা স্থানে নানাবিধ স্বপ্ন ও তাহার ফলাদি বর্ণিত হইয়াছে। "বীরমিত্রোদয়" নিবন্ধে (রাজনীতিপ্রকাশ, ৩৩৩-৪০ পৃষ্ঠা) ঐ সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। শাস্ত্রবর্ণিত ঐ সমস্ত স্বপ্নের সমস্ত বিষয়ই যে, স্বপ্নদ্রষ্টার পূর্ব্বানুভূত, ইহা বলা যাইবে না। পরন্তু স্বপ্নে কোন সময়ে নিজের মস্তক ভক্ষণ, মস্তক ছেদন এবং সূর্য্যধারণ, সূর্য্যভক্ষণাদি কত কত অননুভূত বিষয়েরও যে জ্ঞান জন্মে, তদ্বিষয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা বহু বহু প্রামাণিক ব্যক্তিই সাক্ষী আছেন। সুতরাং উহা অস্বীকার করা যাইবে না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নে নিজের শিরশ্ছেদনাদি দর্শন স্থলেও ঐ জ্ঞানের বিষয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঐ স্বপ্নদ্রষ্টার পূর্ব্বানুভূত। অর্থাৎ নিজের

মস্তক তাহার পূর্ব্বানুভূত এবং ছেদনাদি ক্রিয়াও তাহার পূর্ব্বানুভূত। অন্যত্র ঐ ছেদনাদি ক্রিয়ার সম্বন্ধও তাহার পূর্ব্বানুভূত। উহার মধ্যে কোন পদার্থই ঐ স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির একেবারে অজ্ঞাত নহে। সেই ব্যক্তি নিজের মস্তকে ছেদনাদি ক্রিয়ার সম্বন্ধ কখনও না দেখিলেও উহা অন্যত্র দেখিয়াছে। নিজ মস্তকে ঐ সম্বন্ধবোধই তাহার ভ্রম এবং ঐ ভ্রমই তাহার স্বপ্ন। উহাতে পূর্ব্বে নিজ মস্তকে ছেদনাদি ক্রিয়ার সম্বন্ধবোধ অনাবশ্যক। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ মস্তকাদি পদার্থগুলির বোধ ও তজ্জন্য সংস্কার আবশ্যক। কারণ, নিজ মস্তকাদি পদার্থ বিষয়ে কোন সংস্কার না থাকিলে ঐরূপ স্বপ্ন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি কখনও ছেদনক্রিয়া দেখে নাই অথবা তদ্বিষয়ে তাহার অন্য কোনরূপ জ্ঞানও নাই, সে ব্যক্তি স্বপ্নেও ছেদনক্রিয়াকে ছেদন বলিয়া বুঝিতে পারে না। ফলকথা, স্বপ্নজ্ঞানের সমস্ত বিষয়ই পৃথক্ পৃথক্রূপেও পূর্ব্বানুভূত না হইলে তদ্বিষয়ে স্বপ্নজ্ঞান জন্মিতে পারে না। কারণ, স্বপ্নজ্ঞান সর্ব্বত্রই সংস্কারজন্য। মহর্ষি গোতমও এই সূত্রে স্বপ্নজ্ঞানকে স্মৃতি ও সংকল্পের তুল্য বলিয়া উক্ত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার দ্বারা তাঁহার মতে স্বপ্নজ্ঞান যে, স্মৃতি নহে, কিন্তু স্মৃতির ন্যায় সংস্কারবিশেষজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষ, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও স্বপ্নজ্ঞানকে অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষই বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে একেবারে অননুভূত অপ্রসিদ্ধ পদার্থে সংস্কার না থাকায় অদৃষ্টবিশেষের প্রভাবেই স্বপ্নজ্ঞান জন্মে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্ট ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন[১]। কিন্তু মহর্ষি গোতমের এই সূত্রানুসারে ন্যায়াচার্য্যগণ উহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে স্বপ্নজ্ঞান সর্ব্বত্রই সংস্কার-বিশেষজন্য, সুতরাং সর্ব্বত্রই পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক। মীমাংসাচার্য্য ভট্ট কুমারিলও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-মত খণ্ডন করিতে সর্ব্বত্র স্বপ্নজ্ঞানকে পূর্ব্বানুভূত বাহ্য পদার্থবিষয়ক বলিয়াই বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন[২]। তিনি উহা সমর্থন করিতে ইহাও বলিয়াছেন যে, স্বপ্নজ্ঞানের কোন বিষয় ইহ জন্মে অনুভূত না হইলেও পূর্ব্বতন কোন জন্মে উহা অবশ্য অনুভূত। যে কোন জন্মে, যে কোন কালে, যে কোন দেশে অনুভূত বিষয়ই স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকসম্প্রদায়েরও ইহাই

১। অত্যন্তাপ্রসিদ্ধেষু স্বতঃ পরতশ্চাপ্রতীতেষু চন্দ্রাদিত্যভক্ষণাদিষু জ্ঞানং, তদদৃষ্টাদেব, অননুভূতেষু সংস্কারাভাবাৎ। —"ন্যায়কন্দলী", ১৮৫ পৃষ্ঠা।

২। স্বপ্নাদিপ্রত্যয়ে বাহ্যং সর্ব্বথা নহি নেষ্যতে। সর্ব্বত্রালম্বনং বাহ্যং দেশকালান্যথাত্মকং ॥
জন্মন্যেকত্র ভিন্নে বা তথা কালান্তরেঽপি বা। তদ্দেশো বাহ্যদেশো বা স্বপ্নজ্ঞানস্য গোচরঃ ॥
—শ্লোকবার্ত্তিক, "নিরালম্বনবাদ", ১০৭—৯।

কিমিতি নেষ্যতেঽত আহ সর্ব্বত্রেতি। বাহ্যমেব দেশান্তরে কালান্তরে বাঽনুভূতমেব স্বপ্নে স্মর্য্যমাণং দোষবশাৎ সন্নিহিতদেশকালবত্তয়াবগম্যতেঽতোঽত্রাপি ন বাহ্যাভাব ইতি। ননু অননুভূতমপি কচিৎ স্বপ্নেঽবগম্যতেঽত আহ "জন্মনী"তি। অনন্তরদিবসানুভূতস্য স্বপ্নে বর্ত্তমানবদবগমাৎ স্মৃতিরেব তাবৎ স্বপ্নজ্ঞানমিতি নিশ্চীয়তে, অন্যত্রাপি স্মৃতিত্ব-মেব যুক্তং। ততশ্চাস্মিন্ জন্মনি অননুভূতস্যাপি স্বপ্নে দৃশ্যমানস্য জন্মান্তরাদাবনুভবঃ কল্প্যত ইতি।—পার্থসারথি-মিশ্রকৃত টীকা।

সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিশেষ এই যে, কুমারিলের মতে স্বপ্নজ্ঞান স্মৃতিবিশেষ, উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। কুমারিলের মতের ব্যাখ্যাতা পার্থসারথি মিশ্র ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বেদান্তসূত্রানুসারে স্বপ্নদর্শনকে স্মৃতি বলিয়া, উহা যে, জাগ্রদবস্থার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ, সুতরাং উহাকে দৃষ্টান্ত করিয়া বিজ্ঞানবাদের সমর্থন করা যায় না, ইহা বুঝাইয়াছেন[৩]। সুতরাং তাঁহার মতেও স্বপ্নজ্ঞান যে, সর্ব্বত্রই সংস্কারবিশেষজন্য, সুতরাং পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক, ইহা বুঝা যায়। কারণ, যাহা স্মৃতি, তাহা সংস্কার ব্যতীত জন্মে না। যে বিষয়ে যাহার সংস্কার নাই, তাহার তদ্বিষয়ে স্মরণ হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত। পূর্ব্বানুভব ব্যতীতও সংস্কার জন্মিতে পারে না। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, স্বপ্নের পরে জাগরিত হইলে "আমি হস্তী দেখিয়াছিলাম," "আমি পর্ব্বত দেখিয়াছিলাম" ইত্যাদিরূপেই ঐ স্বপ্নদর্শনের মানস জ্ঞান জন্মে ; তদ্দ্বারা বুঝা যায়, ঐ স্বপ্নজ্ঞান প্রত্যক্ষবিশেষ। উহা স্মৃতি হইলে আমি "হস্তী স্মরণ করিয়াছিলাম" ইত্যাদিরূপেই উহার জ্ঞান হইত। পরন্তু স্বপ্নজ্ঞান স্মৃতি হইলে স্বপ্নস্থলে বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের মিথ্যা বিষয়ের সৃষ্টি ও উহার প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকারের প্রয়োজন কি ? ইহাও বিচার্য্য। সে যাহাই হউক, ফলকথা, স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় যে, অলীক নহে এবং সমস্ত স্বপ্নজ্ঞানই যে, পূর্ব্বানুভূত-বাহ্য-পদার্থবিষয়ক, ইহা ভট্ট কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিও সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে ঐ সমস্ত বাহ্য বিষয় সৎ না হইলেও অসৎও নহে। কারণ, অসৎ বা অলীক পদার্থের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়গুলি পূর্ব্বানুভূত, ইহা স্বীকার্য্য হইলে তদ্-দৃষ্টান্তে প্রমাণ ও প্রমেয়কে অসৎ বা অলীক বলা যায় না। কারণ, স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়গুলিও অলীক নহে। যাহা পূর্ব্বানুভূত, তাহা অলীক হইতে পারে না, ইহাই এখানে মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য ॥৩৩॥

ভাষ্য। এবঞ্চ সতি—

সূত্র। মিথ্যোপলব্ধের্ব্বিনাশস্তত্ত্ব-জ্ঞানাৎ স্বপ্নবিষয়াভি-মানপ্রণাশবৎ প্রতিবোধে ॥৩৫॥৪৪৫॥

অনুবাদ। এইরূপ হইলেই অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রধানাশ্রিত হইলেই তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়—যেমন জাগরণ হইলে স্বপ্নে বিষয়ভ্রমের বিনাশ হয়।

ভাষ্য। স্থাণৌ পুরুষোঽয়মিতি ব্যবসায়ো মিথ্যোপলব্ধিঃ—অতস্মিংস্তদিতি জ্ঞানং। স্থাণৌ স্থাণুরিতি ব্যবসায়স্তত্ত্বজ্ঞানং। তত্ত্ব-জ্ঞানেন চ

৩। "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" (বেদান্তসূত্র, ২।২।২৯)। "অপিচ স্মৃতিরেষা যৎ স্বপ্নদর্শনং উপলব্ধিস্তু জাগরিতজ্ঞানং, স্মৃত্যুপলব্ধ্যোশ্চ প্রত্যক্ষমন্তরং স্বয়মনুভূয়তে" ইত্যাদি শারীরকভাষ্য।

মিথ্যোপলব্ধির্নিবর্ত্ত্যতে,—নার্থঃ স্থাণুপুরুষসামান্যলক্ষণঃ। যথা প্রতিবোধে যা জ্ঞানবৃত্তিস্তয়া স্বপ্নবিষয়াভিমানো নিবর্ত্ত্যতে,—নার্থো বিষয়সামান্যলক্ষণঃ। তথা মায়া-গন্ধর্ব্বনগর-মৃগতৃষ্ণিকাণামপি যা বুদ্ধয়োঽতস্মিংস্তদিতি ব্যবসায়াস্তত্রাপ্যনেনৈব কল্পেন মিথ্যোপলব্ধিবিনাশস্তত্ত্ব-জ্ঞানান্নার্থ-প্রতিষেধ ইতি।

উপাদানবচ্চ মায়াদিষু মিথ্যাজ্ঞানং। প্রজ্ঞাপনীয়সরূপঞ্চ দ্রব্যমুপাদায় সাধনবান্ পরস্য মিথ্যাধ্যবসায়ং করোতি—সা মায়া। নীহারপ্রভৃতীনাং নগর-রূপসন্নিবেশে দূরান্নগরবুদ্ধিরুৎপদ্যতে,—বিপর্য্যয়ে তদভাবাৎ। সূর্য্যমরীচিষু ভৌমেনোষ্মণা সংসৃষ্টেষু স্পন্দমানেষূদকবুদ্ধির্ভবতি, সামান্যগ্রহণাৎ। অন্তিকস্থস্য বিপর্য্যয়ে তদভাবাৎ। ক্বচিৎ কদাচিৎ কস্যচিচ্চ ভাবান্নানিমিত্তং মিথ্যাজ্ঞানং।

দৃষ্টঞ্চ বুদ্ধিদ্বৈতং মায়াপ্রয়োক্তুঃ পরস্য চ, দূরান্তিকস্থয়োর্গন্ধর্ব্বনগর-মৃগতৃষ্ণিকাসু,—সুপ্তপ্রতিবুদ্ধয়োশ্চ স্বপ্নবিষয়ে। তদেতৎ সর্ব্বস্যাভাবে নিরুপাখ্যতায়াং নিরাত্মকত্বে নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। স্থাণুতে "ইহা পুরুষ" এইরূপ নিশ্চয় মিথ্যাজ্ঞান (অর্থাৎ) তদ্‌ভিন্ন পদার্থে "তাহা" এইরূপ জ্ঞান। স্থাণুতে ইহা "স্থাণু"—এইরূপ নিশ্চয় তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কর্ত্তৃক মিথ্যাজ্ঞান নিবর্ত্তিত হয়, স্থাণু ও পুরুষসামান্যরূপ পদার্থ নিবর্ত্তিত হয় না। যেমন জাগরণ হইলে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তৎকর্ত্তৃক স্বপ্নে বিষয়ভ্রম নিবর্ত্তিত হয়, বিষয়সামান্যরূপ পদার্থ নিবর্ত্তিত হয় না, অর্থাৎ জাগ্রৎ ব্যক্তির জ্ঞানের দ্বারা স্বপ্নবিষয় পদার্থের অভাব বা অলীকত্ব সিদ্ধ হয় না। তদ্রূপ মায়া, গন্ধর্ব্বনগর ও মৃগতৃষ্ণিকার সম্বন্ধেও তদ্‌ভিন্ন পদার্থে "তাহা" এইরূপ নিশ্চয়াত্মক যে সমস্ত বুদ্ধি জন্মে, সেই সমস্ত স্থলেও এই প্রকারেই তত্ত্ব-জ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়, পদার্থের অর্থাৎ ঐ সমস্ত ভ্রমবিষয় পদার্থসমূহের অভাব হয় না।

পরন্তু মায়া প্রভৃতি স্থলে মিথ্যাজ্ঞান উপাদানবিশিষ্ট অর্থাৎ নিমিত্তবিশেষজন্য। যথা—"সাধনবান্" অর্থাৎ মায়া প্রয়োগের উপকরণবিশিষ্ট মায়িক ব্যক্তি "প্রজ্ঞাপনীয় সরূপ" অর্থাৎ যাহা দেখাইবে,তাহার সমানাকৃতি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া অপরের মিথ্যা অধ্যবসায় অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নিশ্চয় জন্মায়,—তাহা মায়া। নীহার প্রভৃতির নগররূপে সন্নিবেশ হইলে অর্থাৎ আকাশে হিম বা মেঘাদি গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় সন্নিবিষ্ট হইলেই

দূর হইতে নগরবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। যেহেতু "বিপর্য্যয়ে" অর্থাৎ আকাশে নীহারাদির নগররূপে সন্নিবেশ না হইলে সেই নগরবুদ্ধি হয় না। সূর্য্যকিরণ ভৌম উষ্মা কর্ত্তৃক সংসৃষ্ট হইয়া স্পন্দনবিশিষ্ট হইলেই সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষবশতঃ (তাহাতে) জলবুদ্ধি জন্মে। যে হেতু নিকটস্থ ব্যক্তির "বিপর্য্যয়"প্রযুক্ত অর্থাৎ সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষের অভাববশতঃ সেই জলভ্রম হয় না। (ফলিতার্থ) কোন স্থানে, কোন কালে, কোন ব্যক্তি-বিশেষেরই "ভাব" অর্থাৎ ঐ সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় ভ্রমজ্ঞান নির্নিমিত্তক নহে অর্থাৎ নিমিত্তবিশেষজন্য।

পরন্তু মায়াপ্রয়োগকারী ব্যক্তি এবং অপর অর্থাৎ মায়ানভিজ্ঞ দ্রষ্টা ব্যক্তির বুদ্ধির ভেদ দেখা যায়। দূরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির গন্ধর্ব্বনগর ও মরীচিকা বিষয়ে এবং সুপ্ত ও প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তির স্বপ্নবিষয়ে বুদ্ধির ভেদ দেখা যায়। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিদ্বৈত, সকল পদার্থের অভাব হইলে (অর্থাৎ) নিরুপাখ্যতা বা নিঃস্বরূপতা হইলে উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সকল পদার্থই অলীক হইলে সকলেরই একরূপই বুদ্ধি জন্মিবে, বিভিন্নরূপ বুদ্ধি জন্মিতে পারে না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, ভ্রমজ্ঞানের বিপরীত যথার্থজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান স্বীকার করিলে তদ্দ্বারাও পূর্ব্বজাত ভ্রমজ্ঞানের বিষয়গুলির অলীকত্ব প্রতিপন্ন হইবে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান হইলে তখন বুঝা যাইবে যে, পূর্ব্বজাত ভ্রমজ্ঞানের বিষয়গুলি নাই, উহা থাকিলে কখনই ভ্রমজ্ঞান হইত না; সুতরাং উহা অলীক। মহর্ষি এ জন্য পরে এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, যেমন জাগরণ হইলে স্বাপ্ন বিষয়ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ সর্ব্বত্রই তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রমজ্ঞানেরই নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ভাষ্যকার ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধি, পুরুষভিন্ন পদার্থে পুরুষবুদ্ধি, সুতরাং উহা মিথ্যা উপলব্ধি অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান। এবং স্থাণুতে স্থাণুবুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞান। ঐ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সেই পূর্ব্বজাত স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধিরূপ ভ্রমজ্ঞানেরই নিবৃত্তি হয়, কিন্তু স্থাণু ও পুরুষরূপ পদার্থসামান্য অর্থাৎ সামান্যতঃ সমস্ত স্থাণু ও সমস্ত পুরুষ পদার্থের নিবৃত্তি বা অভাব হয় না। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না। যেমন জাগরণ হইলে তখন যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তজ্জন্য স্বপ্নকালীন বিষয়ভ্রমেরই নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ঐ স্বপ্নের বিষয়-সামান্যের নিবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ তদ্দ্বারা স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না।

ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে এই সূত্রের দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত "মায়াগন্ধর্ব্বনগরমৃগতৃষ্ণিকাদ্বা" (৩২শ) এই সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তদ্রূপ অর্থাৎ স্বপ্নে বিষয়ভ্রমের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত মায়া, গন্ধর্ব্বনগর ও মরীচিকাস্থলেও যে সমস্ত ভ্রমজ্ঞান জন্মে, সেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞান স্থলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রমজ্ঞানেরই

নিবৃত্তি হয়, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সেই সমস্ত পদার্থের অভাব হয় না। অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থলে পরে তত্ত্বজ্ঞান হইলে তদ্দ্বারা বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না। তত্ত্বজ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বিরোধী, কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের বিরোধী নহে। সুতরাং উহা ভ্রমজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক হয়, বিষয়ের নিবর্ত্তক হয় না। ভ্রমজ্ঞানের ঐ সমস্ত বিষয় সেই স্থানে বিদ্যমান না থাকাতেই ঐ জ্ঞান ভ্রম। কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয় একেবারে অসৎ বা অলীক নহে। অলীক হইলে তদ্‌বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। কারণ, "অসৎখ্যাতি" স্বীকার করা যায় না। পরন্তু অলীক হইলে তদ্‌বিষয়ে যথার্থ-জ্ঞান অসম্ভব। যথার্থজ্ঞান ব্যতীতও ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সুতরাং ভ্রমজ্ঞানের বিষয়সমূহ যথার্থ জ্ঞানেরও বিষয় হওয়ায় উহা কোন মতেই অলীক হইতে পারে না। অসৎখ্যাতিবাদীর কথা পরে পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্বোক্ত "মায়াগন্ধর্ব্বনগর" ইত্যাদি সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞানকেও মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থকে যে, অসৎ বা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার পরে নিজে বিশেষ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, মায়া প্রভৃতি স্থলে যে মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রম জন্মে, তাহা উপাদানবিশিষ্ট অর্থাৎ নিমিত্তবিশেষজন্য। "উপাদান" শব্দের দ্বারা যে, এখানে নিমিত্তবিশেষই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত, ইহা তাঁহার উপসংহারে "নানিমিত্তং মিথ্যাজ্ঞানং" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। নিমিত্তবিশেষ বা সামগ্রীবিশেষ অর্থেও "উপাদান" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভাষ্যকারের যুক্তি এই যে, মায়া প্রভৃতি স্থলে যেমন নিমিত্তবিশেষজন্যই ভ্রমজ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রম হইলেও উহাও কোন নিমিত্তবিশেষজন্যই হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্র প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞান স্থলে ভ্রমজনক ঐরূপ কোন নিমিত্তবিশেষ নাই। অতএব সর্ব্বত্রই প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না।

ভাষ্যকার পরে যথাক্রমে মায়া, গন্ধর্ব্বনগর ও মরীচিকাস্থলে ভ্রমজ্ঞান যে নিমিত্তবিশেষজন্য, ইহা বুঝাইবার জন্য প্রথমে "মায়া"র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, মায়াপ্রয়োগের উপকরণবিশিষ্ট মায়িক ব্যক্তি দ্রষ্টাদিগকে যাহা দেখাইবে, তাহার সদৃশাকৃতি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া অপরের ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন করে, তাহাই মায়া। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ স্থলে মায়িক ব্যক্তি অপরের যে ভ্রম উৎপন্ন করে, ঐ ভ্রমজ্ঞানকে তিনি "মায়া" বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐন্দ্রজালিক-ভ্রম-জ্ঞানবিশেষও যে, "মায়া" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বকালে কথিত হইয়াছে, ইহা "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে মহাকবি কালিদাসের "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাও বুঝা যায়। কিন্তু ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তি অপরের ভ্রম উৎপাদন করিতে যে মন্ত্রাদির প্রয়োগ করে, উহাও যে, "মায়া" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাও পরে ভাষ্যকারের "মায়াপ্রয়োক্তুঃ" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। "মায়া" শব্দের দম্ভ, দয়া, কাপট্য প্রভৃতি আরও বহু অর্থ আছে। শত্রুজয়ের জন্য রাজার আশ্রয়ণীয় শাস্ত্রোক্ত সপ্তবিধ উপায়ের মধ্যে "মায়া" ও ইন্দ্রজাল পৃথক্‌রূপে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "মায়া" কাপট্যবিশেষ। উহাতে মন্ত্রতন্ত্রাদির আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ইন্দ্রজালে মন্ত্রতন্ত্রাদির আবশ্যকতা আছে। "বীর-

মিত্রোদয়" নিবন্ধে (রাজনীতিপ্রকাশ, ৩০৪—৬ পৃষ্ঠায়) শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা ইহা বর্ণিত হইয়াছে। "দত্তাত্রেয়তন্ত্রে" মন্ত্রবিশেষসাধ্য ইন্দ্রজালের সবিস্তর বর্ণন আছে। "ইন্দ্রজাল তন্ত্রে" ওষধিবিশেষসাধ্য ইন্দ্রজালেরও বর্ণন হইয়াছে। কপটতা অর্থেও "মায়া" শব্দের প্রয়োগ আছে। এই অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের তৃতীয় সূত্রের বৃত্তিতে বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন,—"পর-বঞ্চনেচ্ছা মায়া"। এইরূপ শম্বরাসুরের "মায়া"ও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এ জন্য মায়ার একটী নাম "শাম্বরী"। শম্বরাসুর হিরণ্যকশিপুর আদেশে প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য মায়া সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বালক প্রহ্লাদের দেহ রক্ষার্থ ভগবান্ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রকর্তৃক শম্বরাসুরের সহস্র মায়া এক একটী করিয়া খণ্ডিত হইয়াছিল, ইহা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে[১]। শ্রীমদ্-ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৫৫শ অধ্যায়েও শম্বরাসুরের মায়াশতবিজ্ঞতা এবং মায়াকে আশ্রয় করিয়া প্রদ্যুম্নের প্রতি অস্ত্র নিঃক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে[২]। তদ্দ্বারা ঐ মায়া যে শম্বরাসুরের অস্ত্রবিশেষ হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহাই বুঝা যায়। বস্তুতঃ শাস্ত্রাদিগ্রন্থে অনেক স্থলে মায়ার কার্য্যকেও মায়া বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের বচনেও শম্বরাসুরের মায়াসৃষ্ট অস্ত্রসহস্রকেই "মায়াসহস্র" বলা হইয়াছে বুঝা যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা অসুরাদির অস্ত্রবিশেষই "মায়া" শব্দের বাচ্য, ইহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। পরন্তু আসুরী মায়ার ন্যায় রাক্ষসী মায়াও "মায়া" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে মৃগরূপধারী রাক্ষস মারীচকে "মায়ামৃগ" বলা হইয়াছে[৩]। কিন্তু মারীচের মায়া ও উহার কার্য্য তাহার কোন অস্ত্রবিশেষ নহে। রামানুজের মতে মারীচের মায়া কি, তাহা "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" মাধবাচার্য্যও কিছু বলেন নাই। এইরূপ পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষও বেদাদি শাস্ত্রে "মায়া" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ সেই স্থলে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,—"অঘটনঘটন-

১। ততঃ স সসৃজে মায়াং প্রহ্লাদে শম্বরোঽসুরঃ। বিনাশমিচ্ছন্ দুর্ব্বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র সমদর্শিনি॥
তেন মায়াসহস্রং তৎ শম্বরস্যাশুগামিনা। বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশ্যেন সূদিতং॥
—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, ১৯শ অধ্যায়, ১৭।২০॥

„সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" রামানুজদর্শনে মাধবাচার্য্য "তেন মায়াসহস্রং" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রামানুজের মত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, বিচিত্র পদার্থ সৃষ্টিসমর্থ পারমার্থিক অসুরাদির অস্ত্রবিশেষই "মায়া" শব্দের বাচ্য, ইহা উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়। অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য যে অবাস্তব মায়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা "মায়া" শব্দের বাচ্য নহে। শ্রীভাষ্যেও বিষ্ণুপুরাণের ঐ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু উহার চতুর্থ পাদে "একৈকশ্যেন" এইরূপ পাঠই প্রকৃত। বঙ্গবাসী সংস্করণের বিষ্ণুপুরাণেও ঐরূপ পাঠই মুদ্রিত হইয়াছে। আধুনিক শ্রীভাষ্যাদি কোন কোন পুস্তকে "একৈকাং-শেন" এইরূপ কল্পিত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। ন্যায়সূত্রেও "একৈকশ্যেন" এইরূপ প্রয়োগ আছে। উহার অর্থাদি বিষয়ে আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে ১৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২। স চ মায়াং সমাশ্রিত্য দৈতেয়ীং ময়দর্শিতাং। মুমুচেঽস্ত্রময়ং বর্ষং কার্ষ্ণৌ বৈহায়সোঽসুরঃ॥ ১০ম।৫৫শ অঃ, ২১শ শ্লোক।

৩। মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥—১১শ স্কন্ধ, ৫ম অঃ, ৩৪শ শ্লোক।

পটীয়সী ঈশ্বরী শক্তির্মায়া"। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতে ঐ মায়া মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয়। উহাই জগতের মিথ্যা সৃষ্টির মূল। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রথম স্তবকের শেষ-শ্লোকে ন্যায়মতানুসারে বলিয়াছেন যে, জীবগণের অদৃষ্টসমষ্টিই শাস্ত্রে পরমেশ্বরের "মায়া" বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে তাঁহার সহকারি-শক্তি অর্থাৎ সহকারি-কারণ। পরমেশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়াই তদনুসারে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। ঐ অদৃষ্টসমষ্টি অতিদুর্ব্বোধ বলিয়া উহার নাম "মায়া" অর্থাৎ মায়ার সদৃশ বলিয়াই উহাকে মায়া বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" ইত্যাদি বহু শ্লোকে এবং শাস্ত্রে আরও বহু স্থলে যে, জীবগণের অদৃষ্টসমষ্টিই "মায়া" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহা বহুবিবাদগ্রস্ত। উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলির দ্বিতীয় স্তবকের শেষ শ্লোকেও বলিয়াছেন, "মায়াবশাৎ সংহরন্"। এবং পরমেশ্বর ইন্দ্রজালের ন্যায় জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করতঃ ক্রীড়া করিতেছেন, ইহাও ঐ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথানুসারে তাঁহার প্রযুক্ত "মায়া" শব্দের দ্বারা জীবগণের অদৃষ্টসমষ্টিই বুঝিতে হয়। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় শ্লোকে "মায়াবৎ সময়াদয়ঃ" এই চতুর্থ পাদে যে মায়াকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ঐন্দ্রজালিক বা বাজীকরের মায়া, ইহা তাঁহার নিজের ব্যাখ্যার দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত "মায়াগন্ধর্ব্ব" ইত্যাদি সূত্রানুসারে ভাষ্যকারও এখানে সেই মায়ারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাজীকর যে দ্রব্য দেখাইবে, তাহার সমানাকৃতি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রাদির সাহায্যে দ্রষ্টাদিগের যে ভ্রম উৎপন্ন করে, উহা যেমন মায়া, তদ্রূপ ঐ স্থলে তাহার প্রযোজ্য মন্ত্রাদিও তাহার "মায়া" বলিয়া কথিত হয়, ইহা পরে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপে "মায়া"র ব্যাখ্যা করিয়া ঐ স্থলে ভ্রমজ্ঞান যে নিমিত্তবিশেষজন্য, ইহা বুঝাইয়াছেন। মায়া প্রয়োগ-কারীর মন্ত্রাদি সাধন এবং দ্রব্যবিশেষের গ্রহণ ঐ স্থলে ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত। কারণ, উহা ব্যতীত ঐ ভ্রম উৎপন্ন করা যায় না। ভাষ্যকার পরে গন্ধর্ব্বনগর-ভ্রমও যে নিমিত্তবিশেষজন্য, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, নীহার প্রভৃতির নগররূপে সন্নিবেশ হইলেই দূর হইতে নগরবুদ্ধি জন্মে, নচেৎ ঐ নগরবুদ্ধি জন্মে না। অর্থাৎ আকাশে হিম বা মেঘ নগরাকারে সন্নিবিষ্ট হইলে দূরস্থ ব্যক্তি তাদৃশ হিমাদিকেই গন্ধর্ব্বনগর বলিয়া ভ্রম করে। ঐ স্থলে হিমাদির নগরাকারে সন্নিবেশ ও দ্রষ্টার দূরস্থতা ঐ ভ্রমের নিমিত্ত। দ্রষ্টা আকাশস্থ ঐ হিমাদির নিকটস্থ হইলে তখন তাহার ঐ ভ্রম জন্মে না। ভাষ্যকার এখানে সামান্যতঃ নগরবুদ্ধি বলিলেও গন্ধর্ব্বনগরবুদ্ধিই তাঁহার বিবক্ষিত। কোন সময়ে আকাশমণ্ডলে উত্থিত অনিষ্টসূচক নগরকে গন্ধর্ব্বনগর ও "খপুর" বলা হইয়াছে। বৃহৎ-সংহিতার ৩৬শ অধ্যায়ে উহার বিবরণ আছে। গন্ধর্ব্বদিগের নগরও গন্ধর্ব্বনগর নামে কথিত হইয়াছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ১৭শ অধ্যায়ে উহার উল্লেখ আছে। কিন্তু আকাশে ঐ গন্ধর্ব্ব-নগর বা অন্য কোন নগরই বস্তুতঃ নাই। পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তবশতঃই আকাশে গন্ধর্ব্বনগর ভ্রম হইয়া থাকে। ভট্ট কুমারিল গন্ধর্ব্বনগর ভ্রমস্থলে মেঘ ও পূর্ব্বদৃষ্ট গৃহাদিকে এবং মরীচিকায় জল-ভ্রম স্থলে পূর্ব্বানুভূত জলাদিকে নিমিত্ত বলিয়া ঐ সমস্ত বাহ্য বিষয়কেই ঐ সমস্ত ভ্রমের বিষয়

বলিয়াছেন[১]। ভাষ্যকার পরে মরীচিকায় জলভ্রমও যে নিমিত্তবিশেষজন্য, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, সূর্য্যকিরণসমূহ ভৌম উষ্মার সহিত সংসৃষ্ট হইয়া স্পন্দনবিশিষ্ট হইলে তাহাতে জলের সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষবশতঃ দূরস্থ ব্যক্তির জলভ্রম হয়। তাৎপর্য্য এই যে, মরুভূমিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে উহা সেই মরুভূমি হইতে উদ্‌গত উৎকট উষ্মার সহিত সংসৃষ্ট হইয়া চঞ্চল জলের ন্যায় স্পন্দিত হয়। ঐ সময়ে তাহাতে দূরস্থ মৃগাদির জলের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষবশতঃ সেই সূর্য্যকিরণেই জল বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু নিকটস্থ ব্যক্তির ঐ ভ্রম হয় না। সুতরাং দূরত্বও যে সেখানে ঐ ভ্রমের নিমিত্ত-বিশেষ, ইহা স্বীকার্য্য। এবং মরুভূমিতে পূর্ব্বোক্তরূপ সূর্য্যকিরণও ঐ ভ্রমের নিমিত্তবিশেষ। কারণ, ঐরূপ সূর্য্যকিরণ ব্যতীত যে কোন সূর্য্যকিরণে দূর হইতেও জলভ্রম হয় না। অতএব মায়াদি স্থলে ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান যে, নিমিত্তবিশেষজন্য, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকার শেষে সার যুক্তি প্রকাশ করিয়া ফলিতার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোন স্থানে কোন কালে কোন ব্যক্তিবিশেষেরই যখন ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান জন্মে, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সকল ব্যক্তিরই উহা জন্মে না, তখন ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান নির্নিমিত্তক নহে, ইহা স্বীকার্য্য। অর্থাৎ ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানে ঐ সমস্ত নিমিত্তবিশেষের কোন অপেক্ষা না থাকিলে সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সকল ব্যক্তিরই ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীও তাহা স্বীকার করেন না। অতএব ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানে ঐ সমস্ত নিমিত্তবিশেষের কারণত্ব স্বীকার করিতে তিনিও বাধ্য। তাহা হইলে নিমিত্তের অভাবে সর্ব্বকালে সকল ব্যক্তির ঐ সমস্ত ভ্রম জন্মে না, ইহা তিনিও বলিতে পারেন। কিন্তু ঐ সমস্ত নিমিত্তের সত্তা অস্বীকার করিয়া সর্ব্বত্র সমস্ত বিষয়ের অসত্তা বা অলীকত্ববশতঃ সকল জ্ঞানেরই ভ্রমত্ব সমর্থন করিতে গেলে সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সকল ব্যক্তিরই মায়াদিস্থলীয় সেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞান কেন জন্মে না, ইহা তিনি বলিতে পারেন না। অতএব ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান স্থলে পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত নিমিত্তের সত্তা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে মায়াদি দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক সমস্ত জ্ঞানকেই ভ্রম বলিয়া প্রমাণ ও প্রমেয়ের অসত্তা বা অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। কারণ, মায়াদি স্থলের ন্যায় সর্ব্বত্র সমস্ত ভ্রমেরই নিমিত্তবিশেষ তাঁহারও অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সমস্ত পদার্থই অসৎ বা অলীক, ইহা বলা যায় না। সুতরাং সমস্ত জ্ঞানকেই ভ্রমও বলা যায় না। অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ মত তাঁহার ঐ দৃষ্টান্তের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে শেষে তাঁহার চরমযুক্তি বলিয়াছেন যে, মায়াপ্রয়োগকারী এবং মায়ানভিজ্ঞ দর্শক ব্যক্তির বুদ্ধির ভেদ দেখাও যায়। অর্থাৎ মায়াপ্রয়োগকারী ঐন্দ্রজালিক বা বাজীকর মায়া-প্রভাবে যে সমস্ত দ্রব্য দেখাইয়া থাকে, ঐ সমস্ত দ্রব্য অসত্য বলিয়াই তাহার জ্ঞান হয়। কিন্তু মায়ানভিজ্ঞ দর্শক উহা সত্য বলিয়াই তখন বুঝে। অর্থাৎ ঐ স্থলে ঐন্দ্রজালিকের

১। গন্ধর্ব্বনগরেঽভ্রাণি পূর্ব্বদৃষ্টং গৃহাদি চ।
পূর্ব্বানুভূত-তোয়ঞ্চ রশ্মিতপ্তোষরং তথা॥
মৃগতোয়স্য বিজ্ঞানে কারণত্বেন কল্প্যতে॥—শ্লোকবার্ত্তিক, "নিরালম্বনবাদ," ১১০—১১।

নিজের দর্শন তৎকালেই বাধজ্ঞানবিশিষ্ট, দর্শকদিগের দর্শন তৎকালে বাধজ্ঞানশূন্য। সুতরাং ঐ স্থলে ঐ উভয়ের বুদ্ধি বা জ্ঞান একরূপ নহে। এইরূপ দূরস্থ ব্যক্তির আকাশে যে, গন্ধর্ব্বনগর ভ্রম হয়, এবং মরীচিকায় জলভ্রম হয়, তাহা নিকটস্থ ব্যক্তির হয় না। নিকটস্থ ব্যক্তি উহা অসত্য বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থলে দূরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির বুদ্ধি বা জ্ঞানও একরূপ নহে। কারণ, ঐ স্থলে দূরস্থ ব্যক্তির জ্ঞান হইতে নিকটস্থ ব্যক্তির জ্ঞান বিপরীত। এইরূপ সুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নরূপ যে জ্ঞান জন্মে, ঐ ব্যক্তি জাগরিত হইলে তখন তাহার স্বপ্নের বিষয়সমূহে সেইরূপ জ্ঞান থাকে না। কারণ, স্বপ্নকালে যে সকল বিষয় সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, জাগরণের পরে উহা মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয়। অতএব ঐ ব্যক্তির বিভিন্নকালীন জ্ঞান একরূপ নহে। কারণ, উহা বিপরীত জ্ঞান। ভাষ্যকার উপসংহারে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সকল পদার্থের অভাব হইলে অর্থাৎ সকল পদার্থই নিরুপাখ্য বা নিঃস্বরূপ হইলে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিভেদের উপপত্তি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যদি সকল পদার্থই অলীক হয়, কোন পদার্থেরই স্বরূপ বা সত্তা না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে কাহারই জ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞান স্বীকার করিলেও সকল ব্যক্তিরই একরূপই জ্ঞান হইবে। কারণ, যাহা অলীক, তাহা সকলের পক্ষেই অলীক। তাহা কোন কালে কোন স্থানে কোন ব্যক্তি সত্য বলিয়া বুঝিবে এবং কোন ব্যক্তি তাহা অসৎ বলিয়া বুঝিবে, ইহার কোন হেতু নাই। হেতু স্বীকার করিলে আর সকল পদার্থকেই অলীক বলা যাইবে না। হেতু স্বীকার করিয়া উহাকেও অলীক বলিলে ঐ হেতু কোন কার্য্যকারী হয় না। কারণ, যাহা গগনকুসুমবৎ অলীক, তাহা কোন কার্য্যকারী হইতে পারে না। কার্য্যকারী বলিয়া স্বীকার করিলেও সকলের পক্ষেই সমান কার্য্যকারী হইবে। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে পূর্ব্বোক্ত মায়াদি স্থলে বুদ্ধিভেদের কোনরূপেই উপপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার "সর্ব্বস্যাভাবে" এই কথা বলিয়া ঐ "অভাবে" এই পদের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,— "নিরুপাখ্যতায়াং"। পরে উহারই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"নিরাত্মকত্বে"। সকল পদার্থের অভাব অর্থাৎ নিরু খ্যতা। "নিরুপাখ্যতা" শব্দের অর্থ "নিরাত্মকত্ব" অর্থাৎ নিঃস্বরূপতা। সকল পদার্থই নিঃস্বরূপ, ইহা বলিলে সকল পদার্থই অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ অলীক, ইহাই বলা হয়। তাহা হইলে ভাষ্যকারের এই শেষ কথার দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাভাববাদীই যে, এখানে তাঁহার অভিমত পূর্ব্বপক্ষবাদী, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্ত "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" ইত্যাদি (৩১শ) পূর্ব্বপক্ষসূত্রের অবতারণায় বিজ্ঞানবাদীকেই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বার্ত্তিককারও পূর্ব্বে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক বিজ্ঞানবাদেরই খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের কথার দ্বারা তিনি যে, এখানে বিজ্ঞানবাদেরই খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ যে ভাবে বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায় না, তাঁহারা জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত জ্ঞেয় স্বীকার করেন নাই। জ্ঞানই তাঁহাদিগের মতে জ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপ। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে সকল পদার্থ নিরাত্মক বা নিঃস্বরূপ নহে। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে॥৩৫॥

সূত্র। বুদ্ধেশ্চৈবং নিমিত্তসদ্ভাবোপলম্ভাৎ ॥৩৬॥৪৪৬॥

অনুবাদ। এইরূপ বুদ্ধিরও অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় ভ্রমজ্ঞানেরও সত্তা আছে, যেহেতু (ভ্রমজ্ঞানের) নিমিত্ত ও সত্তার উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। মিথ্যাবুদ্ধেশ্চার্থবদপ্রতিষেধঃ। কস্মাৎ ? **নিমিত্তোপলম্ভাৎ সদ্ভাবোপলম্ভাচ্চ**। উপলভ্যতে হি মিথ্যাবুদ্ধিনিমিত্তং, মিথ্যাবুদ্ধিশ্চ প্রত্যাত্মমুৎপন্না গৃহ্যতে, সংবেদ্যত্বাৎ। তস্মাৎ মিথ্যাবুদ্ধিরপ্যস্তীতি।

অনুবাদ। ভ্রমজ্ঞানেরও "অর্থে"র ন্যায় অর্থাৎ উহার বিষয়ের ন্যায় প্রতিষেধ (অভাব) নাই অর্থাৎ সত্তা আছে। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) নিমিত্তের উপলব্ধিবশতঃ এবং সত্তার উপলব্ধিবশতঃ। বিশদার্থ এই যে, যেহেতু ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত উপলব্ধ হয় এবং ভ্রমজ্ঞান প্রত্যেক আত্মাতে উৎপন্ন হইয়া জ্ঞাত হয়, কারণ, (ভ্রমজ্ঞানের) "সংবেদ্যত্ব" অর্থাৎ জ্ঞেয়ত্ব আছে। অতএব ভ্রমজ্ঞানও আছে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত (৩৩।৩৪।৩৫) তিন সূত্রের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের সত্তা সমর্থন করিয়া, এখন ঐ ভ্রমজ্ঞানেরও সত্তা সমর্থন করিতে এবং তদ্দ্বারাও জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা সমর্থন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, এইরূপ অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় ভ্রমজ্ঞানেরও সত্তা আছে। ভাষ্যকার মহর্ষির বিবক্ষানুসারে এখানে সূত্রোক্ত "বুদ্ধি" শব্দের দ্বারা মিথ্যা বুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রম জ্ঞানকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং "অপ্রতিষেধঃ" এই পদের অধ্যাহার করিয়া প্রথমে মহর্ষির সাধ্য প্রকাশ করিয়াছেন। "প্রতিষেধ" বলিতে অভাব অর্থাৎ অসত্তা। সুতরাং "অপ্রতিষেধ" শব্দের দ্বারা অসত্তার বিপরীত সত্তা বুঝা যায়। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের উদ্ধৃত সূত্রের শেষে "অপ্রতিষেধঃ" এই পদের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু "ন্যায়সূচীনিবন্ধা"দি গ্রন্থে "বুদ্ধেশ্চৈবং নিমিত্তসদ্ভাবোপলম্ভাৎ" এই পর্য্যন্তই সূত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে। মহর্ষি ভ্রমজ্ঞানের সত্তা সাধনের জন্য হেতুবাক্য বলিয়াছেন "নিমিত্তসদ্ভাবোপলম্ভাৎ"। দ্বন্দ্ব সমাসের পরে প্রযুক্ত "উপলম্ভ" শব্দের "নিমিত্ত" শব্দ ও "সদ্ভাব" শব্দের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহার দ্বারা বুঝা যায়—নিমিত্তের উপলব্ধি এবং সদ্ভাবের উপলব্ধি। "সদ্ভাব" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—সতের অসাধারণ ধর্ম্ম সত্তা। ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ হেতুদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেহেতু ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্তের উপলব্ধি হয় এবং ঐ ভ্রমজ্ঞান প্রত্যেক আত্মাতে উৎপন্ন হইয়া জ্ঞাত হয়। কারণ, উহা সংবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়। তাৎপর্য্য এই যে, ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রত্যেক আত্মাই মনের দ্বারা উহা প্রত্যক্ষ করে। কারণ, ভ্রমজ্ঞানেরও মানস প্রত্যক্ষ হওয়ায় উহাও জ্ঞেয়। সর্ব্বত্র ভ্রম বলিয়া উহার বোধ না হইলেও উহার স্বরূপের প্রত্যক্ষ অবশ্যই হয়।

সুতরাং উহার সত্তার উপলব্ধি হওয়ায় উহারও অস্তিত্ব আছে। এবং উহার নিমিত্তের উপলব্ধি-প্রযুক্তও উহার সত্তা স্বীকার্য্য। কারণ, যাহার নিমিত্ত আছে, তাহা অসৎ হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সামান্য দর্শন, বিশেষের অদর্শন এবং অবিদ্যমান কোন বিশেষের আরোপ, ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত। ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিলে উহার নিমিত্তও স্বীকার করিতেই হইবে। নিমিত্ত স্বীকার করিলে জ্ঞানের বিষয় পদার্থও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ঐ সমস্ত নিমিত্তও উপলব্ধির বিষয় হয়, এবং উহা ব্যতীত ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না। অতএব যিনি ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করেন, তিনি উপলব্ধির বিষয় ঐ সমস্ত নিমিত্ত স্বীকার করিতেও বাধ্য। তাহা হইলে তিনি আর সকল বিষয়কেই অসৎ বলিতে পারেন না।

উদ্দ্যোতকর এই ভাবে সূত্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিলেও তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, শূন্যবাদী যে মাধ্যমিক ভ্রমজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া বাহ্য পদার্থের অসত্তা সমর্থনপূর্ব্বক পরে ঐ দৃষ্টান্তের দ্বারাই জ্ঞানেরও অসত্তা সমর্থন করিয়া বিচারাসহত্বই পদার্থের তত্ত্ব বলিয়া ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার ঐ মত খণ্ডনের জন্যই পরে এই সূত্রটি বলা হইয়াছে। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডনের জন্য প্রথমে মহর্ষির এই সূত্রোক্ত যুক্তিও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু নাগার্জ্জুন প্রভৃতি মাধ্যমিকের শূন্যবাদের যেরূপে ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাহ্য পদার্থ ও জ্ঞানের অত্যন্ত অসত্তাই ব্যবস্থাপিত হয় নাই। তাঁহাদিগের মতে নাস্তিতাই শূন্যতা নহে। পরে এ বিষয়ে আলোচনা করিব। আমরা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে এখানে বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত যে "আনুপলম্ভিকে"র মতে "সর্ব্বং নাস্তি" অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় কিছুরই সত্তা নাই; ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় ভ্রমজ্ঞানেরও বাস্তব সত্তা নাই, কিন্তু অসত্তাই ব্যবস্থিত, তাহারই উক্ত মত খণ্ডনের জন্য প্রথমে ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের সত্তা সমর্থন করিয়া মহর্ষি শেষে এই সূত্রের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানেরও সত্তা সমর্থন করিয়াছেন। তদ্দ্বারাও জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অবয়বীর অস্তিত্বও সুদৃঢ় হওয়ায় অবয়বিবিষয়ে অভিমানকে মহর্ষি প্রথমে যে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়াছেন, তাহার কোনরূপেই অনুপপত্তি নাই ॥৩৬॥

সূত্র। তত্ত্বপ্রধানভেদাচ্চ মিথ্যাবুদ্ধের্দ্বৈবিধ্যোপপত্তিঃ ॥৩৭॥৪৪৭॥

অনুবাদ। পরন্তু "তত্ত্ব" ও "প্রধানে"র অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান স্থলে আরোপের আশ্রয় ধর্ম্মী এবং উহাতে আরোপিত অপর পদার্থের ভেদবশতঃ ভ্রমজ্ঞানের দ্বিবিধত্বের উপপত্তি হয় (অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান ধর্ম্মী অংশে যথার্থ, এবং আরোপ্য অংশে ভ্রম। অতএব উহা ঐরূপে দ্বিবিধ)।

ভাষ্য। "তত্ত্বং" স্থাণুরিতি, "প্রধানং" পুরুষ ইতি। তত্ত্ব-প্রধানয়োরলোপাদ্‌ভেদাৎ স্থাণৌ পুরুষ ইতি মিথ্যাবুদ্ধিরুৎপদ্যতে, সামান্যগ্রহণাৎ। এবং পতাকায়াং বলাকেতি, লোষ্টে কপোত ইতি। নতু সমানে বিষয়ে মিথ্যাবুদ্ধীনাং সমাবেশঃ, সামান্যগ্রহণব্যবস্থানাৎ। যস্য তু নিরাত্মকং নিরুপাখ্যং সর্ব্বং, তস্য সমাবেশঃ প্রসজ্যতে।

গন্ধাদৌ চ প্রমেয়ে গন্ধাদিবুদ্ধয়ো মিথ্যাভিমতাস্তত্ত্বপ্রধানয়োঃ সামান্যগ্রহণস্য চাভাবাত্তত্ত্ববুদ্ধয় এব ভবন্তি। তস্মাদযুক্তমেতৎ প্রমাণ-প্রমেয়বুদ্ধয়ো মিথ্যেতি।

অনুবাদ। স্থাণু ইহা "তত্ত্ব", পুরুষ ইহা "প্রধান" (অর্থাৎ স্থাণুতে পুরুষ-বুদ্ধিস্থলে ঐ ভ্রমের ধর্ম্মী বা বিশেষ্য স্থাণু "তত্ত্ব" পদার্থ, এবং উহাতে আরোপিত পুরুষ "প্রধান" পদার্থ)। "তত্ত্ব" ও "প্রধান" পদার্থের "অলোপ" অর্থাৎ সত্তাপ্রযুক্ত ভেদবশতঃ সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষজন্য স্থাণুতে "পুরুষ", এইরূপ ভ্রমজ্ঞান জন্মে। এইরূপ পতাকায় "বলাকা" এইরূপ ভ্রমজ্ঞান জন্মে, লোষ্টে "কপোত" এইরূপ ভ্রমজ্ঞান জন্মে। কিন্তু "সমান" অর্থাৎ একই বিষয়ে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের সমাবেশ (সম্মেলন) হয় না। যেহেতু "সামান্য গ্রহণে"র অর্থাৎ সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষের ব্যবস্থা (নিয়ম) আছে। কিন্তু যাঁহার মতে সমস্তই নিরাত্মক বা নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ বা অলীক, তাঁহার মতে (একই বিষয়ে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের) সমাবেশ প্রসক্ত হয় [অর্থাৎ তাঁহার মতে স্থাণুতে পুরুষ-ভ্রমের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত বলাকাভ্রম, কপোতভ্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রমই জন্মিতে পারে। কিন্তু তাহা যখন জন্মে না, তখন ভ্রমজ্ঞান স্থলে তত্ত্বপদার্থ ও প্রধানপদার্থের সত্তা ও ভেদ স্বীকার করিয়া উহার কারণ সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষের নিয়ম স্বীকার্য্য]।

পরন্তু গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে মিথ্যা বলিয়া অভিমত গন্ধাদি জ্ঞান, "তত্ত্ব" পদার্থ ও প্রধান পদার্থের এবং সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষের অভাববশতঃ "তত্ত্ববুদ্ধি" অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানই হয়। অতএব প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক সমস্ত বুদ্ধি মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম, ইহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে সর্ব্বশেষে এই সূত্রের দ্বারা চরম কথা বলিয়াছেন যে, "তত্ত্ব" পদার্থ ও "প্রধান" পদার্থের ভেদবশতঃ ভ্রমজ্ঞানের দ্বিবিধত্বের উপপত্তি হয়। এখানে প্রথমে বুঝা আবশ্যক যে, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় পদার্থের মধ্যে একটি "তত্ত্ব" ও অপরটি "প্রধান"। যেমন স্থাণুতে পুরুষ-ভ্রম স্থলে স্থাণু "তত্ত্ব" ও পুরুষ "প্রধান"। ঐ স্থলে স্থাণু বস্তুতঃ পুরুষ নহে, কিন্তু

তত্ত্বতঃ উহা স্থাণুই, এ জন্য উহার নাম "তত্ত্ব"। এবং ঐ স্থলে ঐ স্থাণুতে পুরুষেরই আরোপ হওয়ায় ঐ আরোপের প্রধান বিষয় বলিয়া পুরুষকেই "প্রধান" বলা যায়। স্থাণুতে পুরুষের সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষজন্যই ঐ ভ্রম জন্মে, নচেৎ উহা জন্মিতে পারে না। সুতরাং ঐ স্থলে ভ্রমের উৎপাদক বিষয়ের মধ্যে পুরুষই প্রধান, ইহা স্বীকার্য্য। ফলকথা, ভ্রমজ্ঞান স্থলে যে ধর্ম্মীতে অপর পদার্থের আরোপ বা ভ্রম হয়, সেই ধর্ম্মীর নাম "তত্ত্ব" এবং সেই "আরোপ্য" পদার্থটির নাম "প্রধান"। "তত্ত্ব" ও "প্রধান" এই দুইটি যথাক্রমে ঐ উভয় পদার্থের প্রাচীন সংজ্ঞা। এখানে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। এইরূপ ভ্রমজ্ঞান ও যথার্থ জ্ঞানের মধ্যে যথার্থ জ্ঞানই প্রধান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এ জন্য ভাষ্যকার পূর্ব্বে অনেক স্থলে যথার্থ জ্ঞানকে "প্রধান" এই নামের দ্বারাও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রে তিনি মহর্ষির তাৎপর্য্যানুসারে ভ্রমজ্ঞান স্থলে আরোপ্য পদার্থকেই সূত্রোক্ত "প্রধান" শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদ্দ্বারা উহা যে, আরোপ্য পদার্থের প্রাচীন সংজ্ঞা, ইহাও বুঝা যায়। বৃত্তিকারও এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তত্ত্বং ধর্ম্মিস্বরূপং, প্রধানমারোপ্যং।" বৃত্তিকারের মতে মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা বক্তব্য এই যে, সর্ব্বসম্মত ভ্রমজ্ঞানও যখন ধর্ম্মী অংশে যথার্থ জ্ঞান, তখন তৎদৃষ্টান্তে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, জগতে যথার্থজ্ঞানই নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানও অংশবিশেষে যথার্থ বলিয়া উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এখানে সূত্রোক্ত দ্বৈবিধ্য কিরূপ এবং কিরূপেই বা উহার উপপত্তি হয়, তাহা কিছু ব্যক্ত করেন নাই। ভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধি প্রভৃতি ভ্রম প্রত্যক্ষ স্থলে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষকে নিমিত্ত বলিয়াছেন। এবং তত্ত্ব-প্রধানভেদও উহার নিমিত্ত হওয়ায় ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত দ্বিবিধ, ইহাও তাঁহার তাৎপর্য্য বুঝা যায়। মনে হয়, এই জন্যই তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, সূত্রে "মিথ্যাবুদ্ধি" শব্দের দ্বারা মিথ্যাবুদ্ধি বা ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত লক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে ভ্রমজ্ঞানের যে নিমিত্তের উপলব্ধি বলা হইয়াছে, ঐ নিমিত্ত দ্বিবিধ, ইহাই এই সূত্রে মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু মহর্ষির সূত্রপাঠের দ্বারা তাঁহার ঐরূপ তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারি না।

আমরা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি যে, জগতে যথার্থ জ্ঞানই নাই, সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, যে সমস্ত সর্ব্বসম্মত প্রসিদ্ধ ভ্রম, তাহাও তত্ত্বাংশে যথার্থ এবং প্রধানাংশেই ভ্রম, এই উভয় প্রকারই হয়। সুতরাং ঐরূপে ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের দ্বিবিধত্বের উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ স্থাণুতে "ইহা পুরুষ" এবং শুক্তিতে "ইহা রজত" এইরূপে ভ্রমজ্ঞান জন্মিলে সেখানে অগ্রবর্ত্তী স্থাণু ও শুক্তিতে স্থাণুত্ব ও শুক্তিত্ব ধর্ম্মের জ্ঞান না হইলেও তদ্গত "ইদন্ত্ব" ধর্ম্মের জ্ঞান হওয়ায় উহা ঐ অংশে যথার্থই হয়। কারণ, অগ্রবর্ত্তী সেই স্থাণু প্রভৃতি পদার্থে "ইদন্ত্ব" ধর্ম্মের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। "ইহা পুরুষ নহে", "ইহা রজত নহে" এইরূপে শেষে স্থাণুতে পুরুষের এবং শুক্তিতে রজতের বাধনিশ্চয় হইলেও "ইদন্ত্ব" ধর্ম্মের বাধনিশ্চয় হয় না। সুতরাং ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের ইদমংশের অর্থাৎ "ইদন্ত্ব" ধর্ম্মের আশ্রয় তত্ত্বাংশে উহা যে যথার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক-

সম্প্রদায়ও ঐ সমস্ত ভ্রমস্থলে ইদমংশের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন[১]। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও মহর্ষির এই সূত্রানুসারেই কোন পূর্ব্বাচার্য্য নৈয়ায়িক-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, "ধর্ম্মিণি সর্ব্বমভ্রান্তং প্রকারে চ বিপর্য্যয়ঃ।" অর্থাৎ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানই ধর্ম্মী অংশে অর্থাৎ বিশেষ্য অংশে যথার্থ, কিন্তু "প্রকার" অর্থাৎ বিশেষণ অংশেই ভ্রম। মহামনীষী শূলপাণিও "শ্রাদ্ধবিবেক" গ্রন্থে শ্রাদ্ধে দানত্ব ও যাগত্ব, এই উভয় ধর্ম্মই আছে, উহা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নহে—ইহা সমর্থন করিতে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্তরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিয়াছেন যে, যেমন নৈয়ায়িক মতে ভ্রমজ্ঞানে প্রমাত্ব ও ভ্রমত্ব উভয়ই থাকে, উহা বিরুদ্ধ নহে, তদ্রূপ শ্রাদ্ধেও যাগত্ব ও দানত্ব বিরুদ্ধ নহে। টীকাকার মহানৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার সেখানে পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন।[২] বস্তুতঃ নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে প্রমাত্ব ও ভ্রমত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নহে। একই জ্ঞানে অংশবিশেষে উহা থাকিতে পারে। ঐ ধর্ম্মদ্বয় জ্ঞানগত জাতি-বিশেষ না হওয়ায় তাঁহাদিগের মতে জাতিসঙ্করেরও কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে সমস্ত ভ্রমই যে, কোন অংশে যথার্থ জ্ঞান, ইহাও বলা যায় না। কারণ, এমন ভ্রমও হইতে পারে এবং কদাচিৎ কাহারও হইয়াও থাকে, যাহা সর্ব্বাংশেই ভ্রম। যে ভ্রমে বিশেষ্য অংশে "ইদত্ব" ধর্ম্মের অথবা বিশেষ্যগত ঐরূপ কোন ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না, কিন্তু অন্য ধর্ম্মপ্রকারেই সমস্ত বিশেষ্যের জ্ঞান হয়, সেই ভ্রমই সর্ব্বাংশে ভ্রম; উহা কোন অংশেই যথার্থ হইতে পারে না। নব্য নৈয়ায়িক-গণ ঐরূপ ভ্রমেরও উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যে সমস্ত দোষবিশেষজন্য ভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত দোষবিশেষের বৈচিত্র্যবশতঃ ভ্রমজ্ঞানও যে বিচিত্র হইবে, সুতরাং কোন স্থানে কাহারও যে সর্ব্বাংশে ভ্রমও হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই ভ্রমস্থলে কোন বিশেষ্য অংশে "ইদত্ব" প্রভৃতি কোন বাস্তব ধর্ম্মের জ্ঞান হওয়ায় সেই সমস্ত ভ্রমকেই বিশেষ্য অংশে যথার্থ বলা হইয়াছে। মহর্ষিও এই সূত্রের দ্বারা ঐ সমস্ত প্রসিদ্ধ ভ্রমকেই "মিথ্যাবুদ্ধি" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সমস্ত ভ্রমকেই এখানে গ্রহণ করেন নাই। তবে ভ্রমজ্ঞান স্থলে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বোক্ত "তত্ত্ব" ও "প্রধান" নামক পদার্থদ্বয় আবশ্যক। সুতরাং ঐ উভয়ের সত্তা স্বীকার্য্য। "তত্ত্ব" ও "প্রধান" পদার্থের সত্তা ব্যতীত ঐ উভয়ের ভেদও সমর্থন করা যায় না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "তত্ত্বপ্রধানয়োরলোপাদ্ভেদাৎ।" 'লোপ' শব্দের অর্থ অভাব বা অসত্তা। সুতরাং "অলোপ" শব্দের দ্বারা সত্তা বুঝা যায়। মহর্ষি "তত্ত্বপ্রধানভেদাচ্চ" এই বাক্যের দ্বারা ভ্রমজ্ঞান স্থলে ঐ পদার্থদ্বয়ের সত্তার আবশ্যকতা সূচনা করিয়া ইহাও সূচনা করিয়াছেন যে, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বলিয়া সমস্ত পদার্থই যে অসৎ, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, তত্ত্ব ও প্রধান পদার্থের সত্তামূলক ভেদবশতঃই ভ্রমজ্ঞান

১। ইদমংশস্য সত্যত্বং শুক্তিগং রূপ্য ঈক্ষ্যতে।—পঞ্চদশী, চিত্রদীপ—৩৪শ শ্লোক।

২। ভ্রান্তিজ্ঞানস্যৈব পরমতে প্রমাণতাঽপ্রমাণতা।—শ্রাদ্ধবিবেক। "পরমতে"—নৈয়ায়িকমতে। তন্মতে হি ইদং রজতমিতি ভ্রমে ইদমংশে প্রমাণতা, বাধিতরজতাংশেঽপ্রমাণতা যথা তদ্বৎ। "ধর্ম্মিণি সর্ব্বমভ্রান্তং প্রকারে চ বিপর্য্যয়" ইতি তৎসিদ্ধান্তাৎ।—শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃত টীকা।

পূর্ব্বোক্তরূপে দ্বিবিধ হয়। নচেৎ ঐরূপ ভ্রম জন্মিতেই পারে না। অলীক বিষয়েই ভ্রমজ্ঞান জন্মে, ইহা স্বীকার করিলে সর্ব্বত্র সর্ব্বাংশেই সমান ভ্রম স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা হইলে "ইহা পুরুষ নহে", "ইহা রজত নহে" ইত্যাদি প্রকারে বাধনিশ্চয়কালে "ইদন্ব" ধর্ম্মেরও বাধনিশ্চয় স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা সর্ব্বানুভববিরুদ্ধ। কারণ, ঐ স্থলে বাধনিশ্চয়কালে "ইহা ইহা নহে" অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী এই স্থাণুতে "ইদন্ব" ধর্ম্মও নাই, ইহা তখন কেহই বুঝে না। সুতরাং ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান যে বিশেষ্য অংশে যথার্থ, ইহা স্বীকার্য্য হইলে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব ও প্রধানের সত্তাও অবশ্য স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকার এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে মহর্ষির গূঢ় যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, স্থাণুতে পুরুষের সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষজন্য পুরুষ বলিয়া ভ্রম জন্মে। এবং দূর হইতে শ্বেতবর্ণ পতাকা দেখিলে তাহাতে "বলাকা"র সাদৃশ্য প্রত্যক্ষজন্য "বলাকা" (বকপঙ্ক্তি) বলিয়া ভ্রম জন্মে, এবং দূর হইতে শ্যামবর্ণ কপোতাকার লোষ্ট দেখিলে তাহাতে কপোতের সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষজন্য কপোত বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু একই বিষয়ে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের সমাবেশ বা সম্মেলন হয় না। অর্থাৎ স্থাণুতে পুরুষভ্রমের ন্যায় বলাকাভ্রম, কপোতভ্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রম জন্মে না। এইরূপ পতাকা প্রভৃতি কোন এক বিষয়েও পুরুষভ্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রম জন্মে না। কারণ, সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের নিয়ম আছে। অর্থাৎ যে পদার্থে যাহার সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়, সেই পদার্থেই তাহার ভ্রম জন্মে, এইরূপ নিয়ম ফলানুসারেই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং স্থাণুতে পুরুষেরই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হওয়ায় পুরুষেরই ভ্রম জন্মে। তাহাতে বলাকা প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের ভ্রম জন্মে না। কিন্তু যাঁহার মতে সমস্তই নিঃস্বরূপ অলীক, তাঁহার মতে একই পদার্থে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের সমাবেশ হইতে পারে। অর্থাৎ তাঁহার মতে একই স্থাণুতে পুরুষভ্রম, বলাকাভ্রম, কপোতভ্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রমই জন্মিতে পারে। কারণ, অলীক পদার্থে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম হইতে পারে না। ভ্রমাত্মক সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও সকল পদার্থেই সকল পদার্থের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কারণ, অলীকত্বরূপে সকল পদার্থই সমান বা সদৃশ। ফলকথা, অসৎ পদার্থে অসৎ পদার্থেরই ভ্রম ("অসৎখ্যাতি") স্বীকার করিলে সকল পদার্থেই সকল পদার্থের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু তাহা যখন হয় না, যখন স্থাণুতে পুরুষ-ভ্রমের ন্যায় বলাকা প্রভৃতির ভ্রম হয় না, তখন ভ্রমজ্ঞান স্থলে পূর্ব্বোক্ত "তত্ত্ব" পদার্থ ও "প্রধান" পদার্থের সত্তা ও ভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে যে পদার্থে যাহার সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়, সেই পদার্থে তাহারই ভ্রম হয়, এইরূপ নিয়ম বলা যায়। সুতরাং একই পদার্থে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের আপত্তি হয় না। ভাষ্যে "সমানে বিষয়ে" এই স্থলে "সমান" শব্দ এক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং তুল্যতা বা সাদৃশ্য অর্থে "সামান্য" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। "সমান" শব্দের এক এবং তুল্য, এই দ্বিবিধ অর্থই কোষে কথিত হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানে "ন তু সমানে বিষয়ে" এই স্থলে "তত্র সমানে বিষয়ে," এবং পরে "তস্য সমাবেশঃ," এই স্থলে "তস্যাসমাবেশঃ" এইরূপ পাঠ পরে কোন পুস্তকে মুদ্রিত দেখা যায়। এবং প্রাচীন মুদ্রিত অনেক পুস্তকেই "সামান্যগ্রহণা-

ব্যবস্থানাৎ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ঐ সমস্ত পাঠের মূল কি এবং অর্থসংগতি কিরূপে হইতে পারে, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। বার্ত্তিকাদি গ্রন্থে এখানে ভাষ্যসন্দর্ভের কোন তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা নাই। তৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্ত ৩৫শ সূত্রের ভাষ্যসন্দর্ভেরও কোন ব্যাখ্যা না করিয়া সেখানে লিখিয়াছেন,—"ভাষ্যং সুবোধং"।

কিন্তু বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এই প্রকরণের ব্যাখ্যা করিতে বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানবাদকেই পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও এই প্রকরণের প্রারম্ভে বিজ্ঞানবাদীকেই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়া স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এবং উদ্দ্যোতকরের ন্যায় তিনিও "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" এই প্রকরণকে "বাহ্যার্থভঙ্গনিরাকরণ-প্রকরণ" বলিয়াছেন। তদনুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও এই প্রকরণে বিজ্ঞানবাদকেই পূর্ব্ব-পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য শূন্যবাদীর ন্যায় বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ও স্বপ্ন, মায়া, গন্ধর্ব্বনগর ও মরীচিকা দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। শূন্যবাদের সমর্থক "মাধ্যমিককারিকা" এবং বিজ্ঞানবাদের সমর্থক "লঙ্কাবতারসূত্রে"ও ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখা যায়[১]। শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন[২]। সুতরাং উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এই প্রকরণে পূর্ব্বোক্ত "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" ইত্যাদি (৩১।৩২) পূর্ব্বপক্ষসূত্রদ্বয়ের দ্বারা বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞান-বাদের ব্যাখ্যা অবশ্যই করিতে পারেন। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত ৩৫শ সূত্রের ভাষ্যশেষে "তদেতৎ সর্ব্বস্যাভাবে" ইত্যাদি সন্দর্ভের ন্যায় এই প্রকরণের এই শেষ সূত্রের ভাষ্যেও "যস্য তু নিরাত্মকং" ইত্যাদি যে সন্দর্ভ বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি পূর্ব্বপ্রকরণে যে, "আনুপলম্ভিক"কে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহার মতে "সর্ব্বং নাস্তি," সেই সর্ব্বা-ভাববাদীকেই তিনি এই প্রকরণেও পূর্ব্বপক্ষবাদিরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহারই অন্যান্য যুক্তির খণ্ডন-পূর্ব্বক উক্ত মতের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ভাষ্যানুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইলে ভাষ্যকারের শেষোক্ত "যস্য তু নিরাত্মকং" ইত্যাদি সন্দর্ভেও প্রণিধান করা আবশ্যক। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে সকল পদার্থই নিরাত্মক বা অসৎ নহে। তাঁহারা অসৎখ্যাতিবাদীও নহেন, কিন্তু আত্ম-খ্যাতিবাদী। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

ফল কথা, আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাভাববাদের খণ্ডন করিতেই ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বাহ্য পদার্থের অসত্তা খণ্ডনপূর্ব্বক সত্তা সমর্থন করায় এবং পূর্ব্বে অবয়বীর

১। যথা মায়া যথা স্বপ্নো গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথোৎপাদস্তথা স্থানং তথা ভঙ্গ উদাহৃতঃ ॥—মাধ্যমিক কারিকা, ৫৭।

"যে বা পুনরন্যে মহামতে শ্রমণা ব্রাহ্মণা বা নিঃস্বভাবঘনালাতচক্রগন্ধর্ব্বনগরানুৎপাদমায়ামরীচ্যুদক" ইত্যাদি লঙ্কাবতারসূত্র, ৪৭ পৃষ্ঠা।

২। বেদান্তদর্শনের "নাভাব উপলব্ধেঃ" (২.২.২৮) এই সূত্রের শারীরকভাষ্যে "যথাহি স্বপ্ন-মায়া-মরীচ্যুদক-গন্ধর্ব্বনগরাদিপ্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেনার্থেন গ্রাহ্যগ্রাহকাকারা ভবন্তি," ইত্যাদি সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

অস্তিত্ব সমর্থন করিতে বিজ্ঞানবাদীর কথিত অবয়বীর বাধক যুক্তিরও খণ্ডন করায় বিজ্ঞানবাদেরও মূলোচ্ছেদ হইয়াছে। সুতরাং তিনি এখানে আর পৃথক্ ভাবে বিজ্ঞানবাদকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া উহার খণ্ডন করেন নাই। মনে হয়, উদ্দ্যোতকরের সময়ে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি এখানে মহর্ষি গোতমের সূত্রের দ্বারা বিজ্ঞানবাদেরই বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি এখানে ভাষ্যানুসারে ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। সুধীগণ ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভে মনোযোগ করিয়া ইহার বিচার করিবেন।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যে, গন্ধাদি-প্রমেয়-বিষয়ে, গন্ধাদি-বুদ্ধিকেও মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানই হয়, উহা কখনই ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে না। কারণ, ভ্রমজ্ঞানস্থলে "তত্ত্ব" ও "প্রধান" এই পদার্থদ্বয় থাকা আবশ্যক। কিন্তু গন্ধকে গন্ধ বলিয়া বুঝিলে সেখানে "তত্ত্ব" ও "প্রধান" এই পদার্থদ্বয় ঐ বুদ্ধির বিষয় হয় না। কারণ, ঐ স্থলে এক গন্ধকেই "তত্ত্ব" ও "প্রধান" বলা যায় না। যাহা "তত্ত্ব" পদার্থ, তাহাতে আরোপিত অপর পদার্থের নামই "প্রধান"। সুতরাং ঐ স্থলে গন্ধকে "প্রধান" বলা যায় না। পরন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে গন্ধের অসম্ভাবশতঃ উহা "তত্ত্ব" পদার্থও নহে। সুতরাং গন্ধকে গন্ধ বলিয়া বুঝিলে ঐ স্থলে "তত্ত্ব" ও "প্রধান" নামক বিভিন্ন পদার্থদ্বয় ঐ বুদ্ধির বিষয় না হওয়ায় উহা ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে না। কিন্তু উহা যথার্থ জ্ঞানই হয়। এবং গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে যে গন্ধাদি বুদ্ধি জন্মে, তাহা গন্ধাদির সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষজন্যও নহে। সুতরাং উহা ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে না। ফলকথা, স্থাণু প্রভৃতি পদার্থে পুরুষাদি পদার্থের ভ্রম স্থলে যেমন "তত্ত্ব" ও "প্রধান" পদার্থ এবং কারণরূপে সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষ থাকে, গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি-বুদ্ধিতে উহা না থাকায় ঐ সমস্ত প্রমেয় জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলা যায় না। কারণ, ভ্রমজ্ঞানের ঐ বিশেষ কারণ ঐ স্থলে নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদী ভ্রমজ্ঞান স্থলে "তত্ত্ব" ও "প্রধান" পদার্থের আবশ্যকতা স্বীকার না করিলেও ভ্রমজ্ঞানের কোন বিশেষ কারণ স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ, উহা অস্বীকার করিলে সর্ব্বত্রই সকল পদার্থের ভ্রম হইতে পারে। স্থাণুতে পুরুষ ভ্রমের ন্যায় বলাকাদি ভ্রমও হইতে পারে। কিন্তু গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি-বুদ্ধিও যে ভ্রমজ্ঞান হইবে, তাহার বিশেষ কারণ নাই। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, —"সামান্যগ্রহণস্য চাভাবাৎ।" ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত স্থাণু প্রভৃতিতে পুরুষাদি ভ্রম স্থলে সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষবিশেষ কারণ অর্থাৎ ভ্রমজনক "দোষ"। গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি বুদ্ধি স্থলে ঐ দোষ নাই, অন্য কোন দোষও নাই, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভাষ্য-কারোক্ত "সামান্যগ্রহণ" শব্দটি ভ্রমজনক-দোষমাত্রের উপলক্ষণ। কারণ, সর্ব্বত্রই যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ ভ্রমের বিশেষ কারণ বা ভ্রমজনক দোষ, ইহা বলা যায় না। সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ ব্যতীতও অন্যান্য অনেকরূপ দোষবশতঃও অনেকরূপ ভ্রম জন্মে। পিত্তদোষজন্য পাণ্ডুর-বর্ণ শঙ্খে পীত-বুদ্ধি, দূরত্ব-দোষজন্য চন্দ্র সূর্য্যে স্বল্প-পরিমাণ-বুদ্ধি প্রভৃতি বহু ভ্রম আছে, যাহা সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষজন্য নহে। জ্ঞানের সাধারণ কারণ সত্ত্বে যে অতিরিক্ত কারণবিশেষজন্য ভ্রম জন্মে, তাহাকেই "দোষ" বলা হইয়াছে। ঐ দোষ নানাবিধ। "পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ।"—(ভাষা-

পরিচ্ছেদ)। সুতরাং দোষবিশেষজন্য ভ্রমও নানাবিধ। কিন্তু গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি জ্ঞানও যে, কোন দোষবিশেষজন্য, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদী সর্ব্বত্র অনাদি বিচিত্র সংস্কারকেই ভ্রমজনক দোষ বলিলে ঐ সংস্কার ও উহার কারণের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যাহা অসৎ বা অলীক, তাহা কোন কার্য্যকারী হয় না। কার্য্যকারী হইলে তাহাকে সৎ পদার্থই বলিতে হইবে। তাহা হইলে সকল পদার্থই অসৎ, ইহা বলা যাইবে না। কোন সৎ পদার্থ স্বীকার করিলেও উহার জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞানই বলিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, ইহাও বলা যাইবে না। পরন্ত যেখানে পরে কোন প্রমাণের দ্বারা বাধনিশ্চয় হয়, সেই স্থলেই পূর্ব্বজাত জ্ঞানের ভ্রমত্ব নিশ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি-বুদ্ধির পরে কোন প্রমাণের দ্বারাই "ইহা গন্ধাদি নহে" এইরূপ বাধনিশ্চয় হয় না। ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমাত্মক বা ইচ্ছাপ্রযুক্ত বাধনিশ্চয়ের দ্বারা সার্ব্বজনীন ঐ সমস্ত প্রমেয়জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। পরন্ত যথার্থ জ্ঞান একেবারে না থাকিলে ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না এবং তাহার ভ্রম-সংজ্ঞা ও ভ্রমত্বনিশ্চয়ও হইতে পারে না। ভাষ্যকার উপসংহারে তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতএব প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক সমস্ত বুদ্ধিই যে ভ্রম, ইহা অযুক্ত। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "স্বপ্নবিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণপ্রমেয়াভিমানঃ" এই সূত্রের দ্বারা যে পূর্ব্বপক্ষ কথিত হইয়াছে, তাহা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না; উহা যুক্তিহীন, সুতরাং অযুক্ত।

উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বিজ্ঞানবাদীর মতানুসারে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন স্বপ্নাবস্থায় যে সকল বিষয়ের জ্ঞান হয়, উহা "চিত্ত" হইতে অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থায় উপলব্ধ বিষয়সমূহও জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞেয়ের সত্তা নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবাদীর মতে প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞান যে ভ্রম, এ বিষয়ে জ্ঞানত্বই হেতু, স্বপ্নজ্ঞান দৃষ্টান্ত। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত "হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ" এই সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টান্ত ও তন্মূলক উক্ত মতের খণ্ডনপূর্ব্বক শেষে বিশেষ বিচারের জন্য বিজ্ঞানবাদীর স্বপক্ষ-সাধক অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন যে,[১] বিষয়সমূহ চিত্ত হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, যেহেতু উহা গ্রাহ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়—যেমন বেদনাদি। "বেদনা" শব্দের অর্থ সুখ ও দুঃখ। "চিত্ত" শব্দের অর্থ বিজ্ঞান[২]। যেমন সুখ দুঃখাদি জ্ঞেয় পদার্থ বিজ্ঞান হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, তদ্রূপ অন্যান্য বিষয়সমূহও জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। বিজ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞেয়ের সত্তা নাই। উক্ত অনুমানের খণ্ডন করিতে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সুখ ও দুঃখ হইতে জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। কারণ, সুখ

১। ন চিত্তব্যতিরেকিণো বিষয়া গ্রাহ্যত্বাদ্বেদনাদিবদিতি। যথা বেদনাদি গ্রাহ্যং ন চিত্তব্যতিরিক্তং, তথা বিষয়া অপি। বেদনা সুখদুঃখে। চিত্তং বিজ্ঞানমিতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

২। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে বিজ্ঞানেরই অপর নাম চিত্ত। চিত্ত, মন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি, এই চারিটী পর্য্যায় শব্দ অর্থাৎ সমানার্থক। "বিংশতিকাকারিকা"র বৃত্তির প্রারম্ভে বসুবন্ধু লিখিয়াছেন,—"চিত্তং মনো বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিশ্চেতি পর্য্যায়াঃ"।

ও দুঃখ গ্রাহ্য পদার্থ, জ্ঞান উহার গ্রহণ। সুতরাং গ্রাহ্যগ্রহণভাববশতঃ সুখ দুঃখ এবং উহার জ্ঞান অভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না। গ্রাহ্য ও গ্রহণ যে অভিন্ন পদার্থ, ইহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। কারণ, কর্ম্ম ও ক্রিয়া একই পদার্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের যে গ্রহণরূপ ক্রিয়া, উহার কর্ম্মকারক সুখ ও দুঃখ, এ জন্য উহাকে গ্রাহ্য বলা হয়। কিন্তু কোন ক্রিয়া ও উহার কর্ম্মকারক অভিন্ন পদার্থ হয় না। কুত্রাপি ইহার সর্ব্বসম্মত দৃষ্টান্ত নাই। পরন্তু চতুঃস্কন্ধ বা পঞ্চস্কন্ধাদি বাদ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বিজ্ঞানকেই সৎ বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ বিজ্ঞানের ভেদ কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা জিজ্ঞাস্য। কারণ, বিজ্ঞান মাত্রই পদার্থ হইলে অর্থাৎ বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বাহ্য ও আধ্যাত্মিক আর কোন পদার্থের সত্তা না থাকিলে বিজ্ঞানভেদের বাহ্য ও আধ্যাত্মিক কোন হেতু না থাকায় বিজ্ঞানভেদ কিরূপে হইবে? যদি বল, স্বপ্নের ভেদের ন্যায় ভাবনার ভেদ বশতঃই বিজ্ঞানের ভেদ হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবনার বিষয় ভাব্য পদার্থ ও উহার ভাবক পদার্থের ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ভাব্য ও ভাবক অভিন্ন পদার্থ হয় না। পরন্তু স্বপ্নাদি জ্ঞানের ন্যায় সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম বলিলে প্রধানজ্ঞান অর্থাৎ উহার বিপরীত যথার্থ জ্ঞান স্বীকার্য্য। কারণ, যে বিষয়ে প্রধান জ্ঞান একেবারেই অলীক, তদ্বিষয়ে ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে না। ঐরূপ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না। উহার সর্ব্বসম্মত কোন দৃষ্টান্ত নাই। পরন্তু যিনি "চিত্ত" অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সত্তা মানেন না, তাঁহার স্বপক্ষসাধন ও পরপক্ষ খণ্ডনও সম্ভব নহে। কারণ, তিনি তাঁহার চিত্তের দ্বারা অপরকে কিছু বুঝাইতে পারেন না। তাঁহার "চিত্ত" অর্থাৎ সেই জ্ঞানবিশেষ অপরে বুঝিতে পারে না—যেমন অপরের স্বপ্ন সেই ব্যক্তি না বলিলে অপরে জানিতে পারে না। যদি বল, স্বপক্ষসাধন ও পরপক্ষ খণ্ডনকালে যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই সমস্ত শব্দাকার চিত্তের দ্বারাই অপরকে বুঝান হয়। শব্দাকার চিত্ত অপরের অজ্ঞেয় নহে। কিন্তু তাহা বলিলে "শব্দাকার চিত্ত" এই বাক্যে "আকার" পদার্থ কি, তাহা বক্তব্য। কোন প্রধান বস্তু অর্থাৎ সত্য পদার্থের সাদৃশ্য-বশতঃ তদ্ভিন্ন পদার্থে তাহার যে জ্ঞান, উহাই আকার বলা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর মতে শব্দ নামক বাহ্য বিষয়ের সত্তা না থাকায় তিনি "শব্দাকার চিত্ত" এই কথা বলিতে পারেন না। শব্দ সত্য পদার্থ হইলে এবং কোন বিজ্ঞানে উহার সাদৃশ্য থাকিলে তৎপ্রযুক্ত ঐ বিজ্ঞানবিশেষকে "শব্দাকার চিত্ত" বলা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী তাহা বলিতে পারেন না। পরন্তু বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সত্তাই না থাকিলে স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থার ভেদ হইতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞানবাদীর মতে যেমন স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ের সত্তা নাই, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থাতেও বিষয়ের সত্তা নাই। সুতরাং ইহা স্বপ্নাবস্থা ও ইহা জাগ্রদবস্থা, ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে ও বলা যাইবে? উহা বুঝিবার কোন হেতু নাই। ঐ অবস্থাদ্বয়ের বৈলক্ষণ্যপ্রতিপাদক কোন হেতু বলিতে গেলেই বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে।

উদ্দ্যোতকর পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থার কোন ভেদ না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থাও থাকে না। যেমন স্বপ্নাবস্থায় অগম্যাগমনে অধর্ম্ম জন্মে না, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থায় অগম্যা-গমনে অধর্ম্মের উৎপত্তি না হউক? কারণ, জাগ্রদবস্থাও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় বিষয়শূন্য। বিজ্ঞান-

বাদীর মতে তখনও ত বস্তুতঃ অগম্যাগমন বলিয়া কোন বাহ্য পদার্থ নাই। যদি বল, স্বপ্নাবস্থায় নিদ্রার উপঘাত এবং জাগ্রদবস্থায় নিদ্রার অনুপঘাতপ্রযুক্ত ঐ অবস্থাদ্বয়ের ভেদ আছে এবং ঐ অবস্থাদ্বয়ে জ্ঞানের অস্পষ্টতা ও স্পষ্টতাবশতঃও উহার ভেদ বুঝা যায়। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, নিদ্রোপঘাত যে, চিত্তের বিকৃতির হেতু, ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে? এবং জ্ঞানের বিষয় ব্যতীত উহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে, ইহা বলা আবশ্যক। যদি বল, বিষয় না থাকিলেও ত বিজ্ঞানের ভেদ দেখা যায়। যেমন তুল্য কর্ম্ম-বিপাকে উৎপন্ন প্রেতগণ পূয়পূর্ণ নদী দর্শন করে। কিন্তু সেখানে বস্তুতঃ নদীও নাই, পূয়ও নাই। এইরূপ কোন কোন প্রেত সেই স্থলে সেই নদীকেই জলপূর্ণ দর্শন করে। কোন কোন প্রেত তাহাকেই রুধিরপূর্ণ দর্শন করে। অতএব বুঝা যায় যে, বাহ্য পদার্থ না থাকিলেও বিজ্ঞানই ঐরূপ বিভিন্নাকার হইয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানের ভেদে বাহ্য পদার্থের সত্তা অনাবশ্যক। উদ্দ্যোতকর উক্ত কথার উত্তরে বলিয়াছেন যে, বাহ্য পদার্থ অলীক হইলে পূর্ব্বোক্ত কথাও বলাই যায় না। কারণ, বিজ্ঞানই সেইরূপ উপপন্ন হয়, ইহা বলিলে "সেইরূপ" কি? এবং কেনই বা "সেইরূপ"? ইহা জিজ্ঞাস্য। যদি বল, রুধিরপূর্ণ নদী দর্শনকালে রুধিরাকারে বিজ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে ঐ রুধির কি? তাহা বক্তব্য এবং জলাকার ও নদ্যাকার বিজ্ঞান জন্মে, ইহা বলিলে ঐ জল ও নদী কি? তাহা বক্তব্য। রুধিরাদি বাহ্য বিষয়ের একেবারেই সত্তা না থাকিলে রুধিরাকার ও জলাকার ইত্যাদি বাক্যই বলা যায় না। পরন্তু তাহা হইলে দেশাদি নিয়মও থাকে না। অর্থাৎ প্রেতগণ কোন স্থান-বিশেষেই পূয়পূর্ণ নদী দর্শন করে, স্থানান্তরে দর্শন করে না, এইরূপ নিয়মের কোন হেতু না থাকায় ঐরূপ নিয়ম হইতে পারে না। কারণ, সর্ব্বস্থানেই পূয়পূর্ণ নদী দর্শন অর্থাৎ তদাকার বিজ্ঞান জন্মিতে পারে। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু "বিংশতিকাকারিকা"র প্রথমে নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া দ্বিতীয় কারিকায়[১] দ্বারা নিজেই উক্ত সিদ্ধান্তে অন্য সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক "দেশাদিনিয়মঃ সিদ্ধঃ" ইত্যাদি তৃতীয় কারিকার দ্বারা উহার যে উত্তর দিয়াছেন, উদ্দ্যোতকর এখানে উহাই খণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ সমস্ত কথা বলিয়াছেন এবং পরে "কর্ম্মণো বাসনান্যত্র" ইত্যাদি সপ্তম কারিকার পূর্ব্বার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া উহারও খণ্ডন করিয়াছেন। বসুবন্ধুর উক্ত কারিকাদ্বয় পূর্ব্বে (১০৩ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর বসুবন্ধুর সপ্তম কারি-কার অন্য ভাবে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, আমরা কর্ম্ম ও উহার ফলের বিভিন্না-শ্রয়তা স্বীকার করি না। কারণ, আমাদিগের মতে যে আত্মা কর্ম্মকর্ত্তা, তাহাতেই উহার ফল জন্মে।

১। বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবৈতদসদর্থাবভাসনাৎ।
যথা তৈমিরিকস্যাসৎকেশচন্দ্রাদিদর্শনং ॥১॥
অনর্থা যদি বিজ্ঞপ্তির্নিয়মো দেশকালয়োঃ।
সন্তানস্য চ সঙ্ক্রা ন যুক্তা কৃতক্রিয়া নচ ॥২॥ বিংশতিকাকারিকা।

মুদ্রিত পুস্তকে দ্বিতীয় কারিকার প্রথম ও তৃতীয় পাদে "যদি বিজ্ঞপ্তিরনর্থা" এবং "সন্তানস্যানিয়মশ্চ" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু ইহা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আমাদিগের শাস্ত্রে যে কর্ম্মবিশেষের পুত্রাদি বিষয়রূপ ফলের উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত বিষয় সৎ, এবং তজ্জন্য প্রীতিবিশেষই ঐ সমস্ত কর্ম্মের মুখ্য ফল। উহা কর্ম্মকর্ত্তা আত্মাতেই জন্মে। পূর্ব্বে ফলপরীক্ষায় মহর্ষি নিজেই ঐরূপ সমাধান করিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ২৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উদ্দ্যোতকর পরে এখানে চিত্ত বা জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় বিষয়সমূহ যে ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে অনুমান-প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন[১] এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের দশম সূত্রের বার্ত্তিকে পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবাদের অনুপপত্তি সমর্থন করিতে আরও অনেক বিচার করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়েও অনেক স্থলে বিচারপূর্ব্বক অনেক বৌদ্ধমতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তিনি যে, তৎকালে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরক্ষক মহাপ্রভাবশালী আচার্য্য ছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি যে বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি কুতার্কিকগণের অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য 'ন্যায়বার্ত্তিক' রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ঐ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের দ্বারা ও ঐ স্থলে বাচস্পতি মিশ্রের উক্তির দ্বারা বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকরের সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু মনীষী তাঁহার "ন্যায়বার্ত্তিকে"র টীকা করিয়া এবং নানা স্থানে বিচার করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্ব্বক তৎকালীন বৌদ্ধসম্প্রদায়কে দুর্ব্বল করিয়াছিলেন। তাই পরবর্ত্তী ধর্ম্মকীর্ত্তি, শান্তরক্ষিত ও কমলশীল প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণ উদ্দ্যোতকরের যুক্তির প্রতিবাদ করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। কমলশীল "তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা"য় বহু স্থানে উদ্দ্যোতকরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াও উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কালবশে উদ্দ্যোতকরের সম্প্রদায় বিলুপ্ত হওয়ায় তখন উদ্দ্যোতকরের "ন্যায়বার্ত্তিকে"র তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ও তাঁহার মত-সমর্থন সর্ব্বত্র হয় নাই। অনেক পরে শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র ত্রিলোচন গুরুর নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া উদ্দ্যোতকরের "ন্যায়বার্ত্তিকে"র উদ্ধার করেন (প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা" প্রণয়ন করিয়া উদ্দ্যোতকরের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার মতের সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যবার্ত্তিক-ব্যাখ্যায় বিচারপূর্ব্বক বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়া, তাঁহার "তত্ত্বসমীক্ষা" নামক গ্রন্থে যে পূর্ব্বে তিনি উক্ত বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন, ইহা শেষে লিখিয়াছেন এবং এখানেও বিজ্ঞানবাদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া তাঁহার "ন্যায়কণিকা" নামক গ্রন্থে পূর্ব্বে তিনি বিস্তৃত বিচার দ্বারা উক্ত যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও শেষে লিখিয়াছেন। তিনি যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যের টীকাতেও (কৈবল্যপাদ, ১৪—২০) বিচারপূর্ব্বক বিজ্ঞানবাদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া, তাঁহার "ন্যায়কণিকা" গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে বিস্তৃত বিচার অনুসরণীয়, ইহা লিখিয়াছেন। সর্ব্বশেষে তাঁহার ভামতী টীকাতেও তিনি পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবাদের বিশদ বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। ফলকথা, উদ্দ্যোতকরের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রের নানা গ্রন্থে ঐ সমস্ত বিচার বুঝিতে হইবে। এখানে ঐ সমস্ত বিচারের সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নহে। তবে সংক্ষেপে সার মর্ম্ম প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক।

১। মদীয়াচ্চিত্তাদর্থান্তরং বিষয়াঃ সামান্যবিশেষবত্ত্বাৎ, সন্তানান্তরচিত্তবৎ। প্রমাণগম্যত্বাৎ কার্য্যত্বাদনিত্যত্বাৎ, ধর্ম্মপূর্ব্বকত্বাচ্চেতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মূল সিদ্ধান্ত এই যে, ক্রিয়া ও কারকের কোন ভেদ নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন,—"ভূতির্যেষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে"। অর্থাৎ যাহা উৎপত্তি, তাহাই ক্রিয়া এবং তাহাই কারক। যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যেও উক্ত সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে[১]। তাঁহাদিগের মতে বিজ্ঞানের প্রকাশক অন্য কোন পদার্থও নাই। কারণ, প্রকাশ্য, প্রকাশক ও প্রকাশ ক্রিয়া অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং বিজ্ঞান ভিন্ন বুদ্ধির দ্বারা অনুভাব্য বা বোধ্য অন্য পদার্থও নাই। এবং সেই বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের যে অপর অনুভব, যদ্দ্বারা উহা প্রকাশিত হইতে পারে—তাহাও নাই। গ্রাহ্য ও গ্রাহকের অর্থাৎ প্রকাশ্য ও প্রকাশকের পৃথক্ সত্তা না থাকায় ঐ বুদ্ধি স্বয়ংই প্রকাশিত হয়, উহা স্বতঃপ্রকাশ[২]। উক্ত সিদ্ধান্তের উপরেই বিজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা স্বীকার না করিলে বিজ্ঞানবাদ স্থাপনই করা যায় না। তাই উদ্দ্যোতকর প্রথমে উহাই অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন,—"নহি কর্ম্ম চ ক্রিয়া চ একং ভবতীতি।" অর্থাৎ কর্ম্ম ও ক্রিয়া একই পদার্থ হয় না। সুতরাং গ্রহণ ক্রিয়া ও উহার কর্ম্মকারক গ্রাহ্য বিষয় অভিন্ন পদার্থ হইতেই পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া এখানে পরে ইহাও লিখিয়াছেন যে, উদ্দ্যোতকরের ঐ কথার দ্বারা "সহোপলম্ভনিয়মাৎ" ইত্যাদি[৩] কারিকায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদ সাধনে যে হেতু কথিত হইয়াছে, তাহাও পরাস্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, কর্ম্ম ও ক্রিয়া যখন একই পদার্থ হইতেই পারে না, তখন বিজ্ঞান ও উহার কর্ম্মকারক জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ স্বীকার্য্য হওয়ায় বিজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধিকে ভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং "সহোপলম্ভ" বলিতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের এক বা অভিন্ন উপলব্ধিই বিবক্ষিত হইলে ঐ হেতুই অসিদ্ধ। আর যদি জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত জ্ঞানের উপলব্ধিই "সহোপলম্ভ" এই যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হয়। সুতরাং উক্ত হেতুর দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর উক্ত হেতুর কোন উল্লেখ করেন নাই। শারীরকভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য ঐ হেতুরও উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "ন্যায়কণিকা", যোগদর্শন-ভাষ্যের টীকা ও "ভামতী" প্রভৃতি গ্রন্থে "সহোপলম্ভনিয়মাৎ" ইত্যাদি বৌদ্ধকারিকা উদ্ধৃত করিয়া বিশদ বিচারপূর্ব্বক উক্ত হেতুর খণ্ডন করিয়াছেন। 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে' মাধবাচার্য্য এবং আরও অনেক গ্রন্থকার বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত কারিকাটী কাহার রচিত, ইহা তাঁহারা কেহই বলেন নাই।

১। ক্ষণিকবাদিনো যদ্ভবনং, সৈব ক্রিয়া, তদেব চ কারকমিত্যভ্যুপগমঃ।—যোগদর্শনভাষ্য।৪।২০।

২। নান্যোঽনুভাব্যো বুদ্ধ্যাঽস্তি তস্যা নানুভবোঽপরঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে॥

৩। সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে॥

পূর্ব্বোক্ত "সহোপলম্ভনিয়মাৎ" ইত্যাদি কারিকার দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, নীল জ্ঞান স্থলে নীল ও তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহার ভেদ নাই। নীলাকার জ্ঞানবিশেষই নীল। এইরূপ সর্ব্বত্রই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা সমস্তই সেই জ্ঞানেরই আকারবিশেষ। জ্ঞান হইতে বিষয়ের পৃথক্ সত্তা নাই। জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞেয় অসৎ। ইহার হেতু বলা হইয়াছে,— "সহোপলম্ভনিয়মাৎ।" এখানে "সহ" শব্দের অর্থ কি, ইহাই প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে। জ্ঞানের সহিতই জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়, জ্ঞানের উপলব্ধি ব্যতিরেকে জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, ইহাই উক্ত হেতুর অর্থ হইলে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হয়। কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ না থাকিলে 'সহ' শব্দার্থ সাহিত্যের উপপত্তি হয় না। ভিন্ন পদার্থেই সাহিত্য সম্ভব হয় ও বলা যায়। সুতরাং ঐ হেতু জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদেরই সাধক হওয়ায় উহা বিরুদ্ধ। বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্য ভদন্ত শুভগুপ্ত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যানুসারে উক্ত হেতুকে বিরুদ্ধ বলিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও তাৎপর্য্যটীকায় পূর্ব্বোক্ত যথাশ্রুত অর্থে উক্ত দোষই বলিয়াছেন। কিন্তু "তত্ত্বসংগ্রহে" শান্তরক্ষিত "সহ" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া যে ভাবে পূর্ব্বোক্ত হেতু প্রকাশ করিয়াছেন[১], তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহাদিগের মতে নীল জ্ঞানের উপলব্ধি ও নীলোপলব্ধি একই পদার্থ। ঐ একোপলব্ধিই "সহোপলম্ভ"। সর্ব্বত্রই জ্ঞানের উপলব্ধিই বিষয়ের উপলব্ধি। জ্ঞানের উপলব্ধি ভিন্ন বিষয়ের পৃথক্ উপলব্ধি নাই, ইহাই "সহোপলম্ভনিয়ম।" উহার দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে ভেদ নাই, ইহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ যেমন একই চন্দ্রকে দ্বিচন্দ্র বলিয়া দর্শন করে, অর্থাৎ ঐ স্থলে যেমন চন্দ্র এক হইলেও তাহাতে ভেদ দর্শন হয়, তদ্রূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ না থাকিলেও ভেদ দর্শন হয়। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত "সহোপলম্ভনিয়ম" শব্দে "সহ" শব্দের অর্থ এক বা অভিন্ন—উহার অর্থ সাহিত্য নহে। "তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা"য় কমলশীল ভদন্ত শুভগুপ্তের কথিত সমস্ত দোষের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিতে শেষে পূর্ব্বোক্ত "সহোপলম্ভে"র উক্তরূপ ব্যাখ্যা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন[২]। এবং তৎপূর্ব্বে তিনি শান্তরক্ষিতের "যৎসংবেদনমেব স্যাদ্‌যস্য সংবেদনং ধ্রুবং"—এই বাক্যোক্ত হেতুরও পূর্ব্বোক্তরূপই ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,— "ঈদৃশ এবাচার্য্যীয়ে 'সহোপলম্ভনিয়মা'দিত্যাদৌ প্রয়োগে হেত্বর্থোঽভিপ্রেতঃ।" এখানে "আচার্য্য" শব্দের দ্বারা কোন্ আচার্য্য তাঁহার বুদ্ধিস্থ, তিনি তাহা ব্যক্ত করেন নাই। বহু বিজ্ঞ কোন পণ্ডিত বলেন যে, আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি "প্রমাণবিনিশ্চয়" নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তিব্বতীয় ভাষায় উহার

১। যৎসংবেদনমেব স্যাদ্‌যস্য সংবেদনং ধ্রুবং। তস্মাদব্যতিরিক্তং তৎ ততো বা ন বিভিদ্যতে॥
যথা নীলধিয়ঃ স্বাত্মা দ্বিতীয়ো বা যথোড়ুপঃ। নীলধীবেদনঞ্চেদং নীলাকারস্য বেদনাৎ॥
—"তত্ত্বসংগ্রহ", ৫৬৭ পৃষ্ঠা।

২। ন হ্যত্রৈকেনৈবোপলম্ভ একোপলম্ভ ইত্যয়মর্থোঽভিপ্রেতঃ। কিং তর্হি? জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ পরস্পরমেক এবোপলম্ভো ন পৃথগিতি। স এবহি জ্ঞানোপলম্ভঃ স এব জ্ঞেয়স্য, য এব জ্ঞেয়স্য স এব জ্ঞানস্যেতি যাবৎ।—তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ৫৬৮ পৃষ্ঠা।

অনুবাদ আছে। তদ্দ্বারা এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে "সহোপলম্ভনিয়মাৎ" ইত্যাদি এবং "নান্যো-হনুভাব্যো বুদ্ধ্যাহস্তি" ইত্যাদি এবং "অবিভাগোহপি বুদ্ধ্যাত্মা" ইত্যাদি কারিকা ধর্ম্মকীর্ত্তিরই রচিত, ইহা বুঝা গিয়াছে।

আমরা কিন্তু "তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা"য় বৌদ্ধাচার্য্য কমলশীলের উক্তির দ্বারাও ইহা বুঝিতে পারি। কারণ, কমলশীল প্রথমে "সহোপলম্ভনিয়মাৎ" এই হেতুবাক্যে তাঁহার ব্যাখ্যাত হেত্বর্থ ই আচার্য্যের অভিপ্রেত বলিয়া, পরে উহাতে অন্যের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার গ্রন্থে ঐ স্থলে জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধির ভেদ সমর্থনপূর্ব্বক উক্ত সিদ্ধান্তে পূর্ব্ব-পক্ষ প্রকাশ করায় তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত হেতুবাক্যে "সহ" শব্দের দ্বারা এককাল অর্থ ই তাঁহার বিবক্ষিত—অভেদ অর্থ নহে। অর্থাৎ একই সময়ে জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধিই তাঁহার অভিমত "সহোপলম্ভ"; নচেৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের কাল-ভেদ সমর্থন করিয়া তিনি ঐ স্থলে পূর্ব্ব-পক্ষ সমর্থন করিবেন কেন? জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের এককালই "সহোপলম্ভ" শব্দের দ্বারা তাঁহার বিবক্ষিত না হইলে ঐ স্থলে ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবকাশই থাকে না। কমলশীল এই আশঙ্কার সমাধান করিতে বলিয়াছেন যে, কালভেদ বস্তুভেদের ব্যাপ্য। অর্থাৎ কালভেদ থাকিলেই বস্তুভেদ থাকে। সুতরাং ধর্ম্মকীর্ত্তি যে জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভিন্ন উপলব্ধিকেই "সহোপলম্ভ" বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধির কালভেদ হইলে সম্ভব হয় না। কারণ, বিভিন্ন-কালীন উপলব্ধি অবশ্যই বিভিন্নই হইবে, উহা এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। ধর্ম্মকীর্ত্তি উক্ত-রূপ তাৎপর্য্যেই ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, উহার খণ্ডন দ্বারা তাঁহার কথিত হেতু "সহোপলম্ভে"র অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভিন্ন উপলব্ধিরই সমর্থন করিয়াছেন। কমলশীল এইরূপে ধর্ম্মকীর্ত্তির উক্তিবিশেষের সহিত তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার বিরোধ ভঞ্জন করায় উক্ত কারিকা ধর্ম্মকীর্ত্তিরই রচিত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। সুতরাং কমলশীল পূর্ব্বে "ঈদৃশ এবাচার্য্যীয়ে 'সহোপলম্ভনিয়মা'দিত্যাদৌ প্রয়োগে হেত্বর্থোহভিপ্রেতঃ" এই বাক্যে "আচার্য্য" শব্দের দ্বারা ধর্ম্মকীর্ত্তিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। নচেৎ পরে তাঁহার "ননু চাচার্য্যধর্ম্ম-কীর্ত্তিনা" ইত্যাদি[১] সন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। সুধীগণ এখানে কমলশীলের উক্ত সন্দর্ভে প্রণিধান করিবেন। পরন্তু এই প্রসঙ্গে এখানে ইহা বক্তব্য যে, "সহোপলম্ভনিয়মাৎ" ইত্যাদি কারিকা ধর্ম্মকীর্ত্তিরই রচিত হইলে উদ্দ্যোতকর যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, উদ্দ্যোতকর ঐ কারিকা বা উহার দ্বারা কথিত ঐ হেতুর উল্লেখপূর্ব্বক কোন বিচারই করেন নাই। কিন্তু বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনে উক্ত হেতুর বিচারপূর্ব্বক খণ্ডনও নিতান্ত কর্ত্তব্য।

১। ননু চাচার্য্যধর্ম্মকীর্ত্তিনা "বিষয়স্য জ্ঞানহেতুতয়োপলব্ধিঃ প্রাগুপলম্ভঃ পশ্চাৎ সংবেদনস্যেতি চে"দিত্যেবং পূর্ব্ব-পক্ষমাদর্শয়তা এককালার্থঃ সহশব্দোহত্র দর্শিতো ন ত্বভেদার্থঃ—এককালেহি বিবক্ষিতে কালভেদোপদর্শনং পরন্ত যুক্তং ন ত্বভেদে সতীতি চেন্ন, কালভেদস্য বস্তুভেদেন ব্যাপ্তত্বাৎ কালভেদোপদর্শনমুপলম্ভে নানাত্বপ্রতিপাদনার্থমেব সুতরাং যুক্তং, ব্যাপ্যস্য ব্যাপকাব্যভিচারাৎ।—তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ৫৬৮ পৃষ্ঠা।

শঙ্করাচার্য্য ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি তাহা করিলেও উদ্দ্যোতকর কেন তাহা করেন নাই, ইহা অবশ্য চিন্তনীয়। উদ্দ্যোতকর বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগের কারিকা ও মতের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে, ধর্ম্মকীর্ত্তির কোন উক্তির উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং উদ্দ্যোতকর ও ধর্ম্মকীর্ত্তি সমসাময়িক, তাঁহারা উভয়েই উভয়ের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, এই মতে আমাদিগের বিশ্বাস নাই। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (৩৮।৩৯ পৃষ্ঠায়) এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি।

সে যাহা হউক, মূলকথা, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণ সর্ব্বত্র জ্ঞানের উপলব্ধিকেই বিষয়ের উপলব্ধি বলিয়াছেন. উহাই তাঁহাদিগের কথিত "সহোপলম্ভনিয়ম"। উহার দ্বারা তাঁহারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু বিরোধী বৌদ্ধসম্প্রদায়ও উহা স্বীকার করেন নাই। বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্য ভদন্ত শুভগুপ্ত উক্ত যুক্তি খণ্ডন করিতে বহু কথা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি তাঁহার অনেক কথাই গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে জ্ঞান ও বিষয়ের যে একই উপলব্ধি, ইহা অসিদ্ধ। অন্ততঃ উহা সন্দিগ্ধাসিদ্ধ। কারণ, উহা উভয় পক্ষের নিশ্চিত হেতু নহে। সুতরাং উহার দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদ নিশ্চয় করা যায় না। এইরূপ উক্ত হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। কিন্তু শান্ত রক্ষিত "তত্ত্বসংগ্রহে" প্রতিবাদিগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে পূর্ব্বোক্ত "সহোপলম্ভ-নিয়মে"র সমর্থনপূর্ব্বক উহা যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদসাধক হইতে পারে,—ঐ হেতু যে, অসিদ্ধ বা ব্যভিচারী নহে, ইহা বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে আরও নানা যুক্তির দ্বারা ও ভট্ট কুমারিলের প্রতিবাদের উল্লেখপূর্ব্বক তাহারও খণ্ডন করিয়া নিজসম্মত বিজ্ঞানবাদের সমর্থন করিয়াছেন[১]। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য কমলশীলও উক্ত মতের প্রতিবাদী ভদন্ত শুভগুপ্ত প্রভৃতির সমস্ত কথার উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদের রহস্য বুঝিতে হইলে ঐ সমস্ত মূলগ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য। কেবল প্রতিবাদিগণের প্রতিবাদ পাঠ করিলে উভয় মতের সমালোচনা করাও যায় না। স্থূল কথায় ঐরূপ গভীর বিষয়ের প্রকাশ ও নিরাস করাও যায় না। পরন্তু বিজ্ঞানবাদের সমর্থক বৌদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় কোন কোন অংশে মতভেদও হইয়াছে। বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর "ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিকারিকা" এবং উহার ভাষ্য বুঝিতে পারিলে বসুবন্ধুর ব্যাখ্যাত বিজ্ঞানবাদ বুঝা যাইবে। পরন্তু বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন বুঝিতে হইলে উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির প্রতিবাদও প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। মীমাংসাভাষ্যে শবর স্বামীও বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন। তাহারই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অনেক পরে বৌদ্ধমহাযানসম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যুদয়সময়ে ভট্ট কুমারিল "শ্লোকবার্ত্তিকে" "নিরালম্বনবাদ" ও "শূন্যবাদ" প্রকরণে অতিসূক্ষ্ম বিচার দ্বারা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি বৌদ্ধগুরুর

১। তত্ত্বসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ৫৬৯ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

নিকটেও অধ্যয়ন স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাও শুনা যায়। মীমাংসাচার্য্য প্রভাকরও তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন। শালিকনাথের "প্রকরণপঞ্চিকা" গ্রন্থে তাহা ব্যক্ত আছে। পরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের কার্য্য বিজ্ঞজনবিদিত। পরে শান্তরক্ষিত ও কমলশীল প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রভাবে আবার ভারতে কোন কোন স্থানে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইলে শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এবং সর্ব্বশেষে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য ও শ্রীধর ভট্ট প্রভৃতি বিশেষ বিচার করিয়া বৌদ্ধমতের খণ্ডন করেন। বৌদ্ধমত খণ্ডনের জন্য শেষে উদয়নাচার্য্য "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে যেরূপ পরিপূর্ণ বিচার করিয়াছেন, তাহা পদে পদে চিত্তাকর্ষক ও সুদৃঢ় যুক্তিপূর্ণ। প্রাচীনগণ ঐ গ্রন্থকে "বৌদ্ধাধিকার" নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। এখন অনেকে বলেন, উহার নাম "বৌদ্ধধিক্‌কার"—"বৌদ্ধাধিকার" নহে। উদয়নাচার্য্যের ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থ পাঠ করিলে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের তদানীন্তন অবস্থাও বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধমতের খণ্ডন বুঝিতে হইলে উদয়নাচার্য্যের ঐ গ্রন্থের বিশেষ অনুশীলনও অত্যাবশ্যক। ফলকথা, বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভ হইতেই ভারতে বৈদিক ধর্ম্মরক্ষক মীমাংসক, নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের বহু বহু আচার্য্য নানা স্থানে বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করিয়া নিজ সম্প্রদায় রক্ষা করিয়াছিলেন। এখনও বৌদ্ধপ্রভাববিধ্বংসী বাৎস্যায়ন ও উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি বহু আচার্য্যের যে সকল গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহা বৌদ্ধযুগেও ভারতে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উজ্জ্বল চিত্র ও বিজয়পতাকা। ঐ সমস্ত প্রাচ্য চিত্রে একেবারেই দৃষ্টিপাত না করিয়া অভিনব কল্পিত প্রতীচ্যচিত্র দর্শনে মুগ্ধ হওয়া ঘোর অবিচার। সেই অবিচারের ফলেই শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে ভারতে প্রায় সকল ব্রাহ্মণই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, তিনি তাঁহাদিগকে উপবীত প্রদান করেন, ইত্যাদি প্রকার মন্তব্যও এখন শুনা যায়। কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিৎ বক্তব্য এই যে, বাৎস্যায়নের পূর্ব্বেও বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভ্যুদয়ের সময় হইতেই শেষ পর্য্যন্ত ভারতে সর্ব্বশাস্ত্রনিষ্ণাত তপস্বী কত ব্রাহ্মণ যে বৈদিকবর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণপণে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন এবং সেই সময়ে নানা স্থানে তাঁহাদিগেরও কিরূপ প্রভাব ছিল এবং তাঁহারা নানা শাস্ত্রে কত অপূর্ব্ব গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের নিজ নিজ সম্প্রদায়ে কত শিষ্য প্রশিষ্য ও তাঁহাদিগের মতবিশ্বাসী কত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং স্থানবিশেষে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ায় কত ব্রাহ্মণ যে নিজ সম্পত্তি শাস্ত্রগ্রন্থ মস্তকে করিয়া স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত কি সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে? প্রতীচ্য দিব্যচক্ষুর দ্বারা ত ঐ সমস্ত দেখা যাইবে না। একদেশদর্শী হইয়া প্রত্নতত্ত্বের নির্ণয় করিতে গেলেও প্রকৃত তত্ত্বের নির্ণয় হইবে না। এ বিষয়ে এখানে অধিক আলোচনার স্থান নাই।

পূর্ব্বোক্ত "বিজ্ঞানবাদ" খণ্ডনে প্রথমতঃ সংক্ষেপে স্থূলভাবে মূলকথাগুলি প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। প্রথম কথা—জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় যে বস্তুতঃ অভিন্ন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। জ্ঞেয় হইলেই তাহা জ্ঞানপদার্থ এবং জ্ঞানের উপলব্ধিই জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি,—

জ্ঞেয় বিষয়ের কোন পৃথক্ উপলব্ধি হয় না, সুতরাং জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় বিষয়ের পৃথক্ সত্তা নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, জ্ঞানের উপলব্ধি হইতে জ্ঞেয় বিষয়ের পৃথক্ উপলব্ধিই হইয়া থাকে। জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্নাকারেই জ্ঞেয় বিষয়ের প্রকাশ হয়। পরন্তু জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্মকারকই জ্ঞেয় বিষয়। সুতরাং উহা হইতে জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। কারণ, ক্রিয়া ও তাহার কর্ম্মকারক কখনই এক পদার্থ হয় না। যেমন ছেদনক্রিয়া ও ছেদ্য দ্রব্য এক পদার্থ নহে। পরন্তু জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা ব্যতীত জ্ঞানেরও সত্তা থাকে না। কারণ, নির্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে না। জ্ঞেয় বিষয়গুলি বস্তুতঃ জ্ঞানেরই আকারবিশেষ ; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপে উহার সত্তা আছে, ইহা বলিলে বাহ্য স্বরূপে উহার সত্তা নাই অর্থাৎ বাহ্য পদার্থ নাই, উহা অলীক, ইহাই বলা হয়। কিন্তু তাহা হইলে জ্ঞানাকার পদার্থ অর্থাৎ অন্তর্জ্ঞেয় বস্তু বাহ্যবৎ প্রকাশিত হয়, এই কথা বলা যায় না। কারণ, বাহ্য পদার্থ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক হইলে উহা উপমান হইতে পারে না। অর্থাৎ যেমন "বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় প্রকাশিত হয়" এইরূপ কথা বলা যায় না, তদ্রূপ "বহির্ব্বৎ প্রকাশিত হয়" এই কথাও বলা যায় না। বিজ্ঞানবাদী বাহ্য পদার্থের সত্তা মানেন না, উহা বাহ্যস্বরূপে অলীক বলেন, কিন্তু অন্তর্জ্ঞেয় বস্তু বহির্ব্বৎ প্রকাশিত হয়, এই কথাও বলেন ; সুতরাং তাঁহার ঐরূপ উক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্য নাই। শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই কথা বলিয়াছেন। পরন্তু জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা ব্যতীত তাহার বৈচিত্র্য হইতে পারে না। বিষয়ের বৈচিত্র্য ব্যতীতও জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইতে পারে না। বিজ্ঞানবাদী অনাদি সংস্কারের বৈচিত্র্যবশতঃই জ্ঞানের বৈচিত্র্য বলিয়াছেন। কিন্তু বিষয়ের বৈচিত্র্য ব্যতীত সেই সেই বিষয়ে সংস্কারের বৈচিত্র্যও হইতে পারে না। প্রতিক্ষণে বিজ্ঞানেরই সেই সেই আকারে উৎপত্তি হয় এবং উহাই বিজ্ঞানের পরিণাম, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ঐরূপ ক্ষণিক বিজ্ঞানের উৎপত্তিতে কোন কারণ বলা যায় না। যে বিজ্ঞান দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হইবে, তাহা ঐ সময়ে অপর বিজ্ঞানের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। পরন্তু আলয়বিজ্ঞানসন্তানকে আত্মা বলিলেও উহাতে কালান্তরে কোন বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। কারণ, যে বিজ্ঞান পূর্ব্বে সেই বিষয়ের অনুভব করিয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায় তাহার অনুভূত বিষয় অপর বিজ্ঞান স্মরণ করিতে পারে না। আলয়বিজ্ঞানসন্তানকে স্থায়ী পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে "সর্ব্বং ক্ষণিকং" এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। সুতরাং উহাও প্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহাই বলিতে হইবে (প্রথম খণ্ড, ১৭৩—৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পরন্তু জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সত্তাই না থাকিলে সর্ব্বত্র জ্ঞানেরই জ্ঞান জন্মিতেছে, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে জ্ঞানের পরে "আমি জ্ঞানকে জানিলাম" এইরূপ জ্ঞান কেন জন্মে না ? ইহা বলিতে হইবে। সর্ব্বত্রই কল্পিত বাহ্য পদার্থে জ্ঞানাকার বা অন্তর্জ্ঞেয় বস্তুই বাহ্যবৎ প্রকাশিত হয়, ইহা বলিলে সেই সমস্ত বাহ্য পদার্থের কাল্পনিক বা ব্যবহারিক সত্তাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে সেই সমস্ত বাহ্য পদার্থকে পারমার্থিক বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন বলা যায় না। কাল্পনিক ও পারমার্থিক পদার্থের অভেদ সম্ভব নহে। অসৎ ও সৎপদার্থেরও অভেদ সম্ভব নহে। পরন্তু বিজ্ঞানবাদী

স্বপ্নাদিজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া জ্ঞানত্বহেতুর দ্বারা জাগ্রদবস্থার সমস্ত জ্ঞানকেও ভ্রম বলিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, জাগ্রদবস্থার সমস্ত জ্ঞান স্বপ্নাদি জ্ঞানের তুল্য নহে। পরন্তু স্বপ্নাদি জ্ঞান ভ্রম হইলেও উহাও একেবারে অসদ্‌বিষয়কও নহে। সুতরাং তদ্‌দৃষ্টান্তে জাগ্রদবস্থার সমস্ত জ্ঞানকে অসদ্‌বিষয়ক বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। পরন্তু সর্ব্বাবস্থায় সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম হইলে জগতে যথার্থজ্ঞান থাকে না। উহা না থাকিলেও ভ্রমজ্ঞান বলা যায় না। কারণ, যথার্থ-জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই পূর্ব্বজাত ভ্রমজ্ঞানের ভ্রমত্ব নিশ্চয় করা যায়। নচেৎ সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, ইহা মুখে বলিলে কেহ তাহা গ্রহণ করে না। যথার্থজ্ঞান একেবারেই না থাকিলে প্রমাণেরও সত্তা থাকে না। কারণ, যথার্থ অনুভূতির সাধনকেই প্রমাণ বলে। সেই প্রমাণ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গেলে বিনা প্রমাণে বিপরীত পক্ষও স্থাপন করা যায়। বিজ্ঞানবাদী অপরের সম্মত প্রমাণ-পদার্থ গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত অনুমানের দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, উহার প্রামাণ্য নাই। কারণ, প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য কেহই স্বীকার করেন না। বাহ্য পদার্থের যখন জ্ঞান হইতে পৃথক্‌রূপেই প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন কোন অনুমানের দ্বারাই তাহার অসত্তা সিদ্ধ করা যায় না। বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণও "নাভাব উপলব্ধেঃ" (২।২।২৮) এই সূত্রের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন এবং পরে "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" এই সূত্রের দ্বারা জাগ্রদবস্থার প্রত্যক্ষসমূহ যে, স্বপ্নাদির তুল্য নহে—এই কথা বলিয়া বিজ্ঞানবাদীর অনুমানের দৃষ্টান্তও খণ্ডন করিয়াছেন। যোগদর্শনের কৈবল্যপাদের শেষে এবং উহার ব্যাসভাষ্যেও বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন হইয়াছে। পরন্তু দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থে যে বাহ্যত্ব ও স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা বিজ্ঞানের ধর্ম্ম হইতে পারে না। সুতরাং উহা বিজ্ঞানেরই আকারবিশেষ, ইহাও বলা যায় না। বিজ্ঞানে যাহা নাই, তাহা বিজ্ঞানের আকার বা বিজ্ঞানরূপ হইতে পারে না। পরন্তু যে দ্রব্যে চক্ষুঃসংযোগের পরে তাহাতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা ক্ষণিক হইলে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষকাল পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব না থাকায় উহাতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। সুতরাং "সর্ব্বং ক্ষণিকং" এই সিদ্ধান্তও কোনরূপে উপপন্ন হয় না। পরন্তু বিজ্ঞানবাদী যে বাহ্যশুক্তিতে জ্ঞানাকার রজতেরই ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ঐ বাহ্যশুক্তিও ত তাঁহার মতে বস্তুতঃ জ্ঞান হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ নহে। উহাও জ্ঞানেরই আকারবিশেষ। তাহা হইলে বস্তুতঃ একটী জ্ঞান-পদার্থেই অপর জ্ঞানপদার্থের ভ্রম হওয়ায় তাহাতে বস্তুতঃ কোন বাহ্য সম্বন্ধ না থাকায় বাহ্যবৎ প্রকাশ কিরূপে সম্ভব হইবে? ইহাও বিচার্য্য। পরন্তু তাহা হইলে সর্ব্বত্র বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ সৎপদার্থই অপর জ্ঞানস্বরূপ সৎপদার্থের ভ্রমের অধিষ্ঠান হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। বিজ্ঞানবাদী কিন্তু তাহা বলেন না। তিনি বাহ্যপ্রতীতির অপলাপ করিতে না পারিয়া কল্পিত বাহ্য পদার্থেই জ্ঞানের আরোপ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কল্পিত বাহ্যশুক্তি জ্ঞান হইতে ভিন্ন-রূপে অসৎ। উহাতেই রজতাকার জ্ঞান বা জ্ঞানাকার রজতের ভ্রম হওয়ায় সেই রজতের বাহ্যবৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু বাহ্যস্বরূপে বাহ্য যদি একেবারেই অসৎ বা অলীকই হয়, তাহা হইলে বাহ্যবৎ প্রকাশ হয়, ইহা বলা যায় না। বাহ্যবৎ প্রকাশ বলিতে গেলেই বাহ্য পদার্থের সত্তা স্বীকার্য্য হওয়ায় বিজ্ঞানবাদীর নিজের বাণেই তাঁহার নিজের বিনাশ তখনই হইবে। পরন্তু ভ্রমের যাহা অধিষ্ঠান,

অর্থাৎ যে পদার্থে অপর পদার্থের ভ্রম হয়, সেই পদার্থের সহিত সেই অপর পদার্থ অর্থাৎ আরোপ্য পদার্থটীর সাদৃশ্য ব্যতীত সাদৃশ্যমূলক ঐ ভ্রম হইতে পারে না। তাই শুক্তিতে রজতভ্রমের ন্যায় মনুষ্যাদি-ভ্রম জন্মে না। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর মতে কল্পিত বাহ্য শুক্তি যাহা অসৎ, তাহাই রজতাকার জ্ঞানরূপ সৎপদার্থের ভ্রমের অধিষ্ঠান হইলে অসৎ ও সৎপদার্থের কোন সাদৃশ্য সম্ভব না হওয়ায় উক্তরূপ ভ্রম হইতে পারে না। কল্পিত বা অসৎ বাহ্য শুক্তির সহিতও রজতাকার জ্ঞানের কোনরূপে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, ইহা বলিলে কল্পিত সমস্ত বিষয়ের সহিতই উহার কোনরূপ সাদৃশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় শুক্তিতে রজতভ্রমের ন্যায় মনুষ্যাদি-ভ্রমও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, জ্ঞানাকার মনুষ্যাদিরও ঐ কল্পিত বাহ্য শুক্তিতে ভ্রম কেন হইবে না? ইহাতে বিজ্ঞানবাদীর কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান নিয়ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াকারেই উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানের ঐরূপই পরিণাম স্বভাবসিদ্ধ। অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়াকারেই সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানের স্বভাবানুসারে শুক্তিতে ঐ স্থলে রজতাকার জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়। কোন স্থলে উহাতে অন্যাকার জ্ঞানেরও উৎপত্তি হয়। সর্ব্বাকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু ইহা বলিলে বিজ্ঞানবাদীর মতে উক্তরূপ ভ্রমে বিজ্ঞানের স্বভাব বা শক্তিবিশেষই নিয়ামক, সাদৃশ্যাদি আর কিছুই নিয়ামক নহে, ইহাই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে ঐ স্বভাবের স্বতন্ত্র সত্তা ও উহার নিয়ামক কিছু আছে কি না, ইহা বক্তব্য। বিজ্ঞানের স্বভাবও যদি অপর বিজ্ঞানরূপই হয়, তাহা হইলে সেই বিজ্ঞানেরও স্বভাববিশেষ স্বীকার করিয়া উহার নিয়ামক বলিতে হইবে। এইরূপে অনন্ত বিজ্ঞানের অনন্ত স্বভাব বা শক্তি কল্পনা করিয়া বিজ্ঞানবাদী কল্পনাশক্তিবলে ব্যর্থ বিচার করিলেও বস্তুতঃ উহা তাঁহার কল্পনা মাত্র, উহা বিচারসহ নহে।

বেদবিশ্বাসী অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় কিন্তু ঐরূপ কল্পনা করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে জ্ঞেয় বিষয় বা জগৎপ্রপঞ্চ সৎও নহে, অসৎও নহে, সৎ অথবা অসৎ বলিয়া উহার নির্ব্বচন বা নিরূপণ করা যায় না। সুতরাং উহা অনির্ব্বচনীয়। অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে সনাতন ব্রহ্মে ঐ অনির্ব্বচনীয় জগতের ভ্রম হইতেছে। ঐ ভ্রমের নাম "অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি"। শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হইতেছে, উহাও "অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি"। ঐ স্থলে বাহ্য শুক্তি অসৎ নহে; উহা ব্যবহারিক সত্য। উহাতে অনির্ব্বচনীয় রজতের উৎপত্তি ও ভ্রম হইতেছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ যদি নিজ মত সমর্থন করিতে যাইয়া শেষে উক্ত অদ্বৈত মতেরই নিকটবর্ত্তী হন, তাহা হইলে কিন্তু অদ্বৈতমতেরই জয় হইবে। কারণ, অদ্বৈতমতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত, বেদকে আশ্রয় করিয়াই উক্ত মত সমর্থিত। তাই উহা "বেদনয়" অর্থাৎ বৈদিক মত বলিয়া কথিত হয়। বেদ ও সনাতন ব্রহ্মকে আশ্রয় করায় অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের অপেক্ষায় বলী। সুতরাং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বিচার করিতে করিতে শেষে আত্মরক্ষার জন্য অদ্বৈত মতেরই নিকটবর্ত্তী হইলে তখন অদ্বৈত মতের জয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বলবানেরই জয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও তখন বিজ্ঞানবাদীর নিজ মত ধ্বংস হওয়ায় তাঁহার বৌদ্ধত্বও থাকিবে না। তখন তিনি "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট" হইবেন। আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য উক্তরূপ তাৎপর্য্যেই প্রথম

কল্পে বিজ্ঞানবাদীকে অদ্বৈত মতের কুক্ষিতে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন।[১] পরেই আবার বলিয়াছেন যে, অথবা "মতিকর্দ্দম" অর্থাৎ বুদ্ধির মালিন্য পরিত্যাগ করিয়া নীলাদি বাহ্য বিষয়ের পারমার্থিকত্ব বা সত্যতায় অর্থাৎ আমাদিগের সম্মত দ্বৈতমতে অবস্থান কর। তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞানবাদী বুদ্ধির মালিন্যবশতঃ প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিলে অদ্বৈতমতের কুক্ষিতে প্রবেশ করুন। তাহাতেও আমাদিগের ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির মালিন্য নিবৃত্তি হইলে তিনি আর এই বিশ্বের নিন্দা করিতে পারিবেন না। ইহাকে ক্ষণভঙ্গুরও বলিতে পারিবেন না। অনিন্দ্য ঈদৃশ বিশ্বকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, উদয়নাচার্য্য বিজ্ঞানবাদীকে অদ্বৈত মতের কুক্ষিতে প্রবেশ করিতে বলিলেও পরে বিশ্বের সত্যতা বা দ্বৈতমতে অবস্থান করিতেই বলিয়াছেন এবং তাহাতে বুদ্ধির মালিন্য ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি এখানে অদ্বৈতমতেরই সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তা বলিয়া উক্ত মতে তাঁহার অনুরাগ সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহার পূর্ব্বাপর গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলেও ইহার বিপরীতই বুঝা যায়। এ বিষয়ে চতুর্থ খণ্ডে (১২৫—২৯ পৃষ্ঠায়) আলোচনা দ্রষ্টব্য। ফলকথা, উক্ত অদ্বৈতমতের স্থান থাকিলেও বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের কোন স্থানই নাই, অর্থাৎ উহা দাঁড়াইতেই পারে না, ইহাই উদয়নের চরম বক্তব্য। তাই শেষে বলিয়াছেন,—"তথাগতমতস্য তু কোঽবকাশঃ।"

পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনে জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবাদী সর্ব্বত্র কল্পিত বাহ্য পদার্থে জ্ঞানাকার বা অন্তর্জ্ঞেয় বস্তুরই ভ্রম স্বীকার করেন। জ্ঞানরূপ আত্মাই তাঁহার মতে অন্তর্জ্ঞেয়। সুতরাং সর্ব্বত্র আত্মখ্যাতিই তাঁহার স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে "ইহা নীল" এইরূপ জ্ঞান না হইয়া "আমি নীল" এইরূপই জ্ঞান হইত এবং "ইহা রজত" এইরূপ জ্ঞান না হইয়া "আমি রজত" এইরূপ জ্ঞানই হইত। কারণ, সর্ব্বত্র অন্তর্জ্ঞেয় জ্ঞানেরই ভ্রম হইলে তাহাতে অবশ্য জ্ঞানরূপ আত্মারও সর্ব্বত্র "অহং" এই আকারে প্রকাশ হইবেই। কিন্তু তাহা যখন হয় না, অর্থাৎ আমি রজত, আমি নীল, আমি ঘট, ইত্যাদিরূপে জ্ঞানোৎপত্তি যখন ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীও স্বীকার করেন না, তখন পূর্ব্বোক্ত "আত্মখ্যাতি" কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। এখন এখানে ঐ "আত্মখ্যাতি" কিরূপ, তাহাও বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। তাহাতে প্রথমে "অন্যথাখ্যাতি" ও "অসৎখ্যাতি" প্রভৃতিও বুঝা আবশ্যক।

অনেকে বলিয়াছেন যে, "খ্যাতি" শব্দের অর্থ ভ্রমজ্ঞান। বস্তুতঃ "খ্যাতি" শব্দের অর্থ জ্ঞান মাত্র। পূর্ব্বোক্ত ৩৪শ সূত্রের বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকরও জ্ঞান অর্থেই "খ্যাতি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অনুমিতিদীধিতির টীকার শেষে গদাধর ভট্টাচার্য্য "অসৎখ্যাতি" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেও লিখিয়াছেন,—"খ্যাতির্জ্ঞানং।" যোগদর্শনে "তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যং" (১।১৬) এবং "বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ" (২।২৬) এই সূত্রে যথার্থজ্ঞান অর্থেই

১। প্রবিশ বা অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিকুক্ষিং, তিষ্ঠ বা মতিকর্দ্দমমপহায় নীলাদীনাং পারমার্থিকত্বে তস্মাৎ—

ন গ্রাহ্যভেদমবধূয় ধিয়োঽস্তি বৃত্তিস্তদ্বাধনে বলিনি বেদনয়ে জয়শ্রীঃ।

নো চেদনিন্দ্যমিদমীদৃশমেব বিশ্বং তথ্যং, তথাগতমতস্য তু কোঽবকাশঃ॥—আত্মতত্ত্ববিবেক॥

"খ্যাতি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তবে "আত্মখ্যাতি" প্রভৃতি নামে যে "খ্যাতি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার ফলিতার্থ ভ্রমজ্ঞান। এই ভ্রমজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিক-সমাজে নানারূপ সূক্ষ্ম বিচারের ফলে সম্প্রদায়ভেদে নানা মতভেদ হইয়াছিল এবং ঐ সমস্ত মত-ভেদই সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন মত স্থাপনের মূল ভিত্তি হইয়াছিল। তাই নানা গ্রন্থে আমরা ঐ সমস্ত মতভেদের সমালোচনাপূর্ব্বক খণ্ডন-মণ্ডন দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রধানতঃ পাঁচটী মতই এখন প্রসিদ্ধ। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় উহাকে "খ্যাতিপঞ্চক" বলিয়াছেন[১]। যথা,—(১) আত্মখ্যাতি, (২) অসৎখ্যাতি, (৩) অখ্যাতি, (৪) অন্যথাখ্যাতি ও (৫) অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি। তন্মধ্যে শেষোক্ত "অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি"ই তাঁহাদিগের সম্মত। তাঁহাদিগের মতে শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে অজ্ঞান-বশতঃ সেই শুক্তিতে মিথ্যা রজতের সৃষ্টি হয়। মিথ্যা বলিতে অনির্ব্বচনীয়। অর্থাৎ ঐ রজতকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না; সৎ বা অসৎ বলিয়া উহার নির্ব্বচন করা যায় না; সুতরাং উহা অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা। উক্ত স্থলে সেই অনির্ব্বচনীয় রজতেরই ভ্রম হয়। উহারই নাম "অনির্ব্বচনখ্যাতি" বা "অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি"। এইরূপ সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের মতে ভ্রমস্থলে অনির্ব্বচনীয় বিষয়েরই উৎপত্তি ও ভ্রম হয়। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে সর্ব্বত্র ভ্রমের নাম "অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি"। তাঁহাদিগের মূল যুক্তি এই যে, শুক্তিতে রজতভ্রম ও রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি স্থলে রজত ও সর্প প্রভৃতি সে স্থানে একেবারে অসৎ হইলে উহার ভ্রম হইতে পারে না। বিশেষতঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না। শুক্তিতে রজতভ্রম প্রভৃতি প্রত্যক্ষাত্মক ভ্রম। সুতরাং উহাতে রজতাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অবশ্যই আবশ্যক। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, ঐ স্থলে রজতাদি মিথ্যা বিষয়ের উৎপত্তি হয়। তাহার সহিতই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য ঐরূপ ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ জন্মে। নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ঐ স্থলে রজতাদিজ্ঞানকেই সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া, ঐ সমস্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষের উপপাদন করিয়াছেন। ঐ সন্নিকর্ষকে তাঁহারা "জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি" বলিয়াছেন। উহা অলৌকিক সন্নিকর্ষবিশেষ। তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত স্থলে অলৌকিক ভ্রমপ্রত্যক্ষই জন্মে। সুতরাং উহাতে চক্ষুঃসংযোগাদি লৌকিক সন্নিকর্ষ অনাবশ্যক এবং তজ্জন্য ঐ ভ্রমস্থলে সেই স্থানে মিথ্যা বিষয়ের সৃষ্টি কল্পনাও অনাবশ্যক। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় জ্ঞানরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, উহা স্বীকার করিলে পর্ব্বতাদি স্থানে বহ্ন্যাদির অনুমিতি হইতে পারে না। কারণ, ঐ সমস্ত অনুমিতির পূর্ব্বে সাধ্য বহ্ন্যাদিজ্ঞান যখন থাকিবেই, তখন ঐ জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষজন্য পর্ব্বতাদিতে বহ্ন্যাদির অলৌকিক প্রত্যক্ষই জন্মিবে। কারণ, একই বিষয়ে অনুমিতির সামগ্রী অপেক্ষায় প্রত্যক্ষের সামগ্রী বলবতী। ঐরূপ স্থলে প্রত্যক্ষের সামগ্রী উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষই জন্মে, ইহা নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও স্বীকার করেন। সুতরাং যাহা স্বীকার করিলে অনুমিতির উচ্ছেদ হয়, তাহা স্বীকার করা যায় না। এতদুত্তরে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই

১। আত্ম-খ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথাঽনির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকং॥

যে, জ্ঞানমাত্রই যে, অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষের জনক অলৌকিক সন্নিকর্ষ, ইহা আমরা বলি না। কারণ, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই। কিন্তু যে জ্ঞানবিশেষের পরে প্রত্যক্ষজ্ঞানই জন্মিয়া থাকে, অথচ তৎপূর্ব্বে ঐ প্রত্যক্ষজনক লৌকিক সন্নিকর্ষ থাকে না, তাহা সম্ভবও হয় না, সেখানেই আমরা সেই পূর্ব্বজাত জ্ঞানবিশেষকে প্রত্যক্ষজনক অলৌকিক একপ্রকার সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করি। পর্ব্বতাদি স্থানে বহ্ন্যাদির অনুমিতি স্থলে পূর্ব্বে বহ্ন্যাদি সাধ্যজ্ঞান থাকিলেও উহা ঐ সন্নিকর্ষ হইবে না। কারণ, উহার পরে ঐ স্থলে প্রত্যক্ষ জন্মে না। সুতরাং ঐ স্থলে প্রত্যক্ষের সামগ্রী না থাকায় অনুমিতির কোন বাধা নাই। অবশ্য অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় আরও নানা যুক্তি ও শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখ করিয়া "অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি"-পক্ষই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। শারীরকভাষ্যের প্রারম্ভে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসের স্বরূপ ব্যাখ্যায় "অন্যথাখ্যাতি" ও "আত্ম-খ্যাতি" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন মতসমূহের উল্লেখপূর্ব্বক "অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি"-পক্ষই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। সেখানে "ভামতী" টীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ঐ সমস্ত মতভেদের বিশদ ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিয়া অন্যান্য মতের খণ্ডনপূর্ব্বক আচার্য্য শঙ্করের মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার অনেক পরে আচার্য্য শঙ্করের সম্প্রদায়রক্ষক বিদ্যারণ্য মুনিও "বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ" পুস্তকে ঐ সমস্ত মতের বিশদ সমালোচনা করিয়া শঙ্করের মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত মতের বিশেষ বিচারাদি জানিতে হইলে ঐ সমস্ত মূলগ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য। শ্রীসম্প্রদায়ের বেদান্তাচার্য্য মহামনীষী বেঙ্কটনাথের "ন্যায়পরিশুদ্ধি" গ্রন্থেও ঐ সমস্ত মতের বিশদ ব্যাখ্যা ও বিচার পাওয়া যায়।

কিন্তু "ন্যায়মঞ্জরী"কার মহামনীষী জয়ন্ত ভট্ট পূর্ব্বোক্ত "অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি"কে গ্রহণই করেন নাই। তিনি (১) বিপরীতখ্যাতি, (২) অসৎখ্যাতি, (৩) আত্মখ্যাতি ও (৪) অখ্যাতি, এই চতুর্ব্বিধ খ্যাতিরই উল্লেখ করিয়া[১] বিস্তৃত বিচারপূর্ব্বক শেষোক্ত মতত্রয়ের খণ্ডন করিয়া, প্রথমোক্ত বিপরীত-খ্যাতিকেই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। উহাই ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। উহারই প্রসিদ্ধ নাম "অন্যথাখ্যাতি"। জয়ন্ত ভট্টের পরে মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় "তত্ত্বচিন্তা-মণি"র "অন্যথাখ্যাতিবাদ" নামক প্রকরণে বিস্তৃত বিচার দ্বারা গুরু প্রভাকরের "অখ্যাতিবাদ" খণ্ডন করিয়া, ঐ অন্যথাখ্যাতিবাদেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন ; বিশেষ জিজ্ঞাসু ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসের স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রথমেই ঐ "অন্যথাখ্যাতিবাদে"র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সেখানে একই বাক্যের দ্বারা "অন্যথাখ্যাতি" ও "আত্মখ্যাতি" এই মতদ্বয়ই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও প্রণিধান

১। তথাহি ভ্রান্তবোধেষু প্রস্ফুরদ্বস্তুসম্ভবাৎ।
চতুষ্প্রকারা বিমতিরুপপদ্যেত বাদিনাং ॥
বিপরীতখ্যাতিরসৎখ্যাতিরাত্মখ্যাতিরখ্যাতিরিতি।—ন্যায়মঞ্জরী, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

করা আবশ্যক[১]। অন্যথাখ্যাতিবাদী ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, শুক্তিতে রজত-ভ্রম স্থলে শুক্তি ও রজত, এই উভয়ই সৎপদার্থ। শুক্তি সেখানেই বিদ্যমান থাকে। রজত অন্যত্র বিদ্যমান থাকে। শুক্তিতে অন্যত্র বিদ্যমান সেই রজতেরই ভ্রম হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে শুক্তি শুক্তিরূপে প্রতিভাত না হইয়া "অন্যথা" অর্থাৎ রজতপ্রকারে বা রজতরূপে প্রতিভাত হয়। তাই ঐ ভ্রমজ্ঞানকে "অন্যথাখ্যাতি" বলা হয়। ঐ স্থলে শুক্তিতে রজতের যে ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ জন্মে, উহা একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ। সাদৃশ্যাদি জ্ঞানবশতঃ ঐ স্থলে প্রথমে পূর্ব্বানুভূত রজতের স্মরণাত্মক যে জ্ঞান জন্মে, উহাই ঐ প্রত্যক্ষের কারণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ। ঐ সন্নিকর্ষের নামই জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি। উহা স্বীকার না করিলে কুত্রাপি ঐরূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না। কারণ, ভ্রমপ্রত্যক্ষ স্থলে সর্ব্বত্রই সেই অন্য বিষয়টী সেখানে বিদ্যমান না থাকায় সেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন লৌকিক সন্নিকর্ষ সম্ভব হয় না। ঐ স্থলে রজতের উপাদান-কারণাদি না থাকায় মিথ্যা রজতের উৎপত্তিও হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় যে মিথ্যা অজ্ঞানকে ঐ স্থলে রজতের উপাদান-কারণ বলিয়াছেন, উহা চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রজতের সজাতীয় দ্রব্য-পদার্থ না হওয়ায় রজতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। পরন্তু ঐরূপ অজ্ঞান বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই, ইহাই ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের চরম বক্তব্য। যোগদর্শনেও বিপর্য্যয় নামক চিত্ত-বৃত্তি স্বীকারে পূর্ব্বোক্তরূপ অন্যথাখ্যাতিবাদই স্বীকৃত হইয়াছে। যোগবার্ত্তিকে (১.৮) বিজ্ঞানভিক্ষুও ইহা স্পষ্ট লিখিয়াছেন। মীমাংসাচার্য্য ভট্ট কুমারিলও অন্যথাখ্যাতিবাদী।

মীমাংসাচার্য্য গুরুপ্রভাকর কিন্তু একেবারে ভ্রমজ্ঞানই অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি অভিনব কল্পনাবলে সমর্থন করিয়াছিলেন যে, জগতে "খ্যাতি" অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান নাই। সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ। সুতরাং তিনি "অখ্যাতি"বাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। "খ্যাতি" অর্থাৎ ভ্রমের অভাবই "অখ্যাতি"। প্রভাকরের কথা এই যে, শুক্তি দেখিলে কোন স্থলে ব্যক্তিবিশেষের যে "ইদং রজতং" এইরূপ জ্ঞান জন্মে, উহা একটী বিশিষ্ট জ্ঞান নহে—উহা জ্ঞানদ্বয়। ঐ স্থলে "ইদং" বলিয়া অর্থাৎ ইদন্ত্বরূপে সেই সম্মুখীন শুক্তির প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। পরে উহাতে রজতের সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষজন্য পূর্ব্বদৃষ্ট রজতবিষয়ক সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হওয়ায় সেই রজতের স্মরণাত্মক জ্ঞান জন্মে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে "ইদং" বলিয়া শুক্তির প্রত্যক্ষ এবং পরে পূর্ব্বদৃষ্ট রজতবিশেষের স্মরণ, এই জ্ঞানদ্বয়ই জন্মে। ঐ জ্ঞানদ্বয়ই যথার্থ। সুতরাং ঐ স্থলে ভ্রমজ্ঞান জন্মে না। অবশ্য "ইদং" পদার্থকেই রজত বলিয়া প্রত্যক্ষ হইলে ঐরূপ একটী বিশিষ্ট জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু উক্ত স্থলে ঐরূপ একটী বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মেই না। এইরূপ সর্ব্বত্রই ঐরূপ স্থলে উক্তরূপ জ্ঞানদ্বয়ই জন্মে। সুতরাং জগতে ভ্রমজ্ঞান নাই। এই মতে গুরুতর অনুপপত্তি এই যে, শুক্তিকে রজত বলিয়া বুঝিয়াই

১। তং কেচিদন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি।—শারীরক ভাষ্য।

অন্যথাত্মখ্যাতিবাদিনোর্ম্মতমাহ—"তং কেচি"দিতি। কেচিদন্যথাখ্যাতিবাদিনোঽন্যত্র শুক্ত্যাদাবন্যধর্ম্মস্য স্বাবয়বধর্ম্মস্য দেশান্তরস্থরূপ্যাদেরধ্যাস ইতি বদন্তি। আত্মখ্যাতিবাদিনস্তু বাহ্যশুক্ত্যাদৌ বুদ্ধিরূপাত্মনো ধর্ম্মস্য রজতস্যাধ্যাস আন্তরস্য রজতস্য বহির্ব্বদবভাস ইতি বদন্তীত্যর্থঃ।—রত্নপ্রভা টীকা।

অনেক সময়ে ঐ ভ্রান্ত ব্যক্তি রজত গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি তাহার ঐরূপ বিশিষ্ট বোধই না জন্মে, তাহা হইলে তাহার ঐ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, ঐ স্থলে ঐরূপ বিভিন্ন দুইটী জ্ঞান জন্মিলে সে ব্যক্তি ত শুক্তিকে রজত বলিয়া বুঝে না। সুতরাং সেই দ্রব্যকে রজত বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? এতদুত্তরে প্রভাকর বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে যে কাহারও রজত গ্রহণে প্রবৃত্তিও হয়, ইহা অবশ্যই সত্য। কিন্তু সেখানে কোন একটী বিশিষ্ট জ্ঞান ঐ প্রবৃত্তির কারণ নহে। কিন্তু ইদং পদার্থ শুক্তি ও পূর্ব্বদৃষ্ট সেই রজতের ভেদের অজ্ঞানই ঐ প্রবৃত্তির কারণ। উক্ত স্থলে ইদং পদার্থ ও রজতের যে ভেদজ্ঞান থাকে না, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। পরন্তু অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও উক্ত স্থলে প্রথমে ইদং পদার্থের প্রত্যক্ষ ও পরে রজতত্বরূপে রজতের স্মরণ, এই জ্ঞানদ্বয় স্বীকারই করেন। নচেৎ তাঁহাদিগের মতে উক্তরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না। তাঁহারা জ্ঞানবিশেষরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়াই ঐরূপ স্থলে অলৌকিক ভ্রমপ্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে আবার ঐ জ্ঞানদ্বয়জন্য একটী বিশিষ্ট জ্ঞানরূপ ভ্রম স্বীকার অনাবশ্যক। কারণ, তাঁহাদিগের মতেও উক্ত স্থলে ঐরূপ জ্ঞানদ্বয় এবং শুক্তি ও রজতের ভেদের অজ্ঞান, ইহা যখন স্বীকৃত, তখন উহার দ্বারাই উক্ত স্থলে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে। প্রভাকরের শিষ্য মহামনীষী শালিকনাথ তাঁহার "প্রকরণপঞ্চিকা" গ্রন্থে বিশদরূপে প্রভাকরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা, প্রভাকরের মতে সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—জগতে ভ্রমজ্ঞান নাই।[১] বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতেও সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ। শুক্তিতে যে রজতজ্ঞান হয়, উহাও ভ্রম নহে। কারণ, শুক্তিতে রজতের বহু অংশ বিদ্যমান থাকায় উহা রজতের সদৃশ। তাই কোন সময়ে শুক্ত্যংশের জ্ঞান না হইয়া শুক্তিগত রজতাংশের জ্ঞান হইলেই তজ্জন্য সেখানে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মে এবং পরে ঐ জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া ব্যবহার হয়। শ্রীভাষ্যে "জিজ্ঞাসাধিকরণে"ই রামানুজ বহু বিচার করিয়া তাঁহার উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তিকার বোধায়ন মুনিই প্রথমতঃ উক্ত মতের সমর্থক হইলে প্রভাকরের পূর্ব্বোক্ত কল্পনাকে তাঁহারই অভিনব কল্পনা বলা যায় না। তবে প্রভাকরের উক্ত মত ও যুক্তির বিশিষ্টতা আছে। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীও নহেন। শুক্তিতে রজতাংশ স্বীকারও করেন নাই। তিনি নৈয়ায়িকের ন্যায় আত্মার বহুত্ব ও বাস্তব কর্ত্তৃত্বাদি স্বীকার করিয়া দ্বৈতবাদী। তাঁহার সমর্থিত অখ্যাতিবাদে অধ্যাস বা ভ্রম অসিদ্ধ হওয়ায় অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় বিশেষ বিচার করিয়া তাঁহার উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। এবং রামানুজের সমর্থিত সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিয়াও তাঁহারা অধ্যাস সিদ্ধ করিয়াছেন। কারণ, অধ্যাস সিদ্ধ না হইলে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহাদিগের সেই সমস্ত বিচার সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় না।

প্রভাকরের "অখ্যাতিবাদ" খণ্ডনে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও সুবিস্তৃত বহু বিচার করিয়াছেন।

১। যথার্থং সর্ব্বমেবেহ বিজ্ঞানমিতি সিদ্ধয়ে। প্রভাকরগুরোর্ভাবঃ সমীচীনঃ প্রকাশ্যতে।—ইত্যাদি প্রকরণপঞ্চিকা, "নয়বীথী" নামক চতুর্থ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদিগের চরম কথা এই যে, শুক্তি দেখিলে যে, "ইদং রজতং" এইরূপ জ্ঞান জন্মে, উহা কথনই জ্ঞানদ্বয় হইতে পারে না—উহা একটী বিশিষ্ট জ্ঞান। কারণ, উক্ত স্থলে শুক্তিতে ইহা রজত, এইরূপে একটি বিশিষ্ট জ্ঞান না জন্মিলে অর্থাৎ শুক্তিকেই রজত বলিয়া না বুঝিলে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। কারণ, সর্ব্বত্রই বিশিষ্ট জ্ঞানজন্য ইচ্ছা ও সেই ইচ্ছাজন্য প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। সুতরাং যেমন সত্য রজতকে রজত বলিয়া বুঝিলেই তজ্জন্য ইচ্ছাবশতঃ ঐ রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, সেখানে ঐ বিশিষ্ট জ্ঞানই ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া, ঐ প্রবৃত্তির কারণ হয়, তদ্রূপ শুক্তিতেও "ইহা রজত" এইরূপ একটী বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলেই উহা ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া সেখানে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তির কারণ হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। সেখানে শুক্তি ও রজতের ভেদ-জ্ঞানের অভাবকে ঐ প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া কল্পনা করিলে অভিনব কল্পনা হয়। পরন্তু ঐ স্থলে শুক্তি ও রজতের ভেদ সত্ত্বেও ঐ ভেদজ্ঞান কেন জন্মে না? উহার বাধক কি? ইহা বলিতে গেলে যদি কোন দোষবিশেষই উহার বাধক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ দোষ-বিশেষ ঐ স্থলে "ইহা রজত" এইরূপ একটী ভ্রমাত্মক বিশিষ্ট জ্ঞানই কেন উৎপন্ন করিবে না? ইহা বলা আবশ্যক। বিশিষ্ট জ্ঞানের সামগ্রী থাকিলেও উহা অনাবশ্যক বলিয়া উৎপন্ন হয় না, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, সামগ্রী থাকিলে তাহার কার্য্য অবশ্যই জন্মিবে। পরন্তু ঐ স্থলে যখন শুক্তি ও রজতের ভেদজ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ সেই সম্মুখীন পদার্থ রজত নহে, কিন্তু শুক্তি, ইহা যখন বুঝিতে পারে, তখন "আমি ইহাকে রজত বলিয়াই বুঝিয়াছিলাম",—এইরূপেই সেই পূর্ব্বজাত বিশিষ্ট জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ (অনুব্যবসায়) জন্মে। সুতরাং তদ্দ্বারা অবশ্যই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহার পূর্ব্বজাত সেই জ্ঞান শুক্তিতেই রজতবিষয়ক একটী বিশিষ্ট জ্ঞান। উহা পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞানদ্বয় নহে। কারণ, তাহা হইলে "আমি পূর্ব্বে ইহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, পরে রজতকে স্মরণ করিয়াছিলাম" এইরূপেই ঐ জ্ঞানদ্বয়ের মানস প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। ফলকথা, বাধনিশ্চয়ের পরে পূর্ব্বজাত ভ্রমজ্ঞানের ভ্রমত্ব মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ভ্রমজ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া উহার অপলাপ করা যায় না। প্রভাকরের পূর্ব্বোক্ত অখ্যাতিবাদ যে, কোন-রূপেই উপপন্ন হয় না, ইহা মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট ও তাঁহার পরে মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় উপাদেয় বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সর্ব্বশূন্যতাবাদী বা সর্ব্বাসত্ত্ববাদী প্রাচীন নাস্তিকসম্প্রদায়বিশেষের মতে সমস্ত পদার্থই অসৎ। তাঁহাদিগের মতে সর্ব্বত্র অসতের উপরেই অসতের আরোপ হইতেছে। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বত্র সর্ব্বাংশেই অসতের ভ্রম স্বীকার করায় "অসৎখ্যাতি"বাদী। তাঁহারা গগন-কুসুমাদি অলীক পদার্থেরও প্রত্যক্ষাত্মক ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন। অসতের ভ্রমই "অসৎখ্যাতি"। মধ্বাচার্য্যের মতেও শুক্তি প্রভৃতিতে রজতাদি ভ্রমস্থলে রজতাদি অসৎ। কিন্তু তাঁহার মতে ঐ ভ্রমের অধিষ্ঠান শুক্তি প্রভৃতি দ্রব্য সৎ। অর্থাৎ তাঁহার মতে ভ্রমস্থলে সৎ পদার্থেই অসৎ পদার্থের আরোপ হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি সদুপরক্ত অসৎখ্যাতিবাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বশূন্যতাবাদীর ন্যায় অসৎখ্যাতিবাদী নহেন। নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাকের

মতে সকল পদার্থই অসৎ নহে। সুতরাং তিনিও সর্ব্বশূন্যতাবাদীর ন্যায় অসৎখ্যাতিবাদী নহেন। তবে তাঁহার মতে ঈশ্বর প্রভৃতি যে সমস্ত অতীন্দ্রিয় পদার্থ অসৎ, তাহারও জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি ঐ সমস্ত স্থলেই অসৎখ্যাতিবাদী। আস্তিকসম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে অসদ্-বিষয়ক শাব্দ জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। যোগদর্শনেও "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" (১।১৯) এই সূত্রের দ্বারা উহা কথিত হইয়াছে। গগন-কুসুমাদি অলীক বিষয়েও শাব্দজ্ঞান ভট্ট কুমারিলেরও সম্মত ; ইহা তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকের "অত্যন্তাসত্যপি জ্ঞানমর্থে শব্দঃ করোতি হি" (২।৬) এই উক্তির দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু নৈয়ায়িকসম্প্রদায় অলীক বিষয়ে শাব্দজ্ঞানও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা কুত্রাপি কোন অংশেই কোনরূপেই অসৎখ্যাতি স্বীকার করেন নাই, ইহাই প্রাচীন সিদ্ধান্ত। "ব্যাপ্তিপঞ্চক-দীধিতি"র টীকার শেষে নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও লিখিয়াছেন,—"সদুপরাগেণাপ্যসতঃ সংসর্গমর্য্যাদয়া ভানস্যানঙ্গীকারাৎ।" কিন্তু সর্ব্বশেষে তিনি নিজে "পীতঃ শঙ্খো নাস্তি" এই বাক্যজন্য শাব্দবোধে সম্বন্ধাংশে অসৎখ্যাতি স্বীকার করিয়াছেন কি না, ইহা নব্যনৈয়ায়িকগণ বিচার করিবেন। সাংখ্যসূত্রকারও "নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ" (৫।৫২) এই সূত্রের দ্বারা অসৎখ্যাতি অস্বীকার করিয়াছেন এবং "নান্যথাখ্যাতিঃ স্ববচো ব্যাঘাতাৎ" (৫।৫৫) এই সূত্র দ্বারা অন্যথাখ্যাতিও খণ্ডন করিয়াছেন। পরে "সদসৎখ্যাতির্ব্বাধাবাধাৎ" (৫।৫৬) এই সূত্রদ্বারা "সদসৎখ্যাতি" সমর্থন করিয়াছেন।

বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে শূন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায়কে অনেকে অসৎখ্যাতিবাদী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণ শূন্যবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উক্ত মতে সকল পদার্থ অসৎ বলিয়াই ব্যবস্থিত নহে। কিন্তু (১) সৎও নহে, (২) অসৎও নহে, (৩) সৎ ও অসৎ, এই উভয়প্রকারও নহে, (৪) সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন কোন প্রকারও নহে। "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" মাধবাচার্য্যও উক্ত শূন্যবাদের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত শূন্যকেই "তত্ত্ব" বলিয়াছেন[১]। উক্ত শূন্যবাদের ব্যাখ্যায় "সমাধিরাজসূত্রে" স্পষ্টভাষায় উক্ত হইয়াছে,—"অস্তীতি নাস্তীতি উভেহপি মিথ্যা"। অর্থাৎ পদার্থের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, উভয়ই মিথ্যা। "মাধ্যমিককারিকা"য় দেখা যায়,—"আত্মনোহস্তিত্বনাস্তিত্বে ন কথঞ্চিচ্চ সিধ্যতঃ।" (তৃতীয় খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বও কোন প্রকারে সিদ্ধ হয় না, নাস্তিত্বও কোন প্রকারে সিদ্ধ হয় না। সুতরাং উক্ত মতে নাস্তিতাই শূন্যতা নহে। অতএব উক্ত মতে সকল পদার্থই অসৎ বলিয়া নির্দ্ধারিত না হওয়ায় শূন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায়কে কিরূপে অসৎখ্যাতিবাদী বলা যায় ? পরন্তু উক্ত মতে পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত শূন্যই পারমার্থিক সত্য। সৎ বলিয়া লৌকিক বুদ্ধির বিষয় পদার্থ কাল্পনিক সত্য। উহাকে "সাংবৃত" সত্যও বলা হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থ ও উহার প্রতিবাদগ্রন্থে অনেক স্থলে "সংবৃতি" ও "সাংবৃত" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। লৌকিক বুদ্ধিরূপ অবিদ্যা বা কল্পনাকেই "সংবৃতি" বলা হইয়াছে। সুতরাং কাল্পনিক সত্যকেই "সাংবৃত" সত্য

১। অতস্তত্ত্বং সদসদুভয়ানুভয়াত্মকচতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যমেব।—"সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" বৌদ্ধদর্শন।

বলা হইয়াছে। শূন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ সত্য[1] স্বীকার করায় তাঁহারা বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের ন্যায় অনির্ব্বাচ্যবাদী, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের ন্যায় ভ্রমের মূল অধিষ্ঠান কোন নিত্য পদার্থ স্বীকার না করায় উক্ত মত বেদান্তের অদ্বৈতমতের কোন অংশে সদৃশ হইলেও উহা অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধ এবং উক্ত মতে জগদ্‌ভ্রমের মূল অধিষ্ঠান কোন সনাতন সত্য পদার্থ স্বীকৃত না হওয়ায় উহা কোন সময়ে প্রবল হইলেও পরে অপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শ্রুতিসিদ্ধ সনাতন ব্রহ্মকে জগদ্‌ভ্রমের মূল অধিষ্ঠানরূপে অবলম্বন করিয়াই শ্রৌত অদ্বৈতবাদের সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সমস্ত মূল মতেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সকলের মতেই "সর্ব্বং ক্ষণিকং।" কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় জগৎকে বিজ্ঞানমাত্র বলিয়া সমস্ত বিজ্ঞানকেই অনিত্য বলিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মের নিত্যতা ও চিদানন্দরূপতা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরই অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ মন্তব্য অবিচারমূলক। শূন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায়ের স্বীকৃত তত্ত্ব "শূন্য"ই শঙ্করের ব্যাখ্যাত ব্রহ্মতত্ত্ব, ইহাও কোনরূপে বলা যায় না। কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন,—"চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্তং শূন্যমিত্যভিধীয়তে।" কিন্তু শঙ্করের ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম "সৎ" বলিয়াই নির্দ্ধারিত। সুতরাং তিনি পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত কোন তত্ত্ব নহেন। তিনি ক্ষণিকও নহেন। তিনি সতত সৎস্বরূপে বিদ্যমান। তিনি মাধ্যমিকের মিথ্যাবুদ্ধির অগোচর সনাতন সত্য। নাগার্জ্জুনের সময় হইতেই শূন্যবাদের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা ও বিশেষ সমর্থন হইয়াছে। কিন্তু সুপ্রাচীন কালে সকল পদার্থের নাস্তিত্বই এক প্রকার শূন্যবাদ বা শূন্যতাবাদ নামে কথিত হইত, ইহা আমরা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝিতে পারি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সকল পদার্থের নাস্তিত্ববাদী নাস্তিকবিশেষকেই "আনুপলম্ভিক" বলিয়া তাঁহার মতের নিরাস করিয়াছেন। নাগার্জ্জুনের ব্যাখ্যাত পূর্ব্বোক্তরূপ শূন্যবাদের কোন আলোচনা বাৎস্যায়নভাষ্যে পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না, তাহা অবশ্য চিন্তনীয়। সে যাহা হউক, মূল কথা, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি শূন্যবাদীকে আমরা অসৎখ্যাতিবাদী বলিয়া বুঝিতে পারি না।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় আত্মখ্যাতিবাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কারণ, তাঁহাদিগের কথা এই যে, জ্ঞান ব্যতীত কোন বিষয়েরই সত্তা কেহ সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ, জ্ঞানে আরোহণ না করিলে কোন বিষয়েরই প্রকাশ হয় না। সুতরাং বুঝা যায় যে, জ্ঞানই বস্তুতঃ জ্ঞেয়।

১। দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা।
লোকসংবৃতিসত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ॥—মাধ্যমিক কারিকা।
সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং স্মৃতং।
বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতিরুচ্যতে॥—শান্তিদেবকৃত "বোধিচর্য্যাবতার"।

অন্তর্জ্ঞেয় ঐ জ্ঞানই বাহ্য আকারে প্রকাশিত হইতেছে। বস্তুতঃ উহা বাহ্য পদার্থ নহে। কল্পিত বাহ্য পদার্থেই অন্তর্জ্ঞেয় পদার্থের ভ্রম হইতেছে। অন্তর্জ্ঞেয় ঐ জ্ঞান বা বুদ্ধিই আত্মা। সুতরাং সর্ব্বত্র কল্পিত বাহ্য পদার্থে বস্তুতঃ আত্মারই ভ্রম হয়। সুতরাং ঐ ভ্রমকে আত্মখ্যাতি বলা হইয়াছে। যেমন শুক্তিতে রজতভ্রম স্থলে শুক্তি কল্পিত বাহ্য পদার্থ। উহাতে আন্তর অর্থাৎ অন্তর্জ্ঞেয় রজতেরই ভ্রম হয়। কারণ, ঐ রজত, জ্ঞানেরই আকারবিশেষ অর্থাৎ জ্ঞান হইতে অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উহা আত্মা বা আত্মধর্ম্ম। সুতরাং উহা আন্তর বা অন্তর্জ্ঞেয় বস্তু। উহা বাহ্য না হইলেও বাহ্যবৎ প্রকাশিত হওয়ায় উহাও বাহ্য পদার্থ বলিয়া কল্পিত ও কথিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সর্ব্বত্র অন্তর্জ্ঞেয় বিজ্ঞানেরই জ্ঞান হওয়ায় তদ্‌ভিন্ন কোন জ্ঞেয় নাই[১]। ফলকথা, সর্ব্বত্রই অন্তর্জ্ঞেয় আত্মস্বরূপ বিজ্ঞানেরই বস্তুতঃ ভ্রম হওয়ায় উহা "আত্মখ্যাতি" বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই মতে কোন জ্ঞানই যথার্থ না হওয়ায় প্রমাণেরও সত্তা নাই। সুতরাং প্রমাণ প্রমেয় ভাবও কাল্পনিক, উহা বাস্তব নহে। কিন্তু বিজ্ঞানের সত্তা স্বীকার্য্য। কারণ, উহা স্বতঃপ্রকাশ। অনাদি সংস্কারের বৈচিত্র্যবশতঃই অনাদিকাল হইতে অসংখ্য বিচিত্র বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে। ঐ সমস্ত বিজ্ঞান প্রত্যেকেই ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী। কারণ, "সর্ব্বং ক্ষণিকং।" পূর্ব্বজাত বিজ্ঞান পরক্ষণেই অপর বিজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া বিনষ্ট হয়। ঐরূপে অনাদিকাল হইতে বিজ্ঞানপ্রবাহ চলিতেছে। তন্মধ্যে "অহং মম" অর্থাৎ আমি বা আমার ইত্যাকার বিজ্ঞানসন্তানের নাম আলয়-বিজ্ঞান—উহাই আত্মা। তদ্‌ভিন্ন সমস্ত বিজ্ঞানের নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। যেমন নীল, পীত ও ঘটপটাদ্যাকার বিজ্ঞান[২]। পূর্ব্বোক্ত আলয়বিজ্ঞান হইতেই প্রবৃত্তিবিজ্ঞানতরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে[৩]। উহাই সমস্ত বিজ্ঞানে ও কল্পিত সর্ব্বধর্ম্মের মূল স্থান। তাই উহার নাম আলয়বিজ্ঞান। উহাই বিজ্ঞাতা[৪]। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু ঐ বিজ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বহু সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানের "বিপাক", "মনন" এবং "বিষয়বিজ্ঞপ্তি" নামে ত্রিবিধ পরিণাম বলিয়া, তন্মধ্যে প্রথম আলয়বিজ্ঞানকে "বিপাকপরিণাম" বলিয়াছেন[৫]। এই সমস্ত কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় না। বিজ্ঞানবাদের প্রকাশক লঙ্কাবতারসূত্রেও "আলয়বিজ্ঞান" ও "প্রবৃত্তিবিজ্ঞানে"র উল্লেখ এবং

১। যদন্তর্জ্ঞেয়রূপন্তু বহির্ব্বদবভাসতে। সোহর্থো বিজ্ঞানরূপত্বাৎ তৎপ্রত্যয়তয়াপি চ॥

—তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকায় (৫৮২ পৃষ্ঠায়) কমলশীলের উদ্ধৃত দিঙ্‌নাগবচন।

২। তৎ স্যাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহমাস্পদং। তৎ স্যাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং যন্নীলাদিকমুল্লিখেৎ॥

৩। "ওঘান্তরজলস্থানীয়াদালয়বিজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানতরঙ্গ উৎপদ্যতে"।—লঙ্কাবতারসূত্র।

৪। বিজানাতীতি বিজ্ঞানং।—ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিকারিকার ভাষ্য।

৫। বিপাকো মননাখ্যশ্চ বিজ্ঞপ্তির্বিষয়স্য চ। তত্রালয়াখ্যং বিজ্ঞানং বিপাকঃ সর্ব্ববীজকং ॥২॥—বসুবন্ধুকৃত ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিকারিকা। "আলয়াখ্য"মিত্যালয়বিজ্ঞানসংজ্ঞকং যদ্বিজ্ঞানং স বিপাকপরিণামঃ। তত্র সর্ব্বসাংক্লেশিক-ধর্ম্মবীজস্থানত্বাৎ আলয়ঃ। আলয়ঃ স্থানমিতি পর্য্যায়ৌ। অথবা আলীয়ন্তে উপনিবধ্যন্তেঽস্মিন্ সর্ব্বধর্ম্মাঃ কার্য্যভাবেন" ইত্যাদি।—স্থিরমতিকৃত ভাষ্য।

ঐ সম্বন্ধে বহু দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের উপদেশ দেখা যায়। তদ্দ্বারা বিজ্ঞানবাদই ব্যক্ত হইয়াছে[১]। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ বুঝিতে হইলে ঐ সমস্ত গ্রন্থও অবশ্য পাঠ্য। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণের অধিকার ও বুদ্ধি অনুসারেই তাঁহাদিগকে বিভিন্নরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে যোগাচার, বিজ্ঞানবাদই তাঁহার অভিমত তত্ত্ব বুঝিয়া, উহাই প্রকৃত সিদ্ধান্তরূপে প্রচার করেন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে মাধ্যমিক, শূন্যবাদই তাঁহার অভিমত তত্ত্ব বুঝিয়া উহাই প্রকৃত সিদ্ধান্তরূপে প্রচার করেন[২]। বুদ্ধদেব যে, কোন কোন শিষ্যের অধিকার ও অভিপ্রায়ানুসারেই তাঁহাদিগের নিকটে রূপাদি বিষয়ের সত্তাও বলিয়াছিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে, ইহা বসুবন্ধুও বলিয়া গিয়াছেন[৩]। এবং বুদ্ধদেব শিষ্যগণের অধিকার ও রুচি অনুসারে বিভিন্নরূপ "দেশনা" অর্থাৎ উপদেশ করিলেও অদ্বিতীয় শূন্যই তত্ত্ব, এই উপদেশই অভিন্ন অর্থাৎ উহাই তাঁহার চরম উপদেশ। সুতরাং উহাই তাঁহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত, ইহা মাধ্যমিকসম্প্রদায় বলিয়া গিয়াছেন[৪]। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক, বুদ্ধদেবের উপদেশানুসারেই জ্ঞান ভিন্ন বাহ্য বিষয়ের সত্তা তাঁহার অভিমত বুঝিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সৌত্রান্তিক বুঝিয়াছিলেন—বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না, উহা সর্ব্বত্রই অনুমেয়। বৈভাষিক বুঝিয়াছিলেন, বাহ্য পদার্থ পরমাণুপুঞ্জমাত্র হইলেও উহার প্রত্যক্ষ হয়। তাই তিনি উহার প্রত্যক্ষ সমর্থনের জন্য বহু প্রয়াস করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সকল পদার্থেরই অস্তিত্ব স্বীকার করায় উহাঁরা উভয়েই "সর্ব্বাস্তিবাদী" বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাস্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ও বিজ্ঞানবাদীর ন্যায় আত্মখ্যাতিবাদী। কারণ, তাঁহাদিগের মতেও বাহ্যশুক্তি প্রভৃতি দ্রব্যে আরোপ্য রজতাদি, জ্ঞানাকারই হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভ্রমস্থলে শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে জ্ঞানাকার রজতাদিরই "খ্যাতি" বা ভ্রম হইয়া থাকে। শুক্তি প্রভৃতিই ঐ ভ্রমের অধিষ্ঠান। কিন্তু বিশেষ এই যে, ঐ বাহ্য শুক্তি প্রভৃতি তাঁহাদিগের মতে বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন সৎপদার্থ। তাঁহারাও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়া সর্ব্বাস্তিবাদই বুদ্ধদেবের অভিমত সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ই হীনযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন এবং তাঁহারাই গোতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পরে ভারতে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন। প্রথমে তাঁহাদিগেরই বিশেষ অভ্যুদয় হইয়াছিল। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঐ সময়েই তাঁহাদিগের প্রবল প্রতি-

১। অথ খলু ভগবান্ তস্যাং বেলায়াং ইমা গাথা অভাষত—

দৃশ্যং ন বিদ্যতে চৈত্তং চিত্তং দৃশ্যাৎ প্রমুচ্যতে।

দেহভোগপ্রতিষ্ঠানমালয়ং খ্যায়তে নৃণাং ॥—ইত্যাদি, লঙ্কাবতারসূত্র, ৫৯ পৃষ্ঠা ও "এবমেবং মহামতে, প্রবৃত্তিবিজ্ঞানানি আলয়বিজ্ঞানজাতিলক্ষণাদন্যানি স্যুঃ।" ইত্যাদি ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। তত্রার্থশূন্যং বিজ্ঞানং যোগাচারাঃ সমাশ্রিতাঃ। তস্যাপ্যভাবমিচ্ছন্তি যে মাধ্যমিকবাদিনঃ ॥—মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিক, নিরালম্বনবাদ।১৪।

৩। রূপাদ্যায়তনাস্তিত্বং তদ্বিনেয়জনং প্রতি। অভিপ্রায়বশাদুক্তমুপপাদুকসত্ত্ববৎ ॥৮॥—"বিংশতিকাকারিকা"।

৪। দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগা। ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥ ভিন্নাপি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাঽদ্বয়লক্ষণা ॥— "বোধিচিত্তবিবরণ"।

দ্বন্দী হইয়া গৌতমসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন, ইহা তাঁহার অনেক বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় ; যথাস্থানে তাহা বলিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাস্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় ক্রমশঃ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া নানা মতভেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যুদয়ে বৌদ্ধমহাযানসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইলে পূর্ব্বোক্ত হীনযান বৌদ্ধসম্প্রদায় নানা স্থানে নানারূপে বিচার ও নিজমত প্রচার দ্বারা অনেক দিন যাবৎ সম্প্রদায় রক্ষা করিলেও ক্রমশঃ মহাযান-সম্প্রদায়ের পরিপোষক অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ, স্থিরমতি, ধর্ম্মকীর্ত্তি, শান্তরক্ষিত ও কমলশীল প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণের অসাধারণ পাণ্ডিত্যাদি প্রভাবে সময়ে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরই অত্যন্ত প্রচার ও প্রভাব বৃদ্ধি হয়। সর্ব্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। হীনযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থবিরবাদী সম্প্রদায়ের মতেরই এখন সংবাদ পাওয়া যায়। "সাংমিতীয়"সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের মতের মূলাদি জানিবার এখন উপায় দেখা যায় না। ঐ সম্প্রদায়ের অবলম্বিত ধর্ম্ম অনেক অংশে বৈদিক ধর্ম্মের তুল্য ছিল, এবং তাঁহারা আত্মারও অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা জানিতে পারা যায়। "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর যে, "সর্ব্বাভিসময়সূত্র" নামক বৌদ্ধগ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আত্মার অস্তিত্ব বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন, উহা ঐ "সাংমিতীয়"সম্প্রদায়ের অবলম্বিত কোন প্রাচীন গ্রন্থও হইতে পারে (তৃতীয় খণ্ড, ৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উদ্দ্যোতকর তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অন্ধকার পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যায় এবং পূর্ব্বে পরমাণুর স্বরূপ ব্যাখ্যায় বৈভাষিকসম্প্রদায়বিশেষের যে মত-বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন, উহারও মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি মত যে, গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পরেই প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং ন্যায়দর্শনেও পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলি পরেই সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, বেদান্তসূত্র, যোগসূত্র ও যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে যে বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ ও খণ্ডন হইয়াছে, উহা গৌতম বুদ্ধের বহু পূর্ব্বেই প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। পরন্তু দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্ বিষ্ণুর শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া মায়ামোহ, অসুরগণের প্রতি যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা বিষ্ণুপুরাণেও দেখিতে পাই। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের স্পষ্ট উপদেশ আছে[১]। পরন্তু বেদেও অনেক নাস্তিকমতের সূচনা আছে এবং গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বেও যে ভারতে বৌদ্ধমতের প্রকাশ ছিল, ইহাও আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি (তৃতীয় খণ্ড, ৫৪ ও ২২৩-২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে অপরের মত বলিয়াই যে নাস্তিকমতবিশেষের উল্লেখ আছে, ইহাও (চতুর্থ খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠায়) প্রদর্শন করিয়াছি। সুবালোপনিষদের ১১শ, ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ খণ্ডের শেষভাগে "ন সন্নাসন্ন সদসৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং ঋগ্‌বেদের নাসদীয় সূক্তে "নাসদাসীন্নো সদাসীৎ" (১০ম মঃ, ৮ম অঃ, ১১শ অঃ, ১২৯শ) এই সূক্ত অবলম্বনে উহার কল্পিত অপব্যাখ্যার দ্বারাও অনেক

১। বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ। বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্‌ বুধৈরেবমুদীরিতং ॥ জগদেতদনাধারং ভ্রান্তি-জ্ঞানার্থতৎপরং। রাগাদিদুষ্টমত্যর্থং ভ্রাম্যতে ভবসঙ্কটে ॥—বিষ্ণু পুরাণ, ৩য় অংশ, ১৮শ অঃ, ।১৬।১৭।

নাস্তিক নানারূপ শূন্যবাদের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাও মনে হয়। সুপ্রাচীন কালেও বেদবিরোধী নাস্তিকের অস্তিত্ব ছিল। মন্বাদি সংহিতাতেও তাহাদিগের উল্লেখ ও নিন্দা দেখা যায় এবং নাস্তিক-শাস্ত্র ও উহার পাঠেরও নিন্দা দেখা যায়। বিরোধী সম্প্রদায় যে অপর সম্প্রদায়ের প্রদর্শিত শাস্ত্র-প্রমাণের ব্যাখ্যান্তর করিয়াও নিজমত সমর্থন করিতেন এবং এখনও করিতেছেন, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অবিদিত নহে। পরন্তু এখানে ইহাও বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গোতম অবয়বিবিষয়ে অভিমানকে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়া, ঐ অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থনের জন্যই পূর্ব্বোক্ত যে সমস্ত সূত্র বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদই যে এই প্রকরণে পূর্ব্বপক্ষরূপে তাঁহার বুদ্ধিস্থ, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই। উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র কোন কারণে সেইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা তাহা যে বুঝা যায় না, ইহা পূর্ব্বে যথাস্থানে বলিয়াছি। মহর্ষি সুপ্রাচীন সর্ব্বাভাববাদেরই পূর্ব্বপক্ষরূপে সমর্থনপূর্ব্বক খণ্ডন করায় তদ্দ্বারা ফলতঃ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদেরও মূলোচ্ছেদ হইয়াছে, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত "বুদ্ধ্যা বিবেচনাত্তু ভাবানাং" ইত্যাদি (২৬শ) সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনের জন্য যে যুক্তি কথিত হইয়াছে, উহা লঙ্কাবতার-সূত্রে "বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা কথিত হইলেও তদ্দ্বারা ঐ সূত্রটী বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্যই কথিত এবং লঙ্কাবতারসূত্রের উক্ত শ্লোকানুসারেই পরে রচিত, ইহাও নির্দ্ধারণ করা যায় না। কারণ, ভাষ্যকারোক্ত সর্ব্বাভাববাদী আনুপলম্ভিকও নিজমত সমর্থনে প্রথমে উক্ত যুক্তি বলিতে পারেন। পরে বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্যও "লঙ্কাবতারসূত্রে" ঐ যুক্তি গৃহীত হইয়াছে, ইহাও ত বুঝা যাইতে পারে। তৎপূর্ব্বে যে, আর কেহই ঐরূপ যুক্তির উদ্ভাবন করিতে পারেন না, ইহার কি প্রমাণ আছে? আর পূর্ব্বোক্ত ন্যায়সূত্রে পাঠ আছে,—"বুদ্ধ্যা বিবেচনাত্তু ভাবানাং যাথাত্ম্যানুপলব্ধিঃ।" লঙ্কাবতারসূত্রে ঐ শ্লোকে পাঠ আছে,—"বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্য্যতে।" সুতরাং পরে কেহ যে ঐ শ্লোক হইতে "বুদ্ধ্যা" এই শব্দটী গ্রহণ করিয়া ঐ ভাবে ন্যায়দর্শনে ঐ সূত্রটী রচনা করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনারও কি কোন প্রমাণ থাকিতে পারে? বস্তুতঃ ঐ সমস্ত মতের মধ্যে কোন্ মত ও কোন্ যুক্তি সর্ব্বাগ্রে কাহার উদ্ভাবিত, কোন্ শব্দটী সর্ব্বাগ্রে কাহার প্রযুক্ত, ইহা এখন কোনরূপ বিচারের দ্বারাই নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। সুপ্রাচীন কাল হইতেই নানা মতের প্রকাশ ও ব্যাখ্যাদি হইয়াছে। কালবশে ঐ সমস্ত মতই নানা সম্প্রদায়ে নানা আকারে একরূপ ও বিভিন্নরূপ দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্রমশঃ শাখাভেদে কত প্রকার মতভেদের যে সৃষ্টি ও সংহার হইয়া গিয়াছে, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে জানিবার উপায়ই নাই। সুতরাং সমস্ত মতের পরিপূর্ণ প্রামাণিক ইতিহাস না থাকায় এখন ঐ সমস্ত বিষয়ে কাহারও কল্পনামাত্রমূলক কোন মন্তব্য গ্রহণ করা যায় না ॥৩৭॥

বাহ্যার্থভঙ্গ-নিরাকরণ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৪॥

ভাষ্য। "দোষনিমিত্তানাং তত্ত্ব-জ্ঞানাদহঙ্কার-নিবৃত্তি"রিত্যুক্তং। অথ কথং তত্ত্ব-জ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি ?

অনুবাদ। দোষনিমিত্ত-(শরীরাদি প্রমেয়)সমূহের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। (প্রশ্ন) কিরূপে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় ?

সূত্র। সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ ॥৩৮॥৪৪৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) সমাধিবিশেষের অভ্যাসবশতঃ (তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়)।

ভাষ্য। স তু প্রত্যাহৃতস্যেন্দ্রিয়েভ্যো মনসো ধারকেন প্রযত্নেন ধার্য্যমাণস্যাত্মনা সংযোগস্তত্ত্ববুভুৎসাবিশিষ্টঃ। সতি হি তস্মিন্নিন্দ্রিয়ার্থেষু বুদ্ধয়ো নোৎপদ্যন্তে। তদভ্যাসবশাত্তত্ত্ববুদ্ধিরুৎপদ্যতে।

অনুবাদ। সেই "সমাধিবিশেষ" কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে প্রত্যাহৃত (এবং) ধারক প্রযত্নের দ্বারা ধার্য্যমাণ অর্থাৎ হৃৎপুণ্ডরীকাদি কোন স্থানে স্থিরীকৃত মনের আত্মার সহিত তত্ত্বজিজ্ঞাসাবিশিষ্ট সংযোগ। সেই সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সমূহ বিষয়ে জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হয় না। সেই সমাধিবিশেষের অভ্যাসবশতঃ তত্ত্ব-বুদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার জন্মে।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই আহ্নিকের প্রথমোক্ত "তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি প্রকরণে" শেষোক্ত তৃতীয় সূত্রে যে, অবয়বিবিষয়ে অভিমানকে দোষনিমিত্ত বলিয়াছেন, তাহা পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণে বিরুদ্ধ মত খণ্ডন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছেন। অবয়বী ও অন্যান্য দোষনিমিত্ত পদার্থের সত্তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, মহর্ষি এই আহ্নিকের প্রথম সূত্রে যে তত্ত্বজ্ঞানকে অহঙ্কারের নিবর্ত্তক বলিয়া মুক্তির কারণরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, ঐ তত্ত্ব-জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয় ? শাস্ত্র দ্বারা তত্ত্ব-শ্রবণ করিয়া, পরে মহর্ষি-কথিত যুক্তিসমূহের দ্বারা মনন করিলেও ঐ মননরূপ যে, পরোক্ষতত্ত্ব-জ্ঞান, তাহা ত কাহারই অহঙ্কার নিবৃত্তি করে না। উহার দ্বারা কাহারই ত সেই সমস্ত তত্ত্বে দৃঢ় সংস্কার জন্মে না। মননের পরেও আবার পূর্ব্ববৎ সমস্ত মিথ্যা-জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সহস্র বার শ্রবণ ও মনন করিলেও দিঙ্‌মূঢ় ব্যক্তির দিগ্‌ভ্রম নিবৃত্ত হয় না, ইহা অনেকের পরীক্ষিত সত্য। তাই সাংখ্যসূত্রকারও সাংখ্যমতানুসারে বহু মননের উপদেশ করিয়াও বলিয়াছেন,—"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে" ১।৫৯)। সুতরাং তত্ত্ব বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান বা চরম তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ব্যতীত অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু ঐ তত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান কি উপায়ে উৎপন্ন হইবে ? উহার ত কোন উপায় নাই। সুতরাং উহা হইতেই পারে না। তাই মহর্ষি শেষে এখানে এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়া, প্রথমে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের সর্ব্বসম্মত উত্তর বলিয়াছেন,—"সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ"। ভাষ্যকার প্রভৃতিও

এখানে মহর্ষির প্রথমোক্ত "দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ" এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন প্রকাশপূর্ব্বক তদুত্তরে মহর্ষির এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষির এই সূত্রোক্ত সমাধিবিশেষ ও উহার অভ্যাসাদি যোগশাস্ত্রেই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, উহা যোগশাস্ত্রেরই প্রস্থান। উহা মহর্ষি গোতমের প্রকাশিত এই শাস্ত্রের প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতিপাদ্য নহে। কিন্তু শ্রবণ ও মননের পরে যোগশাস্ত্রানুসারে নিদিধ্যাসন যে, অবশ্য কর্ত্তব্য, চরম নিদিধ্যাসন সমাধিবিশেষের অভ্যাস ব্যতীত যে, তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইতেই পারে না, ইহা মহর্ষি গোতমেরও সম্মত, উহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। মহর্ষি এখানে এই প্রকরণের দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তের প্রকাশ ও পূর্ব্বপক্ষ নিরাসপূর্ব্বক সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল তাঁহার এই ন্যায়-শাস্ত্রোক্ত প্রমাণাদি পদার্থের পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তির চরম কারণ বলেন নাই।

ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "সমাধিবিশেষে"র সংক্ষেপে স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে প্রত্যাহৃত এবং ধারক প্রযত্নের দ্বারা ধার্য্যমাণ মনের আত্মার সহিত সংযোগই "সমাধিবিশেষ।" তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মনকে ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে প্রত্যাহার করিয়া হৃৎপুণ্ডরীকাদি কোন স্থানবিশেষে প্রযত্নবিশেষ দ্বারা ধারণ করিলে অর্থাৎ সেই স্থানে মনকে স্থির করিয়া রাখিলে তখন ঐ মন ও আত্মার যে বিশিষ্ট সংযোগ জন্মে, তাহাই সমাধিবিশেষ। যে প্রযত্নের দ্বারা ঐ ধারণ হয়, উহাকে ধারক প্রযত্ন বলে। উহা যোগাভ্যাসসাধ্য ও যোগী গুরুর নিকটে শিক্ষণীয়। সুষুপ্তিকালেও মন ও আত্মার ঐরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, কিন্তু তাহা ত সমাধি-বিশেষ নহে। তাই ভাষ্যকার পরে ঐ সংযোগকে "তত্ত্ববুভুৎসাবিশিষ্ট" বলিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসাবশতঃ যোগশাস্ত্রোক্ত সাধনপ্রযুক্ত মন ও আত্মার যে পূর্ব্বোক্তরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, তাহাকেই সূত্রোক্ত "সমাধিবিশেষ" বলিয়াছেন। সুষুপ্তিকালীন আত্মমনঃসংযোগ ঐরূপ নহে। কারণ, উহার মূলে তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও তৎপ্রযুক্ত কোন সাধন নাই। পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইলে তখন আর গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মে না। কারণ, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ ব্যতীত গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্তু সমাধিস্থ যোগী ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া স্থানবিশেষেই স্থির করিয়া রাখায় তাঁহার পক্ষে তখন আর ঘ্রাণাদি কোন ইন্দ্রিয়ের সহিতই মনের সংযোগ সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সমাধিবিশেষের অভ্যাসবশতঃই তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মে। তাৎপর্য্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রযত্নের উৎপাদনই তাহার অভ্যাস। দীর্ঘকাল সাদরে নিরন্তর সেই সমাধিবিশেষের অভ্যাস করিলেই তৎপ্রযুক্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মে। বস্তুতঃ কাহারও অল্পদিন অভ্যাসে অথবা মধ্যে ত্যাগ করিয়া অথবা শ্রদ্ধাশূন্য বা সন্দিগ্ধ হইয়া অভ্যাসে উহা দৃঢ়ভূমি হয় না। দীর্ঘকাল শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর অভ্যাস করিলেই ঐ অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়। যোগদর্শনেও ইহা কথিত হইয়াছে[১]। দৃঢ়ভূমি অভ্যাস ব্যতীতও উহা কার্য্যসাধক হয় না। মুদ্রিত তাৎপর্য্যটীকায় "সমাধিতত্ত্বাভ্যাসাৎ"—এইরূপ সূত্রপাঠের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু

১। স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ।১।১৪।

বাচস্পতি মিশ্র "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" "সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ" এইরূপই সূত্রপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যত্রও ঐরূপই সূত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে অনেক প্রকার সমাধি কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চরম নির্বিকল্পক সমাধিই এই সূত্রে "বিশেষ" শব্দের দ্বারা মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, বুঝা যায়। কারণ, উহাই চরম তত্ত্বসাক্ষাৎকারের চরম উপায়। উহার অভ্যাস ব্যতীত চরম তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মিতে পারে না। উহার জন্য প্রথমে অনেক যোগাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে ॥৩৮॥

ভাষ্য। যদুক্তং—"সতি হি তস্মিন্নিন্দ্রিয়ার্থেষু বুদ্ধয়ো নোৎপদ্যন্তে" ইত্যেতৎ—

সূত্র। নার্থবিশেষপ্রাবল্যাৎ ॥৩৯॥৪৪৯॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) যে উক্ত হইয়াছে—"সেই সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সমূহবিষয়ে জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হয় না"—ইহা নহে অর্থাৎ উহা বলা যায় না;—যেহেতু, অর্থবিশেষের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-বিষয়-বিশেষের প্রবলতা আছে।

ভাষ্য। অনিচ্ছতোঽপি বুদ্ধ্যুৎপত্তের্নৈতদ্যুক্তং। কস্মাৎ? অর্থবিশেষপ্রাবল্যাৎ। অবুভুৎসমানস্যাপি বুদ্ধ্যুৎপত্তির্দৃষ্টা, যথা স্তনয়িত্নুশব্দপ্রভৃতিষু। তত্র সমাধিবিশেষো নোপপদ্যতে।

অনুবাদ। জ্ঞানেচ্ছাশূন্য ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তি হওয়ায় ইহা যুক্ত নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু অর্থবিশেষের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বিশেষের প্রবলতা আছে। (তাৎপর্য্য) জ্ঞানেচ্ছাশূন্য ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্ট হয়, যেমন মেঘের শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে। তাহা হইলে সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, সমাধিবিশেষ হইতেই পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনেক বিষয়বিশেষের প্রবলতাবশতঃ তদ্বিষয়ে জ্ঞানেচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞান জন্মে। অতএব সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মে না, ইহা বলা যায় না। ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্রভাষ্যে ঐ কথা বলিয়া, পরে ঐ কথার উল্লেখপূর্ব্বক এই পূর্ব্বপক্ষসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "ইত্যেতৎ" এই বাক্যের সহিত সূত্রের প্রথমস্থ "নঞ্" শব্দের যোগই তাঁহার অভিপ্রেত। ভাষ্যকার "অনিচ্ছতোঽপি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে উহারই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাহার জ্ঞানেচ্ছা নাই, তাহারও বিষয়বিশেষে জ্ঞানোৎপত্তি দেখা যায়। যেমন সহসা মেঘের শব্দ হইলে ইচ্ছা না থাকিলেও লোকে উহা শ্রবণ করে। এইরূপ আরও অনেক "অর্থবিশেষ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বিষয় আছে, যদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষের ইচ্ছা না থাকিলেও প্রত্যক্ষ অনিবার্য্য। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না অর্থাৎ উহা নানাবিষয়-জ্ঞানের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া উৎপন্নই হইতে পারে না। গন্ধাদি পঞ্চ বিষয়কে মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বকথিত দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে "অর্থ" বলিয়াছেন। উহাকে "ইন্দ্রিয়ার্থ"ও বলা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ১৮০—৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উহার মধ্যে এমন অনেক অর্থবিশেষ আছে, যাহা পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইতে প্রবল। সুতরাং সমাধিস্থ বা সমাধির জন্য প্রযত্নবান্ ব্যক্তির ঐ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির ইচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞানোৎপত্তি অনিবার্য্য। সুতরাং উহা সমাধির অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক হওয়ায় উহা কখনও কাহারই হইতে পারে না। অতএব পূর্ব্বসূত্রে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের যে উপায় কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব বলিয়া অযুক্ত, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য ॥৩৯॥

সূত্র। ক্ষুদাদিভিঃ প্রবর্ত্তনাচ্চ ॥৪০॥৪৫০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ক্ষুধা প্রভৃতির দ্বারা (জ্ঞানের) প্রবর্ত্তন-(উৎপত্তি) বশতঃও (সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না)।

ভাষ্য। ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং শীতোষ্ণাভ্যাং ব্যাধিভিশ্চানিচ্ছতোঽপি বুদ্ধয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে। তস্মাদৈকাগ্র্যানুপপত্তিরিতি।

অনুবাদ। ক্ষুধা ও পিপাসাবশতঃ, শীত ও উষ্ণবশতঃ এবং নানা ব্যাধিবশতঃ জ্ঞানেচ্ছাশূন্য ব্যক্তিরও নানা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব একাগ্রতার উপপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে মহর্ষি আবার এই সূত্রের দ্বারা ইহাও বলিয়াছেন যে, ক্ষুধা প্রভৃতির দ্বারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানা জ্ঞানোৎপত্তি অনিবার্য্য বলিয়াও পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত আদি শব্দের দ্বারা পিপাসা এবং শীত উষ্ণ ও নানা ব্যাধি গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ক্ষুধাদিবশতঃ বিষয়বিশেষে ইচ্ছা না থাকিলেও যখন নানা জ্ঞান অবশ্যই জন্মে, সুতরাং চিত্তের একাগ্রতা কোনরূপেই সম্ভব নহে। চিত্তের একাগ্রতা বা বিষয়বিশেষে স্থিরতা সম্ভব না হইলে সবিকল্পক সমাধিও হইতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বিকল্পক সমাধির আশাই নাই। যোগদর্শনেও "ব্যাধিস্ত্যান" (১।৩০) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা যোগের অনেক অন্তরায় কথিত হইয়াছে এবং ঐ ব্যাধি প্রভৃতিকে "চিত্তবিক্ষেপ" বলা হইয়াছে। ফলকথা, ইচ্ছা না থাকিলেও নানা কারণবশতঃ নানাবিধ জ্ঞানোৎপত্তি অনিবার্য্য বলিয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইতেই পারে না। সুতরাং তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের কোন উপায় না থাকায় অহঙ্কারের নিবৃত্তি ও মোক্ষ অসম্ভব, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর মূল তাৎপর্য্য ॥৪০॥

ভাষ্য। অস্ত্বেতৎ সমাধিং বিহায় ব্যুত্থানং ব্যুত্থাননিমিত্তং সমাধি-প্রত্যনীকঞ্চ, সতি ত্বেতস্মিন্—

অনুবাদ। (উত্তর) সমাধি ত্যাগ করিয়া ব্যুত্থান এবং ব্যুত্থানের নিমিত্ত সমাধির "প্রত্যনীক" অর্থাৎ বিরোধী, ইহা থাকুক, কিন্তু ইহা থাকিলেও—

সূত্র। পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ ॥৪১॥৪৫১॥

অনুবাদ। (উত্তর) "পূর্ব্বকৃত" অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত প্রকৃষ্ট ধর্ম্মজন্য "ফলানুবন্ধ"-(যোগাভ্যাসসামর্থ্য)বশতঃ সেই সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হয়।

ভাষ্য। পূর্ব্বকৃতো জন্মান্তরোপচিতস্তত্ত্বজ্ঞানহেতুর্দ্ধর্ম্মপ্রবিবেকঃ। ফলানুবন্ধো যোগাভ্যাসসামর্থ্যং। নিষ্ফলে হ্যভ্যাসে নাভ্যাসমাদ্রিয়েরন্। দৃষ্টং হি লৌকিকেষু কর্ম্মস্বভ্যাসসামর্থ্যং।

অনুবাদ। "পূর্ব্বকৃত" বলিতে জন্মান্তরে সঞ্চিত, তত্ত্বজ্ঞানহেতু ধর্ম্মপ্রবিবেক অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সংস্কাররূপ ধর্ম্ম। "ফলানুবন্ধ" বলিতে যোগাভ্যাসে সামর্থ্য। [অর্থাৎ এই সূত্রে "পূর্ব্বকৃত ফলানুবন্ধ" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে,—জন্মান্তরসঞ্চিত প্রকৃষ্ট সংস্কারজন্য যোগাভ্যাসসামর্থ্য। অভ্যাস নিষ্ফলই হইলে অভ্যাসকে কেহই আদর করিত না। লৌকিক কর্ম্মসমূহেও অভ্যাসের সামর্থ্য দৃষ্টই হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, "পূর্ব্বকৃত ফলানুবন্ধ"বশতঃ সেই সমাধিবিশেষ জন্মে। বার্ত্তিককার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বজন্মে অভ্যস্ত যে সমাধিবিশেষ, তাহার ফল যে ধর্ম্ম, তজ্জন্য পুনর্ব্বার সমাধিবিশেষ জন্মে। তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বজন্মকৃত যে সমাধি, তাহার ফল যে সংস্কার, তাহার "অনুবন্ধ" অর্থাৎ স্থিরতাবশতঃ সমাধিবিশেষ জন্মে। মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের শেষেও শরীরসৃষ্টি পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম-ফলজন্য, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ" (২।৬০) এই সূত্র বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকার পূর্ব্বশরীরে কৃত কর্ম্মকে "পূর্ব্বকৃত" শব্দের দ্বারা এবং তজ্জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মকে "ফল" শব্দের দ্বারা এবং ঐ ফলের আত্মাতে অবস্থানই "অনুবন্ধ" শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে এখানেও মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বকৃত সমাধির ফল যে ধর্ম্মবিশেষ, তাহার অনুবন্ধ অর্থাৎ আত্মাতে অবস্থানবশতঃ ইহজন্মে সমাধিবিশেষ জন্মে—এইরূপ সরল ভাবে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করা যায়। বার্ত্তিককার ঐরূপ ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার সূত্রোক্ত "ফল" শব্দের দ্বারা সংস্কার এবং "অনুবন্ধ" শব্দের দ্বারা স্থিরতা বা স্থায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেষার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে

পূর্ব্বজন্মকৃত সমাধি ইহজন্মে না থাকিলেও তজ্জন্য সংস্কাররূপ যে ফল, তাহা ইহজন্মেও আত্মাতে অনুবদ্ধ থাকে। উহার স্থায়িত্ববশতঃ তজ্জন্য ইহজন্মে সমাধিবিশেষ জন্মে, ইহাই সূত্রার্থ। তদনুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়া, পরে তাঁহার নিজের বুদ্ধি অনুসারে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বকৃত যে ঈশ্বরের আরাধনারূপ কর্ম্ম, তাহার ফল যে ধর্ম্মবিশেষ, তাহার সম্বন্ধবিশেষ-জন্য ইহজন্মে সমাধিবিশেষ জন্মে। বৃত্তিকার তাঁহার নিজের এই ব্যাখ্যা সমর্থনের জন্য এখানে শেষে যোগদর্শনের "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" (২।৪৫) এবং "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" (১।২৯) এই সূত্রদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরপ্রণিধানবশতঃ বিষয়ের প্রতিকূল ভাবে চিত্তের স্থিতি এবং যোগের অন্তরায়ের অভাব হয়। সুতরাং সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত যোগসূত্রানুসারে বৃত্তিকারের এই সরল ব্যাখ্যা সুসংগত হয়, সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভাষ্যকার এখানে অন্য ভাবে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে সূত্রোক্ত "পূর্ব্বকৃত" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—জন্মান্তরে সঞ্চিত তত্ত্বজ্ঞানের হেতু ধর্ম্মপ্রবিবেক। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ "প্রবিবেক" শব্দের ব্যুৎপত্তিবিশেষের দ্বারা উহার অর্থ বলিয়াছেন—প্রকৃষ্ট। প্রকৃষ্ট ধর্ম্মই ধর্ম্মপ্রবিবেক। উহা আত্মধর্ম্ম সংস্কারবিশেষ[১]। উহা তত্ত্বজ্ঞানের হেতু। কারণ, মুমুক্ষুর প্রযত্নসমূহ মিলিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে না থাকায় তাহা তত্ত্বজ্ঞানের হেতু হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত "ফলানুবন্ধ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, যোগাভ্যাস-সামর্থ্য। তাহা হইলে ভাষ্যকারের ঐ ব্যাখ্যানুসারে তাঁহার মতে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, "পূর্ব্বকৃত" অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে সঞ্চিত যে প্রকৃষ্ট সংস্কাররূপ ধর্ম্ম, তজ্জন্য "ফলানুবন্ধ" অর্থাৎ যোগাভ্যাসসামর্থ্যবশতঃ সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, সমাধি ত্যাগ করিয়া ব্যুত্থান অর্থাৎ নানা প্রতিবন্ধকবশতঃ সমাধির অনুৎপত্তি বা ভঙ্গ অবশ্যই স্বীকার্য্য এবং ঐ ব্যুত্থানের কারণ সমাধিবিরোধী অনেক আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা থাকিলেও অধিকারিবিশেষের পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত সংস্কাররূপ ধর্ম্মবিশেষ-জনিত যোগাভ্যাস-সামর্থ্যবশতঃ সমাধিবিশেষ জন্মে। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির এই তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়া এই সিদ্ধান্ত-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত সংস্কার ও অদৃষ্টবিশেষের ফলে অনেক যোগীর তীব্র সংবেগ(বৈরাগ্য)বশতঃ ইহজন্মে শীঘ্রই যোগাভ্যাসে অসাধারণ সামর্থ্য জন্মে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের অতি শীঘ্রই সমাধিলাভ ও উহার ফল হইয়া থাকে। যোগদর্শনেও "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ" (১।২১) এই সূত্রের দ্বারা উহা কথিত হইয়াছে। সংবেগ বা বৈরাগ্যের মৃদুতা, মধ্যতা ও তীব্রতা যে, পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত সংস্কার ও অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্তই হইয়া থাকে, ইহা যোগভাষ্যের টীকায় ঐ স্থলে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও লিখিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অদৃশ্যমান সংস্কার কল্পনা কেন করিব? উহার প্রয়োজন কি? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, অভ্যাস নিষ্ফলই হইলে অভ্যাসকে কেহই আদর

১। প্রবিবিচ্যতে বিশিষ্যতেঽনেনেতি প্রবিবেকঃ। ধর্ম্মশ্চাসৌ প্রবিবেকশ্চেতি ধর্ম্মপ্রবিবেকঃ, প্রকৃষ্টঃ সংস্কারঃ, স তু আত্মধর্ম্ম ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

করিত না। লৌকিক কর্ম্মেও অভ্যাস-সামর্থ্য দেখা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, লৌকিক কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে যখন তাহাতেও ক্রমে সামর্থ্য জন্মে, এবং অধিকারিবিশেষের অধিকতর সামর্থ্য জন্মে, ইহা দেখা যাইতেছে, তখন অলৌকিক কর্ম্মও অভ্যাস করিতে করিতে দীর্ঘকালে তাহাতেও বিশেষ সামর্থ্য অবশ্যই জন্মিবে, সন্দেহ নাই। অভ্যাসের কোন ফল না থাকিলে অর্থাৎ উহা ক্রমশঃ উহাতে সামর্থ্য না জন্মাইলে কেহই উহা করিতে পারে না অর্থাৎ সকলেই উহা ত্যাগ করে। কিন্তু যখন সুচিরকাল হইতে বহু বহু যোগী সুকঠিন যোগাভ্যাসও করিতেছেন, তখন উহা নিষ্ফল নহে। উহা ক্রমশঃ ঐ কার্য্যে সামর্থ্য জন্মায়। তাহার ফলে নির্ব্বিকল্পক সমাধি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু যোগাভ্যাসে ঐ যে সামর্থ্য, তাহা পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারবিশেষের সাহায্যেই জন্মিয়া থাকে। এক জন্মের সাধনায় উহা কাহারই হয় না। অনেক জন্মের বহু বহু অস্থায়ী প্রযত্নবিশেষ মিলিত হইয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে থাকে না। সুতরাং উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মাইতেও পারে না। কিন্তু তজ্জনিত স্থায়ী অনেক সংস্কার-বিশেষ কল্পনা করিলে ঐ সমস্ত সংস্কার কোন জন্মে মিলিত হইয়া অধিকারিবিশেষের তীব্র বৈরাগ্য ও সমাধি-বিশেষের অভ্যাসে অসাধারণ সামর্থ্য জন্মাইয়া তাঁহার তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের সম্পাদক হয়। সুতরাং ঐ সংস্কার অবশ্য স্বীকার্য্য। উহা আত্মগত প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম ॥৪১॥

ভাষ্য। প্রত্যনীকপরিহারার্থঞ্চ—

অনুবাদ। "প্রত্যনীক" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষ-লাভের বিরোধী বা অন্তরায়ের পরিহারের উদ্দেশ্যেও—

সূত্র। অরণ্যগুহাপুলিনাদিষু যোগাভ্যাসোপদেশঃ ॥ ॥৪২॥৪৫২॥

অনুবাদ। অরণ্য, গুহা ও পুলিনাদি স্থানে যোগাভ্যাসের উপদেশ হইয়াছে।

ভাষ্য। যোগাভ্যাসজনিতো ধর্ম্মো জন্মান্তরেঽপ্যনুবর্ত্ততে। প্রচয়-কাষ্ঠাগতে[১] তত্ত্ব-জ্ঞানহেতৌ ধর্ম্মে প্রকৃষ্টায়াং সমাধিভাবনায়াং তত্ত্ব-জ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি। দৃষ্টশ্চ সমাধিনাঽর্থবিশেষ-প্রাবল্যাভিভবঃ,—"নাহমেতদশ্রৌষং নাহমেতদজ্ঞাসিষমন্যত্র মে মনোঽভূ"দিত্যাহ লৌকিক ইতি।

অনুবাদ। যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্ম জন্মান্তরেও অনুবৃত্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের

১। প্রচয়কাষ্ঠা প্রচয়াবধির্যতঃ পরমপরঃ প্রচয়ো নাস্তি। তৎসহকারিশালিতয়া প্রবৃষ্টায়াং সমাধিভাবনায়াং, সমিধপ্রযত্নঃ সমাধিভাবনা তস্যামিত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

হেতু ধর্ম্ম "প্রচয়কাষ্ঠা" অর্থাৎ যাহার পর আর "প্রচয়" বা বৃদ্ধি নাই, সেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে "সমাধিভাবনা" (সমাধিবিষয়ক প্রযত্ন) প্রকৃষ্ট হওয়ায় তত্ত্ব-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। "সমাধি" অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতাকর্ত্তৃক অর্থবিশেষের প্রাবল্যের অভিভব দৃষ্টও হয়। (কারণ) "আমি ইহা শুনি নাই, আমি ইহা জানি নাই, আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল," ইহা লৌকিক ব্যক্তি বলে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি পরে আবার এই সূত্রের দ্বারা আরও বলিয়াছেন যে, সমাধির অন্তরায় পরিহারের জন্য শাস্ত্রে অরণ্য, পর্ব্বত-গুহা ও নদীপুলিনাদি নির্জ্জন ও নির্ব্বাধ স্থানে যোগাভ্যাসের উপদেশ হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থানে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে স্থানের গুণে অনেক অন্তরায় ঘটে না। সুতরাং চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হইতে পারে। ভাষ্যকার এই সরলার্থ সূত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক বলিয়া তাহা করেন নাই। কিন্তু মহর্ষির পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তরের সমর্থনের জন্য তাঁহার সযুক্তিক সিদ্ধান্ত সুব্যক্ত করিতে পরে এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, যোগাভ্যাসজনিত যে ধর্ম্ম, তাহা জন্মান্তরেও অনুবৃত্ত হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মকৃত যোগাভ্যাসজনিত যে ধর্ম্ম, তাহা পরজন্মেও থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের হেতু ঐ ধর্ম্ম ক্রমশঃ বৃদ্ধির চরম সীমা প্রাপ্ত হইলে তখন উহার সাহায্যে কোন জন্মে সমাধিবিষয়ক ভাবনা অর্থাৎ প্রযত্ন প্রকৃষ্ট হয়। তাহার ফলে সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হওয়ায় তখন তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃ সহসা নানা জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া, উহা সমাধিবিশেষের অন্তরায়ও হইতে পারে না। কারণ, বিষয়বিশেষে একাগ্রতা-রূপ যে সমাধি, তাহা উৎপন্ন হইলে অর্থবিশেষের প্রাবল্যকে অভিভূত করে। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে লৌকিক বিষয়েও ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছেন যে, বিষয়বিশেষে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধিকর্ত্তৃক অর্থবিশেষের প্রাবল্যের যে অভিভব হয়, ইহা দৃষ্টও হয়। কারণ, কোন লৌকিক ব্যক্তি কোন বিষয়বিশেষে একাগ্রচিত্ত হইয়া যখন উহারই চিন্তা করে, তখন অপরের কোন কথা শুনিতে পায় না। প্রবল অন্য বিষয়েও তাহার তখন কোন জ্ঞান জন্মে না। পরে তাহাকে উত্তর না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়া থাকে যে, "আমি ত ইহা কিছু শুনি নাই, ইহা কিছু জানি নাই, আমার মন অন্যত্র ছিল।" তাহা হইলে বিষয়বিশেষে তাহার চিত্তের একাগ্রতা যে, তৎকালে অন্য বিষয়ের প্রবলতাকে অভিভূত করিয়াছিল, অর্থাৎ অন্য বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে যোগীরও বিষয়বিশেষে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি জন্মিলে তখন উহাও অন্য বিষয়ের প্রাবল্যকে অভিভূত করে, অর্থাৎ অন্য বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং কারণ সত্ত্বেও বিষয়ান্তরে জ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহাও স্বীকার্য্য। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা স্থানবিশেষে চিত্তের একাগ্রতা যে সম্ভব, ইহাই প্রকাশ করায় ভাষ্যকার এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঐ যুক্তিরও সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ-

বাদী যে অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃ নানাবিধ জ্ঞানের উৎপত্তি অনিবার্য্য বলিয়া কাহারও সমাধি-বিশেষ জন্মিতে পারে না বলিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। কারণ, পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মকৃত যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্মের সাহায্যে এবং স্থানবিশেষের সাহায্যে যোগীর অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি অবশ্যই জন্মে, এবং উহা সমস্ত বিষয়বিশেষের প্রাবল্যকে অভিভূত করিয়া তদ্বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হওয়ায় তখন সেই সমস্ত বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মে না। অতএব ক্রমে নির্ব্বিকল্পক সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হওয়ায় তখন তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। ঐ তত্ত্বসাক্ষাৎকার-জন্য যে সংস্কার, উহারই নাম "তত্ত্বজ্ঞানবিবৃদ্ধি"। উহাই অনাদিকালের মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারকে বিনষ্ট করে। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন, "তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী" (১।৫০)। সংসারনিদান অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইলে আর সংসার হইতে পারে না। সুতরাং মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী, উহা অসম্ভব নহে, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্য্য।

মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা যে দেশবিশেষে যোগাভ্যাসের উপদেশ বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা যোগাভ্যাসে ঐ সমস্ত দেশনিয়ম অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থানেই যে যোগাভ্যাস কর্ত্তব্য, অন্যত্র কর্ত্তব্য নহে, ইহা বিবক্ষিত নহে। কিন্তু যে স্থানে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই উহা কর্ত্তব্য, ইহাই বিবক্ষিত। কারণ, যোগাভ্যাসের দিগ্‌দেশকালনিয়ম নাই। যে দিকে, যে স্থানে ও যে কালে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই উহা কর্ত্তব্য। কারণ, একাগ্রতা লাভের সাহায্যের জন্যই শাস্ত্রে যোগা-ভ্যাসের দেশাদির উল্লেখ হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের "যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ" (৪।১।১১) এই সূত্রের দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই সুব্যক্ত করা হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রকারও বলিয়াছেন,—"ন স্থান-নিয়মশ্চিত্তপ্রসাদাৎ" (৬।৩১)। অবশ্য উপনিষদেও "সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর, ২।১০) শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যোগাভ্যাসের স্থানবিশেষের উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারাও যে স্থানে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই যোগাভ্যাস কর্ত্তব্য, ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। উক্ত বেদান্তসূত্রানুসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও উঁহার ভাষ্যে উক্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া উক্তরূপই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। "ন্যায়বার্ত্তিক" ও "তাৎপর্য্যটীকা"য় এই সূত্রের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। মনে হয়, এই জন্যই কেহ কেহ ইহা ভাষ্যকারেরই উক্তি বলিতেন, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথায় পাওয়া যায়। কিন্তু বৃত্তিকার ইহা মহর্ষির সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" ও "ন্যায়সূত্রোদ্ধারে"ও ইহা সূত্রমধ্যে গৃহীত হইয়াছে ॥৪২॥

ভাষ্য। যদ্যর্থবিশেষপ্রাবল্যাদনিচ্ছতোঽপি বুদ্ধ্যুৎপত্তিরনুজ্ঞায়তে—

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) যদি অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃ জ্ঞানেচ্ছাশূন্য ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার কর, (তাহা হইলে)—

সূত্র। অপবর্গেঽপ্যেবং প্রসঙ্গঃ ॥৪৩॥৪৫৩॥

অনুবাদ। মুক্তি হইলেও এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি হয়।

ভাষ্য। মুক্তস্যাপি বাহ্যার্থ-সামর্থ্যাদ্‌বুদ্ধয় উৎপদ্যেরন্নিতি।

অনুবাদ। মুক্ত পুরুষেরও বাহ্য পদার্থের সামর্থ্যবশতঃ জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হউক ?

টিপ্পনী। জ্ঞানেচ্ছা না থাকিলেও অর্থবিশেষের প্রবলতাবশতঃ সেই অর্থবিশেষে জ্ঞান জন্মে, ইহা স্বীকার করিয়াই মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিয়াছেন। তাই পূর্ব্বপক্ষবাদী অথবা অন্য কোন উদাসীন ব্যক্তি এখানে অপত্তি করিতে পারেন যে, তাহা হইলে মুক্তি হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হউক ? অর্থাৎ যদি জ্ঞানের ইচ্ছা না থাকিলেও কোন কোন বাহ্য বিষয়ের প্রবলতাবশতঃ সেই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান জন্মে,ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেরও সময়বিশেষে সেই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হউক ? তাৎপর্য্য এই যে, সহসা মেঘগর্জ্জন হইলে সেই শব্দবিশেষের প্রবলতা-বশতঃ মুক্ত পুরুষও উহা শ্রবণ করিবেন না কেন ? এইরূপ অন্যান্য বাহ্য বিষয়-বিশেষেও অন্যের ন্যায় তাঁহারও জ্ঞান জন্মিবে না কেন ? মহর্ষি এই পূর্ব্বপক্ষসূত্রের দ্বারা উক্ত আপত্তি প্রকাশ করিয়া, পরবর্ত্তী দুই সূত্রের দ্বারা ভ্রান্তিমূলক উক্ত আপত্তিরও এখানে খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্য-কার উক্ত আপত্তির হেতু প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন,—"বাহ্যার্থসামর্থ্যাৎ।" অর্থাৎ আপত্তি-কারীর কথা এই যে, বাহ্য পদার্থের তদ্বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তিতে সামর্থ্য আছে। অর্থাৎ বাহ্য পদার্থবিশেষের এমনই মহিমা আছে, যে জন্য উহা ইন্দ্রিয়াদিকে অপেক্ষা না করিয়াও তদ্বিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ। এইরূপ ভ্রমমূলক আপত্তিই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন ॥৪৩॥

সূত্র। ন নিষ্পন্নাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ ॥৪৪॥৪৫৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি হয় না। কারণ, "নিষ্পন্নে" অর্থাৎ কর্ম্মবশতঃ উৎপন্ন শরীরেই (জ্ঞানোৎপত্তির) অবশ্য-ম্ভাবিতা আছে।

ভাষ্য। কর্ম্মবশান্নিষ্পন্নে শরীরে চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ে নিমিত্তভাবা-দবশ্যম্ভাবী বুদ্ধীনামুৎপাদঃ। ন চ প্রবলোঽপি সন্ বাহ্যোঽর্থ আত্মনো বুদ্ধ্যুৎপাদে সমর্থো ভবতি। তস্যেন্দ্রিয়েণ সংযোগাদ্‌বুদ্ধ্যুৎপাদে সামর্থ্যং দৃষ্টমিতি।

অনুবাদ। কর্ম্মবশতঃ উৎপন্ন চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয় শরীরে নিমিত্তের সত্তাবশতঃ জ্ঞানসমূহের উৎপাদ অবশ্যম্ভাবী। [অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত শরীর থাকিলেই জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত থাকায় অবশ্য জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার

করি] কিন্তু (শরীর না থাকিলে) বাহ্য পদার্থ প্রবল হইলেও আত্মার জ্ঞানোৎপত্তিতে সমর্থ হয় না। (কারণ) সেই বাহ্য বিষয়ের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগপ্রযুক্তই জ্ঞানোৎপত্তিতে সামর্থ্য দৃষ্ট হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তিমূলক আপত্তির খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, উক্ত আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ যে শরীর "নিষ্পন্ন" বা উৎপন্ন হয়, উহা থাকিলেই সেই শরীরাবচ্ছেদে জ্ঞানোৎপত্তির অবশ্যম্ভাবিতা আছে। অর্থাৎ শরীর থাকিলেই জ্ঞানের নিমিত্ত থাকায় বাহ্য বিষয়-বিশেষের প্রবলতাবশতঃ তদ্বিষয়ে জ্ঞানেচ্ছা না থাকিলেও কোন সময়ে অবশ্য জ্ঞান জন্মে, ইহাই স্বীকার করিয়াছি। শরীরাদি কারণ না থাকিলেও কেবল বাহ্য বিষয়বিশেষের মহিমায় তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, ইহা ত স্বীকার করি নাই। কারণ, তাহা অসম্ভব। সমস্ত কারণ না থাকিলে কোন কার্য্যেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্রোক্ত "নিষ্পন্ন" শব্দের দ্বারা প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ নিষ্পন্ন শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। শরীর থাকিলেই তাহাতে ইন্দ্রিয় থাকে। কারণ, শরীর—চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয়। মহর্ষিও "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরং" (১।১।১১) এই সূত্রের দ্বারা শরীরের উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। তদনুসারেই ভাষ্যকার পরে "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ে" এই বাক্যের দ্বারা শরীরের ঐ স্বরূপের উল্লেখ করিয়া, শরীর থাকিলেই যে, বাহ্যবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিমিত্ত-কারণ থাকে, নচেৎ উহা থাকে না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তাই পরেই বলিয়াছেন, "নিমিত্তভাবাৎ"। ভাষ্যকার পরে উক্ত যুক্তি সুব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, বাহ্য বিষয় প্রবল হইলেও কেবল উহাই তদ্বিষয়ে আত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হয় না। কারণ, ইন্দ্রিয়ের সহিত উহার সংযোগ হইলেই তৎপ্রযুক্ত উহা প্রত্যক্ষজ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হয়, ইহাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়াশ্রয় শরীর না থাকিলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ বা সম্বন্ধবিশেষ সম্ভব না হওয়ায় কারণের অভাবে কোন বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্তলক্ষণাক্রান্ত শরীর থাকিলেই তদাশ্রিত কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে ইচ্ছা না থাকিলেও সময়বিশেষে প্রত্যক্ষ অবশ্যম্ভাবী, ইহা স্বীকার্য্য। সূত্রে সপ্তমীতৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকারের অভিমত। "নিষ্পন্ন" অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মনিষ্পন্ন শরীরে আত্মার বাহ্য বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানোৎপত্তির অবশ্যম্ভাবিত্বই ভাষ্যকারের মতে সূত্রকার মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণের মতে এই সূত্রে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই মহর্ষির অভিমত। বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "নিষ্পন্ন" অর্থাৎ শরীরাদির জ্ঞানাদি কার্য্যে "অবশ্যম্ভাবিত্ব" অর্থাৎ কারণত্ব আছে। অর্থাৎ শরীরাদি না থাকিলে আত্মাতে জ্ঞানাদি কার্য্য জন্মিতে পারে না। "অবশ্যম্ভাবিত্ব" শব্দের দ্বারা জ্ঞানাদি কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে অবশ্যবিদ্যমানত্ব বুঝিলে উহার দ্বারা কারণত্বই বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যাইতে পারে এবং সূত্রে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই যে, প্রথমে বুদ্ধির বিষয় হয়, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু সূত্রোক্ত "অবশ্যম্ভাবিত্ব" শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলে বৃত্তিকারের ঐ ব্যাখ্যা সংগত হয় না। মনে হয়, ভাষ্যকার ঐ প্রসিদ্ধ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন ॥৪৪॥

সূত্র। তদভাবশ্চাপবর্গে ॥ ৪৫॥৪৫৫ ॥

অনুবাদ। কিন্তু, অপবর্গে এই শরীরাদির অভাব (অর্থাৎ মুক্তি হইলে তখন শরীরাদি নিমিত্ত-কারণ না থাকায় জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না)।

ভাষ্য। তস্য বুদ্ধিনিমিত্তাশ্রয়স্য শরীরেন্দ্রিয়স্য ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবাদভাবোঽপবর্গে। তত্র যদুক্ত“মপবর্গেঽপ্যেবং প্রসঙ্গ” ইতি তদযুক্তং। **তস্মাৎ সর্ব্বদুঃখবিমোক্ষোঽপবর্গঃ।** যস্মাৎ সর্ব্বদুঃখবীজং সর্ব্বদুঃখায়তনঞ্চাপবর্গে বিচ্ছিদ্যতে, তস্মাৎ সর্ব্বেণ দুঃখেন বিমুক্তিরপবর্গঃ। ন নির্ব্বীজং নিরায়তনঞ্চ দুঃখমুৎপদ্যতে ইতি।

অনুবাদ। অপবর্গে অর্থাৎ মুক্তিকালে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অভাব প্রযুক্ত জ্ঞানের নিমিত্ত ও আশ্রয় সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অভাব। তাহা হইলে যে উক্ত হইয়াছে, “অপবর্গেও এইরূপ আপত্তি হয়”, তাহা অযুক্ত। অতএব **সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ**। (তাৎপর্য্য) যেহেতু অপবর্গ হইলে সমস্ত দুঃখের বীজ (ধর্ম্মাধর্ম্ম) এবং সমস্ত দুঃখের আয়তন (শরীর) বিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ একেবারে চিরকালের জন্য উচ্ছিন্ন হয়, অতএব সমস্ত দুঃখ কর্ত্তৃক বিমুক্তি অপবর্গ। (কারণ) নির্ব্বীজ ও নিরায়তন দুঃখ উৎপন্ন হয় না। [অর্থাৎ দুঃখের বীজ ধর্ম্মাধর্ম্ম ও দুঃখের আয়তন শরীর না থাকিলে কখনই কোনরূপ দুঃখ জন্মিতে পারে না]।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে যাহা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা ঐ আপত্তির খণ্ডন হইবে কেন ? ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিবার জন্যই মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, মুক্তি হইলে শরীরাদির অভাব হয়। অর্থাৎ তখন হইতে আর কখনও মুক্ত পুরুষের শরীর পরিগ্রহ না হওয়ায় নিমিত্ত-কারণের অভাবে, তাঁহার জ্ঞানোৎপত্তি হইতেই পারে না। জন্য জ্ঞানমাত্রেই শরীর অন্যতম নিমিত্ত-কারণ। কারণ, শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানে ইন্দ্রিয় অসাধারণ নিমিত্তকারণ। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত আপত্তিকারীর পক্ষে বাহ্যবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানই আপত্তির বিষয়রূপে গ্রহণ করায় এখানে সূত্রোক্ত “তৎ” শব্দের দ্বারা শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়কেও গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ শরীর ও ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিমিত্ত-কারণরূপ আশ্রয় বলিয়াছেন। “আশ্রয়” বলিতে এখানে সহায়। শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপ সহায়ের সাহায্যেই আত্মাতে প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। সুতরাং আত্মা ঐ জ্ঞানের আধাররূপ আশ্রয় হইলেও শরীর এবং ইন্দ্রিয়কে উহার সহায়রূপ আশ্রয় বলা যায়। ভাষ্যকার পূর্ব্বেও অনেক স্থানে সহায় বা উপকারক অর্থে “আশ্রয়” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরও সেখানে ঐরূপ ব্যাখ্যা

করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অবশ্য শরীরের অভাব বলিলেই ইন্দ্রিয়ের অভাবও বুঝা যায়। কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ শরীরাশ্রিত। শরীর না থাকিলে ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না। তাই ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্রে "নিষ্পন্ন" শব্দের দ্বারা কেবল শরীরকেই গ্রহণ করিয়া, উহাকে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, ইহাও বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে মহর্ষি, সূত্রে "তদভাব" শব্দের দ্বারা মুক্তিকালে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে প্রয়োজকের উল্লেখ করায় ভাষ্যকার "তৎ" শব্দের দ্বারা শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়কেও গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, শরীরাভাবপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়াভাবই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে সাক্ষাৎ প্রয়োজক। মহর্ষি সাক্ষাৎ প্রয়োজকের উল্লেখ না করিয়া পরম্পরায় প্রয়োজকের উল্লেখ করিলে তাঁহার বক্তব্যের ন্যূনতা হয়। ভাষ্যে "শরীরেন্দ্রিয়স্য" এই স্থলে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসই ভাষ্যকারের অভিমত। মুক্তি হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয় কেন থাকে না ? অর্থাৎ চিরকালের জন্য উহার অত্যন্তাভাবের প্রয়োজক কি ? তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবাৎ।" অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মজন্য যে ধর্ম্মাধর্ম্ম শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উৎপাদক, তাহা মুক্তি হইলে থাকে না, আর কখনও উহা উৎপন্নও হয় না। সুতরাং ঐ নিমিত্ত-কারণের অভাবে মুক্ত পুরুষের কখনও শরীর ও ইন্দ্রিয় জন্মে না। অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবই তখন মুক্ত পুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অভাবের প্রয়োজক। "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য এই সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্মাভাব গ্রহণ করিয়াছেন। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত "অপবর্গেঽপ্যেবংপ্রসঙ্গঃ" এই সূত্রোক্ত আপত্তি অযুক্ত। ভাষ্যকার পরে এখানে উহা বলিয়া মহর্ষির মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

মহর্ষি যে যুক্তি অনুসারে প্রথম অধ্যায়ে "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" (১।২২) এই সূত্রের দ্বারা মুক্তির স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহা এখানে এই সূত্রের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যকার তাহা সুব্যক্ত করিতে পরে এখানে বলিয়াছেন যে, অতএব সর্ব্বদুঃখবিমুক্তি অপবর্গ। অর্থাৎ সর্ব্বদুঃখের বীজ ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং সর্ব্বদুঃখের আয়তন শরীর যখন মুক্তি হইলে একেবারে উচ্ছিন্ন হয়,—কারণ, তত্ত্বসাক্ষাৎকার ও ভোগের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় এবং আর কখনও উহার উৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকায় মুক্ত পুরুষের আর কখনই শরীরপরিগ্রহ হইতেই পারে না,— তখন তাঁহার সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অবশ্যই হইবে। কারণ, বীজ ও আয়তন ব্যতীত দুঃখের উৎপত্তি হইতে পারে না।

এখানে মহর্ষি গোতমের এই সূত্রের দ্বারা ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে মুক্তি হইলে যে, শরীরাদির অভাবে কোন জ্ঞানই থাকে না, ইহা মহর্ষি গোতমের মত বলিয়া অবশ্য বুঝা যায়। কিন্তু যাঁহারা মহর্ষি গোতমের মতেও মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতি সমর্থন করেন, তাঁহারা মহর্ষির এই সূত্রকে উহার বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না। কারণ, তাঁহারা বলেন যে, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা মুক্ত পুরুষের শরীরাদি না থাকায় বাহ্য পদার্থবিষয়ক জ্ঞানের আপত্তিই খণ্ডন করিয়াছেন। আত্মাতে যে নিত্যসুখ চিরবিদ্যমান আছে, সংসারকালে প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহার অনুভূতি হয় না। কিন্তু মুক্তিকালে প্রতিবন্ধক না থাকায় উহার অনুভূতি হইয়া থাকে। তাহাতে তখন শরীরাদি অনাবশ্যক। মহর্ষি পূর্ব্বে এবং এখানেও মুক্তিতে ঐ নিত্যসুখের

অনুভূতির নিষেধ না করায় উহা তাঁহার-অসম্মত বলিয়া বুঝিবার কোন কারণ নাই। উক্ত মতের সমর্থক শ্রীবেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ "ন্যায়পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে তাঁহার নিজ মত সমর্থন করিতে শেষে লিখিয়াছেন,—"এতেন 'তস্মাৎ সর্ব্বদুঃখবিমোক্ষোঽপবর্গ' ইতি চতুর্থাধ্যায়বাক্যমপি নির্ব্যূঢ়ং, তত্রাপ্যানন্দনিষেধাভাবাৎ।" (কাশী চৌখাম্বা সিরিজ, ১৭ পৃষ্ঠা)। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে মুক্ত পুরুষের নিত্যানন্দানুভূতির নিষেধ না করিলেও প্রথম অধ্যায়ে যে বিশেষ বিচার-পূর্ব্বক উহার খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্যক। মহামনীষী বেঙ্কটনাথ যে, তাহা দেখেন নাই, ইহা বলা যায় না। সুতরাং তিনি যে ঐ স্থলে পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যকারের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন, ইহা মনে হয় না। উক্ত স্থলে "তদভাবশ্চাপবর্গে ইতি চতুর্থাধ্যায়সূত্রমপি নির্ব্যূঢ়ং" ইহাই প্রকৃত পাঠ, মুদ্রিত ঐ পাঠ বিকৃত, ইহাই মনে হয়। গৌতম মতে মুক্তিতে নিত্যসুখানুভূতি হয় কি না, এ বিষয়ে চতুর্থ খণ্ডে (৩৪২—৫৫ পৃষ্ঠায়) আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, মহর্ষি গোতম এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর আপত্তি অনুসারেই উহার খণ্ডন করিতে এই সূত্রে "অপবর্গ" শব্দের দ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তিকেই গ্রহণ করিয়া, তাহাতেই শরীরাদির অভাব বলিয়াছেন। তদ্দ্বারা জীবন্মুক্তি যে, তাঁহার সম্মত নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, তিনি ন্যায়দর্শনের "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা জীবন্মুক্তিও সূচনা করিয়াছেন। উহা বেদাদি শাস্ত্রসিদ্ধ। সুতরাং তদ্বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না। তবে জীবন্মুক্ত পুরুষের অবিদ্যার লেশ থাকে কি না, এ বিষয়ে বিবাদ আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে উহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, তত্ত্বসাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যা বাধিত হইলেও সংস্কারবশতঃ কিছুকাল অর্থাৎ শরীরস্থিতি পর্য্যন্ত উহা অনুবর্ত্তন করে[১]। সেখানে "রত্নপ্রভা"টীকাকার উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান অবিদ্যার আবরণশক্তিনামক অংশকেই নষ্ট করে। কিন্তু তখন অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি নামক অংশ থাকে। অবিদ্যার ঐ বিক্ষেপক অংশ বা লেশই অবিদ্যার লেশ। শঙ্করাচার্য্যের মতসমর্থক চিৎসুখ মুনিও "তত্ত্ব-প্রদীপিকা"র সর্ব্বশেষে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক জীবন্মুক্তির সমর্থন করিতে জীবন্মুক্তের যে অবিদ্যার লেশ থাকে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার গুরু জ্ঞান-সিদ্ধিকার "ন্যায়সুধা"গ্রন্থে এক অবিদ্যারই নানা আকার বর্ণন করিয়া, তন্মধ্যে আকারবিশেষকেই অবিদ্যার লেশ বলিয়াছেন। চিৎসুখ মুনি শেষে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া-নিবৃত্তিঃ", এই শ্রুতিবাক্যে "ভূয়স্" শব্দ ও "অন্ত" শব্দদ্বারা নির্ব্বাণমুক্তিকালে পুনর্ব্বার অবিদ্যার নিবৃত্তি কথিত হওয়ায় উহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্তের যে প্রথমে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না, অবিদ্যার লেশ বা কোন আকার থাকে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষু উহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং পূর্ব্বে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে প্রারব্ধ কর্ম্ম যে, ভোগমাত্রনাশ্য,—জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগেরও প্রারব্ধ কর্ম্ম

১। বাধিতমপি মিথ্যাজ্ঞানং দ্বিচন্দ্রাদিজ্ঞানবৎ সংস্কারবশাৎ কঞ্চিৎ কালমনুবর্ত্তত এব।—শারীরক ভাষ্য।৪।১।১৫।

ভোগের জন্যই শরীরাদি থাকে, এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত শ্রৌত সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে (তৃতীয় স্কন্ধ, ২৮শ অঃ, ৩৭ ৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের "কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসাঃ" ইত্যাদি (১৮শ) শ্লোক এবং তৃতীয় স্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের "যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ" ইত্যাদি (ষষ্ঠ) শ্লোকের তৃতীয় পাদে "শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" এই বাক্যের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন যে, ভগবদ্ভক্তিও প্রারব্ধ কর্ম্ম নষ্ট করে। কারণ, উক্ত "শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" এই বাক্যের দ্বারা ভগবদ্-ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালও তখন যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা লাভ করে, ইহা কথিত হইয়াছে। "ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু" গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে,[১] চণ্ডালাদির দুর্জ্জাতি অর্থাৎ নীচ-জাতিই তাহাদিগের যাগানুষ্ঠানে অযোগ্যতার কারণ। ঐ নীচজাতির জনক যে পাপ, তাহা তাহা-দিগের প্রারব্ধ কর্ম্মই। উহা বিনষ্ট না হইলে তাহাদিগের ঐ নীচ জাতির বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতাও হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত বাক্যে ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালের যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা কথিত হওয়ায় ভগবদ্ভক্তি, তাহাদিগের নীচজাতিজনক প্রারব্ধ কর্ম্মও বিনষ্ট করে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উক্ত মতে "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি শাস্ত্রবিরোধ হয় কি না, ইহা বিচার্য্য। শ্রীভাষ্যে (৪।১।১৩) রামানুজ উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া বিষয়ভেদ সমর্থনপূর্ব্বক বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষেই উক্ত বচন কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত বচনের প্রামাণ্য তাঁহাদিগেরও সম্মত, ইহা স্বীকার্য্য। অনেক অনুসন্ধান করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত বচনটী দেখিতে পাইয়াছি[২]। কিন্তু উক্ত বচনের শেষোক্ত বচনে "কায়ব্যূহেন শুধ্যতি" এই কথা কেন বলা হইয়াছে, তাহাও বিচার করা আবশ্যক। তত্ত্ব-জ্ঞানী জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই কায়ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া শীঘ্র সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করেন, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। কায়ব্যূহ নির্ম্মাণে সকলের সামর্থ্যও নাই এবং ভোগ ব্যতীতও প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে কায়ব্যূহ নির্ম্মাণের প্রয়োজনও নাই। যোগী ও জ্ঞানীদিগের পক্ষেই ভোগমাত্রনাশ্য প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ের জন্য কায়ব্যূহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে উহা অনাবশ্যক। কারণ, ভগবদ্ভক্তিই ভক্তের প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয় করে, ইহা বলিলে ঐ ভগবদ্ভক্তের দেহাদিস্থিতি কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা বলা আবশ্যক। কারণ, প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকা পর্য্যন্তই দেহস্থিতি বা জীবন থাকে। উহা না থাকিলে

১। দুর্জ্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতং।
দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

২। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং ॥
... শ্রৌতীর্থসহায়েন কায়ব্যূহেন শুধ্যতি ॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতিখণ্ড, ২৬শ অঃ, ৭১ম শ্লোক।

জীবনই থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতেও উহাই কথিত হইয়াছে[১]। সুতরাং তাঁহার তখন সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মেরই ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোবিন্দভাষ্যে পরে যে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য নিতান্ত আর্ত্ত ভক্তের জ্ঞাতিগণের মধ্যে সুহৃদ্গণ তাঁহার পুণ্যরূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করেন এবং শত্রুগণ পাপরূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করেন, ইহা বলিয়াছেন কেন? ইহাও বিচার করা আবশ্যক। তিনি বেদান্তদর্শনের "বিশেষঞ্চ দর্শয়তি" (৪।৩।১৬) এই সূত্রের ভাষ্যে আর্ত্ত ভক্তবিশেষের পক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষ, প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করায় পূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—"বিশেষাধিকরণে বক্ষ্যতে" (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এবং পূর্ব্বে "তস্য সুকৃত-দুষ্কৃতে বিধুনুতে তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতমিতি" এবং "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাং" এই শ্রুতিবাক্যকে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তবিশেষের প্রারব্ধ কর্ম্মের সম্বন্ধেও যে উক্ত শ্রুতির দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে, ইহা অন্য সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। পরন্তু তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তিও যে প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশক হয়, এই সিদ্ধান্তও উক্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়। কারণ, ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে সেই আর্ত্ত ভক্তেরও সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইলে অন্যে তাহা কিরূপে ভোগ করিবে? যাহা অন্ততঃ অন্যেরও অবশ্য ভোগ্য, তাহার সত্তা ও ভোগমাত্রনাশ্যতাই অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শেষে "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি বচনানুসারেই ভক্ত-বিশেষের প্রারব্ধ কর্ম্মেরও ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। সুধীগণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গোবিন্দভাষ্যের ঐ সমস্ত সন্দর্ভ দেখিয়া ইহার বিচার করিবেন।

পরন্তু এই প্রসঙ্গে এখন এখানে ইহাও বলা আবশ্যক হইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত "শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" এই বাক্যের দ্বারা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালাদি নীচ জাতিরও প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয় হয়, ইহা বলিলেও তাঁহাদিগের যে, ইহ জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব জাতিপ্রাপ্তি ও ব্রাহ্মণকর্ত্তব্য যাগানুষ্ঠানে অধিকার হয়, ইহা কিন্তু বলেন নাই। প্রাচীন টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী উক্ত স্থলে লিখিয়াছেন,—"অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে।" তাঁহার টীকার টীকাকার রাধারমণদাস গোস্বামী উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "অনেন 'কল্পত' ইতি ক্রিয়াপদেন"। অর্থাৎ উক্ত বাক্যে "কল্পতে" এই ক্রিয়াপদের দ্বারা ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালাদির তৎকালে পূজ্যতামাত্রই লক্ষিত হইয়াছে। "কৃপ" ধাতুর অর্থ এখানে সামর্থ্য। সামর্থ্যবাচক "কৃপ"ধাতুর প্রয়োগবশতঃই "সবনায়" এই স্থলে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। ব্রাহ্মণকর্ত্তব্য সোমাদিযাগই ঐ স্থলে "সবন" শব্দের অর্থ। ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালেরও তাহাতে সামর্থ্য অর্থাৎ যোগ্যতা জন্মে, এই কথার দ্বারা তাহার ব্রাহ্মণবৎ পূজ্যতা বা প্রশংসাই কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার সেই জন্মেই ব্রাহ্মণত্বজাতি-

---

১। দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতি সমীক্ষত এব সাসুঃ"। ইত্যাদি—(তৃতীয় স্কন্ধ, ২৮শ অঃ, ৩৮শ শ্লোক)। ননু কথং তর্হি দেহস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিজীবনং বা তত্রাহ দেহোঽপীতি।—স্বামিটীকা। ননু তর্হি তস্য দেহঃ কথং জীবেত্তত্রাহ দেহোঽপীতি।—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

প্রাপ্তি কথিত হয় নাই। রাধারমণদাস গোস্বামী সেখানে ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যেমন অনুপনীত ব্রাহ্মণের যাগানুষ্ঠানে অযোগ্যতার কারণ পাপ না থাকায় যোগ্যতা থাকিলেও উহাতে তাহার উপনয়ন বা সাবিত্রীজন্মের অপেক্ষা আছে, তদ্রূপ ভগবদ্‌ভক্ত চণ্ডালাদিরও ব্রাহ্মণ-কর্ত্তব্য যাগানুষ্ঠানে জন্মান্তরের অপেক্ষা আছে। ফলকথা, উক্ত বাক্যে "কল্পতে" এই ক্রিয়াপদের দ্বারা সামর্থ্য অর্থাৎ যোগ্যতামাত্রই কথিত হইয়াছে। ঐ ক্রিয়াপদের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভগবদ্‌ভক্ত চণ্ডালাদির ইহজন্মেই ব্রাহ্মণত্বজাতিপ্রাপ্তি হয় না। তবে ইহজন্মেই তাহাদিগের ব্রাহ্মণবৎ যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা জন্মে, ইহাই প্রকাশ করিতেই উক্ত বাক্যে বলা হইয়াছে "সদ্যঃ"। "ক্রমসন্দর্ভে" শ্রীজীব গোস্বামীও উক্ত স্থলে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ভগবদ্‌ভক্ত চণ্ডালাদির ইহজন্মে ব্রাহ্মণকর্ত্তব্য যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতামাত্রই জন্মে। কিন্তু তাঁহারা পরজন্মেই ব্রাহ্মণত্বজাতি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অধিকারী হন[১]। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও ঐ স্থলে ভগবদ্‌ভক্ত চণ্ডালাদিকে সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্যই বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বলেন নাই[২]। টীকাকার বীররাঘবাচার্য্য কিন্তু তৃতীয় স্কন্ধের "যস্যাবতারগুণকর্ম্ম" ইত্যাদি (৯ম অঃ ১৫) পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সহিত সমন্বয় করিয়া উক্ত স্থলে বলিয়াছেন যে,[৩] শ্রীভগবানের নাম স্মরণাদির দ্বারা পাপীদিগেরও কৃতার্থতাপ্রতিপাদক ঐ সমস্ত বচন অন্তিম কালে স্মরণ বিষয়েই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অন্তিমকালে শ্রীভগবানের স্মরণাদি করিলে চণ্ডালাদি পাপিগণও শুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় কৃতার্থ হন, ইহাই তাৎপর্য্য। এই ব্যাখ্যায় অনেক বিবাদের নিবৃত্তি হয় বটে। কিন্তু বীর রাঘব পরমবৈষ্ণব হইয়াও ঐরূপ অভিনব ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন কেন, ইহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। সে যাহা হউক, মূলকথা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভগবদ্‌ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালাদিরও নীচজাতিজনক প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয় স্বীকার করিলেও ইহজন্মেই তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্বজাতিপ্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই, ইহা মনে রাখা আবশ্যক এবং পরম ভক্ত হইলেও যখন ইহজন্মে তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করেন নাই, তখন বৈষ্ণবদীক্ষা প্রাপ্ত হইলে তদ্দ্বারা তখনই তাহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে, ইহা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরও সিদ্ধান্ত হইতেই পারে না, ইহাও বুঝা আবশ্যক। "হরিভক্তিবিলাসে"র টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবদীক্ষার প্রশংসাবাদ। "হরিভক্তিবিলাসে"র সপ্তদশ বিলাসের পুরশ্চরণপ্রকরণ দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। বৈষ্ণব দীক্ষার দ্বারা তখনই

১। "সদ্যঃ সবনায় কল্পত" ইতি, "সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি", ইতিবৎ তত্র যোগ্যতায়াং লব্ধারম্ভো ভবতীত্যর্থঃ। তদনন্তরজন্মন্যেব দ্বিজত্বং প্রাপ্য তত্রাধিকারী স্যাদিতি ভাবঃ। —শ্রীজীবগোস্বামিকৃত "ক্রমসন্দর্ভ"।

২। শ্বাদোঽপি শ্বপচোঽপি সদ্যস্তৎক্ষণ এব সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি, সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ইব পূজ্যো ভবতীতি দুর্জ্জাত্যারম্ভকপাপনাশো ব্যঞ্জিতঃ ইত্যাদি।—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

৩। এবম্বিধানি নামস্মরণাদিনা পাপিনামপি কৃতার্থতাপ্রতিপাদকানি বচনানি অন্তিমস্মরণবিষয়ানি দ্রষ্টব্যানি। তথাচোক্তং পুরস্তাৎ—"যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি" ইতি বীররাঘবাচার্য্যকৃত "ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা"।

সকল মানবেরই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলে পুরশ্চরণে বর্ণভেদে ব্যবস্থা সংগত হয় না, ইহা সেখানে প্রণিধান করা আবশ্যক। এ বিষয়ে এখানে আর অধিক আলোচনার স্থান নাই। মূলকথা এই যে, এই সূত্রে "অপবর্গ" শব্দের দ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তি গৃহীত হইলেও জীবন্মুক্তিও মহর্ষি গোতমের সম্মত। উক্ত বিষয়ে প্রমাণাদি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে (৩১—৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ॥৪৫॥

সূত্র। তদর্থং যম-নিয়মাভ্যামাত্ম-সংস্কারো যোগাচ্চাধ্যাত্ম-বিধ্যুপায়ৈঃ ॥৪৬॥৪৫৬॥

অনুবাদ। সেই অপবর্গ লাভের নিমিত্ত "যম" ও "নিয়মের"র দ্বারা এবং যোগশাস্ত্র হইতে (জ্ঞাতব্য) অধ্যাত্মবিধি ও উপায়সমূহের দ্বারা আত্ম-সংস্কার কর্ত্তব্য।

ভাষ্য। তস্যাপবর্গস্যাধিগমায় যম-নিয়মাভ্যামাত্ম-সংস্কারঃ। যমঃ সমানমাশ্রমিণাং ধর্ম্মসাধনং। নিয়মস্তু বিশিষ্টং। আত্ম-সংস্কারঃ পুনরধর্ম্ম-হানং ধর্ম্মোপচয়শ্চ। যোগশাস্ত্রাচ্চাধ্যাত্মবিধিঃ প্রতিপত্তব্যঃ। স পুনস্তপঃ প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারো ধারণা ধ্যানমিতি। ইন্দ্রিয়বিষয়েষু প্রসংখ্যানাভ্যাসো রাগদ্বেষপ্রহাণার্থঃ। উপায়স্তু যোগাচারবিধানমিতি।

অনুবাদ। সেই "অপবর্গ" লাভের নিমিত্ত যম ও নিয়মের দ্বারা আত্মসংস্কার (কর্ত্তব্য)। আশ্রমীদিগের অর্থাৎ চতুরাশ্রমীরই সমান ধর্ম্ম-সাধন "যম"। "নিয়ম" কিন্তু বিশিষ্ট ধর্ম্মসাধন (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমীর পক্ষে বিশেষরূপে বিহিত ধর্ম্মসাধন) "আত্মসংস্কার" কিন্তু অধর্ম্মের ত্যাগ ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি। এবং যোগশাস্ত্র হইতে "অধ্যাত্মবিধি" জ্ঞাতব্য। সেই অধ্যাত্মবিধি কিন্তু তপস্যা, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান। ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে (রূপরসাদি বিষয়ে) "প্রসংখ্যানে"র অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানের অভ্যাস রাগদ্বেষ-ক্ষয়ার্থ। "উপায়" কিন্তু যোগাচারবিধান অর্থাৎ মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে শাস্ত্রবিহিত আচারের অনুষ্ঠান।

টিপ্পনী। কেবল পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষের অভ্যাসই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া অপবর্গ লাভের কারণ হয় না, উহার জন্য প্রথমে আরও অনেক কর্ত্তব্য আছে, সেই সমস্ত ব্যতীত প্রথমে কাহারও ঐ সমাধিবিশেষ হইতেও পারে না। তাই পরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রথমে বলিয়াছেন যে, তদর্থ "যম" ও "নিয়ম" দ্বারা আত্মসংস্কার কর্ত্তব্য। তাৎপর্য্যটীকাকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, কেবল সমাধিবিশেষই তত্ত্বজ্ঞানের সাধন নহে; কিন্তু উহার জন্য যম ও নিয়ম দ্বারা আত্মসংস্কার কর্ত্তব্য। তিনি এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানকেই গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বসূত্রের শেষে "অপবর্গ" শব্দের প্রয়োগ

থাকায় ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার "তৎ" শব্দের দ্বারা অপবর্গকেই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তস্যাপবর্গস্যাধিগমায়"। অর্থাৎ সেই অপবর্গের লাভের জন্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথমে উক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া পরে বলিয়াছেন, "তদর্থং সমাধ্যর্থমিতি বা"। অর্থাৎ মহর্ষি পূর্ব্বে "সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ" (৩৮শ) এই সূত্রে যে সমাধিবিশেষ বলিয়াছেন এবং পরে "পূর্ব্বকৃত-ফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ" (৪১শ) এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সমাধি-বিশেষই এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিস্থ, ইহাও বুঝা যায়। বস্তুতঃ এই সূত্রোক্ত যম ও নিয়ম দ্বারা যে, আত্ম-সংস্কার, তাহা পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষ সম্পাদনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া পরম্পরায় অপবর্গ লাভেরই সহায় হওয়ায় এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা অপ-বর্গকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং কোন বাধক না থাকায় অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত অপবর্গই এখানে "তৎ" শব্দের দ্বারা মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার "তৎ" শব্দের দ্বারা অপবর্গকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

মহর্ষি এই সূত্রে যে "যম" ও "নিয়ম" বলিয়াছেন, উহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার চতুরাশ্রমীর পক্ষে যাহা সমান অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্মসাধন, তাহাকে "যম" বলিয়াছেন এবং চতুরাশ্রমীর পক্ষে যাহা বিশিষ্ট ধর্ম্মসাধন, তাহাকে "নিয়ম" বলিয়াছেন। পরে অধর্ম্মের ত্যাগ ও ধর্ম্মের বৃদ্ধিকে সূত্রোক্ত "আত্ম-সংস্কার" বলিয়াছেন। কোন প্রাচীন সম্প্রদায় এই সূত্রে নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনাচরণকে "যম" এবং ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্ম্মের আচরণকে "নিয়ম" বলিতেন, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারের উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারও ঐরূপই মত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনাচরণ সর্ব্বাশ্রমীরই সাধারণ ধর্ম্মসাধন, উহা সমান ভাবে সকলেরই আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বিশিষ্ট ধর্ম্মসাধন। উহা সকলের পক্ষে এক-রূপও নহে। সুতরাং সমান ভাবে সকলেরই কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ করিলে যে অধর্ম্ম জন্মে, উহার অনাচরণে উহার ত্যাগ হয় অর্থাৎ উহা জন্মিতে পারে না এবং আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে তজ্জন্য ক্রমশঃ ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়। উহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন "আত্ম--সংস্কার"। কারণ, অধর্ম্ম ত্যাগ ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইলেই ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয়। নচেৎ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতেই পারে না। সুতরাং আত্মার অপবর্গ লাভে যোগ্যতাই হয় না। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সূত্রোক্ত "আত্ম-সংস্কার" শব্দের ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আত্মার অপবর্গ লাভে যোগ্যতা।

সুপ্রাচীন কাল হইতেই "যম" ও "নিয়ম" শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে। কোষকার অমর সিংহ প্রভৃতি যাবজ্জীবন অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মকে "যম" এবং আগন্তুক কোন নিমিত্তবিশেষ-প্রযুক্ত কর্ত্তব্য অনিত্য (উপবাস ও স্নানাদি) কর্ম্মকে "নিয়ম" বলিয়া গিয়াছেন[১]। কিন্তু মনুসংহিতার

১। শরীরসাধনাপেক্ষং নিত্যং কর্ম্ম তদ্‌যমঃ।
নিয়মস্তু স যৎ কর্ম্মানিত্যমাগন্তুসাধনং ॥—অমরকোষ ব্রহ্মবর্গ, ৪৮।৪৯।

"যমান্ সেবেত সততং" ইত্যাদি শ্লোকের[১] ব্যাখ্যায় মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের কথানুসারে নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনাচরণই ঐ শ্লোকে "যম" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত এবং আশ্রমবিহিত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মই "নিয়ম" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। কারণ, "যম" ত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মের সেবা করিলে পতিত হয়, এই মনূক্ত সিদ্ধান্তে যুক্তি প্রকাশ করিতে সেখানে মেধাতিথি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে মহাপাতকজন্য পাতিত্যবশতঃ আশ্রমবিহিত অন্যান্য কর্ম্মে তাহার অধিকারই থাকে না। সুতরাং অনধিকারিকৃত ঐ সমস্ত কর্ম্ম ব্যর্থ হয়। অতএব "যম" ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাদি কর্ম্মে রত থাকিয়া নিয়মের সেবা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু টীকাকার কুল্লূক ভট্ট ঐ শ্লোকে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ব্রহ্মচর্য্য ও দয়া প্রভৃতি "যম" এবং স্নান,মৌন ও উপবাস প্রভৃতি "নিয়ম"কেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মুনিগণই যখন "যম" ও "নিয়মে"র স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তখন উক্ত মনুবচনেও "যম" ও "নিয়ম" শব্দের সেই অর্থই গ্রাহ্য। তিনি ইহা সমর্থন করিতে শেষে যাজ্ঞবল্ক্যের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ "যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা"র শেষে ব্রহ্মচর্য্য ও দয়া প্রভৃতিকে "যম" ও "নিয়ম" বলা হইয়াছে। "গৌতমীয়তন্ত্রে"ও অহিংসা প্রভৃতি দশ "যম" ও তপস্যাদি দশ "নিয়মে"র উল্লেখ হইয়াছে। তাহাতে দেবপূজন এবং সিদ্ধান্ত-শ্রবণও "নিয়মে"র মধ্যে কথিত হইয়াছে ("তন্ত্রসার"গ্রন্থে যোগপ্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য)। পরন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতেও উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবদ্বাক্যে দ্বাদশ "যম" ও "নিয়মে"র উল্লেখ দেখা যায়[২]। তন্মধ্যে ঈশ্বরের অর্চ্চনাও "নিয়মে"র মধ্যে কথিত হইয়াছে। যোগদর্শনে অহিংসাদি পঞ্চ "যম" এবং শৌচাদি পঞ্চ "নিয়ম" যোগাঙ্গের মধ্যে কথিত হইয়াছে[৩], ঈশ্বরপ্রণিধানও সেই নিয়মের অন্তর্গত। তাৎপর্য্য-টীকাকার এখানে "যম" শব্দের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াও যোগদর্শনোক্ত অহিংসাদি পঞ্চ যমেরই উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাষ্যকারের মতে এখানে "যম" শব্দের দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনাচরণ বুঝিলেও তদ্দ্বারা যোগদর্শনোক্ত অহিংসাদি পঞ্চ যমও পাওয়া যায়। কারণ, উহাও ফলতঃ হিংসাদি নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনাচরণ। এবং এই সূত্রে "নিয়ম" শব্দের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন

১। যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥—মনুসংহিতা, ৪।২০৪।

প্রতিষেধরূপা যমাঃ। ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ, সুরা ন পেয়া ইত্যাদয়ঃ। অনুষ্ঠেয়রূপা নিয়মাঃ। "বেদমেব জপেন্নিত্য"-মিত্যাদয়ঃ।—মেধাতিথিভাষ্য। যমনিয়মবিবেকশ্চ মুনিভিরেব কৃতঃ। তদাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্দ্দানং সত্যমকল্কতা"—ইত্যাদি কুল্লূক ভট্টকৃত টীকা।

২। অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ। আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা ভয়ং ॥
শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনং। তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনং ॥
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ। পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকালং দুহন্তি হি ॥
—১১শ স্কন্ধ, ১৯শ অঃ, ৩০।৩১।৩২।

৩। অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥
শৌচ-সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥—যোগদর্শন, ২।৩০।৩২।

আশ্রমবিহিত কর্ম্ম বুঝিলেও তদ্দ্বারা শৌচাদি পঞ্চ "নিয়ম"ও পাওয়া যায়। কারণ, ঐ সমস্তও ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমীর পক্ষে বিশিষ্ট ধর্ম্মসাধন। ঈশ্বরের উপাসনাও আশ্রমবিহিত কর্ম্ম এবং উহা সর্ব্বাশ্রমীরই কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতেও ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমীর কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের উপদেশ করিয়া বলা হইয়াছে, "সর্ব্বেষাং মদুপাসনং" (১১শ স্কন্ধ, ১৮শ অঃ, ৪২শ শ্লোক)। অর্থাৎ ভগবদুপাসনা সর্ব্বাশ্রমীরই কর্ত্তব্য। পরন্তু দ্বিজাতিগণের নিত্যকর্ত্তব্য যে গায়ত্রীর উপাসনা, তাহাও পরমেশ্বরেরই উপাসনা এবং নিত্যকর্ত্তব্য প্রণব জপ ও উহার অর্থভাবনাও পরমেশ্বরেরই উপাসনা। সুতরাং আশ্রমবিহিত কর্ম্মরূপ "নিয়মে"র মধ্যে ঈশ্বরোপাসনাও নিত্যকর্ম্ম বলিয়া বিধিবোধিত হওয়ায় মুমুক্ষু উহার দ্বারাও আত্মসংস্কার করিবেন, ইহাও মহর্ষি গোতম এই সূত্র দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং মহর্ষি গোতমের মতে যে, মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বর না থাকিলেও তাঁহার মতে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, এইরূপ মন্তব্য অবিচারমূলক। আর যে মহর্ষি "সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ" এই (৩৮শ) সূত্রদ্বারা সমাধিবিশেষের অভ্যাসকে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়াছেন, তিনি যে এই সূত্রে যোগাঙ্গ "যম" ও "নিয়ম" দ্বারা আত্মসংস্কার কর্ত্তব্য বলেন নাই, ইহাও বলা যায় না। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত যমনিয়মাদি অষ্টবিধ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানজন্য চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে জ্ঞানের প্রকাশ হয়[১], ইহা বলিয়া ঐ অষ্টবিধ যোগাঙ্গানুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এবং বিশেষ করিয়া "নিয়মে"র অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানকে সমাধির সাধক বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতেও মুমুক্ষুর সমাধিসিদ্ধির জন্য ঈশ্বরপ্রণিধান যে সকলের পক্ষেই অত্যাবশ্যক নহে, অন্য উপায়েও উহা হইতে পারে, ইহাও বলা যায় না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে "যম" ও "নিয়ম" শব্দের দ্বারা যোগদর্শনোক্ত যোগাঙ্গ পঞ্চ যম ও পঞ্চ নিয়মকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যোগাঙ্গ যম ও নিয়ম দ্বারা মুমুক্ষুর আত্মসংস্কার অর্থাৎ অপবর্গলাভে যোগ্যতা জন্মে, ইহাই প্রথমে মহর্ষি এই সূত্র দ্বারা বলিয়াছেন। নচেৎ অপবর্গলাভে যোগ্যতাই জন্মে না। সুতরাং শৌচাদি পঞ্চ "নিয়মে"র অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানও যে মুমুক্ষুর পক্ষে অত্যাবশ্যক, ইহা স্বীকার্য্য। যোগদর্শনেও সাধনপাদের প্রারম্ভে "তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ"—এই প্রথম সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলা হইয়াছে। তাহার পরে যোগের অষ্টাঙ্গ বর্ণনায় দ্বিতীয় যোগাঙ্গ নিয়মের মধ্যে (৩২শ সূত্রে) ঈশ্বরপ্রণিধানের উল্লেখ হইয়াছে। তাহার পরে "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" (২।৪৫) এই সূত্রের দ্বারা নিয়মের অন্তর্গত ঐ ঈশ্বরপ্রণিধানের ফল বলা হইয়াছে সমাধিসিদ্ধি। যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেব সাধনপাদে উক্ত তিন সূত্রেই ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণই ঈশ্বরপ্রণিধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সমাধিপাদে "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" (২৩শ) এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাদাবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্লাতি অভিধ্যানমাত্রেণ।" টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা

১। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥—যোগসূত্র, ২।২৮

করিয়াছেন যে, মানসিক, বাচিক অথবা কায়িক ভক্তিবিশেষপ্রযুক্ত আবর্জ্জিত অর্থাৎ অভিমুখীকৃত হইয়া "এই যোগীর এই অভীষ্ট সিদ্ধ হউক," এইরূপ "অভিধ্যান" অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রের দ্বারাই ঈশ্বর তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তিনিরোধকে যোগ বলিয়া, উহার উপায় বলিতে প্রথমে "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ," (১।১২) এই সূত্রের দ্বারা অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে উপায় বলা হইয়াছে। পরে "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রের দ্বারা কল্পান্তরে উহারই উপায়ান্তর বলা হইয়াছে। ঐ সূত্রে "বা" শব্দের অর্থ বিকল্প, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃত্তিকার ভোজরাজ ঐ সূত্রোক্ত উপায়কে সুগম উপায়ান্তর বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ সূত্রের দ্বারা অভ্যাসে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিবিশেষরূপ ঈশ্বরপ্রণিধানকে মহর্ষি পতঞ্জলি সুগম উপায়ান্তরই বলিয়াছেন, ইহা আমরা ভগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্যের দ্বারাও স্পষ্ট বুঝিতে পারি। কারণ, তাহাতেও প্রথমে যোগদর্শনের ন্যায় "অভ্যাসেন চ কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে" (৬।৩৫) এই বাক্যের দ্বারা অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে মনোনিগ্রহরূপ যোগের উপায় বলিয়া, পরে ভক্তিযোগ অধ্যায়ে "অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥" (১২।১০) এই শ্লোকের দ্বারা অভ্যাসে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষকেই উপায় বলা হইয়াছে। যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেবও ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকানুসারেই "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানকে ভক্তিবিশেষ বলিয়াছেন। ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের পরেই "অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥" (১২।১১) এই শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরার্থ কর্ম্মযোগে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বশ্লোকে যে, ঈশ্বরপ্রীতিরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ঈশ্বরার্থ কর্ম্মযোগের কর্ত্তব্যতাই উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। ঐরূপ কর্ম্মযোগও ভক্তিযোগবিশেষ, উহার দ্বারা ঈশ্বর প্রীত হইয়া সেই ভক্তের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত যোগভাষ্যসন্দর্ভের বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাও ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। কিন্তু যোগবার্ত্তিকে বিজ্ঞান ভিক্ষু পূর্ব্বোক্ত "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রোক্ত ঈশ্বরপ্রণিধানকে ঈশ্বর বিষয়ে একাগ্রতারূপ ভাবনাবিশেষ বলিয়াছেন। তিনি উহার পরবর্ত্তী "তজ্জপস্তদর্থভাবনং" (১।২৮) এই সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রণববাচ্য ঈশ্বরের ভাবনাবিশেষই যে, পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহা পরে ঐ সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে। তিনি ঐরূপ ঈশ্বরপ্রণিধানকে প্রেমলক্ষণ ভক্তিবিশেষ বলিয়া, পরে ভাষ্যকার ব্যাসদেবের "প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাৎ" এই উক্তির উপপাদান করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত ভগবদ্গীতার "অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব," ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে প্রণিধান করিলে বিজ্ঞান ভিক্ষুর ঐ ব্যাখ্যা অভিনব কল্পিত বলিয়াই মনে হয় এবং ভাষ্যকার ব্যাসদেব যোগদর্শনের সাধনপাদে সর্ব্বত্র ঈশ্বরপ্রণিধানের একরূপ ব্যাখ্যা করিলেও সমাধিপাদে পূর্ব্বোক্ত "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রের ভাষ্যে "প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাৎ" এইরূপ ব্যাখ্যা কেন করিয়াছেন, তাহারও পূর্ব্বোক্তরূপ কারণ বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বাক্যানুসারেই যোগসূত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, যোগদর্শনে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটিকে "যম" বলা হইয়াছে, এবং শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই পাঁচটিকে "নিয়ম" বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণই ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহা ভাষ্যকার ব্যাসদেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগদর্শনে উহা ক্রিয়াযোগ বলিয়াও কথিত হইয়াছে এবং সমাধিসিদ্ধি উহার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং সমাধিসিদ্ধির জন্য যোগিমাত্রেরই উহা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উহা অভ্যাসে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে সমাধিসিদ্ধির উপায়ান্তররূপে কথিত হয় নাই। "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" এই সূত্রে বিকল্পার্থ "বা" শব্দের প্রয়োগ নাই, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। ভগবদ্গীতাতেও ভক্তিযোগের বর্ণনায়—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং"ইত্যাদি শ্লোকের পরেই "যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥"—(৯।২৭) এই শ্লোকের দ্বারা পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। মুমুক্ষুমাত্রেরই উহা কর্ত্তব্য। কারণ, উহা ব্যতীত মোক্ষলাভে যোগ্যতাই হয় না। সুতরাং যোগদর্শনোক্ত পূর্ব্বোক্ত "নিয়মে"র অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধান মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে বহিরঙ্গ সাধন হইলেও উহাও যে অত্যাবশ্যক, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ও জীবের কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, এবং মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রবণ ও মননের পরে যোগশাস্ত্রানুসারে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের কর্ত্তব্যতা বলিয়াছেন, সেই মহর্ষি গোতম যে এই সূত্রের দ্বারা ঈশ্বরপ্রণিধানেরও কর্ত্তব্যতা বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ" এই সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও অগ্রাহ্য নহে। ঐ ব্যাখ্যানুসারে ঐ সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বজন্মকৃত ঈশ্বরারাধনার ফলে যে সমাধি-বিশেষের উৎপত্তি হয়, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য হইলে পূর্ব্বজন্মেও যে, ঈশ্বরের আরাধনা মুক্তিলাভে আবশ্যক, ইহাও মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। সুতরাং মহর্ষি গোতমের মতে যে মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। গোতম মতে মুক্তিলাভে যে ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানও আবশ্যক, এ বিষয়ে পূর্ব্বে (১৮—২৪ পৃষ্ঠায়) আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি এই সূত্রে পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, যোগশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য যে, অধ্যাত্মবিধি ও উপায়-সমূহ, তদ্দ্বারাও মুমুক্ষুর আত্ম-সংস্কার কর্ত্তব্য। অর্থাৎ কেবল "যম" ও "নিয়মই" মুমুক্ষুর সাধন নহে; যোগশাস্ত্রে আরও অনেক সাধন কথিত হইয়াছে। উহা যোগশাস্ত্রেরই প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতিপাদ্য। সুতরাং যোগশাস্ত্র হইতেই ঐ সমস্ত জানিয়া গুরূপদেশানুসারে উহার অনুষ্ঠানাদি করিয়া তদ্দ্বারাও আত্মসংস্কার করিতে হইবে। সূত্রে "যোগ" শব্দের দ্বারা যোগশাস্ত্রই লক্ষিত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রভৃতিও এখানে "যোগ" শব্দের দ্বারা যোগশাস্ত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" (২।১।৩) এই সূত্রেও যোগশাস্ত্র অর্থেই "যোগ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সুচিরকাল হইতেই এই যোগশাস্ত্রের প্রকাশ হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই যোগের পুরাতন বক্তা। উপনিষদেও যোগের উল্লেখ আছে[১]। তদনুসারে স্মৃতিপুরাণাদি নানা শাস্ত্রে

১। শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।—বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫। ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং।—শ্বেতাশ্বতর, ২।৮। তংযোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং।—কঠ, ২।৬।১১। বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং।—কঠ, ২।৬।১৮।

যোগের বর্ণন ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য নিজসংহিতায় যোগের অনেক উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। পরে মহর্ষি পতঞ্জলি সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া যোগদর্শনের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি গোতম এই সূত্রে "যোগ" শব্দের দ্বারা সুপ্রাচীন যোগশাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়া, উহা হইতে অধ্যাত্মবিধি ও অন্যান্য উপায় পরিজ্ঞাত হইয়া তদ্দ্বারাও মুমুক্ষুর আত্মসংস্কার কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে "অধ্যাত্মবিধি" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—আত্মসাক্ষাৎকারের বিধায়ক "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বিধিবাক্য। এবং "যোগাৎ" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ বলিয়াছেন প্রতিপাদ্যত্ব। কিন্তু উক্ত বিধিবাক্য যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। যোগের উপায়সমূহ অবশ্য যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যোগশাস্ত্র হইতে "অধ্যাত্মবিধি" জানিতে হইবে। সেই অধ্যাত্ম-বিধি বলিতে তপস্যা, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারণা। এই সমস্ত যোগশাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত "তপস্যা" পাপক্ষয় সম্পাদন করিয়া চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করে এবং তপোবিশেষের ফলে অণিমাদি সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সিদ্ধি জন্মে (যোগদর্শন, বিভূতিপাদ, ৪৫শ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ঐ সমস্ত সিদ্ধি সমাধিতে উপসর্গ বলিয়া কথিত হইলেও সময়বিশেষে উহা বিঘ্ন নিরাকরণ করিয়া সমাধিলাভের সাহায্যও করে। এইরূপ প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এবং ধারণা ও ধ্যান সমাধিলাভে নিতান্ত আবশ্যক। তন্মধ্যে "ধারণা"ও ধ্যানের সমষ্টির অন্তরঙ্গ সাধন। প্রাণবায়ুর সংযমবিশেষই "প্রাণায়াম"। ইন্দ্রিয়নিরোধের নাম "প্রত্যাহার"। কোন একই স্থানে চিত্তের বন্ধন বা ধারণই "ধারণা"। ঐ ধারণাই ধারাবাহিক অর্থাৎ বিরামশূন্য বা জ্ঞানান্তরের সহিত অসংসৃষ্ট হইলে তখন উহাকে "ধ্যান"বলে। ঐ ধ্যানই পরিপক্ক হইয়া শেষে ধ্যেয়াকারে পরিণত হয়। তখন চিত্তবৃত্তি থাকিলেও না থাকার মত ভাসমান হয়। সেই অবস্থাই সমাধি[১]। উহা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত নামে দ্বিবিধ। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয়বিষয়ক চিত্তবৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়। উহারই অপর নাম নির্ব্বিকল্পক সমাধি; উহাই চরম সমাধি। পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়ামাদি সমস্তই যোগশাস্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য এবং সদ্‌গুরুর নিকটে শিক্ষণীয়। উহা লিখিয়া বুঝান যায় না এবং কেবল পুস্তক পাঠের দ্বারাও বুঝা যায় না ও অভ্যাস করা যায় না। নিজের অধিকার বিচার ও শাস্ত্রবিহিত সদাচার ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে উহার অভ্যাস করিতে যাওয়া ব্যর্থ, পরন্ত বিপজ্জনক। মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছা করিলেই সকলেই যোগী হইতে পারে না। কাহাকেও সামান্য অর্থ দিয়াও যোগী হওয়া যায় না। যোগী হইতে অনেক জন্মের বহু সাধন আবশ্যক। অনেক জন্মের বহু সাধনা ব্যতীত কেহই সিদ্ধ হইতে পারেন না। এ পর্য্যন্ত এক জন্মের সাধনায় কেহই সিদ্ধ হন নাই, ইহা অতিনিশ্চিত। শ্রীভগবান্ নিজেও বলিয়া গিয়াছেন,—"অনেক-

১। তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।
স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥—যোগদর্শন, সাধনপাদ—৪৯।৫৪॥
দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং ॥
তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥—বিভূতিপাদ—১।২।৩

জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং॥"—(গীতা, ৬।৪৫)। পরে আবারও বলিয়াছেন,—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" ৭।১৯।

পূর্ব্বোক্ত "দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সংকল্পকৃতাঃ" এই দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানই প্রথম কর্ত্তব্য, ইহা কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এই প্রসঙ্গে এখানে পরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি বিষয়ে তত্ত্ব-জ্ঞানের অভ্যাস রাগদ্বেষ ক্ষয়ার্থ, ইহা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে যুক্তিও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ রূপাদি বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ সমাধি লাভের গুরু অন্তরায়। সুতরাং উহার ক্ষয় ব্যতীত সমাধি লাভ ও মোক্ষলাভে যোগ্যতাই হয় না। সুতরাং ঐ সমস্ত বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ নিবৃত্তির জন্য প্রথমে তদ্বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস করিবে এবং সুকর বলিয়াও উহাই প্রথম কর্ত্তব্য। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে সূত্রোক্ত "উপায়ে"র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"উপায়স্তু যোগাচারবিধানমিতি।" তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ "যোগাচার" শব্দের দ্বারা যতিধর্ম্মোক্ত একাকিতা, আহারবিশেষ এবং একত্র অনবস্থান প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১] এবং ঐ সমস্তও ক্রমশঃ তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তি নির্ব্বাহ করিয়া অপবর্গের সাধন হয়, ইহাও বলিয়াছেন। বস্তুতঃ যোগীর একাকিতা এবং আহার-বিশেষ ও নিয়ত বাসস্থানের অভাব প্রভৃতিও শাস্ত্রসিদ্ধ উপায় বা সাধন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বর্ণনায় "একাকী যতচিত্তাত্মা" ইত্যাদি (১০ম) এবং "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ" (১৬শ) ইত্যাদি এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে "বিবিক্ত-সেবী লঘ্বাশী" ইত্যাদি বচনের দ্বারা ঐ সমস্ত সাধনও উপদিষ্ট হইয়াছে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তি-যোগের বর্ণনায় ১৯শ শ্লোকে ভক্তিযোগীকেও বলা হইয়াছে,—"অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ"। ভক্ত সাধক বা যোগীর নিয়ত কোন একই স্থানে বাসও তাঁহার সাধনার অনেক অন্তরায় জন্মায়। তাহাতে চিত্তের একাগ্রতার ব্যাঘাত হয়। তাই মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তনও আবশ্যক। তাহা হইলে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্ভব হওয়ায় "স্থিরমতি" হওয়া যায়। অনিকেতত্ব অর্থাৎ নিয়তবাসস্থানশূন্যতা স্থৈর্য্যের সহায় হয় বলিয়াই উক্ত শ্লোকে "অনিকেত" বলিয়া, পরেই "স্থিরমতি" বলা হইয়াছে। ঋষিগণও এ জন্য নানা সময়ে নানা স্থানে অবস্থান করিয়া সাধনা করিয়াছেন। পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে। নিয়ত কোন এক স্থানে বাস না করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্মমধ্যেও কথিত হইয়াছে। ফলকথা, তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারোক্ত "যোগাচার" শব্দের দ্বারা যতিধর্ম্মোক্ত পূর্ব্বোক্ত একাকিত্ব প্রভৃতিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার "যোগাচার" শব্দের পরে "বিধান" শব্দের প্রয়োগ করায় যোগাভ্যাসকালে যোগীর কর্ত্তব্য সমস্ত আচারের অনুষ্ঠানই উহার দ্বারা সরল ভাবে বুঝা যায়। সে যাহা হউক, মহর্ষি যে, সূত্রশেষে "উপায়" শব্দের দ্বারা যোগীর আশ্রয়ণীয় যোগশাস্ত্রোক্ত অন্যান্য সমস্ত সাধনই গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই॥৪৬॥

১। যোগাচার একাকিতা আহারবিশেষ একত্রানবস্থানমিত্যাদি যতিধর্ম্মোক্তং। এতেঽপি তত্ত্বজ্ঞানক্রমোৎপাদ-ক্রমেণাপবর্গসাধনমিত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

সূত্র। জ্ঞানগ্রহণাভ্যাসস্তদ্বিদ্যৈশ্চ সহ সংবাদঃ ॥ ॥৪৭॥৪৫৭॥

অনুবাদ। সেই মোক্ষলাভের নিমিত্ত "জ্ঞান" অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন আত্ম-বিদ্যারূপ এই শাস্ত্রের গ্রহণ ও অভ্যাস এবং সেই বিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত "সংবাদ" কর্ত্তব্য।

ভাষ্য। "তদর্থ"মিতি প্রকৃতং। জ্ঞায়তেঽনেনেতি "জ্ঞান"-মাত্মবিদ্যাশাস্ত্রং। তস্য গ্রহণমধ্যয়নধারণে। অভ্যাসঃ সততক্রিয়া-ধ্যয়নশ্রবণ-চিন্তনানি। "তদ্বিদ্যৈশ্চ সহ সংবাদ" ইতি প্রজ্ঞাপরি-পাকার্থং। পরিপাকস্তু সংশয়চ্ছেদনমবিজ্ঞাতার্থবোধোঽধ্যবসিতাভ্যনুজ্ঞান-মিতি। সময়াবাদঃ সংবাদঃ।

অনুবাদ। "তদর্থং" এই পদটি প্রকৃত অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্র হইতে এই সূত্রে ঐ পদটির অনুবৃত্তি মহর্ষির অভিপ্রেত। 'ইহার দ্বারা জানা যায়' এই অর্থে "জ্ঞান" বলিতে আত্মবিদ্যারূপ শাস্ত্র অর্থাৎ মহর্ষি গোতমের প্রকাশিত এই "আন্বীক্ষিকী" শাস্ত্র। তাহার "গ্রহণ" অধ্যয়ন ও ধারণা। "অভ্যাস" বলিতে সতত ক্রিয়া—অধ্যয়ন, শ্রবণ ও চিন্তন। এবং "তদ্বিদ্য"দিগের সহিত সংবাদ কর্ত্তব্য—ইহা প্রজ্ঞা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পরিপাকের নিমিত্ত কথিত হইয়াছে। "পরিপাক" কিন্তু সংশয়-চ্ছেদন, অবিজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান, এবং "অধ্যবসিত" অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত তত্ত্বের (তর্কের দ্বারা) অভ্যনুজ্ঞান। সমীপে অর্থাৎ "তদ্বিদ্য"দিগের নিকটে যাইয়া "বাদ" সংবাদ।

টিপ্পনী। অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারাই তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হয়, তাহা হইলে আর এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? মহর্ষি এত-দুত্তরে শেষে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, মোক্ষলাভের জন্য এই ন্যায়শাস্ত্রের গ্রহণ ও অভ্যাস এবং "তদ্বিদ্য"দিগের সহিত সংবাদ কর্ত্তব্য। পূর্ব্বসূত্র হইতে "তদর্থং" এই পদের অনুবৃত্তি মহর্ষির অভি-প্রেত। ভাষ্যকার প্রথমে উহা বলিয়া, পরে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে সূত্রোক্ত "জ্ঞান" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, আত্মবিদ্যারূপ শাস্ত্র। যদ্দ্বারা তত্ত্ব জানা যায়, এই অর্থে জ্ঞাধাতুর উত্তর করণবাচ্য "অনট্" প্রত্যয়নিষ্পন্ন "জ্ঞান" শব্দের দ্বারা শাস্ত্রও বুঝা যায়। তাহা হইলে মহর্ষি এই সূত্রে "জ্ঞান" শব্দের দ্বারা তাঁহার প্রকাশিত এই ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়। এই ন্যায়বিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্মবিদ্যা, ভগবান্ মনুও উহাকে আত্মবিদ্যা

বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৯—৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ঐ আত্মবিদ্যারূপ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ধারণাকে ভাষ্যকার উহার "গ্রহণ" বলিয়াছেন। এবং উহার সতত ক্রিয়াকে উহার "অভ্যাস" বলিয়াছেন। পরে ঐ সমস্ত ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অধ্যয়ন, শ্রবণ ও চিন্তন। অর্থাৎ ঐ আত্মবিদ্যারূপ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ধারণারূপ গ্রহণের অভ্যাস বলিতে সতত অধ্যয়ন এবং সতত শ্রবণ ও চিন্তন। অপবর্গলাভের জন্য উহা কর্ত্তব্য। সুতরাং মুমুক্ষুর পক্ষে এই ন্যায়শাস্ত্রও আবশ্যক, ইহা ব্যর্থ নহে। মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যোগশাস্ত্রানুসারে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারাই তত্ত্বসাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য হইলেও তৎপূর্ব্বে শাস্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত তত্ত্বের শ্রবণ করিয়া, যুক্তির দ্বারা উহার মনন কর্ত্তব্য, ইহা "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই উপদেশ করিয়াছেন। নচেৎ প্রথমেই সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না। শ্রুতিও তাহা বলেন নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে শ্রবণের পরে যে মনন মুমুক্ষুর অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার জন্য এই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ধারণারূপ গ্রহণের অভ্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, এই ন্যায়-শাস্ত্রে ঐ মননের সাধন বহু যুক্তি বা অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা মননরূপ পরোক্ষ তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মে। এবং পুনঃ পুনঃ ঐ সমস্ত যুক্তির অনুশীলন করিলে ঐ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান ক্রমশঃ পরিপক্ক হয়। অতএব উহার জন্য প্রথমে মুমুক্ষুর এই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং শ্রবণ ও চিন্তন সতত কর্ত্তব্য। মহর্ষি পরে আরও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা "তদ্বিদ্য" অর্থাৎ এই ন্যায়বিদ্যাবিজ্ঞ ব্যক্তিবিশেষ, তাঁহাদিগের সহিত সংবাদও কর্ত্তব্য। সুতরাং তজ্জন্যও এই ন্যায়বিদ্যা আবশ্যক, ইহা ব্যর্থ নহে। "তদ্বিদ্য"দিগের সহিত সংবাদের প্রয়োজন বা ফল কি ? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উহা "প্রজ্ঞাপরিপাকার্থ"। "প্রজ্ঞা" অর্থাৎ মননরূপ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের পরিপাকের জন্য উহা কর্ত্তব্য। পরে ঐ "পরিপাক" বলিয়াছেন,—সংশয় ছেদন, অবিজ্ঞাত পদার্থের বোধ, এবং প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত পদার্থের তর্কের দ্বারা অভ্যনুজ্ঞা। অর্থাৎ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্য পদার্থ, ইহা যুক্তির দ্বারা মনন করিলেও আবার কোন কারণে ঐ বিষয়ে সংশয় জন্মিলে তখন ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ গুরু প্রভৃতির নিকটে যাইয়া "বাদ" বিচার করিলে ঐ সংশয় নিবৃত্তি হয়। যাহা অবিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষরূপে বুঝা হয় নাই, সামান্য জ্ঞান জন্মিলেও যে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান জন্মে নাই, তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। এবং যাহা "অধ্যবসিত" অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ঐ প্রমাণের সহকারী তর্ক-বিশেষ দ্বারা ঐ প্রমাণকে সবল বুঝিলে ঐ নিশ্চয় দৃঢ় হয়। তর্ক, সংশয়বিষয় পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একটীর নিষেধের দ্বারা অপরটীকে প্রমাণের বিষয়রূপে অনুজ্ঞা করে, ইহা ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত তদ্বিদ্য-দিগের সহিত সংবাদ করিলে যে, পূর্ব্বোক্ত সংশয় নিবৃত্তি প্রভৃতি হয়, উহাই প্রজ্ঞার পরিপাক। তাই ঐ সমস্ত হইলে তখন সেই মননরূপ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে। সূত্রোক্ত "সংবাদ" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—"সময়াবাদঃ সংবাদঃ।" অনেক পুস্তকেই "সমায় বাদঃ সংবাদঃ" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু ঐ পাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায় না। "সময়াবাদঃ সংবাদঃ"—এই পাঠও কোন পুস্তকে দেখা যায় এবং

প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা যায়। "সময়া" শব্দ সমীপার্থক অব্যয়। "সময়া" অর্থাৎ নিকটে যাইয়া যে "বাদ," তাহাই এই সূত্রোক্ত "সংবাদ"—ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। অর্থাৎ সূত্রোক্ত "সংবাদ" শব্দের অন্তর্গত "সং" শব্দের অর্থ এখানে সমীপ। সমীপে যাইয়া বাদই "সংবাদ"। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিবার জন্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সময়াবাদঃ সংবাদঃ।" পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারাও ইহাই বুঝা যায় ॥৪৭॥

ভাষ্য। "তদ্বিদ্যৈশ্চ সহ সংবাদ" ইত্যবিভক্তার্থং বচনং বিভজ্যতে—

অনুবাদ। "এবং তদ্বিদ্যদিগের সহিত সংবাদ কর্ত্তব্য" এই অবিভক্তার্থ বাক্য বিভাগ করিতেছেন, অর্থাৎ পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত ঐ অস্ফুটার্থ বাক্য বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—

সূত্র। তং শিষ্য-গুরু-সব্রহ্মচারি-বিশিষ্টশ্রেয়োঽর্থিভিরনসূয়িভিরভ্যুপেয়াৎ ॥৪৮॥৪৫৮॥

অনুবাদ। অসূয়াশূন্য শিষ্য, গুরু, সব্রহ্মচারী অর্থাৎ সহাধ্যায়ী এবং বিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শিষ্যাদি ভিন্ন শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ শ্রেয়োর্থীদিগের সহিত অর্থাৎ মুক্তিরূপ শ্রেয়ঃপদার্থে শ্রদ্ধাবান্ বা মুমুক্ষু পূর্ব্বোক্ত শিষ্যাদির সহিত সেই "সংবাদ" অভিমুখে উপস্থিত হইয়া প্রাপ্ত হইবে। [অর্থাৎ অসূয়াশূন্য পূর্ব্বোক্ত শিষ্যাদির সহিত "বাদ" বিচার করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিবে।]

ভাষ্য। এতন্নিগদেনৈব নীতার্থমিতি।

অনুবাদ। "নিগদ" অর্থাৎ সূত্রবাক্যদ্বারাই এই সূত্র "নীতার্থ" (অবগতার্থ)। অর্থাৎ সূত্রপাঠের দ্বারাই ইহার অর্থ বোধ হওয়ায় ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে শেষে বলিয়াছেন,—"তদ্বিদ্যৈশ্চ সহ সংবাদঃ।" কিন্তু উহার অর্থ "বিভক্ত" (বিশেষরূপে ব্যক্ত) হয় নাই অর্থাৎ "তদ্বিদ্য" কিরূপ ব্যক্তিদিগের সহিত সংবাদ কর্ত্তব্য, তাহা বলা হয় নাই এবং তাঁহাদিগের সহিত কোথায় কি ভাবে ঐ সংবাদ করিতে হইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। তাই মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা তাহা বলিয়াছেন। ফলকথা, পূর্ব্বসূত্রে শেষোক্ত ঐ অংশের বিভাগ বা বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যার জন্যই মহর্ষি পরে এই সূত্রটী বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের উক্তরূপ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াই এই সূত্রের অবতরণা করিয়াছেন। কিন্তু পরে সূত্রপাঠের দ্বারাই ইহার অর্থবোধ হয়, ইহা বলিয়া উহার অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত "মায়া-গন্ধর্ব্ব-নগর-মৃগতৃষ্ণিকাবদ্বা" (৩২শ)

সূত্রেরও অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই; তবে সেখানে উহা কেন করেন নাই, তাহাও কিছু বলেন নাই। কিন্তু তাহা বলা আবশ্যক। তাই মনে হয়, ভাষ্যকার পরে আবশ্যক বোধে এখানে তাহা ঐ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। নচেৎ এখানে পরে তাঁহার "এতন্নিগদেনৈব নীতার্থমিতি"—এই কথা বলার প্রয়োজন কি? তিনি ত আর কোন সূত্রে ঐরূপ কথা বলেন নাই। আমরা কিন্তু মন্দবুদ্ধিবশতঃ মহর্ষির এই সূত্রবাক্যকে একবারে স্পষ্টার্থ বলিয়া বুঝি না। উহার ক্রিয়াপদ ও কর্ম্মপদের অর্থসংগতি সুবোধ বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না।

যাহা হউক, মূলকথা, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা অসূয়াশূন্য শিষ্য, গুরু, সহাধ্যায়ী এবং ঐ শিষ্যাদি ভিন্ন শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ বিশিষ্ট শ্রেয়োর্থী অর্থাৎ মুক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ বা মুক্তিকামী ব্যক্তিই তাঁহার পূর্ব্বসূত্রে কথিত "তদ্বিদ্য", ইহা প্রকাশ করিয়াছেন বুঝা যায়। এবং পূর্ব্বসূত্রে "সহ" শব্দ যোগে "তদ্বিদ্যৈঃ" এই তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করায় এই সূত্রে উহারই বিশেষ্য প্রকাশ করিতেই এই সূত্রেও তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা যায়। এবং "অনসূয়িভিঃ" এই পদের দ্বারা ঐ শিষ্যাদির বিশেষণ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ শিষ্য প্রভৃতি অসূয়াবিশিষ্ট হইলে তাঁহাদিগের সহিত সংবাদ করিতে যাইবে না। কারণ, তাহাতে উঁহাদিগের জিগীষা উপস্থিত হইলে নিজেরও জিগীষা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে আর ঐ স্থলে "বাদ"বিচার হইবে না। কারণ, জিগীষাশূন্য হইয়া কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে বিচার হয়, তাহাকেই "বাদ" বলে। সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রের শেষোক্ত "সংবাদ"ই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রোক্ত "অভ্যুপেয়াৎ" এই ক্রিয়াপদে লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তৎ তদ্বিদ্যাৎ।" কিন্তু এই ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত তৃতীয়ান্ত পদের অর্থসংগতি এবং "তৎ" এই স্থলে একবচন প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া বুঝা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার লিখিয়াছেন,—"তদনেন গুর্ব্বাদিভির্ব্বাদং কৃত্বা তত্ত্বনির্ণয় উক্তঃ।" অর্থাৎ এই সূত্রের দ্বারা শিষ্য, গুরু প্রভৃতির সহিত এবং গুরুও শিষ্য প্রভৃতির সহিত "বাদ"বিচার করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিবেন, ইহাই উক্ত হইয়াছে। নিজের তত্ত্বনির্ণয় দৃঢ় করিবার জন্যও জিগীষাশূন্য হইয়া তদ্বিষয়ে "বাদ" বিচার করিবেন এবং অভিমানশূন্য হইয়া গুরুও শিষ্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া এবং শিষ্যও সহাধ্যায়ী প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত "বাদ"বিচার করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিবেন। তাই মহর্ষি, সূত্রশেষে বলিয়াছেন,—"অভ্যুপেয়াৎ"। তাৎপর্য্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অভ্যুপেয়াদভিমুখমুপেত্য জানীয়াদ্‌গুর্ব্বাদিভিঃ সহেত্যর্থঃ।" অর্থাৎ অভিমুখে উপস্থিত হইয়া গুরু প্রভৃতির সহিত পূর্ব্বসূত্রোক্ত "সংবাদ" জানিবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় গুরু প্রভৃতির সহিত "সংবাদ" করিবে, এই বিবক্ষিত অর্থ ব্যক্ত হয় না। সূত্রে "তৎ (সংবাদং) অভ্যুপেয়াৎ" এইরূপ যোজনাই সূত্রকারের অভিমত, ইহা পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যারম্ভে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ব্যক্ত আছে। আমাদিগের মনে হয়, সূত্রে "অভ্যুপেয়াৎ" এই ক্রিয়াপদের দ্বারা অভিমুখে উপস্থিত হইয়া প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত। গত্যর্থ ধাতুর প্রাপ্তি অর্থও প্রসিদ্ধ আছে। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, অসূয়াশূন্য শিষ্যাদির অভিমুখে উপস্থিত

হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সেই "সংবাদ" (তত্ত্বনির্ণয়ার্থ "বাদ"বিচার) প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ উহা অবলম্বন করিবে। তাহা হইলে ঐরূপ শিষ্যাদির সহিত "বাদ" বিচার করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিবে, এই তাৎপর্য্যার্থই উহার দ্বারা প্রকটিত হয়। আরও মনে হয়, এই সূত্রে মহর্ষির "অভ্যুপেয়াৎ" এই ক্রিয়াপদের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বসূত্রোক্ত "সংবাদ" শব্দের অর্থ যে সমীপে উপস্থিত হইয়া "বাদ", ইহাও বিভক্ত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যেই মহর্ষি এই সূত্রে ঐরূপ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। তদনুসারেই ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্র-ভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন,—"সময়াবাদঃ সংবাদঃ।" কেবল তত্ত্ব নির্ণয়োদ্দেশ্যে জিগীষাশূন্য হইয়া যে বিচার বা "কথা" হয়, তাহার নাম "বাদ" (প্রথম খণ্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। গুরু, শিষ্যের সহিতও "বাদ" বিচার করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিবেন। শিষ্য নিকটে উপস্থিত না থাকিলে তত্ত্ব-নির্ণয়ের অত্যাবশ্যকতাবশতঃ তিনিই সাগ্রহে শিষ্যের নিকটে উপস্থিত হইবেন। সাধনা ও উদ্দেশ্যের গুরুত্বের মহিমায় প্রকৃত গুরুর ঐরূপ নিরভিমানতা, সারল্য ও সদ্‌বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া অব্যাহত থাকে। ঋষিগণ ও ভারতের প্রাচীন গুরুগণ নিজের শিষ্যকে তাঁহার সাধনা ও তত্ত্বনির্ণয়ের প্রধান সহায় মনে করিতেন। মহর্ষি গোতমও এই সূত্রে শিষ্যের ঐ প্রাধান্য সূচনা করিতে গুরুর পূর্ব্বেই শিষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সুধী পাঠক ইহা লক্ষ্য করিবেন ॥৪৮॥

ভাষ্য। যদি চ মন্যেত—পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ প্রতিকূলঃ পরস্যেতি[1]।

অনুবাদ। যদিও মনে কর, পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ অপরের (পূর্ব্বসূত্রোক্ত শিষ্য ও গুরু প্রভৃতির) প্রতিকূল অর্থাৎ তজ্জন্য তাঁহাদিগের সহিত বাদবিচারও উচিত নহে, (এ জন্য মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্র বলিয়াছেন)।

সূত্র। প্রতিপক্ষহীনমপি বা প্রয়োজনার্থমর্থিত্বে ॥ ॥৪৯॥৪৫৯॥

অনুবাদ। অথবা অর্থিত্ব (কামনা) অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে "প্রয়োজনার্থ" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান নির্ণয়রূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রতিপক্ষহীন ভাবে অর্থাৎ নিজের পক্ষ স্থাপন না করিয়া, সেই "সংবাদ" অভিমুখে উপস্থিত হইয়া প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্য। "তমভ্যুপেয়া"দিতি বর্ত্ততে। পরতঃ প্রজ্ঞামুপাদিৎসমান-স্তত্ত্ব-বুভুৎসাপ্রকাশনেন স্বপক্ষমনবস্থাপয়ন্ স্বদর্শনং পরিশোধয়েদিতি। অন্যোন্যপ্রত্যনীকানি চ প্রাবাদুকানাং দর্শনানি[2]।

১। যদিচ মন্যেত "পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ প্রতিকূলঃ পরস্য"—গুর্ব্বাদেস্তস্মান্ন বাদোঽপ্যুচিত ইতি,—তত্রেদং সূত্র-মুপতিষ্ঠতে।—তাৎপর্য্যটীকা।

২। গুর্ব্বাদিকৃতাদ্‌বিচারাৎ পূর্ব্বপক্ষোচ্ছেদেন সিদ্ধান্তব্যবস্থাপনলক্ষণাৎ স্বদর্শনং পরিশোধয়েৎ। "অন্যোন্য-প্রত্যনীকানি চ প্রাবাদুকানাং দর্শনানি" অযুক্তপরিত্যাগেন যুক্তপরিগ্রহণেনচ পরিশোধয়েদিতি সম্বধ্যতে।—তাৎপর্য্যটীকা।

অনুবাদ। "তমভ্যুপেয়াৎ" ইহা বর্ত্তমান আছে অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্র হইতে ঐ পদদ্বয় অথবা "তং" ইত্যাদি সমস্ত সূত্রবাক্যেরই এই সূত্রে অনুবৃত্তি অভিপ্রেত। (তাৎপর্য্য) অপর (গুর্ব্বাদি) হইতে "প্রজ্ঞা" (তত্ত্বজ্ঞান) গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া—তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রকাশের দ্বারা নিজের পক্ষ স্থাপন না করিয়া নিজের দর্শনকে পরিশোধিত করিবেন। এবং "প্রাবাদুক"দিগের অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী দার্শনিক-দিগের পরস্পর বিরুদ্ধ দর্শনসমূহকে পরিশোধিত করিবেন।

টিপ্পনী। কেহ বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বসূত্রে শিষ্যাদির সহিত যে, বাদবিচার কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে, তাহাও মুমুক্ষুর পক্ষে উচিত নহে। কারণ, বাদবিচারেও পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহ আবশ্যক। অর্থাৎ একজন বাদী হইয়া নিজের পক্ষ স্থাপন করিবেন; অপরে প্রতিবাদী হইয়া উহার খণ্ডন করিয়া তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিবেন। বাদীর যাহা পক্ষ, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ। প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, তাহা বাদীর প্রতিপক্ষ। সুতরাং ঐ পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহ উভয়ের পক্ষেই প্রতিকূল। সুতরাং উহা করিতে গেলে উভয়েরই রাগদ্বেষাদি উপস্থিত হইতে পারে। অনেক সময়ে তাহা হইয়াও থাকে। বাদী ও প্রতিবাদী জিগীষাশূন্য হইয়া বিচারের আরম্ভ করিলেও পরে জিগীষার প্রভাবে জল্প ও বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা অনেক স্থলে দেখাও যায়। অতএব যিনি মুমুক্ষু, তিনি কাহারও সহিত কোনরূপ বিচারই করিবেন না। মহর্ষি এ জন্য পরে আবার এই সূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যে প্রথমে "যদিদং মন্যেত" এইরূপ পাঠই সকল পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে "যদি চ" ইত্যাদি ভাষ্যপাঠই উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং উহাই প্রকৃত পাঠ বুঝা যায়। ভাষ্যকার "যদি" শব্দের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইলেও যাহাদিগের রাগদ্বেষমূলক জিগীষা উপস্থিত হয়, তাহারা ত মুমুক্ষুই নহে, তাহারা বাদবিচারে অধি-কারীও নহে। কিন্তু যাঁহারা শ্রেয়োর্থী অর্থাৎ মুমুক্ষু, যাঁহারা বহুসাধনসম্পন্ন, সুতরাং অসূয়াদি-শূন্য, তাঁহারা তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইলে কখনই তাঁহাদিগের রাগদ্বেষমূলক জিগীষা জন্মে না। পূর্ব্বসূত্রে ঐরূপ ব্যক্তির সহিতই বাদবিচার কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যে পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহ, উহা অপরের প্রতিকূল হইতেই পারে না। তবে যদি কেহ কোন স্থলে ঐরূপ আশঙ্কা করেন, তজ্জন্যই মহর্ষি পক্ষান্তরে এই সূত্রের দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন যে, অথবা প্রতিপক্ষহীন যেরূপে হয়, সেইরূপে অর্থাৎ অপরের প্রতিপক্ষ যে নিজের পক্ষ, তাহার সংস্থা-পন না করিয়াই অভিমুখে যাইয়া সেই "সংবাদ" প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বসূত্র হইতে "তং অভ্যুপেয়াৎ" এই বাক্যের অনুবৃত্তি এই সূত্রে মহর্ষির অভিপ্রেত। সূত্রে "প্রতিপক্ষহীনং" এই পদটী ক্রিয়ার বিশেষণ-পদ। "প্রতিপক্ষহীনং যথা স্যাত্তথা তমভ্যুপেয়াৎ" এইরূপ ব্যাখ্যাই মহর্ষির অভিমত। সূত্রে "অপি বা" এই শব্দটী পক্ষান্তরদ্যোতক। পক্ষান্তর সূচনা করিতেও ঋষিবাক্যে অন্যত্রও

"অপি বা" এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়[১]। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে "বা" শব্দকে নিশ্চয়ার্থক বলিয়াছেন। কিন্তু "অপি" শব্দের কোন উল্লেখ করেন নাই।

ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রোক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষু পূর্ব্বসূত্রোক্ত গুরুপ্রভৃতি হইতে তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাদিগের নিকটে যাইয়া নিজের তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রকাশপূর্ব্বক নিজের পক্ষস্থাপন না করিয়া নিজের দর্শনকে পরিশোধিত করিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী দার্শনিকগণের পরস্পর বিরুদ্ধ দর্শনসমূহও পরিশোধিত করিবেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুমুক্ষু গুরু প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত হইয়া 'আমি শরীরাদি পদার্থ হইতে আত্মার ভেদ বুঝিতে ইচ্ছা করি' ইহা বলিয়া নিজের তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রকাশ করিবেন, কিন্তু নিজের কোন পক্ষ স্থাপন করিবেন না। তখন ঐ গুরু প্রভৃতি উক্ত বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ ও উহার খণ্ডনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন পর্য্যন্ত যে বিচার করিবেন, তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া, উহার দ্বারা নিজের দর্শন অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে পূর্ব্বজাত জ্ঞানবিশেষকে পরিশোধিত করিবেন এবং পরস্পর বিরুদ্ধ যে সমস্ত দর্শন আছে, তাহাও তন্মধ্যে অযুক্ত পরিত্যাগ করিয়া ও যুক্ত গ্রহণ করিয়া পরিশোধিত করিবেন। অর্থাৎ কোন পক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অপরের বিচার শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাস্য তত্ত্ব বুঝিয়া লইলে সেখানে অপরের প্রতিকূল কিছুই না থাকায় জিগীষার কোন সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকে না। যদিও গুরু প্রভৃতিকৃত সেই বিচার সেখানে "বাদ" হইতে পারে না। কারণ, উভয় পক্ষের সংস্থাপন না হইলে "বাদ" হয় না। তথাপি সেই বিচারেও কাহারও জিগীষা না না থাকায় এবং বাদের ন্যায় উহাও তত্ত্বনির্ণয় সম্পাদন করায় উহা বাদকার্য্যকারী বলিয়া বাদতুল্য। তাই উহাকেও গৌণ অর্থে পূর্ব্বসূত্রোক্ত "সংবাদ" বলা হইয়াছে।

ভাষ্যে স্বদর্শন শব্দের দ্বারা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পূর্ব্বজাত জ্ঞানবিশেষই বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাঁহার পূর্ব্বজাত জ্ঞান কোন অংশে ভ্রম হইলে তাহা বুঝিয়া, পরজাত জ্ঞানে যে যথার্থতা বোধ হয়, তাহাই ঐ জ্ঞানের পরিশোধন। গুরু প্রভৃতির নিকট হইতে পুনর্ব্বার জ্ঞাত তত্ত্ব বিষয়ে বিচার শ্রবণ করিলে নিজের সেই জ্ঞানের পরিশোধন হয় এবং উহা সুদৃঢ় তত্ত্বনির্ণয় উৎপন্ন করে। এবং ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী দার্শনিকগণের যে সমস্ত পরস্পর বিরুদ্ধ দর্শন, তন্মধ্যে যাহা অযুক্ত, তাহার ত্যাগ ও যাহা যুক্ত, তাহার গ্রহণই উহার পরিশোধন। ভাষ্যকারের শেষোক্ত "দর্শন" শব্দ মতবিশেষ বা সিদ্ধান্তবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা যায়। "দর্শন" শব্দ যে, জ্ঞানবিশেষের ন্যায় দার্শনিক মতবিশেষ এবং সেই মতপ্রতিপাদক শাস্ত্রবিশেষ অর্থেও প্রাচীন কালে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং পরস্পর বিরুদ্ধ দার্শনিক মতগুলি "প্রবাদ" নামেও কথিত হইয়াছে, এ বিষয়ে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি (তৃতীয় খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যোগদর্শনভাষ্যেও সাংখ্য ও যোগাদিকে "প্রবাদ" বলা

১। "দ্বিজাতিভ্যো ধনং লিপ্সেৎ প্রশস্তেভ্যো দ্বিজোত্তমঃ।
অপি বা ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যাৎ"—ইত্যাদি "প্রায়শ্চিত্তবিবেকে' উদ্ধৃত ব্যাসবচন

হইয়াছে[১]। যাঁহারা কোনও মতবিশেষকে আশ্রয় করিয়া পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক সেই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা "প্রাবাদুক" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের "দর্শন" অর্থাৎ মতসমূহের মধ্যে যেগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ মুমুক্ষুর নিজের অধিগত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই সমস্ত মতেরও পরিশোধন করিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। তাই ভাষ্যকার বিশেষণপদ বলিয়াছেন—"অন্যোন্যপ্রত্যনীকানি।" উহার ব্যাখ্যা "পরস্পর-বিরুদ্ধানি" ॥৪৯॥

তত্ত্বজ্ঞানবিবৃদ্ধি-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৫॥

ভাষ্য। স্বপক্ষরাগেণ চৈকে ন্যায়মতিবর্ত্তন্তে, তত্র—

অনুবাদ। কেহ কেহ নিজের পক্ষে অনুরাগবশতঃ ন্যায়কে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান হন, অর্থাৎ তাঁহারা ন্যায়াভাসের দ্বারা অশাস্ত্রীয় বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উপস্থিত হন, সেই স্থলে—

সূত্র। তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্প-বিতণ্ডে, বীজ-প্ররোহ-সংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ ॥৫০॥৪৬০॥

অনুবাদ। বীজ হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরের সংরক্ষণের নিমিত্ত কণ্টক-শাখার দ্বারা আবরণের ন্যায় তত্ত্ব-নিশ্চয়ের সংরক্ষণের নিমিত্ত জল্প ও বিতণ্ডা কর্ত্তব্য।

ভাষ্য। অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানানামপ্রহীণদোষাণাং তদর্থং ঘটমানানা-মেতদিতি।

অনুবাদ। "অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞান" অর্থাৎ যাঁহাদিগের মননাদির দ্বারা সুদৃঢ় তত্ত্বনিশ্চয় জন্মে নাই এবং "অপ্রহীণদোষ" অর্থাৎ যাঁহাদিগের রাগদ্বেষাদি দোষ প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ হয় নাই, কিন্তু তন্নিমিত্ত "ঘটমান" অর্থাৎ সেই তত্ত্বনিশ্চয়াদির জন্য যাঁহারা প্রযত্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই সূত্র কথিত হইয়াছে।

টিপ্পনী। অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য পূর্ব্বোক্ত শিষ্য প্রভৃতির সহিত "বাদ"-বিচার কর্ত্তব্য হইলেও "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র প্রয়োজন কি? মহর্ষি প্রথম সূত্রে "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র তত্ত্বজ্ঞানকেও নিঃশ্রেয়সলাভের প্রযোজক কিরূপে বলিয়াছেন? মোক্ষসাধন তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের জন্য উহার ত কোন আবশ্যকতাই বুঝা যায় না। তাই মহর্ষি পরে আবার এই প্রকরণ আরম্ভ করিয়া প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তত্ত্বনিশ্চয় সংরক্ষণের নিমিত্ত জল্প ও বিতণ্ডা কর্ত্তব্য। তাই শেষোক্ত এই প্রকরণ "তত্ত্বজ্ঞান-পরিপালন-প্রকরণ" নামে কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার

১। "সাংখ্যযোগাদয়স্তু প্রবাদাঃ" ইত্যাদি যোগদর্শনভাষ্য। ৪।২১।

মহর্ষির এই সূত্রোক্ত উপদেশের মূল কারণ ব্যক্ত করিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ নিজের পক্ষে অনুরাগবশতঃ অর্থাৎ যে কোনরূপে নিজপক্ষ সমর্থনোদ্দেশ্যে ন্যায়কে অতিক্রম করিয়া বিচার করিতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা নাস্তিক্যবশতঃ ন্যায়াভাসের দ্বারা অশাস্ত্রীয় মতের সমর্থন করিয়া আস্তিকের তত্ত্বনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন। সেই স্থলেই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তত্ত্ব-নিশ্চয় সংরক্ষণার্থ জল্প ও বিতণ্ডা কর্ত্তব্য বলিয়াছেন। মহর্ষি শেষে ইহার দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন যে, যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরের সংরক্ষণের জন্য কণ্টক-শাখার দ্বারা আবরণ করে। অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে কোন বীজ রোপণ করিলে যখন উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তখন গো মহিষাদি পশুগণ উহা বিনষ্ট করিতে পারে এবং অনেক সময়ে তাহা করিয়া থাকে। এ জন্য ঐ সময়ে উহার রক্ষাভিলাষী ব্যক্তি কণ্টকযুক্ত শাখার দ্বারা উহার আবরণ করিয়া থাকে। তাহা করিলে তখন গোমহিষাদি পশু উহা বিনষ্ট করিতে যায় না। বিনষ্ট করিতে গেলেও সেই শাখাস্থ কণ্টকের দ্বারা আহত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। সুতরাং ঐ অঙ্কুরের সংরক্ষণ হয়। ক্রমে উহা হইতে ধান্যাদি বৃক্ষের সৃষ্টি হয় এবং উহা পরিপক্ক হইয়া সুদৃঢ় হয়। অন্যত্র ঐ কণ্টকশাখা অগ্রাহ্য হইলেও যেমন অঙ্কুরের রক্ষার্থ কোন স্থলে উহাও গ্রাহ্য এবং নিতান্ত আবশ্যক, তদ্রূপ জল্প ও বিতণ্ডা অন্যত্র অগ্রাহ্য হইলেও দুর্দ্দান্ত নাস্তিকগণ হইতে অঙ্কুরসদৃশ তত্ত্বনিশ্চয় সংরক্ষণের নিমিত্ত কোন স্থলে কণ্টক-শাখার সদৃশ জল্প ও বিতণ্ডা গ্রাহ্য ও নিতান্ত আবশ্যক। উহা গ্রহণ করিলে নাস্তিকগণ পরাজয়-ভয়ে আর নিজপক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রবৃত্ত হইলেও নানা নিগ্রহরূপ কণ্টকের দ্বারা ব্যথিত হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে। সুতরাং আর নাস্তিক-সংসর্গের সম্ভাবনা না থাকায় শাস্ত্র হইতে শ্রুত তত্ত্বের মননের কোন বাধা হইবে না, সেই মননরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অপ্রামাণ্যশঙ্কাও জন্মিবে না। সুতরাং ক্রমে উহা পরিপক্ক হইবে। পরে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা সেই শ্রুত ও যুক্তির দ্বারা মত অর্থাৎ যথার্থরূপে অনুমত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে মোক্ষ হইবে। ফলকথা, মুমুক্ষু ব্যক্তি সমাধিবিশেষের অভ্যাস দ্বারা তাঁহার শ্রুত ও মত তত্ত্বেরই সাক্ষাৎকার করিবেন। কারণ, শ্রুতিতে শ্রবণ ও মননের পরে নিদিধ্যাসন উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং নিদিধ্যাসন দ্বারা সাক্ষাৎকরণীয় সেই তত্ত্বেরই প্রথমে শ্রবণ ও মনন আবশ্যক। কিন্তু প্রথমে শাস্ত্র হইতে তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মনন আরম্ভ করিলে বা তৎপূর্ব্বেই যদি নাস্তিকগণ কুতর্কদ্বারা বেদাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য সমর্থনপূর্ব্বক তাঁহার সেই অঙ্কুরসদৃশ শ্রবণরূপ জ্ঞানকে বিনষ্ট করে অর্থাৎ সেই জ্ঞানের ভ্রমত্ব শঙ্কা উৎপন্ন করে, তাহা হইলে তাঁহার আর তত্ত্বসাক্ষাৎকারের আশাই থাকে না। কারণ, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। সুতরাং তখন তাঁহার সেই শ্রবণরূপ তত্ত্বনিশ্চয়ের সংরক্ষণের নিমিত্ত নাস্তিকের সহিত জল্প ও বিতণ্ডাও কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোৎপন্ন তত্ত্বনিশ্চয়ে ভ্রমত্বনিশ্চয় বা সংশয়ের অনুৎপত্তিই তত্ত্বনিশ্চয়ের সংরক্ষণ। মহর্ষি-সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তে প্রণিধান করিলে তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই আমরা বুঝিতে পারি।

কিন্তু ভাষ্যকার পরে "অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানানাং" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যাঁহা-

দিগের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই এবং রাগদ্বেষাদি দোষের প্রকৃষ্ট ক্ষয় হয় নাই, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানাদির জন্য প্রযত্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই এই সূত্র কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐরূপ ব্যক্তিগণই প্রয়োজন হইলে স্থলবিশেষে জল্প ও বিতণ্ডা করিবেন, ইহাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহা-দিগের কোনরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, যাঁহারা শাস্ত্র হইতেও তত্ত্ব শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদিরে তত্ত্ব-নিশ্চয়-সংরক্ষণ কিরূপে বলা যায়, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। অবশ্য ভাবী অঙ্কুরের সংরক্ষণের ন্যায় ভাবী তত্ত্বনিশ্চয়ের সংরক্ষণও বলা যাইতে পারে। এবং ভাবী তত্ত্বনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিই উহার সংরক্ষণ বলা যায়। কিন্তু তজ্জন্য যিনি জল্প ও বিতণ্ডা করিতে সমর্থ, যাঁহাকে মহর্ষি উহা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্র হইতে তত্ত্ব শ্রবণও করেন নাই, তিনি একেবারে অশাস্ত্রজ্ঞ, ইহা ত কোনরূপেই সম্ভব নহে। অতএব এখানে "অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞান" শব্দের দ্বারা যাঁহাদিগের কোনরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, এইরূপ অর্থই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র হইতে তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, পরে এই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নপূর্ব্বক তদনুসারে মননের আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সেই মনন ও "তদ্বিদ্য"দিগের সহিত সংবাদ সম্পন্ন হয় নাই, তাঁহাদিগকেই ঐ অবস্থায় ভাষ্যকার "অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞান" বলিয়াছেন বুঝা যায়। অর্থাৎ ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির এই ন্যায়শাস্ত্রসাধ্য সম্পূর্ণ মননরূপ তত্ত্বজ্ঞানকেই "তত্ত্ব-জ্ঞান" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। ঐরূপ ব্যক্তিগণের ঐ সময়ে রাগদ্বেষাদি দোষের প্রকৃষ্ট ক্ষয় হয় না। সুতরাং তাঁহাদিগের জল্প ও বিতণ্ডায় প্রবৃত্তি হইতে পারে। এবং তাঁহাদিগের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নাদি-জন্য জল্প ও বিতণ্ডার তত্ত্বজ্ঞান ও তদ্বিষয়ে দক্ষতাও জন্মিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা স্থলবিশেষে জল্প ও বিতণ্ডা করিয়া তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষা করিতে পারেন ও করিবেন। কিন্তু যাঁহারা মননরূপ সাধনা সমাপ্ত করিয়া নিদিধ্যাসনের সুদৃঢ় অভয় আসনে বসিয়াছেন, তাঁহাদিগের জল্প ও বিতণ্ডার কোন প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদিগের উহাতে প্রবৃত্তিও জন্মে না। তাঁহারা ক্রমে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকারলাভে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা নির্জ্জন স্থানেই সাধনায় নিরত থাকেন। তাঁহারা কোন নাস্তিক-সংসর্গ করেন না। তাঁহাদিগের জন-সংসদেও রতি নাই—"অরতির্জ্জন-সংসদি।" (গীতা)। সুতরাং মহর্ষি তাঁহাদিগের জন্য এই সূত্র বলেন নাই। কিন্তু প্রথমে তাঁহাদিগেরও সময়ে "বাদ"ও অত্যাবশ্যক হইলে "জল্প" ও বিতণ্ডা" এই "কথা"ত্রয় কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত কথাত্রয়-ব্যবস্থা যে আগমসিদ্ধ এবং শিষ্ট ব্যক্তির সহিত জল্প ও বিতণ্ডার নিষেধ থাকিলেও অশিষ্ট নাস্তিকদিগের দর্পভঙ্গের জন্য কদাচিৎ উহাও যে কর্ত্তব্য, ইহা আচার্য্য রামানুজের মতানুসারে শ্রীবৈষ্ণব বেঙ্কটনাথও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন[১] ॥৫০॥

১। আগমসিদ্ধা চেয়ং কথাত্রয়ব্যবস্থা। "বাদজল্পবিতণ্ডাভি"রিত্যাদিবচনাৎ। ভগবদ্‌গীতাভাষ্যেঽপি "বাদঃ প্রবদতামহ"মিত্যত্র জল্পবিতণ্ডাদি কুর্ব্বতাং তত্ত্বনির্ণয়ায় প্রবৃত্তো বাদো যঃ সোঽহমিতি ব্যাখ্যানাৎ কথাত্রয়ং দর্শিতং। এতেন "বিপ্রং নির্জ্জিত্য বাদতঃ," "ন বিগৃহ্য কথাং কুর্য্যা"দিত্যাদিভির্জ্জল্পবিতণ্ডয়োর্নিষেধোঽপি শিষ্টবিষয় ইতি দর্শিতং। কদাচিদ্‌বাহ্যকুদৃষ্টিদর্পভঙ্গায় তয়োরপি কার্য্যত্বাৎ।—"ন্যায়পরিশুদ্ধি", দ্বিতীয় আহ্নিক, ১৬৮ পৃষ্ঠা।

ভাষ্য। বিদ্যানির্ব্বেদাদিভিশ্চ পরেণাবজ্ঞায়মানস্য—

অনুবাদ। এবং বিদ্যা অর্থাৎ আত্মবিদ্যা-বিষয়ে নির্ব্বেদপ্রভৃতিবশতঃ অপর কর্ত্তৃক অবজ্ঞায়মান ব্যক্তির—

সূত্র। তাভ্যাং বিগৃহ্য কথনং ॥৫১॥৪৬১॥*

অনুবাদ। বিগ্রহ করিয়া অর্থাৎ বিজিগীষাবশতঃ সেই জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা কথন কর্ত্তব্য।

ভাষ্য। "বিগৃহ্যেতি" বিজিগীষয়া, ন তত্ত্ব-বুভুৎসয়েতি। তদেতদ্-বিদ্যাপরিপালনার্থং, ন লাভ-পূজা-খ্যাত্যর্থমিতি।

ইতি বাৎস্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ। "বিগৃহ্য" এই পদের দ্বারা বিজিগীষাবশতঃ, তত্ত্বজিজ্ঞাসাবশতঃ নহে, ইহা বুঝা যায়। সেই ইহা অর্থাৎ জিগীষাবশতঃ জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা কথন, "বিদ্যা" অর্থাৎ আত্মবিদ্যার পরিরক্ষণের নিমিত্ত—লাভ, পূজা ও খ্যাতির নিমিত্ত নহে, অর্থাৎ কোন লাভাদি উদ্দেশ্যে উহা কর্ত্তব্য নহে।

বাৎস্যায়ন-প্রণীত ন্যায়ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহর্ষির এই শেষোক্ত সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে যে সন্দর্ভের অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, কেবল যে, ভাষ্যকারের পূর্ব্বকথিত ব্যক্তিদিগেরই পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে জল্প ও বিতণ্ডা কর্ত্তব্য, তাহা নহে; কিন্তু বিদ্যানির্ব্বেদ প্রভৃতি কারণবশতঃ অপর কর্ত্তৃক অবজ্ঞায়মান ব্যক্তিরও বিগ্রহ করিয়া সেই জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা কথন কর্ত্তব্য। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত ঐ সন্দর্ভের সহিত সূত্রের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। "বিদ্যা" শব্দের দ্বারা এখানে সদ্বিদ্যা বা আত্মবিদ্যারূপ আন্বীক্ষিকী বিদ্যাই ভাষ্যকারের অভিমত বুঝা যায়। ঐ বিদ্যা বিষয়ে যে বিরক্তি, তাহাই "বিদ্যানির্ব্বেদ"। যাঁহারা ঐ বিদ্যায় বিরক্ত, কিন্তু নাস্তিক-বিদ্যাদিতে অনুরক্ত, তাঁহারা সেই বিদ্যা-বিরক্তিবশতঃ অথবা লাভ

* ন কেবলং তদর্থং ঘটমানানাং জল্পবিতণ্ডে, অপিতু "বিদ্যানির্ব্বেদাদিভিশ্চ পরেণাবজ্ঞায়মানস্য"—"তাভ্যাং বিগৃহ্য কথন"মিতি সূত্রং। যস্তু স্বদর্শনবিলসিতমিথ্যাজ্ঞানাবলেপদুর্ব্বিদগ্ধতয়া সদ্বিদ্যাবৈরাগ্যাদ্বা লাভপূজাখ্যাত্যর্থিতয়া কুহেতুভিরীশ্বরাণাং জনাধারাণাং পুরতো বেদব্রাহ্মণ-পরলোকাদিদূষণপ্রবৃত্তস্তং প্রতি বাদী সমীচীনদূষণমপ্রতিভয়াঽপশ্যন্ জল্পবিতণ্ডে অবতার্য্য বিগৃহ্য জল্পবিতণ্ডাভ্যাং তত্ত্বকথনং করোতি বিদ্যাপরিপালনায়। মা ভূদীশ্বরাণাং মতিবিভ্রমেণ তচ্চরিতমনুবর্ত্তিনীনাং প্রজানাং ধর্ম্মবিপ্লব ইতি। ইদমপি প্রয়োজনং জল্পবিতণ্ডয়োঃ। ন তু লাভ-খ্যাত্যাদি দৃষ্টং। নহি পরহিতপ্রবৃত্তঃ পরমকারুণিকো মুনির্দৃষ্টার্থং পরপাংসুলোপায়মুপদিশতীতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

পূজাদি প্রাপ্তির উৎকট ইচ্ছা প্রভৃতি অন্য কোন কারণবশতঃ বেদপ্রামাণ্যবিশ্বাসী আস্তিকদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং নানা স্থানে নানারূপে নাস্তিক-মতের প্রচার করেন। পূর্ব্বকালে ভারতে অনেক স্থানে অনেক বার নাস্তিক-সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবে ঐরূপ হইয়াছে এবং এখনও অনেক স্থানে বেদাদি শাস্ত্রবিশ্বাসী বর্ণাশ্রমধর্ম্মপক্ষপাতী ব্রাহ্মণদিগের অবজ্ঞা ও নিন্দার সহিত নাস্তিক মতের বক্তৃতা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ঐরূপ স্থলে নাস্তিক কর্ত্তৃক অবজ্ঞায়মান আস্তিকেরও বিগ্রহ করিয়া অর্থাৎ বিজয়েচ্ছাবশতঃ জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা তত্ত্বকথন কর্ত্তব্য, ইহাই ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং শেষে উহা যে আত্ম-বিদ্যার পরিরক্ষণের জন্যই মহর্ষি কর্ত্তব্য বলিয়াছেন—লাভ, পূজা ও খ্যাতির জন্য কর্ত্তব্য বলেন নাই, ইহাও বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য-টীকাকার ইহার তাৎপর্য্য সুব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অর্থাৎ নাস্তিক নিজের দর্শনোৎপন্ন মিথ্যা জ্ঞানের গর্ব্বে দুর্ব্বিনীততাবশতঃ অথবা সদ্বিদ্যাবৈরাগ্যবশতঃ লাভ, পূজা ও খ্যাতির ইচ্ছায় জনসমাজের আশ্রয় রাজাদিগের নিকটে অসৎ হেতু বা কুতর্কের দ্বারা বেদ, ব্রাহ্মণ ও পরলোকাদি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নিকটে তখন নিজের অপ্রতিভাবশতঃ তাহার মতের সমীচীন খণ্ডন বা প্রকৃত উত্তরের স্ফূর্ত্তি না হইলে জল্প ও বিতণ্ডার অবতারণা করিয়া, বিগ্রহ করিয়া আত্ম-বিদ্যার রক্ষার দ্বারা ধর্ম্মরক্ষক আস্তিক, আত্মবিদ্যার রক্ষার্থ জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা তত্ত্ব কথন করেন। কারণ, রাজাদিগের মতিবিভ্রমবশতঃ তাঁহাদিগের চরিতানুবর্ত্তী প্রজাবর্গের ধর্ম্মবিপ্লব না হয়, ইহাই উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহাও জল্পবিতণ্ডার প্রয়োজন। কিন্তু কোন লাভ, পূজা ও খ্যাতি প্রভৃতি দৃষ্টফল উহার প্রয়োজন নহে। মহর্ষি ঐরূপ কোন দৃষ্টফলের জন্য কোন স্থলেই জল্প ও বিতণ্ডার কর্ত্তব্যতার উপদেশ করেন নাই। কারণ, পরহিতপ্রবৃত্ত পরমকারুণিক মুনি (গোতম) দৃষ্টফললাভার্থ ঐরূপ পরদুঃখজনক উপায়ের উপদেশ করিতে পারেন না। তাৎপর্য্যটীকাকারের এই সমস্ত কথার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন কালেও নাস্তিকসম্প্রদায়ের কুতর্কের প্রভাবে অনেক রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তির মতিবিভ্রমবশতঃ প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণিত আছে। ঐরূপ স্থলে নাস্তিকসম্প্রদায়কে নিরস্ত করিয়া ধর্ম্মবিপ্লব নিবারণের জন্য ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষক বহু আচার্য্য তাহাদিগের মতের খণ্ডন ও আস্তিক মতের সমর্থনপূর্ব্বক প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ভারতের আত্মবিদ্যার রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা নাস্তিকমত খণ্ডনে প্রকৃত উত্তরের স্ফূর্ত্তিবশতঃ কোন অসৎ উত্তরের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। স্থলবিশেষে কেহ কেহ তাহাও আশ্রয় করিয়া নাস্তিকসম্প্রদায়কে নিরস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই অন্য পণ্ডিতগণের ন্যায় কোন লাভ, পূজা ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে কুত্রাপি জল্প ও বিতণ্ডা করেন নাই। কারণ, মহর্ষি গোতম তাহা করিতে উপদেশ করেন নাই। তিনি যেরূপ স্থলে ও যেরূপ উদ্দেশ্যে এখানে দুইটী সূত্রের দ্বারা "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র কর্ত্তব্যতার উপদেশ করিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের শেষে "ছল" ও "জাতি"র স্বরূপ বর্ণন করিয়া পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে নানারূপ "জাতি" বিভাগ ও লক্ষণাদি বলিয়াছেন, তাহা অধ্যয়নপূর্ব্বক

প্রণিধান করিয়া বুঝিলে তাঁহাকে কুতর্কের শিক্ষক বলিয়া নিন্দা করা যায় না এবং কোনরূপ লাভ, পূজা বা খ্যাতির জন্যই এই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন যে, তাঁহার অনভিমত, তাহাও বুঝা যায়।

সূত্রে "বিগৃহ্য" শব্দের দ্বারা বিজিগীষাবশতঃই জল্প ও বিতণ্ডা কর্ত্তব্য, ইহা সূচিত হইয়াছে। কারণ, বিজিগীষু ব্যক্তিই অপরের সহিত বিগ্রহ করে। সুতরাং বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে জিগীষা-শূন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষেই বাদ বিচার কর্ত্তব্য এবং জিগীষুর পক্ষেই জল্প ও বিতণ্ডা কর্ত্তব্য, এই সিদ্ধান্তও এই সূত্রে মহর্ষি 'বিগৃহ্য' এই পদের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। "বাদ" "জল্প" ও "বিতণ্ডা" এই ত্রিবিধ বিচারের নাম কথা। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে ভাষ্যকার ইহা বলিয়াছেন। সেখানে ঐ ত্রিবিধ কথার লক্ষণাদিও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে (১৯শ।২৩শ) দুই সূত্রে মহর্ষি নিজেও "কথা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ "কথা" শব্দটী "বাদ" "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র বোধক পারিভাষিক শব্দ। মহর্ষি বাল্মীকিও গোতমোক্ত ঐ পারিভাষিক "কথা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তিনি গোতমের এই সূত্রের ন্যায় সেখানে "কথা" শব্দের পূর্ব্বে "বিগৃহ্য" এই শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন[১]। কিন্তু মহর্ষি গোতম এই সূত্রে স্বল্পাক্ষর "কথা" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "কথন" শব্দের প্রয়োগ করায় উহার দ্বারা বচনরূপ কথনই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"তত্ত্বকথনং করোতি" অর্থাৎ প্রতিবাদী আস্তিক, জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা নাস্তিকের মত খণ্ডন করিয়া, পরে রাজাদির নিকটে প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন; ইহাই তাঁহার তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

এখানে "তাভ্যাং বিগৃহ্য কথনং" ইহা ভাষ্যকারেরই বাক্য, উহা মহর্ষি গোতমের সূত্র নহে, এই-রূপ মতও কেহ কেহ সমর্থন করিতেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার বাচ-স্পতি মিশ্র উহা সূত্র বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাশ করায় এবং "ন্যায়সূচীনিবন্ধে"ও উহা সূত্রমধ্যে গ্রহণ করায় এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এই সূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করায় উহা সূত্র বলিয়াই গ্রাহ্য। পরন্তু মহর্ষি এখানে পৃথক্ প্রকরণের দ্বারাই শেষোক্ত ঐ সিদ্ধান্তের প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে "তাভ্যাং বিগৃহ্য কথনং" এই বাক্যটি তাঁহার এই প্রকরণের দ্বিতীয় সূত্র, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, এক সূত্রের দ্বারা প্রকরণ হয় না। "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য এই সূত্রের শেষে "তত্ত্বন্ত বাদরায়ণাৎ" এইরূপ আর একটি সূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক উহার কএক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত আর কেহই ঐরূপ সূত্রের উল্লেখ করেন নাই; আর কোন পুস্তকেই ঐরূপ সূত্র দেখাও যায় না। উহা মহর্ষি গোতমের সূত্র বলিয়া কোন মতে স্বীকার করাও যায় না (প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ২০শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)॥ ৫১॥

তত্ত্বজ্ঞান-পরিপালন-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৬॥

১। "ন বিগৃহ্য কথারুচিঃ"।—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড।২।৪২। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা—ষষ্ঠ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই আহ্নিকে প্রথমে তিন সূত্রে (১) তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি-প্রকরণ। পরে ১৪ সূত্রে (২) অবয়বাবয়বি-প্রকরণ। তাহার পরে ৮ সূত্রে (৩) নিরবয়ব-প্রকরণ। তাহার পরে ১২সূত্রে (৪) বাহ্যার্থ-ভঙ্গনিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ১২সূত্রে (৫) তত্ত্ব-জ্ঞানবিবৃদ্ধি-প্রকরণ। তাহার পরে ২সূত্রে (৬) তত্ত্ব-জ্ঞানপরিপালন-প্রকরণ।

৬ প্রকরণ ও ৫১ সূত্রে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥

পঞ্চম অধ্যায়

ভাষ্য। সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানস্য বিকল্পাজ্জাতিবহুত্বমিতি সংক্ষেপেণোক্তং, তদ্বিস্তরেণ বিভজ্যতে। তাঃ খল্বিমা জাতয়ঃ স্থাপনা-হেতৌ প্রযুক্তে চতুর্ব্বিংশতিঃ প্রতিষেধহেতবঃ—

অনুবাদ। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যমাত্র দ্বারা প্রত্যবস্থানের (প্রতিষেধের) "বিকল্প" অর্থাৎ নানাপ্রকারতাবশতঃ জাতির বহুত্ব, ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, তাহা সবিস্তর বিভক্ত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হইতেছে।

স্থাপনার হেতু প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ জিগীষু কোন বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিষেধের হেতু অর্থাৎ বাদীর সেই পক্ষপ্রতিষেধের জন্য জিগীষু প্রতিবাদি-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত প্রতিষেধক বাক্য বা উত্তর, সেই এই সমস্ত (পরবর্ত্তি-সূত্রোক্ত) চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার জাতি—

সূত্র। সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যোৎকর্ষাপকর্ষ-বর্ণ্যাবর্ণ্য-বিকল্প-সাধ্য-প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গ-প্রতিদৃষ্টান্তানুৎপত্তি-সংশয়-প্রকরণাহেত্বর্থাপত্ত্যবিশেষোপপত্ত্যুপলব্ধ্যনুপ-লব্ধ্যনিত্য-নিত্যকার্য্যসমাঃ ॥১॥ ৪৬২॥ *

অনুবাদ। (১) সাধর্ম্ম্যসম, (২) বৈধর্ম্ম্যসম, (৩) উৎকর্ষসম, (৪) অপকর্ষসম, (৫) বর্ণ্যসম, (৬) অবর্ণ্যসম, (৭) বিকল্পসম, (৮) সাধ্যসম, (৯) প্রাপ্তিসম, (১০) অপ্রাপ্তিসম, (১১) প্রসঙ্গসম, (১২) প্রতিদৃষ্টান্তসম, (১৩) অনুৎপত্তিসম,

---

* মুদ্রিত "ন্যায়দর্শন", "ন্যায়বার্ত্তিক," "ন্যায়সূচীনিবন্ধ", "ন্যায়মঞ্জরী" ও "তার্কিকরক্ষা" প্রভৃতি পুস্তকে এই সূত্রের শেষে "নিত্যানিত্যকার্য্যসমাঃ" এইরূপ পাঠ দেখা যায় এবং "তার্কিকরক্ষা" ভিন্ন অন্যান্য পুস্তকে "প্রকরণহেত্বর্থা" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু মহর্ষি পরে ১৮শ সূত্রে "অহেতুসম" নামক প্রতিষেধেরই লক্ষণ বলিয়াছেন এবং শেষে ৩২শ সূত্রে "অনিত্যসম" নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়া, তাহার পরে ৩৫শ সূত্রে "নিত্যসম" নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং এই সূত্রেও "অনিত্য" শব্দের পরেই তিনি "নিত্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এখানে মহর্ষির শেষোক্ত ঐ সমস্ত সূত্রানুসারেই সূত্রপাঠ নির্ণয়পূর্ব্বক গৃহীত হইল।

(১৪) সংশয়সম, (১৫) প্রকরণসম, (১৬) অহেতুসম, (১৭) অর্থাপত্তিসম, (১৮) অবিশেষসম, (১৯) উপপত্তিসম, (২০) উপলব্ধিসম, (২১) অনুপলব্ধিসম, (২২) অনিত্যসম, (২৩) নিত্যসম ও (২৪) কার্য্যসম, অর্থাৎ উক্ত "সাধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি নামে পূর্ব্বোক্ত সেই জাতি বা প্রতিষেধ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার।

ভাষ্য। সাধর্ম্ম্যেণ প্রত্যবস্থানমবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতুতঃ **সাধর্ম্ম্যসমঃ**। অবিশেষং তত্র তত্রোদাহরিষ্যামঃ। এবং **বৈধর্ম্ম্যসম**-প্রভৃতয়োঽপি নির্ব্বক্তব্যাঃ।

অনুবাদ। স্থাপনার হেতু হইতে "অবিশিষ্যমাণ" অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক হেতু হইতে নির্ব্বিশেষ বা উহার তুল্য বলিয়া প্রতিবাদীর অভিমত, সাধর্ম্ম্যমাত্র দ্বারা "প্রত্যবস্থান" (প্রতিষেধ) "সাধর্ম্ম্যসম", অর্থাৎ জিগীষু প্রতিবাদী কেবল কোন একটী সাধর্ম্ম্য দ্বারাই বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ করিলেই তাহার সেই প্রতিষেধক বাক্য বা উত্তর "সাধর্ম্ম্যসম" নামক "প্রতিষেধ" (জাতি)। সেই সেই উদাহরণে অবিশেষ প্রদর্শন করিব (অর্থাৎ অবিশেষ না থাকিলেও উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপে বাদীর হেতু হইতে তাহার প্রতিষেধ বা হেতুর অবিশেষ বলেন, তাহা যথাস্থানে "সাধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধের সমস্ত উদাহরণে প্রদর্শন করিব) এইরূপে "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতিও "নির্ব্বক্তব্য" অর্থাৎ "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি প্রকার প্রতিষেধেরও লক্ষণ বক্তব্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি গোতম ন্যায়দর্শনের সর্ব্বপ্রথম সূত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে শেষে যে "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র উদ্দেশ করিয়াছেন,—পরে যথাক্রমে দুই সূত্রের দ্বারা ঐ "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র সামান্য লক্ষণ সূচনা করিয়া, শেষ সূত্রের দ্বারা ঐ "জাতি" ও "নিগ্রহস্থান" যে বহু, ইহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন[১]। সুতরাং "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র পূর্ব্বোক্ত বহুত্ব প্রতিপাদনের জন্য উহার বিভাগাদি কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ঐ "জাতি" ও "নিগ্রহস্থান" কতপ্রকার এবং উহাদিগের বিশেষ বিশেষ নাম ও লক্ষণ কি, তাহা বলা আবশ্যক। নচেৎ ঐ পদার্থদ্বয়ের সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হয় না। তাই মহর্ষি গোতমের এই পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভ। এই অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে জাতির বিভাগ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতির বিশেষ বিশেষ নাম কীর্ত্তন এবং উহাদিগের লক্ষণ ও পরীক্ষা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় আহ্নিকে নিগ্রহস্থানের বিভাগপূর্ব্বক লক্ষণ বলা হইয়াছে। সুতরাং "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র বিভাগ এবং বিশেষ লক্ষণ ও "জাতি"র

১। সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ॥ বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং॥ তদ্বিকল্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থানবহুত্বং॥—১ম অঃ, ২য় আঃ, ১৮।১৯।২০।

পরীক্ষা এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য। এই পঞ্চম অধ্যায় অতি দুর্ব্বোধ। বহু পারিভাষিক শব্দ এবং ন্যায়শাস্ত্রোক্ত পঞ্চাবয়ব ও হেত্বাভাসাদি-তত্ত্বে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে এই পঞ্চম অধ্যায় বুঝা যায় না। এবং ঐ সমস্ত তত্ত্বে অব্যুৎপন্ন ব্যক্তিকে সহজ ভাষায় ইহা বুঝানও যায় না। বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া একাগ্রচিত্তে অনেকবার পাঠ না করিলেও ইহা বুঝা যাইবে না। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথও এই পঞ্চম অধ্যায়কে "অতিগহন" বলিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথের চরণাশ্রিত আমরাও এখানে দুর্গমতরণ শঙ্কর-চরণে নমস্কার করিয়া বিশ্বনাথের উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছি।

"নত্বা শঙ্করচরণং দীনস্য দুর্গমে তরণং।
সম্প্রতি নিরূপয়ামঃ পঞ্চমমধ্যায়মতিগহনং॥"

এই সূত্রের অবতারণা করিতে ভাষ্যকারের প্রথম কথার তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের সর্ব্বশেষ সূত্রে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যমাত্রপ্রযুক্ত যে "প্রত্যবস্থান" অর্থাৎ প্রতিষেধ, তাহার "বিকল্প" অর্থাৎ বিবিধ প্রকার থাকায় পূর্ব্বোক্ত জাতি বহু, ইহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। সেখানে উহার বিস্তার অর্থাৎ সবিশেষ নিরূপণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার অবশিষ্ট কর্ত্তব্যবশতঃ তিনি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জাতির বিভাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ এই সূত্রের দ্বারা "সাধর্ম্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি নামে পূর্ব্বোক্ত "জাতি"নামক প্রতিষেধ যে, চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, ইহাই প্রথমে বলিয়াছেন। পরে যথাক্রমে ঐ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতির লক্ষণ বলিয়া, উহাদিগের পরীক্ষাও করিয়াছেন।

এখানে অবশ্যই প্রশ্ন হয় যে, প্রথম অধ্যায়ের শেষে "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র সামান্য লক্ষণের পরেই ত ঐ উভয়ের বিভাগাদি করা উচিত ছিল। মহর্ষি তাহা না করিয়া সর্ব্বশেষে এই পৃথক্ অধ্যায়ের আরম্ভ করিয়া "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র সবিশেষ নিরূপণ করিয়াছেন কেন? আর সর্ব্বশেষে এই নিরূপণে সংগতিই বা কি? এতদুত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, "জাতি" ও "নিগ্রহস্থান" বহু। সুতরাং উহার সবিশেষ নিরূপণ বহু সময়সাধ্য। পূর্ব্বে যথাস্থানে তাহা করিতে গেলে অর্থাৎ এই অধ্যায়ের সমস্ত কথা পূর্ব্বেই বলিলে প্রমেয়পরীক্ষায় বহু বিলম্ব হইয়া যায়। শিষ্যগণেরও প্রমেয়-তত্ত্বজিজ্ঞাসাই বলবতী হইয়াছে। কারণ, প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানই মুমুক্ষুর প্রধান আবশ্যক। সংশয়াদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান উহার অঙ্গ অর্থাৎ নির্ব্বাহক। তাই মহর্ষি আবশ্যকবশতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয় ও প্রমাণের পরীক্ষা করিয়াই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমেয় পরীক্ষা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা বুঝিয়াই তত্ত্ব প্রকাশ করিতে হয়। কারণ, জিজ্ঞাসা না বুঝিয়া অজিজ্ঞাসিত বিষয়ে উপদেশ করিতে গেলে জিজ্ঞাসুর অবধান নষ্ট হয়। সুতরাং মহর্ষি তাঁহার উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত দ্বাদশ প্রমেয়ের পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াই সর্ব্বশেষে এই অধ্যায়ে তাঁহার অবশিষ্ট কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। ফল কথা, মহর্ষি প্রমেয় পরীক্ষার দ্বারা শিষ্যগণের বিরোধী জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়া পরে "অবসর"সংগতিবশতঃ এই অধ্যায়ের আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং উহা অসংগত হয় নাই। ("অবসর"-সংগতির লক্ষণাদি দ্বিতীয় খণ্ডে ২০২—৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। তাৎপর্য্যটীকাকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, ইতঃপূর্ব্বেই চতুর্থ অধ্যায়ের সর্ব্বশেষে "জল্প" ও "বিতণ্ডার" পরীক্ষাও

হইয়াছে। "জাতি" ও "নিগ্রহস্থান" ঐ "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র অঙ্গ। সুতরাং "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র পরীক্ষার পরে উহার অঙ্গ "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র সবিশেষ নিরূপণও অত্যাবশ্যক বলিয়া এখানে ঐ নিরূপণে অবান্তরসংগতিও আছে। বস্তুতঃ প্রমাণাদি অনেক পদার্থের পরীক্ষার পূর্ব্বে "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র অতি দুর্ব্বোধ সমস্ত তত্ত্ব সম্যক্ বুঝাও যায় না। তাই প্রকৃত বক্তা মহর্ষি গোতম পূর্ব্বে "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র সবিশেষ নিরূপণ করেন নাই। প্রথম অধ্যায়ের শেষে "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র সামান্য লক্ষণ বলিয়া সর্ব্বশেষে ঐ জাতি ও নিগ্রহস্থান যে বহু, সুতরাং তদ্বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য আছে—এইমাত্র বলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র বহুত্ব বিষয়ে সামান্য জ্ঞান জন্মিলে, পরে তদ্বিষয়ে শিষ্যগণের বিশেষ জিজ্ঞাসাও জন্মিবে, ইহাও মহর্ষির সেখানে ঐ শেষ সূত্রের উদ্দেশ্য।

এই সূত্রে "সাধর্ম্ম্য" হইতে "কার্য্য" পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি শব্দের দ্বন্দ্বসমাসের পরে যে "সম" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্য" প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দের সহিতই সম্বদ্ধ হওয়ায় "সাধর্ম্ম্য-সম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি নাম বুঝা যায়। মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্রে পুংলিঙ্গ "সম" শব্দেরই প্রয়োগ করায় এই সূত্রেও তিনি পুংলিঙ্গ "সম" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা যায়। তদনুসারেই ভাষ্যকার "সাধর্ম্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" ইত্যাদি নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্য-কার প্রথম অধ্যায়ে "জাতি"র সামান্য লক্ষণসূত্র-ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত যে "প্রত্যবস্থান"কে "প্রতি-ষেধ" বলিয়াছেন, ঐ প্রতিষেধকে বিশেষ্য করিয়াই এখানে সূত্রানুসারে "সাধর্ম্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি পুংলিঙ্গ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, "প্রতিষেধ" শব্দটি পুংলিঙ্গ। তাৎপর্য্যটীকা-কার বাচস্পতি মিশ্র, "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এইরূপই সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পরে তাঁহার নিজমতে ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রথম অধ্যায়ের সর্ব্বশেষে মহর্ষি "তদ্বিকল্পাৎ" ইত্যাদি সূত্রে পুংলিঙ্গ "বিকল্প" শব্দের প্রয়োগ করায় তদনুসারেই এখানে "সাধর্ম্ম্যসম" ইত্যাদি পুংলিঙ্গ নামেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সেই "বিকল্প"ই "সাধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি নামে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য। পরবর্ত্তী সূত্রেও পূর্ব্বোক্ত বিকল্পই বিশেষ্যরূপে মহর্ষির বুদ্ধিস্থ। "বিকল্প" শব্দের অর্থ এখানে বিবিধ প্রকার। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জাতিকেই বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করিলে "সাধর্ম্ম্যসমা" ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ নামেরও প্রয়োগ হয়। কারণ, "জাতি" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণও প্রায় সর্ব্বত্র ঐরূপ স্ত্রীলিঙ্গ নামের ব্যবহারই করিয়াছেন। আমরাও অনেক স্থলেই ঐ সমস্ত প্রসিদ্ধ নামেরই ব্যবহার করিব।

সুচিরকাল হইতেই "জন"ধাতুনিষ্পন্ন "জাতি" শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে[১]। তন্মধ্যে জন্ম অর্থই সুপ্রসিদ্ধ। "জাত্যা ব্রাহ্মণঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে জন্মই "জাতি" শব্দের অর্থ।

১। জাতিঃ সামান্যজন্মনোঃ।—অমরকোষ, নানার্থবর্গ। জাতির্জ্জাতীফলে ধাত্র্যাং চুল্লীকম্পিল্লয়োরপি" ইতি বিশ্বঃ। জাতিঃ স্ত্রী গোত্রজন্মনোঃ। অশ্মন্তিকামলক্যোশ্চ সামান্যচ্ছন্দ-সারপি। জাতীফলে চ মালত্যাং ইতি মেদিনী। অমরকোষের ভানুজি দীক্ষিতকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ" ইত্যাদি[১] ঋষিবচনেও "জন্মন্" শব্দের দ্বারা ঐ জাতিই কথিত হইয়াছে। যোগদর্শনে "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" (২।১৩) ইত্যাদি অনেক সূত্রেও জন্মবিশেষ অর্থেই "জাতি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ মনুষ্যত্ব, গোত্ব, অশ্বত্ব, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি বহু সামান্য ধর্ম্মও ন্যায়াদিশাস্ত্রে "জাতি" নামে কথিত হইয়াছে। বৈশেষিকসূত্রে উহা "সামান্য" নামে কথিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনেও "ন ঘটাভাবসামান্যনিত্যত্বাৎ" (২।২।১৪) ইত্যাদি সূত্রে "সামান্য" শব্দের দ্বারা ঐ জাতির উল্লেখ ও উহার নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে অনেক সূত্রে "জাতি" শব্দের দ্বারাই ঐ নিত্য জাতির উল্লেখ হইয়াছে। সাংখ্যাদি অনেক সম্প্রদায় ঐ জাতির আশ্রয় ব্যক্তি হইতে পৃথক্ জাতি পদার্থ অস্বীকার করিলেও মীমাংসক-সম্প্রদায় উহা স্বীকার করিয়াছেন। মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকর ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত "সত্তা" প্রভৃতি কতিপয় জাতি অস্বীকার করিলেও ব্যক্তিভিন্ন অনেক জাতি পদার্থ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। "প্রকরণপঞ্চিকা" গ্রন্থে "জাতিনির্ণয়" নামক তৃতীয় প্রকরণে মহামনীষী শালিকনাথ বিচারপূর্ব্বক জাতি বিষয়ে প্রভাকরের মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ফল কথা, মনুষ্যত্ব ও গোত্ব প্রভৃতি বহু সামান্য ধর্ম্মেও ন্যায়াদি শাস্ত্রে পারিভাষিক "জাতি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

কিন্তু ন্যায়দর্শনের সর্ব্বপ্রথম সূত্রে যে, পারিভাষিক "জাতি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ "জল্প" ও "বিতণ্ডা"য় প্রতিবাদীর অসদুত্তরবিশেষ। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের শেষে "সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ" এই সূত্রের দ্বারা উহার লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যায় প্রথমে প্রসঙ্গবিশেষকে "জাতি" বলিয়া, পরে ঐ "প্রসঙ্গ"কেই সূত্রোক্ত "প্রত্যবস্থান" বলিয়াছেন এবং পরে "উপালম্ভ" ও "প্রতিষেধ" শব্দের দ্বারা উহারই বিবরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহাকে "উপালম্ভ" ও "প্রতিষেধ" বলে, তাহাকেই "প্রত্যবস্থান" বলে, ইহাই সেখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য। যদ্দ্বারা প্রতিবাদী বাদীর প্রতিকূলভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ বাদীর পক্ষ খণ্ডনার্থ প্রবৃত্ত হন, এই অর্থে ঐ "প্রত্যবস্থান" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—প্রতিবাদীর পরপক্ষখণ্ডনার্থ উত্তর। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ স্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"প্রত্যবস্থানং দূষণাভিধানং" এবং অন্যত্র "উপালম্ভ" শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"উপালম্ভঃ পরপক্ষদূষণম্।" যদ্দ্বারা প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ অর্থাৎ খণ্ডন করেন, এই অর্থে "প্রতিষেধ" শব্দের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত "প্রত্যবস্থান" বা "উপালম্ভ" বুঝা যায়। সুতরাং ভাষ্যকার শেষে ঐ স্থলে উক্ত অর্থেই মহর্ষির ঐ সূত্রোক্ত জাতিকে "প্রতিষেধ" বলিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ খণ্ডনের জন্য কোন হেত্বাভাসের উল্লেখ করিলে অথবা মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার "ছল" করিলে, তাহাও ত তাঁহার "প্রত্যবস্থান" বা "প্রতিষেধ"। সুতরাং প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধমাত্রই জাতি, ইহা বলা যায় না। তাই মহর্ষি জাতির ঐ লক্ষণ-সূত্রে প্রথমে বলিয়াছেন,—"সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাম্"। অর্থাৎ জিগীষু

১। জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ।—অত্রিসংহিতা, ১৪০ শ্লোক।

প্রতিবাদী কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যমাত্র অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা যে প্রত্যবস্থান করেন, তাহাই "জাতি"। হেত্বাভাসের উল্লেখ বা "ছল" কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যমাত্রপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান না হওয়ায় উহা "জাতি"র উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতিই সর্ব্বত্র যে কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যমাত্রপ্রযুক্ত হওয়ায় উহা উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৪২০—২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে পরে এখানে এই সূত্রোক্ত চতুর্ব্বিংশতি জাতির সামান্য পরিচয় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বাদী প্রথমে তাঁহার নিজ পক্ষস্থাপনে হেতু প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে এই সমস্ত জাতি, প্রতিষেধের হেতু। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তিনি প্রথম অধ্যায়ে জাতির সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যায় জাতিকে যে "প্রতিষেধ" বলিয়াছেন, উহার অর্থ প্রতিষেধক বাক্য, ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। যদ্দ্বারা প্রতিষেধ করা হয়, এই অর্থে "প্রতিষেধ" শব্দের প্রয়োগ হইলে উহার দ্বারা প্রতিষেধক বাক্য বুঝা যায়, ইহা মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জাতি বস্তুতঃ বাদীর পক্ষের প্রতিষেধক হয় না; উহা অসদুত্তর বলিয়া বাদীর পক্ষপ্রতিষেধে সমর্থই নহে। তথাপি প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ-বুদ্ধিবশতঃ তদুদ্দেশ্যেই উহার প্রয়োগ করায় ভাষ্যকার উহাকে প্রতিষেধ-হেতু বলিয়াছেন। বার্ত্তিক-কারও এখানে প্রতিষেধে অসমর্থ হেতুকে জাতি বলিয়া ঐ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন[১]। অর্থাৎ প্রতিবাদীর মতে ঐ সমস্ত জাতি বাদীর পক্ষ-প্রতিষেধের হেতু। প্রতিবাদী ইহা মনে করিয়াই ঐ সমস্ত "জাতি"র প্রয়োগ করায় উহাকে প্রতিষেধের হেতু বলা হইয়াছে। প্রতিবাদীর নিজপক্ষ সাধনে প্রযুক্ত হেতু বা হেত্বাভাস "জাতি" নহে। সুতরাং ভাষ্যকার প্রভৃতি এখানে তাহা বলিতে পারেন না। ফলকথা, বাদীর পক্ষদূষণে অসমর্থ যে অসদুত্তরবিশেষ, তাহাই জাতি। উদ্দ্যোতকরের মতে উহাই জাতির সামান্যলক্ষণ। জয়ন্ত ভট্টও উক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়া উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য উক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়া স্বব্যাঘাতক উত্তরই জাতি, ইহা বলিয়াছেন। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ জাতির সামান্য লক্ষণ বিষয়ে উক্ত মতদ্বয়ই প্রকাশ করিয়াছেন[২]। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতদ্বয়ানুসারেই উক্ত দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন। "তর্কসংগ্রহ"দীপিকার টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্ট এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মাধবাচার্য্য প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থকার স্বব্যাঘাতক উত্তরকেই "জাতি" বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার জাতিই স্বব্যাঘাতক উত্তর, পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। সদুত্তর ও "ছল" নামক অসদুত্তরগুলি জাতির ন্যায় স্বব্যাঘাতক উত্তর নহে। সুতরাং স্বব্যাঘাতক উত্তরই জাতি, এইরূপ

১। তত্র জাতির্নাম স্থাপনাহেতৌ প্রযুক্তে যঃ প্রতিষেধাসমর্থো হেতুঃ।—ন্যায়বার্ত্তিক। প্রতিষেধবুদ্ধ্যা প্রযুক্ত ইতি শেষঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

২। তত্র তাবদ্‌যথাবার্ত্তিকং লক্ষণমাহ,—

প্রযুক্তে স্থাপনাহেতৌ দূষণাশক্তমুত্তরম্।
জাতিমাহুরথান্যে তু স্বব্যাঘাতকমুত্তরম্ ॥৩॥—তার্কিকরক্ষা।

লক্ষণ বলিলে উহাতে কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না। স্বব্যাঘাতক উত্তর, এই অর্থে মহর্ষি গোতমোক্ত এই "জাতি" শব্দটী পারিভাষিক। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে জাতির সামান্যলক্ষণ-সূত্রের ভাষ্যের শেষে ঐ পারিভাষিক "জাতি" শব্দেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, "জায়মানোঽর্থো জাতিঃ"। ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা তাঁহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, যাহা কেবল জন্মে, কিন্তু নিজেই নিজের ব্যাঘাতক হওয়ায় পরে ব্যাহত হইয়া যায় অর্থাৎ স্থায়ী হইতে পারে না, তাহাই ঐ "জাতি" শব্দের অর্থ। কিন্তু উহা "জাতি" শব্দের ব্যুৎপত্তি মাত্র, উহার দ্বারা উক্ত জাতির লক্ষণ কথিত হয় নাই। তাৎপর্য্যটীকাকারও সেখানে ইহাই বলিয়াছেন।

সুবিখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার "ন্যায়বিন্দু" গ্রন্থের সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন, "দূষণাভাসাস্তু জাতয়ঃ" [১]। অর্থাৎ যে সমস্ত উত্তর বস্তুতঃ বাদীর পক্ষের দূষণ বা দূষক নহে, কিন্তু তত্তুল্য বলিয়া "দূষণাভাস" নামে কথিত হয়, সেই সমস্ত উত্তরকে "জাতি" বলে। ধর্ম্মকীর্ত্তি পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যে সমস্ত বাক্যের দ্বারা বাদীর পক্ষে অসত্য দোষের উদ্ভাবন করেন, সেই সমস্ত বাক্যই জাত্যুত্তর। যদ্দ্বারা ঐ অসত্য দোষ উদ্ভাবিত হয়, এই অর্থে ঐ স্থলে প্রতিবাদীর সেই সমস্ত বাক্যকেই তিনি "উদ্ভাবন" বলিয়াছেন। সেখানে টীকাকার ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঐ "জাতি" শব্দ সাদৃশ্য-বোধক। বাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী উহার খণ্ডনার্থ প্রকৃত উত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া যে অসদুত্তর করেন, তাহা প্রকৃত উত্তরের স্থানে প্রযুক্ত হওয়ায় উত্তরের সদৃশ, তাই উহার নাম "জাতি" বা জাত্যুত্তর। প্রকৃত উত্তরের স্থানে প্রয়োগই উহাতে উত্তরের সাদৃশ্য। সুতরাং ঐ সাদৃশ্যবিশিষ্ট উত্তরকে ঐ তাৎপর্য্যে জাত্যুত্তর বলা হয়। অবশ্য "জাতি" শব্দের সাদৃশ্য অর্থও নিষ্প্রমাণ বলা যায় না। কোষকার অমর সিংহের নানার্থবর্গে "জাতিঃ সামান্যজন্মনোঃ" এই বাক্যে "সামান্য" শব্দের দ্বারা সমানতা বুঝিলে সাদৃশ্য অর্থও তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। "নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ" এই (১।১৫৪) সাংখ্যসূত্রে "জাতি" শব্দের এক পক্ষে সাদৃশ্য অর্থেরও ব্যাখ্যা আছে। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু প্রথমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "জাতিঃ সামান্যমেকরূপত্বং"। সুতরাং "জাতি" শব্দের সাদৃশ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া, যাহা প্রকৃত উত্তর নহে, কিন্তু উত্তরের সদৃশ, এই তাৎপর্য্যেও "জাত্যুত্তর" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। এবং ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের ঐরূপ ব্যাখ্যা যে, তাঁহার নিজেরই কল্পিত নহে, উহা পরম্পরাপ্রাপ্ত ব্যাখ্যা, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলেও উহা জাতি বা জাত্যুত্তরের সামান্য লক্ষণ বলা যায় না। কারণ, মহর্ষি গোতমোক্ত "ছল" নামক অসদুত্তরও অসত্য দোষের উদ্ভাবক এবং উত্তরসদৃশ, কিন্তু তাহা "জাতি" নহে। তবে জাত্যুত্তর স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ সাম্য বা সাদৃশ্যের অভিমান করেন, তাহাই "জাতি" শব্দের দ্বারা গ্রহণ

১। দূষণাভাসাস্তু জাতয়ঃ। অভূতদোষোদ্ভাবনানি জাত্যুত্তরাণীতি।—ন্যায়বিন্দু। দূষণবদাভাসন্তে ইতি দূষণাভাসাঃ। কে তে? জাতয়ঃ। জাতিশব্দঃ সাদৃশ্যবচনঃ। উত্তরসদৃশানি জাত্যুত্তরাণি। তদেবোত্তরসাদৃশ্যমুত্তরস্থানপ্রযুক্তত্বেন দর্শয়িতুমাহ "অভূত"স্য অসতস্য দোষস্য উদ্ভাবনানি। উদ্ভাব্যতে এভিরিত্যুদ্ভাবনানি বচনানি, তানি জাত্যুত্তরাণি। জাত্যা সাদৃশ্যেনোত্তরাণি জাত্যুত্তরাণীতি।—ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যকৃত টীকা।

করিলে সেই সাদৃশ্যবিশিষ্ট উত্তরই "জাতি" বা "জাত্যুত্তর" ইহা বলা যাইতে পারে। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

এখন এখানে মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত "জাতি"র সবিশেষ নিরূপণের প্রয়োজন কি? ইহা বুঝা আবশ্যক। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য এখানে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, বাদী নিজ বাক্যে "ছল", "জাতি" ও নিগ্রহস্থানের পরিবর্জ্জন করিবেন, অর্থাৎ বাদী নিজে উহার প্রয়োগ করিবেন না, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সুতরাং মহর্ষির এখানে জাতির সবিশেষ নিরূপণ অনাবশ্যক। কারণ, জাতির সামান্যজ্ঞানপ্রযুক্তই উহার পরিবর্জ্জন সম্ভব হওয়ায় তাহাতে উহার বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। পরন্তু "জাতি" অসদুত্তর। সুতরাং এই মোক্ষশাস্ত্রে উহার সবিশেষ নিরূপণ উচিতও নহে। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, জাতির সবিশেষ নিরূপণের প্রয়োজন পূর্ব্বেই ভাষ্যকার "স্বয়ঞ্চ সুকরঃ প্রয়োগঃ" এই বাক্যের দ্বারা বলিয়াছেন। এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্র-ভাষ্যশেষে "ছল", "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র পরিজ্ঞানের প্রয়োজন বুঝাইতে ঐগুলির স্বকীয় বাক্যে পরিবর্জ্জন ও প্রতিবাদীর বাক্যে পর্য্যনুযোগ কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়াছেন এবং জাতির পরিজ্ঞান থাকিলে প্রতিবাদীর প্রযুক্ত "জাতি"র সহজে সমাধান করা যায় এবং স্বয়ং জাতিপ্রয়োগও সুকর হয়, ইহাও শেষে "স্বয়ঞ্চ সুকরঃ প্রয়োগঃ" এই বাক্যের দ্বারা বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড—৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ঐ স্থলে প্রথমে ভাষ্যকারের পূর্ব্বাপর উক্তির বিরোধ সমর্থন করিয়া,উহার সমাধান করিতে ভাষ্যকারের শেষোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রতিবাদী কোন "জাতি"র প্রয়োগ করিলে জাতিবিষয়ে বিশেষজ্ঞ বাদীই তাহা জাত্যুত্তর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী তাঁহার নিজবাক্যে কোন "জাতি"র প্রয়োগ করিবেন না, ভাষ্যকারের এই পূর্ব্বোক্ত কথা সত্য। কিন্তু প্রতিবাদী যখন বাদীকে নিরস্ত করিবার জন্য কোন "জাতি"র প্রয়োগ করিবেন, তখন তিনি অবশ্যই সভ্যগণকে বলিবেন যে, ইনি জাতির প্রয়োগ করিতেছেন। তখন সভ্যগণ ঐ বাদীকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, কেন? ইহার এই উত্তর যে জাত্যুত্তর, ইহা কিরূপে বুঝিব? এবং চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতির মধ্যে ইহা কোন্ প্রকার? তখন সেই বাদী সভ্যগণকে তাহা বুঝাইবেন। জাতি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান থাকিলেই তিনি তাহা বুঝাইতে পারেন; নচেৎ তাহা পারেন না। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই পরে বলিয়াছেন, "স্বয়ঞ্চ সুকরঃ প্রয়োগঃ"; সুতরাং ঐ স্থলে ভাষ্যকারের পূর্ব্বাপর উক্তির কোন বিরোধ নাই। বাদী যে নিজবাক্যে জাতির প্রয়োগ করিবেন না, এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অব্যাহতই আছে। ফল কথা, বাদীরও "জাতি"র বিশেষ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। সুতরাং এই আহ্নিকে মহর্ষির "জাতি"র সবিশেষ নিরূপণ ব্যর্থ নহে।

উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, অথবা সাধু সাধন নিরাকরণের জন্য সময়বিশেষে বাদীরও "জাতি" প্রয়োগ কর্ত্তব্য হয়। সুতরাং তাঁহারও জাতির সবিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। অর্থাৎ প্রতিবাদী অসাধু সাধন প্রয়োগ করিলেও তখনই ঐ সাধনের অসাধুত্ব বা দোষের স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় বাদী

যদি ঐ সাধনকে সাধু বলিয়াই বুঝেন এবং যদি তাঁহার লাভ, পূজা বা খ্যাতির কামনা থাকে, তাহা হইলে তখন প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিবার জন্য তিনিও "জাতি"র প্রয়োগ করিবেন। নচেৎ তিনি নীরব হইলে তাঁহার ঐকান্তিক পরাজয় হয়। তদপেক্ষায় তাঁহার পরাজয় বিষয়ে সভ্যগণের সন্দেহও শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সদ্বিদ্যাবিদ্বেষী নাস্তিক, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে উপস্থিত হইলে তখন যদি শীঘ্র উহার নিরাসক হেতুর স্ফূর্ত্তি না হয়, তাহা হইলে দ্রষ্টাদিগের সম্মুখে ঐ নাস্তিকের নিকটে ঐকান্তিক পরাজয় অপেক্ষায় তদ্বিষয়ে তাহাদিগের সন্দেহও হউক, অথবা আমার কথঞ্চিৎ পরাজয় হউক, এই বুদ্ধিতে প্রতিবাদীর চক্ষুতে ধূলিনিক্ষেপের ন্যায় বাদীও জাতি প্রয়োগ করিবেন। তদ্দ্বারা প্রতিবাদী নিরস্ত হইলে সমাজে শাস্ত্রতত্ত্ব অবস্থাপিত থাকিবে। অন্যথা সমাজ অসৎপথে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ আস্তিকগণ প্রতিবাদী নাস্তিককে যে কোনরূপে নিরস্ত না করিয়া নীরব থাকিলে সমাজরক্ষক রাজার মতিবিভ্রম হইবে। সুতরাং প্রজাগণের মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লব অনিবার্য্য হইবে। অতএব নাস্তিককে যে কোনরূপে নিরস্ত করিবার জন্য সময়বিশেষে "জল্প" ও "বিতণ্ডা"ও আবশ্যক হইলে তাহাতে "ছল"ও জাতির প্রয়োগও কর্ত্তব্য। তাৎপর্য্যটীকাকারের এই পূর্ব্বোক্ত কথা চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে (২১৭-১৮ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য। কেহ বলিতে পারেন যে, যদি সময়বিশেষে যে কোনরূপে প্রতিবাদী নাস্তিককে নিরস্ত করাই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে নখাঘাত বা চপেটাঘাতাদির দ্বারাও ত তাহা সহজে করা যাইতে পারে। মহর্ষি তাহা কেন উপদেশ করেন নাই? এতদুত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর কথার কোনই উত্তর না দিয়া, নখাঘাতাদির দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে গেলে তিনি প্রতিবাদী নাস্তিকের কথার উত্তর জানেন না, তাই তিনি তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না, ইহাই সকলে বুঝিবে। সুতরাং ঐ স্থলে লোকে প্রতিবাদী নাস্তিকেরই জয় বুঝিবে। তাহা হইলে সেখানে আস্তিকের ঐ বিচার ব্যর্থ হইবে এবং অনর্থের কারণও হইবে। কিন্তু বাদী আস্তিক যদি "জাতি"নামক অসদুত্তরের দ্বারাও প্রতিবাদী নাস্তিককে নিরস্ত করেন, তাহা হইলে সকলে বাদীর নিঃসংশয় পরাজয় বুঝিবে না। অনেকে তাঁহার নিঃসংশয় জয়ও বুঝিবে। সুতরাং তদ্দ্বারাও নাস্তিকের উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যাইবে। সুতরাং মহর্ষি স্থলবিশেষে নাস্তিককে নিরস্ত করিবার জন্য "জল্প", "বিতণ্ডা" ও উহার অঙ্গ "ছল" ও "জাতি"রও উদ্দেশ করিয়াছেন। তিনি নাস্তিক নিরাসের জন্য নখাঘাতাদির উপদেশ করেন নাই। শাস্ত্রকার মহর্ষি কখনও ঐরূপ অসদুপদেশ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ মহর্ষি চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে "তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে" ইত্যাদি (৫০শ) সূত্রের দ্বারা তাঁহার উপদিষ্ট "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র উদ্দেশ্য নিজেই প্রকাশপূর্ব্বক দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন; তাঁহার তাৎপর্য্য ও যুক্তি সেখানেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। লাভ, পূজা ও খ্যাতির জন্য যে জল্প ও বিতণ্ডা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু সময়বিশেষে প্রয়োজন হইলে তত্ত্বনিশ্চয় ও সদ্বিদ্যার রক্ষার্থই উহা কর্ত্তব্য, ইহা ভাষ্যকার প্রভৃতিও চতুর্থ অধ্যায়ের সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার এখানে যে বাদীর লাভ, পূজা ও খ্যাতিকামনার উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ স্থলে তাৎপর্য্য-টীকাকার ঐ লাভাদিকে বাদীর স্থলবিশেষে আনুষঙ্গিক ফল বলিয়াই উপপাদন করিয়াছেন।

"ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও উহা আনুষঙ্গিক ফল বলিয়াছেন। অর্থাৎ জল্প, বিতণ্ডা ও তাহাতে অসদুত্তররূপ জাতির প্রয়োগের তত্ত্বনিশ্চয়-সংরক্ষণই উদ্দেশ্য। সুতরাং তজ্জন্যই উহা কর্ত্তব্য। তাহাতে লাভাদি-কামীর আনুষঙ্গিক লাভাদি ফলও হইয়া থাকে, কিন্তু সে উদ্দেশ্যে উহা কর্ত্তব্য নহে। মূলকথা, মহর্ষি নিজেই পূর্ব্বে "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র প্রয়োজন সমর্থন করিয়া এই মোক্ষশাস্ত্রেও যে, অসদুত্তররূপ "জাতি"র সবিশেষ নিরূপণ যুক্ত ও আবশ্যক, ইহাও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বোক্ত ঐ সূত্রের বিশদ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া তদ্দ্বারাই বিচারপূর্ব্বক ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সময়বিশেষে নাস্তিক-নিরাসের জন্য মুমুক্ষুও যে, "জাতি" প্রয়োগ কর্ত্তব্য, ইহাও তিনি বুঝাইয়াছেন এবং সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইলেই অসদুত্তর দ্বারা এই নাস্তিক-নিরাস কর্ত্তব্য, কিন্তু নখাঘাতাদির দ্বারা উহা কর্ত্তব্য নহে, এ বিষয়েও তিনি পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সম্যক্ সমর্থন করিয়াছেন (ন্যায়মঞ্জরী, ৬২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এখন বুঝা আবশ্যক এই যে, মহর্ষি "সাধর্ম্ম্যসম" ইত্যাদি নামে যে "সম" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহার অর্থ কি? এবং উহার দ্বারা "জাতি" স্থলে কাহার কিরূপ সমত্ব বা সাম্য মহর্ষির অভিপ্রেত? ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের অবতারণা করিয়া, পরে মহর্ষির প্রথমোক্ত "সাধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধের স্বরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত বিষয়ে তাঁহার নিজমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কোন বাদী প্রথমে তাঁহার নিজপক্ষ স্থাপনের হেতু প্রয়োগ করিলে, তখন প্রতিবাদী যদি কোন একটী সাধর্ম্ম্যমাত্রের দ্বারা প্রত্যবস্থান করেন এবং তাঁহার ঐ প্রত্যবস্থান পূর্ব্বোক্ত বাদীর নিজ পক্ষ স্থাপনের হেতু হইতে অবিশিষ্যমাণ অর্থাৎ তুল্য হয়, তাহা হইলে ঐ "প্রত্যবস্থান"ই "সাধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধ অর্থাৎ "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতি। "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতিরও পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। স্থাপনার হেতু হইতে অবিশেষ কিরূপ, তাহা ভাষ্যকার পরে জাতির সেই সমস্ত উদাহরণে প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে "অবিশিষ্যমাণং স্থাপনা-হেতুতঃ" এই কথা বলিয়া "সাধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি স্থলে যে তাঁহার মতে বিশেষ হেতুর অভাবই সাম্য, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ উত্তরবাদী (প্রতিবাদী) "জাতি" প্রয়োগ করিয়া বাদীকে বলেন যে, তোমার কথিত সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যও যেরূপ, আমার কথিত সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যও তদ্রূপই; কারণ, তোমার কথিত সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যই সাধ্যসাধক হইবে, আমার কথিত সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্য সাধ্যসাধক হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। সুতরাং বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের নিজ পক্ষ সমর্থনে বিশেষ হেতুর অভাবই সাম্য। উহা সাধর্ম্ম্যাদিপ্রযুক্তই হয়, এ জন্য "সাধর্ম্ম্যেণ সমঃ" ইত্যাদি বিগ্রহে "সাধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি নামের উল্লেখ হইয়াছে এবং উত্তরবাদীর ঐরূপ প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধকেই ঐ তাৎপর্য্যে "সাধর্ম্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি বলা হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে। ফলকথা, ভাষ্যকারের মতে উভয় পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাবই "সম" শব্দার্থ বা সাম্য। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও এইরূপই বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও পরে "বিশেষহেত্বভাবো বা সমার্থঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা

ভাষ্যকারের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, "সমীকরণার্থং প্রয়োগঃ সমঃ"। শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞও "ন্যায়সারে" বলিয়াছেন, "প্রযুক্তে হেতৌ সমীকরণাভিপ্রায়েণ প্রসঙ্গো জাতিঃ"। অর্থাৎ বাদী নিজ পক্ষের হেতু প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ বা হেতুকে নিজের পক্ষ বা হেতুর সহিত সমান করিবার উদ্দেশ্যেই "জাতি" প্রয়োগ করেন। যদিও তাহাতে বাদীর পক্ষ সমীকৃত হয় না, কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, প্রতিবাদী ঐ উদ্দেশ্যেই "জাতি" প্রয়োগ করেন; এই জন্যই প্রতিবাদীর সেই জাত্যুত্তর "সাধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি নামে কথিত হইয়াছে। বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের সহিত প্রতিবাদীর নিজপক্ষ স্থাপন বা জাত্যুত্তরের বাস্তব সাম্য নাই। কিন্তু প্রতিবাদী ঐ সাম্যের অভিমান করেন বলিয়া আভিমানিক সাম্য আছে। বস্তুতঃ উভয় পক্ষে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যই সম অর্থাৎ তুল্য। তাই উদ্দ্যোতকর পরে লিখিয়াছেন, "সাধর্ম্ম্যমেব সমং বৈধর্ম্ম্যমেব সমমিতি সমার্থঃ" ইত্যাদি। তাৎপর্য্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "সাধর্ম্ম্যমেব সমং যস্মিন্ প্রয়োগে ইতি শেষঃ"। অর্থাৎ প্রতিবাদীর যে প্রয়োগে সাধর্ম্ম্যই সম বা তুল্য, তাহাই "সাধর্ম্ম্যসম"। এইরূপ "বৈধর্ম্ম্যমেব সমং যত্র প্রয়োগে" এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি শব্দও "সাধর্ম্ম্যসম" শব্দের ন্যায় বহুব্রীহি সমাস, ইহাই তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও বার্ত্তিককারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে শেষে লিখিয়াছেন, "অথবা সাধর্ম্ম্যমেব সমং যত্র স সাধর্ম্ম্যসমঃ"। কিন্তু তিনি প্রথমে নিজে সূত্রার্থ ব্যাখ্যায় তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাসই গ্রহণ করিয়াছেন[১]। তাহা হইলে প্রতিবাদীর প্রয়োগ বা "জাতি" নামক অসদুত্তরই সাধর্ম্ম্যাদিপ্রযুক্ত "সম" অর্থাৎ তুল্য এবং বাদীর প্রয়োগ বা নিজ পক্ষ স্থাপনের সহিত (ভাষ্যকারোক্ত) বিশেষ হেতুর অভাবই ঐ জাত্যুত্তরের সমত্ব বা তুল্যতা, ইহাই বুঝা যায়।

কেহ কেহ বাদী ও প্রতিবাদীর (জাতিবাদীর) তুল্যতাই পূর্ব্বোক্ত "সম"শব্দার্থ, ইহা বলিয়াছিলেন। উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, জাতি অসদুত্তর, সুতরাং জাতিবাদী প্রতিবাদী সর্ব্বত্র অসদ্বাদীই হইয়া থাকেন। কিন্তু বাদী ঐরূপ নহেন। কারণ, তিনি সদ্বাদীও হইয়া থাকেন। তিনি সৎ হেতুর দ্বারা সৎপক্ষেরও স্থাপন করেন। সুতরাং জাত্যুত্তর স্থলে সাধর্ম্ম্যাদিপ্রযুক্ত বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যে তুল্য, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। বাদী নিজপক্ষ স্থাপনের হেতু প্রয়োগ করিলে সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকার "জাতি"র প্রয়োগ হইতে পারে, ইহাও কেহ কেহ বলিয়াছিলেন। উদ্দ্যোতকর এখানে উক্ত মতেরও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, কোন বাদী যেখানে কোন বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত নিজ পক্ষ স্থাপন করেন, সেখানে "উৎকর্ষসমা", "অপকর্ষসমা", "বর্ণ্যসমা", "অবর্ণ্যসমা" ও "বিকল্পসমা" জাতির প্রয়োগ হইতে পারে না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। উদয়নাচার্য্যের মতে স্বব্যাঘাতক উত্তরই জাতি, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অর্থাৎ তাঁহার মতে প্রতিবাদীর যে উত্তর বাদীর সাধনের ন্যায় নিজেরও ব্যাঘাতক হয়, (কারণ, তুল্যভাবে ঐ উত্তরকেও ঐরূপ অন্য জাত্যুত্তর দ্বারা খণ্ডন করা যায়) সেই

১। অত্র চ সাধর্ম্ম্যাদীনাং কার্য্যান্তানাং দ্বন্দ্বে তৈঃ সমা ইত্যর্থাৎ সাধর্ম্ম্যসমাদয়শ্চতুর্ব্বিংশতি জাতয় ইত্যর্থঃ।—বিশ্বনাথবৃত্তি

রই "জাতি"। সুতরাং বাদীর সাধন ও প্রতিবাদীর জাত্যুত্তরে যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সাম্য, উহাই "সাধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি শব্দে "সম" শব্দের অর্থ। প্রতিবাদীর সেই সমস্ত জাত্যুত্তর সাধর্ম্ম্যাদি প্রযুক্তই বাদীর সাধনের "সম" হওয়ায় "সাধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি নামে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার মতে প্রতিবাদী কোন জাত্যুত্তর করিলে সর্ব্বত্র তুল্যভাবে অন্য জাত্যুত্তরের দ্বারাও প্রতিবাদীর ঐ উত্তরের খণ্ডন করা যায়, এজন্য বাদীর সাধনের ন্যায় প্রতিবাদীর উত্তরও জাত্যুত্তর ব্যাপ্ত হওয়ায় উহাই জাত্যুত্তর স্থলে বাদীর সাধন ও প্রতিবাদীর উত্তরের সাম্য। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ শেষে উদয়নাচার্য্যের উক্তরূপ মতের বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে সেখানে বার্ত্তিক-কার উদ্দ্যোতকর ও তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মত-ব্যাখ্যায় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাঁহার অনেক কথা এখন ঐ ভাবে বার্ত্তিক ও তাৎপর্য্যটীকায় দেখিতে পাই না।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি জাতির বিশেষ লক্ষণ ও উদাহরণাদি বিষয়ে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের বহু পূর্ব্বাচার্য্য বহু বিচার করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের "প্রবোধ-সিদ্ধি" গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে সুবিস্তৃত সূক্ষ্ম বিচার তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও চিন্তাশক্তির পরিচায়ক। ঐ গ্রন্থ "বোধসিদ্ধি" ও "ন্যায়পরিশিষ্ট" এবং কেবল "পরিশিষ্ট" নামেও কথিত হইয়াছে। "তার্কিক-রক্ষা"কার বরদরাজ উহাকে কেবল "পরিশিষ্ট" নামেও উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি ঐ গ্রন্থানুসারেই জাতিতত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত জাতিতত্ত্ব এবং তদ্বিষয়ে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের অপূর্ব্ব চর্চ্চা বুঝিতে হইলে প্রথমে বরদরাজের "তার্কিকরক্ষা" অবশ্য পাঠ্য। মহা-নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত জাতিতত্ত্বের সবিশেষ নিরূপণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র মহানৈয়ায়িক বর্দ্ধমান উপাধ্যায় "অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ" নামে ন্যায়সূত্রের টীকা করিয়া, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত জাতিতত্ত্বেরও সবিশেষ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি উদয়নাচার্য্যের "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থেরও টীকা করিয়া, উক্ত বিষয়ে উদয়নের মতেরও ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পূর্ব্বে মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে মহর্ষি গোতমের সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া জাতির সবিশেষ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক পরে মৈথিল মহামনীষী শঙ্কর মিশ্র "বাদিবিনোদ" নামে অপূর্ব্ব গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়া ন্যায়দর্শনোক্ত বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার শাস্ত্রসম্মত প্রবৃত্তিক্রম বিশদভাবে প্রদর্শনপূর্ব্বক ন্যায়দর্শনোক্ত সমস্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানের লক্ষণাদি যথাক্রমে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্রের অনেক পরে বাঙ্গালী নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চাননও ন্যায়সূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিনিও যে ন্যায়দর্শনের ভাষ্যবার্ত্তিকাদি সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ এবং উদয়নাচার্য্যের "প্রবোধসিদ্ধি" ও শঙ্কর মিশ্রের "বাদিবিনোদ" প্রভৃতি গ্রন্থেরও বিশেষরূপ অনুশীলন করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। শঙ্কর মিশ্রের ন্যায় বিশ্বনাথও অনেক স্থলে জাতি ও নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যায় উদয়নাচার্য্যের মত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে আরও বহু গ্রন্থকারের বিবিধ বিচারের ফলে পূর্ব্বোক্ত "জাতি"র প্রকার-ভেদ ও উদাহরণাদি বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই নানা মতভেদ হইয়াছে। সেই সমস্ত মতভেদের সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞান ও প্রকাশ এখন সম্ভব নহে। সংক্ষেপেও

তাহা প্রকাশ করা যায় না। মহামনীষী শঙ্কর মিশ্রও উক্ত জাতি বিষয়ে বহুসম্মত মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য মতানুসারে উহার বিস্তার বর্ণন করেন নাই, ইহা তিনি নিজেও শেষে বলিয়া গিয়াছেন[১]।

বাৎস্যায়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের ন্যায় প্রাচীন কালে শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণও গৌতমের সূত্রানুসারে "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তদনুসারে শৈব নৈয়ায়িক ভাসর্ব্বজ্ঞও তাঁহার "ন্যায়সার" গ্রন্থের অনুমান পরিচ্ছেদে গৌতমের সূত্রের উল্লেখ করিয়া জাতি ও নিগ্রহস্থানের নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। "ন্যায়সারে"র অষ্টাদশ টীকাকার সকলেই উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরিও "ষড়্দর্শনসমুচ্চয়" গ্রন্থে নৈয়ায়িক মতের বর্ণনায় জাতি ও নিগ্রহস্থানের লক্ষণ বলিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের "লঘুবৃত্তি"কার জৈন মহামনীষী মণিভদ্র সূরি বিশদভাবে ন্যায়দর্শনোক্ত সমস্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং টীকাকার জৈন মহাদার্শনিক গুণরত্ন সূরি ঐ জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তদ্বিষয়ে বহু বিচার করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধসম্প্রদায়ও নিজ মতানুসারে জাতি ও নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র ও বরদরাজ প্রভৃতি, বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের ব্যাখ্যাবিশেষেরও উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। যথাস্থানে ইহা ব্যক্ত হইবে। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ই ন্যায়দর্শনোক্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা সকলেই গৌতমের ন্যায়দর্শনোক্ত সমস্ত পদার্থেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের নানা গ্রন্থের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। অদ্বৈত বেদান্তাচার্য্য শ্রীহর্ষ মিশ্রের 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" পাঠ করিলে পদে পদে তাঁহার মহানৈয়ায়িকত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় এবং গৌতমোক্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানে পূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীবেদান্তাচার্য্য মহামনীষী বেঙ্কটনাথ "ন্যায়পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে তাঁহার ন্যায়দর্শনে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ গ্রন্থের অনুমানাধ্যায়ে ন্যায়দর্শনোক্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিশেষরূপ ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়া গিয়াছেন। সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা উক্ত বিষয়ে অনেক নূতন কথাও বলিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জাতিকে (১) "প্রতিপ্রমাণসমা" ও (২) "প্রতিতর্কসমা" এই নামদ্বয়ে দ্বিবিধ বলিয়া তাঁহার যুক্তি অনুসারে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাঁহার ঐ সমস্ত কথা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বিশেষ জিজ্ঞাসু সুধী তাঁহার ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্ব্বোক্ত জাতিতত্ত্ব বিষয়ে অনেক প্রাচীন সংবাদ জানিতে পারিবেন।

বেঙ্কটনাথ "ন্যায়পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত জাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে যে "তত্ত্বরত্নাকর" ও "প্রজ্ঞাপরিত্রাণ" নামে গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা এখন দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তিনি যে বিষ্ণু মিশ্রের মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থকারও যে, জাতি ও নিগ্রহস্থান বিষয়ে বহু চর্চ্চা ও বিচার করিয়াছিলেন, তাহা বেঙ্কটনাথের ঐ গ্রন্থ

১। বহূনাং সম্মতঃ পন্থা জাতীনামেষ দর্শিতঃ।
একদেশিমতেনাসাং প্রপঞ্চো নৈব বর্ণিতঃ ॥—বাদিবিনোদ।

পাঠে বুঝিতে পারা যায়। কোন সম্প্রদায় গোতমোক্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতি অস্বীকার করিয়া চতুর্দ্দশ জাতির সমর্থন করিয়াছিলেন। বেঙ্কটনাথের উদ্ধৃত "প্রজ্ঞাপরিত্রাণ" গ্রন্থের বচনেও উক্ত মতের স্পষ্ট প্রকাশ আছে[1]। বেঙ্কটনাথ উক্ত বচনের অন্যরূপ তাৎপর্য্য কল্পনা করিলেও উক্ত মত যে প্রাচীন কালেও কোন সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা আমরা উদ্দ্যোতকরের বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারি। কারণ, পরবর্ত্তী ষষ্ঠ সূত্রের বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের উল্লেখ-পূর্ব্বক গোতমোক্ত চতুর্ব্বিংশতি জাতির মধ্যে কোন জাতিই যে নামভেদে পুনরুক্ত হয় নাই, অর্থ-ভেদ ও প্রয়োগভেদবশতঃ সমস্ত জাতিরই যে ভেদ আছে, ইহা সমর্থন করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। উক্ত মতবাদীদিগের কথা এই যে, প্রয়োগের ভেদবশতঃ জাতির ভেদ স্বীকার করিলে উহার অনন্ত ভেদ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে উহা চতুর্ব্বিংশতি প্রকারও বলা যায় না। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, চতুর্ব্বিংশতি প্রকারই জাতি, এইরূপ অবধারণ করা হয় নাই। কিন্তু উদাহরণের ভেদবশতঃ এক প্রকার জাতিও অনেক প্রকারও হয়। যেমন একই "প্রকরণসমা" জাতি চতুর্ব্বিধ হয়। পরন্তু যদি প্রয়োগভেদে ও উদাহরণ-ভেদে জাতির ভেদ স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে চতুর্দ্দশ জাতিও ত বলা যায় না। তবে যদি কোন অংশে অভেদ থাকিলেও কোন অংশে ভেদও আছে বলিয়া চতুর্দ্দশ জাতি বলা যায়, তাহা হইলে চতুর্থ সূত্রোক্ত "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ জাতি যে ঐ সূত্রোক্ত "বিকল্পসমা" জাতি হইতে ভিন্ন নহে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, "বিকল্পসমা" জাতি হইতে "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি জাতির কোন অংশে ভেদও আছে; যথাস্থানে ইহা বুঝা যাইবে। উদ্দ্যোতকরের এই সমস্ত কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ব্বকালে কোন বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষই গৌতমের জাতিবিভাগ অগ্রাহ্য করিয়া, চতুর্দ্দশ প্রকার জাতি স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা গোতমোক্ত "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি দশপ্রকার জাতির পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত জাতিরও অন্য জাতি হইতে কোন অংশে ভেদ আছে বলিয়া মহর্ষি গোতম চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতি বলিয়াছেন। কিন্তু চতুর্ব্বিংশতি প্রকারই জাতি, এইরূপ অবধারণ তাঁহার বিবক্ষিত নহে। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও উক্ত বিষয়ে বিচারপূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সামান্যতঃ জাতি অনন্তপ্রকার, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, একপ্রকার জাতির সহিত অন্য প্রকার জাতিরও সংকর হইতে পারে। সুতরাং ঐরূপ সংকীর্ণ জাতি অসংখ্যপ্রকার হয়, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু অসংকীর্ণ জাতি অর্থাৎ যে জাতির সহিত অন্য জাতির সংকর বা নিয়ত সম্বন্ধ নাই, সেই সমস্ত জাতি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, ইহাই মহর্ষি গোতমের বিবক্ষিত[2]। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাকার

১। প্রজ্ঞাপরিত্রাণেপ্যুক্তং—"আনন্ত্যেঽপি চ জাতীনাং জাতয়স্তু চতুর্দ্দশ। উক্তাস্তদপৃথগ্‌ভূতা বর্ণ্যাবর্ণ্যসমাদয়ঃ"॥ —ইত্যাদি ন্যায়পরিশুদ্ধি।

২। সত্যপ্যানন্ত্যে জাতীনামসংকীর্ণোদাহরণবিবক্ষয়া চতুর্ব্বিংশতিপ্রকারত্বমুপবর্ণিতং, নতু তৎসংখ্যানিয়মঃ কৃত ইতি —ন্যায়মঞ্জরী।

গুণরত্ন সূরিও ইহাই বলিয়াছেন১। "তত্ত্বরত্নাকর" গ্রন্থকারও বলিয়াছেন যে২, চতুর্বিংশতি জাতির উল্লেখ কতকগুলি জাতির প্রদর্শনের জন্য। কারণ, মহর্ষি গোতম দ্বিতীয় অধ্যায়ে "অন্যদন্যস্মাৎ" ইত্যাদি (২য় আ০, ৩১শ) সূত্রের দ্বারা অন্যপ্রকার জাতিরও সূচনা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতেও জাতি অনন্তপ্রকার।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতির উদাহরণ প্রদর্শন না করিলে পূর্ব্বোক্ত কোন কথাই বুঝা যায় না। উদাহরণ ব্যতীত কেবল মহর্ষি গোতমের অতি দুর্ব্বোধ কতিপয় সূত্রাবলম্বনে তাঁহার প্রদর্শিত জাতিতত্ত্বের অন্ধকারময় গুহায় প্রবেশও করা যায় না। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি অসামান্য প্রতিভা ও চিন্তাশক্তির বলে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি জাতির উদাহরণ প্রদর্শনদ্বারা উহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে আমরাও এখন পাঠকগণের বক্ষ্যমাণ জাতিতত্ত্ববোধের সহায়তার জন্য আবশ্যক বোধে এখানেই সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি জাতির লক্ষণ ও উদাহরণাদি প্রকাশ করিতেছি।

১। সাধর্ম্ম্যসমা—(দ্বিতীয় সূত্রে)

সমান ধর্ম্মকে সাধর্ম্ম্য বলে। কোন বাদী কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতু বা হেত্বাভাসের দ্বারা কোন ধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি কোন একটী বিপরীত সাধর্ম্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা বাদীর গৃহীত সেই ধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী বলিলেন,—"আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্বাৎ লোষ্টবৎ।" অর্থাৎ আত্মা সক্রিয়,—যেহেতু তাহাতে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে। যে সকল পদার্থে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে, সে সমস্ত পদার্থই সক্রিয়,—যেমন লোষ্ট। লোষ্টে ক্রিয়ার কারণ গুণ সংযোগবিশেষ আছে,—এইরূপ আত্মাতেও ক্রিয়ার কারণ গুণ, প্রযত্ন বা অদৃষ্ট আছে। অতএব আত্মা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়। বাদী এইরূপে আত্মাতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্ম সক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে, তখন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, যদি সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্ম্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা)বশতঃ আত্মা সক্রিয় হয়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় আকাশের সাধর্ম্ম্য বিভুত্ববশতঃ আত্মা নিষ্ক্রিয় হউক ? আত্মাও আকাশের ন্যায় বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী এবং আকাশ নিষ্ক্রিয়, ইহা বাদীরও স্বীকৃত। সুতরাং আত্মাতে নিষ্ক্রিয় আকাশের সাধর্ম্ম্য বিভুত্ব থাকায় আত্মা নিষ্ক্রিয় কেন হইবে না ? আত্মা সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সক্রিয় হইবে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় আকাশের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর ভাষ্যকারের মতে "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতি। যদিও উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর

১। তদেবমুদ্ভাবনবিষয়বিকল্পভেদেন জাতীনামানন্ত্যেঽপ্যসংকীর্ণোদাহরণবিবক্ষয়া চতুর্ব্বিংশতি জাতিভেদা এতে প্রদর্শিতাঃ।—গুণরত্নকৃত টীকা।

২। উক্তঞ্চ "তত্ত্বরত্নাকরে" অমূষাং জাতীনামানন্ত্যাচ্চতুর্ব্বিংশতিরসৌ প্রদর্শনার্থা। "অন্যদন্যস্মা"দিত্যাদিনা ন্যায়ান্তরসূচনাদিতি।—ন্যায়পরিশুদ্ধি।

অভিমত বিভুত্ব হেতু আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের সাধকই হয়; কারণ, বিভু দ্রব্যমাত্রই নিষ্ক্রিয় হওয়ায় বিভুত্ব ধর্ম্ম নিষ্ক্রিয়ত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট; সুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐ হেতু দুষ্ট নহে, কিন্তু বাদীর হেতুই দুষ্ট। তথাপি উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুর দোষ প্রদর্শন না করিয়া, ঐরূপ উত্তর করায় তাঁহার উক্তি-দোষপ্রযুক্ত ঐ উত্তরও সদুত্তর নহে, ভাষ্যকারের মতে উহাও জাত্যুত্তর। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

অথবা কোন বাদী বলিলেন, "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাদ্ঘটবৎ"। অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা কার্য্য অর্থাৎ কারণজন্য। কারণজন্য পদার্থমাত্রই অনিত্য, যেমন ঘট। শব্দও ঘটের ন্যায় কারণজন্য; সুতরাং অনিত্য। বাদী এইরূপে অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে তখন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন ঘটের সাধর্ম্ম্য কার্য্যত্ব আছে, তদ্রূপ আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্বও আছে। কারণ, শব্দও আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত পদার্থ। সুতরাং শব্দও আকাশের ন্যায় নিত্য হউক? অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য হইবে, কিন্তু নিত্য আকাশের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত নিত্য হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এখানে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতি। আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্ব হেতুর দ্বারা বাদীর পূর্ব্বোক্ত হেতুতে "সৎপ্রতিপক্ষ" দোষের উদ্ভাবন করাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা অসদুত্তর। কারণ, বাদীর প্রযুক্ত হেতু কার্য্যত্ব, তাঁহার সাধ্য ধর্ম্ম অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। কারণ, যে যে পদার্থে কার্য্যত্ব বা কারণজন্যত্ব আছে, সে সমস্তই অনিত্য। কিন্তু প্রতিবাদীর অভিমত অমূর্ত্তত্ব হেতু নিত্যত্বের ব্যভিচারী। কারণ, অমূর্ত্ত পদার্থমাত্রই নিত্য নহে। সুতরাং প্রতিবাদীর ঐ ব্যভিচারী হেতু বাদীর সৎ হেতুর প্রতিপক্ষ না হওয়ায় উক্ত স্থলে প্রকৃত সৎপ্রতিপক্ষ দোষ হইতে পারে না। বাদী ও প্রতিবাদীর হেতুদ্বয় তুল্যবল না হইলে সেখানে সৎপ্রতিপক্ষ দোষ হয় না। তৃতীয় সূত্র দ্রষ্টব্য।

২। বৈধর্ম্ম্যসমা—(দ্বিতীয় সূত্রে)

বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে বৈধর্ম্ম্য বলে। অর্থাৎ যে পদার্থে যে ধর্ম্ম থাকে না, তাহা ঐ পদার্থের বৈধর্ম্ম্য। কোন বাদী কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতু বা হেত্বাভাসের দ্বারা কোন ধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর দৃষ্টান্তপদার্থের কোন একটী বৈধর্ম্ম্যমাত্র দ্বারা বাদীর গৃহীত সেই ধর্ম্মীতে তাঁহার সেই সাধ্য ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "বৈধর্ম্ম্যসমা" জাতি। যেমন পূর্ব্ববৎ কোন বাদী "আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ লোষ্টবৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট লোষ্ট পরিচ্ছিন্ন পদার্থ, কিন্তু আত্মা অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ অর্থাৎ বিভু। ঐ অপরিচ্ছিন্নত্ব ধর্ম্ম লোষ্টে না থাকায় উহা লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য। সুতরাং আত্মাতে সক্রিয় লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য থাকায় আত্মা সক্রিয় হইতে পারে না। কারণ, সক্রিয় পদার্থের বৈধর্ম্ম্য থাকিলে তাহাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব স্বীকার্য্য।

অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয় হউক ? আত্মা সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সক্রিয় হইবে, কিন্তু উহার বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্টের বৈধর্ম্ম্যমাত্র দ্বারা আত্মাতে বাদীর সাধ্য ধর্ম্ম সক্রিয়ত্বের অভাব নিষ্ক্রিয়ত্বের আপত্তি প্রকাশ করায়, তাঁহার ঐ উত্তর ভাষ্যকারের মতে "বৈধর্ম্ম্যসমা" জাতি। পূর্ব্বোক্ত সাধর্ম্ম্যসমা জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বিভুত্ব ধর্ম্মকে আকাশের সাধর্ম্ম্যরূপে গ্রহণ করিয়া, সেই সাধর্ম্ম্যদ্বারাই উক্তরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু এই "বৈধর্ম্ম্যসমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী ঐ বিভুত্বধর্ম্মকে বাদীর দৃষ্টান্ত লোষ্টের বৈধর্ম্ম্যরূপে গ্রহণ করিয়া, সেই বৈধর্ম্ম্য দ্বারাই উক্তরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন, ইহাই বিশেষ। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ভাষ্যকারের মতে ইহাও সদুত্তর নহে, ইহাও জাত্যুত্তর।

অথবা কোন বাদী পূর্ব্ববৎ "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাদ্ঘটবৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য কার্য্যত্ব আছে, তদ্রূপ উহার বৈধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্বও আছে। কারণ, শব্দ ঘটের ন্যায় মূর্ত্ত পদার্থ নহে, কিন্তু অমূর্ত্ত। সুতরাং যে অমূর্ত্তত্ব ঘটে না থাকায় উহা ঘটের বৈধর্ম্ম্য, তাহা শব্দে থাকায় শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য হইতে পারে না। সুতরাং শব্দ নিত্য হউক ? শব্দ অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অনিত্য হইবে, কিন্তু উহার বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত নিত্য হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "বৈধর্ম্ম্যসমা" জাতি। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর অভিমত হেতু অমূর্ত্তত্ব অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্ম্য হইলেও উহা নিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বৈধর্ম্ম্য নহে। কারণ, অমূর্ত্ত পদার্থমাত্রই নিত্য নহে। সুতরাং প্রতিবাদীর অভিমত ঐ ব্যভিচারী বা দুষ্ট হেতু বাদীর গৃহীত নির্দ্দোষ হেতুর প্রতিপক্ষ না হওয়ায় প্রতিবাদী ঐ হেতুর দ্বারা বাদীর হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষ দোষ বলিতে পারেন না। তৃতীয় সূত্র দ্রষ্টব্য।

৩। উৎকর্ষসমা—(চতুর্থ সূত্রে)

বাদী কোন ধর্ম্মীতে কোন হেতু বা হেত্বাভাসের দ্বারা তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই হেতুর দ্বারাই বাদীর গৃহীত সেই ধর্ম্মীতে অবিদ্যমান কোন ধর্ম্মের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "উৎকর্ষসমা" জাতি। "উৎকর্ষ" বলিতে এখানে অবিদ্যমান ধর্ম্মের আরোপ। যেমন কোন বাদী পূর্ব্ববৎ "আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ লোষ্টবৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিলে যদি প্রতিবাদী বলেন যে, তাহা হইলে তোমার ঐ হেতু প্রযুক্ত আত্মা লোষ্টের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্টও হউক ? যদি ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে বলিয়া আত্মা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় হয়, তাহা হইলে স্পর্শবিশিষ্টও কেন হইবে না ? আর যদি আত্মা লোষ্টের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়ও হইতে পারে না। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদীর গৃহীত সাধ্যধর্ম্মী—তাঁহার দৃষ্টান্ত পদার্থের সর্ব্বাংশেই সমানধর্ম্মা না হইলে উহা দৃষ্টান্ত বলা যায় না।

সুতরাং বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্টে যে স্পর্শবত্ত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহাও বাদীর সাধ্যধর্ম্মী আত্মাতে থাকা আবশ্যক। কিন্তু আত্মাতে যে স্পর্শবত্ত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। প্রতিবাদী বাদীর উক্ত হেতুর দ্বারাই আত্মাতে ঐ অবিদ্যমান ধর্ম্মের আপত্তি প্রকাশ করায় তাঁহার ঐ উত্তর "উৎকর্ষসমা" জাতি। এইরূপ কোন বাদী পূর্ব্ববৎ "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে শব্দ ঘটের ন্যায় রূপবিশিষ্টও হউক? কারণ, তোমার দৃষ্টান্ত যে ঘট, তাহা রূপবিশিষ্ট। যদি কার্য্যত্ববশতঃ শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য হয়, তাহা হইলে ঘটের ন্যায় রূপবিশিষ্টও কেন হইবে না? বস্তুতঃ রূপবত্তা যে শব্দে নাই, উহা শব্দে অবিদ্যমান ধর্ম্ম, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। কিন্তু প্রতিবাদী উক্ত স্থলে বাদীর ঐ হেতুর দ্বারাই শব্দে ঐ অবিদ্যমান ধর্ম্মের আপত্তি প্রকাশ করায়, তাঁহার ঐ উত্তর "উৎকর্ষসমা" জাতি। ইহাও অসদুত্তর। কারণ, বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তগত সমস্ত ধর্ম্মই বাদীর গৃহীত সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষে থাকে না, তাহা থাকা আবশ্যকও নহে। এবং কোন ব্যভিচারী হেতুর দ্বারাও প্রতিবাদী সেই অবিদ্যমান ধর্ম্মের আপত্তি সমর্থন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত হেতু কার্য্যত্ব রূপের ব্যভিচারী। কারণ, কার্য্য বা জন্য পদার্থমাত্রেই রূপ নাই। সুতরাং উহার দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের ন্যায় রূপবত্তা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ হেতু রূপের ব্যাপ্য নহে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৪। অপকর্ষসমা—(চতুর্থ সূত্রে)

"অপকর্ষ" বলিতে এখানে বিদ্যমান ধর্ম্মের অপলাপ বা উহার অভাবের আপত্তি। বাদী কোন ধর্ম্মীতে কোন হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধ্য ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বাদীর ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাঁহার গৃহীত ধর্ম্মীতে বিদ্যমান ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি করিয়া প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই প্রতিষেধ বা উত্তরের নাম "অপকর্ষসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ"—এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আপনার কথিত দৃষ্টান্ত যে লোষ্ট, তাহা অবিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পদার্থ নহে, পরিচ্ছিন্ন পদার্থ। সুতরাং আত্মাও ঐ লোষ্টের ন্যায় অবিভু হউক? ক্রিয়ার কারণগুণবত্ত্বাবশতঃ আত্মা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় হইবে, কিন্তু লোষ্টের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। বস্তুতঃ আত্মাতে যে বিভুত্ব ধর্ম্মই বিদ্যমান আছে, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই স্বীকৃত। কিন্তু প্রতিবাদী আত্মাতে ঐ বিদ্যমান ধর্ম্মের অভাবের (অবিভুত্বের) আপত্তি প্রকাশ করায়, তাঁহার উক্ত উত্তরের নাম "অপকর্ষসমা" জাতি। এইরূপ কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দ যদি কার্য্যত্ববশতঃ ঘটের ন্যায় অনিত্য হয়, তাহা হইলে উহা ঘটের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের অবিষয় হউক? বস্তুতঃ ঘট শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, কিন্তু শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সুতরাং শব্দে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বই বিদ্যমান ধর্ম্ম। প্রতিবাদী উক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারাই শব্দে ঐ বিদ্যমান ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি

প্রকাশ করায় তাঁহার ঐ উত্তর "অপকর্ষসমা" জাতি। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসদুত্তর। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৫। বর্ণ্যসমা—(চতুর্থ সূত্রে)

যে পদার্থে বাদীর সাধ্য ধর্ম্ম নিশ্চিত নহে, কিন্তু সন্দিগ্ধ, বাদী সেই পদার্থকে তাঁহার সাধ্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণন করেন। সুতরাং "বর্ণ্য" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—সন্দিগ্ধসাধ্যক। উহা "পক্ষ" নামেও কথিত হইয়াছে। এবং যে পদার্থে বাদীর সাধ্য ধর্ম্ম নিশ্চিতই আছে, তদ্বিষয়ে কাহারই বিবাদ নাই, সেই পদার্থকে সপক্ষ বলে। ঐরূপ পদার্থই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বোক্ত "আত্মা সক্রিয়ঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে আত্মাই সক্রিয়ত্বরূপে বর্ণ্য, সুতরাং আত্মাই পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত লোষ্ট সপক্ষ। এবং "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে শব্দই অনিত্যত্বরূপে বর্ণ্য, সুতরাং পক্ষ। দৃষ্টান্ত ঘট সপক্ষ। কোন বাদী কোন হেতু এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন পক্ষে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর গৃহীত সেই দৃষ্টান্তে বর্ণ্যত্ব অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যকত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "বর্ণ্যসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ লোষ্টবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে লোষ্টও আত্মার ন্যায় বর্ণ্য অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যক হউক? এইরূপ কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে ঘটও শব্দের ন্যায় বর্ণ্য অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যক হউক? প্রতিবাদীর কথা এই যে, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত সমানধর্ম্মা হওয়া আবশ্যক। সুতরাং বাদীর পক্ষপদার্থের ধর্ম্ম যে সন্দিগ্ধসাধ্যকত্ব, তাহা দৃষ্টান্ত পদার্থেও স্বীকার্য্য। পরন্তু বাদীর গৃহীত যে হেতু তাঁহার গৃহীত পক্ষপদার্থে আছে, সেই হেতুই তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্তপদার্থেও আছে। সুতরাং বাদীর সেই হেতুবশতঃ তাঁহার গৃহীত সেই দৃষ্টান্তপদার্থও তাঁহার গৃহীত পক্ষপদার্থের ন্যায় সন্দিগ্ধসাধ্যক কেন হইবে না? কিন্তু তাহা হইলে আর উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, সন্দিগ্ধসাধ্যক পদার্থ দৃষ্টান্ত হয় না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "বর্ণ্যসমা" জাতি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসদুত্তর। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৬। অবর্ণ্যসমা—(চতুর্থ সূত্রে)

পূর্ব্বোক্ত "বর্ণ্য"র বিপরীত "অবর্ণ্য"। সুতরাং "অবর্ণ্যসমা" জাতিকে পূর্ব্বোক্ত "বর্ণ্যসমার" বিপরীত বলা যায়। অর্থাৎ যাহা সন্দিগ্ধসাধ্যক (বর্ণ্য) নহে, কিন্তু নিশ্চিতসাধ্যক, তাহা "অবর্ণ্য"। নিশ্চিতসাধ্যকত্বই "অবর্ণ্যত্ব"। উহা বাদীর গৃহীত পক্ষে থাকে না, দৃষ্টান্তে থাকে। কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর গৃহীত পক্ষে দৃষ্টান্তগত "অবর্ণ্যত্বে"র অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যকত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম "অবর্ণ্যসমা" জাতি। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আত্মাও লোষ্টের ন্যায় নিশ্চিতসাধ্যক হউক? কারণ, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত

সমানধর্ম্মা হওয়া আবশ্যক। পরন্তু বাদীর গৃহীত যে হেতু দৃষ্টান্ত লোষ্টে আছে, ঐ হেতুই তাহার গৃহীত পক্ষ আত্মাতেও আছে। সুতরাং ঐ হেতুবশতঃ ঐ পক্ষ আত্মাও ঐ দৃষ্টান্ত লোষ্টের ন্যায় নিশ্চিতসাধ্যক কেন হইবে না? তাহা হইলে আর উহা পক্ষ হয় না। কারণ, যাহা সন্দিগ্ধ-সাধ্যক, তাহাই পক্ষ হয়। এইরূপ "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ," ইত্যাদি প্রয়োগস্থলেও প্রতিবাদী যদি পূর্ব্ববৎ বাদীর গৃহীত পক্ষে দৃষ্টান্তগত "অবর্ণ্যত্ব" অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যকত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ উত্তরও "অবর্ণ্যসম" জাতি হইবে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসদুত্তর। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৭। বিকল্পসমা—(চতুর্থ সূত্রে)

বাদীর কথিত হেতুবিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পদার্থে অন্য কোন ধর্ম্মের বিকল্পপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর কথিত সেই হেতু পদার্থে অন্য কোন ধর্ম্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই হেতুতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তর ভাষ্যকারের মতে "বিকল্পসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী পূর্ব্বোক্ত "আত্মা সক্রিয়ঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও যেমন কোন দ্রব্য গুরু, যেমন লোষ্ট, এবং কোন দ্রব্য লঘু, যেমন বায়ু, তদ্রূপ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও কোন দ্রব্য সক্রিয়, যেমন লোষ্ট এবং কোন দ্রব্য নিষ্ক্রিয়, যেমন আত্মা, ইহা কেন হইবে না? ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেই যে সে দ্রব্য সক্রিয় হইবে, নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। তাহা হইলে ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট বলিয়া লোষ্টের ন্যায় বায়ু প্রভৃতিও গুরু কেন হয় না? সুতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রই যে, একরূপই নহে, ইহা স্বীকার্য্য। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "বিকল্পসমা" জাতি। "বিকল্প" শব্দের অর্থ বিবিধ প্রকার বা বৈচিত্র্য, উহার ফলিতার্থ এখানে ব্যভিচার। উক্ত স্থলে বাদীর দৃষ্টান্তপদার্থ লোষ্টে তাঁহার হেতু ক্রিয়ার কারণগুণবত্তা আছে। কিন্তু তাহাতে লঘুত্বধর্ম্ম নাই। সুতরাং বাদীর ঐ হেতু ঐ স্থলে লঘুত্বধর্ম্মের ব্যভিচারী। উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে ঐ লঘুত্বধর্ম্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, তদ্দ্বারা বাদীর ঐ হেতুতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্ম সক্রিয়ত্বের ব্যভিচারের সমর্থনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসদুত্তর। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৮। সাধ্যসমা—(চতুর্থ সূত্রে)

"সাধ্য" শব্দের অর্থ এখানে সাধ্যধর্ম্মী। যে পদার্থ যেরূপে পূর্ব্বসিদ্ধ নহে, সেই পদার্থই সেইরূপে হেতু প্রভৃতি অবয়ব প্রয়োগ করিয়া বাদী সাধন করেন। সুতরাং ঐ অর্থে "সাধ্য" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মীও বুঝা যায়। যেমন পূর্ব্বোক্ত "আত্মা সক্রিয়ঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মা সাধ্যধর্ম্মী। "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্দ

সাধ্যধর্ম্মী। কিন্তু যাহা দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হয়, তাহা পূর্ব্বসিদ্ধই থাকায় সাধ্য নহে। যেমন উক্ত স্থলে লোষ্ট সক্রিয়ত্বরূপে পূর্ব্বসিদ্ধই আছে এবং ঘট অনিত্যত্বরূপে পূর্ব্বসিদ্ধই আছে। লোষ্ট যে সক্রিয় এবং ঘট যে অনিত্য, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই স্বীকৃত। সুতরাং হেতু প্রভৃতি অবয়বের প্রয়োগ করিয়া উহা সাধন করা অনাবশ্যক। কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই দৃষ্টান্তপদার্থেও সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তর "সাধ্যসমা" জাতি। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, "যেমন লোষ্ট, সেইরূপ আত্মা" ইহা বলিলে লোষ্টও আত্মার ন্যায় সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য হউক? অর্থাৎ লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে হেতু কি? তাহাও বলা আবশ্যক। এইরূপ "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, "যেমন ঘট, তদ্রূপ শব্দ" ইহা বলিলে ঘটও শব্দের ন্যায় সাধ্য হউক? অর্থাৎ ঘট যে অনিত্য, এ বিষয়ে হেতু কি? তাহাও বলা আবশ্যক। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত সমানধর্ম্মা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তও তাহার পক্ষের ন্যায় ঐরূপে সাধ্য হইলে উহা দৃষ্টান্তই হয় না। কারণ, সাধ্য পদার্থ দৃষ্টান্ত হয় না। সুতরাং দৃষ্টান্তাসিদ্ধিবশতঃ বাদীর ঐ অনুমান হইতে পারে না। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "সাধ্যসমা" জাতি। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুপ্রযুক্তই বাদীর পক্ষ, হেতু এবং দৃষ্টান্ত যাহা পূর্ব্বসিদ্ধ, তাহাতেও সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিলে তাঁহার ঐ উত্তর "সাধ্যসমা" জাতি। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসদুত্তর। কারণ, ব্যাপ্তিশূন্য কেবল কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারা কোন সাধ্যসিদ্ধি বা আপত্তি হইতে পারে না। বাদীর পক্ষের কোন সাধর্ম্ম্যমাত্র ঐ পক্ষের ন্যায় তাঁহার দৃষ্টান্তের সাধ্যত্বের সাধক হেতু হয় না। পরন্ত অনুমানের পক্ষগত সমস্ত ধর্ম্মই দৃষ্টান্তে থাকে না। তাহা হইলে ঐ পক্ষ ও দৃষ্টান্ত অভিন্ন পদার্থই হওয়ায় কুত্রাপি দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয় না। সর্ব্বত্রই উক্ত যুক্তিতে দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইলে অনুমান মাত্রেরই উচ্ছেদ হয়। সুতরাং প্রতিবাদী নিজেও কোন অনুমান প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার ঐ উত্তর নিজেরই ব্যাঘাতক হওয়ায় অসদুত্তর। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র দ্রষ্টব্য

৯। প্রাপ্তিসমা—(সপ্তম সূত্রে)

"প্রাপ্তি" শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতু ও সাধ্য ধর্ম্মের প্রাপ্তিবশতঃ সাম্য সমর্থন করিয়া দোষোদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম "প্রাপ্তিসমা" জাতি। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, এই হেতু কি এই সাধ্যধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইয়াই উহার সাধক হয় অথবা প্রাপ্ত না হইয়াই উহার সাধক হয়। যদি বল, সাধ্যধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইয়াই উহার সাধক হয়, তাহা হইলে ঐ হেতুর সহিত ঐ সাধ্যধর্ম্মের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ স্বীকৃত হওয়ায় ঐ হেতুর ন্যায় ঐ সাধ্যধর্ম্মও যে বিদ্যমান পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, উভয় পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে সেই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি ঐ হেতু ও সাধ্যধর্ম্ম,

এই উভয় পদার্থই একত্র বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ঐ উভয়ের অবিশেষবশতঃ কে কাহার সাধক অথবা সাধ্য হইবে? ঐ সাধ্য ধর্ম্মও ঐ হেতুর সাধক কেন হয় না? কারণ, তাহাও ত ঐ হেতুর সহিত সম্বদ্ধ। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের প্রাপ্তিপক্ষ গ্রহণ করিয়া উক্তরূপে প্রতিকূল তর্ক দ্বারা বাদীর হেতুর সাধকত্ব খণ্ডন করিলে তাঁহার ঐ উত্তর ভাষ্যকারের মতে "প্রাপ্তিসমা" জাতি। এইরূপ বাদী কোন পদার্থকে কোন কার্য্যের কারণ বলিলে প্রতিবাদী যদি পূর্ব্ববৎ বলেন যে, ঐ পদার্থ যদি ঐ কার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়াই উহার জনক হয়, তাহা হইলে ঐ কার্য্যও পূর্ব্বে বিদ্যমান পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। নচেৎ উহার সহিত ঐ কারণের প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ হইতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ কার্য্য ঐ কারণের ন্যায় পূর্ব্বেই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে আর ঐ পদার্থকে ঐ কার্য্যের জনক বলা যায় না। সুতরাং উহা কারণই হয় না। প্রতিবাদী এইরূপে প্রতিকূল তর্কের দ্বারা বাদীর কথিত কারণের কারণত্ব খণ্ডন করিলে তাঁহার ঐ উত্তরও পূর্ব্ববৎ "প্রাপ্তিসমা" জাতি হইবে। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, যাহা বস্তুতঃ বাদীর সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু, তাহা ঐ সাধ্যধর্ম্মকে প্রাপ্ত না হইয়াও উহার সাধক হইতে পারে। ঐ হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের যে ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধ আছে, তাহাতে ঐ উভয়ের অবিশেষ হয় না। হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের যেরূপ সম্বন্ধ থাকিলে হেতুর ন্যায় সাধ্য ধর্ম্মেরও সর্ব্বত্র পূর্ব্বসত্তা স্বীকার্য্য হয়, সেইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক এবং তাহা সর্ব্বত্র সম্ভবও হয় না। এইরূপ যাহা বস্তুতঃ কারণ বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ, তাহাও কার্য্যকে প্রাপ্ত না হইয়াও ঐ কার্য্যের জনক হয়। ঐ উভয়ের কার্য্য-কারণ-ভাব সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। কিন্তু যেরূপ সম্বন্ধ থাকিলে কারণের ন্যায় সেই কার্য্যেরও পূর্ব্বসত্তা স্বীকার্য্য হয়, সেরূপ সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক। অষ্টম সূত্র দ্রষ্টব্য।

১০। অপ্রাপ্তিসমা—(সপ্তম সূত্রে)

বাদীর কথিত হেতু তাঁহার সাধ্যধর্ম্মকে প্রাপ্ত না হইয়াই উহার সাধক হয় এবং তাঁহার কথিত কারণও সেই কার্য্যকে প্রাপ্ত না হইয়াই উহার জনক হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুর সাধকত্ব এবং কথিত কারণের কারণত্ব খণ্ডন করিলে, প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "অপ্রাপ্তিসমা" জাতি। যেমন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, প্রদীপ যেমন তাহার প্রকাশ্য পদার্থকে প্রাপ্ত না হইয়া তাহার প্রকাশক হইতে পারে না, তদ্রূপ হেতুও তাহার সাধ্য পদার্থকে প্রাপ্ত না হইয়া তাহার সাধক হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে ঐ হেতু সেই সাধ্যধর্ম্মের অভাবেরও সাধক হইতে পারে। তাহা হইলে আর উহার দ্বারা সেই সাধ্যধর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ বহ্নি যেমন দাহ্য পদার্থকে প্রাপ্ত না হইলে তাহার দাহ জন্মাইতে পারে না, তদ্রূপ কারণও কার্য্যকে প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে জন্মাইতে পারে না। সুতরাং হেতু সাধ্যধর্ম্মকে প্রাপ্ত না হইলে তাহা উহার সাধকই হয় না এবং কারণও কার্য্যকে প্রাপ্ত না হইলে তাহার কারণই হয় না। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "অপ্রাপ্তিসমা" জাতি। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসদুত্তর। অষ্টম সূত্র দ্রষ্টব্য।

১১। প্রসঙ্গসমা—(নবম সূত্রে)

প্রতিবাদী বাদীর কথিত দৃষ্টান্তেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া বাদীর অনুমানে দৃষ্টান্ত-সিদ্ধি দোষ প্রদর্শন করিলে, তাঁহার সেই উত্তর ভাষ্যকারের মতে "প্রসঙ্গসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ লোষ্টবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে প্রমাণ কি ? তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ কথিত না হওয়ায় ঐ দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ। এইরূপ "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘট যে অনিত্য, এ বিষয়ে প্রমাণ কি ? তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ কথিত না হওয়ায় ঐ দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "প্রসঙ্গসমা" জাতি। উদয়নাচার্য্যের মতে প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত, এই পদার্থত্রয়েই পূর্ব্বোক্তরূপে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, বাদী তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিলে তাহাতেও প্রমাণ প্রশ্ন করেন, এবং বাদী তাহাতে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিলে তাহাতেও আবার প্রমাণ প্রশ্ন করেন, অর্থাৎ এইরূপে প্রমাণ-পরম্পরা প্রশ্ন করিয়া যদি অনবস্থা-ভাসের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "প্রসঙ্গসমা" জাতি। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, যেমন কেহ কোন দৃশ্য পদার্থ দেখিবার জন্য প্রদীপ গ্রহণ করিলে, সেই প্রদীপ দর্শনের জন্য আবার অন্য প্রদীপ গ্রহণ করে না, কারণ, অন্য প্রদীপ ব্যতীতও সেই প্রদীপ দেখা যায় ; সুতরাং সেখানে প্রদীপ দর্শনের জন্য অন্য প্রদীপ গ্রহণ ব্যর্থ,—এইরূপ বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তদ্বিষয়ে আর প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক। এইরূপ বাদীর হেতু এবং পক্ষও প্রমাণসিদ্ধ থাকায় তদ্বিষয়েও আর প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক হয় না। কোন স্থলে আবশ্যক হইলেও সর্ব্বত্রই প্রমাণপরম্পরা প্রদর্শন আবশ্যক হয় না। তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের অনুমানেও তাঁহার বক্তব্য দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পদার্থে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া দৃষ্টান্তাদির অসিদ্ধি বলা যাইবে ; পূর্ব্বোক্তরূপে অনবস্থাভাসের উদ্ভাবনও করা যাইবে। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে অসদুত্তর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। দশম সূত্র দ্রষ্টব্য।

১২। প্রতিদৃষ্টান্তসমা—(নবম সূত্রে)

যে পদার্থে বাদীর সাধ্যধর্ম্ম নাই, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মত, সেই পদার্থকে প্রতিবাদী দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে তাহাকে বলে প্রতিদৃষ্টান্ত বা প্রতিকূল দৃষ্টান্ত। প্রতিবাদী যদি ঐ প্রতিদৃষ্টান্তে বাদীর কথিত হেতুর সত্তা সমর্থন করিয়া, তদ্দ্বারা বাদীর সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তর ভাষ্যকারের মতে "প্রতিদৃষ্টান্তসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতু-গুণবত্ত্বাৎ লোষ্টবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তারূপ যে হেতু, তাহা ত আকাশেও আছে। কারণ,বৃক্ষের সহিত বায়ুর সংযোগ বৃক্ষের ক্রিয়ার কারণ গুণ। ঐ বায়ুর সংযোগ আকাশেও আছে। সুতরাং আত্মা আকাশের ন্যায় নিষ্ক্রিয় হউক ? ক্রিয়ার

কারণ গুণবত্তাবশতঃ আত্মা যদি লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় হয়, তাহা হইলে ঐ হেতুবশতঃ আত্মা আকাশের ন্যায় নিষ্ক্রিয় হইবে না কেন ? প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে "প্রতিদৃষ্টান্তসমা" জাতি। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত আকাশরূপ দৃষ্টান্তই প্রতিদৃষ্টান্ত। উহাতে বাদীর কথিত হেতুর সত্তা সমর্থনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা বাদীর সাধ্যধর্ম্মী আত্মাতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্ম সক্রিয়ত্বের অভাব নিষ্ক্রিয়ত্বের সমর্থন করিয়া, বাদীর অনুমানে বাধ অথবা সৎপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। এইরূপ কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, কার্য্যত্ববশতঃ শব্দ যদি ঘটের ন্যায় অনিত্য হয়, তাহা হইলে আকাশের ন্যায় নিত্যও হউক ? কারণ, আকাশেও কার্য্যত্ব হেতু আছে। কূপ খনন করিলে তন্মধ্যে আকাশও জন্মে। সুতরাং আকাশও কার্য্য বা জন্য পদার্থ। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তরও "প্রতি-দৃষ্টান্তসমা" জাতি। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতু প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্তে বস্তুতঃ নাই। সুতরাং প্রকৃত হেতুশূন্য কেবল ঐ প্রতিদৃষ্টান্ত উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর সাধ্যসাধক হয় না। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে প্রতিবাদী যদি হেতু সাধ্যসাধন নহে, কিন্তু দৃষ্টান্তই সাধ্যসাধন, ইহা মনে করিয়া, কেবল প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারাই বাদীর সাধ্য ধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই উত্তরের নাম "প্রতিদৃষ্টান্ত-সমা" জাতি। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসদুত্তর। একাদশ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৩। অনুৎপত্তিসমা—(দ্বাদশ সূত্রে)

বাদী কোন পদার্থে কোন হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্য অনিত্যত্ব ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি অনুৎপত্তিকে আশ্রয় করিয়া, বাদীর ঐ হেতুতে দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার সেই উত্তর "অনুৎপত্তিসমা" জাতি। উৎপত্তির পূর্ব্বে উহার যে অভাব থাকে, তাহাই এখানে অনুৎপত্তি। যেমন কোন বাদী বলিলেন,—"শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ ঘটবৎ" অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা প্রযত্নের অনন্তর উৎপন্ন হয়, যেমন ঘট। এখানে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাতে ত ঐ হেতু নাই। সুতরাং তখন শব্দে অনিত্যত্ব-সাধক হেতু না থাকায় সেই শব্দ নিত্য হউক ? নিত্য হইলে আর উহাতে উৎপত্তি-ধর্ম্ম নাই, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং বাদীর কথিত ঐ হেতু (প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি) শব্দে অসিদ্ধ হওয়ায় উহা শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "অনুৎপত্তিসমা" জাতি। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, শব্দের উৎপত্তি হইলেই তাহার সত্তা সিদ্ধ হয়। তখন হইতেই উহা শব্দ। তৎপূর্ব্বে উহার সত্তাই নাই। সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে অনুৎপন্ন শব্দে বাদীর ঐ হেতু নাই, অতএব তখন ঐ শব্দ নিত্য, এই কথা বলাই যায় না। পরন্তু প্রতিবাদী ঐ কথা বলিয়া শব্দের উৎপত্তি স্বীকারই করিয়াছেন। সুতরাং শব্দের অনিত্যত্বও তাঁহার স্বীকৃত হইয়াছে। ত্রয়োদশ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৪। সংশয়সমা—(চতুর্দ্দশ সূত্রে)

বাদী কোন পদার্থে কোন হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি সংশয়ের কারণ প্রদর্শন করিয়া, সেই পদার্থে বাদীর সেই সাধ্যধর্ম্ম বিষয়ে সংশয় সমর্থন করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তর "সংশয়সমা" জাতি। যেমন কোন বাদী বলিলেন, "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নজন্যত্বাৎ ঘটবৎ"। এখানে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য প্রযত্নজন্যত্ব শব্দে আছে বলিয়া শব্দে যদি অনিত্যত্বের নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় কেন হইবে না? ঐরূপ সংশয়েরও ত কারণ আছে? কারণ, শব্দ যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তদ্রূপ ঘট এবং তদ্‌গত ঘটত্ব জাতিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ঘটত্ব জাতির প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটত্বরূপে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ঐ ঘটত্ব জাতি নিত্য, ইহা বাদীও স্বীকার করেন। সুতরাং নিত্য ঘটত্ব জাতি এবং অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য বা সমান ধর্ম্ম যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব, তাহা শব্দে বিদ্যমান থাকায় উহার জ্ঞানজন্য শব্দ কি ঘটত্ব জাতির ন্যায় নিত্য? অথবা ঘটের ন্যায় অনিত্য? এইরূপ সংশয় অবশ্যই হইবে। কারণ, সমানধর্ম্মজ্ঞান এক প্রকার সংশয়ের কারণ। সুতরাং কারণ থাকায় উক্তরূপ সংশয় অবশ্যম্ভাবী। সংশয়ের কারণ থাকিলেও যদি সংশয় না হয়, তাহা হইলে বাদীর অভিমত নিশ্চয়ের কারণ থাকিলেও নিশ্চয় হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "সংশয়সমা" জাতি। উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিয়া বাদীর হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষত্ব দোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, বিশেষ ধর্ম্ম-নিশ্চয় হইলে সমানধর্ম্মজ্ঞান সংশয়ের কারণ হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। নচেৎ সমানধর্ম্মজ্ঞান স্থলে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই সংশয় জন্মিবে। কোন দিনই ঐ সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্থলে শব্দে বাদীর কথিত হেতু প্রযত্নজন্যত্ব সিদ্ধ থাকায় তদ্দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয়বশতঃ তাহাতে উক্তরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না। কারণ, বিশেষ ধর্ম্মনিশ্চয় সংশয়ের প্রতিবন্ধক, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। পঞ্চদশ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৫। প্রকরণসমা—(ষোড়শ সূত্রে)

যথাক্রমে বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যধর্ম্মরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নাম "প্রকরণ"। বাদীর যাহা পক্ষ, প্রতিবাদীর তাহা প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, বাদীর তাহা প্রতিপক্ষ। বাদী প্রথমে কোন হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্ম্মরূপ পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যরূপ অন্য হেতুর দ্বারা বাদীর সেই সাধ্যধর্ম্মের অভাবরূপ প্রতিপক্ষের স্থাপন করেন, এবং উভয়েই সেই হেতুদ্বয়কে তুল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াই নিজ সাধ্যনির্ণয়ের অভিমানবশতঃ অপরের সাধ্যধর্ম্মকে বাধিত বলিয়া প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে সেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের সেই উত্তরই "প্রকরণসমা" জাতি। যেমন প্রথমে কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নজন্যত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রযত্নজন্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন

করিলে পরে প্রতিবাদী "শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া শ্রাবণত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে বাদীর সাধ্যধর্ম্ম অনিত্যত্বের অভাব নিত্যত্বের সংস্থাপনপূর্ব্বক যদি বলেন যে, শব্দের ন্যায় তদ্‌গত শব্দত্ব নামক জাতিও "শ্রাবণ" অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং উহা নিত্য পদার্থ, ইহা বাদীরও স্বীকৃত। সুতরাং ঐ শব্দত্ব জাতিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রাবণত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে নিত্যত্বই সিদ্ধ আছে। অতএব আর উহাতে কোন হেতুর দ্বারাই অনিত্যত্ব সাধন করা যায় না। কারণ, শব্দে যে অনিত্যত্ব বাধিত অর্থাৎ অনিত্যত্ব নাই, ইহা নিশ্চিতই আছে। উক্ত স্থলে পরে বাদীও প্রতিবাদীর ন্যায় যদি বলেন যে, শব্দ যে প্রযত্নজন্য এবং প্রযত্নজন্যত্ব হেতু যে অনিত্যত্বের সাধক, ইহা প্রতিবাদীরও স্বীকৃত। কারণ, প্রতিবাদী উহার খণ্ডন বা অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং ঐ প্রযত্নজন্যত্ব হেতুর দ্বারা পূর্ব্বে শব্দে অনিত্যত্বই সিদ্ধ হওয়ায় আর কোন হেতুর দ্বারা উহাতে নিত্যত্ব সাধন করা যায় না। কারণ, শব্দে যে নিত্যত্ব বাধিত, অর্থাৎ নিত্যত্ব নাই, ইহা পূর্ব্বেই নিশ্চিত হইয়াছে। উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই উত্তর "প্রকরণসমা" জাতি; কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী কেহই নিজ হেতুর অধিক বলশালিত্ব প্রতিপন্ন না করায় অপরের হেতুর সহিত নিজ হেতুর তুল্যতাই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা কেহই নিজ হেতুর দ্বারা অপর পক্ষের বাধ নির্ণয় করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের আভিমানিক বাধ নির্ণয় প্রকৃত বাধনির্ণয় নহে। সপ্তদশ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৬। অহেতুসমা—(অষ্টাদশ সূত্রে)

বাদী কোন হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, এই হেতু এই সাধ্যধর্ম্মের পূর্ব্বে থাকিয়া উহার সাধন হয় না। কারণ, তখন এই সাধ্যধর্ম্ম না থাকায় কাহার সাধন হইবে? এবং এই হেতু এই সাধ্যধর্ম্মের পরে থাকিয়াও উহার সাধন হয় না। কারণ, পূর্ব্বে হেতু না থাকিলে ইহা কাহার সাধ্য হইবে? যাহা সাধ্যধর্ম্মের পূর্ব্বে নাই, তাহা সাধন হইতে পারে না। এবং এই হেতু যুগপৎ অর্থাৎ এই সাধ্যধর্ম্মের সহিত একই সময়ে বিদ্যমান থাকিয়াও উহার সাধন হয় না। কারণ, উভয় পদার্থই সমকালে বিদ্যমান থাকিলে কে কাহার সাধন অথবা সাধ্য হইবে? উভয়েই উভয়ের সাধ্য ও সাধন কেন হয় না? সুতরাং এই হেতু যখন পূর্ব্বোক্ত কালত্রয়েই সাধ্য সাধন হইতে পারে না, তখন উহা হেতুই হয় না, উহা অহেতু। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরের নাম "অহেতুসমা" জাতি। এবং বাদী কোন পদার্থকে কোন কার্য্যের কারণ বলিলে, প্রতিবাদী যদি পূর্ব্বোক্তরূপে কোন কালেই উহা সেই কার্য্যের কারণ হইতে পারে না, সুতরাং উহা কারণই নহে, ইহা সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরও "অহেতুসমা" জাতি হইবে। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি এবং কারণ দ্বারা কার্য্যোৎপত্তি প্রতিবাদীরও স্বীকার্য্য। নচেৎ তিনিও কোন পক্ষ স্থাপন এবং কোন কার্য্যে কোন পদার্থকে কারণ বলিতে পারেন না। সর্ব্বত্রই তাঁহার ন্যায় উক্তরূপ প্রতিষেধ করিলে তাঁহাকে নীরবই থাকিতে হইবে। ১৯শ ও ২০শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৭। অর্থাপত্তি-সমা—(একবিংশ সূত্রে)

কেহ কোন বাক্যবিশেষ বলিলে, ঐ বাক্যের অর্থতঃ যে অনুক্ত অর্থবিশেষের যথার্থ বোধ জন্মে, তাহাকে বলে অর্থাপত্তি এবং সেই বোধের যাহা করণ, তাহাকে বলে অর্থাপত্তিপ্রমাণ। মহর্ষি গোতমের মতে উহা অনুমান-প্রমাণেরই অন্তর্গত, অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নহে। যেমন কেহ যদি বলেন যে, দেবদত্ত জীবিত আছেন, কিন্তু গৃহে নাই। তাহা হইলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ দেবদত্ত বাহিরে আছেন, ইহা বুঝা যায়। কারণ, দেবদত্তের বাহিরে সত্তা ব্যতীত তাঁহার জীবিতত্ব ও গৃহে অসত্তার উপপত্তি হয় না। কিন্তু উক্ত বাক্যের অর্থতঃ দেবদত্তের পুত্র গৃহে আছেন, ইহা বুঝা যায় না। কেহ ঐরূপ বুঝিলে তাহা প্রকৃত অর্থাপত্তি নহে, এবং ঐরূপ বোধের যাহা সাধন, তাহাও অর্থাপত্তি-প্রমাণ নহে। উহাকে বলে অর্থাপত্ত্যাভাস। কোন বাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি ঐ অর্থাপত্ত্যাভাসের দ্বারা বাদীর বাক্যের অনভিমত তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া, বিপরীত পক্ষের অর্থাৎ বাদীর সাধ্য ধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের অভাবের সমর্থনপূর্ব্বক বাদীর অনুমানে বাধ-দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "অর্থাপত্তি-সমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নজন্যত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য প্রযত্নজন্যত্ব-প্রযুক্ত শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য, ইহা বলিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে বুঝিলাম, নিত্য আকাশের সাধর্ম্ম্য স্পর্শশূন্যতা-প্রযুক্ত শব্দ আকাশের ন্যায় নিত্য। কারণ, আপনার ঐ বাক্যের অর্থতঃ ইহা বুঝা যায়। সুতরাং আপনি শব্দের নিত্যত্ব স্বীকারই করায় শব্দে অনিত্যত্ব যে বাধিত অর্থাৎ অনিত্যত্ব নাই, ইহা স্বীকারই করিয়াছেন। সুতরাং আপনি কোন হেতুর দ্বারাই শব্দে অনিত্যত্ব সাধন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "অর্থাপত্তিসমা" জাতি। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, বাদী উক্ত বাক্য বলিলে তাহার অর্থতঃ প্রতিবাদীর কথিত ঐরূপ অর্থ বুঝা যায় না। উহা প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে। পরন্তু প্রতিবাদী ঐরূপ বলিলে বাদীও প্রতিবাদীর বাক্যের অর্থতঃ তাঁহার বিপরীত পক্ষ বুঝা যায়, ইহা বলিতে পারেন। কারণ, বাদীর কথিতরূপ অর্থাপত্তি উভয় পক্ষেই তুল্য। পরন্তু প্রতিবাদী যে বাক্যের দ্বারা তাঁহার পক্ষ সিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিবেন, সেই বাক্যের অর্থতঃ তাঁহার পক্ষ অসিদ্ধ, ইহাও বুঝা যায় বলিলে তিনি কি উত্তর দিবেন? সুতরাং তাঁহার ঐরূপ উত্তর স্বব্যাঘাতক বলিয়াও উহা অসদুত্তর। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে বাদী "শব্দ অনিত্য" এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝিলাম, শব্দ ভিন্ন সমস্তই নিত্য। এবং বাদী "শব্দ অনুমানপ্রযুক্ত অনিত্য", ইহা বলিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝিলাম, শব্দ প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য। কারণ, অর্থাপত্তির দ্বারা ঐরূপ বুঝা যায়। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব স্বীকৃতই হওয়ায় উহাতে অনিত্যত্ব বাধিত, ইহা বাদীর স্বীকার্য্য। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরও "অর্থাপত্তিসমা" জাতি। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসদুত্তর। ২২শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৮। অবিশেষ-সমা—(ত্রয়োবিংশ সূত্রে)

বাদী কোন পদার্থে কোন দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্যরূপ হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি সকল পদার্থের সাধর্ম্ম্য সত্তা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থেরই অবিশেষের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম "অবিশেষ-সমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নজন্যত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘট ও শব্দে প্রযত্নজন্যত্বরূপ এক ধর্ম্ম আছে বলিয়া যদি শব্দ ও ঘটের অনিত্যত্বরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থেই সত্তা ও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি এক ধর্ম্ম থাকায় সকল পদার্থেরই অবিশেষ হউক? তাহা কেন হইবে না? প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "অবিশেষ-সমা" জাতি। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদী যদি সকল পদার্থের একত্বরূপ অবিশেষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে অনুমানের পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্তাদির ভেদ না থাকায় তিনি উক্ত অনুমানই করিতে পারেন না। আর যদি তিনি সকল পদার্থের একধর্ম্মবত্তা বা একজাতীয়ত্বরূপ অবিশেষই স্বীকার করেন, তাহা হইলে পদার্থের নিত্যানিত্য বিভাগ থাকে না। অর্থাৎ সকল পদার্থই নিত্য অথবা সকল পদার্থই অনিত্য, ইহার এক পক্ষই স্বীকার্য্য। সকল পদার্থই নিত্য, ইহা স্বীকার করিলে শব্দের নিত্যত্বও স্বীকৃত হওয়ায় আর তাহাতে অনিত্যত্ব সাধন করা যায় না। সকল পদার্থই অনিত্য, ইহা স্বীকার করিলে বিশেষতঃ শব্দে অনিত্যত্বের সাধন ব্যর্থ হয়। উক্ত স্থলে এইরূপে বাদীর অনুমানে নানা দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল পদার্থের যে অবিশেষের আপত্তি সমর্থন করিয়াছেন, তাহার সাধক কোন হেতু নাই। সত্তা বা প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ঐরূপ অবিশেষের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্য নহে। সুতরাং তদ্দ্বারা সকল পদার্থের একত্ব বা একজাতীয়ত্ব প্রভৃতি কোন অবিশেষ সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু প্রতিবাদী সকল পদার্থেই অবিশেষের অনুমান করিতে গেলে দৃষ্টান্তের অভাবে তাঁহার ঐ অনুমান হইতে পারে না। কারণ, সকল পদার্থ সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ হইলে উহার অন্তর্গত কোন পদার্থই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। পরন্তু প্রতিবাদী যদি উহার অন্তর্গত ঘটাদি কোন পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াই সকল পদার্থে অনিত্যত্বরূপ অবিশেষই সাধন করেন, তাহা হইলে শব্দের অনিত্যত্ব তাঁহার স্বীকৃতই হওয়ায় তিনি আর উহার প্রতিষেধ করিতেও পারেন না। সুতরাং তাঁহার উক্তরূপ উত্তর ব্যর্থ এবং স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা অসদুত্তর। ২৪শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৯। উপপত্তিসমা—(পঞ্চবিংশ সূত্রে)

বাদীর পক্ষ এবং প্রতিবাদীর পক্ষ, এই উভয় পক্ষে হেতুর সত্তাই এখানে "উপপত্তি" শব্দের দ্বারা অভিমত। বাদী প্রথমে তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি তাঁহার নিজপক্ষেরও সাধক হেতু প্রদর্শন করিয়া, নিজ পক্ষের আপত্তি প্রকাশ করিয়া দোষোদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "উপপত্তিসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ

প্রযত্নজন্যত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রযত্নজন্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বরূপ নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন অনিত্যত্বের সাধক প্রযত্নজন্যত্ব হেতু আছে, তদ্রূপ নিত্যত্বের সাধক স্পর্শশূন্যত্বরূপ হেতুও আছে। সুতরাং ঐ স্পর্শশূন্যতা-প্রযুক্ত গগনের ন্যায় শব্দ নিত্যও হউক? উভয় পক্ষেই যখন হেতু আছে, তখন শব্দে অনিত্যত্বই সিদ্ধ হইবে, কিন্তু নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে না, ইহা কখনই বলা যায় না। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে "উপপত্তিসমা" জাতি। পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" ও "প্রকরণসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ খণ্ডনোদ্দেশ্যে তাঁহার হেতুকে দুষ্ট বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই "উপপত্তিসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ স্বীকার করিয়াই তদ্দৃষ্টান্তে অন্য হেতুর দ্বারা নিজ পক্ষেরও সমর্থন করেন। তদ্দ্বারা পরে প্রতি-বাদীর পক্ষের অসিদ্ধি সমর্থনই তাঁহার উদ্দেশ্য। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী মনে করেন যে, শব্দে নিত্যত্ব সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে বাদী আর উহাতে অনিত্যত্ব সাধন করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, প্রতিবাদী যখন বাদীর কথিত প্রযত্নজন্যত্ব হেতুকে শব্দে অনি-ত্যত্বের সাধক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন তিনি শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকারই করিয়াছেন। শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকৃত হইলে তাহাতে আর নিত্যত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, উহা একাধারে থাকে না। পরন্তু প্রতিবাদী যে স্পর্শশূন্যত্বকে শব্দে নিত্যত্বের সাধক হেতু বলিয়াছেন, তাহাও নিত্যত্বের সাধক হয় না। কারণ, রূপরসাদি অনিত্য গুণ এবং গমনাদি ক্রিয়াতেও স্পর্শশূন্যতা আছে। কিন্তু তাহাতে নিত্যত্ব না থাকায় স্পর্শশূন্যতা নিত্য-ত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম্ম নহে; উহা নিত্যত্বের ব্যভিচারী। অর্থাৎ স্পর্শশূন্য পদার্থমাত্রই নিত্য নহে। সুতরাং শব্দে নিত্যত্বসাধক হেতুও আছে, ইহাও প্রতিবাদী বলিতে পারেন না। উদয়না-চার্য্য প্রভৃতির মতে "উপপত্তিসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী তাঁহার নিজ পক্ষের সাধক কোন হেতু বা প্রমাণ প্রদর্শন করেন না। কিন্তু আমার পক্ষেও অবশ্য কোন হেতু বা প্রমাণ আছে, ইহা সমর্থন করেন। অর্থাৎ আমার পক্ষও সপ্রমাণ, যেহেতু উহা বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষের অন্তর্গত একতর পক্ষ—যেমন বাদীর পক্ষ, ইত্যাদি প্রকারে বাদীর পক্ষকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া অনুমানদ্বারা প্রতিবাদী নিজপক্ষের সপ্রমাণত্ব সাধনপূর্ব্বক বাদীর অনুমানে বাধ বা সৎপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করেন। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসদুত্তর। কারণ, প্রতিবাদী বাদীর পক্ষকে সপ্রমাণ বলিয়া স্বীকারই করায় তিনি আর কোনরূপেই বাদীর পক্ষের খণ্ডন করিতে পারেন না। ২৬শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২০। উপলব্ধিসমা—(সপ্তবিংশ সূত্রে)

বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও কোন পদার্থে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের উপলব্ধি হয়, ইহা প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদী বাদীর হেতুর অসাধকত্ব সমর্থন করিলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম "উপলব্ধিসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নজন্যত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতি-

বাদী যদি বলেন যে, প্রবল বায়ুর আঘাতে বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য যে শব্দ জন্মে, তাহা ত কাহারও প্রযত্নজন্য নহে। সুতরাং তাহাতে বাদীর কথিত হেতু প্রযত্নজন্যত্ব নাই। কিন্তু তথাপি তাহাতে বাদীর সাধ্য ধর্ম্ম অনিত্যত্বের উপলব্ধি হয়। সুতরাং প্রযত্নজন্যত্ব, শব্দের অনিত্যত্বের সাধক হয় না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "উপলব্ধিসমা" জাতি। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী শব্দে অনিত্যত্বের অনুমানে প্রযত্নজন্যত্বকে হেতু বলিয়া শব্দ যে কারণজন্য, ইহাই বলিয়াছেন। শব্দমাত্রই প্রযত্নরূপ কারণজন্য, ইহা তিনি বলেন নাই। বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য শব্দও অন্য কারণজন্য। সুতরাং তাহাও অনিত্য। ঐ শব্দ প্রযত্নজন্য না হইলেও প্রযত্নজন্যত্ব হেতু শব্দের অনিত্যত্বের সাধক হইতে পারে। কারণ, যে সমস্ত পদার্থ প্রযত্নজন্য, সে সমস্তই অনিত্য, এইরূপ নিয়মে কুত্রাপি ব্যভিচার নাই। সুতরাং উক্ত নিয়ম বা ব্যাপ্তি অনুসারেই বাদী শব্দে অনিত্যত্বের সাধন করিতে প্রযত্নজন্যত্বকে হেতু বলিতে পারেন। পরন্তু শব্দমাত্রে প্রযত্নজন্যত্ব না থাকিলেও বর্ণাত্মক শব্দে উহা আছে। বাদী তাহাতেই ঐ হেতুর দ্বারা অনিত্যত্বের সাধন করিয়াছেন। সুতরাং বাদীর ঐ হেতু তাঁহার পক্ষে অংশতঃ অসিদ্ধও নহে। ২৮শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে বাদী তাঁহার বাক্যে অবধারণবোধক কোন শব্দ প্রয়োগ না করিলেও অর্থাৎ অবধারণে তাঁহার তাৎপর্য্য না থাকিলেও প্রতিবাদী যদি বাদীর অবধারণবিশেষে তাৎপর্য্যের বিকল্প করিয়া, বাদীর অনুমানে বাধাদি দোষের উদ্‌ভাবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম "উপলব্ধিসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি কেবল পর্ব্বতেই বহ্নি আছে? অথবা পর্ব্বতে কেবল বহ্নিই আছে? কিন্তু উহার কোন পক্ষই বলা যায় না। কারণ, পর্ব্বত ভিন্ন পদার্থেও বহ্নি আছে এবং পর্ব্বতে বহ্নিভিন্ন পদার্থও আছে। এইরূপ বাদী ঐ স্থলে "ধূমাৎ" এই হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি পর্ব্বতে কেবল ধূমই আছে? অথবা পর্ব্বত-মাত্রেই ধূম আছে? কিন্তু ইহার কোন পক্ষই বলা যায় না। প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞাদি বাক্যে পূর্ব্বোক্তরূপে তাঁহার অবধারণ-তাৎপর্য্যের বিকল্প করিয়া সকল পক্ষেরই খণ্ডন করিলে তাঁহার ঐ উত্তর "উপলব্ধিসমা" জাতি। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, বাদীর প্রতিজ্ঞাদিবাক্যে ঐরূপ কোন অবধারণে তাৎপর্য্য নাই। তাহা হইলে তিনি "পর্ব্বত এব বহ্নিমান্" ইত্যাদিপ্রকার বাক্যই বলিতেন। বাদীর তাৎপর্য্যানুসারে তাঁহার ঐ অনুমানে কোন দোষ নাই। পরন্তু প্রতিবাদী উক্তরূপে বাদীর অনভিমত তাৎপর্য্য কল্পনা করিলে তাঁহার বাক্যেও উক্তরূপে তাৎপর্য্যকল্পনা করিয়া সকল পক্ষেরই খণ্ডন করা যায়। যথাস্থানে ইহা ব্যক্ত হইবে।

২১। অনুপলব্ধিসমা—(ঊনত্রিংশ সূত্রে)

উপলব্ধির অভাবই অনুপলব্ধি। যে পদার্থের উপলব্ধি হয়, তাহার সত্তা স্বীকার্য্য। উপলব্ধি না হইলে অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত তাহার অসত্তা স্বীকার্য্য। বাদী অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত কোন পদার্থের

অসত্তা সমর্থন করিলে প্রতিবাদী যদি সেই অনুপলব্ধিরও অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত সেই পদার্থের সত্তা সমর্থন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "অনুপলব্ধিসমা" জাতি। যেমন শব্দনিত্যতা-বাদী মীমাংসক প্রথমে শব্দের নিত্যত্ব পক্ষ সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্ব্বেও তাহার উপলব্ধি (শ্রবণ) হউক ? কারণ, আপনার মতে তখনও ত শব্দ বিদ্যমান আছে। এতদুত্তরে বাদী মীমাংসক বলিলেন যে, হাঁ, তখনও শব্দ বিদ্যমান আছে ও চিরকালই বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু বিদ্যমান থাকিলেই যে, তাহার প্রত্যক্ষ হইবে, ইহা বলা যায় না। তাহা হইলে মেঘাচ্ছন্ন দিনে অথবা রাত্রিতে সূর্য্যদেব বিদ্যমান থাকিলেও তখন তাঁহার প্রত্যক্ষ কেন হয় না ? যদি বলেন যে, তখন মেঘাদি আবরণবশতঃই তাঁহার প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা হইলে আমরাও বলিব যে, উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের কোন আবরণ আছে বলিয়াই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। এতদুত্তরে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, সূর্য্যদেবের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষপ্রতি-বন্ধক মেঘাদি আবরণের উপলব্ধি হওয়ায় উহা স্বীকার্য্য। কিন্তু উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের কোন আবরণেরই ত উপলব্ধি হয় না। সুতরাং অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত উহা নাই, ইহাই স্বীকার্য্য। তখন বাদী মীমাংসক ইহার সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের কোন আবরণের অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত যদি তাহার অভাব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই অনুপলব্ধিরও অনুপলব্ধি-প্রযুক্ত অভাব সিদ্ধ হইবে। কারণ, সেই অনুপলব্ধিরও ত উপলব্ধি হয় না। অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত উহার অভাব সিদ্ধ হইলে উহার উপলব্ধিই সিদ্ধ হইবে। কারণ, অনুপলব্ধির অভাব উপলব্ধি-স্বরূপ। আবরণের উপলব্ধি সিদ্ধ হইলে তৎপ্রযুক্ত আবরণের সত্তাই স্বীকার্য্য। সুতরাং উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের কোন আবরণ নাই, ইহা ত আর বলা যাইবে না। এইরূপ উচ্চারণের পূর্ব্বে অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত শব্দ নাই, ইহা বলিলেও মীমাংসক যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের যে অনুপলব্ধি বলিতেছেন; সেই অনুপলব্ধিরও ত উপলব্ধি হয় না। সুতরাং অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত সেই অনুপলব্ধির অভাব যে উপলব্ধি, তাহা সিদ্ধ হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের সত্তাই সিদ্ধ হয়। মীমাংসকের উক্তরূপ উত্তর "অনুপলব্ধিসমা" জাতি। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, উপলব্ধির অভাবই অনুপলব্ধি। সুতরাং উহা অভাব বা অসৎ বলিয়া উপলব্ধির যোগ্য পদার্থই নহে। কারণ, যে পদার্থে অস্তিত্ব বা সত্তা আছে, তাহারই উপলব্ধি হয়। যাহা অভাব বা অসৎ, তাহাতে সত্তা না থাকায় তাহার উপলব্ধি হইতেই পারে না। যিনি অনুপলব্ধির উপলব্ধি হয় না বলিবেন, তিনি উহা সমর্থন করিতে এই কথাই বলিবেন। নচেৎ অনুপলব্ধির উপলব্ধি কেন হয় না ? এ বিষয়ে তিনি আর কোন যুক্তি বলিতে পারেন না। কিন্তু যদি অভাবাত্মক বলিয়া অনুপলব্ধি উপলব্ধির যোগ্যই নহে, ইহাই তিনি বলেন, তাহা হইলে অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত ঐ অনুপলব্ধির অভাব (উপলব্ধি) সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যাহা উপলব্ধির যোগ্য পদার্থ, তাহারই অনুপলব্ধির দ্বারা অভাব সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের এবং তাহার কোন আবরণের যে অনুপলব্ধি, তাহারও উপলব্ধিই হইয়া থাকে। আমি শব্দ এবং উহার কোন আবরণের উপলব্ধি করিতেছি না, এইরূপে ঐ অনুপলব্ধি মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অর্থাৎ মনের দ্বারা

উপলব্ধির ন্যায় উহার অভাব যে অনুপলব্ধি, তাহারও প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দ এবং উহার আবরণের অনুপলব্ধির উপলব্ধি হওয়ায় উহার অনুপলব্ধিই অসিদ্ধ। অতএব মীমাংসকের উক্ত উত্তর অমূলক। ৩০শ ও ৩১শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২২। অনিত্যসমা—(দ্বাবিংশ সূত্রে)

বাদী কোন পদার্থে হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অনিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি ঐ দৃষ্টান্তের সহিত সকল পদার্থের কোন সাধর্ম্ম্য অথবা কোন বৈধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থেরই অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "অনিত্যসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নজন্যত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, শব্দ ও ঘটের সাধর্ম্ম্য প্রযত্নজন্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ যদি ঘটের ন্যায় অনিত্য হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থ ই ঘটের ন্যায় অনিত্য হউক? কারণ, ঘটের সহিত সকল পদার্থেরই সত্তা ও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য আছে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "অনিত্যসমা" জাতি। পূর্ব্বোক্ত "অবিশেষসমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী উক্তরূপে সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তিই প্রকাশ করেন। কিন্তু "অনিত্যসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে বিশেষ করিয়া সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বিপক্ষেও (সাধ্যধর্ম্মশূন্য বলিয়া নিশ্চিত নিত্য পদার্থেও) সপক্ষত্বের (অনিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্ম্মবত্তার) আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি সমর্থনে যে সত্তাদি হেতু গ্রহণ করিয়াছেন, উহা বাদীর দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্যমাত্র, উহা অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্য নহে। সুতরাং উহার দ্বারা সকল পদার্থে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রতিবাদী যেমন বাদীর বাক্যকে অসিদ্ধ বলিতেছেন, তদ্রূপ তাঁহার নিজের বাক্যও অসিদ্ধ, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য হয়। কারণ, বাদীর বাক্য যেমন প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত, তদ্রূপ প্রতিবাদীর প্রতিষেধবাক্যও প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত। অতএব বাদীর বাক্যের সহিত প্রতিবাদীর বাক্যের ঐরূপ সাধর্ম্ম্য থাকায় তৎপ্রযুক্ত বাদীর বাক্যের ন্যায় প্রতিবাদীর বাক্যও অসিদ্ধ কেন হইবে না? সুতরাং ব্যাপ্তিশূন্য কেবল কোন সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্ম্মের সিদ্ধি হয় না, ইহা প্রতিবাদীরও স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ যে ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্য ধর্ম্মের সাধন অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া যথার্থরূপে নিশ্চিত হয়, তাহাই প্রকৃত হেতু। উহা দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য, এই উভয় প্রকার হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদীর কথিত প্রযত্নজন্যত্ব হেতু ঘটরূপ দৃষ্টান্ত পদার্থে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত সাধর্ম্ম্য হেতু। সুতরাং উহার দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রতিবাদীর অভিমত সত্তাদি হেতু উক্ত স্থলে অনিত্যত্বের সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না। সুতরাং উহার দ্বারা সকল পদার্থে অনিত্যত্বের আপত্তি সমর্থন করা যায় না। ৩৩শ ও ৩৪শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২৩। নিত্যসমা—(পঞ্চত্রিংশ সূত্রে)

বাদী কোন পদার্থে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি ঐ অনিত্যত্ব নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া, উভয় পক্ষেই সেই পদার্থে নিত্যত্বের আপত্তি সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম "নিত্যসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দের যে অনিত্যত্ব, তাহা কি নিত্য, অথবা অনিত্য? যদি উহা নিত্য হয়, তাহা হইলে উহা সর্ব্বকালেই শব্দে বিদ্যমান আছে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে শব্দও সর্ব্বকালেই বিদ্যমান আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, শব্দ সর্ব্বকালে বিদ্যমান না থাকিলে তাহাতে সর্ব্বকালেই অনিত্যত্ব বিদ্যমান আছে, ইহা বলা যায় না। ধর্ম্মী বিদ্যমান না থাকিলে তাহাতে কোন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। কিন্তু শব্দ সর্ব্বকালেই বিদ্যমান আছে, ইহা স্বীকার্য্য হইলে তাহাতে নিত্যত্বের আপত্তি অনিবার্য্য। সুতরাং বাদী তাহাতে অনিত্যত্বের সাধন করিতে পারেন না। আর যদি বাদীর স্বীকৃত শব্দের অনিত্যত্ব অনিত্যই হয়, তাহা হইলেও শব্দের নিত্যত্বাপত্তি অনিবার্য্য। কারণ, ঐ অনিত্যত্ব অনিত্য হইলে কোন কালে উহা শব্দে থাকে না, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে যে সময়ে উহা শব্দে থাকে না, সেই সময়ে শব্দ অনিত্যত্বশূন্য হওয়ায় নিত্য, ইহা স্বীকার্য্য। তখন শব্দ নিত্যও নহে, অনিত্যও নহে, ইহা ত বলা যাইবে না। কারণ, অনিত্যত্বের অভাবই নিত্যত্ব। সুতরাং অনিত্যত্ব না থাকিলে তখন নিত্যত্বই স্বীকার্য্য। শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার্য্য হইলে বাদী আর তাহাতে অনিত্যত্বের সাধন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "নিত্যসমা" জাতি। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে আরও বহু স্থলে বহু প্রকারে এই "নিত্যসমা" জাতির প্রয়োগ হয়। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, শব্দে অনিত্যত্ব সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে, এই পক্ষ গ্রহণ করিলে শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকৃতই হয়। সুতরাং প্রতিবাদী শব্দে নিত্যত্বাপত্তি সমর্থনে যে হেতু গ্রহণ করিয়াছেন, উহা নিত্যত্বের বিরুদ্ধ হওয়ায় নিত্যত্বের বাধকই হয়। যাহা বাধক, তাহা কখনই সাধক হইতে পারে না। ফলকথা, শব্দে সর্ব্বদা অনিত্যত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া, তদ্দ্বারা তাহাতে নিত্যত্বাপত্তি সমর্থন করা যায় না। আর শব্দে অনিত্যত্ব অনিত্য, এই পক্ষ গ্রহণ করিয়াও তাহাতে নিত্যত্বের আপত্তি সমর্থন করা যায় না। কারণ, শব্দের উৎপত্তির পূর্ব্বকালে এবং ধ্বংসকালে শব্দের সত্তাই না থাকায় তখন তাহাতে অনিত্যত্ব নাই অর্থাৎ নিত্যত্বই আছে, ইহা বলা যায় না। ধর্ম্মীর সত্তা ব্যতীত তাহাতে কোন ধর্ম্মের সত্তা সমর্থন করা যায় না। পরন্তু শব্দে কোন কালে নিত্যত্বও আছে এবং কোন কালে অনিত্যত্ব ও আছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। অতএব পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষেই শব্দের নিত্যত্বাপত্তি সমর্থন করা যায় না। ৩৬শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২৪। কার্য্যসমা—(সপ্তত্রিংশ সূত্রে)

বাদীর অভিমত হেতুকে অসিদ্ধ বলিয়া অনভিমত হেতুর আরোপ করিয়া, তাহাতে ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন করিলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "কার্য্যসমা" জাতি। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে বাদীর পক্ষ, হেতু অথবা দৃষ্টান্তের মধ্যে যে কোন পদার্থকে অসিদ্ধ বলিয়া নিজে তাহার কোন সাধকের উল্লেখপূর্ব্বক তাহাতেও দোষ প্রদর্শন করিলে সেই উত্তর "কার্য্যসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি ন্যায়বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে যে "প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব" হেতু বলা হইয়াছে, উহা কি প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি অথবা প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি? প্রযত্নের কার্য্যত অনেক প্রকার দেখা যায়। কোন স্থলে প্রযত্নের অনন্তর তজ্জন্য অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তিই হয় এবং কোন স্থলে প্রযত্নের অনন্তর বিদ্যমান পদার্থের অভিব্যক্তিই হয়। সুতরাং প্রযত্নের অনন্তর শব্দের কি উৎপত্তিই হয় অথবা অভিব্যক্তি হয়? কিন্তু প্রযত্নের অনন্তর শব্দের যে, উৎপত্তিই হয়, ইহা অসিদ্ধ। কারণ, বাদী কোন হেতুর দ্বারা উহা সাধন করেন নাই। সুতরাং প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তিই তাঁহার অভিমত হেতু বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলে বাদীর ঐ হেতু অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা অনিত্যত্বের সাধক হয় না। কারণ, ভূগর্ভে জলাদি বহু পদার্থ বিদ্যমান আছে, এবং নানা স্থানে আরও অনেক নিত্য পদার্থও আছে, সেই সমস্ত পদার্থের প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি হয় না, কিন্তু অভিব্যক্তিই প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং চিরবিদ্যমান বা নিত্য পদার্থেরও প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি হওয়ার বিষয়তা সম্বন্ধে ঐ হেতু তাহাতেও আছে, কিন্তু তাহাতে বাদীর অভিমত সাধ্যধর্ম্ম অনিত্যত্ব না থাকায় ঐ হেতু তাহার ঐ সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচারী। ফলকথা, বক্তার প্রযত্নজন্য বিদ্যমান বর্ণাত্মক শব্দের শ্রবণরূপ অভিব্যক্তিই হয়, অবিদ্যমান ঐ শব্দের উৎপত্তি হয় না, ইহাই স্বীকার্য্য হইলে আর উহাতে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "কার্য্যসমা" জাতি। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, যে পদার্থের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক কোন আবরণাদি থাকে, প্রযত্নজন্য সেই আবরণাদির অপসারণ হইলে সেই পদার্থের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু শব্দের যে কোন আবরণাদি আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় শব্দের অভিব্যক্তিতে প্রযত্ন হেতু বলা যায় না। সুতরাং শব্দের উৎপত্তিতেই প্রযত্ন হেতু, ইহাই বলিতে হইবে। অর্থাৎ বক্তার প্রযত্নজন্য বর্ণাত্মক শব্দের উৎপত্তিই হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। উক্ত যুক্তি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তিই বাদীর অভিমত সিদ্ধ হেতু। সুতরাং বাদীর অভিমত ঐ হেতু অসিদ্ধও নহে, ব্যভিচারীও নহে। প্রতিবাদী ইহা স্বীকার না করিলে প্রমাণ দ্বারা উহা খণ্ডন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বাদীর অনভিমত হেতুকে হেতু বলিয়া, তাহাতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাদীর অভিমত পূর্ব্বোক্ত হেতু দুষ্ট হইতে পারে না। ৩৮শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত প্রথম সূত্রের দ্বারা "সাধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার প্রতিষেধের

(জাতির) উদ্দেশ করিয়া, পরে দ্বিতীয় সূত্র হইতে ৩৮শ সূত্র পর্য্যন্ত যথাক্রমে ঐ সমস্ত জাতির লক্ষণ বলিয়া, ঐ সমস্ত জাতি যে অসদুত্তর, ইহাও সর্ব্বত্র পৃথক্ সূত্রের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। উহাই জাতির পরীক্ষা। মহর্ষির উদ্দেশ্য এই যে, যে কারণেই হউক, জিগীষু প্রতিবাদিগণ পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকারে অসদুত্তর করিলে, বাদী সদুত্তর দ্বারাই তাহার খণ্ডন করিবেন। সুতরাং সর্ব্বত্র জাত্যুত্তর স্থলে বাদীর বক্তব্য সদুত্তর মহর্ষি পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সূচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার জাত্যুত্তর করিলে বাদী যদি সদুত্তর দ্বারা উহার খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া, প্রতিবাদীর ন্যায় জাত্যুত্তরই করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহারা উভয়েই নিগৃহীত হইবেন। তাঁহাদিগের সেই ব্যর্থ বিচার-বাক্যের নাম "কথাভাস"। মহর্ষি জাতি নিরূপণের পরে ৩৯শ সূত্র হইতে পাঁচ সূত্রের দ্বারা সেই "কথাভাস" প্রদর্শন করিয়া, এই প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা বুঝা যাইবে।

এখন এখানে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার জাতির সাতটী অঙ্গ বুঝিতে হইবে ও মনে রাখিতে হইবে। যথা—(১) লক্ষ্য, (২) লক্ষণ, (৩) উত্থান, (৪) পাতন, (৫) অবসর, (৬) ফল, (৭) মূল। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতিই লক্ষ্য। মহর্ষি ঐ সমস্ত লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া যথাক্রমে উহাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত সপ্তাঙ্গের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গ মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্গ "উত্থান"। যেরূপ জ্ঞানবশতঃ ঐ সমস্ত জাতির উত্থিতি হয়, তাহাই উত্থান অর্থাৎ জাতির উত্থিতি-বীজ। চতুর্থ অঙ্গ "পাতন"। পাতন বলিতে কোন প্রকার হেত্বাভাসে নিপাতন। অর্থাৎ প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিয়া বাদীর কথিত হেতুকে যে, কোন প্রকার হেত্বাভাস বা দুষ্ট হেতু বলিয়া প্রতিপাদন করেন, তাহাই "পাতন"। পঞ্চম অঙ্গ "অবসর"। "অবসর" বলিতে প্রতিবাদীর জাতি প্রয়োগের অবসর। যে সময়ে যে কারণে প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিতে বাধ্য হন, তাহাই উহার অবসর। যে সময়ে প্রতিবাদী সভাক্ষোভাদিবশতঃ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বক্তব্য বিষয়ে অবধান করিতে পারেন না, তখন সেই অনবধানতারূপ প্রমাদবশতঃ এবং কোন স্থলে সদুত্তরের প্রতিভা অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় প্রতিবাদী পরাজয় ভয়ে একেবারে নীরব না থাকিয়া জাত্যুত্তর করিতে বাধ্য হন। সুতরাং প্রমাদ ও প্রতিভাহানি সর্ব্বপ্রকার জাতির পঞ্চম অঙ্গ "অবসর" বলিয়া কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অঙ্গ "ফল"। অর্থাৎ প্রতিবাদীর জাতি প্রয়োগের ফল। জাত্যুত্তর করিয়া বাদী অথবা মধ্যস্থগণের যেরূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করা প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য থাকে, সেই ভ্রান্তিই তাঁহার জাতি প্রয়োগের ফল। সপ্তম অঙ্গ "মূল"। মূল বলিতে এখানে প্রতিবাদীর জাত্যুত্তরের দুষ্টত্বের মূল। অর্থাৎ যদ্দ্বারা প্রতিবাদীর হেতু বা জাত্যুত্তরের দুষ্টত্ব নির্ণয় হয়। ঐ মূল দ্বিবিধ, সাধারণ ও অসাধারণ। তন্মধ্যে স্বব্যাঘাতকত্বই সর্ব্বপ্রকার জাতির সাধারণ দুষ্টত্ব মূল। কারণ, প্রতিবাদী কোন প্রকার জাত্যুত্তর করিলে তুল্যভাবে তাঁহারই কথানুসারে তাঁহার ঐ উত্তরও ব্যাহত হইয়া যায়। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার জাতিই স্বব্যাঘাতক বলিয়া অসদুত্তর। স্বব্যাঘাতকত্ববশতঃ সর্ব্বপ্রকার জাতিরই দুষ্টত্ব স্বীকার্য্য হওয়ায় স্বব্যাঘাতকত্বই উহার সাধারণ

মূল। অসাধারণ দুষ্টত্ব মূল ত্রিবিধ—(১) যুক্তাঙ্গহীনত্ব, (২) অযুক্ত অঙ্গের স্বীকার, এবং (৩) অবিষয়বৃত্তিত্ব। ব্যাপ্তি প্রভৃতি যাহা হেতুর যুক্ত অঙ্গ, তাহা জাতিবাদীর অভিমত হেতুতে না থাকিলে অথবা জাতিবাদী কোন অযুক্ত অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত জাত্যুত্তর করিলে অথবা তাঁহার ঐ উত্তর প্রকৃত বিষয়ে সম্বদ্ধ না হইয়া, অন্য বিষয়ে বর্ত্তমান হইলে তদ্দ্বারাও তাহার জাত্যুত্তরের দুষ্টত্ব নির্ণয় হয়। তবে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার জাতিতে তুল্যভাবে উহা সম্ভব না হওয়ায় উক্ত যুক্তাঙ্গহীনত্ব প্রভৃতি অসাধারণ দুষ্টত্ব মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহর্ষি যে জাতির অসদুত্তরত্ব বুঝাইতে যে সূত্র বলিয়াছেন, সেই সূত্র দ্বারা সেই জাতির দুষ্টত্বের মূল (সপ্তম অঙ্গ) সূচনা করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা ব্যক্ত হইবে। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ জাতির পূর্ব্বোক্ত সপ্তাঙ্গ ব্যক্ত করিয়া বলেন নাই। পরবর্ত্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য অতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত সপ্তাঙ্গের এবং মহর্ষি-কথিত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতির আরও অনেক প্রকার ভেদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্র ও ভাষ্যাদিতে ঐ সমস্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত না হওয়ায় ঐ সমস্ত অতি গূঢ়, তাই তিনি বিশদরূপে উহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, ইহাও শেষে "লক্ষ্যং লক্ষণমুত্থিতিঃ স্থিতিপদং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বলিয়াছেন। উদয়নের ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক বরদরাজ জাতির পূর্ব্বোক্ত সপ্তাঙ্গের বর্ণন করিয়াছেন[১]। কিন্তু তিনিও বাহুল্য ভয়ে সমস্ত অঙ্গের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, "উত্থান", "পাতন", "ফল" ও "মূল", এই চারিটী অঙ্গ "প্রবোধসিদ্ধি" নামক "পরিশিষ্টে" বিস্তৃত আছে; অতএব ঐ গ্রন্থে পরিশ্রমশালী হইবে। অর্থাৎ উদয়নাচার্য্যের ঐ গ্রন্থে বিশেষ পরিশ্রম করিলেই উক্ত বিষয়ে সমস্ত তত্ত্ব জানা যাইবে। ফলকথা, সর্ব্বত্রই সমস্ত জাতির সাতটী অঙ্গ বুঝা আবশ্যক। পরে আমরা যথাস্থানে ইহা প্রকাশ করিব। কিন্তু বাহুল্যভয়ে সর্ব্বত্রই সমস্ত অঙ্গ প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। আমরাও এই পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বরদরাজের ন্যায় এখানে বলিতেছি,—"বয়ং বিস্তরভীরবঃ"॥ ১॥

১। লক্ষ্যং লক্ষণমুত্থানং পাতনাবসরৌ ফলং। মূলমিত্যঙ্গমেতাসাং তত্রোক্তে লক্ষ্যলক্ষণে॥
প্রমাদঃ প্রতিভাহানিরাসামবসরঃ স্মৃতঃ। সুলভং পরিশিষ্টেঽন্যদ্বয়ং বিস্তরভীরবঃ॥

"অঙ্গ"মুত্থানবীজং, কুত্র চিহ্নেত্বাভাসে নিপাতনং, প্রয়োগফলং দোষমূলঞ্চেতি চতুষ্টয়ং "প্রবোধসিদ্ধি"নামনি "পরিশিষ্টে" বিস্তৃতমিতি তৎপরিশ্রমশালিভির্ভবিতব্যং। তত্র হ্যেবমুক্তং—

"লক্ষ্যং লক্ষণমুত্থিতিঃ স্থিতিপদং মূলং ফলং পাতনং
জাতীনাং সবিশেষমেতদখিলং প্রব্যক্তমুক্তং রহঃ" ইতি।
বয়ন্তু সংগ্রহাধিকারিণো বিস্তরাদ্ভীত্যা ন ব্যাকৃতবন্ত ইতি॥ ৩১॥—তার্কিকরক্ষা।

(১) "লক্ষ্যং" সামান্যবিশেষজাতিস্বরূপং। (২) "লক্ষণং" তদসাধারণো ধর্ম্মঃ। (৩) "উত্থিতি"স্তত্তজ্জাতীনামুত্থানহেতুঃ। (৪) "স্থিতিপদং" জাতিপ্রয়োগাবসরঃ। (৫) "মূলং" সাধারণাসাধারণদুষ্টত্বমূলং। (৬) "ফলং" জাতিপ্রয়োজনং বাদিনস্তদা ভ্রান্তিরিতি যাবৎ। (৭) "পাতনং" জাত্যুত্তরেণ বাদিসাধনে আপাদ্যমসিদ্ধত্বাদি দূষণং। "সবিশেষং" জাত্যবান্তরভেদসহিতং "রহঃ" সূত্রভাষ্যাদিষু সাকল্যেনানভিব্যক্তত্বাদতিগূঢ়ং।—জ্ঞানপূর্ণকৃত "লঘুদীপিকা" টীকা।

ভাষ্য। লক্ষণন্তু—

অনুবাদ। লক্ষণ কিন্তু—

সূত্র। সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যামুপসংহারে তদ্ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়োপপত্তেঃ সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-সমৌ ॥ ২ ॥ ৪৬৩ ॥*

অনুবাদ। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা "উপসংহার" করিলে অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মীর সংস্থাপন করিলে, সেই সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্মের অর্থাৎ বাদীর সাধনীয় ধর্ম্মের অভাবের উপপত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ বাদীর সাধ্যধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের অভাব সমর্থনোদ্দেশ্যে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা প্রত্যবস্থান। (১) "সাধর্ম্ম্যসম" ও (২) "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ।

বিবৃতি। সমান ধর্ম্মের নাম "সাধর্ম্ম্য" এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্মের নাম "বৈধর্ম্ম্য"। বাদীর গৃহীত হেতু তাঁহার পক্ষ ও দৃষ্টান্ত, এই উভয়েই থাকিলে উহাকে ঐ পক্ষ ও দৃষ্টান্তের সমানধর্ম্ম বা "সাধর্ম্ম্য" বলা যায় এবং উহার বিপরীত ধর্ম্ম হইলে তাহাকে "বৈধর্ম্ম্য" বলা যায়। সূত্রে "উপসংহার" শব্দের অর্থ সংস্থাপন বা সমর্থন। বাদী যে পদার্থকে কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া সংস্থাপন করেন, সেই পদার্থকে বলে সাধ্যধর্ম্মী। এবং সেই ধর্ম্মকে বলে সাধ্যধর্ম্ম। যেমন "শব্দোঽনিত্যঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে সেখানে অনিত্যত্বরূপে শব্দই সাধ্যধর্ম্মী এবং শব্দে অনিত্যত্ব ধর্ম্মই সাধ্যধর্ম্ম। সূত্রে "তদ্ধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা বাদীর সেই সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্ম বা সংস্থাপনীয় ধর্ম্মই বিবক্ষিত। "বিপর্য্যয়" শব্দের অর্থ অভাব। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ এখানে উপপাদন। ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ "তাদর্থ্য" বা নিমিত্ততা। সূত্রের প্রথমোক্ত "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং" এই পদের পুনরাবৃত্তি এবং প্রথম অধ্যায়ের শেষোক্ত জাতির সামান্য-লক্ষণসূত্র হইতে "প্রত্যবস্থানং" এই

* "ত"দিতি সাধ্যপরামর্শঃ। উপসংহারকর্ম্মতয়া প্রকৃতত্বাৎ। "উপপত্তে"রিতি তাদর্থ্যে ষষ্ঠী। "সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যা"মিত্যাবর্ত্তনীয়ং। সামান্যলক্ষণসূত্রাৎ প্রত্যবস্থানপদমনুবর্ত্তনীয়ং। লক্ষ্যলক্ষণপদানাং যথাসংখ্যেন সম্বন্ধঃ।—তার্কিকরক্ষা। কথমপ্রস্তুতস্য "তদ্"শব্দেন পরামর্শ ইত্যত্রাহ—"উপসংহারকর্ম্মতয়ে"তি। উপসংহারঃ সমর্থনং, তৎকর্ম্মতয়া সমর্থনীয়ত্বেন। "সামান্যলক্ষণসূত্রাৎ" "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতি"রিত্যস্মাৎ। "তার্কিকরক্ষার" উক্ত সন্দর্ভের জ্ঞানপূর্ণকৃত টীকা। "উপসংহারে" সাধ্যস্যোপসংহরণে বাদিনা কৃতে তদ্ধর্ম্মস্য সাধ্যরূপধর্ম্মস্য যো বিপর্য্যয়ো ব্যতিরেকস্তস্য সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং কেবলাভ্যাং ব্যাপ্ত্যনপেক্ষাভ্যাং যদুপপাদনং, ততো হেতোঃ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যসমাবুচ্যেতে। তদয়মর্থঃ—বাদিনা অন্বয়েন ব্যতিরেকেণ বা সাধ্যে সাধিতে প্রতিবাদিনঃ সাধর্ম্ম্য-মাত্রপ্রবৃত্তহেতুনা তদভাবাপাদনং সাধর্ম্ম্যসমঃ। বৈধর্ম্ম্যমাত্রপ্রবৃত্তহেতুনা তদভাবাপাদনং বৈধর্ম্ম্যসমঃ"।—বিশ্বনাথবৃত্তি।

পদের অনুবৃত্তি এই সূত্রে মহর্ষির অভিমত। তাহা হইলে "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যামুপসংহারে তদ্ধর্ম্মবিপর্য্যয়োপপত্তেঃ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যসমৌ" এইরূপ সূত্রবাক্যের দ্বারা সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, কোন বাদী কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্ম্মীর সংস্থাপন করিলে ঐ ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যধর্ম্মের অভাব সমর্থন করিবার জন্য ঐরূপ কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারা প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধ, তাহাকে বলে "সাধর্ম্ম্যসম"। এইরূপ বাদী কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারা সাধ্যধর্ম্মীর সংস্থাপন করিলেও পূর্ব্বোক্তরূপে কোন সাধর্ম্ম্যের দ্বারা প্রতিবাদীর যে "প্রত্যবস্থান," তাহাও "সাধর্ম্ম্যসম।" এবং বাদী কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্য দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্ম্মীর সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারাই বাদীর সেই সাধ্যধর্ম্মের অভাবের উপপাদনার্থ প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে ঐ প্রতিষেধকে বলে "বৈধর্ম্ম্যসম"।

ভাষ্য। সাধর্ম্ম্যেণোপসংহারে সাধ্যধর্ম্মবিপর্য্যয়োপপত্তেঃ সাধর্ম্ম্যেণৈব প্রত্যবস্থানমবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতুতঃ সাধর্ম্ম্যসমঃ প্রতিষেধঃ।

নিদর্শনং—'ক্রিয়াবানাত্মা,—দ্রব্যস্য ক্রিয়াহেতুগুণযোগাৎ। দ্রব্যং লোষ্টঃ ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তঃ ক্রিয়াবান্,—তথা চাত্মা, তস্মাৎ ক্রিয়াবা'-নিতি। এবমুপসংহৃতে পরঃ সাধর্ম্ম্যেণৈব প্রত্যবতিষ্ঠতে,—'নিষ্ক্রিয় আত্মা, বিভুনো দ্রব্যস্য নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ, বিভু চাকাশং নিষ্ক্রিয়ঞ্চ, তথা চাত্মা, তস্মান্নিষ্ক্রিয় ইতি। ন চাস্তি বিশেষহেতুঃ, ক্রিয়াবৎসাধর্ম্ম্যাৎ ক্রিয়াবতা ভবিতব্যং, ন পুনরক্রিয়সাধর্ম্ম্যান্নিষ্ক্রিয়েণেতি। বিশেষহেত্বভাবাৎ সাধর্ম্ম্যসমঃ প্রতিষেধো ভবতি।

অনুবাদ। সাধর্ম্ম্য দ্বারা উপসংহার করিলে অর্থাৎ কোন বাদী সাধর্ম্ম্য হেতু ও সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার সাধ্যের সংস্থাপন করিলে সাধ্যধর্ম্মের অভাবের উপপাদনের নিমিত্ত অর্থাৎ বাদীর গৃহীত সেই পক্ষ বা ধর্ম্মীতে তাঁহার সংস্থাপনীয় ধর্ম্মের অভাব সমর্থনোদ্দেশ্যে (প্রতিবাদিকর্ত্তৃক) স্থাপনার হেতু হইতে অবিশিষ্যমাণ অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনে প্রযুক্ত সাধর্ম্ম্য হেতু হইতে বিশেষশূন্য সাধর্ম্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান, "সাধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ।

উদাহরণ, যথা—(বাদী) আত্মা সক্রিয়। যেহেতু দ্রব্য পদার্থ আত্মার ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা আছে। দ্রব্য লোষ্ট, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট, সক্রিয়, আত্মাও তদ্রূপ,[১] অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থ ও ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট, অতএব আত্মা সক্রিয়।

১। অস্তি খল্বাত্মনঃ ক্রিয়াহেতুর্গুণঃ প্রযত্নোঽদৃষ্টং বা, লোষ্টস্যাপি ক্রিয়াহেতুর্গুণঃ স্পর্শবদ্বেগবদ্দ্রব্যসংযোগ ইতি। —তাৎপর্য্যটীকা।

এইরূপে উপসংহৃত হইলে অর্থাৎ বাদিকর্ত্তৃক আত্মাতে সক্রিয়ত্ব সংস্থাপিত হইলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী সাধর্ম্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন (যথা)—আত্মা নিষ্ক্রিয়। যেহেতু বিভু দ্রব্যের নিষ্ক্রিয়ত্ব আছে। যেমন আকাশ বিভু ও নিষ্ক্রিয়। আত্মাও তদ্রূপ, অর্থাৎ বিভু দ্রব্য, অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয়। সক্রিয় দ্রব্যের (লোষ্টের) সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় দ্রব্যের (আকাশের) সাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ "সাধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি জাতির মধ্যে প্রথমটীর নাম "সাধর্ম্ম্যসমা" এবং দ্বিতীয়টীর নাম "বৈধর্ম্ম্যসমা"। জাতি বিশেষ্য হইলে "সাধর্ম্ম্যসমা" ও "বৈধর্ম্ম্যসমা" এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ নামের প্রয়োগ হয় এবং "প্রতিষেধ" বিশেষ্য হইলে "সাধর্ম্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" এইরূপ পুংলিঙ্গ নামের প্রয়োগ হয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মহর্ষি এই সূত্রে "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যসমে" এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিবচনান্ত প্রয়োগ না করিয়া, "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যসমৌ" এইরূপ পুংলিঙ্গ দ্বিবচনান্ত প্রয়োগ করায় প্রতিষেধই তাঁহার বুদ্ধিস্থ বিশেষ্য, ইহা বুঝা যায়। তাই বার্ত্তিককার সূত্রের শেষে "প্রতিষেধৌ" এই পদের পূরণ করিয়া "সাধর্ম্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" নামক দুইটি প্রতিষেধই মহর্ষির এই সূত্রোক্ত লক্ষণের লক্ষ্য, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি জাতি "প্রতিষেধ"নামেও কথিত হইয়াছে। মহর্ষির এই সূত্রে এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য সূত্রে পুংলিঙ্গ "সম" শব্দের প্রয়োগ দ্বারাও তাহা বুঝা যায়। বাদী তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী উহার প্রতিষেধ বা খণ্ডনের জন্য যে উত্তর করেন, সেই প্রতিষেধক বাক্যরূপ উত্তরকেই এখানে ঐ অর্থে প্রতিবাদীর "প্রতিষেধ" বলা হইয়াছে। উহাকে "প্রত্যবস্থান" এবং "উপালম্ভ"ও বলা হইয়াছে। বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারাই ঐ "প্রত্যবস্থান" বা প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ প্রতিষেধের নাম "সাধর্ম্ম্যসম"। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত প্রথম সূত্র-ভাষ্যেই "সাধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধের এই সামান্য স্বরূপ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদী কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি ঐরূপ কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা প্রথম প্রকার "সাধর্ম্ম্যসম"। এবং বাদী কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা হইবে দ্বিতীয় প্রকার "সাধর্ম্ম্যসম"। এবং বাদী কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা প্রথম প্রকার "বৈধর্ম্ম্যসম" হইবে। এবং বাদী কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি ঐরূপ কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা হইবে দ্বিতীয় প্রকার "বৈধর্ম্ম্যসম"। মহর্ষি এই সূত্রের প্রথমে "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যামুপ-সংহারে" এই বাক্যের প্রয়োগ করিয়া, ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বিবিধ "সাধর্ম্ম্যসম" ও দ্বিবিধ

"বৈধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধদ্বয়ের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। প্রতিবাদী কেন ঐরূপ প্রত্যবস্থান করেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি? তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—"তদ্ধর্ম্মবিপর্য্যয়োপপত্তেঃ"। বাদীর সাধ্য ধর্ম্মই এখানে "তদ্ধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। তাই ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সাধ্যধর্ম্মবিপর্য্যয়োপপত্তেঃ"। বাদীর সাধনীয় অর্থাৎ সংস্থাপনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী এবং তাহাতে সংস্থাপনীয় ধর্ম্ম, এই উভয়ই "সাধ্য" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে এবং "ধর্ম্ম" শব্দের পৃথক্ উল্লেখ থাকিলে "সাধ্য" শব্দের দ্বারা ধর্ম্মিরূপ সাধ্যই বুঝা যায়, ইহা ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৬৪—৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে মহর্ষির ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্ম্মীতে তাঁহার সাধনীয় বা সংস্থাপনীয় ধর্ম্মের অভাব সমর্থনোদ্দেশ্যেই ঐরূপ প্রত্যবস্থান করেন। বাদীর হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষদোষের উদ্ভাবনই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকার "সাধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে "নিদর্শনং" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। "নিদর্শন" শব্দের অর্থ উদাহরণ।

ভাষ্যকার ঐ উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য প্রথমে কোন বাদীর প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—কোন বাদী আত্মাতে সক্রিয়ত্ব ধর্ম্মের উপসংহার অর্থাৎ সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—(প্রতিজ্ঞা) আত্মা সক্রিয়। (হেতু) যেহেতু দ্রব্য পদার্থ আত্মার ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা আছে। (উদাহরণ) দ্রব্য পদার্থ লোষ্ট, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট—সক্রিয়। (উপনয়) আত্মাও তদ্রূপ, অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য পদার্থ। (নিগমন) অতএব আত্মা সক্রিয়। বাদীর কথা এই যে, যে সমস্ত দ্রব্য পদার্থে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে, সেই সমস্তই সক্রিয়। যেমন কোন স্থানে লোষ্ট নিঃক্ষেপ করিলে স্পর্শ ও বেগবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত সংযোগজন্য ঐ লোষ্টে ক্রিয়া জন্মে। সুতরাং ঐ সংযোগবিশেষ ঐ লোষ্টে ক্রিয়ার কারণ গুণ। এইরূপ আত্মাতে যে প্রযত্ন ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট আছে, উহাও ক্রিয়ার কারণ গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে[১]। সুতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা লোষ্টের ন্যায় আত্মাতেও বিদ্যমান থাকায় উহা লোষ্ট ও আত্মার সাধর্ম্ম্য বা সমান ধর্ম্ম। সুতরাং উহার দ্বারা লোষ্ট দৃষ্টান্তে আত্মাতে সক্রিয়ত্ব অনুমান করা যায়। ঐ অনুমানে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা, সাধর্ম্ম্য হেতু। লোষ্ট, সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত বা অন্বয় দৃষ্টান্ত। কারণ, উক্ত স্থলে যে যে দ্রব্য ক্রিয়ার কারণ-গুণবিশিষ্ট, সেই সমস্ত দ্রব্যই সক্রিয়, যেমন লোষ্ট, এইরূপে উক্ত হেতুতে সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া, বাদী ঐরূপ অনুমান করেন। ঐ ব্যাপ্তিকে অন্বয়ব্যাপ্তি বলে। বাদী উক্তরূপ সাধর্ম্ম্য দ্বারা অর্থাৎ লোষ্ট ও আত্মার সমান ধর্ম্ম ক্রিয়ার কারণগুণবত্তারূপ হেতুর দ্বারা আত্মাতে সক্রিয়ত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের উপসংহার (সংস্থাপন) করিলে, প্রতিবাদী তখন আত্মাতে ঐ সক্রিয়ত্ব

১। বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ে মহর্ষি কণাদ দ্রব্যের ক্রিয়ার কারণ গুণসমূহের বর্ণন করিয়াছেন। তদনুসারে প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,—"গুরুত্ব-দ্রবত্ব-বেগ-প্রযত্ন-ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংযোগবিশেষাঃ ক্রিয়াহেতবঃ"।—প্রশস্তপাদভাষ্য, কাশী সংস্করণ, ১০১ পৃষ্ঠা।

ধর্ম্মের বিপর্য্যয় (নিষ্ক্রিয়ত্ব) সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—(প্রতিজ্ঞা) আত্মা নিষ্ক্রিয়। (হেতু) কারণ, বিভুদ্রব্যের নিষ্ক্রিয়ত্ব আছে অর্থাৎ আত্মাতে বিভুত্ব আছে। (উদাহরণ) যেমন আকাশ বিভু ও নিষ্ক্রিয়। (উপনয়) আত্মাও তদ্রূপ অর্থাৎ বিভুদ্রব্য। (নিগমন) অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয়।

প্রতিবাদীর কথা এই যে, আত্মাতে যেমন সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্ম্য আছে, তদ্রূপ নিষ্ক্রিয় আকাশের সাধর্ম্ম্যও আছে। কারণ, আত্মাও আকাশের ন্যায় বিভু। সুতরাং বিভুত্ব ঐ উভয়ের সাধর্ম্ম্য। কিন্তু বিভু মাত্রই নিষ্ক্রিয়। সুতরাং "আত্মা নিষ্ক্রিয়ো বিভুত্বাৎ, আকাশবৎ" এইরূপে অনুমান দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইলে উহাতে সক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয়ই হইবে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় আকাশের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। একতর পক্ষের নিশ্চায়ক হেতুই এখানে "বিশেষ হেতু" শব্দের অর্থ। যদিও জাতি প্রয়োগ স্থলে এক পক্ষে বিশেষ হেতু থাকে, কিন্তু জাতিবাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই বিশেষ হেতু নাই বলিয়া উভয় পক্ষে সাম্য প্রদর্শন করেন। উহা বাস্তব সাম্য নহে, কিন্তু উহাকে বলে, প্রতিবাদীর আভিমানিক সাম্য। অর্থাৎ প্রতিবাদী ঐরূপ সাম্যের অভিমান করিয়া উহা প্রদর্শনের জন্যই ঐরূপ উত্তর করেন। প্রতিবাদী যে উভয় পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাব বলেন, উহাই ভাষ্যকারের মতে জাতি প্রয়োগ স্থলে উভয় পক্ষে প্রতিবাদীর আভিমানিক সাম্য এবং উহাই "সাধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি নামে "সম" শব্দের অর্থ। তাই ভাষ্যকার পরে এখানে উহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"বিশেষহেত্বভাবাৎ সাধর্ম্ম্যসমঃ প্রতিষেধো ভবতি"। এবং পূর্ব্বে "সাধর্ম্ম্য-সম" নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিতে "অবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতুতঃ" এই বাক্যের দ্বারা ঐরূপ সাম্যই প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহা কথিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে বাদী আত্মা ও লোষ্টের সাধর্ম্ম্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা) দ্বারা আত্মাতে সক্রিয়ত্ব ধর্ম্মের উপসংহার করায়, এবং প্রতিবাদীও আত্মা ও আকাশের সাধর্ম্ম্য (বিভুত্ব) দ্বারাই ঐরূপ প্রত্যবস্থান করায়, প্রতিবাদীর ঐ উত্তর ভাষ্যকারের মতে পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকার "সাধর্ম্ম্যসম"। কিন্তু প্রতিবাদী যে বিভুত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের অনুমান করিয়াছেন, ঐ বিভুত্ব ধর্ম্ম নিষ্ক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য। কারণ, বিভু দ্রব্যমাত্রই নিষ্ক্রিয়, ইহা বাদীরও স্বীকার্য্য। সুতরাং প্রতিবাদীর ঐ হেতু দুষ্ট না হওয়ায় তাঁহার ঐ উত্তর সদুত্তরই হইবে, উহা অসদুত্তর না হওয়ায় ভাষ্যকার উহাকে "সাধর্ম্ম্যসম" নামক জাত্যুত্তর কিরূপে বলিয়াছেন ? ইহা বিচার্য্য। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত কারণে ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণ উপেক্ষা করিয়া[১] অন্য উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে নিত্য আকাশের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য হউক ? কারণ, আকাশের ন্যায় শব্দও অমূর্ত্ত পদার্থ। সুতরাং অমূর্ত্তত্ব অর্থাৎ অপরি-

১। অত্র চ সাধনমাভাসমুত্তরঞ্চ ন জাতিঃ, বিভুত্বস্যাক্রিয়ত্বেন স্বভাবতঃ প্রতিবন্ধাৎ তেনৈতদুপেক্ষ্য বার্ত্তিককার উদাহরণান্তরমাহ :—তাৎপর্য্যটীকা।

চ্ছিন্নত্ব আকাশ ও শব্দের সাধর্ম্ম্য। তাহা হইলে "শব্দো নিত্যঃ অমূর্ত্তত্বাৎ আকাশবৎ" এইরূপে অনুমান করিয়া, ঐ অমূর্ত্তত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে নিত্যত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না? প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে প্রথম প্রকার "সাধর্ম্ম্যসম"। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অমূর্ত্তত্ব হেতু নিত্যত্বের ব্যাপ্য নহে। কারণ, অনিত্য গুণ ও ক্রিয়াতেও অমূর্ত্তত্ব আছে। সুতরাং প্রতিবাদীর ঐ হেতু ব্যভিচারী বলিয়া দুষ্ট হওয়ায় তাঁহার ঐ উত্তর অসদুত্তর। সুতরাং উহা "জাতি" হইতে পারে, ইহাই উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য। জয়ন্ত ভট্ট, বরদরাজ, শঙ্কর মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এখানে উক্তরূপ উদাহরণই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু নাস্তিকবাদী দুষ্ট হেতুর প্রয়োগ করিলে তাঁহাকে শীঘ্র নিরস্ত করিয়া বিতাড়িত করিবার জন্য স্থলবিশেষে যে নির্দ্দোষ হেতুর দ্বারাও "জাতি" প্রয়োগ কর্ত্তব্য, ইহা জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন এবং এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণের দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন[১]। "তর্কসংগ্রহদীপিকা"র টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্টও পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণই গ্রহণ করিয়াছেন।

পরন্তু বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণকে পূর্ব্বোক্ত কারণে উপেক্ষা করিলেও পরবর্ত্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে স্থলবিশেষে সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সৎ হেতুর দ্বারা প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থানকেও এক প্রকার "সাধর্ম্ম্যসম" জাতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে মহামনীষী মৈথিল শঙ্কর মিশ্র "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতিকে "সদ্‌বিষয়া", "অসদ্‌বিষয়া" এবং "অসদুক্তিকা" এই তিন প্রকার বলিয়া উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন[২]। তন্মধ্যে এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণস্থলে অসদুক্তিকা "সাধর্ম্ম্যসমা" বলা যায়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে যদিও প্রতিবাদীর গৃহীত বিভুত্ব হেতু তাঁহার সাধ্য ধর্ম্ম নিষ্ক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য, সুতরাং উহা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব সাধনে সৎহেতু, ঐ হেতুতে কোন দোষ নাই। কিন্তু ঐ স্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ উক্তিতে দোষ আছে, উহা ঐ স্থলে তাঁহার সদুক্তি নহে, এ জন্য তাঁহার ঐরূপ উত্তরও সদুত্তর বলা যায় না; উহাও জাত্যুত্তর। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী ঐ স্থলে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তাকে হেতু করিয়া, তদ্দ্বারা লোষ্ট দৃষ্টান্তে আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আত্মাতে ক্রিয়ার কারণ যে গুণ (প্রযত্ন ও অদৃষ্ট) আছে, তাহা অন্যত্র ক্রিয়া উৎপন্ন করে। আত্মাতে বিভুত্ববশতঃ ক্রিয়া জন্মিতে

১। মুমুক্ষুং প্রতি চ শাস্ত্রারম্ভাদাক্রমোন তদপেক্ষয়া সাধনাভাসবিষয় এব জাতিপ্রয়োগঃ। অতএব চ ভাষ্যকৃতা প্রথমং সাধনাভাস এব জাত্যুদাহরণং দর্শিতম্।—ন্যায়মঞ্জরী, ৬২১ পৃষ্ঠা।

২। তত্র প্রথমং সাধর্ম্ম্যসমা যথা, সা চৈবং প্রবর্ত্ততে। "শব্দোঽনিত্যঃ কৃতকত্বাদ্‌ঘটব"দিতি স্থাপনায়াং যদি ঘট-সাধর্ম্ম্যাৎ কৃতকত্বাদয়মনিত্যো হন্ত আকাশসাধর্ম্ম্যাৎ প্রমেয়ত্বান্নিত্য এব কিং ন স্যাদিতি। ইয়ঞ্চ সদ্বিষয়া, স্থাপনায়াঃ সম্যক্‌ত্বাৎ। অথাসদ্বিষয়া, "শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববৎ", ইত্যত্র অসমীচীনায়াং স্থাপনায়াং অনিত্যসাধর্ম্ম্যাদনিত্য এব কিং ন স্যাদিতি। "অসদুক্তিকা" তৃতীয়া,—"নিত্যঃ শব্দঃ শ্রাবণত্বা"দিতি প্রযুক্তে শ্রাবণত্বান্নিত্যসাধর্ম্ম্যাদ্‌যদি নিত্যস্তদা কৃতকত্বাদনিত্যসাধর্ম্ম্যাদনিত্য এব কিং ন স্যাদিতি। উক্তিমাত্রমত্র দুষ্টং, নতু সাধনমপি। যদ্যপ্যসদুক্তিকায়ামসদ্‌বিষয়ত্বমেবৌচিত্যং, তথাপ্যুক্তিদোষাদপি জাতিঃ সম্ভবতীতি প্রদর্শনার্থং প্রকারত্রয়াভিধানমকারোৎ।—শঙ্কর মিশ্রকৃত "বাদিবিনোদ"।

পারে না। বিভুত্ব ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধকের অভাবও কার্য্যের অন্যতম কারণ। সুতরাং ঐ কারণের অভাবে আত্মাতে ক্রিয়া জন্মে না। সুতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণ থাকিলেই যে সেই সমস্ত পদার্থ সক্রিয়, ইহা বলা যায় না। ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য নহে, ব্যভিচারী। বাদী ঐ ব্যভিচারী হেতুর দ্বারা আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সাধন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর প্রথমে এই সমস্ত কথাই বলা উচিত। অর্থাৎ বাদীর ঐ হেতুতে ব্যভিচার দোষের সমর্থন করিয়া, উহা যে আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সাধক হয় না, ইহা বলাই প্রথমে তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি উহা না বলিয়া, ঐ স্থলে বিভুত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিয়া প্রত্যবস্থান করায় তাঁহার ঐ উক্তি দুষ্ট, উহা সদুক্তি নহে। সুতরাং তাঁহার ঐ উত্তরও ঐ জন্য জাত্যুত্তরের মধ্যে গণ্য। উক্ত স্থলে উহা অসদুক্তিকা "সাধর্ম্ম্যসমা"। শঙ্কর মিশ্র শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যদিও "অসদুক্তিকা" সাধর্ম্ম্যসমাও অবশ্যই অদদ্বিষয়া হইবে, কারণ, ঐ স্থলে বাদীর স্থাপনা সমীচীন নহে অর্থাৎ বাদীর হেতু নির্দ্দোষ নহে, কিন্তু তথাপি উক্তিদোষ-প্রযুক্তও যে, জাতি সম্ভব হয়, ইহা প্রদর্শনের জন্য উক্তরূপ প্রকারত্রয় কথিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যের অন্যান্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। অথ বৈধর্ম্ম্যসমঃ,—ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তো লোষ্টঃ পরিচ্ছিন্নো দৃষ্টঃ, ন চ তথাত্মা, তস্মান্ন লোষ্টবৎ ক্রিয়াবানিতি। ন চাস্তি বিশেষহেতুঃ, ক্রিয়াবৎসাধর্ম্ম্যাৎ ক্রিয়াবতা ভবিতব্যং, ন পুনঃ ক্রিয়াবদ্‌বৈধর্ম্ম্যাদক্রিয়েণেতি। বিশেষহেত্বভাবাদ্‌বৈধর্ম্ম্যসমঃ।

অনুবাদ। অনন্তর "বৈধর্ম্ম্যসম" (প্রদর্শিত হইতেছে)—ক্রিয়ার কারণ গুণ-বিশিষ্ট লোষ্ট পরিচ্ছিন্ন দেখা যায়, কিন্তু আত্মা তদ্রূপ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন নহে। অতএব আত্মা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় নহে। সক্রিয় পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে, কিন্তু সক্রিয় পদার্থের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ (উক্ত স্থলে) "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথমে "সাধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধের (জাতির) একপ্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে দ্বিতীয় "বৈধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে বৈধর্ম্ম্য দ্বারা প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, বাদী কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহাকে বলে "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ। প্রত্যবস্থানের ঐরূপ ভেদবশতঃই "সাধর্ম্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন বাদী "আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া, আত্মাতে

লোষ্টের সাধর্ম্ম্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা) দ্বারা সক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট যে লোষ্ট, তাহা ত পরিচ্ছিন্ন পদার্থ, কিন্তু আত্মা অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ, সুতরাং আত্মাতে লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য অপরিচ্ছিন্নত্ব থাকায় আত্মা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় হইতে পারে না। পরন্ত লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য ঐ অপরিচ্ছিন্নত্ব হেতুর দ্বারা (আত্মা নিষ্ক্রিয়োঽপরিচ্ছিন্নত্বাৎ এইরূপে) আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। সক্রিয় পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইলে উহার বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় কেন হইবে না? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, যদ্দ্বারা সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে, কিন্তু উহার বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত নিষ্ক্রিয় হইবে না, ইহা নিশ্চয় করা যায়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী এইরূপে সক্রিয় লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য অপরিচ্ছিন্নত্বাত্মক হেতু করিয়া, তদ্দ্বারাই ঐরূপ প্রত্যবস্থান করায় উহা "বৈধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধ। ভাষ্যকারের মতে উক্ত স্থলেও বিশেষ হেতুর অভাবই উভয় প্রয়োগে প্রতিবাদীর আভিমানিক সাম্য। তাই পরে উহাই ব্যক্ত করিতে তিনি বলিয়াছেন,—"বিশেষহেত্বভাবাদ্বৈধর্ম্ম্য-সমঃ"। এখানেও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকারোক্ত এই উদাহরণে প্রতিবাদী অপরিচ্ছিন্নত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে ঐ হেতু দুষ্ট নহে। উহা নিষ্ক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য। কারণ, অপরিচ্ছিন্ন পদার্থমাত্রই নিষ্ক্রিয়। সুতরাং উদ্দ্যোতকরের মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ উত্তর জাতি হইতে পারে না। তাই তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলেই "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ভাষ্যকারোক্ত এই উদাহরণেও অসদুক্তিকা "বৈধর্ম্ম্যসমা" বুঝিতে হইবে। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতিও ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "তর্কসংগ্রহদীপিকা"র টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্টও ভাষ্যকারোক্ত এই উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাষ্য। বৈধর্ম্ম্যেণ চোপসংহারো নিষ্ক্রিয় আত্মা, বিভুত্বাৎ, ক্রিয়াবদ্-দ্রব্যমবিভু দৃষ্টং, যথা লোষ্টঃ, ন চ তথাত্মা, তস্মান্নিষ্ক্রিয় ইতি। বৈধর্ম্ম্যেণ প্রত্যবস্থানং—নিষ্ক্রিয়ং দ্রব্যমাকাশং ক্রিয়াহেতুগুণরহিতং দৃষ্টং, নচ তথাত্মা, তস্মান্ন নিষ্ক্রিয় ইতি। ন চাস্তি বিশেষহেতুঃ ক্রিয়াবদ্বৈধর্ম্ম্যান্নিষ্ক্রিয়েণ ভবিতব্যং ন পুনরক্রিয়বৈধর্ম্ম্যাৎ ক্রিয়াবতেতি। বিশেষহেত্বভাবাদ্-বৈধর্ম্ম্যসমঃ।

অনুবাদ। বৈধর্ম্ম্য দ্বারা উপসংহার অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপন, যথা - আত্মা নিষ্ক্রিয়, যেহেতু বিভুত্ব আছে, সক্রিয় দ্রব্য অবিভু দেখা যায়, যেমন লোষ্ট। কিন্তু আত্মা তদ্রূপ অর্থাৎ অবিভু দ্রব্য নহে, অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয়। বৈধর্ম্ম্য দ্বারা প্রত্যবস্থান যথা—নিষ্ক্রিয় দ্রব্য আকাশ ক্রিয়ার কারণ গুণশূন্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা তদ্রূপ অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণশূন্য নহে, অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয় নহে। সক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত

সক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ (উক্ত স্থলে) "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। বাদী কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা প্রথম প্রকার "বৈধর্ম্ম্যসম"। এবং বাদী কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারা প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা দ্বিতীয় প্রকার "বৈধর্ম্ম্যসম"। ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকার "বৈধর্ম্ম্যসমে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে দ্বিতীয় প্রকার "বৈধর্ম্ম্য-সমে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রথমে বাদীর বৈধর্ম্ম্য দ্বারা উপসংহার প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন কোন বাদী বলিলেন,—(প্রতিজ্ঞা) আত্মা নিষ্ক্রিয়। (হেতু) যেহেতু বিভুত্ব আছে। (উদাহরণ) সক্রিয় দ্রব্য অবিভু দেখা যায়, যেমন লোষ্ট। (উপনয়) কিন্তু আত্মা অবিভু দ্রব্য নহে। (নিগমন) অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয়। এখানে আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব সাধনে বাদী যে বিভুত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা বৈধর্ম্ম্যহেতু। কারণ, যে যে দ্রব্য নিষ্ক্রিয় নহে অর্থাৎ সক্রিয়, সেই সমস্ত দ্রব্য বিভু নহে, যেমন লোষ্ট, এইরূপে বাদী ঐ স্থলে যে লোষ্টকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত। বিভুত্ব হেতু ঐ লোষ্টে না থাকায় উহা লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য। সুতরাং উক্ত স্থলে বিভুত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে বাদীর যে নিষ্ক্রিয়ত্বের উপসংহার, উহা বৈধর্ম্ম্য দ্বারা উপসংহার। তাই বাদী পরে আত্মা অবিভু দ্রব্য নহে, এই কথা বলিয়া উক্ত স্থলে বৈধর্ম্ম্যোপনয় বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈধর্ম্ম্যহেতু প্রভৃতির লক্ষণাদি প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ২৫৪—৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাদীর বৈধর্ম্ম্য দ্বারা প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নিষ্ক্রিয় দ্রব্য যে আকাশ, তাহা ক্রিয়ার কারণ গুণশূন্য, কিন্তু আত্মা তদ্রূপ নহে; অর্থাৎ আত্মা ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট। সুতরাং আত্মা নিষ্ক্রিয় নহে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি আত্মাতে বাদীর সাধ্যধর্ম্ম নিষ্ক্রিয়ত্বের অভাব (সক্রিয়ত্ব) সমর্থন করিবার জন্য বলেন যে, নিষ্ক্রিয় দ্রব্য আকাশে ক্রিয়ার কারণ কোন গুণ নাই। কিন্তু আত্মাতে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে। সুতরাং আত্মা সক্রিয় কেন হইবে না? অর্থাৎ আত্মাতে যে বিভুত্ব আছে, উহা সক্রিয় লোষ্টে না থাকায় উহা যেমন ঐ লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য, তদ্রূপ আত্মাতে যে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা আছে, উহা নিষ্ক্রিয় আকাশে না থাকায় উহা আকাশের বৈধর্ম্ম্য। তাহা হইলে আত্মাতে যেমন সক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য আছে, তদ্রূপ নিষ্ক্রিয় দ্রব্যেরও বৈধর্ম্ম্য আছে। তাহা হইলে যদি সক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় কেন হইবে না? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, যদ্দ্বারা আত্মা সক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত নিষ্ক্রিয়ই হইবে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সক্রিয় হইবে না, ইহা নিশ্চয় করা যায়। প্রতিবাদীর এইরূপ প্রত্যবস্থান বা উত্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীয় প্রকার "বৈধর্ম্ম্যসম"। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য বিভুত্বকে হেতু করিয়া, তদ্দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের উপসংহার (সংস্থাপন) করিলে প্রতিবাদী "আত্মা সক্রিয়ঃ

ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া, আকাশের বৈধর্ম্ম্য যে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্ত', তদ্দ্বারা আত্মাতে লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়ত্বের সমর্থন করিয়াছেন। এখানে প্রতিবাদীর ঐ হেতু সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য নহে। সুতরাং তাঁহার ঐ উত্তর যে জাত্যুত্তর, ইহা নির্ব্বিবাদ। পূর্ব্ববৎ উক্ত স্থলেও প্রতিবাদী যে বিশেষ হেতুর অভাব বলেন, উহাই উভয় প্রয়োগে ভাষ্যকারের মতে সাম্য। তাই তিনি এখানেও শেষে পূর্ব্ববৎ বলিয়াছেন,— "বিশেষহেত্বভাবাদ্বৈধর্ম্ম্যসমঃ"।

ভাষ্য। অথ সাধর্ম্ম্যসমঃ, ক্রিয়াবান্ লোষ্টঃ ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তো দৃষ্টঃ, তথা চাত্মা, তস্মাৎ ক্রিয়াবানিতি। ন চাস্তি বিশেষহেতুঃ—ক্রিয়াবদ্-বৈধর্ম্ম্যান্নিষ্ক্রিয়ো ন পুনঃ ক্রিয়াবৎসাধর্ম্ম্যাৎ ক্রিয়াবানিতি। বিশেষ-হেত্বভাবাৎ সাধর্ম্ম্যসমঃ।

অনুবাদ। অনন্তর "সাধর্ম্ম্যসম" অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার "সাধর্ম্ম্যসম" (প্রদর্শিত হইতেছে)। সক্রিয় লোষ্ট ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, আত্মাও তদ্রূপ অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট, অতএব আত্মা সক্রিয়। সক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে, কিন্তু সক্রিয় দ্রব্যের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ (উক্ত স্থলে) "সাধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার সর্ব্বপ্রথমে প্রথম প্রকার "সাধর্ম্ম্যসমে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে দ্বিবিধ "বৈধর্ম্ম্যসমে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে এখানে অবশিষ্ট দ্বিতীয় প্রকার "সাধর্ম্ম্যসমে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, বাদী তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্তের কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা হইবে—দ্বিতীয় প্রকার "সাধর্ম্ম্যসম"। সুতরাং উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইলে কোন বাদীর বৈধর্ম্ম্য দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন প্রদর্শন করা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার দ্বিবিধ বৈধর্ম্ম্যসমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই উক্ত স্থলেই শেষে দ্বিতীয় প্রকার সাধর্ম্ম্যসমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে ভাষ্যকারের আর পৃথক্ করিয়া বৈধর্ম্ম্য দ্বারা উপসংহার প্রদর্শন করা আবশ্যক না হওয়ায় গ্রন্থ লাঘব হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য বিভুত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, সক্রিয় লোষ্ট ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট, আত্মাও ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট। সুতরাং আত্মাও লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়। সক্রিয় লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য-(বিভুত্ব) বশতঃ আত্মা যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে ঐ সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্ম্য-(ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা) প্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় কেন হইবে না? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, যদ্দ্বারা উহার একতর পক্ষের

নিশ্চয় করা যায়। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীয় প্রকার "সাধর্ম্ম্যসম"। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য বিভুত্ব দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী ঐ লোষ্টের সাধর্ম্ম্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা) দ্বারাই আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সমর্থন করিয়াছেন। প্রতিবাদীর গৃহীত ঐ হেতু সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য নহে। সুতরাং তাঁহার ঐ উত্তর যে জাত্যুত্তর, ইহা নির্ব্বিবাদ। পূর্ব্ববৎ উক্ত স্থলেও প্রতিবাদী যে বিশেষ হেতুর অভাব বলেন, উহাই উভয় প্রয়োগে ভাষ্যকারের মতে সাম্য। তাই ভাষ্যকার এখানেও সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—"বিশেষ-হেত্বভাবাৎ সাধর্ম্ম্যসমঃ"।

ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণ দ্বারা এখানে আমরা বুঝিলাম যে, পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" ও "বৈধর্ম্ম্যসমা" জাতি প্রত্যেকেই পূর্ব্বোক্তরূপে দ্বিবিধ এবং উহার মধ্যে কোন কোন জাতি সদ্‌বিষয়া, অসদ্‌বিষয়া এবং অসদুক্তিকা, এই প্রকারত্রয়ে ত্রিবিধ। পরন্তু কোন বাদী যদি কোন সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য, এই উভয় দ্বারাই নিজ পক্ষ স্থাপন করেন এবং প্রতিবাদী যদি সেখানে কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারা অথবা বৈধর্ম্ম্য দ্বারা অথবা ঐ উভয় দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে সেই স্থলেও প্রতিবাদীর সেই উত্তর অন্য প্রকার "সাধর্ম্ম্যসমা" ও "বৈধর্ম্ম্যসমা" জাতি হইবে। কারণ, তুল্য যুক্তিতে ঐরূপ স্থলে প্রতিবাদীর ঐ উত্তরও সদুত্তর হইতে পারে না। উক্ত লক্ষণানুসারে উহাও জাত্যুত্তর। "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু বরদরাজ ইহাও শেষে বলিয়াছেন যে, অনুমানের ন্যায় প্রতিবাদী যদি প্রত্যক্ষাদির দ্বারাও ঐরূপ প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহাও সেখানে উক্ত জাত্যুত্তর হইবে। কারণ, তুল্য যুক্তিতে সেখানে প্রতিবাদীর ঐ উত্তরও সদুত্তর নহে এবং উহা "ছল"ও নহে। সুতরাং উহাও জাত্যুত্তর বলিয়াই স্বীকার্য্য। বাদী অনুমান দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া প্রত্যবস্থান করিলেও যে তাহা পূর্ব্বোক্ত জাত্যুত্তর হইবে, ইহা "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও বলিয়াছেন এবং তাহার উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য উক্ত কারণেই "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধদ্বয়কে "প্রতিধর্ম্মসম" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ উহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে,[১] যাহাতে ব্যাপ্তি প্রভৃতি যুক্ত অঙ্গ স্বীকৃত নহে, এমন প্রতিপ্রমাণ দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে "প্রতিধর্ম্মসম"। বাদীর বিপরীত পক্ষের সাধকরূপে প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিকূল যে কোন প্রমাণই প্রতিপ্রমাণ। মহর্ষি গোতমের সূত্রোক্ত "সাধর্ম্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" নামক

১। অনভ্যুপেতযুক্তাঙ্গাৎ প্রমাণাৎ প্রতিরোধতঃ। প্রত্যবস্থানমাচখ্যুঃ প্রতিধর্ম্মসমং বুধাঃ ॥২॥
সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যসমৌ তদ্ভেদাবেব সূত্রিতৌ। অবান্তরভিদাঃ সন্তি সর্ব্বত্রেতি প্রসিদ্ধয়ে ॥৩॥
তৌ চেৎ স্বতন্ত্রাভিমতৌ প্রত্যক্ষাদেঃ প্রমাণতঃ। এবম্বিধঃ-প্রসঙ্গঃ স্যাজ্জাতিত্বেন ন সূত্রিতঃ ॥৪॥
—'তার্কিকরক্ষা', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিষেধদ্বয় উক্ত "প্রতিধর্ম্মসমে"রই প্রকারবিশেষ। তাহা হইলে মহর্ষি উক্ত "প্রতিধর্ম্মসমে"র উল্লেখ না করিয়া, উহার প্রকারবিশেষেরই উল্লেখ করিয়াছেন কেন? এতদুত্তরে বরদরাজ বলিয়াছেন যে, সমস্ত জাতিতেই বহুপ্রকার ভেদ আছে, ইহা প্রদর্শন করিতেই মহর্ষি প্রথমে উক্ত প্রকারভেদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধদ্বয় উক্ত লক্ষণাক্রান্ত "প্রতি-ধর্ম্মসমে"র প্রকারভেদ না হইয়া, স্বতন্ত্র প্রতিষেধই তাঁহার অভিমত হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যবস্থানও যে জাত্যুত্তর, ইহা তাঁহার কোন স্থত্রের দ্বারাই উক্ত হয় না। কিন্তু ঐরূপ প্রত্যবস্থানও যে জাত্যুত্তর, ইহা স্বীকার্য্য। যেমন কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া অনুমান প্রমাণদ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, "ক" "খ" প্রভৃতি বর্ণাত্মক শব্দের যখন পুনঃ শ্রবণ হয়, তখন সেই এই "ক", সেই এই "খ" ইত্যাদিরূপে ঐ সমস্ত শব্দের প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ব্বশ্রুত সেই সমস্ত শব্দেরই পুনঃ শ্রবণ হইতেছে, সেই সমস্ত শব্দের ধ্বংস হয় নাই। সুতরাং শব্দ যদি অনুমানপ্রমাণপ্রযুক্ত অনিত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য হউক? অনুমানপ্রযুক্ত শব্দ কি অনিত্য হইবে, কিন্তু উক্তরূপ প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এইরূপ প্রতিবাদী মীমাংসক যদি উক্ত স্থলে তাঁহার নিজমতানুসারে উপমানপ্রমাণ এবং শব্দের নিত্যত্ববোধক শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাও শব্দের নিত্যত্বের আপত্তি সমর্থন করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে তাহাও শব্দানিত্যত্ববাদী মহর্ষি গোতমের মতে জাত্যুত্তরই হইবে। অতএব বুঝা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত "প্রতি-ধর্ম্মসম" নামক প্রতিষেধ এবং তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণই মহর্ষি গোতমের অভিমত। তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যবস্থানও স্থলবিশেষে তাঁহার কথিত "সাধর্ম্ম্যসম" এবং স্থলবিশেষে "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ হইতে পারে। অতএব এখানে তিনি "প্রতিধর্ম্মসম" নামে লক্ষ্য নির্দ্দেশ না করিলেও এবং উহার পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ না বলিলেও উহাই এখানে তাঁহার অভি-মত লক্ষ্য ও লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে প্রতিপ্রমাণের দ্বারা বাদীর সাধ্য ধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি সমর্থন করেন, তাঁহার সেই প্রতিপ্রমাণবিষয়ক জ্ঞানই উক্ত জাতির (৩) "উত্থান" অর্থাৎ উত্থিতিবীজ। কারণ, তদ্বিষয়ক জ্ঞান ব্যতীত উক্ত জাতির উদ্ভবই হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া, উহাতে সৎপ্রতিপক্ষত্বের আরোপ করায় সৎপ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাসে নিপাতনই উক্ত স্থলে (৪) "পাতন"। প্রতিবাদীর প্রমাদ অথবা প্রতিভাহানি উক্ত জাতির (৫) অবসর। উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে বাদী অথবা মধ্যস্থগণের সৎপ্রতিপক্ষত্ব ভ্রান্তিই উক্ত জাতির (৬) ফল। উক্ত জাতির সপ্তম অঙ্গ (৭) "মূল" অর্থাৎ উহার দুষ্টত্বের মূল। পরবর্ত্তী তৃতীয় সূত্রের দ্বারা মহর্ষি নিজেই তাহা সূচনা করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে॥ ২॥

ভাষ্য। অনয়োরুত্তরং—

অনুবাদ। এই উভয়ের অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত "সাধর্ম্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধদ্বয়ের উত্তর—

সূত্র। গোত্বাদ্গোসিদ্ধিবত্তৎসিদ্ধিঃ ॥৩॥৪৬৪॥

অনুবাদ। গোত্বপ্রযুক্ত গোর সিদ্ধির ন্যায় সেই সাধ্য ধর্ম্মের সিদ্ধি হয়।

বিবৃতি। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত জাতিদ্বয়ের উত্তর বলিয়াছেন। অর্থাৎ প্রতিবাদীর ঐরূপ উত্তর যে অসদুত্তর, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ের অসদুত্তরত্বনির্ণয়রূপ পরীক্ষাই এই সূত্রের উদ্দেশ্য। মহর্ষির সেই যুক্তির মর্ম্ম এই যে, যে কোন সাধর্ম্ম্য বা যে কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারা কোন সাধ্য সিদ্ধ হয় না। কিন্তু যে সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্য সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, তদ্দ্বারাই সেই সাধ্য ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। যেমন গোমাত্রে যে গোত্ব নামে একটি জাতিবিশেষ আছে, উহা গোমাত্রের সাধর্ম্ম্য এবং অশ্বাদির বৈধর্ম্ম্য। ঐ গোত্বনামক জাতিবিশেষকে হেতু করিয়া, তদ্দ্বারা "ইহা গো" এইরূপে গোর সিদ্ধি অর্থাৎ যথার্থ অনুমিতি হয়। কারণ, ঐ গোত্বজাতি গোপদার্থের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্য। কিন্তু পশুত্বাদি ধর্ম্ম গো পদার্থের সাধর্ম্ম্য হইলেও তদ্দ্বারা গো পদার্থের সিদ্ধি হয় না। কারণ, গোভিন্ন পদার্থেও পশুত্বাদি ধর্ম্ম থাকায় উহা গো-পদার্থের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে। এইরূপ কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া, কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে শব্দে অনিত্যত্বের সিদ্ধি বা অনুমিতি হয়। কারণ, কার্য্যত্ব হেতু অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। যে যে পদার্থে কার্য্যত্ব অর্থাৎ উৎপত্তিমত্ত্ব আছে, সেই সমস্ত পদার্থই অনিত্য, ইহা নির্ব্বিবাদ। কিন্তু প্রতিবাদী ঐ স্থলে "শব্দো নিত্যঃ, অমূর্ত্তত্বাৎ গগনবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া অমূর্ত্তত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে গগনের ন্যায় নিত্যত্ব সংস্থাপন করিলে শব্দে নিত্যত্বসিদ্ধি হয় না। কারণ, অমূর্ত্তত্ব, শব্দ ও গগনের সাধর্ম্ম্য হইলেও উহা নিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে। কারণ, অনেক অনিত্য পদার্থেও অমূর্ত্তত্ব আছে। অমূর্ত্ত পদার্থ হইলেই তাহা নিত্য, ইহা বলা যায় না। সুতরাং প্রতিবাদী ঐ স্থলে সৎপ্রতিপক্ষ দোষ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ঐরূপ অনুমান করিতে গেলে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর উভয় হেতুই তুল্যবল হইলেই সেখানেই সৎপ্রতিপক্ষ হইয়া থাকে। একের হেতু নির্দ্দোষ, অপরের হেতু ব্যভিচারাদি দোষযুক্ত বা ব্যভিচারাদি-শঙ্কাগ্রস্ত, এমন স্থলে সৎপ্রতিপক্ষ হয় না। অতএব প্রতিবাদীর ঐরূপ উত্তর উক্ত স্থলে কোনরূপেই সদুত্তর হইতে পারে না, উহা অসদুত্তর। উহার নাম "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতি। এইরূপ উক্ত যুক্তিতে "বৈধর্ম্ম্যসমা" জাতিও অসদুত্তর।

ভাষ্য। সাধর্ম্ম্যমাত্রে বৈধর্ম্ম্যমাত্রে চ[1] সাধ্যসাধনে প্রতিজ্ঞায়মানে স্যাদব্যবস্থা। সা তু ধর্ম্মবিশেষে নোপপদ্যতে। গোসাধর্ম্ম্যাদ্‌গোত্বাজ্জাতিবিশেষাদ্‌গোঃ সিধ্যতি, ন তু সাস্নাদিসম্বন্ধাৎ। অশ্বাদিবৈধর্ম্ম্যাদ্‌গোত্বাদেব গোঃ সিধ্যতি, ন গুণাদিভেদাৎ। তচ্চৈতৎ কৃতব্যাখ্যানমবয়বপ্রকরণে। প্রমাণানামভিসম্বন্ধাচ্চৈকার্থকারিত্বং সমানং বাক্যে, ইতি। হেত্বাভাসাশ্রয়া খল্বিয়মব্যবস্থেতি।

অনুবাদ। সাধর্ম্ম্যমাত্র অথবা বৈধর্ম্ম্যমাত্র সাধ্যসাধন বলিয়া প্রতিজ্ঞায়মান হইলে অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী তাঁহাদিগের সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিশূন্য কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যকে সাধ্যধর্ম্মের সাধনরূপে গ্রহণ করিলে অব্যবস্থা হয়। কিন্তু ধর্ম্মবিশেষ অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন ধর্ম্ম সাধ্যধর্ম্মের সাধনরূপে প্রতিজ্ঞায়মান হইলে সেই অব্যবস্থা উপপন্ন হয় না। (যথা) গোর সাধর্ম্ম্য গোত্বনামক জাতিবিশেষপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয়, কিন্তু সাস্নাদির (গলকম্বলাদির) সম্বন্ধপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয় না। (এবং) অশ্বাদির বৈধর্ম্ম্য গোত্বপ্রযুক্তই গো সিদ্ধ হয়, "গুণাদিভেদ" অর্থাৎ রূপাদি গুণবিশেষ এবং গমনাদি ক্রিয়াবিশেষপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয় না। সেই ইহা অবয়বপ্রকরণে "কৃতব্যাখ্যান" হইয়াছে (অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব ব্যাখ্যার শেষে যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)। বাক্যে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়বাক্যে সর্ব্বপ্রমাণের অভিসম্বন্ধপ্রযুক্তই একার্থকারিত্ব অর্থাৎ প্রকৃত সাধ্যসিদ্ধিরূপ এক প্রয়োজনসম্পাদকত্ব সমান। (অর্থাৎ নির্দ্দোষ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যে সমস্ত প্রমাণেরই সম্বন্ধ থাকায় সেখানে সমস্ত প্রমাণ মিলিত হইয়া সমানভাবে সেই সাধ্যধর্ম্মের যথার্থ নিশ্চয় সম্পন্ন করে) এই অব্যবস্থা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদীর কথিত অব্যবস্থা হেত্বাভাসাশ্রিতই অর্থাৎ হেত্বাভাস বা দুষ্ট হেতুর দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন হইলেই তৎপ্রযুক্ত উক্তরূপ অব্যবস্থা হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "জাতি"দ্বয়ের প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী যে, অব্যবস্থার সমর্থন করিয়া, বাদীর হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া আরোপ করেন, ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির সূত্রোক্ত যুক্তি

১। এখানে "সাধর্ম্ম্যমাত্রেণ বৈধর্ম্ম্যমাত্রেণ চ" এইরূপ পাঠই প্রচলিত সকল পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু পরে ভাষ্যকারের "ধর্ম্মবিশেষে" এই সপ্তম্যন্ত পাঠে লক্ষ্য করিলে প্রথমেও সপ্তম্যন্ত পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারেই এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে এখানে লিখিয়াছেন,—"যদি সাধর্ম্ম্যমাত্রং বৈধর্ম্ম্যমাত্রং বা সাধ্যসাধনং প্রতিজ্ঞায়েত, স্যাদিয়মব্যবস্থা।" সুতরাং ভাষ্যকারেরও উক্তরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

অনুসারে ঐ অব্যবস্থার খণ্ডন করিয়াই এই সূত্রোক্ত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ব্যবস্থা" শব্দের অর্থ নিয়ম। সুতরাং "অব্যবস্থা" বলিলে বুঝা যায় অনিয়ম। বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি ন্যায়-বাক্যের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি পূর্ব্বোক্তরূপ জাত্যুত্তর করেন, তাহা হইলে তিনি বলেন যে, শব্দ যে অনিত্যই হইবে, নিত্য হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা হয় না। কারণ, যদি অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য কার্য্যত্বাদিপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে গগনের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্বাদিপ্রযুক্ত শব্দ নিত্যও হইতে পারে। সুতরাং উক্ত স্থলে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ই জন্মে। অতএব বাদীর কথিত ঐ হেতু সৎপ্রতিপক্ষ হওয়ায় উহা তাঁহার সাধ্যসাধক হয় না। কারণ, সৎপ্রতিপক্ষ স্থলে উভয় পক্ষের সংশয়ই জন্মে; কোন পক্ষেরই অনুমিতি জন্মে না (প্রথম খণ্ড, ৩১৫—১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার উক্ত জাতিদ্বয় স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য অব্যবস্থার খণ্ডন করিতে মহর্ষির এই সূত্রানুসারে বলিয়াছেন যে, সাধর্ম্ম্যমাত্র অথবা বৈধর্ম্ম্যমাত্রই সাধ্যধর্ম্মের সাধনরূপে গ্রহণ করিলেই উক্তরূপ অব্যবস্থা হয়। ভাষ্যকার এখানে "মাত্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যাপ্তির ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদী যদি সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিশূন্য কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়াই নিজ পক্ষের সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে সেখানেই কোন পক্ষের নিশ্চয় না হওয়ায় উক্তরূপ অব্যবস্থা হয়। কারণ, ঐরূপ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচারী হওয়ায় উহা হেত্বাভাস। সুতরাং উহা কোন পক্ষেরই সাধক না হওয়ায় উক্তরূপ অব্যবস্থা হইবে। তাই ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অব্যবস্থা হেত্বাভাসাশ্রিত। অর্থাৎ হেত্বাভাসই উক্তরূপ অব্যবস্থার আশ্রয় বা প্রযোজক। কিন্তু বাদী অথবা প্রতিবাদী যদি সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যরূপ প্রকৃত হেতুদ্বারা সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে সেখানে যে পক্ষে প্রকৃত হেতু কথিত হয়, সেই পক্ষই নিশ্চিত হওয়ায় আর পূর্ব্বোক্তরূপ অব্যবস্থা হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"সা তু ধর্ম্মবিশেষেনোপপদ্যতে"। ফলকথা, সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতুর দ্বারাই সাধ্যধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। কেবল কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য দ্বারা সাধ্যধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। মহর্ষি এই সূত্রে "গোত্বাদ্-গোসিদ্ধিবৎ" এই দৃষ্টান্তবাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়া, পূর্ব্বসূত্রোক্ত জাতিদ্বয় যে অসদুত্তর, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কারণ, প্রতিবাদী তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিশূন্য কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ের প্রয়োগ করিলে, তাঁহার অভিমত ঐ হেতুতে হেতুর যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা না থাকায় যুক্তাঙ্গহীনত্ববশতঃ তাঁহার ঐ হেতু তাঁহার সাধ্যসাধক বা প্রকৃত হেতুই হয় না। এবং কোন স্থলে প্রতিবাদী তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতু প্রয়োগ করিলেও বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি না থাকায় যুক্তাঙ্গহীনত্ববশতঃ উহা তাঁহার সাধ্যসাধক বা প্রকৃত হেতুই হয় না। সুতরাং উক্ত উভয় স্থলেই প্রতিবাদী সৎপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন না। সুতরাং যুক্তাঙ্গহীনত্ববশতঃ পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয় দুষ্ট বা অসদুত্তর। মহর্ষি এই

সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত জাতিদ্বয়ের অসাধারণ দুষ্টত্বমূল (যুক্তাঙ্গহীনত্ব) সূচনা করিয়া, উহার দুষ্টত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা উহার সাধারণ দুষ্টত্বমূল যে স্বব্যাঘাতকত্ব, তাহাও সূচিত হইয়াছে। কারণ, প্রতিবাদী যদি উক্ত স্থলে কেবল কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা বাদীর সাধ্যধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের অভাবের আপত্তি সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের ঐ উত্তরেও অদূষকত্বের আপত্তি সমর্থন করা যায়। কারণ, উক্ত স্থলে যে সমস্ত উত্তর বা বাক্য বাদীর বাক্যের অদূষক, তাহাতে যে প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে, তাহা প্রতিবাদীর ঐ উত্তরবাক্যেও আছে। সুতরাং সেই প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি কোন সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অন্যান্য অদূষক বাক্যের ন্যায় প্রতিবাদীর ঐ উত্তরবাক্যও অদূষক হউক? তাহা কেন হইবে না? সুতরাং তুল্য ভাবে প্রতিবাদীর উহা স্বীকার্য্য হওয়ায় তাঁহার ঐ উত্তর স্বব্যাঘাতকত্ববশতঃ অসদুত্তর। কারণ, প্রতিবাদীর ঐ দূষক বাক্য বা উত্তর যদি অদূষক বলিয়া সন্দিগ্ধও হয়, তাহা হইলে আর তিনি উহার দ্বারা বাদীর বাক্যের দুষ্টত্ব সমর্থন করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার নিজের কথানুসারেই তাঁহার ঐ উত্তর নিজের ব্যাঘাতক হওয়ায় উহা কখনই সদুত্তর হইতে পারে না। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যে সৎপ্রতিপক্ষদোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা প্রকৃত সৎপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন নহে। কিন্তু তত্তুল্য বলিয়া উক্ত জাতিদ্বয়কে বলা হইয়াছে,—"সৎপ্রতিপক্ষদেশনাভাস"। উদ্দ্যোতকরও পরে এই প্রকরণকে "সৎপ্রতিপক্ষদেশনাভাস-প্রকরণ" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বসূত্রের "বার্ত্তিকে" পূর্ব্বোক্ত সাধর্ম্ম্যসমা জাতির উদাহরণ বলিয়া, উহাকে বলিয়াছেন,—"অনৈকান্তিকদেশনাভাসা"। ব্যভিচারী হেতুকেই "অনৈকান্তিক" বলে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুকে অনৈকান্তিক বলেন না। সুতরাং উদ্দ্যোতকরের ঐ কথা কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহা চিন্তনীয়। তাৎপর্য্যটীকায় ঐ কথার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, বার্ত্তিকে ঐ "অনৈকান্তিক" শব্দের অর্থও সৎপ্রতিপক্ষ। যাহা একান্ততঃ সাধ্যসাধক হয় না অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী, কাহারই সাধ্যসাধক না হইয়া, উভয়ের সাধ্য বিষয়ে সংশয়েরই প্রযোজক হয়, এই অর্থেই বার্ত্তিককার উক্ত স্থলে যৌগিক "অনৈকান্তিক" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং উহার দ্বারাও সৎপ্রতিপক্ষ বুঝা যায় এবং তাহাই বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার পরে মহর্ষির সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, গোত্বনামক জাতিবিশেষরূপ যে গোর সাধর্ম্ম্য, তৎপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয়। কিন্তু সাস্নাদির সম্বন্ধপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয় না। এবং গোত্বরূপ যে অশ্বাদির বৈধর্ম্ম্য, তৎপ্রযুক্তই গো সিদ্ধ হয়। গুণবিশেষ বা ক্রিয়াবিশেষপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, গোত্বনামক জাতিবিশেষ যেমন সমস্ত গোর সাধর্ম্ম্য, তদ্রূপ সাস্নাদি সম্বন্ধও সমস্ত গোর সাধর্ম্ম্য, এবং গোত্ব নামক জাতিবিশেষ যেমন অশ্বাদিতে না থাকায় অশ্বাদির বৈধর্ম্ম্য, তদ্রূপ অনেক গুণবিশেষ ও ক্রিয়াবিশেষও অশ্বাদির বৈধর্ম্ম্য আছে। কিন্তু তন্মধ্যে গোত্বনামক জাতিবিশেষপ্রযুক্তই অর্থাৎ ঐ হেতুর দ্বারাই "ইহা গো" এই-

রূপে গোর সিদ্ধি বা অনুমিতি হয়। সাস্নাদি সম্বন্ধ[1] এবং গুণবিশেষ ও ক্রিয়াবিশেষপ্রযুক্ত ঐরূপে গোর অনুমিতি হয় না। কারণ, গোত্বনামক জাতিবিশেষ গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্য এবং অশ্বাদির বৈধর্ম্ম্য। সাস্নাদি সম্বন্ধ প্রভৃতি ঐরূপ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য নহে। এখানে ভাষ্যকারোক্ত সাস্নাদির সম্বন্ধ কি? সাস্না শব্দেরই বা অর্থ কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি অনেক পূর্ব্বাচার্য্যের উক্তির[1] দ্বারা বুঝা যায়, তাঁহাদিগের মতে গোর অবয়বসমূহের পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগরূপ যে সংস্থান বা আকৃতি, তাহাই "সাস্নাদি" শব্দের অর্থ। তাহা হইলে উহা সমবায় সম্বন্ধে গোর অবয়বসমূহেই বিদ্যমান থাকে। তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে গোব্যক্তিও বিদ্যমান থাকায় সাস্নাদির সহিত গোর সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ আছে। কিন্তু "সাস্নাদি" শব্দের উক্ত অর্থে আর কোন প্রমাণ নাই। কোষকার অমর সিংহ বৈশ্যবর্গে বলিয়াছেন,—"সাস্না তু গলকম্বলঃ"। অর্থাৎ গোর গলদেশে যে লম্বমান চর্ম্মবিশেষ থাকে, যাহার নাম গলকম্বল, তাহাই "সাস্না" শব্দের অর্থ। "সাস্না" শব্দের এই অর্থই প্রসিদ্ধ। "তর্কভাষা"গ্রন্থে গোর লক্ষণ প্রকাশের জন্য কেশব মিশ্রও বলিয়াছেন,—"গোঃ সাস্নাবত্বং"। গোর গলকম্বলরূপ অবয়বই "সাস্না" হইলে উহাতে গোনামক অবয়বী সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে এবং তাহাতে "সাস্না" নামক অবয়ব সমবেতত্ব সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। সাস্নাদি শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থেও উহা সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে গোপদার্থেই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাহা হইলে ঐ সাস্নাদিও গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্যই হয়। কারণ, উহা গোভিন্ন আর কোন পদার্থে নাই। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও "যত্র সাস্নাদিঃ সা গৌঃ" এইরূপ বলিয়া সাস্নাদি হেতুর দ্বারা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গোর অনুমিতি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন[2]। সুতরাং এখানে ভাষ্যকারের "নতু সাস্নাদিসম্বন্ধাৎ" এইরূপ উক্তি কিরূপে সংগত হয়? ইহা গুরুতর চিন্তনীয়। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের ঐ উক্তি গ্রহণ করেন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ইহা চিন্তা করিয়া ভাষ্যকারের ঐ উক্তি সংগত করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারের[3] "সাস্নাদি" এই বাক্য "অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান" বহুব্রীহি সমাস। সুতরাং উহার দ্বারা গোপদার্থের ব্যাপ্তিশূন্য শৃঙ্গাদিই গৃহীত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, "তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান" ও "অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান" নামে বহুব্রীহি সমাস দ্বিবিধ। বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত পদের অর্থ প্রধানরূপে বোধবিষয় না হওয়ায় উহাকে বহুব্রীহি সমাসের "তদ্‌গুণ" বলা হইয়াছে। "গুণ" শব্দের অর্থ অপ্রধান। কিন্তু যেখানে বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত কোন পদের অর্থও ঐ সমাসের দ্বারা প্রধানতঃ বুঝা যায়, সেই স্থলে ঐ সমাসের নাম "তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান" বহুব্রীহি। যেমন "লম্বকর্ণমানয়" এই বাক্যে "লম্বকর্ণ" এই বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত

১। সাস্নাদিসংস্থানাভিব্যক্তগোত্বদেব প্রতীতেঃ।—কিরণাবলী, (এসিয়াটিক) ১৫৯ পৃষ্ঠা। "সাস্নাদিলক্ষণ-বিলক্ষণাকৃত্যাপি" ইত্যাদি শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, ২৩শ কারিকা ব্যাখ্যা।

২। অতএব গোত্বস্যাদ্যগ্রহদশায়াং যত্র সাস্নাদিঃ সা গৌরিতি তাদাত্ম্যেন গোব্যাপকত্বগ্রহে সাস্নাদিনা তাদাত্ম্যেন গোত্বাদাত্ম্যেন গোর্ব্যতিরেকাচ্চ সাস্নাদিব্যতিরেকঃ সিধ্যতি।—ব্যাপ্তিসিদ্ধান্তলক্ষণদীধিতি।

৩। "সাস্নাদী"ত্যতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ। তেন ব্যভিচারিণঃ শৃঙ্গাদয়ো গৃহ্যন্তে।—তাৎপর্য্যটীকা।

কর্ণ পদার্থেরও প্রধানতঃ বোধ হয়। কারণ, যাহার কর্ণ লম্বমান, সেই ব্যক্তিকে আনয়ন কর, ইহা বলিলে কর্ণ সহিত সেই ব্যক্তির আনয়নই বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত স্থলে "লম্বকর্ণ" এই বাক্য "তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান" বহুব্রীহি সমাস। কিন্তু "দৃষ্টসাগরমানয়" এই বাক্যের দ্বারা যে ব্যক্তি সাগর দেখিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর, ইহা বলিলে সাগর সহিত সেই ব্যক্তির আনয়ন বুঝা যায় না। সুতরাং "দৃষ্টসাগর" এই বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা প্রধানতঃ সাগরের বোধ না হওয়ায় উহা "অতদ্‌-গুণসংবিজ্ঞান" বহুব্রীহি সমাস। এইরূপ ভাষ্যকারোক্ত "সাস্নাদি" এই বাক্য "অতদ্‌গুণসংবি-জ্ঞান" বহুব্রীহি সমাস হইলে উহার দ্বারা "সাস্না আদির্যেষাং" এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে প্রধানতঃ শৃঙ্গাদিরই বোধ হয়। সেই শৃঙ্গাদি গোর সাধর্ম্ম্য হইলেও গোত্ব জাতির ন্যায় গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্য নহে। কারণ, উহা গোর ন্যায় মহিষাদিতেও থাকে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"নতু সাস্নাদি-সম্বন্ধাৎ"। ফলকথা, ভাষ্যকারের কথিত ঐ "সাস্নাদি" শব্দের প্রতিপাদ্য শৃঙ্গাদি। সুতরাং তাঁহার ঐ উক্তির অসংগতি নাই। কিন্তু শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত সমাধানে চিন্তনীয় এই যে, শৃঙ্গাদিই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত হইলে তিনি "শৃঙ্গাদি" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "সাস্নাদি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? এবং পূর্ব্বোক্ত "দৃষ্টসাগর" এই বহুব্রীহি সমাসে "সাগর" শব্দ প্রয়োগের যেরূপ প্রয়োজন আছে, "সাস্নাদি" এই বহুব্রীহি সমাসে "সাস্না" শব্দ প্রয়োগের সেইরূপ প্রয়োজন কি আছে? অবশ্য গোভিন্ন কোন পশ্বাদিতে সাস্না সম্বন্ধের কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের ঐ উক্তির দ্বারা মনে হয়, তিনি যেন গোর ন্যায় অন্য কোন পশুরও গলকম্বল দেখিয়াছিলেন। তবে তাহা "সাস্না" শব্দের বাচ্য বলিয়া সর্ব্বসম্মত নহে, ইহা মনে করিয়া "সাস্না" শব্দের পরে "আদি" শব্দের প্রয়োগ করিয়া, তদ্দ্বারা শৃঙ্গাদিই গ্রহণ করিয়াছেন। আবার ইহাও মনে হয় যে, ভাষ্যকার "সাস্নাদিসম্বন্ধ" বলিয়া সাস্নাদি অবয়বের সহিত গোর সমবায় সম্বন্ধই এখানে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, "নতু সাস্নাদিসম্বন্ধাৎ"। অর্থাৎ সমবেতত্ব সম্বন্ধে সাস্না গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্য হইলেও ঐ সাস্না ও গোর যে সমবায় সম্বন্ধ, তাহা গোর ন্যায় সাস্নাতেও থাকে। কিন্তু সাস্না গো নহে। কারণ, অবয়ব হইতে অবয়বী ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং সাস্নাতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে গো না থাকায় সাস্নার যে সমবায় সম্বন্ধ (যাহা গো এবং সাস্না, এই উভয়েই থাকে), তাহার দ্বারা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে গোর অনুমিতি হইতে পারে না। কারণ, সাস্না প্রভৃতি অবয়বের যে সমবায় নামক সম্বন্ধ, তাহা ঐ সমস্ত অবয়বেও থাকায় উহা গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্য নহে। রঘুনাথ শিরোমণি "যত্র সাস্নাদিঃ সা গৌঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে গোর অনুমানে সম্বন্ধবিশেষে সাস্নাদি-কেই হেতু বলিয়াছেন। তিনি ত "সাস্নাদি" শব্দের পরে সম্বন্ধ শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু ভাষ্যকার "সাস্নাদি" শব্দের পরে "সম্বন্ধ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? "সাস্নাদি" শব্দের দ্বারা গোপদার্থের ব্যাপ্তিশূন্য বা ব্যভিচারী শৃঙ্গাদিই তাঁহার বিবক্ষিত হইলে পরে আর "সম্বন্ধ" শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজন কি আছে? এবং ঐ সম্বন্ধই বা কি? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। সুধীগণ এখানে ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভে মনোযোগ করিয়া, তাঁহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন। পরন্তু এখানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "গোত্ব"

শব্দের দ্বারা গোত্বের সম্বন্ধ গ্রহণ না করিয়া, গোত্ব নামক জাতিবিশেষই গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার স্পষ্ট প্রকাশের জন্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "গোত্বাজ্‌জাতিবিশেষাৎ।"

আপত্তি হইতে পারে যে, গোত্ব জাতির প্রত্যক্ষ করিলে তখন সেই গোব্যক্তিরও প্রত্যক্ষ হওয়ায় গোত্ব-হেতুর দ্বারা প্রত্যক্ষ গোর অনুমিতি হইতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যকারের ঐ ব্যাখ্যা সংগত নহে। এতদুত্তরে ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, গোত্ব জাতির প্রত্যক্ষ করিয়াও অনুমানের ইচ্ছা হইলে ঐ হেতুর দ্বারা "অয়ং গৌঃ" এইরূপে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ গোরও স্বার্থানুমান হইতে পারে। ঐরূপ স্বার্থানুমানে সিদ্ধ সাধন দোষ নহে। মহর্ষি এই সূত্রে উক্তরূপ স্বার্থানুমানই দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইচ্ছাপ্রযুক্ত স্বার্থানুমানে সিদ্ধ সাধন দোষ নহে এবং সিদ্ধসাধন হেত্বাভাসও নহে, ইহাও এই সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও অন্যত্র বলিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষপরিকলিতমপ্যর্থমনুমানেন বুভুৎসন্তে তর্করসিকাঃ।" অর্থাৎ যাঁহারা অনুমানরসিক, তাঁহারা ইচ্ছাবশতঃ প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থেরও অনুমান করেন। কোন সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধসাধন দোষ পরিহারের উদ্দেশ্যে এখানে সূত্রোক্ত "গোসিদ্ধি" শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—গোব্যবহারসিদ্ধি। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে গোত্ব হেতুর দ্বারা "অয়ং গোশব্দবাচ্যো গোত্বাৎ" এইরূপে প্রত্যক্ষ গোব্যক্তিতে গোশব্দবাচ্যত্বের অনুমিতিই এই সূত্রে মহর্ষির বিবক্ষিত। গোশব্দবাচ্যত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হওয়ায় সিদ্ধসাধন দোষের আশঙ্কা নাই, ইহাই তাঁহাদিগের তাৎপর্য্য। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ উক্ত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রপাঠের দ্বারা সরলভাবে ঐরূপ অর্থ কোনরূপেই বুঝা যায় না। উক্ত ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত গোশব্দের গোব্যবহার অর্থাৎ গোশব্দবাচ্যত্বে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু ঐরূপ লক্ষণার প্রকৃত গ্রাহক এখানে নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে প্রথমে উক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া, উহাতে অরুচিবশতঃ নিজমতে অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,[১] সূত্রোক্ত "গোত্ব" শব্দের অর্থ সাস্নাদি। অর্থাৎ সাস্নাদি হেতুর দ্বারাই সমবায় সম্বন্ধে গোত্ব জাতির অথবা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে গোব্যক্তিরই অনুমিতি, এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু বৃত্তিকারের এই ব্যাখ্যাও আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, "গোত্ব" শব্দের দ্বারা সাস্নাদি অর্থ বুঝা যায় না। যাহা গো ভিন্ন পদার্থে সমবেত নহে অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, তাহা গোত্ব, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে গোত্ব শব্দের দ্বারা সাস্নাদি বুঝা যাইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সাস্নাদি কোন মতেই গোপদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। গোভিন্ন পদার্থ যাহাতে সমবেত নহে এবং গো পদার্থ যাহাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহা গোত্ব, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াও গোত্ব শব্দের দ্বারা সাস্নাদি অবয়ব বুঝা যায় না। কারণ, "গোত্ব" শব্দের ঐরূপ অর্থে কোন প্রমাণ নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের সন্দর্ভের দ্বারাও সরল ভাবে ঐরূপ অর্থ বুঝা যায় না। সুধীগণ এই সমস্ত কথারও বিচার করিবেন।

মহর্ষির এই সূত্রানুসারে ভাষ্যকারের উক্ত সিদ্ধান্ত যে যুক্তিসিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিবার জন্য ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, অবয়বপ্রকরণে পূর্ব্বেই উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাত

১। বয়ন্তু গোভিন্নাসমবেতত্বে সতি গোসমবেতত্বাৎ সাস্নাদিঃ ইত্যাদি।—বিশ্বনাথ-বৃত্তি।

হইয়াছে। কোথায় কিরূপে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা এখানে স্মরণ করাইবার জন্য ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রধান যুক্তির সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ন্যায়বাক্যে সর্ব্বপ্রমাণের সম্বন্ধপ্রযুক্তই একার্থকারিত্ব সমান। অর্থাৎ প্রকৃত বিশুদ্ধ ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিলে সেখানে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়ের মূলে যথাক্রমে শব্দপ্রমাণ, অনুমানপ্রমাণ, প্রত্যক্ষপ্রমাণ এবং উপমানপ্রমাণের সম্বন্ধ থাকায় সেখানে ঐ সমস্ত প্রমাণ মিলিত হইয়া সাধ্যনিশ্চয়রূপ এক প্রয়োজন সম্পন্ন করে। সুতরাং সেখানে ঐ সমস্ত অবয়বও সমানভাবে সাধ্যনিশ্চয় সম্পাদন করায় প্রকৃত সাধ্যবিষয়ে কোন সংশয় জন্মে না। কিন্তু হেত্বাভাসের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে সেখানে প্রকৃত ন্যায়ের দ্বারা উহার সংস্থাপন না হওয়ায় যথার্থ নির্ণয় হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অব্যবস্থা হয়। তাই ভাষ্যকার এখানে সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, এই অব্যবস্থা হেত্বাভাসাশ্রিত। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে "নিগমন" সূত্রের ভাষ্যে প্রকৃত ন্যায়বাক্যে যে সর্ব্বপ্রমাণের সম্বন্ধ আছে এবং তাহা কিরূপে সম্ভব হয়, ইত্যাদি বলিয়াছেন। এবং সেখানে ইহাও বলিয়াছেন যে, হেতু ও উদাহরণের পরিশুদ্ধি থাকিলে জাতি ও নিগ্রহস্থানের বহুত্ব সম্ভবই হয় না। কারণ, জাতিবাদী কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে তাঁহার সাধ্যধর্ম্ম ও হেতু পদার্থের সাধ্যসাধন ভাবের ব্যবস্থাপন না করিয়াই অর্থাৎ ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়াই প্রায়শঃ ব্যভিচারী হেতুর দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন। কিন্তু সাধ্যধর্ম্ম ও হেতু পদার্থের সাধ্যসাধনভাব ব্যবস্থিত হইলে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম্মবিশেষকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করা যায় না। প্রথম অধ্যায়ে অবয়বপ্রকরণে ভাষ্যকারের এই শেষ কথার দ্বারাও এখানে তাঁহার কথিত সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে (প্রথম খণ্ড, ২৮৬—৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানে ভাষ্যে "কৃতব্যাখ্যানং" এই স্থলে "কৃতব্যবস্থানং" এইরূপ পাঠান্তরও অনেক পুস্তকে আছে। "ব্যবস্থান" শব্দের দ্বারা ব্যবস্থা বা নিয়ম বুঝা যায়। সুতরাং অবয়বপ্রকরণে হেতু ও উদাহরণের স্বরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম্মবিশেষই হেতু হয়, কেবল কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যমাত্র হেতু হয় না, এইরূপ ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম করা হইয়াছে, ইহাই উক্ত পাঠের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। কিন্তু ঐরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে এখানে ভাষ্যকারের শেষোক্ত "প্রমাণানামভিসম্বন্ধাৎ" ইত্যাদি পাঠের সুসংগতি ভাল বুঝা যায় না। সুধীগণ ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিবেন॥ ৩॥

সৎপ্রতিপক্ষদেশনাভাস-প্রকরণ সমাপ্ত॥ ১॥

সূত্র। সাধ্য-দৃষ্টান্তয়োর্ধর্ম্মবিকল্পাদুভয়-সাধ্যত্বাচ্চোৎকর্ষাপকর্ষ-বর্ণ্যাবর্ণ-বিকল্প-সাধ্যসমাঃ॥৪॥৪৬৫॥

অনুবাদ। সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্ম্মবিকল্প অর্থাৎ ধর্ম্মের বিবিধত্ব-প্রযুক্ত (৩) উৎকর্ষসম, (৪) অপকর্ষসম, (৫) বর্ণ্যসম, (৬) অবর্ণ্যসম ও (৭)

বিকল্পসম হয় এবং উভয়ের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের সাধ্যত্ব-প্রযুক্ত (৮) সাধ্যসম হয়।

বিবৃতি। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সংক্ষেপে "উৎকর্ষসম" প্রভৃতি ষড়্বিধ প্রতিষেধের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমে "সাধ্যদৃষ্টান্তয়োর্দ্ধর্ম্মবিকল্পাৎ" এই বাক্যের দ্বারা "উৎকর্ষসম" প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিষেধের এবং পরে "উভয়সাধ্যত্বাচ্চ" এই বাক্যের দ্বারা শেষোক্ত "সাধ্যসম" প্রতিষেধের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। সূত্রে প্রথমোক্ত "সাধ্য" শব্দের অর্থ এখানে সাধ্যধর্ম্মী। বাদী বা প্রতিবাদী যে ধর্ম্মীকে কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া সংস্থাপন করেন, সেই ধর্ম্মীও সেই ধর্ম্মরূপে "সাধ্য" বলিয়া কথিত হইয়াছে। ন্যায়সূত্রে অনেক স্থলে উক্তরূপ অর্থেও "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। তদনুসারেই ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সাধ্যধর্ম্মী ও সাধ্যধর্ম্ম, এইরূপে সাধ্য দ্বিবিধ। যেমন আত্মাকে সক্রিয় বলিয়া সংস্থাপন করিলে ঐ স্থলে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মা সাধ্য-ধর্ম্মী এবং তাহাতে সক্রিয়ত্ব সাধ্যধর্ম্ম। এবং শব্দকে অনিত্য বলিয়া সংস্থাপন করিলে ঐ স্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্দ সাধ্যধর্ম্মী এবং তাহাতে অনিত্যত্ব সাধ্য ধর্ম্ম। নব্য নৈয়ায়িকগণ উক্ত স্থলে আত্মা ও শব্দকে "পক্ষ" বলিয়া, উহাতে অনুমেয় সক্রিয়ত্ব ও অনিত্যত্ব ধর্ম্মকেই সাধ্য বলিয়াছেন। তাঁহা-দিগের মতে অনুমেয় ধর্ম্মের নামই সাধ্য। কিন্তু তাঁহাদিগের মতেও এই সূত্রের প্রথমোক্ত "সাধ্য" শব্দের অর্থ পক্ষ। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থে কোন ধর্ম্মের সাধন বা অনুমান করা হয়, এই অর্থে এই সূত্রে "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় উহার দ্বারা বুঝা যায় পক্ষ। পূর্ব্বোক্ত সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্ম্মের বিকল্প আছে। "বিকল্প" বলিতে এখানে কোন স্থানে সত্তা ও কোন স্থানে অসত্তা প্রভৃতি নানাপ্রকারতারূপ বৈচিত্র্য। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে এমন অনেক ধর্ম্ম আছে, যাহা সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষে নাই এবং সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষে এমন অনেক ধর্ম্ম আছে, যাহা দৃষ্টান্ত পদার্থে নাই। যেমন সক্রিয়ত্বরূপে আত্মা সাধ্যধর্ম্মী এবং লোষ্ট দৃষ্টান্ত হইলে ঐ স্থানে লোষ্টের ধর্ম্ম স্পর্শবত্তা আত্মাতে নাই এবং আত্মার ধর্ম্ম বিভুত্ব লোষ্টে নাই। এবং লোষ্টের ধর্ম্ম নিশ্চিতসাধ্যবত্ত্ব (অবর্ণ্যত্ব) আত্মাতে নাই এবং আত্মার ধর্ম্ম সন্দিগ্ধসাধ্যবত্ত্ব (বর্ণ্যত্ব) লোষ্টে নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত পদার্থেও অন্যান্য নানা ধর্ম্মের পূর্ব্বোক্তরূপ বিকল্প আছে। যেমন উক্ত স্থলে লোষ্টে গুরুত্ব আছে, লঘুত্ব নাই এবং লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় বায়ুতে লঘুত্ব আছে, গুরুত্ব নাই। বাদীর সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ পদার্থ এবং তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থের পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মবিকল্পকে আশ্রয় করিয়া, তৎপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে অসদুত্তরবিশেষ, তাহা (৩) উৎকর্ষসম, (৪) অপকর্ষসম, (৫) বর্ণ্যসম, (৬) অবর্ণ্যসম ও (৭) বিকল্পসম নামক প্রতিষেধ (জাতি) হয়। প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মবিকল্প-জ্ঞানই উৎকর্ষসম প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিষেধের উত্থানের বীজ। তাই সূত্রে "সাধ্যদৃষ্টান্তয়োর্ধর্ম্ম-বিকল্পাৎ" এই বাক্যের দ্বারা উক্ত ধর্ম্মবিকল্পকেই "উৎকর্ষসম" প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিষেধের প্রযোজক বলিয়া উহাদিগের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে।

এইরূপ বাদীর সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ এবং তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থে এই উভয়ের সাধ্যত্বকে আশ্রয় করিয়া, তৎপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে অসদুত্তরবিশেষ, তাহার নাম (৮) "সাধ্যসম"। অর্থাৎ বাদীর সাধ্যধর্ম্মী সাধ্য পদার্থ হইলেও বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থ সাধ্য নহে। কারণ, যে পদার্থ সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধ আছে, যাহা ঐরূপে বাদীর ন্যায় প্রতিবাদীরও স্বীকৃত, তাহাই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে আত্মা সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য হইলেও লোষ্ট সক্রিয়ত্বরূপে সিদ্ধ পদার্থ। লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর সাধ্য-ধর্ম্মীর ন্যায় তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থেও সাধ্যত্বের আরোপ করিয়া, দৃষ্টান্তাসিদ্ধি প্রভৃতি দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে ঐ স্থলে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম "সাধ্যসম"। সূত্রোক্ত উভয় সাধ্যত্ব জ্ঞানই ইহার উত্থানের বীজ। তাই সূত্রে উভয় সাধ্যত্বকেই উহার প্রয়োজক বলিয়া শেষোক্ত "সাধ্যসম" নামক প্রতিষেধের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। পরে ভাষ্য-ব্যাখ্যায় এই সূত্রোক্ত ষড়্‌বিধ প্রতিষেধ বা জাতির স্বরূপ ও উদাহরণ ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। দৃষ্টান্তধর্ম্মং সাধ্যে সমাসঞ্জয়ত **উৎকর্ষসমঃ**। যদি ক্রিয়াহেতুগুণযোগাল্লোষ্টবৎ ক্রিয়াবানাত্মা, লোষ্টবদেব স্পর্শবানপি প্রাপ্নোতি। অথ ন স্পর্শবান্‌, লোষ্টবৎ ক্রিয়াবানপি ন প্রাপ্নোতি। বিপর্য্যয়ে বা বিশেষো বক্তব্য ইতি।

অনুবাদ। দৃষ্টান্তের ধর্ম্মকে সাধ্যধর্ম্মীতে সমাসঞ্জনকারী অর্থাৎ আপাদনকারী প্রতিবাদীর (৩) "উৎকর্ষসম" প্রতিষেধ হয়। (যথা পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন) ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তাপ্রযুক্ত আত্মা যদি লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় হয়, তাহা হইলে লোষ্টের ন্যায়ই স্পর্শবিশিষ্টও প্রাপ্ত হয়। আর যদি আত্মা স্পর্শবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়ও প্রাপ্ত হয় না। (অর্থাৎ আত্মা লোষ্টের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট না হইলে ক্রিয়াবিশিষ্টও হইতে পারে না) অথবা বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ আত্মাতে স্পর্শবত্তার অভাবে বিশেষ হেতু বক্তব্য।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার যথাক্রমে এই সূত্রোক্ত ষড়্‌বিধ জাতির লক্ষণাদি প্রকাশ করিতে প্রথমে "উৎকর্ষসমে"র লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে যে ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই, তাহাতে সেই ধর্ম্মের আরোপকে "উৎকর্ষ" বলে। বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তস্থ যে ধর্ম্ম, তাঁহার সাধ্যধর্ম্মীতে বস্তুতঃ বিদ্যমান নাই, সেই ধর্ম্মবিশেষকে সাধ্যধর্ম্মীতে সমাসঞ্জন করিয়া প্রতিবাদী দোষোদ্ভাবন করিলে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম উৎকর্ষসম। "সমাসঞ্জন" বলিতে আপাদন বা আপত্তিপ্রকাশ। যেমন কোন বাদী "আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ লোষ্টবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে সেখানে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মাই তাঁহার সাধ্যধর্ম্মী, লোষ্ট দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত লোষ্টে স্পর্শবত্তা আছে, কিন্তু আত্মাতে উহা নাই। আত্মা স্পর্শশূন্য দ্রব্য। কিন্তু প্রতিবাদী যদি ঐ স্থানে বাদীর দৃষ্টান্তস্থ স্পর্শবত্তা ধর্ম্মকে

বাদীর সাধ্যধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া বলেন যে, আত্মা যদি লোষ্টের ন্যায় ক্রিয়াবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ লোষ্টের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্টও হইবে। আর যদি আত্মা স্পর্শবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে ক্রিয়াবিশিষ্টও হইতে পারে না। অথবা আত্মাতে স্পর্শবত্তার বিপর্য্যয় যে স্পর্শশূন্যতা আছে, তদ্বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু বলা হয় নাই। সুতরাং আত্মা লোষ্টের ন্যায় ক্রিয়াবিশিষ্ট, কিন্তু স্পর্শবিশিষ্ট নহে, তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু না থাকায় আত্মা যে লোষ্টের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট, ইহাও স্বীকার্য্য। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, আত্মা স্পর্শবিশিষ্ট, ইহা বাদীও স্বীকার করিতে না পারায় আত্মা সক্রিয় নহে, ইহাই তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং তিনি আর আত্মা সক্রিয়, এইরূপ অনুমান করিতে পারিবেন না। উক্তরূপে বাদীর অনুমানে বাধদোষের উদ্ভাবনই ঐ স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। প্রতিবাদী উক্ত স্থলে আত্মাতে অবিদ্যমান স্পর্শবত্তা ধর্ম্মের যে আরোপ করেন, উহার নাম উৎকর্ষ। ঐ উৎকর্ষপ্রযুক্তই প্রতিবাদী উভয় পক্ষে সাম্যের অভিমান করায় "উৎকর্ষেণ সমঃ" এই অর্থে উক্তরূপ উত্তরের নাম "উৎকর্ষসম"।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত উৎকর্ষসমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাদ্ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, কার্য্যত্ববশতঃ যদি ঘটের ন্যায় শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে শব্দও ঘটের ন্যায় রূপ-বিশিষ্ট হউক ? কারণ, কার্য্যত্ববিশিষ্ট ঘটে অনিত্যত্বের ন্যায় রূপবত্তাও আছে। কার্য্যত্ববশতঃ শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য হইবে, কিন্তু রূপবিশিষ্ট হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্তস্থ যে রূপবত্তা তাঁহার সাধ্যধর্ম্মী শব্দে বস্তুতঃ নাই, তাহা শব্দে আরোপ করায় তাঁহার উক্তরূপ উত্তর "উৎকর্ষসম" নামক প্রতিষেধ হয়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদী শব্দে রূপের অভাব স্বীকার করিলেও তিনি উহার বিরোধী হেতু অর্থাৎ ঐ রূপাভাবের অভাব যে রূপ, তাহার সাধক হেতু (কার্য্যত্ব) প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ঐ হেতুর দ্বারা শব্দে ঘটের ন্যায় রূপবত্তা সিদ্ধ হইলে উক্ত হেতু বিশেষবিরুদ্ধ হইবে। কারণ, বাদী শব্দে রূপশূন্যতা সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও রূপবত্তার সাধক হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও তাহার অভাবের সাধক হেতু প্রয়োগ করিলে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হয়। ফলকথা, উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে বিশেষবিরুদ্ধত্বই প্রতিবাদীর আরোপ্য এবং বাদী অথবা মধ্যস্থগণের উক্ত হেতুতে বিশেষবিরুদ্ধত্ব ভ্রমই উক্ত জাত্যুত্তরের ফল। উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে বরদরাজ ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে এইরূপ বলিয়াছেন। তাই উক্ত জাতি "বিশেষবিরুদ্ধ-হেতুদেশনাভাস" এই নামে কথিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতির মতে বাদীর পক্ষ অথবা দৃষ্টান্ত, এই উভয় পদার্থেই সাধ্যধর্ম্ম অথবা হেতু, এই উভয় দ্বারাই অবিদ্যমান ধর্ম্মের আপত্তি প্রকাশ করিলে "উৎকর্ষসমা" জাতি হইবে। তাই বৃত্তিকার ঐ ভাবেই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই উৎকর্ষসমা জাতি সর্ব্বত্রই অসৎ হেতুর দ্বারাই হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বত্রই ইহা অসদুত্তরই হইবে, সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতির ন্যায় ইহা

কখনও "অসদুক্তিকা" হইতে পারে না। ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র ইহা স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন[১]।

ভাষ্য। সাধ্যে ধর্ম্মাভাবং দৃষ্টান্তাৎ প্রসঞ্জয়তোঽ**পকর্ষসমঃ**। লোষ্টঃ খলু ক্রিয়াবানবিভুর্দৃষ্টঃ, কামমাত্মাঽপি ক্রিয়াবানবিভুরস্তু, বিপর্য্যয়ে বা বিশেষো বক্তব্য ইতি।

অনুবাদ। দৃষ্টান্তপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত দ্বারাই সাধ্যধর্ম্মীতে ধর্ম্মাভাবপ্রসঞ্জনকারী অর্থাৎ বাদীর সাধ্যধর্ম্মীতে বিদ্যমান ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৪) "অপকর্ষসম" প্রতিষেধ হয়। (যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন) লোষ্ট সক্রিয়, কিন্তু অবিভু দৃষ্ট হয়, সুতরাং আত্মাও সক্রিয় হইয়া অবিভু হউক? অথবা বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ আত্মাতে অবিভুত্বের অভাব বিভুত্ব বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য।

টিপ্পনী। বিদ্যমান ধর্ম্মের অপলাপকে "অপকর্ষ" বলে। অপকর্ষপ্রযুক্তসম, এই অর্থে অর্থাৎ প্রতিবাদী অপকর্ষপ্রযুক্ত উভয় পক্ষে সাম্যের অভিমান করায় "অপকর্ষসম" এই নামের প্রয়োগ হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত দ্বারাই বাদীর সাধ্যধর্ম্মীতে বিদ্যমান কোন ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম "অপকর্ষসম"। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন যে, লোষ্ট সক্রিয়, কিন্তু অবিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী নহে। সুতরাং আত্মা যদি লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় হয়, তাহা হইলে লোষ্টের ন্যায়ই অবিভু হউক। অথবা আত্মাতে যে অবিভুত্বের বিপর্য্যয় (বিভুত্ব) আছে, তদ্বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য। কিন্তু আত্মা যে লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় হইবে, কিন্তু অবিভু হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু না থাকায় আত্মাতে লোষ্টের ন্যায় অবিভুত্বও স্বীকার্য্য। প্রতিবাদী এইরূপে আত্মাতে বিদ্যমান ধর্ম্ম যে বিভুত্ব, তাহার অভাবের (অবিভুত্বের) আপত্তি প্রকাশ করিলে তাঁহার ঐ উত্তর "অপকর্ষসম" নামক প্রতিষেধ হইবে। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, আত্মাতে লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়ত্ব স্বীকার করিলে অবিভুত্বও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, সক্রিয় পদার্থমাত্রই অবিভু। সুতরাং অবিভুত্ব সক্রিয়ত্বের ব্যাপক। কিন্তু আত্মাতে অবিভুত্ব নাই, বাদীও উহা স্বীকার করেন না। সুতরাং ব্যাপকধর্ম্মের অভাববশতঃ ব্যাপ্যধর্ম্মের অভাব সিদ্ধ হওয়ায় আত্মাতে সক্রিয়ত্বের অভাবই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে বাদী আর আত্মাতে সক্রিয়ত্বের অনুমান করিতে পারিবেন না। উক্ত স্থলে এইরূপে বাদীর অনুমানে বাধ অথবা সৎপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য।

১। অসদুক্তিকত্বেহ ন সম্ভবতি, উৎকর্ষেণ প্রত্যবস্থানস্য অসদুত্তরত্বনিয়মাৎ।—বাদিবিনোদ।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি প্রয়োগ-স্থলেই "অপকর্ষসমে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন, শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য হইলে শব্দের ন্যায় ঘটও রূপশূন্য হউক? কার্য্যত্ববশতঃ শব্দ ঘটের সদৃশ পদার্থ হইলে শব্দের ন্যায় ঘটও রূপশূন্য কেন হইবে না? কার্য্যত্ববশতঃ শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য হইবে, কিন্তু ঘট শব্দের ন্যায় রূপশূন্য হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্তে (ঘটে) বিদ্যমান ধর্ম্ম যে রূপ, তাহার অভাবের আপত্তি প্রকাশ করায়, ঐ উত্তর "অপকর্ষসম" নামক প্রতিষেধ, ইহাই উদ্দ্যোতকরের কথার দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার বাদীর সাধ্যধর্ম্মীতে বিদ্যমান ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি স্থলেই "অপকর্ষসম" বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও বার্ত্তিককারের উক্ত উদাহরণ স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদীর দৃষ্টান্ত ঘটে রূপশূন্যতার আপাদন অর্থান্তর। "অর্থান্তর" নিগ্রহস্থানবিশেষ,—উহা "জাতি" নহে। বৃত্তিকারের মতে বাদীর পক্ষ অথবা দৃষ্টান্ত, ইহার যে কোন পদার্থে ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া, বাদীর হেতু অথবা সাধ্যধর্ম্মের সহিত একত্র বিদ্যমান কোন ধর্ম্মের অভাবের দ্বারা প্রতিবাদী ঐ হেতু অথবা সাধ্যধর্ম্মের অভাবের আপত্তি করিলে, সেখানে তাঁহার সেই উত্তরের নাম "অপকর্ষসমা" জাতি। যেমন "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিত্যত্বের সমানাধিকরণ যে ঘটধর্ম্ম কার্য্যত্ব, তৎপ্রযুক্ত শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে ঐ কার্য্যত্ব ও অনিত্যত্বের সমানাধিকরণ ঘটধর্ম্ম যে রূপবত্তা, তাহা শব্দে না থাকায় ঐ রূপবত্তার অভাবপ্রযুক্ত শব্দে কার্য্যত্ব ও অনিত্যত্বের অভাবও সিদ্ধ হউক? অনিত্যত্বের সমানাধিকরণ কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা ঘটে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে কার্য্যত্ব ও অনিত্যত্বের সমানাধিকরণ রূপবত্তার অভাবের দ্বারা ঘটে কার্য্যত্ব ও অনিত্যত্বের অভাবও কেন সিদ্ধ হইবে না? কিন্তু শব্দে কার্য্যত্ব হেতুর অভাব সিদ্ধ হইলে স্বরূপাসিদ্ধি-দোষবশতঃ বাদীর উক্ত অনুমান হইতে পারে না এবং শব্দে অনিত্যত্ব সাধ্যের অভাব সিদ্ধ হইলে পক্ষে সাধ্যধর্ম্ম বাধিত হওয়ায় উক্ত অনুমান হইতে পারে না। এইরূপে প্রথম পক্ষে হেতুর অসিদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপাসিদ্ধি দোষের উদ্ভাবন এবং দ্বিতীয় পক্ষে বাধদোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উক্ত "অপকর্ষসমা" জাতি "অসিদ্ধিদেশনাভাসা" এবং "বাধদেশনাভাসা" এই নামে কথিত হইয়াছে।

ভাষ্য। খ্যাপনীয়ো বর্ণ্যো বিপর্য্যয়াদবর্ণ্যঃ। তাবেতৌ সাধ্য-দৃষ্টান্ত-ধর্ম্মৌ বিপর্য্যস্যতো **বর্ণ্যাবর্ণ্যসমৌ ভবতঃ।**

অনুবাদ। খ্যাপনীয় অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বাদীর সংস্থাপনীয় সাধ্যধর্ম্মীকে "বর্ণ্য" বলে, বিপর্য্যয়বশতঃ "অবর্ণ্য" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "বর্ণ্যে"র বিপরীত দৃষ্টান্ত পদার্থকে "অবর্ণ্য" বলে। সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের সেই এই ধর্ম্মদ্বয়কে (বর্ণ্যত্ব ও অবর্ণ্যত্বকে) বিপর্য্যাসকারী অর্থাৎ বিপরীত ভাবে আরোপকারী প্রতিবাদীর (৫) বর্ণ্যসম ও (৬) অবর্ণ্যসম প্রতিষেধ হয়, অর্থাৎ অবর্ণ্য দৃষ্টান্ত পদার্থে বর্ণ্যত্বের

আরোপ করিয়া উত্তর করিলে "বর্ণ্যসম" এবং বর্ণ্য সাধ্যধর্ম্মীতে অবর্ণ্যত্বের আরোপ করিয়া উত্তর করিলে "অবর্ণ্যসম" নামক প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। বাদীর যাহা বর্ণনীয় অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্তাদির দ্বারা খ্যাপনীয় বা সংস্থাপনীয়, তাহাকে "বর্ণ্য" বলা যায়। যেমন বাদী আত্মাকে সক্রিয় বলিয়া খ্যাপন বা সংস্থাপন করিলে, সেখানে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মাই বর্ণ্য। এবং শব্দকে অনিত্য বলিয়া সংস্থাপন করিলে সেখানে অনিত্যত্বরূপে শব্দই বর্ণ্য। উক্ত স্থলে আত্মাতে সক্রিয়ত্ব এবং শব্দে অনিত্যত্ব প্রতিবাদী স্বীকার করেন না। সুতরাং উহা সিদ্ধ না হওয়ায় সন্দিগ্ধ পদার্থ। তাই উক্ত স্থলে আত্মা ও শব্দ সন্দিগ্ধসাধ্যক পদার্থ। সুতরাং সন্দিগ্ধসাধ্যকত্বই "বর্ণ্যত্ব", ইহাই ফলিতার্থ হয়। তাহা হইলে উহার বিপরীত ধর্ম্ম নিশ্চিতসাধ্যকত্বই "অবর্ণ্যত্ব", ইহা বুঝা যায়। বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যধর্ম্ম নিশ্চিতই থাকে। উহা সেখানে সন্দিগ্ধ হইলে সেই পদার্থ দৃষ্টান্তই হয় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত পদার্থ বাদীর সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া পূর্ব্বসিদ্ধ থাকায় উহার বর্ণন বা স্থাপন করিতে হয় না। ফলকথা, নিশ্চিতসাধ্যকত্বই "অবর্ণ্যত্ব", উহা দৃষ্টান্তগত ধর্ম্ম। সূত্রে "বর্ণ্য" ও "অবর্ণ্য" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ বর্ণ্যত্ব ও অবর্ণ্যত্ব ধর্ম্মই বিবক্ষিত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। কারণ, ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মদ্বয়কে যিনি বিপরীত ভাবে আরোপ করেন, তাঁহার ঐ উত্তর যথাক্রমে "বর্ণ্যসম" ও "অবর্ণ্যসম" হয়। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, প্রতিবাদী বাদীর কথিত "অবর্ণ্য" পদার্থে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে বর্ণ্যত্ব অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যকত্বের আরোপ করিয়া উত্তর করিলে, উহা হইবে "বর্ণ্যসম" এবং বাদীর সাধ্যধর্ম্মী যাহা বাদীর বর্ণ্য পদার্থ, তাহাতে অবর্ণ্যত্ব অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যকত্বের আরোপ করিয়া উত্তর করিলে, উহা হইবে অবর্ণ্যসম। যেমন ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আত্মা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়, ইহা বলিলে ঐ লোষ্টও আত্মার ন্যায় বর্ণ্য অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যক হউক ? কারণ, সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত পদার্থ সমানধর্ম্মা হওয়া আবশ্যক। যাহা দৃষ্টান্ত, তাহাতে সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষের ধর্ম্ম (বর্ণ্যত্ব) না থাকিলে, তাহা ঐ পক্ষের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সুতরাং লোষ্টও আত্মার ন্যায় সন্দিগ্ধসাধ্যক পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার দৃষ্টান্ত লোষ্টকেও আত্মার ন্যায় সন্দিগ্ধসাধ্যক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে, উহা দৃষ্টান্তই হয় না। সুতরাং বাদীর উক্ত অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ হয় এবং তাহা হইলে বাদীর উক্ত হেতু সপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট কোন পদার্থে না থাকায় কেবল পক্ষমাত্রস্থ হওয়ায় "অসাধারণ" নামক হেত্বাভাস হয়। পূর্ব্বোক্তরূপে বাদীর অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি এবং অসাধারণ নামক হেত্বাভাসের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত "বর্ণ্যসম" প্রতিষেধকে বলিয়াছেন,—"অসাধারণদেশনাভাস"।

এইরূপ পূর্ব্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বিপরীত ভাবে বলেন যে, আত্মা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়, ইহা বলিলে ঐ আত্মাও লোষ্টের ন্যায় অবর্ণ্য অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যক হউক ? কারণ, আত্মা লোষ্টের

সমানধর্ম্মা না হইলে লোষ্ট দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। পরন্তু আত্মা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় হইবে, কিন্তু লোষ্টের ন্যায় অবর্ণ্য অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যক হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "অবর্ণ্যসম" নামক প্রতিষেধ বা "অবর্ণ্যসমা" জাতি। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্ট নিশ্চিতসাধ্যক পদার্থ। অর্থাৎ সক্রিয়ত্বরূপ সাধ্যধর্ম্ম উহাতে নিশ্চিত আছে বলিয়াই বাদী উহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নচেৎ উহা দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার গৃহীত হেতু নিশ্চিতসাধ্যক-পদার্থস্থ বলিয়াই তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের সাধক হয়, ইহা তাঁহার স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ যে আত্মা, তাহা নিশ্চিতসাধ্যক না হইলে নিশ্চিতসাধ্যক-পদার্থস্থ ঐ হেতু আত্মাতে না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। কারণ, যাদৃশ হেতু দৃষ্টান্তে থাকিয়া সাধ্যসাধক হয়, তাদৃশ হেতু পক্ষে না থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হইয়া থাকে। সুতরাং বাদী ঐ স্বরূপাসিদ্ধি দোষ বারণের জন্য তাঁহার সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ আত্মাকেও শেষে লোষ্টের ন্যায় নিশ্চিতসাধ্যক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে, উহা উক্ত অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয় হইতে পারে না। কারণ, সন্দিগ্ধসাধ্যক পদার্থই উক্তরূপ অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয় হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত অনুমানে আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ অনিবার্য্য। এইরূপে উক্ত অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি বা আশ্রয়াসিদ্ধি দোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত "অবর্ণ্যসমা" জাতিকে বলিয়াছেন,—"অসিদ্ধিদেশনাভাসা"। বাদীর সমস্ত অনুমানেই জিগীষু প্রতিবাদী উক্তরূপে "বর্ণ্যসমা" ও "অবর্ণ্যসমা" জাতির প্রয়োগ করিতে পারেন। তাই ভাষ্যকার ঐ জাতিদ্বয়ের কোন উদাহরণবিশেষ প্রদর্শন করেন নাই।

ভাষ্য। সাধনধর্ম্মযুক্তে দৃষ্টান্তে ধর্ম্মান্তরবিকল্পাৎ সাধ্যধর্ম্মবিকল্পং প্রসঞ্জয়তো **বিকল্পসমঃ**। ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তং কিঞ্চিদ্‌গুরু, যথা লোষ্টঃ, কিঞ্চিল্লঘু, যথা বায়ুঃ। এবং ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তং কিঞ্চিৎ ক্রিয়াবৎ স্যাৎ, যথা লোষ্টঃ, কিঞ্চিদক্রিয়ং স্যাদ্‌যথা আত্মা। বিশেষো বা বাচ্য ইতি।

অনুবাদ। সাধনরূপ ধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট দৃষ্টান্তে অন্য ধর্ম্মের বিকল্পপ্রযুক্ত সাধ্যধর্ম্মের বিকল্প প্রসঞ্জনকারী অর্থাৎ বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচারের আপত্তিপ্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৭) "বিকল্পসম" প্রতিষেধ হয়। (যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন)—ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য গুরু, যেমন লোষ্ট, কোন দ্রব্য লঘু, যেমন বায়ু। এইরূপ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য সক্রিয় হউক—যেমন লোষ্ট, কোন দ্রব্য নিষ্ক্রিয় হউক, যেমন আত্মা। অথবা বিশেষ বক্তব্য, অর্থাৎ লোষ্টের ন্যায় আত্মাও যে সক্রিয়ই হইবে, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য, কিন্তু তাহা নাই।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার "বিকল্পসম" নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, সাধনরূপ ধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতুরূপ যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট বাদীর দৃষ্টান্তে অন্য কোন একটি ধর্ম্মের বিকল্পপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর হেতুতে সেই অন্য ধর্ম্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুতে বাদীর সাধ্যধর্ম্মের বিকল্প প্রসঞ্জন অর্থাৎ ব্যভিচারের আপাদন করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম "বিকল্পসম"। যেমন কোন বাদী বলিলেন,—"আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্বাৎ লোষ্টবৎ।" উক্ত স্থলে ক্রিয়ার কারণগুণবত্তা বাদীর সাধনরূপ ধর্ম্ম অর্থাৎ হেতু। বাদীর দৃষ্টান্ত লোষ্টে ঐ ধর্ম্ম আছে, কিন্তু লঘুত্ব ধর্ম্ম নাই। সুতরাং বাদীর দৃষ্টান্তে তাঁহার হেতু লঘুত্বধর্ম্মের ব্যভিচারী। প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ঐ ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, তাহাতে বাদীর সাধ্যধর্ম্ম সক্রিয়ত্বের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করিলে, তাঁহার ঐ উত্তর "বিকল্পসম" নামক প্রতিষেধ হইবে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও যেমন কোন দ্রব্য (লোষ্ট) গুরু, কোন দ্রব্য (বায়ু) লঘু, তদ্রূপ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও কোন দ্রব্য (লোষ্ট) সক্রিয়, কোন দ্রব্য (আত্মা) নিষ্ক্রিয় হউক? ক্রিয়ার কারণ-গুণবিশিষ্ট বলিয়া আত্মা যে সক্রিয়ই হইবে, নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। সুতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও যেমন লোষ্ট গুরু, বায়ু লঘু, ঐরূপ দ্রব্যমাত্রই গুরু বা লঘু, এইরূপ কোন এক প্রকারই নহে, উহাতে গুরুত্ব ও লঘুত্ব, এই "বিকল্প" অর্থাৎ বিরুদ্ধ প্রকার আছে, তদ্রূপ ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষ্ট লোষ্ট প্রভৃতি সক্রিয় হইলেও আত্মা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ঐরূপ দ্রব্যের সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব, এই বিরুদ্ধ প্রকারও আছে, ইহাও ত বলিতে পারি। তাহা হইলে আত্মাতে যে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা আছে, তাহা ঐ আত্মাতেই বাদীর সাধ্যধর্ম্ম সক্রিয়ত্বের ব্যভিচারী হওয়ায় ঐ হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "বিকল্পসম" প্রতিষেধ। বার্ত্তিককার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "শব্দোঽনিত্য উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ ঘটবৎ" এই প্রয়োগস্থলেই উক্ত "বিকল্পসম" প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন, উৎপত্তিধর্ম্মক হইলেও যেমন শব্দ বিভাগজন্য, কিন্তু ঘট বিভাগজন্য নহে, তদ্রূপ উৎপত্তিধর্ম্মক হইলেও শব্দ নিত্য, কিন্তু ঘটাদি অনিত্য, ইহাও ত হইতে পারে। অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থের মধ্যে যেমন বিভাগজন্যত্ব এবং অবিভাগজন্যত্ব, এই বিরুদ্ধ প্রকার আছে, তদ্রূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই বিরুদ্ধ প্রকারভেদও থাকিতে পারে। তাহা হইলে শব্দে অনিত্যত্ব না থাকায় উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব হেতু ঐ শব্দেই অনিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্ম্মের ব্যভিচারী হয়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "বিকল্পসম" নামক প্রতিষেধ বা "বিকল্পসমা" জাতি। "বিকল্প"-প্রযুক্ত সম, এই অর্থে অর্থাৎ প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্তরূপ বিকল্পকে আশ্রয় করিয়াই উভয় পক্ষে সাম্যের অভিমান করেন, এ জন্য উহা "বিকল্পসম" এই নামে কথিত হইয়াছে। "বিকল্প" শব্দের অর্থ এখানে বিরুদ্ধ প্রকার, উহার দ্বারা ব্যভিচারই বিবক্ষিত। কারণ, পূর্ব্বোক্তরূপে বাদীর হেতুতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত "বিকল্পসমা" জাতিকে বলিয়াছেন,—"অনৈকান্তিকদেশনাভাসা"। "অনৈকান্তিক"

শব্দের অর্থ এখানে "সব্যভিচার" নামক হেত্বাভাস বা দুষ্ট হেতু (প্রথম খণ্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের সূক্ষ্ম বিচারানুসারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন যে, (১) বাদীর হেতুরূপ ধর্ম্মে অন্য যে কোন ধর্ম্মের ব্যভিচার, অথবা (২) অন্য যে কোন ধর্ম্মে বাদীর সাধ্য ধর্ম্মের ব্যভিচার, (৩) অথবা যে কোন ধর্ম্মে তদ্ভিন্ন যে কোন ধর্ম্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুতেও তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তর "বিকল্পসমা" জাতি[১] হইবে। প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ যে কোন ব্যভিচার জ্ঞানই উক্ত জাতির উত্থানের হেতু। তন্মধ্যে বাদীর হেতুতে অন্য কোন ধর্ম্মের ব্যভিচার আবার ত্রিবিধ। (১) বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তে ব্যভিচার, (২) বাদী পদার্থদ্বয় পক্ষরূপে গ্রহণ করিলে, সেই পক্ষদ্বয়ে ব্যভিচার এবং (৩) বাদী পদার্থদ্বয় দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিলে, সেই দৃষ্টান্তদ্বয়ে ব্যভিচার। সূত্রে "সাধ্যদৃষ্টান্তয়োঃ" এই বাক্যের দ্বারা সাধ্যদ্বয় অর্থাৎ পক্ষদ্বয় এবং দৃষ্টান্তদ্বয়ও এক পক্ষে বুঝিতে হইবে। বরদরাজ শেষে সূত্রার্থ ব্যাখ্যায় ঐ কথাও বলিয়াছেন এবং তিনি উক্ত মতানুসারে পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকার ত্রিবিধ ব্যভিচার ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বপ্রকার "বিকল্পসমা" জাতিরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতানুসারেই ব্যাখ্যা করিলেও তিনি উহার একটিমাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, ঐ স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, কার্য্যত্ব হেতু গুরুত্ব ধর্ম্মের ব্যভিচারী, ঐ গুরুত্ব ধর্ম্মও অনিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যভিচারী এবং ঐ অনিত্যত্ব ধর্ম্ম মূর্ত্তত্ব ধর্ম্মের ব্যভিচারী। এইরূপে ধর্ম্মমাত্রই যখন তদ্‌ভিন্ন ধর্ম্মের ব্যভিচারী, তখন কার্য্যত্বরূপ ধর্ম্মও অর্থাৎ বাদীর হেতুও অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হইবে? কারণ, কার্য্যত্ব এবং অনিত্যত্বও ধর্ম্ম। ধর্ম্মমাত্রই তদ্‌ভিন্ন ধর্ম্মের ব্যভিচারী হইলে কার্য্যত্বরূপ ধর্ম্মও অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মের ব্যভিচারী কেন হইবে না? তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু নাই। প্রতিবাদী উক্তরূপে বাদীর হেতু কার্য্যত্ব ধর্ম্মে তাঁহার সাধ্যধর্ম্ম অনিত্যত্বের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করিলে উক্ত স্থলে তাঁহার ঐ উত্তর "বিকল্পসমা" জাতি।

ভাষ্য। হেত্বাদ্যবয়বসামর্থ্যযোগী ধর্ম্মঃ সাধ্যঃ। তং দৃষ্টান্তে প্রসঞ্জয়তঃ **সাধ্যসমঃ**। যদি যথা লোষ্টস্তথাত্মা, প্রাপ্তস্তর্হি যথাত্মা তথা লোষ্ট ইতি। সাধ্যশ্চায়মাত্মা ক্রিয়াবানিতি, কামং লোষ্টোঽপি সাধ্যঃ? অথ নৈবং? ন তর্হি যথা লোষ্টস্তথাত্মা।

১। ধর্ম্মস্যৈকস্য কেনাপি ধর্ম্মেণ ব্যভিচারতঃ।
হেতোশ্চ ব্যভিচারোক্তির্বিকল্পসমজাতিতা॥—তার্কিকরক্ষা।

অনুবাদ। হেতু প্রভৃতি অবয়বের সামর্থ্যযুক্ত ধর্ম্ম সাধ্য, দৃষ্টান্ত পদার্থে সেই সাধ্যকে প্রসঞ্জনকারীর অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টান্তও সাধ্য হউক? এইরূপ আপত্তি-প্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৮) "সাধ্যসম" প্রতিষেধ হয়। (যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন যে) যদি যেমন লোষ্ট, তদ্রূপ আত্মা হয়, তাহা হইলে যেমন আত্মা, তদ্রূপ লোষ্ট প্রাপ্ত হয়। (তাৎপর্য্য) এই আত্মা সক্রিয়, এইরূপে সাধ্য, সুতরাং লোষ্টও সক্রিয়, এইরূপে সাধ্য হউক? আর যদি এইরূপ না হয় অর্থাৎ লোষ্টও আত্মার ন্যায় সাধ্য না হয়, তাহা হইলে যেমন লোষ্ট, তদ্রূপ আত্মা হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার এই সূত্রোক্ত "উৎকর্ষসম" প্রভৃতি ষড়্‌বিধ প্রতিষেধের মধ্যে শেষোক্ত ষষ্ঠ "সাধ্যসম" নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিবার জন্য প্রথমে উক্ত "সাধ্য" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন যে, হেতু প্রভৃতি অবয়বের সামর্থ্যবিশিষ্ট যে ধর্ম্ম (পদার্থ), তাহাই "সাধ্য"। ভাষ্যকার ন্যায়দর্শনের ভাষ্যারম্ভে "সামর্থ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়া, সেখানে ঐ "সামর্থ্য" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, ফলের সহিত সম্বন্ধ। এবং পরে উপনয়সূত্রের (১।১।৩৮) ভাষ্যেও ভাষ্যকার যে "সামর্থ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহার ব্যাখ্যাতেও শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উক্ত অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এখানেও ভাষ্যকারোক্ত "সামর্থ্য" শব্দের দ্বারা উক্ত অর্থই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, বাদী হেতু ও উদাহরণাদি অবয়বের দ্বারা যে পদার্থকে কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া সাধন করেন, অর্থাৎ হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা যে পদার্থকে কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া সাধন করাই বাদীর উদ্দেশ্য হওয়ায় ঐ সমস্ত অবয়বপ্রযুক্ত ফলসম্বন্ধ যে পদার্থে থাকে, সেই পদার্থই এখানে "সাধ্য" শব্দের অর্থ। যেমন কোন বাদী "আত্মা সক্রিয়ঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক হেতু ও উদাহরণাদি অবয়বের প্রয়োগ করিয়া, ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সংস্থাপন করিলে, সেখানে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মাই বাদীর "সাধ্য" বা সাধ্যধর্ম্মী। কারণ, উক্ত স্থলে হেতু প্রভৃতি অবয়বের প্রয়োগ ব্যতীত বাদী সক্রিয়ত্বরূপে আত্মার সংস্থাপন করিতে পারেন না এবং সক্রিয়ত্বরূপে আত্মার সিদ্ধি বা অনুমিতিই বাদীর ঐ সমস্ত অবয়বপ্রযুক্ত ফল। সুতরাং উক্ত স্থলে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মাই ঐ সমস্ত অবয়বের ফলসম্বন্ধরূপ "সামর্থ্য"বিশিষ্ট। ফলকথা, হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা যে পদার্থ যেরূপে সংস্থাপিত হয়, সেই পদার্থই সেইরূপে সাধ্য, ইহাই এখানে "সাধ্য" শব্দের অর্থ। বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থ সেইরূপে সিদ্ধই থাকায় উহা সাধ্য নহে। কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই দৃষ্টান্ত পদার্থকে উক্তরূপ সাধ্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর ঐ উত্তরের নাম "সাধ্যসম" প্রতিষেধ। বাদীর সমস্ত অনুমান প্রয়োগেই জিগীষু প্রতিবাদী ঐরূপ উত্তর করিতে পারেন। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্থলেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, যদি যেমন লোষ্ট, তদ্রূপ আত্মা, ইহা

হয়, তাহা হইলে যেমন আত্মা, তদ্রূপ লোষ্ট, ইহাও হউক ? অর্থাৎ হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা লোষ্টও সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য হউক ? কারণ, আত্মা হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য, লোষ্ট উহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু লোষ্টও ঐরূপে সাধ্য না হইলে তদ্দৃষ্টান্তে আত্মাও ঐরূপে সাধ্য হইতে পারে না। কারণ, সমানধর্ম্মা পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সুতরাং লোষ্টেও আত্মার ন্যায় উক্তরূপে সাধ্যত্ব ধর্ম্ম না থাকিলে উহা দৃষ্টান্ত বলা যায় না। ভাষ্যকারের মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ সাধ্য পদার্থেরই আরোপ করেন, ইহাই বুঝা যায়। উক্ত স্থলে বাদীর অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ প্রদর্শনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ লোষ্ট আত্মার ন্যায় সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য না হইলে উহা উক্ত স্থলে দৃষ্টান্তই হইতে পারে না, সুতরাং দৃষ্টান্তের অভাবে বাদীর উক্তরূপে অনুমান বা সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না, ইহাই প্রতিবাদীর চরম বক্তব্য। পূর্ব্বোক্ত "বর্ণ্যসমা" জাতি স্থলেও বাদীর দৃষ্টান্তে সন্দিগ্ধসাধ্যকত্বরূপ বর্ণ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিয়া, প্রতিবাদী দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ প্রদর্শন করেন। কিন্তু উক্ত "সাধ্যসমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থকে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মীর ন্যায় হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা সাধ্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বলেন যে, লোষ্ট যে সক্রিয়, ইহাতে হেতু কি ? উহাও আত্মার ন্যায় হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা সক্রিয়ত্বরূপে সাধন করিতে হইবে, নচেৎ উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "বর্ণ্যসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী ঐরূপ বলেন না। সুতরাং উহা হইতে এই "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতির উক্তরূপ বিশেষ আছে। উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্টের ব্যাখ্যার দ্বারাও ইহাই বুঝা যায়[১]।

কিন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ উক্ত "সাধ্যসম" প্রতিষেধের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদীর অনুমানে তাঁহার পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত পদার্থ প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী যদি তাহাতেও বাদীর সেই হেতু প্রযুক্তই সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম "সাধ্যসম"[২]। অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার দৃষ্টান্ত পদার্থে যে, তোমার সাধ্যধর্ম্ম আছে, তাহাতেও তোমার উক্ত হেতুই

১। ঘটো বা অনিত্য ইত্যত্র কো হেতুরয়মপি সাধ্যবৎ জ্ঞাপয়িতব্য ইতি সাধ্যবৎপ্রত্যবস্থানাৎ সাধ্যসমঃ।—ন্যায়বার্ত্তিক। হেত্বাদ্যবয়বযোগিত্বপ্রসঞ্জনং সাধ্যসমঃ। অতএব "উভয়সাধ্যত্বা"দিতি সাধ্যত্বং হেতুমাহ সাধ্যসমস্য সূত্রকারঃ। ভাষ্যকারোহপি "হেত্বাদ্যবয়বসামর্থ্যযোগী"তি ব্রুবাণস্তৎপ্রসঞ্জনং সাধ্যসমং মন্যতে। তদেতদ্বার্ত্তিককৃদাহ—"ঘটো বা অনিত্য ইত্যত্র কো হেতুরিতি"—তাৎপর্য্যটীকা।

উভয়োরপি সাধ্যদৃষ্টান্তয়োঃ সাধ্যত্বাপাদনেন প্রত্যবস্থানং সাধ্যসমঃ প্রতিষেধঃ। যদি যথা ঘটস্তথা শব্দঃ, প্রাপ্তং তর্হি যথা শব্দস্তথা ঘট ইতি। শব্দশ্চানিত্যতয়া সাধ্য ইতি ঘটোঽপি সাধ্য এব স্যাদন্যথাহি ন তেন তুল্যো ভবেদিতি।—ন্যায়মঞ্জরী।

২। দৃষ্টান্ত-হেতুপক্ষাণাং সিদ্ধানামপি সাধ্যবৎ।
সাধ্যতাপাদনং তস্মাল্লিঙ্গাৎ সাধ্যসমো ভবেৎ ॥১৬॥

প্রমাণান্তরসিদ্ধানামেব পক্ষহেতুদৃষ্টান্তানাং সাধ্যধর্ম্মস্যেব তত এব লিঙ্গাৎ সাধ্যত্বাপাদনং সাধ্যসমঃ। 'তস্মা-'দিতি বর্ণ্যসমতো ভেদং দর্শয়তি।—তার্কিকরক্ষা।

সাধকরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে। নচেৎ ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার ঐ হেতু তোমার পক্ষেও তোমার ঐ সাধ্যধর্ম্মের সাধক হইতে পারে না। সুতরাং তোমার ঐ দৃষ্টান্তও ঐ হেতুর দ্বারাই তোমার সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইলে, পূর্ব্বে উহা সিদ্ধ না থাকায় উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। এবং তোমার ঐ পক্ষ এবং হেতুও পূর্ব্বসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ঐ উভয়ও তোমার উক্ত হেতুর দ্বারাই সাধ্য হইতেছে। কারণ, তোমার সাধ্যধর্ম্মের ন্যায় তোমার ঐ পক্ষ বা ধর্ম্মীও উক্ত অনুমানে বিশেষ্যরূপে বিষয় হইবে এবং তোমার উক্ত হেতুও তাহাতে উক্ত পক্ষের বিশেষণরূপে বিষয় হইবে। (উদয়নাচার্য্যের মতে হেতুবিশিষ্ট পক্ষেই সাধ্যধর্ম্মের অনুমান হয়। উহারই নাম লিঙ্গোপধান মত)। সুতরাং উক্ত হেতু ও পক্ষের সিদ্ধির জন্যও উক্ত হেতুই প্রযুক্ত হওয়ায় অনুমান স্থলে সর্ব্বত্র সাধ্যধর্ম্মের ন্যায় হেতু এবং পক্ষও সাধ্য, উহাও সিদ্ধ নহে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু পূর্ব্বসিদ্ধ না হইলে কোন পদার্থ হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। উক্তরূপে বাদীর অনুমানে হেত্বসিদ্ধি ও পক্ষাসিদ্ধি বা আশ্রয়াসিদ্ধি এবং দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোক্ত "বর্ণ্যসমা" জাতিস্থলে প্রতিবাদী বাদীর সেই হেতু প্রযুক্ত উক্তরূপে বাদীর দৃষ্টান্তে এবং তাঁহার সেই হেতু ও পক্ষে সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন না। সুতরাং "বর্ণ্যসমা" জাতি হইতে এই "সাধ্যসমা" জাতির ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। উক্তরূপ ভেদ রক্ষার জন্যই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি "সাধ্যসমা" জাতির উক্তরূপই স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও উক্ত মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির সূত্রে "উভয়সাধ্যত্বাৎ" এই যে বাক্যের দ্বারা উক্ত "সাধ্যসমে"র স্বরূপ সূচিত হইয়াছে, উহাতে "উভয়" শব্দের দ্বারা সূত্রের প্রথমোক্ত সাধ্যধর্ম্মী অর্থাৎ পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত, এই উভয়ই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বরদরাজ তাঁহার ব্যাখ্যাত মতানুসারে উক্ত "উভয়সাধ্যত্বাচ্চ" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অনুমানে সাধ্যধর্ম্মই সাধ্য, এবং হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত সিদ্ধই থাকে। সুতরাং অনুমান স্থলে সিদ্ধ অংশ ও সাধ্য অংশ, এই উভয়ই থাকে। ঐ উভয়ই সূত্রে "উভয়"শব্দের দ্বারা মহর্ষির বুদ্ধিস্থ। এবং "চ" শব্দের দ্বারা প্রথমোক্ত ধর্ম্মবিকল্পের সমুচ্চয়ই মহর্ষির অভিমত। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধ ও সাধ্য, এই উভয়ের সিদ্ধসাধ্যত্বই এখানে মহর্ষির অভিমত ধর্ম্মবিকল্প। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, অনুমান স্থলে সিদ্ধ অংশ ও সাধ্য অংশ, এই উভয়ের সাধ্যত্ব প্রযুক্ত এবং ঐ উভয়ের সিদ্ধত্ব ও সাধ্যত্ব, এই ধর্ম্মবিকল্প প্রযুক্ত "সাধ্যসম" প্রতিষেধ হয়। ফল কথা, অনুমান স্থলে বাদীর সাধ্যধর্ম্মের ন্যায় হেতু প্রভৃতি সিদ্ধ পদার্থেও বাদীর সেই হেতুপ্রযুক্ত সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিলে সেখানে "সাধ্যসম" প্রতিষেধ হইবে, ইহাই সূত্রে "উভয়সাধ্যত্বাচ্চ" এই বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতানুসারেই "সাধ্যসমা" জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সূত্রোক্ত "উভয়" শব্দের দ্বারা বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়া, শেষে লিখিয়াছেন, "তদ্ধর্ম্মো হেত্বাদিঃ"। সূত্রে কিন্তু "উভয়" শব্দের পরে "ধর্ম্ম" শব্দের প্রয়োগ নাই। বৃত্তিকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদীর অনুমান প্রয়োগ দ্বারা সাধ্য পদার্থই তাঁহার অনুমানের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং বাদীর পক্ষ এবং (উদয়নাচার্য্যের মতে)

হেতুও অনুমানের বিষয় হওয়ায় ঐ উভয়েও সাধ্যত্ব স্বীকার্য্য এবং হেতু পদার্থে উক্তরূপ সাধ্যত্ব স্বীকার্য্য হইলে সেই হেতুবিশিষ্ট দৃষ্টান্তও সাধ্য, ইহা স্বীকার্য্য। উক্তরূপে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্তেও সাধ্যত্ব বা সাধ্যতুল্যতার আপত্তি প্রকাশ করিলে, সেখানে ঐ উত্তর "সাধ্যসমা" জাতি হইবে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদীর ঐ পক্ষ প্রভৃতি পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থ হইলে, উহা তাঁহার অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থে বাদীর অনুমান-প্রয়োগ-সাধ্যত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ পক্ষ প্রভৃতি পদার্থও যে বাদীর সাধ্যধর্ম্মের ন্যায় পূর্ব্বসিদ্ধ নহে, কিন্তু সাধ্য, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বাদীর উক্ত অনুমানে পক্ষাসিদ্ধি বা আশ্রয়াসিদ্ধি প্রভৃতি দোষ অনিবার্য্য। কারণ, যাহা পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থ নহে, তাহা পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, ইহা বাদীও স্বীকার করেন। বৃত্তিকার প্রভৃতির মতে সূত্রে "সাধ্যসম" এই নামে "সাধ্য" শব্দের দ্বারা সাধ্যত্ব ধর্ম্মই বিবক্ষিত। পূর্ব্বোক্তরূপ সাধ্যত্ব প্রযুক্ত সম, এই অর্থেই "সাধ্যসম" নামের প্রয়োগ হইয়াছে॥ ৪ ॥

ভাষ্য। এতেষামুত্তরং—

অনুবাদ। এই সমস্ত প্রতিষেধের অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত "উৎকর্ষসম" প্রভৃতি ষড়্‌বিধ প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র। কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যাদুপসংহার-সিদ্ধের্বৈধর্ম্ম্যা-দপ্রতিষেধঃ ॥৫॥৪৬৬॥

অনুবাদ। কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উপসংহারের সিদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ "যথা গো, তথা গবয়" ইত্যাদি উপমানবাক্য সর্ব্বসিদ্ধ থাকায় বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। **অলভ্যঃ সিদ্ধস্য নিহ্নবঃ।** সিদ্ধঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যা-দুপমানং **যথা গৌস্তথা গবয়** ইতি। তত্র ন লভ্যো গোগবয়য়োর্ধর্ম্ম-বিকল্পশ্চোদয়িতুং। এবং সাধকে ধর্ম্মে দৃষ্টান্তাদিসামর্থ্যযুক্তে ন লভ্যঃ সাধ্যদৃষ্টান্তয়োর্ধর্ম্মবিকল্পাদ্বৈধর্ম্ম্যাৎ প্রতিষেধো বক্তুমিতি।

অনুবাদ। সিদ্ধ পদার্থের নিহ্নব অর্থাৎ অপলাপ বা নিষেধ লভ্য নহে। যথা— কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ উপমানবাক্য সিদ্ধ আছে। সেই স্থলে গো এবং গবয়ের ধর্ম্মবিকল্প অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আশঙ্কা করিবার নিমিত্ত লভ্য নহে। (অর্থাৎ উক্তরূপ উপমানবাক্য প্রয়োগ করিলে গবয়ও গোর ন্যায় সাস্নাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট হউক ? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করা যায় না। কারণ, গো এবং গবয়ের কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্তই "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ উপসংহার সিদ্ধ

হয়) এইরূপ দৃষ্টান্তাদির সামর্থ্যবিশিষ্ট সাধক ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট প্রকৃত হেতু প্রযুক্ত হইলে সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্তের ধর্ম্মবিকল্পরূপ বৈধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত প্রতিষেধ বলিবার নিমিত্ত লভ্য হয় না (অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তের ধর্ম্মবিকল্পরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ করেন, তাহা হইতে পারে না। কারণ, বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তের কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য থাকিলেও অনেক বৈধর্ম্ম্যও স্বীকার্য্য)।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা "উৎকর্ষসম" প্রভৃতি যে ষড়্বিধ প্রতিষেধের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, উহার পরীক্ষা করা অর্থাৎ ঐ সমস্ত জাতি যে অসদুত্তর, তাহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করা আবশ্যক। তাই মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত ষড়্বিধ জাতির খণ্ডনে যুক্তি বলিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "বর্ণ্যসমা", "অবর্ণ্যসমা" ও "সাধ্যসমা" জাতির খণ্ডনে অপর যুক্তিবিশেষও বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এবং উদয়নাচার্য্য, বরদরাজ, বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "উৎকর্ষসম" প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিষেধের উত্তর কথিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী সূত্রদ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত ষষ্ঠ "সাধ্যসমে"র উত্তর কথিত হইয়াছে। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

বরদরাজ প্রভৃতির মতে এই সূত্রে "কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্ম বা অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্যই বিবক্ষিত। সুতরাং শেষোক্ত "বৈধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিপরীত ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিশূন্য যে কোন ধর্ম্মই বিবক্ষিত বুঝা যায়। ন্যায়সূত্রে নানা অর্থে "উপসংহার" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রে "উপসংহার" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—প্রকৃত পক্ষে প্রকৃত সাধ্যের উপসংহার অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপন। তদনুসারে এই সূত্রেও "উপসংহার" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের উপসংহারও বুঝা যায়। বরদরাজ ঐরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১]। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে "উপসংহার" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছেন[২]। অনুমানের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যাহা উপসংহৃত অর্থাৎ নিশ্চিত হয়, এই অর্থে "উপসংহার" শব্দের দ্বারা প্রকৃত সাধ্যধর্ম্মও বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে সাধর্ম্ম্য বা প্রকৃত হেতু, তৎপ্রযুক্তই প্রকৃত সাধ্যধর্ম্মের সিদ্ধি হয় অথবা তাহার উপসংহার অর্থাৎ সংস্থাপন সিদ্ধ হয়, অতএব বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিশূন্য কোন ধর্ম্ম-

১। "কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যাদ্"ব্যাপ্তাৎ সাধ্যোপসংহারে সিদ্ধে "বৈধর্ম্ম্যা"দব্যাপ্তাৎ কুতশ্চিদ্ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধো ন ভবতীত্যর্থঃ।"—তার্কিকরক্ষা।

২। "কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যাৎ" সাধর্ম্ম্যবিশেষাৎ ব্যাপ্তিসহিতাৎ, "উপসংহার-সিদ্ধেঃ" সাধ্যসিদ্ধেঃ, বৈধর্ম্ম্যাদেতদ্বিপরীতাৎ ব্যাপ্তিনিরপেক্ষাৎ সাধর্ম্ম্যমাত্রাৎ ভবতা কৃতঃ প্রতিষেধো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। অন্যথা প্রমেয়ত্বরূপাসাধকসাধর্ম্ম্যাৎ ত্বদ্বচনমপ্যসম্যক্ স্যাদিতি ভাবঃ।—বিশ্বনাথবৃত্তি।

প্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যে প্রতিষেধ করেন, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার অভিমত কোন হেতুই ঐ সমস্ত স্থলে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে, কিন্তু ব্যাপ্তিশূন্য বিপরীত ধর্ম্ম। ঐরূপ বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত কিছুই সিদ্ধ হয় না। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"বৈধর্ম্ম্যাদপ্রতিষেধঃ"।

কিন্তু এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, প্রথমোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" ও "বৈধর্ম্ম্যসমা" জাতির খণ্ডনের জন্য মহর্ষি পূর্ব্বে "গোত্বাদ্গোসিদ্ধিবত্তৎসিদ্ধিঃ" এই তৃতীয় সূত্রের দ্বারা যে যুক্তি বলিয়াছেন, তাহাই আবার এই সূত্রের দ্বারা অন্য ভাবে বলা অনাবশ্যক; পরন্তু পূর্ব্বসূত্রোক্ত "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি জাতির খণ্ডনের অনুকূল অপর বিশেষ যুক্তিও এখানে বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার অন্য ভাবে এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, সিদ্ধ পদার্থের নিহ্নব অর্থাৎ অপলাপ বা নিষেধ লভ্য নহে। অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধ পদার্থের নিষেধ একেবারেই অসম্ভব, উহা অলীক। ভাষ্যকার এই ভাব ব্যক্ত করিতেই "অশক্যঃ" এইরূপ বাক্য না বলিয়া, "অলভ্যঃ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। যাহা অলীক, তাহা নিষেধের জন্য লভ্যই হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির সূত্রানুসারে উদাহরণ দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ উপমানবাক্য সিদ্ধ আছে অর্থাৎ উহা সর্ব্বসিদ্ধ। উক্ত স্থলে গো এবং গবয়ের ধর্ম্মবিকল্প আপাদন করিবার নিমিত্ত লভ্য নহে। অর্থাৎ উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেখানে গবয়ে গোর সমস্ত ধর্ম্মের আপত্তি প্রকাশ করা যায় না। কারণ, কিঞ্চিৎ-সাধর্ম্ম্য প্রযুক্তই "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গবয়ে গোর সমস্ত ধর্ম্ম থাকে না, উহা অসম্ভব। বার্ত্তিককার ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, "যথা গো, তথা গবয়," এইরূপ বাক্য বলিলে গোর সমস্ত ধর্ম্মই গবয়ে আছে, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, বক্তার তাহাই বক্তব্য হইলে, উক্ত বাক্যে "যথা" ও "তথা" শব্দের প্রয়োগ হইত না, কিন্তু "গোপদার্থই গবয়" এইরূপই প্রয়োগ হইত। ফল কথা, ভাষ্যকার এই সূত্রের "কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যাদুপসংহারসিদ্ধেঃ" এই অংশকে পূর্ব্বোক্তরূপ দৃষ্টান্তসূচক বলিয়া সূত্রোক্ত "উপসংহার" শব্দের দ্বারা "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ উপমানবাক্যই এখানে মহর্ষির অভিমত দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে মহর্ষির মূল বক্তব্য সমর্থন করিতে পরে সূত্রের শেষোক্ত অংশের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ দৃষ্টান্তাদির সামর্থ্যবিশিষ্ট অর্থাৎ দৃষ্টান্তাদির দ্বারা যাহা সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত, এমন সাধক ধর্ম্ম (হেতু) প্রযুক্ত হইলে, সেখানে বাদীর সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্তের ধর্ম্মবিকল্প অর্থাৎ নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্মরূপ বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রতিষেধ বলিবার নিমিত্তও লভ্য নহে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত যে প্রতিষেধ করেন, তাহা করা যায় না। কারণ, দৃষ্টান্ত পদার্থ সর্ব্বাংশেই সাধ্যধর্ম্মীর সমানধর্ম্মা হয় না। যেমন "যথা গো, তথা গবয়" এই উপমানবাক্য প্রয়োগ করিলে, সেখানে গোপদার্থে গবয়ের সমস্ত ধর্ম্মের আপত্তি প্রকাশ করা যায় না, তদ্রূপ অনুমান স্থলে বাদীর সাধ্যধর্ম্মীতে তাঁহার দৃষ্টান্তগত সমস্ত ধর্ম্মের আপত্তি প্রকাশ

করা যায় না। কারণ, ঐ দৃষ্টান্ত পদার্থে যে ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু বিদ্যমান থাকে, তদ্দ্বারা সাধ্যধর্ম্মীতে সেই ব্যাপক ধর্ম্মই সিদ্ধ হয়; তদ্ভিন্ন ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। বার্ত্তিককার মহর্ষির বক্তব্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "শব্দোঽনিত্যঃ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, ঘটের সমস্ত ধর্ম্মই শব্দে আছে, ইহা বলা হয় না। কিন্তু যে পদার্থ যাহার সাধক অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম্ম, সেই পদার্থই তাহার সাধন হয়। উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষে সেই সাধন বা প্রকৃত হেতুর উপসংহার করা হয়। উক্ত স্থলে উপনয়বাক্যের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব হেতুর উপসংহার করিলে, তখন উক্ত অনুমানের দ্বারা শব্দে ঘটের ধর্ম্ম অনিত্যত্বই সিদ্ধ হয়—রূপাদি সিদ্ধ হয় না। কারণ, ঐ হেতু রূপাদি সমস্ত পদার্থের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট নহে। ফলকথা, প্রতিবাদী হেতু পদার্থের স্বরূপ না বুঝিয়াই পূর্ব্বোক্ত "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি জাতির প্রয়োগ করেন, ইহাই বার্ত্তিককারের মতে মহর্ষির মূল বক্তব্য। তাই বার্ত্তিককার এখানে প্রথমেই বলিয়াছেন,—"ন হেত্বর্থাপরিজ্ঞানাদিতি সূত্রার্থঃ"। মূল কথা, পূর্ব্বসূত্রোক্ত "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি ষড়্বিধ জাতিই অসদুত্তর। কারণ, ঐ সমস্ত জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষকে তাঁহার দৃষ্টান্তের সর্ব্বাংশে সমানধর্ম্মা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না এবং তাঁহার সাধ্য বা আপাদ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তিশূন্য কোন ধর্ম্মকে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুই প্রকৃত হেতু। উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষে উক্তরূপ প্রকৃত হেতুরই উপসংহার হয়। সুতরাং তাহার ফলে সাধ্যধর্ম্মীতে সেই হেতুর ব্যাপক সাধ্যধর্ম্মই সিদ্ধ হইয়া থাকে। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে উপনয়সূত্রে যদ্দ্বারা সাধ্যধর্ম্মীতে প্রকৃত হেতুর উপসংহার হয়, এই অর্থে উপনয়বাক্যকেও "উপসংহার" বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৭২—৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকার এই সূত্রে 'উপসংহার" শব্দের দ্বারা উপমানবাক্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহাকে সিদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জয়ন্ত ভট্টের ব্যাখ্যার দ্বারাও ভাষ্যকারের ঐ তাৎপর্য্য বুঝা যায়[১]। পূর্ব্বোক্ত উপমানবাক্যেও "তথা" শব্দের দ্বারা সমান ধর্ম্মের উপসংহার হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপমান পরীক্ষায় "তথেত্যুপসংহারাৎ" (২।১।৪৮) ইত্যাদি সূত্রে মহর্ষি নিজেও তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং উক্তরূপ তাৎপর্য্যে (যদ্দ্বারা সমান ধর্ম্মের উপসংহার হয়, এই অর্থে) এই সূত্রে "উপসংহার" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত উপমানবাক্যও বুঝা যাইতে পারে॥ ৫॥

সূত্র। সাধ্যাতিদেশাচ্চ দৃষ্টান্তোপপত্তেঃ ॥৬॥৪৬৭॥

অনুবাদ। এবং সাধ্যধর্ম্মীর অতিদেশপ্রযুক্ত দৃষ্টান্তের উপপত্তি হওয়ায় প্রতিষেধ হয় না।

১। কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যাদুপসংহারঃ সিধ্যতি, "যথা গৌরেবং গবয়" ইতি।—ন্যায়মঞ্জরী।

ভাষ্য। যত্র লৌকিক-পরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং, তেনাবিপরীতো-হর্থোঽতিদিশ্যতে প্রজ্ঞাপনার্থং। এবং সাধ্যাতিদেশাদ্দৃষ্টান্ত উপপদ্যমানে সাধ্যত্বমনুপপন্নমিতি।

অনুবাদ। যে পদার্থে লৌকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির সাম্য আছে, অর্থাৎ যাহা বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই সম্মত প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ, সেই (দৃষ্টান্ত) পদার্থদ্বারা প্রজ্ঞাপনার্থ অর্থাৎ অপরকে বুঝাইবার জন্য অবিপরীত পদার্থ (সাধ্যধর্ম্মী) অতিদিষ্ট হয় অর্থাৎ সিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার অবিপরীত ভাবে সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষে সেই দৃষ্টান্তগত ধর্ম্ম কথিত বা সমর্থিত হয়। এইরূপ সাধ্যাতিদেশপ্রযুক্ত দৃষ্টান্ত উপপদ্যমান হওয়ায় (তাহাতে) সাধ্যত্ব উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। জয়ন্ত ভট্টের মতে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "সাধ্যসম" নামক প্রতিষেধেরই উত্তর কথিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত "সাধ্যসম" প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থে যে সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, এই সূত্রের দ্বারা সেই সাধ্যত্বের খণ্ডনপূর্ব্বক উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করা হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও সরলভাবে বুঝা যায়। কিন্তু ইহার দ্বারা দৃষ্টান্ত পদার্থ যে, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই নিশ্চিত সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট এবং বাদীর সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ উহার বিপরীত অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যক, ইহাও সমর্থিত হওয়ায় ফলতঃ এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "বর্ণ্যসমা" ও "অবর্ণ্যসমা" জাতিরও খণ্ডন হইয়াছে, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থ নিশ্চিতসাধ্যক বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে, প্রতিবাদী তাহাতে বর্ণ্যত্ব অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যকত্বের আপত্তি সমর্থন করিতে পারেন না এবং বাদীর সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ সন্দিগ্ধসাধ্যক বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে তাহাতে অবর্ণ্যত্ব অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যকত্বেরও আপত্তি সমর্থন করিতে পারেন না। এই জন্যই বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এখানে বলিয়াছেন যে, এই সূত্র দ্বারা মহর্ষি "বর্ণ্যসমা", "অবর্ণ্যসমা" ও "সাধ্যসমা" জাতির খণ্ডনার্থ অপর যুক্তিবিশেষ বলিয়াছেন।

সূত্রশেষে পূর্ব্বসূত্রের শেষোক্ত "অপ্রতিষেধঃ" এই পদের অনুবৃত্তি করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। সূত্রের প্রথমোক্ত "সাধ্য" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ। ঐ সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষে দৃষ্টান্ত দ্বারা অবিপরীতভাবে অর্থাৎ উহার তুল্যভাবে সাধ্যধর্ম্মের সমর্থনই এখানে ভাষ্যকারের মতে "সাধ্যাতিদেশ"। তাই ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থে লৌকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির সাম্য আছে অর্থাৎ মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে "লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ" (১।২৫) এই সূত্র দ্বারা যেরূপ পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা উহার অবিপরীত পদার্থ অর্থাৎ উহার অবিপরীত ভাবে (তুল্যভাবে) সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ অতিদিষ্ট হয়। উক্তরূপ "সাধ্যাতিদেশ"প্রযুক্ত দৃষ্টান্তের উপপত্তি হওয়ায় তাহাতে সাধ্যত্বের উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ যাহা দৃষ্টান্ত, তাহা কখনই সাধ্য হইতে পারে না। সুতরাং তাহাতে সাধ্যত্বের

আপত্তি করা যায় না। জয়ন্ত ভট্টের ব্যাখ্যার দ্বারাও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়[১]। ফলকথা, "লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মত প্রমাণসিদ্ধ পদার্থকেই দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ২২০।২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অনুমান স্থলে বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত পদার্থে তাঁহার সাধ্যধর্ম্ম নিশ্চিত অর্থাৎ বাদীর ন্যায় প্রতিবাদীরও উহা স্বীকৃত, ইহা স্বীকার্য্য, নচেৎ উহা দৃষ্টান্তই হয় না। পূর্ব্বোক্ত "আত্মা সক্রিয়ঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে বাদী লোষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা অবিপরীত ভাবে অর্থাৎ যথা লোষ্ট, তথা আত্মা, এই প্রকারে এবং "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে ঘট দৃষ্টান্ত দ্বারা "যথা ঘট, তথা শব্দ" এই প্রকারে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ আত্মা ও শব্দকে অতিদেশ করেন অর্থাৎ উহাতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্ম সক্রিয়ত্ব ও অনিত্যত্বের সমর্থন করেন। সিদ্ধ পদার্থের দ্বারাই অসিদ্ধ পদার্থের ঐরূপ অতিদেশ হয়। অসিদ্ধ পদার্থের দ্বারা ঐরূপ অতিদেশ হয় না, হইতেই পারে না। সুতরাং উক্তরূপ অতিদেশপ্রযুক্ত প্রতিপন্ন হয় যে, বাদীর ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত পদার্থ নিশ্চিত-সাধ্যক বলিয়া সর্ব্বসম্মত। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "আত্মা সক্রিয়ঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে লোষ্ট যে সক্রিয়, এবং "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে ঘট যে অনিত্য, ইহা প্রতিবাদীরও স্বীকৃত। এবং উক্ত স্থলে বাদীর সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ যে আত্মা ও শব্দ, তাহা অসিদ্ধ অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যক, ইহাও প্রতিবাদীর স্বীকৃত। সুতরাং প্রতিবাদী আর উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তকে "বর্ণ্য" অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যক বলিয়া এবং হেতু প্রভৃতি অবয়ব দ্বারা সাধ্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করিতে পারেন না এবং বাদীর সাধ্যধর্ম্মী আত্মা ও শব্দ প্রভৃতিকে বাদীর দৃষ্টান্তের ন্যায় "অবর্ণ্য" অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যক বলিয়াও আপত্তি প্রকাশ করিতে পারেন না। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন[২] যে, যে পদার্থপ্রযুক্ত অন্যত্র অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্ম অতিদিষ্ট হয়, তাহা দৃষ্টান্ত। সিদ্ধ পদার্থ দ্বারাই অসিদ্ধ পদার্থের অতিদেশ হইয়া থাকে। সুতরাং দৃষ্টান্ত সিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু পক্ষ সাধ্য পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত, এই উভয় পদার্থই সিদ্ধ অথবা সাধ্য পদার্থ হইলে দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকভাবের ব্যাঘাত হয়। অর্থাৎ যে পদার্থের দৃষ্টান্ত কথিত হয়, তাহার নাম দার্ষ্টান্তিক। যেমন পূর্ব্বোক্ত "আত্মা সক্রিয়ঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে আত্মা দার্ষ্টান্তিক, লোষ্ট উহার দৃষ্টান্ত। "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে শব্দ দার্ষ্টান্তিক, ঘট উহার দৃষ্টান্ত। উক্ত স্থলে আত্মা সক্রিয়ত্বরূপে এবং শব্দ অনিত্যত্ব-রূপে সাধ্য পদার্থ, এ জন্য উহা দার্ষ্টান্তিক। এবং লোষ্ট সক্রিয়ত্বরূপে এবং ঘট অনিত্যত্বরূপে

১। "লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ,—তেনাবিপরীততয়া শব্দোঽতিদিশ্যতে,—যথা ঘটঃ প্রযত্নানন্তরীয়কঃ সন্ননিত্যঃ এবং শব্দোঽপীতি" ইত্যাদি।—ন্যায়মঞ্জরী।

২। যতঃ সাধ্যধর্ম্মোঽন্যত্রাতিদিশ্যতে স দৃষ্টান্তঃ। সিদ্ধেন চাতিদেশো ভবত্যসিদ্ধস্যেতি ন্যায়াৎ সিদ্ধো দৃষ্টান্তঃ। পক্ষস্তু সাধ্যোঽঙ্গীকার্য্যঃ। উভয়োরপি সিদ্ধত্বে সাধ্যত্বে বা দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাবব্যাঘাত ইতি।—তার্কিকরক্ষা। যতো যস্মাদ্দৃষ্টান্তাদন্যত্র সাধ্যধর্ম্মিণি, অতিদিশ্যতে যথা ঘটস্তথা শব্দোঽপীতি প্রতিপাদ্যতে। "উভয়োরপি সিদ্ধত্বে" ইত্যবর্ণ্যসময়োত্তরং। "সাধ্যত্বে" বেতি বর্ণ্যসাধ্যসময়োরুত্তরমিতি বিভাগঃ।—লঘুদীপিকা টীকা।

সিদ্ধ পদার্থ, এ জন্য উক্ত স্থলে উহা দৃষ্টান্ত। উক্ত স্থলে লোষ্ট ও ঘট ঐরূপে সিদ্ধ পদার্থ না হইলে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না এবং আত্মা ও শব্দ ঐরূপে সাধ্য না হইয়া সিদ্ধ হইলে, উহা দার্ষ্টান্তিক হইতে পারে না। বরদরাজের ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত "সাধ্য" শব্দের অর্থ সাধ্যধর্ম্ম এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষে ঐ সাধ্যধর্ম্মের অতিদেশই সূত্রোক্ত "সাধ্যাতিদেশ", ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার উক্ত ব্যাখ্যানুসারেও তাঁহার পূর্ব্বকথিত বাদীর হেতু পদার্থে সাধ্যত্বের খণ্ডন বুঝা যায় না এবং মহর্ষির এই সূত্র দ্বারাও তাহা বুঝা যায় না।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ কষ্টকল্পনা করিয়া, সূত্রোক্ত "দৃষ্টান্ত" শব্দ দ্বারা দৃষ্টান্তের ন্যায় পক্ষও ব্যাখ্যা করিয়া, দৃষ্টান্ত ও পক্ষ উভয়েই প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার ঐরূপ ব্যাখ্যা প্রয়াসের কোন প্রয়োজন বুঝা যায় না এবং উহা প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা বলিয়াও মনে হয় না। সে যাহা হউক, মূল কথা, পূর্ব্বোক্ত "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি ষড়্‌বিধ জাতিও যে অসদুত্তর, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, প্রতিবাদী অনুমানের পক্ষ ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির সর্ব্বসিদ্ধ লক্ষণ এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যুক্তির অপলাপ করিয়া নিজের কল্পিত ঐ সমস্ত যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত-রূপ ঐ সমস্ত আপত্তি প্রকাশ করিয়া, বাদীর অনুমানে ঐ সমস্ত অসত্য দোষের উদ্ভাবন করিলে, তিনি বাদীর হেতু প্রভৃতি অথবা বাক্যের অসাধকত্ব সাধন করিতে যে অনুমান প্রয়োগ করিবেন, তাহাতেও তুল্যভাবে ঐরূপ সমস্ত আপত্তি প্রকাশ করা যায়;—তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন না। সুতরাং তুল্যভাবে তাঁহার নিজের অনুমানও খণ্ডিত হওয়ায় তাঁহার ঐ সমস্ত উত্তরই স্বব্যাঘাতকত্ববশতঃ অসদুত্তর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্তরূপে স্বব্যাঘাতকত্বই "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি ষড়্‌বিধ জাতির সাধারণ দুষ্টত্বমূল। যুক্তাঙ্গহীনত্ব এবং অযুক্ত অঙ্গের স্বীকার প্রভৃতি যথাসম্ভব অসাধারণ দুষ্টত্বমূল। মহর্ষি দুই সূত্রের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি ষড়্‌বিধ জাতির সপ্তম অঙ্গ ঐ "মূল" সূচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৬ ॥

উৎকর্ষসমাদিজাতিষট্‌কপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

সূত্র। প্রাপ্য সাধ্যমপ্রাপ্য বা হেতোঃ প্রাপ্ত্যা-ঽবিশিষ্টত্বাদপ্রাপ্ত্যাঽসাধকত্বাচ্চ প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিসমৌ ॥ ৭॥৪৬৮॥

অনুবাদ। সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া হেতুর সাধকত্ব, অথবা প্রাপ্ত না হইয়া সাধকত্ব, প্রাপ্তিপ্রযুক্ত (হেতু ও সাধ্যের) অবিশিষ্টত্ববশতঃ (৯) প্রাপ্তিসম এবং অপ্রাপ্তি-প্রযুক্ত (হেতুর) অসাধকত্ববশতঃ (১০) অপ্রাপ্তিসম প্রতিষেধ হয়। (অর্থাৎ বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) আছে, এই পক্ষে ঐ উভয়েরই বিদ্যমানতা

স্বীকার্য্য। নচেৎ ঐ উভয়ের সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কিন্তু তাহা হইলে ঐ উভয়ের বিদ্যমানতারূপ অবিশেষবশতঃ সাধ্যসাধকভাব হইতে পারে না। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের "প্রাপ্তি"প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান করিলে, তাহাকে বলে "প্রাপ্তিসম"। এবং হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের "প্রাপ্তি" অর্থাৎ কোন সম্বন্ধ নাই—এই পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদী যদি বলেন যে, উক্ত পক্ষেও ঐ হেতু ঐ সাধ্যধর্ম্মের সাধক হইতেই পারে না, তাহা হইলে অপ্রাপ্তিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর ঐ প্রত্যবস্থানকে বলে অপ্রাপ্তিসম।)

ভাষ্য। হেতুঃ প্রাপ্য বা সাধ্যং সাধয়েদপ্রাপ্য বা, ন তাবৎ প্রাপ্য, প্রাপ্ত্যামবিশিষ্টত্বাদসাধকঃ। দ্বয়োর্ব্বিদ্যমানয়োঃ প্রাপ্তৌ সত্যাং কিং কস্য সাধকং সাধ্যং বা।

অপ্রাপ্য সাধকং ন ভবতি, নাপ্রাপ্তঃ প্রদীপঃ প্রকাশয়তীতি। প্রাপ্ত্যা প্রত্যবস্থানং **প্রাপ্তিসমঃ**। অপ্রাপ্ত্যা প্রত্যবস্থানম**প্রাপ্তিসমঃ**।

অনুবাদ। হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিবে অথবা প্রাপ্ত না হইয়া সাধন করিবে। (কিন্তু) প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিতে পারে না। (কারণ) প্রাপ্তি থাকিলে অর্থাৎ হেতুর সহিত সাধ্যের সম্বন্ধ থাকিলে অবিশিষ্টতাবশতঃ (ঐ হেতু) সাধক হয় না। (তাৎপর্য্য) বিদ্যমান উভয় পদার্থেরই প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) থাকায় কে কাহার সাধক অথবা সাধ্য হইবে।

সাধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াও সাধক হয় না, (যেমন) অপ্রাপ্ত প্রদীপ প্রকাশ করে না অর্থাৎ প্রদীপ যে ঘটাদিদ্রব্যকে প্রকাশ করে, উহাকে প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ উহার সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত উহা প্রকাশ করিতে পারে না। প্রাপ্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (৯) প্রাপ্তিসম। অপ্রাপ্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১০) অপ্রাপ্তিসম।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা (৯) প্রাপ্তিসম ও (১০) অপ্রাপ্তিসম নামক প্রতিষেধ-দ্বয়ের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। একই স্থলে এই উভয় প্রতিষেধ প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ "প্রাপ্তিসম" প্রতিষেধের প্রয়োগ হইলে, সেখানে অন্য পক্ষে "অপ্রাপ্তিসম" প্রতিষেধেরও প্রয়োগ হয়। এ জন্য এই উভয় প্রতিষেধকে বলা হইয়াছে—"যুগনদ্ধবাহী"। তাই মহর্ষি এক সূত্রেই উক্ত উভয় প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রে "হেতোঃ" এই পদের পরে "সাধকত্বং" এই পদের অধ্যাহার করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে[১]। অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইয়া হেতুর সাধকত্ব অথবা প্রাপ্ত না

১। হেতোঃ সাধকত্বমিতি শেষঃ।—তার্কিকরক্ষা। "হেতো"রিতি সাধকত্বমিতি শেষঃ॥—বিশ্বনাথবৃত্তি।

হইয়া সাধকত্ব, ইহাই মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও সূত্রের ঐ প্রথম অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিবে অথবা প্রাপ্ত না হইয়া সাধন করিবে। সূত্রে "সাধ্য"শব্দের অর্থ এখানে সাধ্যধর্ম্ম অর্থাৎ অনুমেয় ধর্ম্ম। "প্রাপ্তি" শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। তাহা হইলে সূত্রের ঐ প্রথম অংশের দ্বারা বুঝা যায় যে, যে সাধ্যধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য যে হেতুর প্রয়োগ করা হয়, ঐ হেতু ঐ সাধ্যধর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ অথবা অসম্বদ্ধ, ইহার কোন এক পক্ষই বলিতে হইবে। কারণ, উহা ভিন্ন তৃতীয় আর কোন পক্ষ নাই। কিন্তু বাদী কোন অনুমান প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার ঐ হেতু তোমার সাধ্যধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইয়া উহার সাধন করিতে পারে না। কারণ, ঐ হেতুর সহিত সাধ্যধর্ম্মের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকিলে ঐ হেতুর ন্যায় ঐ সাধ্যধর্ম্মও বিদ্যমান আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, উভয় পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কিন্তু যদি হেতুর ন্যায় সাধ্যধর্ম্মও পক্ষে বিদ্যমান আছে, ইহাই পূর্ব্বেই নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে উহার অনুমান ব্যর্থ। আর উহা পূর্ব্বে নিশ্চিত না হইলেও হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের বিদ্যমানতা যখন স্বীকার্য্য, তখন ঐ বিদ্যমানতারূপ অবিশেষবশতঃ উহার মধ্যে কে কাহার সাধক বা সাধ্য হইবে? ঐ সাধ্যধর্ম্মও ঐ হেতুর সাধক কেন হয় না? ফলকথা, অবিশিষ্ট পদার্থদ্বয়ের সাধ্য-সাধক-ভাব হইতে পারে না। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের "প্রাপ্তি" পক্ষ গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করিলে, তাহার নাম "প্রাপ্তিসম" প্রতিষেধ। সূত্রে "প্রাপ্যাহ-বিশিষ্টত্বাৎ" এই বাক্যের দ্বারা মহর্ষি প্রথমে উহার লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। এইরূপ হেতু সাধ্যধর্ম্মকে প্রাপ্ত না হইয়াই সাধক হয়, এই পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে ত উহা সাধক হইতেই পারে না। কারণ, ঐ হেতুর সহিত যাহার কোন সম্বন্ধই নাই, তাহার সাধক উহা কিরূপে হইবে? তাহা হইলে ঐ হেতু ঐ সাধ্যধর্ম্মের ন্যায় উহার অভাবেরও সাধক হইতে পারে। তাহা স্বীকার করিলে আর উহাকে ঐ সাধ্যের সাধক বলা যাইবে না। প্রতিবাদী এইরূপ বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের "অপ্রাপ্তি" পক্ষে তৎপ্রযুক্ত উক্তরূপে প্রত্যবস্থান করিলে তাহার নাম "অপ্রাপ্তিসম" প্রতিষেধ। সূত্রে "অপ্রাপ্যাহসাধকত্বাচ্চ এই বাক্যের দ্বারা মহর্ষি পরে ইহার লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন।

হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের প্রাপ্তিপক্ষে তৎপ্রযুক্ত ঐ উভয়ের বিদ্যমানতাই অবিশেষ, ইহা এখানে বার্ত্তিককারও বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের "দ্বয়োর্ব্বিদ্যমানয়োঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারাও তাঁহারও উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় এখানে বলিয়াছেন যে, যাহা অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থ, তাহাই সাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা হেতুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহা হেতুর ন্যায় বিদ্যমান পদার্থ হওয়ায় সাধ্য হইতে পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার পরে নিজে ইহাও বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের সহিত যাহার প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ হয়, তাহার সহিত সেই পদার্থের অভেদই হয়। যেমন সাগরপ্রাপ্ত গঙ্গার সহিত তখন সাগরের অভেদই হয়। সুতরাং হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের প্রাপ্তি স্বীকার করিলে গঙ্গা-সাগরের ন্যায় ঐ

উভয়ের অভেদই স্বীকার্য্য হওয়ায় কে কাহার সাধ্য ও সাধন হইবে? অভিন্ন পদার্থের সাধ্যসাধন-ভাব হইতে পারে না। কিন্তু হেতু ও সাধ্যের প্রাপ্তি স্বীকার করিলে উহা গঙ্গাসাগরের ন্যায় প্রাপ্তি নহে। সুতরাং তৎপ্রযুক্ত ঐ উভয়ের অভেদ হইতে পারে না। সাগরপ্রাপ্ত গঙ্গারও সাগরের সহিত তত্ত্বতঃ অভেদ হয় না। ভেদ অবিনাশী পদার্থ। অবশ্য জাতিবাদী বাদিনিরাসের জন্য ঐরূপও বলিতে পারেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। সূত্রে মহর্ষিও "প্রাপ্ত্যাঽভেদাৎ" এইরূপ স্বল্লাক্ষর বাক্য প্রয়োগ কেন করেন নাই? ইহাও চিন্তা করিতে হইবে।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হেতু জ্ঞান সাধ্যধর্ম্মের জ্ঞাপক, সাধ্যধর্ম্ম উহার জ্ঞাপ্য। কিন্তু ঐ উভয়ের সম্বন্ধ স্বীকার্য্য হইলে সংযোগাদি সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধই স্বীকার্য্য। অর্থাৎ হেতুজ্ঞানের সহিত সাধ্যধর্ম্মের বিষয়তা সম্বন্ধ আছে। তাহা হইলে সেই হেতুজ্ঞানে হেতুর ন্যায় সাধ্যধর্ম্মও বিষয় হওয়ায় উহাও হেতুর ন্যায় পূর্ব্বজ্ঞাত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং পূর্ব্বজ্ঞাতত্ব-বশতঃ ঐ উভয়েরই অবিশেষ হওয়ায় কে কাহার জ্ঞাপ্য ও জ্ঞাপক হইবে? অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্ম পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইলেই উহা পরে হেতুজ্ঞানের জ্ঞাপ্য হইতে পারে না। সুতরাং হেতুজ্ঞানও উহার জ্ঞাপক হইতে পারে না। প্রতিবাদী হেতু ও সাধ্যের প্রাপ্তিপক্ষে উক্তরূপ দোষোদ্ভাবন করিলে "প্রাপ্তিসম" প্রতিষেধ হয়[১]। বরদরাজ "কৃতি" অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি এবং "জ্ঞপ্তি" এই উভয় পক্ষেই উক্ত দ্বিবিধ জাতির বিশদ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, হেতু বা হেতুজ্ঞান, উহার কার্য্য অনুমিতিরূপ জ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন করে অথবা প্রাপ্ত না হইয়া উৎপন্ন করে। প্রথম পক্ষে অনুমিতিরূপ কার্য্যের সহিত উহার হেতু বা কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধবশতঃ ঐ কারণের ন্যায় তাহার কার্য্য অনুমিতিও পূর্ব্বেই বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। নচেৎ ঐ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবই হয় না। কিন্তু তাহা হইলে অনুমান ব্যর্থ এবং ঐ হেতু সেই পূর্ব্বসিদ্ধ অনুমানরূপ কার্য্যের কারণও হইতে পারে না। এইরূপে কৃতি পক্ষে প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রত্যবস্থান "প্রাপ্তিসম" প্রতিষেধ হয়, এবং উক্ত কারণ ও কার্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই, এই পক্ষে পূর্ব্ববৎ "অপ্রাপ্তিসম" প্রতিষেধও হয়। সুতরাং এই সূত্রে "হেতু" শব্দের দ্বারা কারক অর্থাৎ জনক হেতু এবং জ্ঞাপক হেতু, এই দ্বিবিধ হেতুই বিবক্ষিত এবং "সাধ্য" শব্দের দ্বারাও কার্য্য ও জ্ঞাপ্য, এই উভয়ই বিবক্ষিত, ইহা বুঝিতে হইবে। মহর্ষির পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। সেখানে বার্ত্তিককারও ইহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে বাদীর হেতু যে হেতুই হয় না, ইহা সমর্থন করিয়া, বাদীর হেতুর অসিদ্ধি-দোষের উদ্ভাবনাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য বুঝা যায়। কিন্তু বরদরাজ বলিয়াছেন যে, উক্ত জাতিদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে বাদীর হেতুতে বিশেষণের অসিদ্ধিই প্রতিবাদীর

১। প্রাপ্য সাধ্যং সাধয়তি হেতুশ্চেৎ প্রাপ্তিকর্ম্মণঃ।
সাধ্যস্য পূর্ব্বং সিদ্ধিঃ স্যাদিতি প্রাপ্তিসমোদয়ঃ।

কৃতি-জ্ঞপ্তিসাধারণীয়ং জাতিঃ। তত্রশ্চ সাধ্যং কার্য্যং জ্ঞাপ্যঞ্চ। তত্র কার্য্যমনুমিতিজ্ঞানং জ্ঞাপ্যমনুমেয়ং। হেতুশ্চ লিঙ্গং তজ্জ্ঞানং বা। প্রাপ্তিঃ সংযোগাদির্বিষয়বিষয়িভাবশ্চ। সিদ্ধিঃ সত্ত্বং জ্ঞাতত্বঞ্চ ইত্যাদি।—তার্কিকরক্ষা।

আরোপ্য। সুতরাং উক্ত স্থলে হেতুতে বিশেষণাসিদ্ধিদোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ উক্ত জাতিদ্বয়কে বলিয়াছেন,—"প্রতিকূলতর্কদেশনাভাস"। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত জাতিদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে উক্তরূপে প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন করিয়াই বাদীর প্রযুক্ত হেতুর অসাধকত্ব সমর্থন করেন। কিন্তু উহা প্রকৃত প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন নহে। তাই উক্ত জাতিদ্বয়কে বলা হইয়াছে,—"প্রতিকূলতর্কদেশনাভাস"। "দেশনা" শব্দের অর্থ এখানে উদ্ভাবন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত "প্রাপ্তিসমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের অপ্রাপ্তির পক্ষেও যখন পূর্ব্বোক্ত দোষ প্রদর্শন করেন, তখন তিনি ঐ স্থলে "অপ্রাপ্তি-সমা" জাতিরও অবশ্য প্রয়োগ করেন, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে আর মহর্ষি "অপ্রাপ্তিসমা" জাতির পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন? উক্ত স্থলে "প্রাপ্তিসমা" অথবা "অপ্রাপ্তিসমা" নামে একই জাতি বলাই উচিত। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "প্রাপ্তিসমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে সর্ব্বত্র "অপ্রাপ্তিসমা" জাতির প্রয়োগ হইলেও উভয় পক্ষে দোষ প্রদর্শনে যে বিশেষ আছে, তৎপ্রযুক্ত ঐ জাতিদ্বয়ের ভেদবিবক্ষাবশতঃই মহর্ষি ঐরূপ জাতিদ্বয়ের পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, ইহার যে কোন এক পক্ষ-মাত্রে উক্তরূপ দোষ প্রদর্শন করিলেও সেখানেও ত তাঁহার জাত্যুত্তরই হইবে। সুতরাং "প্রাপ্তিসমা" ও "অপ্রাপ্তিসমা" নামে পৃথক্ জাতির নির্দ্দেশ কর্ত্তব্য। উদ্দ্যোতকর পরে উক্ত জাতিদ্বয় উদাহরণের সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত না হওয়ায় জাতির সামান্য লক্ষণাক্রান্তই হয় না, অতএব উহা জাতিই নহে, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যব-স্থানং জাতিঃ" (১।২।১৮) এই সূত্রের অর্থ না বুঝিয়াই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করা হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত সূত্রে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সাধর্ম্ম্যই বিবক্ষিত নহে, যে কোন পদার্থের সহিত সাধর্ম্ম্যই বিবক্ষিত। উক্ত জাতিদ্বয়ও যে কোন সাধ্যধর্ম্ম অথবা যে কোন হেতুর সহিত সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত জাতির সামান্য লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে॥ ৭॥

ভাষ্য। অনয়োরুত্তরং—

অনুবাদ। এই "প্রাপ্তিসম" ও "অপ্রাপ্তিসম" প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র। ঘটাদিনিষ্পত্তিদর্শনাৎ পীড়নে চাভিচারা-দপ্রতিষেধঃ ॥৮॥৪৬৯॥

অনুবাদ। ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি দর্শনপ্রযুক্ত এবং অভিচারজন্য পীড়ন হওয়ায় অর্থাৎ শত্রু মারণার্থ অভিচারক্রিয়া-জন্য দূরস্থ শত্রুরও পীড়ন হওয়ায় (পূর্ব্বোক্ত) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। উভয়থা খল্বযুক্তঃ প্রতিষেধঃ। কর্তৃ-করণাধিকরণানি প্রাপ্য মৃদং ঘটাদিকার্য্যং নিষ্পাদয়ন্তি। অভিচারাচ্চ পীড়নে সতি দৃষ্টমপ্রাপ্য সাধকত্বমিতি।

অনুবাদ। উভয় প্রকারেই প্রতিষেধ অযুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে হেতু ও সাধ্য-ধর্ম্মের প্রাপ্তি পক্ষে এবং অপ্রাপ্তিপক্ষে যে প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে, তাহা অযুক্ত। (কারণ) কর্ত্তা, করণ ও অধিকরণ মৃত্তিকাকে প্রাপ্ত হইয়া ঘটাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করে এবং "অভিচার" অর্থাৎ শ্যেনাদি যাগজন্য (দূরস্থ শত্রুর) পীড়ন হওয়ায় (শত্রুকে) প্রাপ্ত না হইয়াও সাধকত্ব অর্থাৎ ঐ অভিচারক্রিয়ার পীড়নজনকত্ব দৃষ্ট হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "প্রাপ্তিসম" ও "অপ্রাপ্তিসম" নামক প্রতিষেধদ্বয়ের উত্তর বলিতে অর্থাৎ অসদুত্তরত্ব সমর্থন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ অযুক্ত। অর্থাৎ হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়াই সাধক হয় অথবা সাধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াই সাধক হয়, এই উভয় পক্ষেই যে প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কেন বলা যায় না? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন,—"ঘটাদিনিষ্পত্তিদর্শনাৎ"। ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মৃত্তিকা হইতে যে ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, উহার কর্ত্তা কুম্ভকার এবং করণ দণ্ডাদি এবং অধিকরণ ভূতলাদি ঐ মৃত্তিকাকে প্রাপ্ত হইয়াই ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন করে। বার্ত্তিককার ইহার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঘটাদির কারণ দণ্ডাদি মৃৎপিণ্ডকে প্রাপ্ত হইলেও ঘটাদির সহিত দণ্ডাদির অবিশেষ হয় না এবং উহাদিগের কার্য্যকারণভাবের নিবৃত্তিও হয় না। যদি বল, ঘটোৎপত্তি স্থলে মৃত্তিকা ত সাধ্য অর্থাৎ দণ্ডাদির কার্য্য নহে, ঘটই সাধ্য। কিন্তু ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঐ ঘট বিদ্যমান না থাকায় উহার সহিত দণ্ডাদি কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ সম্ভবই হয় না। সুতরাং অবিদ্যমান পদার্থের সাধন হইতে পারে না। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, দণ্ডাদির দ্বারা মৃৎপিণ্ডকে ঘট করা হয়। অর্থাৎ মৃত্তিকার অবয়বসমূহ পূর্ব্ব আকার ধ্বংসের পরে অন্য আকার প্রাপ্ত হয়। সেই অন্য আকার হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ঘটোৎপত্তি স্থলে বিদ্যমান মৃৎপিণ্ডেই উহার কর্ত্তা প্রভৃতি সাধনের ব্যাপার হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সমস্ত সাধনকে বিদ্যমান পদার্থের সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়া, বিদ্যমান মৃৎপিণ্ডের সহিত দণ্ডাদি সাধনের প্রাপ্তি সত্ত্বেও যে উহাদিগের অবিশেষ হয় না, এবং উহাদিগের কার্য্যকারণ ভাবেরও নিবৃত্তি হয় না, ইহাই সূত্রে প্রথমে উক্ত বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ মহর্ষি ঐ দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঘটাদির উৎপত্তি স্থলে উক্তরূপ কার্য্যকারণ-ভাব লোকসিদ্ধ, উহার অপলাপ করা যায় না। সুতরাং কার্য্য ও কারণের ন্যায় অনুমান স্থলে সাধ্য ও সাধনের প্রাপ্তি পক্ষেও সাধ্য-সাধনভাব স্বীকার্য্য। এইরূপ হেতু ও সাধ্যের অপ্রাপ্তি পক্ষেও উক্তরূপ প্রতিষেধ হইতে পারে না। মহর্ষি ইহা বুঝাইতে দৃষ্টান্তরূপে পরে বলিয়াছেন,—"পীড়নে চাভিচারাৎ"। তাৎপর্য্য এই যে, "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" ইত্যাদি

বৈদিক বিধিবাক্যানুসারে শত্রু মারণার্থ শ্যেনাদি যাগরূপ "অভিচার"ক্রিয়া করিলে, উহা দূরস্থ শত্রুকে প্রাপ্ত না হইয়াও তাহার পীড়ন জন্মায়। অর্থাৎ ঐ স্থলে সেই শত্রুর সহিত ঐ অভিচার ক্রিয়ার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও উহা যে, ঐ শত্রুর পীড়নের কারণ হয়, ইহা বেদসিদ্ধ। সুতরাং উক্ত কার্য্য-কারণ ভাবের অপলাপ করা যায় না। সুতরাং অনেক স্থলে যে কার্য্য ও কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কার্য্য-কারণ ভাব আছে, ইহাও উক্ত দৃষ্টান্তে স্বীকার্য্য। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তে অনুমান স্থলেও সাধ্য ও হেতুর প্রাপ্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও সাধ্য-সাধন ভাব আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। ফলকথা, কারণের ন্যায় অনুমানের সাধন অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের জ্ঞাপক হেতু ও কোন স্থলে সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া এবং কোন স্থলে সাধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াও সাধক হয়, ইহা উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত "প্রাপ্তিসম" ও "অপ্রাপ্তিসম" প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। আর প্রতিবাদী যদি উহা স্বীকার না করেন, অর্থাৎ তিনি যদি লোকসিদ্ধ ও বেদসিদ্ধ কার্য্য-কারণ-ভাবের অপলাপ করিয়া, বাদীর হেতুতে পূর্ব্বোক্তরূপে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ দূষণের জন্য যে প্রতিষেধক হেতুর প্রয়োগ করেন, ঐ হেতুও তাঁহার দূষ্য পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়াও দূষক হয় না এবং উহাকে প্রাপ্ত না হইয়াও দূষক হয় না, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য। সুতরাং তাঁহার উক্তরূপ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে অসদুত্তর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। পূর্ব্ববৎ স্বব্যাঘাতকত্বই উক্ত জাতিদ্বয়ের সাধারণ দুষ্টত্বমূল। অযুক্ত অঙ্গের স্বীকার উহার অসাধারণ দুষ্টত্বমূল। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের যে প্রাপ্তিকে অর্থাৎ যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধকে হেতুর অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উহা অযুক্ত। কারণ, উহা সম্ভবও নহে, আবশ্যকও নহে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা উক্ত জাতিদ্বয়ের ঐ অসাধারণ দুষ্টত্বমূল সূচনা করিয়া, উহার অসদুত্তরত্ব সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

সূত্র। দৃষ্টান্তস্য কারণানপদেশাৎ প্রত্যবস্থানাচ্চ প্রতিদৃষ্টান্তেন প্রসঙ্গ-প্রতিদৃষ্টান্তসমৌ ॥৯॥৪৭০॥

অনুবাদ। দৃষ্টান্তের "কারণে"র (প্রমাণের) অনুল্লেখবশতঃ প্রত্যবস্থান-প্রযুক্ত (১১) প্রসঙ্গসম প্রতিষেধ হয় এবং প্রতিদৃষ্টান্তের দ্বারা প্রত্যবস্থান-প্রযুক্ত (১২) প্রতিদৃষ্টান্তসম প্রতিষেধ হয়।

ভাষ্য। সাধনস্যাপি সাধনং বক্তব্যমিতি প্রসঙ্গেন প্রত্যবস্থানং **প্রসঙ্গসমঃ**। ক্রিয়াহেতুগুণযোগী ক্রিয়াবান্ লোষ্ট ইতি হেতুর্নাপদিশ্যতে, নচ হেতুমন্তরেণ সিদ্ধিরস্তীতি।

প্রতিদৃষ্টান্তেন প্রত্যবস্থানং **প্রতিদৃষ্টান্তসমঃ**। ক্রিয়াবানাত্মা ক্রিয়াহেতুগুণযোগাল্লোষ্টবদিত্যুক্তে প্রতিদৃষ্টান্ত উপাদীয়তে ক্রিয়াহেতুগুণযুক্ত-

মাকাশং নিষ্ক্রিয়ং দৃষ্টমিতি। কঃ পুনরাকাশস্য ক্রিয়াহেতুগুণঃ? বায়ুনা সংযোগঃ সংস্কারাপেক্ষো বায়ুবনস্পতিসংযোগবদিতি।

অনুবাদ। সাধনেরও সাধন বক্তব্য, এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তিবশতঃ প্রত্যবস্থান (১১) প্রসঙ্গসম প্রতিষেধ। যথা—ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষ্ট লোষ্ট সক্রিয়, ইহাতে হেতু (প্রমাণ) কথিত হইতেছে না। কিন্তু হেতু ব্যতীত সিদ্ধি হয় না (অর্থাৎ লোষ্ট যে সক্রিয়, ইহাতেও প্রমাণ বক্তব্য, নচেৎ উহা সিদ্ধ হইতে পারে না)।

প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারা প্রত্যবস্থান (১২) প্রতিদৃষ্টান্তসম প্রতিষেধ। যথা—আত্মা সক্রিয়, যেহেতু (আত্মাতে) ক্রিয়ার কারণগুণবত্তা আছে, যথা লোষ্ট, ইহা (বাদী কর্ত্তৃক) উক্ত হইলে (প্রতিবাদী কর্ত্তৃক) প্রতিদৃষ্টান্ত গৃহীত হয়—(যথা) ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষ্ট আকাশ নিষ্ক্রিয় দৃষ্ট হয়। (প্রশ্ন) আকাশের ক্রিয়ার কারণগুণ কি? (উত্তর) বায়ুর সহিত সংস্কারাপেক্ষ অর্থাৎ বায়ুর বেগজন্য (আকাশের) সংযোগ, যেমন বায়ু ও বৃক্ষের সংযোগ।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ক্রমানুসারে "প্রসঙ্গসম" ও "প্রতিদৃষ্টান্তসম" নামক প্রতিষেধদ্বয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রের শেষোক্ত "সম" শব্দের "প্রসঙ্গ" ও "প্রতিদৃষ্টান্ত" শব্দের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ "প্রসঙ্গসম" ও "প্রতিদৃষ্টান্তসম" এই নামদ্বয় বুঝা যায়। সূত্রে "কারণ" শব্দের অর্থ এখানে প্রমাণ। ঋষিগণ প্রমাণ অর্থেও "হেতু", "কারণ" ও "সাধন" শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। "অপদেশ" শব্দের কথন অর্থ গ্রহণ করিলে "অনপদেশ" শব্দের দ্বারা অকথন বুঝা যায়। সূত্রোক্ত "প্রত্যবস্থান" শব্দের উভয় লক্ষণেই সম্বন্ধ মহর্ষির অভিমত। তাহা হইলে সূত্রের দ্বারা প্রথমোক্ত "প্রসঙ্গসম" প্রতিষেধের লক্ষণ বুঝা যায় যে, দৃষ্টান্তের প্রমাণ অপদিষ্ট (কথিত) হয় নাই অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থ যে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট, এ বিষয়েও প্রমাণ বক্তব্য, কিন্তু বাদী তাহা বলেন নাই, এই কথা বলিয়া প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহার নাম "প্রসঙ্গসম" প্রতিষেধ। সূত্রে মহর্ষি "দৃষ্টান্ত" শব্দের প্রয়োগ করায় ভাষ্যকার প্রথমোক্ত "সাধন" শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়। বাদীর কথিত দৃষ্টান্তও তাঁহার সাধ্যসিদ্ধির প্রয়োজক হয়। সুতরাং ঐ অর্থে দৃষ্টান্তকেও সাধন বলা যায়। ভাষ্যকারোক্ত দ্বিতীয় "সাধন" শব্দ এবং শেষোক্ত "হেতু" শব্দদ্বয়ের দ্বারা প্রমাণই বিবক্ষিত। অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া প্রতিবাদী যে প্রত্যবস্থান করেন, তাহাই ভাষ্যকারের মতে "প্রসঙ্গসম" প্রতিষেধ। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরেরও উহাই মত। তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলেই উহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য, ইহা বলিলে ঐ দৃষ্টান্ত ঘট যে অনিত্য, এ বিষয়ে হেতু অর্থাৎ প্রমাণ কি? প্রতিবাদী এইরূপ প্রশ্ন করিয়া

প্রত্যবস্থান করিলে উহা "প্রসঙ্গসম" প্রতিষেধ। ভাষ্যকারও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্থলেই উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষ্ট লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে প্রমাণ কথিত হয় নাই। কিন্তু প্রমাণ ব্যতীত উহা সিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর দৃষ্টান্তে লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ কথিত না হওয়ায় উহা অসিদ্ধ। এইরূপে বাদীর অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধিদোষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোক্ত "সাধ্যসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত-পদার্থগত সাধ্যধর্ম্মে পঞ্চাবয়বপ্রয়োগসাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সূত্রোক্ত "প্রসঙ্গসমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত-পদার্থগত সাধ্যধর্ম্মে প্রমাণমাত্রসাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। সুতরাং উক্তরূপ বিশেষ থাকায় পুনরুক্তি-দোষ হয় নাই। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে ইহাই বলিয়াছেন[১]।

কিন্তু পরবর্ত্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য এই সূত্রোক্ত "দৃষ্টান্ত" শব্দের দ্বারা বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত, হেতু এবং অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষও গ্রহণ করিয়া, ঐ দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পদার্থত্রয়েই প্রতিবাদী যদি প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে সেই উত্তরকে "প্রসঙ্গ-সম" প্রতিষেধ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"অনবস্থাভাসপ্রসঙ্গঃ প্রসঙ্গসম ইতি"। তাঁহার মতে "প্রসঙ্গসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে অনবস্থাভাসের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই তিনি উক্ত জাতিকে বলিয়াছেন,—"অনবস্থাদেশনাভাসা"। বস্তুতঃ উহা প্রকৃত অনবস্থাদোষের উদ্ভাবন নহে, কিন্তু তত্তুল্য, তাই উহাকে "অনবস্থাদেশনাভাস" বলা হইয়াছে। "দেশনা" শব্দের অর্থ এখানে উল্লেখ বা উদ্ভাবন। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ উক্ত মতানুসারেই উক্ত "প্রসঙ্গসমা" জাতির স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে,[২] বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত, হেতু এবং তাঁহার অনুমানের আশ্রয় পক্ষ-পদার্থ প্রমাণসিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী যদি তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? এইরূপে প্রমাণ প্রশ্ন করেন এবং বাদী তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিলে আবার তাঁহার কথিত দৃষ্টান্তাদি পদার্থে অথবা বাদীর কথিত সেই প্রমাণ-পদার্থেই পূর্ব্ববৎ প্রমাণ প্রশ্ন করেন,—এইরূপে ক্রমশঃ বাদীর কথিত দৃষ্টান্তাদি পদার্থে প্রমাণপরম্পরা প্রশ্নপূর্ব্বক যদি অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর ঐরূপ উত্তরকে বলে "প্রসঙ্গসমা" জাতি। বরদরাজ উক্ত মতানুসারে এখানে সূত্রোক্ত "কারণ" শব্দের

১। দৃষ্টান্তস্য "কারণং" প্রমাণং, তস্যানপদেশাৎ প্রসঙ্গসমঃ। সাধ্যসমে হি দৃষ্টান্তে সাধ্যবৎ হেত্বাদ্যবয়বং প্রসঞ্জয়তি, পঞ্চাবয়বপ্রয়োগসাধ্যতাং দৃষ্টান্তগতস্যানিত্যত্বস্য প্রসঞ্জয়তীত্যর্থঃ। প্রসঙ্গসমস্তু দৃষ্টান্তগতস্যানিত্যত্বস্য প্রমাণমাত্রসাধ্যতামিত্যপৌনরুক্ত্যং। ভাষ্যং—"সাধনস্যাপীতি"। দৃষ্টান্তগতস্যানিত্যত্বস্য সাধনং প্রমাণং বাচ্যমিতি। —তাৎপর্য্যটীকা।

২। সিদ্ধে দৃষ্টান্তহেত্বাদৌ সাধনপ্রশ্নপূর্ব্বকং।
অনবস্থাভাসবাচঃ "প্রসঙ্গসম"জাতিতা ॥১৬॥

ইয়মপি কৃতিজ্ঞপ্তিসাধারণী জাতিঃ। তথাচ সাধনমুৎপাদকং জ্ঞাপকং বা, সিদ্ধিশ্চ স্বরূপতো জ্ঞানতশ্চ। "দৃষ্টা-ন্তস্য কারণানপদেশা"দিতি সূত্রখণ্ডে দৃষ্টান্তপদং স্বরূপতো জ্ঞানতশ্চ সিদ্ধিমাত্রমুপলক্ষয়তি। কারণং জ্ঞাপকং কারকং বা।—তার্কিকরক্ষা। "দৃষ্টান্তস্যেতি" সিদ্ধানামপি পক্ষহেতুদৃষ্টান্তানামনবস্থাপ্রসঙ্গতয়া উৎপাদকজ্ঞাপকানভিধানাৎ প্রত্যবস্থানং প্রসঙ্গসম ইতি সূত্রার্থঃ।—লঘুদীপিকা টীকা।

দ্বারাও জনক এবং জ্ঞাপক, এই উভয়কেই গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি, এই উভয় পক্ষেই প্রসঙ্গসমা জাতির ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এখানে ঐরূপ কোন কথা বলেন নাই, সূত্রোক্ত "দৃষ্টান্ত" শব্দের দ্বারাও হেতু ও পক্ষকেও গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও পক্ষেও পূর্ব্বোক্তরূপে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করিলে, তাহাও ত কোন প্রকার জাত্যন্তরই হইবে। মহর্ষি তাহা না বলিলে তাঁহার বক্তব্যের ন্যূনতা হয়। তাই পরবর্ত্তী উদয়নাচার্য্য সূক্ষ্ম বিচার করিয়া "প্রসঙ্গসমা" জাতিরই উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও শেষে উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন মতেও হেতু ও পক্ষে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করিলে তাহাও জাত্যন্তর হইবে, তাহা উক্ত "প্রসঙ্গসমা" জাতি নহে—কিন্তু বক্ষ্যমাণ আকৃতিগণের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার জাতি, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৩৭শ সূত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকারের ঐ কথা বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ মহর্ষির এই সূত্রে "দৃষ্টান্ত" শব্দের প্রয়োগ এবং পরবর্ত্তী সূত্রোক্ত উত্তরের প্রতি মনোযোগ করিলে, মহর্ষি যে কেবল দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়া "প্রসঙ্গসমা" জাতির লক্ষণাদি বলিয়াছেন, ইহাই সরল ভাবে বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ সেইরূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

"প্রসঙ্গসমে"র পরে "প্রতিদৃষ্টান্তসম" কথিত হইয়াছে। যে পদার্থে বাদীর সাধ্য ধর্ম্ম নাই, ইহা উভয়েরই সম্মত, সেই পদার্থকে প্রতিবাদী দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে, তাহাকে বলে প্রতিদৃষ্টান্ত। প্রতিবাদী উহার দ্বারা প্রত্যবস্থান করিলে তাহাকে বলে "প্রতিদৃষ্টান্তসম" প্রতিষেধ। যেমন ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "ক্রিয়াবানাত্মা" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণগুণবত্তা আকাশেও আছে, কিন্তু আকাশ নিষ্ক্রিয়। সুতরাং আত্মা আকাশের ন্যায় নিষ্ক্রিয়ই কেন হইবে না? এখানে আকাশই প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্ত। উহাতেও ক্রিয়ার কারণগুণবত্তা হেতু আছে, কিন্তু বাদীর সাধ্যধর্ম্ম সক্রিয়ত্ব নাই। সুতরাং বাদীর ঐ হেতু ব্যভিচারী, এই কথা বলিয়া, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিলে, উহা সদুত্তরই হয়, জাত্যুত্তর হয় না। কিন্তু "প্রতিদৃষ্টান্তসমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী উক্তরূপে ব্যভিচার দোষের উদ্ভাবন করেন না। কিন্তু বাদীর কথিত হেতু কোন প্রতিদৃষ্টান্তে প্রদর্শন করিয়া, তদ্দ্বারা বাদীর সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন। উক্ত স্থলে বাদীর অনুমানে বাধ অথবা সৎপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি এই "প্রতিদৃষ্টান্তসমা" জাতিকে বলিয়াছেন—"বাধ-সৎপ্রতিপক্ষান্যতরদেশনাভাসা"। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে উক্ত জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী কোন হেতু প্রয়োগ না করিয়া, কেবল কোন প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারাই উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। সুতরাং মহর্ষির প্রথমোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতি হইতে এই "প্রতিদৃষ্টান্তসমা" জাতির ভেদও বুঝা যায়। কারণ, "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী অন্য হেতুর প্রয়োগ করিয়াই তদ্দ্বারা বাদীর সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন—এই বিশেষ আছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে পরে প্রশ্নপূর্ব্বক

আকাশেও ক্রিয়ার কারণগুণের উল্লেখ করায় তাঁহার মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত ঐ হেতুর দ্বারা আকাশের ন্যায় আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, ইহাই বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের উক্তির দ্বারাও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়[১]। বার্ত্তিক-কারও এখানে ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণই গ্রহণ করিয়া,পরে বায়ুর সহিত আকাশের সংযোগ কোন কালেই আকাশে ক্রিয়া উৎপন্ন করে না, সুতরাং উহা আকাশে ক্রিয়ার কারণ হইতেই পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থনপূর্ব্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, কেবল বায়ু ও আকাশের সংযোগই আকাশে ক্রিয়ার কারণ বলিয়া কথিত হয় নাই। কিন্তু ঐ সংযোগের সদৃশ যে বায়ু ও বৃক্ষের সংযোগ, তাহা বৃক্ষে ক্রিয়া উৎপন্ন করে বলিয়া, উহা ক্রিয়ার কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য। বায়ু ও বৃক্ষের ঐ সংযোগ আকাশেও আছে। কিন্তু আকাশে পরমমহৎ পরিমাণরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃই ক্রিয়া জন্মে না। তাহাতে ঐ সংযোগ যে আকাশে ক্রিয়ার কারণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, কারণ থাকিলেও অনেক স্থলে প্রতিবন্ধকবশতঃ কার্য্য জন্মে না, এ জন্য প্রতিবন্ধকের অভাবও সর্ব্বত্র কার্য্যের কারণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বার্ত্তিককার এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকারের কথার দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায় যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বায়ুর সহিত আকাশের সংযোগকেই আকাশে ক্রিয়ার কারণগুণ বলিয়া সমর্থন করিয়াই ঐ হেতুবশতঃ আকাশরূপ প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। প্রথমোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু হইতে ভিন্ন হেতু গ্রহণ করেন এবং উহা বাদীর পক্ষ পদার্থে বস্তুতঃ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এই "প্রতিদৃষ্টান্তসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুই গ্রহণ করিয়া, তাঁহার গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্ত পদার্থে উহা বিদ্যমান না থাকিলেও উহা সমর্থন করেন। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্টের উদাহরণ ব্যাখ্যার দ্বারাও ভাষ্যকারের উক্তরূপ মতই বুঝা যায়॥ ৯॥

ভাষ্য। অনয়োরুত্তরং—

অনুবাদ। এই "প্রসঙ্গসম" ও "প্রতিদৃষ্টান্তসম" নামক প্রতিষেধদ্বয়ের উত্তর—

সূত্র। প্রদীপোপাদান-প্রসঙ্গবিনিবৃত্তিবত্তদ্বিনিবৃত্তিঃ ॥ ॥১০॥৪৭১॥

অনুবাদ। প্রদীপগ্রহণ প্রসঙ্গের নিবৃত্তির ন্যায় সেই প্রমাণ কথনের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ প্রদীপদর্শনে যেমন প্রদীপান্তর গ্রহণ অনাবশ্যক, তদ্রূপ দৃষ্টান্ত পদার্থেও প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক।

১। ভাষ্যং "প্রতিদৃষ্টান্ত উদাহ্রিয়তে"। ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তমাকাশমক্রিয়ং দৃষ্টং, তস্মাদনেন প্রতিদৃষ্টান্তেন কস্মাৎ ক্রিয়াহেতুগুণযোগো নিষ্ক্রিয়ত্বমেব ন সাধয়ত্যাত্মন ইতি শেষঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

ভাষ্য। ইদং তাবদয়ং পৃষ্টো বক্তুমর্হতি—অথ কে প্রদীপমুপাদদতে কিমর্থং বেতি। দিদৃক্ষমাণা দৃশ্যদর্শনার্থমিতি। অথ প্রদীপং দিদৃক্ষমাণাঃ প্রদীপান্তরং কস্মান্নোপাদদতে? অন্তরেণাপি প্রদীপান্তরং দৃশ্যতে প্রদীপঃ, তত্র প্রদীপদর্শনার্থং প্রদীপোপাদানং নিরর্থকং। অথ দৃষ্টান্তঃ কিমর্থমুচ্যতে ইতি? অপ্রজ্ঞাতস্য জ্ঞাপনার্থমিতি। অথ দৃষ্টান্তে কারণাপদেশঃ কিমর্থং দেশ্যতে? যদি প্রজ্ঞাপনার্থং, প্রজ্ঞাতো দৃষ্টান্তঃ স খলু "লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্ত" ইতি। তৎপ্রজ্ঞাপনার্থঃ কারণাপদেশো নিরর্থক ইতি **প্রসঙ্গসম**স্যোত্তরং।

অনুবাদ। এই প্রতিবাদী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জাত্যুত্তরবাদী জিজ্ঞাসিত হইয়া ইহা বলিবার নিমিত্ত যোগ্য, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ প্রশ্নসমূহের বক্ষ্যমাণ উত্তর বলিতে তিনি বাধ্য। যথা—(প্রশ্ন) কাহারা প্রদীপ গ্রহণ করে? কি জন্যই বা প্রদীপ গ্রহণ করে? (উত্তর) দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ দৃশ্য দর্শনের জন্য প্রদীপ গ্রহণ করে। (প্রশ্ন) আচ্ছা, প্রদীপ দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ অন্য প্রদীপ কেন গ্রহণ করে না? (উত্তর) অন্য প্রদীপ ব্যতীতও প্রদীপ দেখা যায়, সেই স্থলে প্রদীপ দর্শনের জন্য প্রদীপ গ্রহণ অনাবশ্যক। (প্রশ্ন) আচ্ছা, দৃষ্টান্ত কেন কথিত হয়? (উত্তর) অপ্রজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞাপনের নিমিত্ত। আচ্ছা, দৃষ্টান্তে কারণ-কথন কেন আপত্তি করিতেছ? যদি বল, (দৃষ্টান্তের) প্রজ্ঞাপনের নিমিত্ত, (উত্তর) সেই দৃষ্টান্ত "লৌকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির সাম্য আছে, তাহা দৃষ্টান্ত" এই লক্ষণবশতঃ প্রজ্ঞাতই আছে। তাহার প্রজ্ঞাপনের নিমিত্ত কারণ কথন অর্থাৎ উহাতে প্রমাণ প্রদর্শন নিরর্থক—ইহা "প্রসঙ্গসম" প্রতিষেধের উত্তর।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্র ও পরবর্ত্তী সূত্র দ্বারা যথাক্রমে পূর্ব্বসূত্রোক্ত "প্রসঙ্গসম" ও "প্রতিদৃষ্টান্তসম" প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত "প্রসঙ্গসম" প্রতিষেধের প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর প্রমাণসিদ্ধ দৃষ্টান্তেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, ঐ দৃষ্টান্তেও প্রমাণ কথিত হউক? এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তি প্রকাশ করেন। তদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রদীপগ্রহণ-প্রসঙ্গের নিবৃত্তির ন্যায় দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রমাণ-কথন-প্রসঙ্গের নিবৃত্তি। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন প্রদীপ দেখিতে অন্য প্রদীপ গ্রহণ অনাবশ্যক হওয়ায় তজ্জন্য কেহ অন্য প্রদীপ গ্রহণ করে না, সুতরাং সেখানে অন্য প্রদীপ গৃহীত হউক? এইরূপ প্রসঙ্গ বা আপত্তিও হয় না, তদ্রূপ প্রমাণসিদ্ধ দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রমাণ-কথন অনাবশ্যক হওয়ায় কেহ তাহাতে প্রমাণ বলে না, এবং তাহাতে প্রমাণ কথিত হউক? এইরূপ প্রসঙ্গ বা আপত্তিও হয় না। ভাষ্যকার প্রথমে

প্রশ্নোত্তর ভাবে সূত্রোক্ত দৃষ্টান্ত বুঝাইয়া, তদ্দ্বারা পরে মহর্ষির উত্তর সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, লোকে দৃশ্য বস্তু দর্শনের জন্য প্রদীপ গ্রহণ করিলেও ঐ প্রদীপ দর্শনের জন্য অন্য প্রদীপ কেন গ্রহণ করে না? এইরূপ প্রশ্ন করিলে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, প্রদীপ দর্শনে অন্য প্রদীপ অনাবশ্যক। কারণ, অন্য প্রদীপ ব্যতীতও সেই প্রদীপ দর্শন করা যায়। তাহা হইলে প্রতিবাদী দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রমাণ প্রশ্ন করেন কেন? উহাতে প্রমাণ বলা আবশ্যক কেন? এইরূপ প্রশ্ন করিলে তিনি কি উত্তর দিবেন? তিনি যদি বলেন যে, প্রজ্ঞাপনের জন্য, অর্থাৎ বাদীর ঐ দৃষ্টান্ত পদার্থ যে, তাঁহার সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য উহাতে প্রমাণ বলা আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্ববৎ ইহাও বলা যায় না। কারণ, মহর্ষির "লৌকিকপরীক্ষকাণাং" ইত্যাদি সূত্রোক্ত দৃষ্টান্ত-লক্ষণানুসারে দৃষ্টান্ত পদার্থ প্রজ্ঞাতই থাকে। অর্থাৎ বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থ যে, তাঁহার সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট, ইহা প্রমাণসিদ্ধই থাকে, নচেৎ উহা দৃষ্টান্তই হইতে পারে না। সুতরাং উহা প্রতিপাদনের জন্য প্রমাণ কথন অনাবশ্যক। এইরূপ বাদীর কথিত হেতু এবং অনুমানের আশ্রয় পক্ষ-পদার্থও প্রমাণসিদ্ধই থাকায় তাহাতেও প্রমাণ-কথন অনাবশ্যক। আর প্রতিবাদী যদি প্রমাণসিদ্ধ পদার্থেও প্রমাণ প্রশ্ন করেন এবং বাদী তাহাতে প্রমাণ প্রদর্শন করিলে পূর্ব্ববৎ তাঁহার দৃষ্টান্তে অথবা হেতু ও পক্ষেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, ঐরূপে প্রমাণপরম্পরা প্রশ্নপূর্ব্বক অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের অনুমানে ও দৃষ্টান্তাদি পদার্থে প্রমাণ প্রশ্ন করা যায় এবং তাঁহার ন্যায় অনবস্থাভাসেরও উদ্ভাবন করা যায়। তাহা হইলে তাঁহার নিজের পূর্ব্বোক্ত ঐ উত্তর নিজেরই ব্যাঘাতক হওয়ায় উহা স্বব্যাঘাতক হয়। সুতরাং উহা কোনরূপেই সদুত্তর হইতে পারে না। উহা তাঁহার নিজের কথানুসারেই দুষ্ট উত্তর—ইহা স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য হইবেন। উক্তরূপে স্বব্যাঘাতকত্বই তাঁহার ঐ উত্তরের সাধারণ দুষ্টত্বমূল, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। অথ প্রতিদৃষ্টান্তসমস্যোত্তরং—

অনুবাদ। অনন্তর "প্রতিদৃষ্টান্তসম" প্রতিষেধের উত্তর (কথিত হইতেছে)।

সূত্র। প্রতিদৃষ্টান্ত-হেতুত্বে চ নাহেতুর্দৃষ্টান্তঃ॥ ॥১১॥৪৭২॥

অনুবাদ। প্রতিদৃষ্টান্তের হেতুত্ব (সাধকত্ব) থাকিলে দৃষ্টান্ত অহেতু (অসাধক) হয় না (অর্থাৎ প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্ত যদি তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের সাধক হয়, তাহা হইলে বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তও তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের অসাধক হয় না, উহাও সাধক বলিয়া স্বীকার্য্য)।

ভাষ্য। প্রতিদৃষ্টান্তং ব্রুবতা ন বিশেষহেতুরপদিশ্যতে, অনেন

প্রকারেণ প্রতিদৃষ্টান্তঃ সাধকো ন দৃষ্টান্ত ইতি। এবং প্রতিদৃষ্টান্ত-হেতুত্বে নাহেতুর্দৃষ্টান্ত ইত্যুপপদ্যতে। স চ কথমহেতুর্ন স্যাৎ? যদ্য-প্রতিষিদ্ধঃ সাধকঃ স্যাদিতি।

অনুবাদ। প্রতিদৃষ্টান্তবাদী কর্ত্তৃক বিশেষ হেতু কথিত হইতেছে না, (যথা)—এইপ্রকারে প্রতিদৃষ্টান্তই সাধক হইবে, দৃষ্টান্ত সাধক হইবে না। এইরূপ স্থলে প্রতিদৃষ্টান্তের হেতুত্ব (সাধকত্ব) থাকিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে তাঁহার প্রতিদৃষ্টান্তের সাধকত্ব স্বীকার করিলে দৃষ্টান্ত অহেতু নহে অর্থাৎ বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত পদার্থও তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের সাধক, ইহা উপপন্ন হয় অর্থাৎ উহাও স্বীকার্য্য। (প্রশ্ন) সেই দৃষ্টান্ত পদার্থও কেন অহেতু হইবে না? (উত্তর) যদি অপ্রতিসিদ্ধ হইয়া সাধক হয়। অর্থাৎ বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত প্রতিবাদী কর্ত্তৃক প্রতিসিদ্ধ (খণ্ডিত) না হওয়ায় উহা অবশ্যই সাধক হইবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা "প্রসঙ্গসম" প্রতিষেধের উত্তর বলিয়া, এই সূত্রের দ্বারা "প্রতিদৃষ্টান্তসম" প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন যে, প্রতিদৃষ্টান্ত হেতু হইলে কিন্তু দৃষ্টান্ত অহেতু হয় না অর্থাৎ অসাধক হয় না। সূত্রে "হেতু" শব্দের অর্থ সাধক। ভষ্যকারও পরে "সাধক" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ঐ অর্থ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির এই উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত "প্রতিদৃষ্টান্তসম" প্রতিষেধের প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী প্রতিদৃষ্টান্ত বলিয়া কোন বিশেষ হেতু বলেন না, যদ্দ্বারা তাঁহার প্রতিদৃষ্টান্তই সাধক, কিন্তু বাদীর দৃষ্টান্ত সাধক নহে, ইহা স্বীকার্য্য হয়। সুতরাং তাঁহার কথিত প্রতিদৃষ্টান্ত বস্তুতঃ সাধকই হয় না। তথাপি তিনি যদি উহা সাধক বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলে বাদীর দৃষ্টান্তও যে সাধক, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য। কারণ, তিনি বাদীর দৃষ্টান্তকে খণ্ডন না করায় ঐ দৃষ্টান্তও যে সাধক, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য এবং তিনি বাদীর হেতুরও খণ্ডন না করায় তাহারও সাধকত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য। তাহা হইলে তিনি আর প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারা কি করিবেন? তিনি বাদীর হেতুকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রতিদৃষ্টান্তদ্বারা বাদীর সাধ্যধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের অভাব সাধন করিয়া, বাদীর অনুমানে বাধদোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন না। কারণ, ঐ হেতু তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু—(বিশেষ হেতু) নহে। সুতরাং তাঁহার ঐ প্রতিদৃষ্টান্ত বাদীর দৃষ্টান্ত হইতে অধিক বলশালী না হওয়ায় তিনি উহার দ্বারা বাদীর অনুমানে বাধ-দোষের উদ্‌ভাবন করিতে পারেন না এবং তুল্য বলশালীও না হওয়ায় সৎপ্রতিপক্ষ-দোষেরও উদ্ভাবন করিতে পারেন না। বস্তুতঃ বাদী ও প্রতিবাদীর বিভিন্ন হেতুদ্বয় তুল্যবলশালী হইলেই সেখানেই সৎপ্রতিপক্ষ দোষ হয়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী কোন পৃথক্ হেতু প্রয়োগ করেন না। সুতরাং সৎপ্রতিপক্ষ-দোষের সম্ভাবনাই নাই। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে "প্রতিদৃষ্টান্তসমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী কোন হেতুরই উল্লেখ করেন না। কেবল দৃষ্টান্তকেই সাধ্যসিদ্ধির অঙ্গ মনে

করিয়া, প্রতিদৃষ্টান্তদ্বারাই উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। যেমন শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য হইলে আকাশের ন্যায় নিত্য হউক? এইরূপে আকাশের ন্যায় শব্দের নিত্যত্ব সাধন করিয়া, শব্দে অনিত্যত্বের বাধ সমর্থন করেন। কিন্তু প্রতিবাদীর ঐ দৃষ্টান্ত হেতুশূন্য বলিয়া উহা সাধকই হয় না। প্রকৃত হেতু ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না। সূত্রে মহর্ষির "নাহেতুর্দৃষ্টান্তঃ" এই বাক্যের দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে বুঝা যায়। ফলকথা, বাদীর দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিবাদীর দৃষ্টান্তে অধিক বলশালিত্বই বাধদোষের প্রতি যুক্ত অঙ্গ বা প্রযোজক। প্রতিবাদী উহা অস্বীকার করিয়া ঐরূপে বাধদোষের উদ্ভাবন করায়, উক্ত স্থলে যুক্তাঙ্গহানি তাঁহার ঐ উত্তরের অসাধারণ দুষ্টত্বমূল। আর প্রতিবাদী যদি শেষে বলেন যে, আমার দৃষ্টান্তের ন্যায় তোমার দৃষ্টান্তও অসাধক। কারণ, তোমার পক্ষেও ত বিশেষ হেতু নাই। কিন্তু তাহা হইলে প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা অসদুত্তর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। কারণ, তিনি তাঁহার কথিত প্রতিদৃষ্টান্তকে অসাধক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে আর উহার দ্বারা বাদীর পক্ষ খণ্ডন করিতে পারেন না। উক্তরূপে স্বব্যাঘাতকত্বই উক্ত জাতির সাধারণদুষ্টত্বমূল।

প্রসঙ্গসম-প্রতিদৃষ্টান্তসম-জাতিদ্বয়-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৪॥

সূত্র। প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাভাবাদনুৎপত্তিসমঃ ॥১২॥৪৭৩॥

অনুবাদ। উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের (হেতুর) অভাবপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৩) "অনুৎপত্তিসম" প্রতিষেধ।

ভাষ্য। "অনিত্যঃ শব্দঃ, প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদ্‌ঘটব"দিত্যুক্তে অপর আহ—প্রাগুৎপত্তেরনুৎপন্নে শব্দে প্রযত্নানন্তরীয়কত্বমনিত্যত্বকারণং নাস্তি, তদভাবান্নিত্যত্বং প্রাপ্তং, নিত্যস্য চোৎপত্তির্নাস্তি। অনুৎপত্ত্যা প্রত্যবস্থানমনুৎপত্তিসমঃ।

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু (শব্দে) প্রযত্নের অনন্তরভাবিত্ব অর্থাৎ প্রযত্নজন্যত্ব আছে, যেমন ঘট, ইহা (বাদী কর্ত্তৃক) উক্ত হইলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন,—উৎপত্তির পূর্ব্বে অনুৎপন্ন শব্দে অনিত্যত্বের কারণ (অনুমাপক হেতু) প্রযত্নজন্যত্ব নাই। তাহার অভাববশতঃ (সেই শব্দে) নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তখন সেই শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, কিন্তু নিত্য পদার্থের উৎপত্তি নাই। অনুৎপত্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৩) "অনুৎপত্তিসম"।

টিপ্পনী। মহর্ষি যথাক্রমে এই সূত্রের দ্বারা (১৩) "অনুৎপত্তিসম" প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রে "কারণ" শব্দের অর্থ এখানে অনুমাপক হেতু, জনক হেতু নহে। "কারণাভাবাৎ" এই পদের পরে "প্রত্যবস্থানং" এই পদের অধ্যাহার সূত্রকারের অভিমত বুঝা যায়। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদী তাঁহার নিজ মতানুসারে কোন জন্য পদার্থকে অনুমানের আশ্রয় বা পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, কোন হেতু দ্বারা তাহাতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে, সেখানে প্রতিবাদী যদি বাদীর পক্ষ পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাতে বাদীর কথিত হেতু নাই, ইহা বলিয়া প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহার নাম (১৩) "অনুৎপত্তিসম" প্রতিষেধ। ভাষ্যকার এখানে উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক উক্তরূপে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহাতে প্রযত্নের অনন্তরভাবিত্ব অর্থাৎ প্রযত্নজন্যত্ব আছে—যেমন ঘট। কোন বাদী ঐরূপ বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, শব্দের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাতে অনিত্যত্বের কারণ অর্থাৎ সাধক হেতু না থাকায়, তখন সেই অনুৎপন্ন শব্দের নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। কিন্তু নিত্য পদার্থের উৎপত্তি নাই। সুতরাং তখন তাহাতে প্রযত্নজন্যত্ব হেতু না থাকায় তদ্দ্বারা শব্দমাত্রের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদী শব্দমাত্রেই প্রযত্নজন্যত্ব হেতুর দ্বারা অনিত্যত্ব সাধন করিতেছেন। কিন্তু তিনি শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে অনুৎপন্ন শব্দে যে তাঁহার কথিত হেতু প্রযত্নজন্যত্ব নাই, ইহা তাঁহার স্বীকার্য্য। কারণ, তখনও তাহাতে প্রযত্নজন্যত্ব থাকিলে তাহাকে আর অনুৎপন্ন বলা যায় না। কিন্তু সেই অনুৎপন্ন শব্দে বাদীর কথিত হেতু না থাকায় উহার নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে শব্দের মধ্যে অনুৎপন্ন শব্দ অনিত্য নহে এবং তাহাতে বাদীর কথিত ঐ হেতুও নাই, ইহা স্বীকার্য্য হওয়ায় বাদীর ঐ অনুমানে অংশতঃ বাধ ও ভাগাসিদ্ধি অর্থাৎ অংশতঃ স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ স্বীকার্য্য। "বার্ত্তিক"কার ও জয়ন্ত ভট্টও ভাষ্যকারোক্ত "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলেই বাদীর পক্ষ শব্দের অনুৎপত্তি গ্রহণ করিয়াই এই সূত্রোক্ত "অনুৎপত্তিসম" প্রতিষেধের উদাহরণ বুঝাইয়াছেন।

কিন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের সূক্ষ্ম বিচারানুসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ এখানে বাদীর অনুমানের অঙ্গ পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি যে কোন পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে হেতুর অভাব বলিয়া, প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ভাগাসিদ্ধিদোষ প্রদর্শন করিলে "অনুৎপত্তিসম" প্রতিষেধ হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১] এবং উহার সমস্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বত্র বাদীর হেতুতে প্রতিবাদীর বক্তব্য ভাগাসিদ্ধিদোষই বুঝাইয়াছেন। অনুমানের আশ্রয়রূপ

১। অনুৎপন্নে সাধনাঙ্গে হেতুবৃত্তেরভাবতঃ।
ভাগাসিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ স্যাদনুৎপত্তিসমো মতঃ॥১৮॥

সাধনাঙ্গানাং ধর্ম্মি-লিঙ্গ-সাধ্য-দৃষ্টান্ত-তজ্জ্ঞানানামন্যতমস্যোৎপত্তেঃ পূর্ব্বং হেতুবৃত্তেরভাবাদ্ভাগাসিদ্ধ্যা প্রত্যবস্থানমনুৎপত্তিসমঃ।

তদুক্তং "প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাভাবাদনুৎপত্তিসম" ইতি। সাধনাঙ্গানামুৎপত্তেঃ প্রাক্ কারণস্য হেতোরভাবাৎ প্রত্যবস্থানমনুৎপত্তিসম ইত্যর্থঃ।—তার্কিকরক্ষা।

পক্ষ পদার্থের কোন ভাগে অর্থাৎ কোন অংশে হেতু না থাকিলে তাহাকে "ভাগাসিদ্ধি" দোষ বলে। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার তাঁহার প্রদর্শিত উদাহরণে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি ও বাধদোষও প্রদর্শন করিয়াছেন। বার্ত্তিককার পরে সূত্রোক্ত হেতু যে জ্ঞাপক হেতু, কারক অর্থাৎ জনক হেতু নহে, ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া অন্য আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে কেহ কেহ যে, এই "অনুৎপত্তিসমা" জাতিকে "অর্থাপত্তিসমা" জাতিই বলিতেন, ইহা বুঝাইয়া, উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। পরে এই "অনুৎপত্তিসমা" জাতি কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত না হওয়ায় জাতির লক্ষণাক্রান্তই হয় না, এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, অনুৎপন্ন পদার্থমাত্রই অহেতু। যেমন অনুৎপন্ন সূত্রসমূহ বস্ত্রের কারণ হয় না, তদ্রূপ শব্দের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাতে অনুৎপন্ন বা অবিদ্যমান প্রযত্নজন্যত্ব তাহাতে অনিত্যত্বের সাধক হয় না। এইরূপে অনুৎপন্ন অহেতু পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উক্তরূপ প্রত্যবস্থান হওয়ায় উহাও জাতির লক্ষণাক্রান্ত হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপে বার্ত্তিককারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারাও "অর্থাপত্তিসমা" জাতি হইতে এই "অনুৎপত্তিসমা" জাতির ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ, এই "অনুৎপত্তিসমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে অনুৎপন্ন অহেতু পদার্থের সহিত সাম্য প্রযুক্ত প্রতিষেধ হয়। কিন্তু "অর্থাপত্তিসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে বাদীর বাক্যার্থের বিপরীত পদার্থের আরোপ করিয়া প্রতিষেধ হয়। পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে। ভাষ্যকারও এখানে সর্ব্বশেষে "অনুৎপত্তিসম" নামের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ভেদ সূচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রতিবাদী বাদীর গৃহীত পক্ষের উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন অনুৎপত্তিকে আশ্রয় করিয়া, তৎপ্রযুক্ত পূর্ব্বোক্তরূপে প্রত্যবস্থান করায় ইহার নাম "অনুৎপত্তিসম"। "অর্থাপত্তিসম" প্রতিষেধ পূর্ব্বোক্ত অনুৎপত্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান নহে, সুতরাং ইহা হইতে ভিন্ন ॥ ১২ ॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং—

অনুবাদ। ইহার অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত "অনুৎপত্তিসম" প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র। তথাভাবাদুৎপন্নস্য কারণোপপত্তের্ন কারণ-প্রতিষেধঃ ॥১৩॥৪৭৪॥

অনুবাদ। উৎপন্ন পদার্থের "তথাভাব"বশতঃ অর্থাৎ জন্য পদার্থ উৎপন্ন হইলেই তাহার স্বস্বরূপে সত্তাবশতঃ কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই পদার্থে বাদীর কথিত হেতুর সত্তা থাকায় কারণের (হেতুর) প্রতিষেধ (অভাব) নাই।

ভাষ্য। তথাভাবাদুৎপন্নস্যেতি। উৎপন্নঃ খল্বয়ং শব্দ ইতি ভবতি। প্রাগুৎপত্তেঃ শব্দ এব নাস্তি, উৎপন্নস্য শব্দভাবাৎ, শব্দস্য সতঃ প্রযত্না-

নন্তরীয়কত্বমনিত্যত্বকারণমুপপদ্যতে। কারণোপপত্তেরযুক্তোঽয়ং দোষঃ প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাভাবাদিতি।

অনুবাদ। "তথাভাবাদুৎপন্নস্য"—ইহা অর্থাৎ সূত্রের প্রথমোক্ত ঐ বাক্য (ব্যাখ্যাত হইতেছে)। ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অনুমানে বাদীর গৃহীত পক্ষ শব্দ উৎপন্ন হইয়াই শব্দ, ইহা হয়। (তাৎপর্য্য) উৎপত্তির পূর্ব্বে শব্দই নাই, যেহেতু উৎপন্ন হইলেই তাহার শব্দত্ব। সৎ অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া স্বস্বরূপে বিদ্যমান শব্দের সম্বন্ধে অনিত্যত্বের কারণ (বাদীর কথিত অনিত্যত্বের সাধক হেতু) উপপন্ন হয় অর্থাৎ তখন তাহাতে বাদীর কথিত প্রযত্নজন্যত্ব হেতু আছে। কারণের উপপত্তি-বশতঃ অর্থাৎ শব্দে বাদীর কথিত ঐ হেতুর সত্তা থাকায় "উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের (হেতুর) অভাববশতঃ" এই দোষ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য পূর্ব্বোক্ত দোষ অযুক্ত।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "অনুৎপত্তিসম" নামক প্রতিষেধের উত্তর বলিতে মহর্ষি এই সূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,—"তথাভাবাদুৎপন্নস্য", অর্থাৎ জন্য পদার্থ উৎপন্ন হইলেই তাহার "তথাভাব" অর্থাৎ তদ্রূপতা হয়। ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্থলে উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শব্দ উৎপন্ন হইয়াই শব্দ, ইহা হয়। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে শব্দই থাকে না,—কারণ, শব্দ উৎপন্ন হইলেই তাহার শব্দভাব হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শব্দের যে "তথাভাব" অর্থাৎ শব্দভাব বা শব্দত্ব, তাহা শব্দ উৎপন্ন হইলেই তাহাতে সিদ্ধ হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে উহা থাকিতে পারে না। কারণ, তখন শব্দই নাই। সুতরাং অনুৎপন্ন শব্দ বলিয়া কোন শব্দ নাই। শব্দ উৎপন্ন হইলেই তখন তাহার স্বস্বরূপে সত্তা সিদ্ধ হওয়ায় তখন তাহাতে অনিত্যত্বের কারণ অর্থাৎ সাধক হেতু প্রযত্নজন্যত্ব আছে, সুতরাং অনিত্যত্বও আছে। তাহা হইলে আর বাদীর পক্ষ শব্দের কোন অংশে তাঁহার হেতু না থাকায় তাহা নিত্য, ইহা বলিয়া বাদীর উক্ত অনুমানে অংশতঃ বাধ ও অংশতঃ স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ কোনরূপেই বলা যায় না। অর্থাৎ বাদী যে, শব্দমাত্র-কেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রযত্নজন্যত্ব হেতুর দ্বারা তাহাতে অনিত্যত্ব সাধন করেন, সেই শব্দ-মাত্রেই তাঁহার ঐ হেতু আছে এবং নিত্যত্ব আছে। শব্দের মধ্যে অনুৎপন্ন নিত্য কোন প্রকার শব্দ নাই। যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহা গ্রহণ করিয়া, তাহাতে হেতুর অভাব ও সাধ্য ধর্ম্মের অভাব বলিয়া উক্ত দোষ প্রদর্শন করা যায় না। বস্তুতঃ অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষে হেতু না থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ এবং সাধ্য ধর্ম্ম না থাকিলে বাধদোষ হয়। কিন্তু যাহা পক্ষের অন্তর্গতই নহে, যাহা অলীক, তাহাতে হেতুর অভাব ও সাধ্যধর্ম্মের অভাব থাকিতেই পারে না। আধার ব্যতীত আধেয় হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিবাদীর কথিত উক্ত দোষের সম্ভাবনাই নাই। আর প্রতিবাদী ঐ সমস্ত যুক্তি অস্বীকার করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ দোষ বলিলে, তিনি যে অনুমানের দ্বারা বাদীর ঐ হেতুর দুষ্টত্ব সাধন করিবেন, সেই অনুমান বা তাহার সমর্থক অন্য কোন অনুমানে বাদীও

তাঁহার ন্যায় উক্তরূপে স্বরূপাসিদ্ধি প্রভৃতি দোষ বলিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার উক্ত উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা কোনরূপেই সদুত্তর হইতে পারে না, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। পূর্ব্ববৎ স্বব্যাঘাতকত্বই প্রতিবাদীর উক্ত উত্তরের সাধারণ দুষ্টত্বমূল ॥ ১৩ ॥

অনুৎপত্তিসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

সূত্র। সামান্যদৃষ্টান্তয়োরৈন্দ্রিয়কত্বে সমানে নিত্যানিত্যসাধর্ম্ম্যাৎ সংশয়সমঃ ॥১৪॥৪৭৪॥

অনুবাদ। সামান্য ও দৃষ্টান্তের ঐন্দ্রিয়কত্ব সমান ধর্ম্ম হওয়ায় অর্থাৎ "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে দৃষ্টান্ত ঘট অনিত্য এবং সেই ঘটস্থ সামান্য অর্থাৎ ঘটত্ব জাতি নিত্য, কিন্তু ঐ উভয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব ঐ ঘটত্বসামান্যও ঘট দৃষ্টান্তের সমান ধর্ম্ম হওয়ায় নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত (সংশয় দ্বারা প্রত্যবস্থান) অর্থাৎ উক্ত স্থলে শব্দে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের পূর্ব্বোক্ত সমান ধর্ম্ম জ্ঞানজন্য শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় সমর্থনপূর্ব্বক প্রত্যবস্থান (১৪) সংশয়সম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। 'অনিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদ্‌ঘটব'দিত্যুক্তে হেতৌ সংশয়েন প্রত্যবতিষ্ঠতে—সতি প্রযত্নানন্তরীয়কত্বে অস্ত্যেবাস্য নিত্যেন সামান্যেন সাধর্ম্ম্যমৈন্দ্রিয়কত্বমস্তি চ ঘটেনানিত্যেন, অতো নিত্যানিত্যসাধর্ম্ম্যাদনিবৃত্তঃ সংশয় ইতি।

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যে হেতু প্রযত্নজন্য—যেমন ঘট, এই বাক্য দ্বারা (বাদী কর্ত্তৃক) হেতু অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্বনিশ্চায়ক প্রযত্নজন্যত্ব হেতু কথিত হইলে (প্রতিবাদী) সংশয় দ্বারা প্রত্যবস্থান করিলেন, (যথা—) প্রযত্নজন্যত্ব থাকিলে অর্থাৎ শব্দে ঘটের ন্যায় অনিত্যত্বের নিশ্চায়ক প্রযত্নজন্যত্ব হেতু থাকিলেও এই শব্দের নিত্য সামান্য অর্থাৎ ঘটত্ব জাতির সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বরূপ সাধর্ম্ম্য আছেই এবং অনিত্য ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বরূপ সাধর্ম্ম্য আছে। অতএব নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সংশয় নিবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ শব্দে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব থাকায় উহার জ্ঞানজন্য শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ও অবশ্য জন্মিবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি ক্রমানুসারে এই সূত্রদ্বারা (১৪) "সংশয়সম" প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রে "নিত্যানিত্যসাধর্ম্ম্যাৎ" এই বাক্যের দ্বারা ঐ লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। ঐ বাক্যের পরে "সংশয়েন প্রত্যবস্থানং" এই বাক্যের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত। তাই ভাষ্যকারও "সংশয়েন প্রত্যবতিষ্ঠতে" এই বাক্যের দ্বারা উহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সূত্রে "সামান্যদৃষ্টান্তয়োঃ" ইত্যাদি প্রথমোক্ত বাক্য উদাহরণ প্রদর্শনার্থ। অর্থাৎ উহার দ্বারা "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে মহর্ষি এই "সংশয়সম" প্রতিষেধের উদাহরণ সূচনা করিয়াছেন। তাই পরে লক্ষণ সূচনা করিতেও বলিয়াছেন,—"নিত্যানিত্য-সাধর্ম্ম্যাৎ"। উক্ত স্থলে নিত্য ঘটত্ব জাতি এবং অনিত্য ঘটদৃষ্টান্তের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বরূপ সাধর্ম্ম্য বা সমানধর্ম্মই ঐ বাক্যের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত বাক্যে "নিত্য" শব্দের দ্বারা বিপক্ষ এবং "অনিত্য" শব্দের দ্বারা সপক্ষই মহর্ষির বিবক্ষিত এবং "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা সংশয়ের কারণমাত্রই বিবক্ষিত[১]। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদীর সাধ্যধর্ম্ম ও তাহার অভাব বিষয়ে সংশয়ের যে কোন কারণ প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদী যদি তদ্বিষয়ে সংশয় সমর্থনপূর্ব্বক প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহাকে বলে (১৪) "সংশয়সম" প্রতিষেধ বা "সংশয়সমা" জাতি। যে পদার্থ বাদীর সাধ্যশূন্য বলিয়া নিশ্চিতই আছে, তাহাকে বলে বিপক্ষ এবং যে পদার্থ বাদীর সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত, তাহাকে বলে সপক্ষ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে অনিত্যত্বশূন্য অর্থাৎ নিত্য ঘটত্ব জাতি বিপক্ষ এবং অনিত্যত্ব-বিশিষ্ট ঘট দৃষ্টান্ত সপক্ষ। তাই মহর্ষি উক্ত স্থলকেই গ্রহণ করিয়া সূত্রে "নিত্য" ও "অনিত্য" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তদনুসারেই ভাষ্যকার প্রভৃতি উক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ অন্য স্থলেও বাদীর সপক্ষ ও বিপক্ষের সাধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া, প্রতিবাদী উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিলে, সেখানেও ইহার উদাহরণ বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্রানুসারে ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নজন্যত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন ঘটের সাধর্ম্ম্য প্রযত্নজন্যত্ব আছে, তদ্রূপ উহাতে নিত্য ঘটত্ব জাতি এবং অনিত্য-ঘটের সাধর্ম্ম্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বও আছে। কারণ, শব্দ যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তদ্রূপ ঘটত্ব-জাতিও এবং ঘটও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ঘটত্ব জাতির প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটত্বরূপে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ঐ ঘটত্ব জাতি নিত্য, ইহা বাদীরও স্বীকৃত। সুতরাং নিত্য ঘটত্ব জাতি এবং অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব, তাহা শব্দে বিদ্যমান থাকায়, উহার জ্ঞানজন্য শব্দ কি ঘটত্ব জাতির ন্যায় নিত্য, অথবা ঘটের ন্যায় অনিত্য, এইরূপ সংশয় কেন হইবে না? সমানধর্ম্মজ্ঞান এক প্রকার সংশয়ের কারণ। সুতরাং উক্তরূপ সংশয়ের কারণ থাকায় ঐরূপ সংশয় অবশ্যম্ভাবী। বাদীর অভিমত নিশ্চয়ের কারণজন্য শব্দে অনিত্যত্ব নিশ্চয় হইবে, কিন্তু শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ের কারণ থাকিলেও ঐরূপ সংশয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর

১। অত্র "সমানে" ইত্যন্তমুদাহরণপ্রদর্শনপরং। নিত্যানিত্যশব্দৌ সপক্ষবিপক্ষাবুপলক্ষয়তঃ, সাধর্ম্ম্যপদঞ্চ সংশয়হেতুং। ততশ্চ সাধ্যতদভাবয়োঃ সংশয়কারণাদিত্যর্থঃ।—তার্কিকরক্ষা।

এইরূপ উত্তর "সংশয়সমা" জাতি। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, সংশয়ের কারণ না থাকিলেই সেখানে নিশ্চয়ের কারণজন্য নিশ্চয় জন্মে। উক্ত স্থলে উক্তরূপ সংশয়ের কারণ থাকায় বাদীর প্রযুক্ত ঐ হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব-নিশ্চয় জন্মিতে পারে না। উক্তরূপে নিশ্চয়ের প্রতিপক্ষ সংশয় সমর্থন করিয়া, বাদীর হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষত্ব দোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুর তুল্যবলশালী অন্য হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন না করায় উহা প্রকৃত সৎপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন নহে, কিন্তু তত্তুল্য। তাই এই জাতিকে বলা হইয়াছে,—"সৎপ্রতিপক্ষদেশনাভাসা"।

এইরূপ শব্দাদিগত শব্দত্ব প্রভৃতি অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিলেও প্রতিবাদীর সেই উত্তর "সংশয়সমা" জাতি হইবে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহা বলিয়াছেন। মহর্ষির প্রথমোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতি হইতে এই "সংশয়সমা" জাতির বিশেষ কি ? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, যে, কোন এক পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্তই "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্তই এই "সংশয়সমা" জাতির প্রবৃত্তি হয়, ইহাই বিশেষ। বস্তুতঃ মহর্ষিও এই সূত্রে "নিত্যানিত্যসাধর্ম্ম্যাৎ" এই বাক্যের দ্বারা উক্তরূপ বিশেষই সূচনা করিয়া গিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং—

অনুবাদ। ইহার অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত "সংশয়সম" প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র। সাধর্ম্ম্যাৎ সংশয়ে ন সংশয়ো বৈধর্ম্ম্যাদুভয়থা বা সংশয়েঽত্যন্তসংশয়প্রসঙ্গো নিত্যত্বানভ্যুপগমাচ্চ সামান্যস্যাপ্রতিষেধঃ ॥১৫॥৪৭৬॥

অনুবাদ। সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ সমানধর্ম্ম দর্শনজন্য সংশয় হইলেও বৈধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত অর্থাৎ সংশয়ের নিবর্ত্তক বিশেষ-ধর্ম্মনিশ্চয়বশতঃ সংশয় জন্মে না। উভয় প্রকারেই সংশয় হইলে অর্থাৎ সমান ধর্ম্মজ্ঞান ও বিশেষ ধর্ম্মনিশ্চয়, এই উভয় সত্ত্বে সংশয় জন্মিলে অত্যন্ত সংশয়প্রসঙ্গ অর্থাৎ সংশয়ের অনুচ্ছেদের আপত্তি হয়। "সামান্যে"র নিত্যত্বের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমানধর্ম্মরূপ সাধর্ম্ম্যের সর্ব্বদা সংশয়-প্রযোজকত্বের অস্বীকারবশতঃই (পূর্ব্বসূত্রোক্ত) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। বিশেষাদ্বৈধর্ম্ম্যাদবধার্য্যমাণেঽর্থে পুরুষ ইতি—ন স্থাণু-পুরুষ-সাধর্ম্ম্যাৎ সংশয়োঽবকাশং লভতে। এবং বৈধর্ম্ম্যাদ্বিশেষাৎ—প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদবধার্য্যমাণে শব্দস্যানিত্যত্বে নিত্যানিত্যসাধর্ম্ম্যাৎ

সংশয়োঽবকাশং ন লভতে। যদি বৈ লভেত, ততঃ স্থাণুপুরুষসাধর্ম্ম্যানুচ্ছেদাদত্যন্তং সংশয়ঃ স্যাৎ। গৃহ্যমাণে চ বিশেষে নিত্যং সাধর্ম্ম্যং সংশয়হেতুরিতি নাভ্যুপগম্যতে। নহি গৃহ্যমাণে পুরুষস্য বিশেষে স্থাণুপুরুষসাধর্ম্ম্যং সংশয়হেতুর্ভবতি।

অনুবাদ। বিশেষধর্ম্মরূপ বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত "পুরুষ" এইরূপে নিশ্চীয়মান পদার্থে স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ম্মপ্রযুক্ত সংশয় অবকাশ লাভ করে না অর্থাৎ পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইলে তখন আর তাহাতে ইহা কি স্থাণু? অথবা পুরুষ? এইরূপ সংশয় জন্মিতেই পারে না; এইরূপ বিশেষধর্ম্মরূপ বৈধর্ম্ম্য প্রযত্নজন্যত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বনিশ্চায়ক ঐ হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব নিশ্চীয়মান হইলে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সংশয় অবকাশ লাভ করে না। যদি অবকাশ লাভ করে, অর্থাৎ যদি বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলেও সংশয় জন্মে, ইহা বল, তাহা হইলে স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ম্মের অনুচ্ছেদবশতঃ অত্যন্ত সংশয় অর্থাৎ সর্ব্বদা সংশয় হউক? বিশেষধর্ম্ম "গৃহ্যমাণ" (নিশ্চীয়মান) হইলেও সমান ধর্ম্ম সর্ব্বদা সংশয়ের প্রযোজক হয়, ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, পুরুষের বিশেষ ধর্ম্ম নিশ্চীয়মান হইলে স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম্ম সংশয়ের প্রযোজক হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "সংশয়সম" প্রতিষেধের উত্তর বলিতে সূত্রশেষে বলিয়াছেন, "অপ্রতিষেধঃ"। অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ হয় না, উহা অযুক্ত। কেন উহা অযুক্ত? ইহা বুঝাইতে প্রথমে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন,—"সাধর্ম্ম্যাৎ সংশয়ে ন সংশয়ো বৈধর্ম্ম্যাৎ।" অর্থাৎ সমানধর্ম্মের দর্শনজন্য সংশয় হইলেও বিশেষধর্ম্মের দর্শনপ্রযুক্ত সংশয় জন্মে না। বার্ত্তিককার সূত্রোক্ত "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা সমানধর্ম্মের দর্শন এবং "বৈধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা বিশেষ ধর্ম্মের দর্শনই গ্রহণ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সূত্রোক্ত "সংশয়ে" এই পদের পরে "আপাদ্যমানেঽপি" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমানধর্ম্মের দর্শনজন্য সংশয় আপত্তির বিষয় হইলেও বিশেষ ধর্ম্মের দর্শনপ্রযুক্ত সংশয় জন্মে না, ইহাই মহর্ষির উক্ত বাক্যের অর্থ। তাৎপর্য্যটীকাকার উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বলিয়াছেন যে,[1] কেবল সমান ধর্ম্মদর্শনমাত্রই সংশয়ের কারণ নহে, কিন্তু বিশেষধর্ম্মের অদর্শন সহিত সমান ধর্ম্মদর্শনই সংশয়বিশেষের কারণ। সুতরাং যেখানে বিশেষ ধর্ম্মের দর্শন হইয়াছে, সেখানে পূর্ব্বোক্তরূপ সমান ধর্ম্মদর্শন না থাকায় সংশয়ের কারণই থাকে না; সুতরাং সংশয় জন্মিতে পারে না। বরদরাজ এখানেও পূর্ব্বসূত্রের ন্যায় সূত্রোক্ত "সাধর্ম্ম্য"

১। ন সামান্যদর্শনমাত্রং সংশয়স্য কারণমপি তু বিশেষাদর্শনসহিতং। বিশেষদর্শনে তু তদ্রহিতং ন কারণমিতি সূত্রার্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

শব্দের দ্বারা সংশয়ের কারণমাত্রই বিবক্ষিত এবং তদনুসারে সূত্রোক্ত "বৈধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারাও নিশ্চয়ের কারণমাত্রই বিবক্ষিত, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা মহর্ষির উক্ত বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বিশেষধর্ম্মরূপ বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ পুরুষের বিশেষ ধর্ম্ম হস্ত পদাদি যাহা স্থাণুতে না থাকায় স্থাণুর বৈধর্ম্ম্য, তাহা দেখিয়া পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইলে, তখন আর তাহাতে স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ম্ম দর্শনজন্য পূর্ব্বের ন্যায় ইহা কি স্থাণু? অথবা পুরুষ? এইরূপ সংশয় জন্মে না। এইরূপ শব্দে যে প্রযত্নজন্যত্ব প্রমাণসিদ্ধ বিশেষধর্ম্ম আছে, যাহা নিত্য পদার্থের বৈধর্ম্ম্য, তাহা যখন শব্দে নিশ্চিত হয়, তৎকালে ঐ শব্দে নিত্য ঘটত্বজাতি এবং অনিত্য ঘট দৃষ্টান্তের সমানধর্ম্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বের জ্ঞান হইলেও তজ্জন্য আর উহাতে নিত্য, কি অনিত্য? এইরূপ সংশয় জন্মে না। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে যে সংশয় সমর্থন করিয়াছেন, তাহা কারণের অভাবে হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার উক্তরূপ প্রতিষেধ অযুক্ত।

প্রতিবাদী যদি বলেন যে, উভয় প্রকারেই সংশয় জন্মে অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম দর্শন ও বিশেষ ধর্ম্ম দর্শন, এই উভয় থাকিলেও সেখানে সংশয়ের কারণ থাকায় সংশয় জন্মে। এতদুত্তরে মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—"উভয়থা বা সংশয়েঽত্যন্তসংশয়প্রসঙ্গঃ"। উক্ত বাক্যে "বা" শব্দের অর্থ অবধারণ। অর্থাৎ উক্ত পক্ষ গ্রহণ করিলে সর্ব্বদাই সংশয়ের আপত্তি হয়। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তস্থলে ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম্মের উচ্ছেদ না হওয়ায় উহার দর্শনজন্য পরেও উহাতে সংশয় জন্মিবে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে পুরুষের বিশেষধর্ম্ম হস্তপদাদি দর্শন করিলেও স্থাণু ও পুরুষের যে সমান ধর্ম্ম দেখিয়া পূর্ব্বে সংশয় জন্মিয়াছিল, তাহা তখনও বিদ্যমান থাকায় উহা দেখিয়া তখনও আবার তাহাতে পূর্ব্ববৎ ইহা কি স্থাণু? অথবা পুরুষ? এইরূপ সংশয় কেন জন্মিবে না? উক্ত পক্ষে সেখানেও সংশয়ের কারণ থাকায় সংশয়ের উচ্ছেদ কখনই হইতে পারে না। প্রতিবাদী শেষে যদি উহা স্বীকার করিয়াই বলেন যে, আমি সেখানেও সংশয় জন্মে, ইহা বলি, সমান ধর্ম্ম দর্শন হইলে কখনই সংশয়ের উচ্ছেদ হয় না, উহা চিরকালই সংশয়ের জনক, ইহাই আমার বক্তব্য। এতদুত্তরে মহর্ষি সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,— "নিত্যত্বানভ্যুপগমাচ্চ সামান্যস্য"। অর্থাৎ সমানধর্ম্মরূপ যে "সামান্য", তাহার নিত্যত্ব অর্থাৎ সতত সংশয়প্রযোজকত্ব স্বীকারই করা যায় না। উক্ত বাক্যে "চ" শব্দের অর্থ অবধারণ। ভাষ্যকার উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বিশেষ ধর্ম্মের দর্শন বা নিশ্চয় হইলেও সমান ধর্ম্ম সতত সংশয়ের প্রযোজক হয়, ইহা স্বীকারই করা যায় না। কারণ, পুরুষের বিশেষধর্ম্ম হস্তপদাদি দেখিলে তখন তাহাতে বিদ্যমান স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ম্ম সংশয়ের প্রযোজক হয় না। ভাষ্যকার এখানে সূত্রোক্ত "সামান্য" শব্দের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত সাধর্ম্ম্য বা সমান ধর্ম্মই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং "নিত্যত্ব" শব্দের দ্বারা নিত্য সংশয়হেতুত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমান ধর্ম্ম দর্শন সংশয়ের কারণ হইলে ঐ সমানধর্ম্ম ঐ সংশয়ের প্রযোজক হয়। সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত "হেতু" শব্দের অর্থ এখানে প্রযোজক, ইহাই বুঝিতে হয়। বার্ত্তিককার প্রভৃতির মতানুসারে সূত্রোক্ত "সামান্য" শব্দ ও উহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারোক্ত "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা সমান ধর্ম্ম দর্শনই বিবক্ষিত বুঝিলে ভাষ্যকারোক্ত হেতু

শব্দের দ্বারা জনক অর্থও বুঝা যায়। সে যাহা হউক, ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ শেষোক্ত বাক্যের কষ্টকল্পনা করিয়া যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার মূল কারণ এই যে, মহর্ষি কণাদের ন্যায় মহর্ষি গোতমের মতেও ঘটত্বাদি "সামান্য" বা জাতির নিত্যত্বই সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গোতম দ্বিতীয় অধ্যায়ে শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষায় "ন ঘটাভাবসামান্যনিত্যত্বাৎ" (২।১৩) ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষসূত্রে ঐ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বলিয়াছেন। পরে সেখানে সিদ্ধান্তসূত্রে ঐ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিয়াও পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করেন নাই। সুতরাং তিনি এই সূত্রে "সামান্য" অর্থাৎ জাতির নিত্যত্ব স্বীকার করি না, ইহা কখনই বলিতে পারেন না। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি সমস্ত ব্যাখ্যাকারই এখানে কষ্টকল্পনা করিয়া মহর্ষির ঐ শেষোক্ত বাক্যের উক্তরূপই অর্থব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বাক্যের দ্বারা ঘটত্বাদি সামান্যের নিত্যত্বের অস্বীকারই যে সরলভাবে বুঝা যায়, ইহা স্বীকার্য্য। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে এবং এই সূত্রে সমানধর্ম্ম বলিতে "সাধর্ম্ম্য" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বসূত্রে ঘটত্বাদি জাতি অর্থেই "সামান্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক। সুতরাং তিনি এই সূত্রে পরে পূর্ব্ববৎ "সাধর্ম্ম্য" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, "সামান্য" শব্দের প্রয়োগ করিবেন কেন? এবং নিত্য সংশয়প্রযোজকত্বই তাঁহার বক্তব্য হইলে "নিত্যত্ব"শব্দের প্রয়োগ করিবেন কেন? "নিত্যত্ব" শব্দের দ্বারাই বা ঐরূপ অর্থ কিরূপে বুঝা যায়? এই সমস্তও চিন্তা করা আবশ্যক। পরবর্ত্তী কালে যে স্বাধীন চিন্তাপরায়ণ অনেক নব্য নৈয়ায়িক ঐ সমস্ত চিন্তা করিয়াই উক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই, ইহাও এখানে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, বৃত্তিকার নিজে এখানে উক্ত বাক্যের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, সর্ব্বশেষে তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, গোত্ব প্রভৃতি জাতির নিত্যত্বের অনভ্যুপগম অর্থাৎ অস্বীকারের আপত্তি হয়। কারণ, ঐ সমস্ত জাতিতেও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত নিত্যত্ব সংশয় হইতে পারে। অর্থাৎ যদি বিশেষ ধর্ম্ম দর্শন হইলেও সমানধর্ম্ম দর্শনজন্য সর্ব্বদাই সংশয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে ঘটত্বাদি জাতিকে নিত্য বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বকে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সমান ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৎপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য, কি অনিত্য? এইরূপ সংশয় সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও তিনি করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে ঐ ঘটত্বাদি জাতিরও নিত্যত্ব নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ, তাহাতে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সমান ধর্ম্ম প্রমেয়ত্ব বিদ্যমান আছে। সুতরাং তৎপ্রযুক্ত তাহাতেও নিত্যত্ব সংশয় অবশ্যই জন্মিবে। তাহা হইলে আর তাহাতেও কখনই নিত্যত্ব নিশ্চয় জন্মে না, ইহা তাঁহার স্বীকার্য্য। "ন্যায়সূত্রবিবরণ"-কার গোস্বামী ভট্টাচার্য্য পরে এই নবীন ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সূত্রে মহর্ষির "নিত্যত্বানভ্যুপগমাচ্চ সামান্যস্য" এই চরম উত্তরবাক্যের দ্বারা আমরা তাঁহার চরম বক্তব্য বুঝিতে পারি যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে বিশেষধর্ম্ম নিশ্চয় সত্ত্বেও শব্দে উক্তরূপ সংশয় স্বীকার করিয়া, প্রতিবাদী শব্দের অনিত্যত্ব অস্বীকার করিলে, বাদী তাঁহাকে বলিবেন যে, তাহা হইলে তুমি ত ঘটত্বাদি জাতির নিত্যত্ব স্বীকারও কর না, করিতে পার না। কারণ, ঘটত্বাদি জাতিতেও নিত্য আত্মা ও অনিত্য ঘটের সমান ধর্ম্ম প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি বিদ্যমান থাকায় তোমার

যুক্তানুসারেই তাহাতেও উক্তরূপ সংশয় স্বীকার করিতে তুমি বাধ্য। সুতরাং ঘটত্বাদি জাতিতেও নিত্যানিত্যত্ব-সংশয়বশতঃ উহার নিত্যত্ব স্বীকারও তুমি কর না, ইহা তোমাকে বলিতেই হইবে। কিন্তু তাহা হইলে তুমি আর শব্দে উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিতে পার না। কারণ, তুমি ঘটত্বাদি জাতিকে নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াই ঐ সংশয় সমর্থন করিয়াছ। কিন্তু ঐ ঘটত্বাদি জাতির নিত্যত্ব অস্বীকার করিতে বাধ্য হইলে তোমার ঐ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে অসদুত্তর, ইহা তোমারও স্বীকার্য্য। মহর্ষির উক্ত বাক্যের এইরূপই তাৎপর্য্য হইলে উহার সম্যক্ সার্থক্যও বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যায় উক্ত বাক্যের বিশেষ প্রয়োজনও বুঝা যায় না। মূলকথা, শব্দে প্রযত্ন-জন্যত্ব হেতুর নিশ্চয় হইলে শব্দের অনিত্যত্বেরই নিশ্চয় হইবে। কারণ, যাহা প্রযত্নজন্য অর্থাৎ কাহারও প্রযত্ন ব্যতীত যাহার সত্তাই সিদ্ধ হয় না, তাহা অনিত্য, ইহা সিদ্ধই আছে। সুতরাং প্রযত্ন-জন্যত্ব অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম্ম এবং উহা শব্দের বিশেষধর্ম্ম। ঐ বিশেষধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে তাহাতে অনিত্যত্বেরই নিশ্চয় হওয়ায় আর তাহাতে নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মিতেই পারে না। প্রতিবাদী তখনও উহাতে সংশয় স্বীকার করিলে চিরকালই সর্ব্বত্র সংশয় জন্মিবে। কুত্রাপি কোন সংশয়েরই উচ্ছেদ হইতে পারে না। প্রতিবাদী সত্যের অপলাপ করিয়া তাহাই স্বীকার করিলে, তিনি যে সমস্ত অনুমানের দ্বারা বাদীর হেতুর দুষ্টত্ব সাধন করিবেন, তাহাতে ও তাঁহার সাধ্যাদি বিষয়ে প্রমেয়ত্বাদি সমান ধর্ম্মজ্ঞানজন্য সংশয় স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য হইবেন। তাহা হইলে, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ঐ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে অসদুত্তর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। পূর্ব্ববৎ স্বব্যাঘাতকত্বই উক্ত জাতির সাধারণ দুষ্টত্বমূল। যুক্তাঙ্গহানি অসাধারণ দুষ্টত্বমূল। কারণ, বিশেষধর্ম্মদর্শনের অভাববিশিষ্ট সমানধর্ম্মদর্শনই সংশয়বিশেষের কারণ হওয়ায় বিশেষধর্ম্ম দর্শনের অভাব ঐ কারণের যুক্ত অঙ্গ অর্থাৎ অত্যাবশ্যক বিশেষণ বা সহকারী। প্রতিবাদী উহা অস্বীকার করিয়া, কেবল সমানধর্ম্ম দর্শনজন্যই সংশয় সমর্থনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর করায় যুক্তাঙ্গহানি-বশতঃও তাঁহার ঐ উত্তর দুষ্ট হইয়াছে, উহা সদুত্তর নহে ॥ ১৫ ॥

সংশয়সম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সূত্র। উভয়-সাধর্ম্ম্যাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধেঃ প্রকরণসমঃ॥ ॥১৬॥৪৭৭॥

অনুবাদ। উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত "প্রক্রিয়া"সিদ্ধি অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তির সিদ্ধিবশতঃ (প্রত্যবস্থান) (১৫) প্রকরণসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। উভয়েন নিত্যেন চানিত্যেন চ সাধর্ম্ম্যাৎ পক্ষপ্রতিপক্ষয়োঃ প্রবৃত্তিঃ প্রক্রিয়া—অনিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদ্‌ঘটবদিত্যেকঃ পক্ষং

প্রবর্ত্তয়তি। দ্বিতীয়শ্চ নিত্যসাধর্ম্ম্যাৎ প্রতিপক্ষং প্রবর্ত্তয়তি—নিত্যঃ শব্দঃ শ্রাবণত্বাৎ, শব্দত্ববদিতি। এবঞ্চ সতি প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদিতি হেতুরনিত্যসাধর্ম্ম্যেণোচ্যমানো ন প্রকরণমতিবর্ত্ততে,—প্রকরণানতিবৃত্তের্নির্ণয়ানির্ব্বর্ত্তনং, সমানঞ্চৈতন্নিত্যসাধর্ম্ম্যেণোচ্যমানে হেতৌ। তদিদং প্রকরণানতিবৃত্ত্যা প্রত্যবস্থানং **প্রকরণসমঃ**। সমানঞ্চৈতদ্বৈধর্ম্ম্যেঽপি, উভয়বৈধর্ম্ম্যাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধেঃ **প্রকরণসম** ইতি।

অনুবাদ। উভয় পদার্থের সহিত (অর্থাৎ) নিত্য পদার্থের সহিত এবং অনিত্য পদার্থের সহিত সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তিরূপ "প্রক্রিয়া" (যথা) শব্দ অনিত্য, যেহেতু প্রযত্নজন্য, যেমন ঘট, এইরূপে এক ব্যক্তি (বাদী) পক্ষ অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্ব প্রবর্ত্তন (স্থাপন) করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও অর্থাৎ প্রতিবাদীও নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব প্রবর্ত্তন করিলেন—(যথা) শব্দ নিত্য, যেহেতু শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়, যেমন শব্দত্ব। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্তরূপে শব্দের নিত্যত্বসাধক হেতু প্রয়োগ করায় অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উচ্যমান "প্রযত্নজন্যত্বাৎ" এই বাক্যোক্ত হেতু অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্নজন্যত্ব হেতু প্রকরণকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান হয় না অর্থাৎ উহা প্রতিবাদীর সাধ্য প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণকে (শব্দের নিত্যত্বকে) অতিক্রম করিতে পারে না। প্রকরণের অনতিবর্ত্তনবশতঃ নির্ণয়ের অনুৎপত্তি হয় অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের নির্ণয় জন্মে না। নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উচ্যমান হেতুতেও ইহা সমান [অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর কথিত শব্দের নিত্যত্বসাধক (শ্রাবণত্ব) হেতুও বাদীর পক্ষরূপ প্রকরণকে (শব্দের অনিত্যত্বকে) অতিক্রম করিতে না পারায় উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্ম্ম নিত্যত্বেরও নির্ণয় জন্মে না] প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ সেই এই প্রত্যবস্থানকে (১৫) প্রকরণসম বলে। এবং ইহা বৈধর্ম্ম্যেও সমান, (অর্থাৎ) উভয় পদার্থের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধিবশতঃও প্রকরণসম প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা "প্রকরণসম" নামক প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ এই সূত্রেও "প্রত্যবস্থানং" এই পদের অধ্যাহার বা অনুবৃত্তি মহর্ষির অভিমত। সূত্রে "উভয়" শব্দের দ্বারা বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট উভয় পদার্থই এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত। বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তি অর্থাৎ স্থাপনই এখানে ভাষ্যকারের মতে সূত্রোক্ত "প্রক্রিয়া" শব্দের অর্থ। অর্থাৎ প্রথমে বাদীর নিজ পক্ষ স্থাপন, পরে প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ স্থাপন, ইহাকেই বলে

"প্রক্রিয়া"। বাদীর যাহা পক্ষ অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্ম, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, তাহা বাদীর প্রতিপক্ষ। উক্তরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নামই "প্রকরণ"। অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ সাধ্যধর্ম্মদ্বয়, যাহা সন্দেহের বিষয়, কিন্তু নির্ণীত হয় নাই, তাহাই ভাষ্যকারের মতে "প্রকরণ" শব্দের অর্থ এবং ঐ প্রকরণের স্থাপনই এই সূত্রে "প্রক্রিয়া" শব্দের অর্থ। প্রথম অধ্যায়ে "যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা" (২।৭) ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যারম্ভে ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "প্রকরণ" শব্দের উক্ত অর্থই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে "প্রক্রিয়তে সাধ্যত্বেনাধিক্রিয়তে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া "প্রকরণ" শব্দের ঐ অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সূত্রের ব্যাখ্যাতেও তিনি লিখিয়াছেন,—"প্রকরণস্য প্রক্রিয়মাণস্য সাধ্যস্যেতি যাবৎ"। আধুনিক কোন ব্যাখ্যাকার ঐ স্থানে প্রকরণ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সংশয়; কিন্তু উহা নিষ্প্রমাণ ও অসংগত। তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ এই সূত্রে "প্রক্রিয়া" শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্য ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে পূর্ব্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ-রূপ প্রকরণেরই নামান্তর প্রক্রিয়া। তাই তিনি এই "প্রকরণসম" প্রতিষেধকে "প্রক্রিয়া-সম" নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ অর্থে পূর্ব্বকালে "প্রক্রিয়া" শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও ভাষ্যকারোক্ত "প্রক্রিয়াসিদ্ধি"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন—স্বসাধ্যসিদ্ধি। কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের নিজের কথার দ্বারা তাঁহার মতে পূর্ব্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্থাপনই "প্রক্রিয়া"শব্দের অর্থ, ইহা বুঝা যায়। পরন্তু এখানে প্রক্রিয়া ও প্রকরণ একই পদার্থ হইলে মহর্ষি এই সূত্রে বিশেষ করিয়া প্রক্রিয়া শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? পরবর্ত্তী সূত্রেই বা "প্রকরণ" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এই সূত্রে "প্রক্রিয়া" শব্দের ফলিতার্থ বলিয়াছেন —বিপরীত পক্ষের সাধন। তিনি বিপরীত পক্ষকেই প্রক্রিয়া বলেন নাই। কিন্তু কেবল কোন এক পক্ষেরই সাধন বা সংস্থাপনই প্রক্রিয়া নহে। যথাক্রমে বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের সংস্থাপনই এখানে সূত্রোক্ত "প্রক্রিয়া"। সূত্রে "উভয়সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা উভয় পদার্থের বৈধর্ম্ম্যও বিবক্ষিত। অর্থাৎ উভয় পদার্থের সাধ্য ধর্ম্মের ন্যায় উভয় পদার্থের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া স্থলেও এই "প্রকরণসম" প্রতিষেধের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও শেষে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

ভাষ্যকার এখানে নিত্য ও অনিত্য, এই উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক "প্রকরণসম" প্রতিষেধের উদাহরণ দ্বারা সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা, কোন বাদী বলিলেন,— "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ ঘটবৎ"। অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা প্রযত্নের অনন্তর-ভাবী অর্থাৎ প্রযত্নজন্য। যাহা যাহা প্রযত্নজন্য, সে সমস্তই অনিত্য, যেমন ঘট। এখানে শব্দে অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য প্রযত্নজন্যত্ব আছে বলিয়া তৎপ্রযুক্তই বাদী প্রথমে ঐ হেতুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। পরে প্রতিবাদী বলিলেন,—"শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববৎ"। অর্থাৎ শব্দ নিত্য, যে হেতু উহা শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যেমন শব্দত্ব জাতি। শব্দমাত্রে যে শব্দত্ব নামে জাতি

আছে, তাহা নিত্য বলিয়াই এখানে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ শব্দত্ব-জাতিবিশিষ্ট শব্দেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায় শব্দের ন্যায় ঐ শব্দত্ব জাতিও শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। "শ্রবণেন গৃহ্যতে" অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয়, এই অর্থে "শ্রবণ" শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন "শ্রাবণ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। শব্দে নিত্য শব্দত্ব জাতির সাধর্ম্ম্য শ্রাবণত্ব আছে বলিয়া তৎপ্রযুক্ত প্রতিবাদী উক্ত স্থলে "শ্রাবণত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া শব্দত্ব জাতির ন্যায় শব্দ নিত্য, ইহাই প্রতিবাদীর বক্তব্য। প্রতিবাদী পরে উক্তরূপে শব্দের নিত্যত্বসাধক উক্ত হেতু প্রয়োগ করিলেও বাদীর পূর্ব্বোক্ত অনিত্যত্বসাধক হেতুর তাহাতে কি হইবে? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন,—"এবঞ্চ সতি" ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শব্দের নিত্যত্বসাধক হেতু প্রয়োগ করায় বাদীর প্রযুক্ত প্রযত্নজন্যত্ব হেতু প্রকরণকে অতিক্রম করে না অর্থাৎ বাদীর নিজ পক্ষের ন্যায় প্রতিবাদীর নিত্যত্ব পক্ষকেও বাধিত করিতে পারে না। তাহাতে দোষ কি? তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ নিশ্চয়ের উৎপত্তি হয় না। ভাষ্যে "নির্ণয়ানির্ব্বর্ত্তনং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝা যায়। কারণ, তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "নির্ণয়ানিষ্পত্তিরিত্যর্থঃ"। "নির্ব্বর্ত্তন" শব্দের দ্বারা নিষ্পত্তি বা উৎপত্তি অর্থ বুঝা যায়। এইরূপ বাদী প্রথমে শব্দের অনিত্যত্বসাধক উক্ত হেতু প্রয়োগ করায় প্রতিবাদীর প্রযুক্ত উক্ত হেতুও প্রকরণকে অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং প্রতিবাদীর উক্ত পক্ষেরও নিশ্চয় জন্মে না, ইহা সমান। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে উভয় হেতুই কোন পক্ষকে বাধিত করিতে না পারায় উভয় পক্ষে সমানত্ববশতঃ কোন পক্ষের নির্ণয়েই সমর্থ হয় না। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে "প্রকরণসম" নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ-সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেও লিখিয়াছেন,—"উভয়পক্ষসাম্যাৎ প্রকরণমনতিবর্ত্তমানঃ প্রকরণসমো নির্ণয়ায় ন প্রকল্পতে।" সেখানে পরেও বলিয়াছেন,—"সোঽয়ং হেতুরুভৌ পক্ষৌ প্রবর্ত্তয়ন্নন্যতরস্য নির্ণয়ায় ন প্রকল্পতে" (প্রথম খণ্ড, ৩১৫—১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার এখানেও পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে নির্ণয়ের অনুৎপত্তি সমর্থন করিয়া, উক্ত স্থলে এই সূত্রোক্ত "প্রকরণসম" প্রতিষেধের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে "প্রকরণসম" প্রতিষেধ। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে স্থলে বাদী অথবা প্রতি-বাদীর হেতু প্রবল হয়, সেখানে উহা প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণকে বাধিত করিয়া নিজপক্ষ নির্ণয়ে সমর্থ হওয়ায় প্রতিপক্ষবাদী নিরস্ত হন। সুতরাং তিনি সেখানে আর কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন না। কিন্তু উক্ত স্থলে উভয় হেতুই তুল্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় কোন হেতুই প্রতিপক্ষকে বাধিত করিতে না পারায় বাদী ও প্রতিবাদী কেহই নিরস্ত হন না। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ পক্ষ নির্ণয়ের অভিমানবশতঃ অপর পক্ষকে বাধিত বলিয়া সমর্থন করেন। উক্ত স্থলে বাদীর ঐরূপ প্রত্যবস্থান "প্রকরণসম" প্রতিষেধ এবং প্রতিবাদীর ঐরূপ প্রত্যবস্থানও "প্রকরণসম" প্রতিষেধ। অর্থাৎ উক্ত স্থলে উভয়ের উত্তরই জাত্যুত্তর। সুতরাং উক্ত স্থলে উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত "প্রকরণসম"দ্বয়ই বুঝিতে হইবে। এইরূপ উভয় পদার্থের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্তও "প্রকরণসম"দ্বয়

বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন ; যথা,—কোন বাদী বলিলেন,—"শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ আকাশবৎ"। প্রতিবাদী বলিলেন,—"শব্দো নিত্যঃ অস্পর্শবত্ত্বাৎ ঘটবৎ"। বাদী নিত্য আকাশের বৈধর্ম্ম্য কার্য্যত্বপ্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত স্থলে নিত্য আকাশ বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত। প্রতিবাদী অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্ম্য স্পর্শশূন্যতাপ্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত স্থলে ঘট বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত। উক্ত উদাহরণেও পূর্ব্ববৎ বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যবস্থান "প্রকরণসম" প্রতিষেধ হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উভয় স্থল গ্রহণ করিয়া প্রকরণসমচতুষ্টয়ই বুঝিতে হইবে। উক্ত "প্রকরণসম" প্রতিষেধের প্রয়োগস্থলে প্রতিপক্ষের বাধ প্রদর্শনই বাদী ও প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বস্তুতঃ উক্ত স্থলে কোন পক্ষের বাধ নিশ্চয় না হইলেও বাদী ও প্রতিবাদী বিরুদ্ধ পক্ষের বাধনিশ্চয়ের অভিমানবশতঃই উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। তাই এই "প্রকরণসমা" জাতিকে বলা হইয়াছে,—"বাধদেশনাভাসা"। তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ অন্য ভাবে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে,[1] বাদী ও প্রতিবাদী নিজের হেতুর সহিত অপরের হেতুর তুল্যতা স্বীকার করিয়াই বিরোধী প্রমাণের দ্বারা অপরের হেতুর বাধিতত্বাভিমানবশতঃ যে প্রত্যবস্থান করেন, তাহাকে বলে "প্রক্রিয়াসম" বা "প্রকরণসম" প্রতিষেধ। তাঁহার মতে এই সূত্রে "উভয়সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা প্রতিপ্রমাণ অর্থাৎ বিরোধী প্রমাণমাত্রই বিবক্ষিত। সুতরাং বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও শব্দে অনিত্যত্বের বাধ সমর্থন করেন, তাহা হইলেও সেখানে "প্রকরণসম" প্রতিষেধ হইবে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ কিন্তু বলিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদী কোন প্রমাণান্তরের অধিকবলত্বের আরোপ করিয়া অর্থাৎ সেই প্রমাণান্তর বস্তুতঃ অধিকবলশালী না হইলেও তাহাকে অধিকবলশালী বলিয়া তদ্দ্বারা অপর পক্ষের বাধসমর্থন দ্বারা প্রত্যবস্থান করিলে তাহাকে বলে "প্রকরণসম" প্রতিষেধ। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী বলেন যে, আমার হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব পূর্ব্বেই সিদ্ধ হওয়ায় শব্দে নিত্যত্বের বাধনিশ্চয়বশতঃ তোমার দুর্ব্বল হেতুর দ্বারা আর শব্দে কখনই নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এবং প্রতিবাদী বলেন যে, আমার প্রবল হেতুর দ্বারা শব্দে নিত্যত্ব সিদ্ধই থাকায় তাহাতে অনিত্যত্বের বাধনিশ্চয়বশতঃ তোমার ঐ দুর্ব্বল হেতুর দ্বারা কখনই শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা বাধনিশ্চয় সমর্থন করিয়া, বাদী ও প্রতিবাদী উক্তরূপে প্রত্যবস্থান করিলেও তাহাও "প্রকরণসম" প্রতিষেধ হইবে, ইহা বৃত্তিকারেরও সম্মত বুঝা যায়। "প্রকরণসম" অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাসের প্রয়োগ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্তরূপে প্রতিপক্ষের বাধনিশ্চয় সমর্থন করেন না। কিন্তু উভয় পক্ষের সংশয়ই সমর্থন করেন।

১। তুল্যত্বমভ্যুপেত্যৈব পরহেতোঃ স্বহেতুনা।
বাধেন প্রত্যবস্থানং প্রক্রিয়াসম ঈর্য্যতে ॥২০॥
স্বতুল্যপরত্বানধিকবলেন প্রতিপ্রমাণেন পরকীয়হেতোর্বাধাভিমানেন প্রত্যবস্থানং প্রকরণসমা জাতিঃ।—তার্কিকরক্ষা।

সুতরাং উহা হইতে এই "প্রকরণসমা" জাতির ভেদ আছে। পরবর্ত্তী সূত্রে ইহা পরিস্ফুট হইবে। পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" ও "সংশয়সমা" জাতিও এই "প্রকরণসমা" জাতির ন্যায় সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত হওয়ায় ভেদ আছে। অর্থাৎ এই "প্রকরণসমা" জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যথাক্রমে স্ব স্ব পক্ষ স্থাপন করেন। "সাধর্ম্ম্যসমা" ও "সংশয়সমা" জাতিস্থলে ঐরূপ হয় না। উদ্দ্যোতকর এখানে উক্তরূপ ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ ভেদ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "প্রকরণসমা" জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ নিশ্চয়ের দ্বারা আমি অপরের পক্ষের সাধনকে খণ্ডন করিব, এই বুদ্ধিবশতঃই প্রবৃত্ত হন। কিন্তু "সাধর্ম্ম্যসমা" ও "সংশয়সমা" জাতি স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধনের সহিত সাম্যমাত্রের আপত্তি প্রকাশ করিয়া উহার খণ্ডন করেন। কিন্তু নিজপক্ষ নিশ্চয়ের দ্বারা খণ্ডন করেন না, ইহাই বিশেষ। "প্রকরণসমা" জাতি স্থলেও যে সাম্যের আপাদন হইয়া থাকে, তাহা উভয়ের হেতুর সাম্য নহে। কিন্তু উভয়ের দূষণের সাম্য। সেই জন্যই "প্রকরণসম" নাম বলা হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং—

অনুবাদ। এই "প্রকরণসমে"র উত্তর—

সূত্র। প্রতিপক্ষাৎ প্রকরণসিদ্ধেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ প্রতিপক্ষোপপত্তেঃ ॥১৭॥৪৭৮॥

অনুবাদ। "প্রতিপক্ষ"প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রতিপক্ষ সাধনপ্রযুক্ত প্রকরণের (সাধ্য পদার্থের) সিদ্ধি হওয়ায় প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ নিজপক্ষের নিশ্চয় দ্বারা পরকীয় সাধনের প্রতিষেধ হইতে পারে না, যেহেতু প্রতিপক্ষের উপপত্তি হয়।

ভাষ্য। উভয়সাধর্ম্ম্যাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধিং ব্রুবতা প্রতিপক্ষাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধিরুক্তা ভবতি। যদ্যুভয়সাধর্ম্ম্যং, তত্র একতরঃ প্রতিপক্ষ—ইত্যেবং সত্যুপপন্নঃ প্রতিপক্ষো ভবতি। **প্রতিপক্ষোপপত্তেরনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ।** যদি প্রতিপক্ষোপপত্তিঃ প্রতিষেধো নোপপদ্যতে, অথ প্রতিষেধোপপত্তিঃ প্রতিপক্ষো নোপপদ্যতে। প্রতিপক্ষোপপত্তিঃ প্রতিষেধোপপত্তিশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধমিতি।

তত্ত্বানবধারণাচ্চ প্রক্রিয়াসিদ্ধির্ব্বিপর্য্যয়ে প্রকরণাবসানাৎ। তত্ত্বাবধারণে হ্যবসিতং প্রকরণং ভবতীতি।

অনুবাদ। উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধি যিনি বলিতেছেন, তৎ-কর্ত্তৃক প্রতিপক্ষ-সাধনপ্রযুক্তও প্রক্রিয়াসিদ্ধি উক্ত হইতেছে। (তাৎপর্য্য) যদি উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য থাকে, তাহা হইলে একতর প্রতিপক্ষ অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সাধন হয়। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রতিপক্ষেরও সাধন থাকিলে প্রতিপক্ষও উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়। প্রতিপক্ষের উপপত্তিবশতঃ প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। (তাৎপর্য্য) যদি প্রতিপক্ষের উপপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না, আর যদি প্রতিষেধের উপপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিপক্ষ উপপন্ন হয় না। প্রতিপক্ষের উপপত্তি এবং প্রতিষেধের উপপত্তি, ইহা বিপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ ঐ উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ।

তত্ত্বের অনবধারণপ্রযুক্তও প্রক্রিয়ার সিদ্ধি হয়, যেহেতু বিপর্য্যয় হইলে প্রকরণের অবসান (নিশ্চয়) হয়। (তাৎপর্য্য) যেহেতু তত্ত্বের অবধারণ হইলে প্রকরণ অর্থাৎ কোন এক পক্ষ অবসিত (নিশ্চিত) হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "প্রকরণসম" নামক প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন। সূত্রে প্রথমোক্ত "প্রতিপক্ষ" শব্দের দ্বারা প্রতিপক্ষের সাধন অর্থাৎ প্রতিপক্ষসাধক বাদী ও প্রতিবাদীর হেতুই বিবক্ষিত। কারণ, উহাই বাদী ও প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণের (সাধ্যধর্ম্মের) সাধকরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং তৎপ্রযুক্তই প্রকরণসিদ্ধি বলা যায়। মহর্ষির সূত্রানুসারে ভাষ্যকারও এখানে প্রথমে প্রতিপক্ষের সাধনকেই "প্রতিপক্ষ" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে প্রতিপক্ষের সাধক হেতু এবং প্রতিপক্ষবাদী পুরুষেও "প্রতিপক্ষ" শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের সাধনের খণ্ডন অর্থেও মহর্ষি-সূত্রে "প্রতিপক্ষ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমস্তই লাক্ষণিক প্রয়োগ (প্রথম খণ্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সূত্রের শেষোক্ত "প্রতিপক্ষ" শব্দের দ্বারা বাদী অথবা প্রতিবাদীর সাধ্যধর্ম্মই বিবক্ষিত। বাদীর যাহা পক্ষ অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্ম, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ, এবং প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, তাহা বাদীর প্রতিপক্ষ। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, প্রতিপক্ষের সাধনপ্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত উভয় সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধি স্থলে প্রতিপক্ষের সাধক হেতুর দ্বারাও প্রকরণসিদ্ধি বা সাধ্যনিশ্চয় হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। কেন উপপন্ন হয় না ? তাই মহর্ষি শেষে বলিয়াছেন,—"প্রতিপক্ষোপপত্তেঃ"। অর্থাৎ যেহেতু তাহা হইলে প্রতিপক্ষেরও নিশ্চয় হয়, ইহা স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্য এই যে, উক্তরূপ স্থলে প্রতিবাদীর সাধন বাদীর সাধনের সমান হইলেও তিনি যদি তাঁহার ঐ সাধনের দ্বারা তাঁহার নিজের সাধ্যনিশ্চয় স্বীকার করেন, তাহা হইলে বাদীর সাধনের দ্বারাও তাঁহার সাধ্যের নিশ্চয় হয়, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য। কারণ, উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রক্রিয়া-সিদ্ধি বলিলে প্রতিপক্ষের সাধনপ্রযুক্তও যে প্রক্রিয়াসিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যসিদ্ধি হয়, ইহা কথিতই হয়। সুতরাং উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী কেহই কেবল নিজসাধ্য নির্ণয়ের অভিমান করিয়া

তদ্দ্বারা পরকীয় সাধনের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে এই ভাবে সূত্র ও ভাষ্যের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন[১]। ভাষ্যকার তাঁহার প্রথমোক্ত কথার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, যদি উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য থাকে, তাহা হইলে একতর প্রতিপক্ষ অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সাধন হইবে। এখানেও "প্রতিপক্ষ" শব্দের দ্বারা প্রতিপক্ষের সাধনই কথিত হইয়াছে।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত "শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি বাদীর প্রয়োগে এবং পরে "শব্দো নিত্যঃ" ইত্যাদি প্রতিবাদীর প্রয়োগে যথাক্রমে অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত এবং নিত্য শব্দত্বের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত যে প্রক্রিয়াসিদ্ধি কথিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত সাধর্ম্ম্যদ্বয়ই (প্রযত্নজন্যত্ব ও শ্রাবণত্ব) সাধন বা হেতু। সুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিপক্ষের সাধনও আছে। নচেৎ উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য বলা যায় না। উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য, ইহা বলিলে সেই সাধর্ম্ম্যও উভয় এবং তন্মধ্যে একতর বা অন্যতর প্রতিপক্ষের সাধন, ইহা স্বীকৃতই হয়। তাহাতে প্রকৃত স্থলে ক্ষতি কি? তাই ভাষ্যকার মহর্ষির শেষোক্ত বাক্যানুসারে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে প্রতিপক্ষ উপপন্ন হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিপক্ষের সাধক হেতুও থাকায় প্রতিপক্ষেরও নিশ্চয় হয়, ইহা স্বীকার্য্য। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষের নিশ্চয়বশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে পরে বলিয়াছেন যে, প্রতিষেধের উপপত্তি হইলে প্রতিপক্ষের নিশ্চয় হয় না, এবং প্রতিপক্ষের নিশ্চয় হইলেও প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না, ঐ উভয় বিরুদ্ধ অর্থাৎ উহা একত্র সম্ভবই হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুকেও শব্দে অনিত্যত্বের নিশ্চায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে তিনি আর সেখানে নিজের হেতুর দ্বারা শব্দে নিত্যত্ব নিশ্চয় করিতে পারেন না। আর যদি তিনি নিজ হেতুর দ্বারা শব্দে নিত্যত্ব নিশ্চয় করেন, তাহা হইলে আর বাদীর হেতুকে শব্দে অনিত্যত্বের নিশ্চায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ, উহা একাধারে থাকে না। এইরূপ বাদীর পক্ষেও বুঝিতে হইবে। ফলকথা, প্রতিপক্ষ এবং উহার অভাব, এই উভয়ের নিশ্চয় কখনই একত্র সম্ভব নহে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঐ উভয়ের ব্যাঘাত বা বিরোধ সূচনা করিয়া, উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের উত্তরই যে স্বব্যাঘাতক, সুতরাং অসদুত্তর, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্ববৎ উক্ত উত্তরের সাধারণ দুষ্টত্বমূল স্বব্যাঘাতকত্ব এই সূত্রের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরন্তু উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই নিজ নিজ হেতুর দ্বারা নিজ নিজ সাধ্য নির্ণয়ের অভিমান করায় তাঁহাদিগের

১। এবং ব্যবস্থিতে সূত্রভাষ্যে যোজয়িতব্যে। "প্রতিপক্ষাৎ" প্রতিপক্ষসাধনাৎ প্রকরণস্য প্রক্রিয়মাণস্য সাধ্যস্যেতি যাবৎ সিদ্ধেঃ সমানাৎ স্বসাধনাৎ প্রতিষেধস্য প্রতিবাদিসাধনস্য স্বসাধ্যসিদ্ধিদ্বারেণ পরকীয়সাধন-প্রতিষেধস্যানুপপত্তিঃ। কস্মাৎ প্রতিষেধানুপপত্তিরিত্যত উক্তং "প্রতিপক্ষো[illegible]পপত্তেঃ"। ফলতঃ পরকীয়সাধনস্য সমানাৎ স্বসাধনাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধিঃ স্বসাধ্যসিদ্ধিং ব্রুবতা প্রতিপক্ষাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধিরুক্তা ভবতি প্রতিবাদিনা।—তাৎপর্য্যটীকা।

উভয় হেতুই যে তুল্যবল, ইহা তাঁহারা স্বীকারই করেন। সুতরাং উক্ত স্থলে তাঁহারা কেহই অপর পক্ষের বাধ নির্ণয় করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের আভিমানিক বাধনির্ণয় প্রকৃত বাধনির্ণয় নহে। কারণ, যে পর্য্যন্ত কেহ নিজ পক্ষের হেতুর অধিকবলশালিত্ব প্রতিপন্ন করিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত তিনি অপর পক্ষের বাধনির্ণয় করিতে পারেন না। উভয় হেতুর মধ্যে একতরের অধিকবলশালিত্বই ঐরূপ স্থলে বাধনির্ণয়ের যুক্তিসিদ্ধ অঙ্গ। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই ঐ যুক্ত অঙ্গ অস্বীকার করিয়া, অপর পক্ষের বাধ নির্ণয় করায় তাঁহাদিগের উভয়ের উত্তরই যুক্তাঙ্গহীনত্ববশতঃও অসদুত্তর। যুক্তাঙ্গহীনত্ব উক্ত উত্তরের সাধারণ দুষ্টত্বমূল। এই সূত্রের দ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, "প্রকরণসম" অর্থাৎ "সৎপ্রতিপক্ষ" নামক হেত্বাভাস স্থলেও ত বাদী ও প্রতিবাদী পূর্ব্ববৎ বিভিন্ন হেতুর দ্বারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সংস্থাপন করেন। সুতরাং তাহাও এই "প্রকরণসম" নামক জাত্যুত্তরই হওয়ায় বাদবিচারে তাহার উদ্ভাবন করা উচিত নহে। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বের অনবধারণ অর্থাৎ অনিশ্চয়প্রযুক্তও প্রক্রিয়াসিদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন স্থলে প্রতিবাদী তত্ত্বের অনবধারণ বা অনিশ্চয় সম্পাদন করিবার জন্যও অর্থাৎ উভয় পক্ষের সংশয় সমর্থনোদ্দেশ্যেও অন্য হেতুর দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের সংস্থাপন করেন। কারণ, বিপর্য্যয় হইলে অর্থাৎ বাদীর হেতুর দ্বারা তত্ত্বের অবধারণ হইলে প্রকরণ অর্থাৎ বাদীর পক্ষ নির্ণীতই হইয়া যায়। তত্ত্বের অনবধারণের বিপর্য্যয় অর্থাৎ অভাব তত্ত্বের অবধারণ। তাই ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "বিপর্য্যয়ে" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তত্ত্বাবধারণে"। ফলকথা, ভাষ্যকার "তত্ত্বাবধারণাচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পরে এখানে "প্রকরণসম" নামক হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, এই "প্রকরণসমা" জাতি হইতে উহার ভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ "প্রকরণসম" নামক হেত্বাভাসের প্রয়োগস্থলে যাহাতে বাদীর পক্ষের নির্ণয় না হয়—কিন্তু তত্ত্বের অনির্ণয় বা উভয় পক্ষের সংশয়ই সুদৃঢ় হয়, ইহাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। সেই জন্যই সেখানে প্রতিবাদী তুল্যবলশালী অন্য হেতুর দ্বারা প্রতিপক্ষেরও সংস্থাপন করেন। কিন্তু এই "প্রকরণসমা" জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে,[১] নিজসাধ্য নিশ্চয়ের দ্বারা অপরের সাধ্যকে বাধিত করিব, এই বুদ্ধিবশতঃই প্রতিবাদী হেতু প্রয়োগ করিলে, সেখানে "প্রকরণসম" নামক জাত্যুত্তর হয়। আর যেখানে বাদীর হেতুর তুল্যবলশালী অন্য হেতু বিদ্যমান থাকায় সৎপ্রতিপক্ষতাবশতঃ বাদীর হেতুকে অনিশ্চায়ক করিব অর্থাৎ বাদীর ঐ হেতু তাঁহার

১। নম্বেবং প্রকরণসমাহ্বয়ো হেত্বাভাসো নোদ্ভাবনীয়ঃ প্রতিবাদিনা, জাত্যুত্তরপ্রসঙ্গাদিত্যত আহ "তত্ত্বানবধারণাচ্চ প্রক্রিয়াসিদ্ধিঃ"। স্বসাধ্যনির্ণয়েন পরসাধনবিঘটনবুদ্ধ্যা প্রতিবাদিনা সাধনং প্রযুজ্যমানং প্রকরণসমাজাত্যুত্তরং ভবতি। সৎপ্রতিপক্ষতয়া বাদিনঃ সাধনমনিশ্চায়কং করোমীতি বুদ্ধ্যা প্রতিপক্ষসাধনং প্রযুঞ্জানো ন জাতিবাদী, সদুত্তরবাদিত্বাৎ। সৎপ্রতিপক্ষতায়া হেতুদোষস্য অনৈকান্তিকবদুপপাদিতত্বাৎ। "তত্ত্বানবধারণা"দিত্যনেন প্রকরণসমোদাহরণং দর্শিতং :—তাৎপর্য্যটীকা।

সাধ্যের নিশ্চায়ক হয় না, পরন্ত সংশয়েরই প্রয়োজক হয়, ইহা সমর্থন করিব—এই বুদ্ধিবশতঃ প্রতিবাদী প্রতিপক্ষের সাধন বা হেতু প্রয়োগ করেন, সেখানে উহাকে বলে "সৎপ্রতিপক্ষ" নামক হেত্বাভাসের উদ্ভাবন। উহা সদুত্তর, সুতরাং উহা করিলে তাহা জাত্যুত্তর হয় না। উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের হেতুই দুষ্ট হয়। সুতরাং সৎপ্রতিপক্ষতা হেতু দোষ। অতএব তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বাদবিচারেও উহার উদ্ভাবন কর্ত্তব্য। কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদী যদি ঐরূপ স্থলেও নিজসাধ্য নির্ণয়ের অভিমান করিয়া, তদ্দ্বারা অপর পক্ষের বাধ সমর্থন করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহাদিগের উভয়ের উত্তরই স্বব্যাঘাতক হওয়ায় জাত্যুত্তর হইবে। উহারই নাম "প্রকরণসমা" জাতি ॥১৭॥

প্রকরণসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

সূত্র। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধের্হেতোরহেতুসমঃ ॥১৮॥৪৭৯॥

অনুবাদ। হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৬) "অহেতুসম" প্রতিষেধ।

ভাষ্য। হেতুঃ সাধনং, তৎ সাধ্যাৎ পূর্ব্বং পশ্চাৎ সহ বা ভবেৎ। যদি পূর্ব্বং সাধনমসতি সাধ্যে কস্য সাধনং। অথ পশ্চাৎ, অসতি সাধনে কস্যেদং সাধ্যং। অথ যুগপৎ সাধ্যসাধনে, দ্বয়োর্ব্বিদ্যমানয়োঃ কিং কস্য সাধনং কিং কস্য সাধ্যমিতি হেতুরহেতুনা ন বিশিষ্যতে। অহেতুনা সাধর্ম্ম্যাৎ প্রত্যবস্থানমহেতুসমঃ।

অনুবাদ। হেতু বলিতে সাধন, তাহা সাধ্যের পূর্ব্বে, পশ্চাৎ অথবা সহিত অর্থাৎ সেই সাধ্যের সহিত একই সময়ে থাকিতে পারে। (কিন্তু) যদি পূর্ব্বে সাধন থাকে, (তখন) সাধ্য না থাকায় কাহার সাধন হইবে? আর যদি পশ্চাৎ সাধন থাকে, তাহা হইলে (পূর্ব্বে) সাধন না থাকায় ইহা কাহার সাধ্য হইবে? আর যদি সাধ্য ও সাধন যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে থাকে, তাহা হইলে বিদ্যমান উভয় পদার্থের মধ্যে কে কাহার সাধন ও কে কাহার সাধ্য হইবে? (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কালত্রয়েই হেতুর সিদ্ধি হইতে পারে না) এ জন্য হেতু অর্থাৎ যাহা হেতু বলিয়া কথিত হয়, তাহা অহেতুর সহিত বিশিষ্ট হয় না অর্থাৎ অহেতুর সহিত তাহার কোন বিশেষ না থাকায় তাহা অহেতুর তুল্য। অহেতুর সহিত সাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৬) অহেতুসম প্রতিষেধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা "অহেতুসম" প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্ব্ববৎ এই সূত্রেও "প্রত্যবস্থানং" এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে (১৬) অহেতুসম প্রতিষেধ, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য। সূত্রে "হেতু" শব্দের দ্বারা এখানে জনক ও জ্ঞাপক, এই উভয় হেতুই বিবক্ষিত। কারণ, জনক হেতুকে গ্রহণ করিয়াও উক্তরূপ প্রতিষেধ হইতে পারে। পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকারও উহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও ভাষ্যকারোক্ত "সাধন" শব্দের দ্বারা কার্য্যের জনক হেতু ও জ্ঞাপক হেতু, এই উভয় এবং "সাধ্য" শব্দের দ্বারাও কার্য্য ও জ্ঞাপনীয় পদার্থ, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে বুঝা যায়। ভাষ্যকার প্রতিবাদীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য এখানে হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যাহা হেতু বলিয়া কথিত হইবে, তাহা সাধ্যের পূর্ব্বকালে অথবা পরকালে অথবা সমকালে অর্থাৎ সাধ্যের সহিত একই সময়ে জন্মিতে পারে বা থাকিতে পারে। কারণ, উহা ভিন্ন আর কোন কাল নাই; কিন্তু উহার কোন কালেই হেতু সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, হেতু যদি সাধ্যের পূর্ব্বেই জন্মে বা থাকে, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে তখন ঐ সাধ্য না থাকায় ঐ হেতু কাহার সাধন হইবে? যাহা তখন নাই, তাহার সাধন বলা যায় না। আর যদি ঐ হেতু ঐ সাধ্যের পরকালেই জন্মে বা থাকে, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে ঐ সাধ্যের পূর্ব্বে ঐ হেতু না থাকায় উহা কাহার সাধ্য হইবে? হেতুর পূর্ব্বকালবর্ত্তী পদার্থ উহার সাধ্য হইতে পারে না। কারণ, সমানকালীন না হইলে সাধ্য ও সাধনের সম্বন্ধ হইতে পারে না। সমানকালীনত্ব ঐ সম্বন্ধের অঙ্গ। সুতরাং যদি ঐ সাধ্য ও হেতু যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে জন্মে বা থাকে, ইহাই বলা যায়, তাহা হইলে ঐ উভয় পদার্থই সমকালে বিদ্যমান থাকায় উহার মধ্যে কে কাহার সাধন ও কে কাহার সাধ্য হইবে? অর্থাৎ তাহা হইলে ঐ উভয়ের সাধ্য-সাধন-ভাব নির্ণয় করা যায় না। কারণ, উভয়ই উভয়ের সাধ্য ও সাধন বলা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কালত্রয়েই যখন হেতুর সিদ্ধি হয় না, তখন ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ যাহা হেতু বলিয়া কথিত হইতেছে, তাহা অন্যান্য অহেতুর সহিত তুল্য হওয়ায় উহা হেতুই হয় না। কারণ, বাদী যে সমস্ত পদার্থকে তাঁহার সাধ্যের সাধন বা হেতু বলেন না, সেই সমস্ত পদার্থের সহিত তাঁহার কথিত হেতুর কোন বিশেষ নাই। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর কথিত হেতুতে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি সমর্থন করিয়া, অহেতুর সহিত উহার সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান করিলে উহাকে বলে (১৬) "অহেতু-সম" প্রতিষেধ। উক্ত প্রতিষেধ স্থলে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রতিকূল তর্কের দ্বারা হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি সমর্থন করিয়া উহার হেতুত্ব বা সাধ্য-সাধন-ভাবই প্রতিবাদীর দূষ্য অর্থাৎ খণ্ডনীয়। অর্থাৎ সর্ব্বত্র কার্য্যকারণভাব ও জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব বা প্রমাণ-প্রমেয়ভাব খণ্ডন করাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহর্ষি নিজেই উক্ত জাতির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদীর বক্তব্য বুঝাইয়াছেন এবং পরে সেখানে উহার খণ্ডনও করিয়াছেন। তাই "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও উক্ত জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,—"সেয়ং জাতিঃ সূত্রকারৈরেব প্রমাণপরীক্ষায়া-মুদাহৃতৈব 'প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধে'রিতি" ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং—

অনুবাদ। এই "অহেতুসম" প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র। ন হেতুতঃ সাধ্যসিদ্ধেস্ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিঃ ॥ ॥১৯॥৪৮০॥

অনুবাদ। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি নাই, যেহেতু হেতুদ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হয় অর্থাৎ কারণ দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি ও প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়ের জ্ঞান হয়।

ভাষ্য। ন ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিঃ। কস্মাৎ? **হেতুতঃ সাধ্যসিদ্ধেঃ।** নির্ব্বর্ত্তনীয়স্য নির্ব্বৃত্তির্ব্বিজ্ঞেয়স্য বিজ্ঞানমুভয়ং কারণতো দৃশ্যতে। সোহয়ং মহান্ প্রত্যক্ষবিষয় উদাহরণমিতি। যত্তু খলূক্তং—**অসতি সাধ্যে কস্য সাধন**মিতি—যত্তু নির্ব্বর্ত্ত্যতে যচ্চ বিজ্ঞাপ্যতে তস্যেতি।

অনুবাদ। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি নাই। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু, হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হয়। বিশদার্থ এই যে, উৎপাদ্য পদার্থের উৎপত্তি ও বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান, এই উভয়ই "কারণ" দ্বারা অর্থাৎ জনক দ্বারা এবং প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হয়। সেই ইহা মহান্ প্রত্যক্ষবিষয় উদাহরণ। যাহা কিন্তু উক্ত হইয়াছে—(প্রশ্ন) সাধ্য না থাকিলে কাহার সাধন হইবে? (উত্তর) যাহাই উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার সাধন হইবে [অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বকালে থাকিয়া উহার জনক পদার্থ উহার সাধন বা কারণ হইয়া থাকে এবং যাহা বিজ্ঞাপিত বা বোধিত হয়, তাহার বিজ্ঞাপক পদার্থ যে কোন কালে থাকিয়া উহার সাধন অর্থাৎ প্রমাণ হইয়া থাকে।]

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত "অহেতুসম" প্রতিষেধের উত্তর বলিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত "অহেতুসম" প্রতিষেধের প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী যে, বাদীর হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি সমর্থন করেন, বস্তুতঃ তাহা নাই। কেন নাই, তাই বলিয়াছেন,—"হেতুতঃ সাধ্যসিদ্ধেঃ"। এখানে "হেতু" শব্দের দ্বারা জনক হেতু অর্থাৎ কার্য্যের কারণ এবং জ্ঞাপক হেতু অর্থাৎ প্রমাণ, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং "সাধ্য" শব্দের দ্বারাও কারণসাধ্য কার্য্য এবং প্রমাণসাধ্য অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা বিজ্ঞেয় পদার্থ, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং 'সিদ্ধি" শব্দের দ্বারাও কার্য্য পক্ষে উৎপত্তি এবং বিজ্ঞেয় পদার্থ পক্ষে বিজ্ঞান বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকারও মহর্ষির উক্ত বাক্যের ঐরূপই ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যে "কারণ" শব্দের দ্বারাও কার্য্য পক্ষে জনক এবং বিজ্ঞেয় পক্ষে বিজ্ঞাপক প্রমাণই গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই ইহা মহান্ প্রত্যক্ষবিষয় উদাহরণ। অর্থাৎ কারণ দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি এবং প্রমাণ দ্বারা প্রমেয়জ্ঞান বহু স্থলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ঐ সমস্ত উদাহরণ দ্বারা সর্ব্বত্রই ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য হওয়ায় হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হইতেই পারে না। তবে হেতু যদি সাধ্যের পূর্ব্বেই থাকে, তাহা হইলে তখন সাধ্য না থাকায় উহা কাহার সাধন হইবে? এই যাহা প্রতিবাদী বলিয়াছেন, তাহার উত্তর বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার পরে ঐ কথার উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, যাহা উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহারই সাধন হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকিয়া উহার জনক পদার্থ উহার সাধন বা কারণ হইতে পারে। পূর্ব্বে ঐ কার্য্য বিদ্যমান না থাকিলেও উহার জনক পদার্থকে পূর্ব্বেও উহার সাধন বা কারণ বলা যায়। অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও বুদ্ধিস্থ সেই কার্য্যকে গ্রহণ করিয়াও উহার পূর্ব্ববর্ত্তী জনক পদার্থে কারণত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে ও হইতে পারে। এবং যে প্রমাণ দ্বারা উহার প্রমেয়বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, সেই প্রমাণ কোন স্থলে সেই প্রমেয় বিষয়ের পূর্ব্বকালে এবং কোন স্থলে পরকালে এবং কোন স্থলে সমকালেও বিদ্যমান থাকিয়া, উহার বিজ্ঞাপক বা প্রমাণ হইয়া থাকে ও হইতে পারে। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণের পূর্ব্বোক্ত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি খণ্ডন করিতে "ত্রৈকাল্যাপ্রতিষেধশ্চ" ইত্যাদি (১৷১৫) সূত্রের দ্বারা উহার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বে সেখানে উহার সমস্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধির খণ্ডন করিয়াছেন। ফলকথা, হেতু যে সাধ্যের পূর্ব্বকালাদি কোন কালেই থাকিয়া হেতু হইতে পারে না, ইহা সমর্থন করিতে প্রতিবাদী যে প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শন করেন, তাহার মূল বা অঙ্গীভূত ব্যাপ্তি নাই। তিনি কোন হেতুতেই ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া ঐরূপ তর্ক প্রদর্শন করেন নাই এবং করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার প্রদর্শিত ঐ তর্কের অঙ্গ ব্যাপ্তি না থাকায় উহা যুক্তাঙ্গহীন হওয়ায় উহার দ্বারা তিনি হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি সমর্থন করিতে পারেন না, সুতরাং তদ্দ্বারা সর্ব্বত্র হেতুর হেতুত্ব বা সাধ্যসাধন-ভাবের খণ্ডন করিতেও পারেন না। বস্তুতঃ প্রতিবাদীর উক্ত তর্ক যুক্তাঙ্গহীন হওয়ায় উহা প্রতিকূল তর্কই নহে, কিন্তু প্রতিকূল তর্কাভাস। তাই এই "অহেতুসমা" জাতিকে বলা হইয়াছে—"প্রতিকূলতর্কদেশনাভাসা"। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা উক্ত জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদীর আশ্রিত পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিকূল তর্কের যুক্তাঙ্গহীনত্ব সূচনা করিয়া, উহা যে, প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরের অসাধারণ দুষ্টত্বের মূল, ইহা সূচনা করিয়া গিয়াছেন এবং সাধ্য ও সাধন সমানকালীন না হইলে ঐ উভয়ের সম্বন্ধ সম্ভব নহে, ইহা বলিয়া প্রতিবাদী ঐ উভয়ের সমান-কালীনত্বকে ঐ উভয়ের সম্বন্ধের অঙ্গ বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক ঐরূপ উত্তর করায় অযুক্ত অঙ্গের স্বীকারও তাঁহার ঐ উত্তরের দুষ্টত্বের মূল, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। কারণ, সাধ্য ও সাধনের সম্বন্ধের পক্ষে ঐ উভয়ের সমানকালীনত্ব অনাবশ্যক, সুতরাং উহা অঙ্গ নহে॥১৯॥

সূত্র। প্রতিষেধানুপপত্তেশ্চ প্রতিষেদ্ধব্যাপ্রতিষেধঃ ॥২০॥৪৮১॥

অনুবাদ। "প্রতিষেধে"র (প্রতিষেধক হেতুর) অনুপপত্তিবশতঃও অর্থাৎ প্রতিবাদীর নিজ মতানুসারে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ তাঁহার প্রতিষেধক ঐ হেতুও অসিদ্ধ হওয়ায় (তাঁহার) প্রতিষেদ্ধব্য বিষয়ের প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। পূর্ব্বং পশ্চাদ্‌যুগপদ্বা "প্রতিষেধ" ইতি নোপপদ্যতে। প্রতিষেধানুপপত্তেঃ স্থাপনাহেতুঃ সিদ্ধ ইতি।

অনুবাদ। "প্রতিষেধ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক হেতু (ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি) পূর্ব্বকালে, পরকালে অথবা যুগপৎ থাকে, ইহা উপপন্ন হয় না। "প্রতিষেধে"র অনুপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ প্রতিবাদীর নিজ মতানুসারে তাঁহার কথিত প্রতিষেধক হেতুও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ অসিদ্ধ হওয়ায় স্থাপনার হেতু অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক হেতু সিদ্ধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "অহেতুসম" প্রতিষেধ যে স্বব্যাঘাতক, ইহা সমর্থন করিয়া, উহার দুষ্টত্বের সাধারণ মূলও প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্ববৎ স্বব্যাঘাতকত্বই সেই সাধারণ মূল। যুক্তাঙ্গহানি ও অযুক্ত অঙ্গের স্বীকার অসাধারণ মূল। পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদ্দ্বারা প্রতিষেধ করা হয়, এই অর্থে এই সূত্রে প্রথমোক্ত "প্রতিষেধ" শব্দের দ্বারা উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিষেধক হেতুই বিবক্ষিত। সূত্রানুসারে ভাষ্যকারও প্রতিষেধক হেতু অর্থেই "প্রতিষেধ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুর হেতুত্বের প্রতিষেধ করিতে অর্থাৎ উহার অভাব সাধন করিতে হেতু বলিয়াছেন—"ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি"। সুতরাং উহাই তাঁহার গৃহীত প্রতিষেধক হেতু। কিন্তু যদি ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ বাদীর প্রযুক্ত হেতুর অসিদ্ধি হয়, উহার হেতুত্বই না থাকে, তাহা হইলে প্রতিবাদীর ঐ হেতুও অসিদ্ধ হইবে, উহাও হেতু হইতে পারে না। কারণ, প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক হেতুও ত উহার সাধ্য প্রতিষেধের পূর্ব্বকালে অথবা পরকালে অথবা যুগপৎ থাকিয়া প্রতিষেধ সাধন করিতে পারে না—ইহা তাঁহারই কথিত যুক্তিবশতঃ স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য। সুতরাং তাঁহার কথিত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ তাঁহার ঐ প্রতিষেধক হেতুও অসিদ্ধ হওয়ায় তিনি উহার দ্বারা তাঁহার প্রতিষেধ্য বিষয়ের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। অর্থাৎ উহার দ্বারা বাদীর নিজ পক্ষস্থাপক হেতুর হেতুত্ব যাহা প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য, তাহার প্রতিষেধ হয় না। সুতরাং উহার হেতুত্বই সিদ্ধ থাকায় ঐ হেতু সিদ্ধই আছে। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির এই চরম বক্তব্যই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। ফলকথা, প্রতিবাদী যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ বাদীর হেতুকে অসিদ্ধ বলিয়া উক্তরূপ উত্তর করেন, সেই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ তাঁহার নিজের ঐ হেতুও অসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য

হওয়ায় পরে বাদীর হেতুকে সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেই তিনি বাধ্য হইবেন। সুতরাং তাঁহার ঐ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় কোনরূপেই উহা সদুত্তর হইতে পারে না, উহা অসদুত্তর। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে সংশয় পরীক্ষার পরে প্রমাণসামান্য পরীক্ষায় মহর্ষি ইহা বিশদরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বার্ত্তিককার ও তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি সেখানেই মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বোক্ত "অহেতুসম" প্রতিষেধের কোন ব্যাখ্যাদি না করিয়া লিখিয়াছেন,—"সূত্রভাষ্যবার্ত্তিকানি প্রমাণসামান্যপরীক্ষাব্যাখ্যানেন ব্যাখ্যাতানি"। ২৩ ॥

অহেতুসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

সূত্র। অর্থাপত্তিতঃ প্রতিপক্ষসিদ্ধেরর্থাপত্তিসমঃ ॥ ॥২১ ॥৪৮২॥

অনুবাদ। অর্থাপত্তি দ্বারা প্রতিপক্ষের (বিরুদ্ধ পক্ষের) সিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৭) অর্থাপত্তিসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। 'অনিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদ্‌ঘটব'দিতি স্থাপিতে পক্ষে অর্থাপত্ত্যা প্রতিপক্ষং সাধয়তো**ঽর্থাপত্তিসমঃ**। যদি প্রযত্নানন্তরীয়-কত্বাদনিত্যসাধর্ম্ম্যাদনিত্যঃ শব্দ ইত্যর্থাদাপদ্যতে নিত্যসাধর্ম্ম্যান্নিত্য ইতি। অস্তি চাস্য নিত্যেন সাধর্ম্ম্যমস্পর্শত্বমিতি।

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু প্রযত্নজন্য, যেমন ঘট—এইরূপে পক্ষ স্থাপিত হইলে অর্থাপত্তির দ্বারা অর্থাৎ অর্থাপত্ত্যাভাসের দ্বারা প্রতিপক্ষ-সাধনকারী প্রতি-বাদীর (১৭) **অর্থাপত্তিসম** প্রতিষেধ হয়। যথা—যদি প্রযত্নজন্যত্বরূপ অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা কথিত হয়; তাহা হইলে নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য, ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ বাদীর পূর্ব্বোক্ত ঐ বাক্যের দ্বারা অর্থতঃ ইহা বুঝা যায়) এই শব্দের নিত্য পদার্থের সহিত স্পর্শ-শূন্যতারূপ সাধর্ম্ম্যও আছে।

টিপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা ক্রমানুসারে "অর্থাপত্তিসম" প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ এই সূত্রেও "প্রত্যবস্থানং" এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত। কোন বক্তা কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ যে অনুক্ত অর্থের যথার্থ বোধ জন্মে, তাহাকে বলে অর্থাপত্তি, এবং উহার সাধন বা করণকে বলে অর্থাপত্তিপ্রমাণ। মীমাংসকসম্প্রদায়ের মতে উহা একটী অতিরিক্ত প্রমাণ। কিন্তু মহর্ষি গোতমের মতে উহা অনুমানপ্রমাণের অন্তর্গত। যেমন কোন বক্তা "জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই", এই বাক্য বলিলে, ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়

যে, দেবদত্ত বাহিরে আছেন। কারণ, জীবিত ব্যক্তি গৃহে না থাকিলে অন্যত্র তাঁহার সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ তাহার জীবিতত্ব ও গৃহে অসত্তার উপপত্তি হয় না। সুতরাং উক্ত স্থলে যে ব্যক্তিতে অন্যত্র বিদ্যমানতা নাই, তাহাতে জীবিতত্ব ও গৃহে অসত্তা নাই, এইরূপে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ সেই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট (জীবিতত্ব সহিত গৃহে অসত্তা) হেতুর দ্বারা দেবদত্ত বাহিরে আছেন, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত বক্তা, বাক্যের দ্বারা উহা না বলিলেও তিনি যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহার অর্থতঃ ঐ অনুক্ত অর্থের যথার্থ বোধ জন্মিয়া থাকে। এ জন্য উহা অর্থাপত্তি নামে কথিত হইয়াছে এবং যদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্থলে অর্থতঃ আপত্তি অর্থাৎ যথার্থবোধ জন্মে, এই অর্থে অর্থাপত্তি প্রমাণেও "অর্থাপত্তি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। গৌতম মতে উহা প্রমাণান্তর না হইলেও প্রমাণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে মহর্ষি উক্ত বিষয়ে নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু যে স্থলে বক্তার কথিত কোন পদার্থে তাহার অনুক্ত অর্থের ব্যাপ্তি নাই, সেখানে অর্থাপত্তির দ্বারা সেই অর্থের যথার্থবোধ জন্মে না। সেখানে কেহ সেই অনুক্ত অর্থ বুঝিলে, তাহার সেই ভ্রমাত্মক বোধের করণ প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে,—উহাকে বলে "অর্থাপত্ত্যাভাস"। এই সূত্রে "অর্থাপত্তি" শব্দের দ্বারা ঐ অর্থাপত্ত্যাভাসই গৃহীত হইয়াছে। প্রতিবাদী ঐ অর্থাপত্ত্যাভাসের দ্বারা প্রতিপক্ষের অর্থাৎ বাদীর বিরুদ্ধ পক্ষের সিদ্ধি সমর্থন করিয়া প্রত্যবস্থান করিলে, তাহাকে বলে "অর্থাপত্তিসম" প্রতিষেধ[1]। ভাষ্যকার উদাহরণ দ্বারা ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদ্ঘটবৎ" ইত্যাদি ন্যায়বাক্যের দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি অর্থাপত্তির দ্বারা অর্থাৎ যাহা প্রকৃত অর্থাপত্তি নহে, কিন্তু অর্থাপত্ত্যাভাস, তদ্দ্বারা প্রতিপক্ষের অর্থাৎ শব্দে নিত্যত্ব পক্ষের সাধন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তর "অর্থাপত্তিসম" প্রতিষেধ হইবে। যেমন প্রতিবাদী যদি উক্ত স্থলে বলেন যে, অনিত্য পদার্থের (ঘটের) সাধর্ম্ম্য প্রযত্নজন্যত্বপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা বলিলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায় যে, নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য। আকাশাদি অনেক নিত্য পদার্থের সহিত শব্দের স্পর্শশূন্যতারূপ সাধর্ম্ম্যও আছে। সুতরাং তৎপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য, ইহা সিদ্ধ হইলে বাদী উহাতে অনিত্যত্ব সাধন করিতে পারেন না। উক্তরূপে বাদীর অনুমানে বাধ অথবা পরে সৎপ্রতিপক্ষ-দোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" প্রভৃতি কোন কোন জাতির প্রয়োগস্থলেও প্রতিবাদী এইরূপ প্রত্যবস্থান করেন। কিন্তু সেই সমস্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বর্ণন করেন না। অর্থাৎ বাদীর বাক্য দ্বারাই অর্থতঃ ঐরূপ বুঝা যায়, ইহা বলেন না। কিন্তু এই "অর্থাপত্তিসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর যাহা তাৎপর্য্য বিষয় নহে, এমন অর্থও তাঁহার তাৎপর্য্যবিষয় বলিয়া কল্পনা করিয়া, উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। সুতরাং ইহা ভিন্ন প্রকার জাতি। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে লিখিয়াছেন,—"ন সাধর্ম্ম্যসমাদৌ বাদ্যভিপ্রায়বর্ণনমিত্যতো ভেদঃ"।

১। উক্তবিপরীতাক্ষেপশক্তিরর্থাপত্তিঃ,—তত্তদাভাসো লক্ষ্যতে। অর্থাপত্ত্যাভাসাৎ প্রতিপক্ষসিদ্ধিমভিধায় প্রত্যবস্থানমর্থাপত্তিসম ইত্যর্থঃ।—তার্কিকরক্ষা।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিধি হইলে উহার দ্বারা শেষের নিষেধ বুঝা যায়, এইরূপ ভ্রমই এই "অর্থাপত্তিসমা" জাতির উত্থানের হেতু। অর্থাৎ ঐরূপ ভ্রমবশতঃই প্রতিবাদী উক্তরূপ অসদুত্তর করেন। যেমন কোন বাদী শব্দ অনিত্য, এই বাক্য বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে অন্য সমস্তই নিত্য, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থও নিত্য হওয়ায় দৃষ্টান্ত সাধ্যশূন্য হয়। তাহা হইলে বিরোধদোষ হয়। এইরূপ কোন বাদী অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অনিত্য, ইহা বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত নিত্য, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। তাহা হইলে বাদীর অনুমানে সৎপ্রতিপক্ষদোষ হয়। এইরূপ কোন বাদী অনুমানপ্রযুক্ত অনিত্য, ইহা বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। তাহা হইলে বাদীর অভিমত অনুমানে বাধদোষ হয়। এইরূপ কোন বাদী কার্য্যত্ব হেতুকে অনিত্যত্বের সাধক বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে অন্য পদার্থ সাধক নহে, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। এইরূপ কোন বাদী কার্য্যত্ব হেতু অনিত্যত্বের ব্যভিচারী নহে, ইহা বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে অন্য সমস্তই ব্যভিচারী, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত স্থলেই প্রতিবাদীর ঐরূপ উত্তর "অর্থাপত্তিসমা" জাতি। প্রতিবাদী ঐরূপে বাদীর অনুমানে সমস্ত দোষেরই উদ্ভাবন করিতে পারেন। তাই উক্ত জাতিকে বলা হইয়াছে,—"সর্ব্বদোষদেশনাভাসা"। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও উক্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ সমস্ত উত্তরও সদুত্তর নহে। উহাও জাত্যুত্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে॥২১॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং—

অনুবাদ। এই "অর্থাপত্তিসম" প্রতিষেধের উত্তর —

সূত্র। অনুক্তস্যার্থাপত্তেঃ পক্ষহানেরুপপত্তিরনুক্তত্বা-দনৈকান্তিকত্বাচ্চার্থাপত্তেঃ ॥২২॥৪৮৩॥

অনুবাদ। অনুক্ত পদার্থের অর্থাপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাদিকর্ত্তৃক অনুক্ত যে কোন পদার্থেরও অর্থতঃ বোধ স্বীকার করিলে তৎপ্রযুক্ত পক্ষহানির উপপত্তি হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের অভাবও অর্থতঃ বুঝা যায়, যেহেতু (তাহাতেও) অনুক্তত্ব আছে এবং অর্থাপত্তির অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহার "অনৈকান্তিকত্ব" অর্থাৎ উভয় পক্ষে তুল্যত্ববশতঃ পক্ষহানির উপপত্তি হয়।

ভাষ্য। অনুপপাদ্য সামর্থ্যমনুক্তমর্থাদাপদ্যতে ইতি ব্রুবতঃ

পক্ষহানেরুপপত্তিরনুক্তত্বাৎ[১]। অনিত্যপক্ষস্য সিদ্ধাবর্থাদাপন্নং নিত্যপক্ষস্য হানিরিতি।

অনৈকান্তিকত্বাচ্চার্থাপত্তেঃ। উভয়পক্ষসমা চেয়মর্থাপত্তিঃ। যদি নিত্যসাধর্ম্ম্যাদস্পর্শত্বাদাকাশবচ্চ নিত্যঃ শব্দোঽর্থাদাপন্নমনিত্য-সাধর্ম্ম্যাৎ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদনিত্য ইতি। **ন চেয়ং বিপর্য্যয়মাত্রা-দেকান্তেনার্থাপত্তিঃ**। ন খলু বৈ ঘনস্য গ্রাব্ণঃ পতনমিত্যর্থাদাপদ্যতে দ্রবাণামপাং পতনাভাব ইতি।

অনুবাদ। সামর্থ্য উপপাদন না করিয়া অর্থাৎ বাদীর বাক্যে যে ঐরূপ অনুক্ত অর্থ কল্পনার সামর্থ্য আছে, যদ্দ্বারা উহা বাদীর বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়, তাহা প্রতিপাদন না করিয়া "অনুক্ত" অর্থাৎ যে কোন অনুক্ত পদার্থ অর্থতঃ বুঝা যায়, ইহা যিনি বলেন, তাঁহার পক্ষহানির উপপত্তি হয়, অর্থাৎ সেই প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের অভাবেরও অর্থতঃ বোধ হয়। কারণ, (তাহাতেও) অনুক্তত্ব আছে। (তাৎপর্য্য) অনিত্য পক্ষের সিদ্ধি হইলে নিত্য পক্ষের অভাব, ইহাও অর্থতঃ বুঝা যায়।

এবং অর্থাপত্তির অনৈকান্তিকত্ববশতঃ [পক্ষহানির উপপত্তি হয়] (তাৎপর্য্য) এই অর্থাপত্তি অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উভয় পক্ষে তুল্যই। (কারণ) যদি নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য স্পর্শশূন্যতা-প্রযুক্ত এবং আকাশের ন্যায় শব্দ নিত্য, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযত্নজন্যত্বপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা অর্থতঃ বুঝা যায়। বিপর্য্যয়মাত্র-বশতঃ ইহা একান্ততঃ অর্থাপত্তিও নহে। যেহেতু "ঘন প্রস্তরের পতন হয়" ইহা বলিলে দ্রব জলের পতন হয় না, ইহা অর্থতঃ বুঝা যায় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত অর্থাপত্তিসম প্রতিষেধের উত্তর বলিতে মহর্ষি এই সূত্র দ্বারা প্রথমে বলিয়াছেন যে, যে কোন অনুক্ত অর্থের অর্থাপত্তি অর্থাৎ অর্থতঃ বোধ হইলে তৎপ্রযুক্ত পক্ষ-হানির উপপত্তি হয়। ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সামর্থ্য উপপাদন না

১। যদি পুনরনুপলব্ধসামর্থ্যমনুক্তমপি গম্যেত, ততস্ত্বয়ানিত্যত্বাপাদনে শব্দস্যোচ্যমানেঽনুচ্যমানমনিত্যত্বং প্রত্যেতব্যং। তথাচ ভবদভিমতস্য নিত্যত্বস্য ব্যাবৃত্তিঃ। তদিদমাহ—"অনিত্যপক্ষস্যানুক্তস্য সিদ্ধ বর্থাদাপন্নং নিত্য-পক্ষস্য হানিরিতি। বিপর্য্যয়েণাপি প্রত্যবস্থানসম্ভবাদনৈকান্তিকত্বমাহ—"উভয়পক্ষসমা চেয়মিতি। ব্যভিচারাচ্চা-নৈকান্তিকত্বমাহ—"ন চেয়ং বিপর্য্যয়মাত্রা"দিতি। নহি ভোজননিষেধাদেবাভোজনবিপরীতং সর্ব্বত্র কল্প্যতে ঘনত্বং হি গ্রাব্ণঃ পতনানুকূলগুরুত্বাতিশয়সূচনার্থং, ন ত্বিতরেষাং পতনং বারয়তি। বার্ত্তিকং সুবোধং।—তাৎপর্য্যটীকা।

করিয়া যে কোন অনুক্ত পদার্থ অর্থতঃ বুঝা যায়, ইহা যিনি বলেন, তাঁহার পক্ষহানির উপপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যে অনুক্ত অর্থের কল্পনা ব্যতীত সেই বাক্যার্থের উপপত্তিই হয় না, সেই অনুক্ত অর্থই সেই বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। সুতরাং সেই অনুক্ত অর্থের কল্পনাতেই সেই বাক্যের সামর্থ্য আছে। প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে তাঁহার অনুক্ত অর্থের কল্পনার মূল সামর্থ্য প্রতিপাদন না করিয়া অর্থাৎ বাদীর কথিত পদার্থে তাঁহার অনুক্ত অর্থের ব্যাপ্তি প্রদর্শন না করিয়া যে কোন অনুক্ত অর্থ অর্থতঃ বুঝা যায় ইহা বলিলে তাঁহার পক্ষহানি অর্থাৎ নিজ পক্ষের অভাবও অর্থতঃ বুঝা যাইবে। কেন বুঝা যাইবে? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"অনুক্তত্বাৎ"। অর্থাৎ যেহেতু প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের হানিও অনুক্ত অর্থ। উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন,—"কিং কারণং? সামর্থ্যস্যানুক্তত্বাৎ"। অর্থাৎ যেহেতু প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে যে ঐরূপ অনুক্ত অর্থ কল্পনার সামর্থ্য আছে, তাহা উপপাদন করেন নাই। কিন্তু সূত্র ও ভাষ্য দ্বারা মহর্ষির ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যানুসারে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে অনুক্ত অর্থের বোধে বাদীর বাক্যের সামর্থ্য বুঝা যায় না, অর্থাৎ যে অর্থের কল্পনা না করিলেও বাদীর বাক্যার্থের কোন অনুপপত্তি নাই, সেই অনুক্ত অর্থও যদি প্রতিবাদী বাদীর বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়, ইহা বলেন, তাহা হইলে তিনি শব্দ নিত্য, এই বাক্য প্রয়োগ করিলেই উহার দ্বারা অর্থতঃ শব্দ অনিত্য, ইহাও বুঝা যাইবে। কারণ, উহাও ত তাঁহার অনুক্ত অর্থ। তিনি উহা স্বীকার করিলে তাঁহার পক্ষহানিই স্বীকৃত হইবে। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই শেষে বলিয়াছেন যে, অনিত্য পক্ষের সিদ্ধি হইলে নিত্য পক্ষের হানি, ইহা অর্থতঃ বুঝা যায়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দের নিত্যত্ববাদী প্রতিবাদী শব্দ নিত্য, এই কথা বলিলে তাঁহার অনুক্ত অর্থ যে অনিত্য পক্ষ অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্ব, তাহার সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ তাহাও প্রতিবাদীর ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা গেলে প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ যে নিত্যপক্ষ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব, তাহার অভাব, ইহাই অর্থতঃ বুঝা যায়। কারণ, নিত্যত্বের অভাবই অনিত্যত্ব। ফলকথা, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত ঐ উত্তর উক্তরূপে স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা সদুত্তর হইতে পারে না।

মহর্ষি প্রকারান্তরেও উক্ত প্রতিষেধের স্বব্যাঘাতকত্ব সমর্থন করিতে পরে আবার বলিয়াছেন, "অনৈকান্তিকত্বাচ্চার্থাপত্তেঃ"। ভাষ্যকার প্রথমে ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উভয় পক্ষে তুল্য। কারণ, বিপরীত ভাবেও প্রত্যবস্থান হইতে পারে। অর্থাৎ প্রতিবাদী "শব্দো নিত্যঃ অস্পর্শত্বাৎ গগনবৎ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, বাদীও তখন তাঁহার ঐ বাক্য অবলম্বন করিয়া, তাঁহার ন্যায় বলিতে পারেন যে, যদি নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য স্পর্শশূন্যতাপ্রযুক্ত এবং আকাশের ন্যায় শব্দ নিত্য, ইহা বল, তাহা হইলে অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযত্নজন্যত্বপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। সুতরাং তোমার নিজ পক্ষের হানি অর্থাৎ অভাব সিদ্ধ হওয়ায় তুমি আর নিজ পক্ষ সিদ্ধ করিতে পার না। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত "অনৈকান্তিকত্ব" শব্দের অর্থ উভয় পক্ষে তুল্যত্ব। ভাষ্যকার পরে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অর্থাপত্তি যে

ব্যভিচারবশতঃ ও অনৈকান্তিক, ইহা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, বিপর্য্যয়মাত্রবশতঃ এই অর্থাপত্তি ঐকান্তিক অর্থাপত্তিও নহে। অর্থাৎ উহা অনৈকান্তিক (ব্যভিচারী) বলিয়া প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে। উহাকে বলে অর্থাপত্ত্যাভাস। কারণ, ঐরূপ স্থলে বাদীর কথিত অর্থের বিপর্য্যয় বা বৈপরীত্যমাত্রই থাকে। বাদীর কথিত কোন অর্থে তাঁহার অনুক্ত সেই বিপরীত অর্থের ব্যাপ্তি থাকে না। সুতরাং উহা প্রকৃত অর্থাপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরে ইহা একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, কেহ ঘন প্রস্তরের পতন হয়, এই কথা বলিলে, দ্রব জলের পতন হয় না, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায় না। অর্থাৎ উক্ত বাক্যে "ঘন" শব্দের দ্বারা প্রস্তরে পতনের অনুকূল গুরুত্বের আধিক্যমাত্র সূচিত হয়। উহার দ্বারা দ্রব জলের গুরুত্বই নাই, সুতরাং উহার পতন হয় না, ইহা বক্তার বিবক্ষিত নহে এবং তাহা সত্যও নহে। সুতরাং উক্ত স্থলে ঐরূপ অনুক্ত অযোগ্য অর্থের কল্পনা না করিলেও ঐ বাক্যার্থ বোধের উপপত্তি হওয়ায় অর্থাপত্তির দ্বারা ঐরূপ বোধ হইতে পারে না। কারণ, ঐরূপ অর্থাপত্তি অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হওয়ায় উহা প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে; উহাকে বলে অর্থাপত্ত্যাভাস। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত "অর্থাপত্তিসম" প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহাও অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী বলিয়া প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে। সুতরাং তদ্দ্বারা ঐরূপ অনুক্ত অর্থের যথার্থ বোধ হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের বাক্য দ্বারাও অর্থতঃ তাঁহার নিজ পক্ষহানিরও যথার্থ বোধ হইতে পারে। সুতরাং প্রতিবাদী কখনই তাঁহার নিজপক্ষ সিদ্ধ করিতে পারেন না, ইহাই মহর্ষির চরম বক্তব্য। সূত্রে "অনৈকান্তিকত্ব" শব্দের দ্বারা মহর্ষি ব্যভিচারিত্ব অর্থও প্রকাশ করিয়া "অর্থাপত্তিসম" প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অর্থাপত্তি যে ব্যাপ্তিশূন্য, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থাপত্তির যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা উহাতে নাই, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। সুতরাং যুক্তাঙ্গহানিও যে, উক্ত উত্তরের দুষ্টত্বের মূল, ইহাও এই সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে এবং প্রথমে স্বব্যাঘাতকত্বরূপ অসাধারণ দুষ্টত্বমূলও এই সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও ইহা বলিয়াছেন। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে "অনর্থাপত্তা-বর্থাপত্ত্যভিমানাৎ" (২।৪) এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃত অর্থাপত্তিরই ব্যভিচারিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রের দ্বারা "অর্থাপত্তিসম" প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহারই ব্যভিচারিত্ব বলিয়াছেন। সুতরাং সেই সূত্রের সহিত এই সূত্রের কোন বিরোধ নাই, ইহা এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক। উদ্দ্যোতকরও এখানে ঐ কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং তিনিও এই সূত্রে "অনৈকান্তিকত্ব" শব্দের দ্বারা ব্যভিচারিত্ব অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার যে উহার দ্বারা প্রথমে উভয়পক্ষতুল্যতা অর্থও গ্রহণ করিয়া, উহার দ্বারাও উক্তরূপ উত্তরের স্বব্যাঘাতকত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও এখানে বুঝা আবশ্যক ॥২২॥

অর্থাপত্তিসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৯॥

সূত্র। একধর্ম্মোপপত্তেরবিশেষে সর্ব্বাবিশেষপ্রসঙ্গাৎ সদ্ভাবোপপত্তেরবিশেষসমঃ ॥২৩॥৪৮৪॥

অনুবাদ। এক ধর্ম্মের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থে একই ধর্ম্মের সত্তাবশতঃ (ঐ উভয় পদার্থের) অবিশেষ হইলে সদ্‌ভাবের (সত্তার) উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সকল পদার্থেই সত্তারূপ এক ধর্ম্ম থাকায় সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ সত্তারূপ এক ধর্ম্ম থাকায় সকল পদার্থের অবিশেষ হউক ? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান (১৮) **অবিশেষসম** প্রতিষেধ।

ভাষ্য। একো ধর্ম্মঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বং শব্দঘটয়োরুপপদ্যতে ইত্যবিশেষে উভয়োরনিত্যত্বে সর্ব্বস্যাবিশেষঃ প্রসজ্যতে ; কথং ? **সদ্‌ভাবোপপত্তেঃ**। একো ধর্ম্মঃ সদ্‌ভাবঃ সর্ব্বস্যোপপদ্যতে। **সদ্‌ভাবোপপত্তেঃ সর্ব্বাবিশেষপ্রসঙ্গাৎ** প্রত্যবস্থানমবিশেষসমঃ।

অনুবাদ। একই ধর্ম্ম প্রযত্নজন্যত্ব শব্দ ও ঘটে আছে, এ জন্য অবিশেষ হইলে (অর্থাৎ) শব্দ ও ঘট, এই উভয়ের অনিত্যত্ব হইলে সকল পদার্থেরই অবিশেষ প্রসক্ত হয়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু "সদ্‌ভাবে"র অর্থাৎ সত্তার উপপত্তি (বিদ্যমানতা) আছে। (তাৎপর্য্য) একই ধর্ম্ম সত্তা সকল পদার্থের উপপন্ন হয়, অর্থাৎ সকল পদার্থেই উহা আছে। সত্তার উপপত্তিবশতঃ সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান (১৮) অবিশেষসম প্রতিষেধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা "অবিশেষসম" প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রে "অবিশেষে" এই পদের পূর্ব্বে "সাধ্যদৃষ্টান্তয়োঃ" এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত। এবং পূর্ব্ববৎ "অবিশেষসম" এই পদের পূর্ব্বে "প্রত্যবস্থানং" এই পদের অধ্যাহারও এখানে বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও শেষে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উদাহরণস্থলেই এই "অবিশেষসম" প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নজন্যত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে,

তোমার সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষ যে শব্দ এবং দৃষ্টান্ত ঘট, এই উভয়ে তোমার কথিত হেতু প্রযত্নজন্যত্বরূপ একই ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে বলিয়া, তুমি ঐ উভয় পদার্থের অবিশেষ বলিতেছ অর্থাৎ ঘটের ন্যায় শব্দেরও অনিত্যত্ব সমর্থন করিতেছ। কিন্তু তাহা হইলে সকল পদার্থেরই অবিশেষ হউক ? উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে "অবিশেষসম" প্রতিষেধ। প্রতিবাদী কেন ঐরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন ? তাঁহার অভিমত হেতু বা আপাদক কি ? তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—"সদ্ভাবোপপত্তেঃ।" অর্থাৎ যেহেতু সকল পদার্থেই "সদ্‌ভাব" অর্থাৎ সত্তা বিদ্যমান আছে। "সদ্‌ভাব" শব্দের দ্বারা সৎ পদার্থের ভাব অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম্ম বুঝা যায়। সুতরাং উহা দ্বারা সত্তারূপ ধর্ম্ম বুঝা যায়। সূত্রে "উপপত্তি" শব্দও সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। "তার্কিক-রক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, সূত্রে "সদ্ভাব" শব্দের দ্বারা এখানে সাধারণ ধর্ম্মমাত্রই বিবক্ষিত। সুতরাং প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মও উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, যখন সত্তা ও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি একই ধর্ম্ম সকল পদার্থেই বিদ্যমান আছে, ইহা বাদীরও স্বীকৃত, তখন তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থেরই অবিশেষ কেন হইবে না ? ইহাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, যদি সকল পদার্থের অনিত্যত্বরূপ অবিশেষই স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে আর বিশেষ করিয়া শব্দে অনিত্যত্বের সাধন ব্যর্থ। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, যদি সমস্ত পদার্থেরই একত্বরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির বিভাগ অর্থাৎ ভেদ না থাকায় অনুমানই হইতে পারে না। আর যদি একধর্ম্মবত্ত্বরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থেরই একজাতীয়ত্ববশতঃ পূর্ব্ববৎ অনুমান প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর যদি একাকার-ধর্ম্মবত্ত্বরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থেরই অনিত্যতাবশতঃ বিশেষ করিয়া শব্দে অনিত্যত্বের অনুমান-প্রবৃত্তি হইতে পারে না। "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অবিশেষ প্রদর্শন করিয়া, ঐ পক্ষত্রয়েই দোষ সমর্থন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও উক্তরূপ ত্রিবিধ অবিশেষ গ্রহণ করিয়া উক্ত পক্ষত্রয়ে দোষ বলিয়াছেন। এই "জাতি"র প্রয়োগ স্থলে উক্তরূপে প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন করিয়া, বাদীর অনুমান ভঙ্গ করাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই বৃত্তিকার এই "জাতি"কে বলিয়াছেন, "প্রতিকূলতর্কদেশনাভাসা"। কিন্তু উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে উক্ত জাতি স্থলে বাদীর হেতুর অসাধকত্বই প্রতিবাদীর আরোপ্য। সুতরাং তাঁহারা ইহাকে বলিয়াছেন,—"অসাধকত্বদেশনাভাসা"। মহর্ষির প্রথমোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতিও সাধর্ম্ম্যমাত্রপ্রযুক্ত হওয়ায় তাহা হইতে এই "অবিশেষসমা" জাতি ভিন্ন হইবে কিরূপে ? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, কোন এক পদার্থের সাধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতির প্রয়োগ হয়। কিন্তু সমস্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া এই "অবিশেষসমা" জাতির প্রয়োগ হয়। সুতরাং "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতি হইতে ইহার ভেদ আছে ॥২৩॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং—

অনুবাদ। এই "অবিশেষসম" প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র। ক্বচিত্তদ্ধর্ম্মোপপত্তেঃ ক্বচিচ্চানুপপত্তেঃ প্রতিষেধাভাবঃ ॥২৪॥৪৮৫॥*

অনুবাদ। কোন সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ প্রযত্নজন্যত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য বিদ্যমান থাকিলে সেই ধর্ম্মের অর্থাৎ উহার ব্যাপক অনিত্যত্ব ধর্ম্মের উপপত্তিবশতঃ এবং কোন সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সত্তা প্রভৃতি সমস্ত সৎ পদার্থের সাধর্ম্ম্য বিদ্যমান থাকিলেও সেই ধর্ম্মের অর্থাৎ অনিত্যত্ব ধর্ম্মের অনুপপত্তিবশতঃ (পূর্ব্বসূত্রোক্ত) প্রতিষেধ হয় না। [অর্থাৎ প্রযত্নজন্যত্বরূপ সাধর্ম্ম্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হওয়ায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হয়। কিন্তু সত্তা প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট না হওয়ায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হয় না। কারণ, সাধর্ম্ম্যমাত্রই সাধ্যসাধক হয় না। সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্যই উহার সাধক হয়।]

ভাষ্য। যথা সাধ্যদৃষ্টান্তয়োরেকধর্ম্মস্য প্রযত্নানন্তরীয়কত্বস্যোপপত্তেরনিত্যত্বং ধর্ম্মান্তরমবিশেষো নৈবং সর্ব্বভাবানাং সদ্ভাবোপপত্তিনিমিত্তং ধর্ম্মান্তরমস্তি, যেনাবিশেষঃ স্যাৎ।

অথ **মতমনিত্যত্বমেব ধর্ম্মান্তরং সদ্ভাবোপপত্তিনিমিত্তং ভাবানাং সর্ব্বত্র স্যাদিতি**—এবং খলু বৈ কল্প্যমানে **অনিত্যাঃ সর্ব্বে ভাবাঃ সদ্ভাবোপপত্তেরিতি** পক্ষঃ প্রাপ্নোতি। তত্র প্রতিজ্ঞার্থ-ব্যতিরিক্তমন্যদুদাহরণং নাস্তি। অনুদাহরণশ্চ হেতুর্নাস্তীতি। প্রতিজ্ঞৈক-দেশস্য চোদাহরণত্বমনুপপন্নং, নহি সাধ্যমুদাহরণং ভবতি। সতশ্চ নিত্যা-নিত্যভাবাদনিত্যত্বানুপপত্তিঃ। তস্মাৎ **সদ্ভাবোপপত্তেঃ সর্ব্বা-বিশেষপ্রসঙ্গ** ইতি নিরর্থকমেতদ্বাক্যমিতি। **সর্ব্বভাবানাং সদ্ভাবোপপত্তেরনিত্যত্বমিতি** ব্রুবতাহনুজ্ঞাতং শব্দস্যানিত্যত্বং, তত্রানুপপন্নঃ প্রতিষেধ ইতি।

* ক্বচিৎ সাধর্ম্ম্যে প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদৌ সতি শব্দাদের্ঘটাদিনা সহ তদ্ধর্ম্মস্য ঘটধর্ম্মস্যানিত্যত্বস্যোপপত্তেঃ, ক্বচিৎ সাধর্ম্ম্যে শব্দস্য ভাবমাত্রেণ সহ সত্ত্বাদৌ সতি ভাবমাত্রধর্ম্মস্যানুপপত্তেঃ প্রতিষেধাভাব ইতি যোজনা। এতদুক্তং ভবতি—অবিনাভাবসম্পন্নং সাধর্ম্ম্যং গমকং, নতু সাধর্ম্ম্যমাত্রমিতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

অনুবাদ। যেমন সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে শব্দ ও ঘটে প্রযত্নজন্যত্বরূপ একধর্ম্মের উপপত্তি (সত্তা) বশতঃ অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মান্তর অবিশেষ আছে, এইরূপ সমস্ত সৎপদার্থের সত্তার উপপত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ সত্তারূপ এক ধর্ম্মের ব্যাপক ধর্ম্মান্তর নাই, যৎপ্রযুক্ত (সমস্ত সৎপদার্থের) অবিশেষ হইতে পারে।

(পূর্ব্বপক্ষ) সমস্ত পদার্থের সর্ব্বত্র সত্তার ব্যাপক অনিত্যত্বই ধর্ম্মান্তর হউক, ইহা যদি মত হয় ? (উত্তর) এইরূপ কল্পনা করিলে সত্তার উপপত্তিপ্রযুক্ত সকল পদার্থ অনিত্য, ইহাই পক্ষ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ তাহা হইলে ঐ হেতুর দ্বারা সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব প্রতিবাদীর সাধ্য হয়)। তাহা হইলে প্রতিজ্ঞার্থ ব্যতিরিক্ত অন্য উদাহরণ অর্থাৎ দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্তশূন্য হেতুও হয় না। প্রতিজ্ঞার একদেশের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার্থের মধ্যে কোন পদার্থের দৃষ্টান্তত্বও উপপন্ন হয় না। যেহেতু সাধ্যধর্ম্মী দৃষ্টান্ত হয় না। পরন্তু সৎপদার্থের নিত্যানিত্যত্ববশতঃ অর্থাৎ সৎপদার্থের মধ্যে আকাশাদি অনেক পদার্থের নিত্যত্ব এবং তদ্‌ভিন্ন পদার্থের অনিত্যত্ব প্রমাণসিদ্ধ থাকায় (সমস্ত সৎপদার্থের) অনিত্যত্বের উপপত্তি হয় না। অতএব সত্তার উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সমস্ত সৎপদার্থেই সত্তারূপ এক ধর্ম্ম আছে বলিয়া সমস্ত সৎপদার্থের অবিশেষ-প্রসঙ্গ, এই যে উক্ত হইয়াছে, এই বাক্য নিরর্থক অর্থাৎ উহার প্রতিপাদ্য অর্থ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন না হওয়ায় উহা নাই। (পরন্তু) সত্তার উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সত্তারূপ এক ধর্ম্ম আছে বলিয়া সমস্ত সৎপদার্থের অনিত্যত্ব, ইহা যিনি বলিতেছেন, তৎকর্ত্তৃক শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকৃতই হইয়াছে। তাহা হইলে প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "অবিশেষসম" প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন। মুদ্রিত তাৎপর্য্যটীকাগ্রন্থে এবং আরও কোন পুস্তকে "কচিত্তদ্ধর্ম্মানুপপত্তেঃ কচিচ্চোপপত্তেঃ" এইরূপ সূত্রপাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ ও "অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ" গ্রন্থে বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও ঐরূপ সূত্রপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন কোন পুস্তকে "কচিদ্ধর্ম্মানুপপত্তেঃ" এইরূপ সূত্রপাঠও দেখা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকায় বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারা "কচিত্তদ্ধর্ম্মোপপত্তেঃ" ইত্যাদি সূত্রপাঠই তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। "ন্যায়বার্ত্তিক," "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" ও "ন্যায়সূত্রোদ্ধারে"ও উক্তরূপ সূত্রপাঠই উদ্ধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ এখানে বাদী ও প্রতিবাদীর অভিমত হেতু গ্রহণ করিয়া ক্রমানুসারে প্রথমে তদ্ধর্ম্মের উপপত্তি এবং পরে উহার অনুপপত্তিই বলা উচিত। জয়ন্ত ভট্ট ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও উক্ত ক্রমানুসারেই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া

গিয়াছেন। সুতরাং উদ্ধৃত সূত্রপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে সূত্রের প্রথমে "ক্বচিৎ" এই শব্দের দ্বারা বাদীর গৃহীত প্রযত্নজন্যত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্ম্যই বিবক্ষিত এবং "তদ্ধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা ঐ সাধর্ম্ম্যের ব্যাপক ঘটধর্ম্ম অনিত্যত্ব বিবক্ষিত। কোন সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ প্রযত্নজন্যত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্ম্যরূপ হেতু বিদ্যমান থাকিলে, সেখানে উহার ব্যাপক অনিত্যত্ব বিদ্যমান থাকে, ইহাই সূত্রোক্ত "ক্বচিত্তদ্ধর্ম্মোপপত্তেঃ" এই প্রথম বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। পরে "ক্বচিৎ" এই শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর গৃহীত সত্তা প্রভৃতি সাধর্ম্ম্যই বিবক্ষিত এবং "অনুপপত্তি" শব্দের দ্বারা উক্ত সাধর্ম্ম্যের ব্যাপক ধর্ম্মের অসত্তাই বিবক্ষিত। সুতরাং সত্তাদি সাধর্ম্ম্যরূপ হেতু বিদ্যমান থাকিলেও সমস্ত সৎপদার্থে উহার ব্যাপক কোন ধর্ম্ম থাকে না, ইহাই "ক্বচিচ্চানুপপত্তেঃ" এই দ্বিতীয় বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। ভাষ্যকারও ঐ ভাবে মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে বাদীর সাধ্যধর্ম্মী শব্দ এবং দৃষ্টান্ত ঘটে প্রযত্নজন্যত্বরূপ সাধর্ম্ম্য বা একধর্ম্ম আছে বলিয়া, যেমন ঐ উভয়ের অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মান্তর আছে এবং উহাই ঐ উভয়ের অবিশেষ বলিয়া সিদ্ধ হয়, এইরূপ সমস্ত সৎ পদার্থে সদ্ভাব বা সত্তারূপ সাধর্ম্ম্য বা একধর্ম্ম থাকিলেও উহার ব্যাপক কোন ধর্ম্মান্তর নাই, যাহা সমস্ত সৎপদার্থের অবিশেষ হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী যে প্রযত্নজন্যত্বরূপ সাধর্ম্ম্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা তাঁহার সাধ্যধর্ম্ম অনিত্যত্বের ব্যাপ্য, অনিত্যত্ব উহার ব্যাপক। কারণ, প্রযত্নজন্য পদার্থমাত্রই যে অনিত্য, ইহা সর্ব্বসম্মত। সুতরাং বাদীর ঐ হেতুর দ্বারা ঘটের ন্যায় শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং ঐ অনিত্যত্ব শব্দ ও ঘটের অবিশেষ বলিয়া স্বীকার করা যায়। কিন্তু উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে, সমস্ত সৎপদার্থের সত্তারূপ সাধর্ম্ম্য বা একধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা সমস্ত সৎপদার্থেরই অবিশেষের আপত্তি সমর্থন করিয়াছেন, ঐ সাধর্ম্ম্য তাঁহার অভিমত কোন অপর ধর্ম্মবিশেষের ব্যাপ্য নহে, সুতরাং উহার ব্যাপক কোন ধর্ম্মান্তর নাই, যাহা সমস্ত সৎপদার্থের অবিশেষ হইতে পারে। ভাষ্যে "সদ্ভাবোপপত্তিনিমিত্তং" এই কথার ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার লিখিয়াছেন,—"সদ্ভাবব্যাপকমিত্যর্থঃ"। সদ্ভাব বলিতে সত্তা। উহার ব্যাপক কোন ধর্ম্মান্তর নাই, ইহা বলিলে প্রতিবাদীর গৃহীত ঐ সত্তারূপ সাধর্ম্ম্যে তাঁহার আপাদিত কোন ধর্ম্মান্তররূপ অবিশেষের ব্যাপ্তি নাই, ইহাই বলা হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে সরলভাবে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "ক্বচিৎ" অর্থাৎ কার্য্যত্ব বা প্রযত্নজন্যত্ব প্রভৃতি হেতুতে "তদ্ধর্ম্ম" অর্থাৎ সেই হেতুর ধর্ম্ম ব্যাপ্তি প্রভৃতি আছে এবং "ক্বচিৎ" অর্থাৎ সত্তা প্রভৃতিতে ব্যাপ্তি প্রভৃতি হেতু ধর্ম্ম নাই, অতএব প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধের অভাব অর্থাৎ উহা অসম্ভব। ফলকথা, প্রতিবাদীর গৃহীত সত্তা প্রভৃতি সাধর্ম্ম্যে কোন অবিশেষের ব্যাপ্তি না থাকায় উহার দ্বারা সমস্ত সৎপদার্থের অবিশেষ সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত হেতুর যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা ঐ সত্তাদি সাধর্ম্ম্যে না থাকায় যুক্তাঙ্গহানিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর ঐ উত্তর দুষ্ট। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের অসাধারণ দুষ্টত্বমূল ঐ যুক্তাঙ্গহানিই প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বব্যাঘাতকত্ব যাহা সাধারণ দুষ্টত্ব মূল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ, প্রতিবাদী যদি যে কোন সাধর্ম্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির সমর্থন করেন, তাহা হইলে তিনি যাহা সাধন করিবেন, তাহার অভাবও সাধন করা যাইবে। সুতরাং তিনি কিছুই সাধন করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বাদী তাঁহার ন্যায় সত্তা প্রভৃতি কোন সাধর্ম্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা তাঁহার সাধ্যের অভাবের সাধন করিলে, তিনি কখনই নিজ সাধ্য সাধন করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার নিজের ঐ উত্তর নিজেরই ব্যাঘাতক হইবে।

সর্ব্বানিত্যত্ববাদী বৈনাশিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে সত্ত্বাবশতঃ সকল পদার্থই অনিত্য। কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন,—"যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং"। সুতরাং সত্তাহেতুর দ্বারা সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে, উহাই সত্তার ব্যাপক ধর্ম্মান্তর এবং সকল পদার্থের অবিশেষ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সত্তার ব্যাপক কোন ধর্ম্মান্তর নাই, যাহা সমস্ত পদার্থের অবিশেষ হইতে পারে, ইহা ভাষ্যকার বলিতে পারেন না। তাই ভাষ্যকার পরে উক্ত মতানুসারে এখানে বৌদ্ধ প্রতিবাদীর ঐ বক্তব্য প্রকাশ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে সত্তার উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থে সত্তা আছে বলিয়া সমস্ত পদার্থ অনিত্য, ইহাই প্রতিবাদীর পক্ষ বা সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। কিন্তু প্রতিবাদী উক্তরূপ অনুমানের দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত সাধন করিতে পারেন না। কারণ, সকল পদার্থই অনিত্য, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে সকল পদার্থই তাঁহার প্রতিজ্ঞার্থ হয়। সুতরাং উহা ভিন্ন কোন দৃষ্টান্ত না থাকায় সত্তা হেতু তাঁহার ঐ সাধ্যের সাধক হয় না। কারণ, দৃষ্টান্তশূন্য কোন হেতুই হয় না। প্রতিজ্ঞার্থের অন্তর্গত কোন পদার্থও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, যাহা সাধ্যধর্ম্মী, তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। উক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপে সমস্ত পদার্থই প্রতিবাদীর সাধ্যধর্ম্মী। সুতরাং কোন পদার্থই তিনি দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন না। প্রতিবাদী বৌদ্ধ মতানুসারে যদি বলেন যে, ঘটপটাদি অসংখ্য পদার্থ যে অনিত্য, ইহা ত সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং তাহাই দৃষ্টান্ত আছে। যাহা বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই অনিত্য বলিয়া স্বীকৃতই আছে, তাহা সাধ্যধর্ম্মী বা প্রতিজ্ঞার্থের অন্তর্গত হইলেও দৃষ্টান্ত হইতে পারে। ভাষ্যকার এ জন্য পরে আবার বলিয়াছেন যে, সৎ পদার্থের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব থাকায় সমস্ত পদার্থেরই অনিত্যত্ব উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ঘটপটাদি অসংখ্য পদার্থ অনিত্য বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ আছে, তদ্রূপ আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ নিত্য বলিয়াও প্রমাণসিদ্ধ আছে। সুতরাং প্রতিবাদীর গৃহীত সত্তা হেতু সেই সমস্ত নিত্য পদার্থেও বিদ্যমান থাকায় উহা অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। সুতরাং উহার দ্বারা তিনি সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সাধন করিতে পারেন না। আকাশাদি সমস্ত নিত্য পদার্থের নিত্যত্বসাধক প্রমাণের খণ্ডন করিতে না পারিলে তাঁহার ঐ হেতুর দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ঐ বাক্য নিরর্থক। কারণ, তাঁহার ঐ বাক্যের যাহা অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য, তাহা কোন প্রমাণসিদ্ধ হয় না। প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটপটাদি অসংখ্য পদার্থ অনিত্য বলিয়া সর্ব্বসম্মত থাকায় তদ্দৃষ্টান্তে আমার পূর্ব্বোক্ত অনুমানই ত সকল পদার্থের অনিত্যত্বসাধক প্রমাণ আছে। আমার ঐ প্রমাণের খণ্ডন ব্যতীতও ত বাদী কোন পদার্থের নিত্যত্ব সাধন করিতে পারেন না। ভাষ্যকার এ জন্য সর্ব্বশেষে উক্ত স্থলে বাদীর চরম বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমস্ত

পদার্থেরই অনিত্যত্ব স্বীকার করিলে শব্দের অনিত্যত্বও স্বীকৃত হওয়ায় প্রতিবাদীর প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিবাদী যদি তাঁহার ঐ অনুমানকে সকল পদার্থের অনিত্যত্বের সাধক প্রমাণই বলেন, তাহা হইলে তিনি শব্দেরও অনিত্যত্বসাধক প্রমাণই প্রদর্শন করায় তিনি আর বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। কারণ, বাদী যে, শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন, তাহা তিনি স্বীকারই করিতেছেন। সুতরাং বাদীর প্রদর্শিত প্রমাণেরও তিনি প্রতিষেধ করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার উক্তরূপ প্রতিষেধ কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার পরে এই কথার দ্বারা অন্যভাবে প্রতিবাদীর ঐ উত্তর যে, স্বব্যাঘাতক, সুতরাং উহা অসদুত্তর, ইহাও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বানিত্যত্ববাদও কোনরূপে উপপন্ন হয় না। মহর্ষি পূর্ব্বেই উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ড, ১৫৩—৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২৪ ॥

অবিশেষসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

সূত্র। উভয়কারণোপপত্তেরুপপত্তিসমঃ ॥২৫॥৪৮৬॥

অনুবাদ। উভয় পক্ষের অর্থাৎ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের "কারণের" (হেতুর) উপপত্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৯) **উপপত্তিসম** প্রতিষেধ।

ভাষ্য। যদ্যনিত্যত্বকারণমুপপদ্যতে শব্দস্যেত্যনিত্যঃ শব্দো নিত্যত্ব-কারণমপ্যুপপদ্যতেঽস্যাস্পর্শত্বমিতি নিত্যত্বমপ্যুপপদ্যতে। উভয়স্যানিত্যত্বস্য নিত্যত্বস্য চ কারণোপপত্ত্যা প্রত্যবস্থান**মুপপত্তিসমঃ**।

অনুবাদ। যদি শব্দের অনিত্যত্বের "কারণ" অর্থাৎ সাধক হেতু আছে, এ জন্য শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে এই শব্দের স্পর্শশূন্যত্বরূপ নিত্যত্বের সাধক হেতুও আছে, এ জন্য নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। উভয়ের (অর্থাৎ উক্ত স্থলে) অনিত্যত্বের ও নিত্যত্বের সাধক হেতুর উপপত্তি (সত্তা) প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৯) **উপপত্তিসম** প্রতিষেধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা "উপপত্তিসম" প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রে "উভয়" শব্দের দ্বারা বাদীর সাধ্যধর্ম্মরূপ পক্ষ এবং তাহার অভাবরূপ প্রতিপক্ষই বিবক্ষিত। "কারণ" শব্দের দ্বারা সাধক হেতু বিবক্ষিত। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ সত্তা। পূর্ব্ববৎ "প্রত্যব-স্থানং" এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদীর পক্ষের ন্যায় তাঁহার প্রতিপক্ষেরও সাধক হেতুর সত্তা আছে বলিয়া প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে "উপপত্তিসম" প্রতিষেধ। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্থলেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী

যদি বলেন যে, শব্দের অনিত্যত্বসাধক (কার্য্যত্ব) হেতু আছে বলিয়া শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে শব্দের নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। কারণ, শব্দ আকাশাদি নিত্য পদার্থের ন্যায় স্পর্শশূন্য। সুতরাং শব্দে স্পর্শশূন্যত্বরূপ নিত্যত্বসাধক হেতুও আছে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ অনিত্যত্ব এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ নিত্যত্ব, এই উভয়েরই সাধক হেতুর সত্তাপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর পক্ষের ন্যায় তাঁহার নিজপক্ষেরও সাধক হেতু আছে বলিয়া প্রত্যবস্থান করায় উহা "উপপত্তিসম" প্রতিষেধ। উক্তরূপে বাদীর অনুমানে বাধ বা সৎপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উক্ত "উপপত্তিসমা" জাতিকে বলা হইয়াছে—বাধ ও সৎপ্রতিপক্ষ, এই অন্যতর-দেশনাভাসা। পূর্ব্বোক্ত "প্রকরণসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে বাদীর ন্যায় প্রতিবাদীও অন্য হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করেন এবং নিজপক্ষ নির্ণয়ের অভিমান-বশতঃ বাদীর পক্ষের বাধ সমর্থন করেন এবং সেই স্থলে বাদীও ঐরূপ করায় তাঁহার উত্তরও "প্রকরণসমা" জাতি হয়। কিন্তু এই "উপপত্তিসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী হেতু ও দৃষ্টান্তাদির দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করেন না। কেবল নিজপক্ষে অর্থাৎ বাদীর বিরুদ্ধ পক্ষেও অন্য হেতুর দ্বারাই বাদীর অনুমানে বাধ বা সৎপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "প্রকরণসমা" জাতি হইতে এই "উপপত্তিসমা"র বিশেষ থাকায় ইহা ভিন্ন প্রকার জাতি বলিয়াই কথিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরও এখানে ইহাই বলিয়াছেন।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে 'তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, বাদী তাঁহার সাধ্যসিদ্ধির জন্য প্রমাণ অর্থাৎ হেতু বলিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার পক্ষের ন্যায় আমার পক্ষেও কোন প্রমাণ থাকিবে? আমি তোমার পক্ষকেই দৃষ্টান্ত করিয়া, অনুমান দ্বারা আমার পক্ষেরও সপ্রমাণত্ব সাধন করিব। সুতরাং তোমার ঐ অনুমানে বাধ বা সৎপ্রতিপক্ষ-দোষ অনিবার্য্য। প্রতিবাদী উক্তরূপে নিজপক্ষেও কোন প্রমাণের সম্ভাবনা দ্বারা প্রত্যবস্থান করিলে উহাকে বলে "উপপত্তিসম" প্রতিষেধ[1]। পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা", "বৈধর্ম্ম্যসমা" ও "প্রকরণসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী সিদ্ধ হেতুর উল্লেখ করিয়া, তদ্দ্বারাই নিজ সাধ্যের উপপাদন করেন। কিন্তু এই "উপপত্তিসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী নিজপক্ষে কোন সিদ্ধ হেতুর উল্লেখ করেন না। কিন্তু তাঁহার নিজ পক্ষেও যে কোন প্রমাণ বা হেতু আছে, ইহাই অনুমান দ্বারা সমর্থন করেন। সুতরাং ইহা ভিন্নপ্রকার জাতি। পূর্ব্বোক্তরূপ ভেদ রক্ষার জন্যই উদয়নাচার্য্য এই "উপপত্তিসমা" জাতির উক্তরূপেই স্বরূপব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র

১। অস্মৎপক্ষেঽপি কিমপি প্রমাণমুপপৎস্যতে।
ত্বৎপক্ষবদিতি প্রাপ্তিরুপপত্তিসমো মতঃ ॥২৪॥

যথা অনিত্যঃ শব্দঃ কার্য্যত্বাদিত্যুক্তে যদ্যনিত্যত্বে প্রমাণং কার্য্যত্বমস্তীত্যনিত্যঃ শব্দস্তর্হি নিত্যত্বপক্ষেঽপি কিঞ্চিৎ প্রমাণং ভবিষ্যতি, বাদিপ্রতিবাদিনোরন্যতরোক্তত্বাৎ ত্বৎপক্ষমৎপক্ষয়োরন্যতরত্বাৎ প্রকৃতসন্দেহবিষয়ত্বাদ্বিপ্রতিপত্তিবিষয়ত্বাদ্বা ত্বৎপক্ষবৎ। তথাচ বাধঃ প্রতিরোধো বেতি। ইয়ঞ্চ প্রতিধর্ম্মসমপ্রকরণসমাভ্যাং ভিদ্যতে, অত্র প্রমাণস্যৈবোপপাদনাৎ তত্র সিদ্ধেন প্রমাণেন সাধ্যোপপাদনাৎ। অস্যাঃ সামান্যতঃ প্রমাণসম্ভাবনা দ্বারং।—তার্কিকরক্ষা।

ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও উক্ত মতানুসারেই ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এবং তাৎপর্য্যটীকাকার ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রতিবাদীর পক্ষে স্পর্শশূন্যতারূপ হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক ॥২৫॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং—

অনুবাদ। এই "উপপত্তিসম" প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র। উপপত্তিকারণাভ্যনুজ্ঞানাদপ্রতিষেধঃ ॥২৬॥৪৮৭॥

অনুবাদ। উপপত্তির কারণের অর্থাৎ বাদীর নিজ পক্ষের উপপত্তিসাধক হেতুরও স্বীকারবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। **উভয়কারণোপপত্তে**রিতি ব্রুবতা নানিত্যত্বকারণোপপত্তেরনিত্যত্বং প্রতিষিধ্যতে। যদি প্রতিষিধ্যতে নোভয়কারণোপপত্তিঃ স্যাৎ। উভয়কারণোপপত্তিবচনাদনিত্যত্বকারণোপপত্তিরভ্যনুজ্ঞায়তে। অভ্যনুজ্ঞানাদনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ।

ব্যাঘাতাৎ প্রতিষেধ ইতি চেৎ? সমানো ব্যাঘাতঃ। একস্য নিত্যত্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গং ব্যাহতং ব্রুবতোক্তঃ প্রতিষেধ ইতি চেৎ? স্বপক্ষপরপক্ষয়োঃ সমানো ব্যাঘাতঃ। স চ নৈকতরস্য সাধক ইতি।

অনুবাদ। "উভয় পক্ষের 'কারণের' অর্থাৎ সাধক হেতুর উপপত্তিবশতঃ" এই কথা যিনি বলেন, তৎকর্ত্তৃক অনিত্যত্বের সাধক হেতুরও উপপত্তিবশতঃ অনিত্যত্ব প্রতিষিদ্ধ হয় না। যদি প্রতিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সাধক হেতুর উপপত্তি থাকে না। উভয় পক্ষের সাধক হেতুর উপপত্তি কথন প্রযুক্ত অনিত্যত্বের সাধক হেতুর উপপত্তি স্বীকৃত হইতেছে। স্বীকারবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত) প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না।

(পূর্ব্বপক্ষ) ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধপ্রযুক্ত (পূর্ব্বোক্ত) প্রতিষেধ হয়, ইহা যদি বল? (উত্তর) ব্যাঘাত সমান। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ব্বপক্ষ) যিনি একই পদার্থের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ ব্যাহত বলেন, তৎকর্ত্তৃক প্রতিষেধ অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ উক্ত হইয়াছে, ইহা যদি বল? (উত্তর) স্বপক্ষ ও পরপক্ষে ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধ তুল্য। (সুতরাং) সেই ব্যাঘাতও একতর পক্ষের সাধক হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত "উপপত্তিসম" প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে অর্থাৎ উহার অসদুত্তরত্ব সমর্থন করিতে পরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাধক হেতুরই সত্তা স্বীকার করায় পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ করিতে প্রতিবাদী যখন "উভয় পক্ষের সাধক হেতুর উপপত্তিবশতঃ" এই কথা বলেন, তখন পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষের সাধক হেতুরও সত্তাবশতঃ তিনি অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। কারণ, যদি তিনি শব্দে অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে অনিত্যত্বের সাধক হেতু নাই, ইহাই তাঁহাকে বলিতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বকথিত উভয় পক্ষের সাধক হেতুর সত্তা থাকে না। কিন্তু তিনি যখন উভয় পক্ষের সাধক হেতুর সত্তা বলিয়াছেন, তখন শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হেতুর সত্তা তিনি স্বীকারই করিয়াছেন। সুতরাং তিনি আর শব্দে অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। তাঁহার ঐ প্রতিষেধ উপপন্ন হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দে অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিয়া অর্থাৎ অভাব সমর্থন করিয়া, বাদীর অনুমানে বাধ বা সৎপ্রতিপক্ষ দোষ প্রদর্শন করাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হেতুও আছে, ইহা স্বীকার করায় শব্দে যে অনিত্যত্ব আছে, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার ঐ উত্তর তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিকূল হওয়ায় উহা বিরুদ্ধ হয়। কারণ, শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হেতু স্বীকার করিয়া অনিত্যত্বও স্বীকার করিব এবং ঐ অনিত্যত্বের প্রতিষেধও করিব, ইহা কখনই সম্ভব হয় না। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা উক্তরূপ বিরোধ সূচনা করিয়া, প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর যে স্বব্যাঘাতক হওয়ায় অসদুত্তর, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্ববৎ স্বব্যাঘাতকত্বই ইহার সাধারণ দুষ্টত্বমূল। এবং ভাষ্যকারের মতানুসারে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী স্পর্শশূন্যত্বকে শব্দের নিত্যত্বসাধক হেতুরূপে প্রদর্শন করিলে, তাঁহার ঐ হেতুতে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি নাই। কারণ, স্পর্শশূন্য পদার্থমাত্রই নিত্য নহে। সুতরাং প্রতিবাদীর ঐ হেতুর যুক্তাঙ্গহীনত্ববশতঃ যুক্তাঙ্গহানিও তাঁহার ঐ উত্তরের দুষ্টত্ব মূল বুঝিতে হইবে। বরদরাজ তাঁহার মতেও যুক্তাঙ্গহানি প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আমি ব্যাঘাতবশতঃই উক্তরূপ প্রতিষেধ বলিয়াছি। অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে, শব্দে যেমন অনিত্যত্বের সাধক হেতু আছে, তদ্রূপ নিত্যত্বের সাধক হেতুও আছে। কিন্তু একই শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ। সুতরাং ঐ ব্যাঘাত বা বিরোধের পরিহারের জন্য শব্দে অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিয়া নিত্যত্বই স্বীকার্য্য, ইহাই আমার বক্তব্য। ভাষ্যকার পরে এখানে প্রতিবাদীর ঐ কথারও উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়া, পরে উহার উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঐ ব্যাঘাত স্বপক্ষ ও পরপক্ষে সমান। সুতরাং উহাও একতর পক্ষের সাধক হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন শব্দে অনিত্যত্ব থাকিলে নিত্যত্ব থাকিতে পারে না, তদ্রূপ নিত্যত্ব থাকিলেও অনিত্যত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রতিবাদী যেমন ঐ ব্যাঘাত পরিহারের জন্য শব্দের অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিয়া নিত্যত্ব স্বীকার করিবেন, তদ্রূপ বাদীও

শব্দের নিত্যত্বের প্রতিষেধ করিয়া অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে পারেন। কারণ, তাহা হইলেও উক্ত ব্যাঘাত বা বিরোধ থাকে না। সুতরাং উক্ত ব্যাঘাত, শব্দের নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বরূপ কোন এক পক্ষের সাধক হয় না। অর্থাৎ কোন পক্ষের সাধক প্রকৃত প্রমাণ ব্যতীত কেবল উক্ত ব্যাঘাত-প্রযুক্ত যে কোন এক পক্ষের প্রতিষেধ করিয়া অপর পক্ষের নির্ণয় করা যায় না ॥২৬॥

অনুপপত্তিসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১১॥

সূত্র। নির্দ্দিষ্টকারণাভাবেঽপ্যুপলম্ভাদুপলব্ধি-সমঃ ॥২৭॥৪৮৮॥

অনুবাদ। নির্দ্দিষ্ট কারণের অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতুর অভাবেও (সাধ্য ধর্ম্মের) উপলব্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২০) উপলব্ধিসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। নির্দ্দিষ্টস্য প্রযত্নানন্তরীয়কত্বস্যানিত্যত্বকারণস্যাভাবেঽপি বায়ুনোদনাদ্[1]বৃক্ষশাখাভঙ্গজস্য শব্দস্যানিত্যত্বমুপলভ্যতে। নির্দ্দিষ্টস্য সাধনস্যাভাবেঽপি সাধ্যধর্ম্মোপলব্ধ্যা প্রত্যবস্থানমুপলব্ধিসমঃ।

অনুবাদ। নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্নজন্যত্বরূপ অনিত্যত্বসাধক হেতুর

১। "নোদন" শব্দের অর্থ সংযোগবিশেষ। উহা ক্রিয়াবিশেষের কারণ। বাণ নিঃক্ষেপ করিলে উহার প্রথম ক্রিয়া "নোদন"জন্য। মহর্ষি কণাদ "নোদনাদাদ্যমিষোঃ কর্ম্ম" ইত্যাদি (৫।১।১৭) সূত্রের দ্বারা ইহা বলিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রিয়ার কারণ বর্ণনায় বহু সূত্রে "নোদন" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং "অভিঘাত" শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। "ভাষাপরিচ্ছেদে" বিশ্বনাথ পঞ্চানন শব্দজনক সংযোগবিশেষের নাম "অভিঘাত" এবং শব্দের অজনক সংযোগবিশেষের নাম "নোদন" ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে, বেগজনিত যে সংযোগবিশেষ বিভাগের জনক ক্রিয়ার কারণ হয়, তাহার নাম "অভিঘাত"। এবং গুরুত্বাদি যে কোন কারণজন্য যে সংযোগবিশেষ বিভাগের অজনক ক্রিয়ার কারণ হয়, তাহার নাম "নোদন"। "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ভট্ট উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"নোদ্যনোদকয়োঃ পরস্পরবিভাগং ন করোতি যৎ কর্ম্ম, তস্য কারণং নোদনং"। (প্রশস্তপাদভাষ্য, ৩০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "নুদ" ধাতুর অর্থ প্রেরণ। সুতরাং যাহা প্রেরক, তাহাকে বলে নোদক এবং যাহা প্রের্য্য, তাহাকে বলে নোদ্য। প্রবল বায়ুসংযোগে বৃক্ষের শাখাভঙ্গ স্থলে বায়ু নোদক এবং শাখা নোদ্য। ঐ স্থলে বৃক্ষের শাখায় যে ক্রিয়া জন্মে, তাহা ঐ শাখা ও বায়ুর বিভাগ জন্মায় না। কারণ, তখনও বায়ুর সহিত ঐ শাখার সংযোগ বিদ্যমানই থাকে। সুতরাং বায়ু ও শাখার ঐ সংযোগ তখন ঐ উভয়ের পরস্পর বিভাগজনক ক্রিয়ার কারণ না হওয়ায় ভাষ্যকার উহাকে "নোদন" বলিতে পারেন। কারণ, যে ক্রিয়া নোদ্য ও নোদকের পরস্পর বিভাগ জন্মায় না, তাহার কারণ সংযোগবিশেষই "নোদন"। উহা অন্য কোন পদার্থের বিভাগজনক ক্রিয়ার কারণ হইলেও "নোদন" হইতে পারে। "নুদ্যতেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ঐরূপ সংযোগবিশেষ অর্থে "নোদন" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

অভাবেও অর্থাৎ প্রযত্নজন্যত্ব হেতু না থাকিলেও বায়ুর নোদন অর্থাৎ বিজাতীয় *সংযোগবিশেষপ্রযুক্ত বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য শব্দের অনিত্যত্ব উপলব্ধ হয়। নির্দ্দিষ্ট সাধনের অভাবেও অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও সাধ্য ধর্ম্মের উপলব্ধি-প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২০) উপলব্ধিসম* প্রতিষেধ।

টিপ্পনী। ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা "উপলব্ধিসম" প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। সূত্রে "কারণ" শব্দের দ্বারা সাধক হেতু বিবক্ষিত। বাদী নিজ পক্ষ সাধনের জন্য যে হেতুর নির্দ্দেশ বা উল্লেখ করেন, তাহাই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কারণ। পূর্ব্ববৎ এই সূত্রেও "প্রত্যবস্থানং" এই পদের অধ্যাহার বা অনুবৃত্তি মহর্ষির অভিমত। এবং "উপলম্ভাৎ" এই পদের পূর্ব্বে "সাধ্যধর্ম্মস্য" এই পদের অধ্যাহারও মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই ভাষ্যকার শেষে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট সাধনের অভাবেও অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও সাধ্যধর্ম্মের উপলব্ধি-প্রযুক্ত যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে "উপলব্ধিসম" প্রতিষেধ। ভাষ্যকার প্রথমে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্নজন্যত্বরূপ যে অনিত্যত্বসাধক হেতু, তাহা না থাকিলেও বায়ুর সংযোগবিশেষপ্রযুক্ত বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য যে শব্দ জন্মে, তাহার অনিত্যত্বের উপলব্ধি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নজন্যত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার নির্দ্দিষ্ট বা কথিত হেতু যে প্রযত্নজন্যত্ব, তাহা বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য শব্দে নাই। কারণ, ঐ শব্দ কোন ব্যক্তির প্রযত্নজন্য নহে। কিন্তু ঐ শব্দেও তোমার সাধ্যধর্ম্ম অনিত্যত্বের উপলব্ধি হইতেছে। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, যে হেতু না থাকিলেও তাহার সাধ্যধর্ম্মের উপলব্ধি বা নিশ্চয় হয়, সেই হেতু সেই সাধ্যধর্ম্মের সাধক বলা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদীর কথিত প্রযত্ন-জন্যত্ব হেতু শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হয় না, উহা অসাধক। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রত্যবস্থান "উপলব্ধিসম" প্রতিষেধ বা "উপলব্ধিসমা" জাতি। আপত্তি হইতে পারে যে, অনিত্য পদার্থমাত্রই প্রযত্নজন্য, ইহা ত বাদী বলেন নাই। যে যে পদার্থ প্রযত্নজন্য, সে সমস্তই অনিত্য, এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃই বাদী ঐরূপ হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ঐ হেতুতে ব্যভিচার নাই। কারণ, কোন নিত্য পদার্থই প্রযত্নজন্য নহে। অতএব বাদীর উদাহরণ-বাক্যানুসারে উক্ত স্থলে তাঁহার বক্তব্য যাহা বুঝা যায়, তাহাতে প্রতিবাদী ঐরূপ দোষ বলিতেই পারেন না। সুতরাং উক্তরূপে এই "উপলব্ধিসমা" জাতির উত্থানই হয় না। কারণ, ঐরূপে উহার উত্থানের কোন বীজ নাই। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এইরূপ চিন্তা করিয়া, এখানে অন্য ভাবে উক্ত জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শব্দমাত্রকেই বাদীর সাধ্যধর্ম্মী বলিয়া আরোপ করিয়া, তন্মধ্যে বৃক্ষের শাখাভঙ্গাদিজন্য ধ্বন্যাত্মক শব্দে বাদীর ঐ হেতু নাই, ইহাই প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ যদিও বাদী উক্ত স্থলে "শব্দোঽনিত্যঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা বর্ণাত্মক শব্দকেই সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি শব্দমাত্রকেই পক্ষরূপে

গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ আরোপ করিয়া, প্রতিবাদী সেই পক্ষের অন্তর্গত ধ্বন্যাত্মক শব্দবিশেষে বাদীর হেতু নাই, ইহা প্রদর্শনপূর্ব্বক বাদীর হেতুতে ভাগাসিদ্ধিদোষের আরোপ করেন। পক্ষের অন্তর্গত কোন পদার্থে হেতু না থাকিলে তাহাকে "ভাগাসিদ্ধি" বা অংশতঃ স্বরূপাসিদ্ধি দোষ বলে। ফলকথা, উদ্দ্যোতকরের মতে প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞার্থ ব্যতিরিক্ত পক্ষকেও তাঁহার প্রতিজ্ঞার্থ বলিয়া আরোপ করিয়া, তাহাতে বাদীর কথিত হেতুর অভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক ভাগাসিদ্ধিদোষের উদ্‌ভাবন করিলে, তাঁহার সেই উত্তরের নাম "উপলব্ধিসমা" জাতি। উদ্দ্যোতকর উক্ত স্থলে ইহার আরও দুইটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সেই স্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ আরোপের বীজ বা মূল কি? তাহা তিনি কিছু বলেন নাই।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, বাদী তাঁহার প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যে অবধারণবোধক কোন শব্দের প্রয়োগ না করিলেও অর্থাৎ কোন অবধারণে তাঁহার তাৎপর্য্য না থাকিলেও প্রতিবাদী যদি বাদীর প্রতিজ্ঞাদিবাক্যে তাঁহার কোন অবধারণে তাৎপর্য্যের বিকল্প করিয়া বাধাদি দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম উপলব্ধিসমা জাতি[১]। যেমন কোন বাদী "পর্ব্বতো বহ্নিমান্‌" এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি কেবল পর্ব্বতেই বহ্নি আছে, অথবা পর্ব্বতমাত্রেই অবশ্য বহ্নি আছে? কেবল পর্ব্বতেই বহ্নি আছে, ইহা বলা যায় না। কারণ, অন্যত্রও বহ্নির প্রত্যক্ষ হয়। এবং পর্ব্বতমাত্রেই অবশ্য বহ্নি আছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কদাচিৎ বহ্নি-শূন্য পর্ব্বতও দেখা যায়। সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষে সাধ্য বহ্নি না থাকিলেও পক্ষ বা ধর্ম্মী পর্ব্বতের উপলব্ধি হওয়ায় বাদীর ঐ অনুমানে বাধদোষ হয়। এইরূপ উক্ত স্থলে বাদী "ধূমাৎ" এই হেতু-বাক্যের প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি পর্ব্বতে কেবল ধূমই আছে? অথবা পর্ব্বতমাত্রেই ধূম আছে? কিন্তু পর্ব্বতে বৃক্ষাদিরও উপলব্ধি হওয়ায় কেবল ধূমই আছে, ইহা বলা যায় না। এবং কদাচিৎ ধূমশূন্য পর্ব্বতেরও উপলব্ধি হওয়ায় পর্ব্বতমাত্রেই ধূম আছে, ইহাও বলা যায় না। ঐ পক্ষে ধূম হেতুর অভাবেও পক্ষ বা ধর্ম্মী পর্ব্বতের উপলব্ধি হওয়ায় বাদীর উক্ত অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি কেবল ধূমবত্তাপ্রযুক্তই পর্ব্বত বহ্নিমান্‌? ইহাই তাৎপর্য্য? কিন্তু আলোকাদিপ্রযুক্তও পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান হওয়ায় উহা বলা যায় না। কারণ, ধূম হেতুর অভাবেও পর্ব্বতে সাধ্য বহ্নির অনুমানরূপ উপলব্ধি হওয়ায় কেবল ধূম হেতুতে ঐ সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই, ইহা অব্যাপ্তি দোষ। এইরূপ কোন স্থলে অতিব্যাপ্তিদোষ দ্বারাও প্রতিবাদী প্রত্যবস্থান করিলে তাহাও "উপলব্ধিসমা" জাতি হইবে। "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য উক্ত জাতির পঞ্চ প্রকার প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্‌ভাব্য পঞ্চ দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—(১) সাধ্যধর্ম্ম না থাকিলেও ধর্ম্মী বা পক্ষের উপলব্ধি হওয়ায় বাধদোষ হয়। (২) হেতু না থাকিলেও ধর্ম্মী

১। অবধারণতাৎপর্য্যং বাদিবাক্যে বিকল্প্য যৎ। তদ্‌বাধাৎ প্রত্যবস্থানমুপলব্ধিসমো মতঃ ॥২৭॥—তার্কিকরক্ষা।

বা পক্ষের উপলব্ধি হওয়ায় স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। (৩) সাধ্যধর্ম্ম ও হেতু, এই উভয় না থাকিলেও ধর্ম্মী বা পক্ষের উপলব্ধি হওয়ায় বাধ ও স্বরূপাসিদ্ধি, এই উভয় দোষ হয়। (৪) হেতু না থাকিলেও কোন স্থলে সাধ্যধর্ম্মের উপলব্ধি হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ হয়। (৫) সাধ্যধর্ম্ম না থাকিলেও কোন স্থলে হেতু থাকায় অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। উদয়নাচার্য্য ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বরদরাজ পূর্ব্বোক্তরূপে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও উক্ত মতানুসারেই সংক্ষেপে এই "উপলব্ধিসম" জাতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মতে প্রতিবাদী, বাদীর বাক্যে কোন অবধারণ তাৎপর্য্য না থাকিলেও উহা সমর্থন করিয়া উক্ত-রূপ প্রত্যবস্থান করেন, উহাই উক্ত জাতির উত্থানের বীজ ॥ ২৭॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং—

অনুবাদ। এই "উপলব্ধিসম" প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র। কারণান্তরাদপি তদ্ধর্ম্মোপপত্তেরপ্রতিষেধঃ॥ ॥২৮॥৪৮৯॥

অনুবাদ। "কারণান্তর"প্রযুক্তও অর্থাৎ অন্য জ্ঞাপক বা সাধক হেতুপ্রযুক্তও "তদ্ধর্ম্মের" অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের উপপত্তি হওয়ায় (পূর্ব্বোক্ত) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। "প্রযত্নানন্তরীয়কত্বা"দিতি ব্রুবতা কারণত উৎপত্তিরভি-ধীয়তে, ন কার্য্যস্য কারণনিয়মঃ। যদি চ কারণান্তরাদপ্যুৎপদ্যমানস্য শব্দস্য তদনিত্যত্বমুপপদ্যতে, কিমত্র প্রতিষিধ্যত ইতি।

অনুবাদ। "প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" এই হেতু-বাক্যবাদী কর্ত্তৃক কারণজন্য উৎপত্তি কথিত হয়, কার্য্যের কারণ-নিয়ম কথিত হয় না। (অর্থাৎ উক্ত বাদী বর্ণাত্মক শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিবার নিমিত্ত ঐ হেতুর দ্বারা ঐ শব্দ যে প্রযত্নরূপ কারণজন্য, ইহাই বলেন। কিন্তু সমস্ত শব্দই প্রযত্নজন্য, আর কোন কারণে কোন শব্দই জন্মে না, ইহা তিনি বলেন না)। কিন্তু যদি কারণান্তরপ্রযুক্তও জায়মান শব্দবিশেষের সেই অনিত্যত্ব উপপন্ন হয়, তাহা হইলে এই স্থলে কি প্রতিষিদ্ধ হয়? অর্থাৎ তাহা হইলে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য কিছুই না থাকায় তিনি প্রতিষেধ করিতে পারেন না।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "উপলব্ধিসম" প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন। পূর্ব্ববৎ এই সূত্রেও "কারণ" শব্দের দ্বারা জ্ঞাপক বা সাধক হেতুই বিবক্ষিত। বাদীর প্রযুক্ত হেতু হইতে ভিন্ন হেতুর দ্বারাও সাধ্যধর্ম্মের উপপত্তি বা সিদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ

হয় না, ইহাই সূত্রার্থ[১]। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্থলে ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী বর্ণাত্মক শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিবার জন্ত "প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" এই হেতু-বাক্যের দ্বারা প্রযত্নরূপ কারণজন্ত ঐ শব্দের উৎপত্তি হয়, সুতরাং উহা অনিত্য, ইহাই বলেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার সমস্ত শব্দেই প্রযত্নই কারণ, ইহা তিনি বলেন না। ঐরূপ কারণ-নিয়ম তাঁহার বিবক্ষিত নহে। সুতরাং তাঁহার ঐ হেতু বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দে না থাকিলেও কোন দোষ হইতে পারে না। বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্ত ঐ শব্দও কারণজন্ত এবং সেই কারণজন্তত্ব-রূপ অন্ত হেতুর দ্বারা উহারও অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। ভাষ্যে সর্ব্বত্র "কারণ" শব্দের অর্থ—জনক হেতু। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বৃক্ষের শাখাভঙ্গাদিজন্ত যে সমস্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহারও যে কারণান্তর আছে, ইহা বাদীও স্বীকার করেন; তিনি উহার প্রতিষেধ করেন না। এবং সেই কারণান্তরজন্তত্ব প্রভৃতি হেতুর দ্বারা যে, ঐ সমস্ত শব্দেরও অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাও বাদী স্বীকার করেন এবং প্রতিবাদীও ঐ সমস্তই স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং উক্ত স্থলে তিনি কিসের প্রতিষেধ করিবেন? তাঁহার প্রতিষেধ্য কিছুই নাই। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—"কিমত্র প্রতিষিধ্যতে।" ফলকথা, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী ঐরূপ প্রতিষেধ করিতে পারেন না। ঐরূপ প্রতিষেধ করিলে তিনি পরে বাদীর হেতুর দুষ্টত্ব সাধন করিতে যে অনুমান প্রয়োগ করিবেন, তাহাতেও বাদী তাঁহার ন্যায় প্রতিষেধ করিতে পারেন। এবং উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে নানারূপ অবধারণতাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া বাধাদি দোষের উদ্ভাবন করিলে, বাদীও প্রতিবাদীর বাক্যে পূর্ব্ববৎ নানারূপ অবধারণতাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া ঐরূপ নানা দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন। সুতরাং প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা কোনরূপেই সদুত্তর হইতে পারে না। বরদরাজ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা অন্ত হেতু-প্রযুক্তও সাধ্যসিদ্ধি হয়, এই কথা বলিয়া বাদীর হেতুতে অবধারণের অস্বীকার প্রদর্শন করিয়া, তদ্দ্বারা বাদীর সাধ্যাদি পদার্থেও অবধারণের অস্বীকার সূচনা করিয়াছেন। এই "উপলব্ধিসমা" জাতি কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত না হওয়ায় জাতির লক্ষণাক্রান্ত হইবে কিরূপে? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, যাহা অহেতু বা অসাধক, তাহার সহিত সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্তই প্রতিবাদী ঐরূপ প্রত্যবস্থান করায় ইহাও "জাতি"র লক্ষণাক্রান্ত হয় ॥২৮॥

উপলব্ধিসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১২॥

ভাষ্য। **ন প্রাগুচ্চারণাদ্বিদ্যমানস্য শব্দস্যানুপলব্ধিঃ।** কস্মাৎ? **আবরণাদ্যনুপলব্ধেঃ।** যথা বিদ্যমানস্যোদকাদেরর্থস্যা-বরণাদেরনুপলব্ধির্নৈবং শব্দস্যাগ্রহণকারণেনাবরণাদিনাঽনুপলব্ধিঃ। গৃহ্যেত

১। সূত্রার্থস্তু "কারণান্তরাদপি" জ্ঞাপকান্তরাদপি "তদ্ধর্ম্মোপপত্তেঃ" সাধ্যধর্ম্মোপপত্তেরপ্রতিষেধ" ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

চৈতদস্যাগ্রহণকারণমুদকাদিবৎ, ন গৃহ্যতে। তস্মাদুদকাদিবিপরীতঃ শব্দো-ঽনুপলভ্যমান ইতি।

অনুবাদ। উচ্চারণের পূর্ব্বে বিদ্যমান শব্দের অনুপলব্ধি (অশ্রবণ) হইতে পারে না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু আবরণাদির উপলব্ধি হয় না। (তাৎপর্য্য) যেমন বিদ্যমান জলাদি পদার্থের আবরণাদিপ্রযুক্ত অনুপলব্ধি (অপ্রত্যক্ষ) হয়, এইরূপ শব্দের অগ্রহণকারণ অর্থাৎ অশ্রবণের প্রযোজক আবরণাদিপ্রযুক্ত অনুপলব্ধি হয় না। জলাদির ন্যায় এই শব্দের অগ্রহণকারণ অর্থাৎ অশ্রবণের প্রযোজক আবরণাদি গৃহীত হউক? কিন্তু গৃহীত হয় না, (অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ জলাদির অপ্রত্যক্ষের প্রযোজক আবরণাদির যেমন প্রত্যক্ষ হইতেছে, তদ্রূপ উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের অশ্রবণের প্রযোজক আবরণাদির প্রত্যক্ষ হয় না) অতএব অনুপলভ্যমান শব্দ জলাদির বিপরীত অর্থাৎ জলাদির তুল্য নহে।

সূত্র। তদনুপলব্ধেরনুপলম্ভাদভাবসিদ্ধৌ তদ্বিপরী-তোপপত্তেরনুপলব্ধিসমঃ ॥২৯॥৪৯০॥

অনুবাদ। সেই আবরণাদির অনুপলব্ধির অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত অভাবের সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ধির অভাব যে আবরণাদির উপলব্ধি, তাহা সিদ্ধ হওয়ায় তাহার বিপরীতের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সেই আবরণাদির অভাবের বিপরীত যে, আবরণাদির অস্তিত্ব, তাহার সিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২১) **অনুপলব্ধিসম** প্রতিষেধ।

ভাষ্য। তেষামাবরণাদীনামনুপলব্ধির্নোপলভ্যতে। অনুপলম্ভা-ন্নাস্তীত্যভাবোঽস্যাঃ সিধ্যতি। **অভাবসিদ্ধৌ** হেত্বভাবাত্তদ্বিপরীত-মস্তিত্বমাবরণাদীনামবধার্য্যতে। **তদ্বিপরীতোপপত্তের্**যৎপ্রতিজ্ঞাতং "ন প্রাগুচ্চারণাদ্বিদ্যমানস্য শব্দস্যানুপলব্ধিরিত্যে"তন্ন সিধ্যতি। সোঽয়ং হেতু"রাবরণাদ্যনুপলব্ধে"রিত্যাবরণাদিষু চাবরণাদ্যনুপলব্ধৌ চ সময়াঽনুপ-লব্ধ্যা প্রত্যবস্থিতোঽ**নুপলব্ধিসমো** ভবতি।

অনুবাদ। সেই আবরণাদির অনুপলব্ধি উপলব্ধ হয় না। অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত "নাই" অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ধি নাই, এইরূপে উহার অভাব সিদ্ধ হয়। অভাবসিদ্ধি হইলে হেতুর অভাববশতঃ অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত হেতু যে

আবরণাদির অনুপলব্ধি, তাহার অভাব (আবরণাদির উপলব্ধি) সিদ্ধ হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত, তাহার বিপরীত অর্থাৎ আবরণাদির অভাবের বিপরীত আবরণাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত হয়। তাহার বিপরীতের অর্থাৎ আবরণাদির অস্তিত্বের উপপত্তি (নিশ্চয়)বশতঃ "উচ্চারণের পূর্ব্বে বিদ্যমান শব্দের অনুপলব্ধি হইতে পারে না" এই বাক্যের দ্বারা যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হয় না। সেই এই হেতু (অর্থাৎ) "আবরণাদ্যনুপলব্ধেঃ" এই হেতুবাক্য আবরণাদি বিষয়ে এবং আবরণাদির অনুপলব্ধি বিষয়ে তুল্য অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থিত অর্থাৎ প্রত্যবস্থানের বিষয় হওয়ায় (২০) অনুপলব্ধিসম প্রতিষেধ হয়, অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রত্যবস্থানকে "অনুপলব্ধিসম" প্রতিষেধ বলে।

টিপ্পনী। ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা "অনুপলব্ধিসম" প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। কিরূপ স্থলে ইহার প্রয়োগ হয় ? ইহার দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য কি ? ইহা প্রথমে না বলিলে ইহার লক্ষণ ও উদাহরণ বুঝা যায় না। তাই ভাষ্যকার প্রথমে তাহা প্রকাশ করিয়া, এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের সেই প্রথম কথার তাৎপর্য্য এই যে, শব্দনিত্যত্ববাদী মীমাংসক, শব্দের নিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্ব্বেও উহা বিদ্যমান থাকায় তখনও উহার শ্রবণ হউক ? কিন্তু যখন উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের শ্রবণ হয় না, তখন ইহা স্বীকার্য্য যে, তখন শব্দ নাই। সুতরাং শব্দ নিত্য হইতে পারে না। এতদুত্তরে বাদী মীমাংসক বলিলেন যে, উচ্চারণের পূর্ব্বেও শব্দ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তখন উহা অন্য কোন পদার্থ কর্তৃক আবৃত থাকে, অথবা তখন উহার শ্রবণের অন্য কোন প্রতিবন্ধক থাকে। সুতরাং তখন সেই আবরণাদিপ্রযুক্ত শব্দের শ্রবণ হয় না। যেমন ভূগর্ভে জলাদি অনেক পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও আবরণাদিপ্রযুক্ত তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। এতদুত্তরে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, বিদ্যমান জলাদি অনেক পদার্থের যে আবরণাদিপ্রযুক্তই প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, তাহার আবরণাদির উপলব্ধি হইতেছে। কিন্তু উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের অশ্রবণের প্রয়োজক বা শ্রবণপ্রতিবন্ধক যে, কোন আবরণাদি আছে, তাহার ত উপলব্ধি হয় না। যদি সেই আবরণাদি থাকে, তবে তাহার উপলব্ধি হউক ? কিন্তু উপলব্ধি না হওয়ায় উহা নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং অনুপলভ্যমান শব্দ অর্থাৎ তোমার মতে উচ্চারণের পূর্ব্বে বিদ্যমান শব্দ জলাদির সদৃশ নহে। অতএব তখন তাহার অনুপলব্ধি বা অশ্রবণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার প্রথমে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের ঐ প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়া, পরে প্রশ্নপূর্ব্বক "আবরণাদ্য-নুপলব্ধেঃ" এই হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাদী মীমাংসক নৈয়ায়িকের ঐ কথার সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের আবরণাদির উপলব্ধি হয় না বলিয়া যদি অনুপলব্ধিবশতঃ উহার অভাব নির্ণয় হয়, তাহা হইলে ঐ

আবরণাদির অনুপলব্ধির অভাব যে আবরণাদির উপলব্ধি, তাহারও নির্ণয় হয়। কারণ, সেই অনুপলব্ধিরও ত উপলব্ধি হয় না। সুতরাং আবরণাদির যে অনুপলব্ধি, তাহারও অনুপলব্ধি প্রযুক্ত অভাব সিদ্ধ হইলে আবরণাদির উপলব্ধিই সিদ্ধ হইবে। কারণ, আবরণাদির অনুপলব্ধির যে অভাব, তাহা ত আবরণাদির উপলব্ধি। উহা সিদ্ধ হইলে আবরণাদির সত্তাও সিদ্ধ হইবে। সুতরাং উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের কোন আবরণাদি নাই, ইহা সমর্থন করা যায় না অর্থাৎ অনুপলব্ধি হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ করা যায় না। কারণ, উহা সমর্থন করিতে "আবরণাদ্যনুপলব্ধেঃ" এই বাক্যের দ্বারা যে অনুপলব্ধিরূপ হেতু কথিত হইয়াছে, উহা অসিদ্ধ। উক্ত স্থলে জাতিবাদী মীমাংসক প্রথমে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন করিয়া, পরে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের কথিত ঐ হেতুতে অসিদ্ধি দোষের উদ্ভাবন করেন। পরে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আবরণাদির অনুপলব্ধির অনুপলব্ধি থাকিলেও উহার অভাব অর্থাৎ আবরণাদির উপলব্ধি নাই, সুতরাং আমার ঐ হেতু অসিদ্ধ নহে। তাহা হইলে তখন জাতিবাদী উক্ত হেতুতে ব্যভিচারদোষ প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ অনুপলব্ধি থাকিলেও যদি উহার অভাব না থাকে, তাহা হইলে অনুপলব্ধি অভাবের ব্যভিচারী হওয়ায় সাধক হইতে পারে না। সুতরাং উহার দ্বারা প্রতিবাদী তাঁহার নিজ সাধ্য যে আবরণাদির অভাব, তাহাও সিদ্ধ করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে শব্দনিত্যত্ববাদীর উক্তরূপ প্রত্যবস্থানকে "অনুপলব্ধিসম" প্রতিষেধ বা "অনুপলব্ধিসমা" জাতি বলে।

মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষায় নিজেই উক্ত জাতির পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ প্রদর্শন এবং খণ্ডনও করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে ইহা যে, "জাতি" বা জাত্যুত্তর, তাহা বলেন নাই। এখানে জাতির প্রকারভেদ নিরূপণ করিবার জন্য যথাক্রমে এই সূত্রের দ্বারা উক্ত "জাতি"র লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত স্থলানুসারেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে সূত্রের প্রথমোক্ত "তৎ"শব্দের দ্বারা আবরণাদিকেই গ্রহণ করিয়া, "তদনুপলব্ধেরনুপলম্ভাৎ" এই বাক্যের দ্বারা সেই আবরণাদির অনুপলব্ধির উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ উহারও অনুপলব্ধি, ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে ঐ অনুপলম্ভ বা অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত আবরণাদির অনুপলব্ধিও নাই, এইরূপে উহার অভাব সিদ্ধ হয়, এই কথা বলিয়া সূত্রোক্ত "অভাবসিদ্ধৌ" এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভাবসিদ্ধি হইলে অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ধির অভাব যে আবরণাদির উপলব্ধি, তাহা সিদ্ধ হইলে আবরণাদির অভাবের বিপরীত যে আবরণাদির অস্তিত্ব, তাহা নিশ্চিত হয়—এই কথা বলিয়া, পরে সূত্রোক্ত "তদ্বিপরীতোপপত্তেঃ" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার উক্ত বাক্যে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের সম্মত যে আবরণাদির অভাব, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। পরে উক্ত জাতিবাদী মীমাংসকের চরম বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আবরণাদির অভাবের বিপরীত যে আবরণাদির অস্তিত্ব, তাহার উপপত্তি অর্থাৎ নিশ্চয় হওয়ায় নৈয়ায়িক যে "উচ্চারণের পূর্ব্বে বিদ্যমান শব্দের অনুপলব্ধি হইতে পারে না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, তাঁহার কথিত হেতু যে, আবরণাদির অনুপলব্ধি, তাহা নাই। অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত তাহারও অভাব

অর্থাৎ আবরণাদির উপলব্ধি সিদ্ধ হওয়ায় আবরণাদির সত্তাও সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ঐ আবরণাদিপ্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্ব্বে বিদ্যমান শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা বলা যাইতে পারে। ফলকথা, প্রতিবাদী নৈয়ায়িক "আবরণাদ্যনুপলব্ধেঃ" এই হেতুবাক্যের দ্বারা অনুপলব্ধিকেই আবরণাদির অভাবের সাধক বলিলে, উহা ঐ অনুপলব্ধিরও অভাবের সাধক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, আবরণাদি বিষয়ে যেমন অনুপলব্ধি, তদ্রূপ আবরণাদির অনুপলব্ধি বিষয়েও অনুপলব্ধি আছে। উভয় বিষয়েই ঐ অনুপলব্ধি তুল্য। সুতরাং আবরণাদির সত্তাও স্বীকার্য্য হইলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞার্থ কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে ইহাই বলিয়া সূত্রোক্ত "অনুপলব্ধিসম" প্রতিষেধের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের অভাব বলিলেও প্রতিবাদী সর্ব্বত্রই উক্তরূপ জাত্যুত্তর করিতে পারেন। উচ্চারণের পূর্ব্বে অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত শব্দ নাই, ইহা বলিলেও প্রতিবাদী ঐ অনুপলব্ধির অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত উহা নাই অর্থাৎ উপলব্ধি আছে, ইহা বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিষেধ করিতে পারেন। এবং চার্ব্বাক অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত ঈশ্বর নাই, ইহা বলিলে ঐ অনুপলব্ধির অনুপলব্ধি গ্রহণ করিয়াও প্রতিবাদী উক্তরূপ জাত্যুত্তর করিতে পারেন। সুতরাং সূত্রের প্রথমোক্ত "তৎ" শব্দের দ্বারা অন্যান্য পদার্থও গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে ॥২৯॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং।

অনুবাদ। এই "অনুপলব্ধিসম" প্রতিষেধের উত্তর।

সূত্র। অনুপলম্ভাত্মকত্বাদনুপলব্ধেরহেতুঃ ॥৩০॥৪৯১॥

অনুবাদ। অহেতু অর্থাৎ অনুপলব্ধি, আবরণাদির অনুপলব্ধির অভাব সাধনে হেতু বা সাধক হয় না, যেহেতু অনুপলব্ধি অনুপলম্ভাত্মক অর্থাৎ উপলব্ধির অভাব মাত্র।

ভাষ্য। আবরণাদ্যনুপলব্ধির্নাস্তি, অনুপলম্ভাদিত্যহেতুঃ। কস্মাৎ? অনুপলম্ভাত্মকত্বাদনুপলব্ধেঃ। উপলম্ভাভাবমাত্রত্বাদনুপলব্ধেঃ। যদস্তি তদুপলব্ধের্ব্বিষয়ঃ, উপলব্ধ্যা তদস্তীতি প্রতিজ্ঞায়তে। যন্নাস্তি তদনুপলব্ধের্ব্বিষয়ঃ, অনুপলভ্যমানং নাস্তীতি প্রতিজ্ঞায়তে। সোঽয়মাবরণাদ্যনুপলব্ধেরনুপলম্ভ উপলব্ধ্যভাবেঽনুপলব্ধৌ স্ববিষয়ে প্রবর্ত্তমানো ন স্বং বিষয়ং প্রতিষেধতি। অপ্রতিষিদ্ধা চাবরণাদ্যনুপলব্ধির্হেতুত্বায় কল্পতে। আবরণাদীনি তু বিদ্যমানত্বাদুপলব্ধের্ব্বিষয়াস্তেষামুপলব্ধ্যা ভবিতব্যং। যত্তানি

নোপলভ্যন্তে, তদুপলব্ধেঃ স্ববিষয়-প্রতিপাদিকায়া অভাবাদনুপলম্ভাদনুপলব্ধের্ব্বিষয়ো গম্যতে ন সন্ত্যাবরণাদীনি শব্দস্যাগ্রহণকারণানীতি। অনুপলম্ভাত্ত্বনুপলব্ধিঃ সিধ্যতি বিষয়ঃ স তস্যেতি।

অনুবাদ। আবরণাদির অনুপলব্ধি নাই, যেহেতু (উহার) উপলব্ধি হয় না—ইহা অহেতু, অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ধির যে অনুপলব্ধি, তাহা ঐ অনুপলব্ধির অভাব সাধনে হেতু হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু অনুপলব্ধি "অনুপলম্ভাত্মক" (অর্থাৎ) অনুপলব্ধি উপলব্ধির অভাবমাত্র। যাহা আছে, তাহা উপলব্ধির বিষয়, উপলব্ধির দ্বারা তাহা আছে, এইরূপে প্রতিজ্ঞাত হয়। যাহা নাই, তাহা অনুপলব্ধির বিষয়, অনুপলভ্যমান বস্তু "নাই" এইরূপে প্রতিজ্ঞাত হয়। সেই এই আবরণাদির অনুপলব্ধির অনুপলম্ভ উপলব্ধির অভাবাত্মক অনুপলব্ধিরূপ নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তমান হইয়া নিজ বিষয়কে প্রতিষেধ করে না অর্থাৎ ঐ অনুপলব্ধির অভাব-সাধনে হেতু হয় না। কিন্তু অপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীরও স্বীকৃত আবরণাদির অনুপলব্ধি, (আবরণাদির অভাবের সম্বন্ধে) হেতুত্বে সমর্থ হয়, অর্থাৎ আবরণাদির যে অনুপলব্ধি, তাহা আবরণাদির অভাব সাধনে হেতু হয়। আবরণ প্রভৃতি কিন্তু বিদ্যমানত্ববশতঃ অর্থাৎ সত্তা বা ভাবত্ববশতঃ উপলব্ধির বিষয়, (সুতরাং) সেই আবরণ প্রভৃতির উপলব্ধি হইবে, অর্থাৎ তাহা উপলব্ধির যোগ্য। যেহেতু সেই আবরণাদি উপলব্ধ হয় না, অতএব নিজ বিষয়ের প্রতিপাদক উপলব্ধির অভাবরূপ অনুপলম্ভপ্রযুক্ত 'শব্দের অশ্রবণপ্রয়োজক আবরণাদি নাই'—এইরূপে অনুপলব্ধির বিষয় সিদ্ধ হয়। "অনুপলম্ভ"প্রযুক্ত অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবসাধক প্রমাণপ্রযুক্ত কিন্তু (আবরণাদির) অনুপলব্ধি সিদ্ধ হয়, (কারণ) তাহা তাহার (অনুপলম্ভের) বিষয় অর্থাৎ অনুপলব্ধিই উপলব্ধির অভাবসাধক প্রমাণের বিষয়, সুতরাং তদ্দ্বারা তাহার বিষয়সিদ্ধি হইলে তৎপ্রযুক্ত আবরণাদি অভাব সিদ্ধ হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "অনুপলব্ধিসম" প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অনুপলব্ধি আবরণাদির অনুপলব্ধির অভাবের অর্থাৎ আবরণাদির উপলব্ধির সাধনে হেতু হয় না। কারণ, অনুপলব্ধি অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ধি উপলব্ধির অভাবাত্মক। ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ হেতুবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে হেতু অনুপলব্ধি, উপলব্ধির অভাব মাত্র, অর্থাৎ উহা উপলব্ধির অভাব ভিন্ন কোন ভাব পদার্থ নহে। তাৎপর্য্যটীকাকার

বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার "মাত্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়া অনুপলব্ধি যে নিজের অভাবরূপ নহে, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর তাহাই অভিমত। কিন্তু জাতিবাদীর যে তাহাই অভিমত, ইহা ত বুঝিতে পারি না। সূত্রে "আত্মন্" শব্দের অর্থ স্বরূপ। ভাষ্যকার "মাত্র" শব্দের দ্বারা সূত্রোক্ত "আত্মন্" শব্দার্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও মনে হয়। ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়েও কোন স্থলে "ধ্বন্যাত্মক" শব্দ বলিতে "ধ্বনিমাত্র" বলিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভাষ্যকার এখানেও স্বরূপ অর্থেই "মাত্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। তাৎপর্য্যটীকাকারের কথা এখানে আমরা বুঝিতে পারি না। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়েও শব্দানিত্যত্ব পরীক্ষায় জাতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে এইরূপ সূত্র বলিয়াছেন[১]। সেখানে ভাষ্যকার সংক্ষেপে মহর্ষির যেরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তদনুসারে এখানেও তাঁহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যাও লিখিত হইয়াছে। এখানেও তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যসন্দর্ভের উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দ্বারা সরল ভাবে তাঁহার মূল যুক্তি কি বুঝা যায়, ইহাও প্রনিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক।

ভাষ্যকার সেই মূল যুক্তি প্রকাশ করিতে পরে এখানে বলিয়াছেন যে, যাহাতে অস্তিত্ব আছে, তাহাই উপলব্ধির বিষয় হয়। সুতরাং উপলব্ধি হেতুর দ্বারা তাহাই "অস্তি" এইরূপে প্রতিজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ উপলব্ধিহেতুর দ্বারা সেই পদার্থেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ করা হয়। এবং যে পদার্থ নাই, তাহা অনুপলব্ধির বিষয়। সুতরাং অনুপলভ্যমান বস্তু "নাস্তি" এইরূপে প্রতিজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ অনুপলব্ধি হেতু দ্বারা তাহারই নাস্তিত্ব সিদ্ধ করা হয়। ভাষ্যকারের বিবক্ষা এই যে, আবরণাদির অনুপলব্ধির উপলব্ধি হয় না, ইহা স্বীকার করিলে কেন উপলব্ধি হয় না, ইহা বক্তব্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর ইহাই বলিতে হইবে যে, যে পদার্থের অস্তিত্ব আছে, তাহাই উপলব্ধির বিষয় হয়। অস্তিত্ব বলিতে বুঝা যায় সত্তা, উহা ভাব পদার্থেরই ধর্ম্ম। কারণ, ভাব পদার্থই "সৎ" এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। এ জন্য ভাব পদার্থকেই বলে "সৎ"। অভাব পদার্থে "সৎ" এইরূপ প্রতীতি জন্মে না। এ জন্য উহা সৎ নহে, তাই উহাকে বলে "অসৎ"। ভাষ্যকার নিজেও "সৎ" ও "অসৎ" শব্দের দ্বারা ভাব ও অভাব পদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ১৪—১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অভাব পদার্থে সত্তা না থাকায় অভাবত্ব বা অসদ্ভাবশতঃ উহার উপলব্ধি হয় না, ইহা স্বীকার্য্য এবং পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর ইহাই বক্তব্য। ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়েও উক্ত সূত্রের ভাষ্যে "সেয়মভাবত্বান্নোপলভ্যতে" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর মতে আবরণাদির অনুপলব্ধি যে, অভাবত্ববশতঃই অর্থাৎ সত্তা না থাকায় উপলব্ধির

১। অনুপলম্ভাত্মকত্বাদনুপলব্ধেরহেতুঃ।২।২।২১ সূত্র।

যদুপলভ্যতে তদস্তি, যন্নোপলভ্যতে তন্নাস্তীতি। অনুপলম্ভাত্মকমসদিতি ব্যবস্থিতং। উপলব্ধ্যভাবশ্চানুপলব্ধিরিতি, সেয়মভাবত্বান্নোপলভ্যতে। সচ্চ খল্বাবরণং, তস্যোপলব্ধ্যা ভবিতব্যং ন চোপলভ্যতে, তস্মান্নাস্তীতি।—ভাষ্য। দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিষয় হয় না, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে আবরণাদির যে অনুপলব্ধি, তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় না, অর্থাৎ উপলব্ধির অযোগ্য, ইহা পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর স্বীকার্য্য। কারণ, আবরণাদির যে অনুপলব্ধি, তাহা ত উপলব্ধির অভাবস্বরূপ। সুতরাং উহাতে অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্তা না থাকায় উহা উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং উহার যে অনুপলব্ধি, তাহা উহার অভাব সাধনে হেতু হয় না। কারণ, যে পদার্থ উপলব্ধির যোগ্য, তাহারই অনুপলব্ধি তাহার অভাব সাধনে হেতু হয়। মহর্ষি এই তাৎপর্য্যেই সূত্র বলিয়াছেন,—"অনুপলম্ভাত্মকত্বাদনুপলব্ধেরহেতুঃ।" ভাষ্যকার পরে মহর্ষির ঐ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, সেই এই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর কথিত আবরণাদির অনুপলব্ধির অনুপলব্ধিরূপ যে হেতু, উহা জাতিবাদীর মতানুসারে উহার নিজ বিষয় যে, উপলব্ধির অভাবরূপ অনুপলব্ধি অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ধি, তাহাতে প্রবর্ত্তমান হইলে উহা ঐ নিজ বিষয়কে প্রতিষেধ করে না। অর্থাৎ যে অনুপলব্ধি অনুপলব্ধিরও বিষয় নহে, তাহাকে পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদী অনুপলব্ধির বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার অভাব সাধন করিবার জন্য যে অনুপলব্ধিকে হেতু বলিয়াছেন, উহা ঐ অনুপলব্ধির অভাব যে আবরণাদির উপলব্ধি, তাহা সিদ্ধ করিতে পারে না। কারণ, ঐ অনুপলব্ধি উপলব্ধির অভাবস্বরূপ, সুতরাং উহা উপলব্ধির অযোগ্য। ভাষ্যকার ইহাই প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"উপলব্ধ্যভাবেঽনুপলব্ধৌ"। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের কথিত যে আবরণাদির অনুপলব্ধি, যাহা পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীরও স্বীকৃত, তাহা আবরণাদির অভাব সাধনে হেতু হইতে পারে। কারণ, আবরণাদি সৎপদার্থ, উহা উপলব্ধির যোগ্য। ভাষ্যকার পরে ইহাই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, আবরণ প্রভৃতি কিন্তু বিদ্যমানত্ববশতঃ উপলব্ধির বিষয় হয় অর্থাৎ উপলব্ধির যোগ্য। ভাষ্যে "বিদ্যমানত্ব" শব্দের দ্বারা সত্তা অর্থাৎ ভাবত্বই বিবক্ষিত। ভাষ্যকার অন্যত্রও ভাব পদার্থ বলিতে "বিদ্যমান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলকথা, আবরণ প্রভৃতি ভাব পদার্থ বলিয়া উপলব্ধির যোগ্য। ভূগর্ভস্থ জলাদি এবং ঐরূপ আরও অনেক পদার্থের প্রত্যক্ষ-প্রতিবন্ধক আবরণাদির উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং শব্দের উচ্চারণের পূর্ব্বে উহার শ্রবণপ্রতিবন্ধক আবরণাদি থাকিলে অবশ্য তাহারও উপলব্ধি হইবে। কিন্তু যখন তাহার উপলব্ধি হয় না, তখন নিজ-বিষয়প্রতিপাদক উপলব্ধির অভাবরূপ অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত সেই অনুপলব্ধির বিষয় অর্থাৎ ঐ হেতুর সাধ্য বিষয় যে উপলভ্য বস্তুর অভাব, তাহা সিদ্ধ হয়। কিরূপে সিদ্ধ হয়? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, শব্দের অশ্রবণপ্রযোজক আবরণাদি নাই। অর্থাৎ শব্দের উচ্চারণের পূর্ব্বে উহার শ্রবণপ্রতিবন্ধক আবরণাদি থাকিলে ভাব পদার্থ বলিয়া তাহা উপলব্ধির যোগ্য, সুতরাং তাহার উপলব্ধি না হওয়ায় অনুপলব্ধি হেতুর দ্বারা উহার অভাব সিদ্ধ হয়। কারণ, ঐ আবরণাদির অভাব অনুপলব্ধির সাধ্য বিষয়। ভাষ্যকার এখানে সাধ্যরূপ বিষয় তাৎপর্য্যেই আবরণাদির অভাবকে অনুপলব্ধির বিষয় বলিয়াছেন। পূর্ব্বে "নাস্তি" এইরূপ প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য বা বিশেষ্যরূপ বিষয়-তাৎপর্য্যে অনুপলভ্যমান বস্তুকে অনুপলব্ধির বিষয় বলিয়াছেন। সুতরাং উদ্দেশ্যতা ও সাধ্যতা প্রভৃতি নামে বিভিন্ন প্রকার বিষয়তা যে ভাষ্যকারেরও সম্মত, ইহা বুঝা যায়। নচেৎ এখানে ভাষ্যকারের পূর্ব্বাপর উক্তির সামঞ্জস্য হয় না।

তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অনুপলম্ভাৎ প্রতিষেধকাৎ প্রমাণাদনুপলব্ধের্যো বিষয় উপলভ্যাভাবঃ স গম্যতে ন সন্ত্যাবরণাদীনি শব্দস্যাগ্রহণকারণানীতি"।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি যে প্রমাণ দ্বারা আবরণাদির উপলব্ধির নিষেধ বা অভাব বুঝা যায়, সেই উপলব্ধিনিষেধক প্রমাণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আবরণাদির অভাবের সাধক হয়? এ জন্য ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, অনুপলম্ভপ্রযুক্ত কিন্তু অনুপলব্ধি সিদ্ধ হয়। এখানে "অনুপলম্ভ" শব্দের দ্বারা উপলব্ধির অভাবের অর্থাৎ অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণই বিবক্ষিত এবং "অনুপলব্ধি" শব্দের দ্বারা আবরণাদির অনুপলব্ধি বিবক্ষিত। অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণ দ্বারা ঐ অনুপলব্ধিই সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার পরে ইহার কারণ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, সেই অনুপলব্ধিই তাহার অর্থাৎ অনুপলম্ভের (অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণের) বিষয় অর্থাৎ সাধ্য। তাৎপর্য্য এই যে, আবরণাদির অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণ বা হেতুর দ্বারা উহার বিষয় বা সাধ্য যে আবরণাদির অনুপলব্ধি, তাহাই প্রথমে সিদ্ধ হয়। পরে উহার দ্বারা আবরণাদির অভাব সিদ্ধ হয়। আবরণাদির অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই আবরণাদির অভাবের সাধক হয় না। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১]।

মূলকথা, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর মতানুসারেই বলিয়াছেন যে, অনুপলব্ধি যখন উপলব্ধির অভাবাত্মক, তখন উহা অসৎ বলিয়া উপলব্ধির যোগ্যই নহে। সুতরাং অভাবত্ববশতঃ উহার উপলব্ধি হয় না। অতএব উহার অনুপলব্ধির দ্বারা উহার অভাব যে উপলব্ধি, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু আবরণাদি সৎপদার্থ অর্থাৎ ভাব পদার্থ। সুতরাং তাহা উপলব্ধির যোগ্য। অতএব অনুপলব্ধির দ্বারা উহার অভাব সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও সরল ভাবে ইহাই তাঁহার তাৎপর্য্য বুঝা যায়। তবে জাতিবাদী যদি পরে আবরণাদির অনুপলব্ধিরূপ অভাব পদার্থও উপলব্ধির যোগ্য বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি আর উহার অনুপলব্ধিও বলিতে পারিবেন না। মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা শেষে তাহাই বলিয়াছেন ॥৩০॥

সূত্র। জ্ঞানবিকল্পানাঞ্চ ভাবাভাবসংবেদনাদধ্যাত্মম্। ॥৩১॥৪৯২॥

অনুবাদ। এবং প্রতি শরীরে "জ্ঞানবিকল্প" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানসমূহের ভাব ও অভাবের সংবেদন (উপলব্ধি) হওয়ায় অহেতু [অর্থাৎ আবরণাদির

১। তৎ কিমিদানীং সাক্ষাদেবোপলম্ভনিষেধকং প্রমাণমুপলভ্যাভাবং গময়তি? নেত্যাহ—"অনুপলম্ভাত্ উপলব্ধিনিষেধকাৎ প্রমাণাদনুপলব্ধিরাবরণস্য সিধ্যতি। কস্মাদিত্যত আহ "বিষয়ঃ স তস্যোপলব্ধিনিষেধকপ্রমাণস্যানুপলব্ধিঃ."—ততশ্চাবরণাদ্যভাব ইতি দ্রষ্টব্যং।—তাৎপর্য্যটীকা।

অনুপলব্ধিরও উপলব্ধি হওয়ায় তাহাতে পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর কথিত অনুপলব্ধি অসিদ্ধ,সুতরাং উহা আবরণাদির উপলব্ধি সাধনে হেতু হয় না]।

ভাষ্য। অহেতুরিতি বর্ত্ততে। শরীরে শরীরে জ্ঞানবিকল্পানাং ভাবাভাবৌ সংবেদনীয়ৌ, অস্তি মে সংশয়জ্ঞানং নাস্তি মে সংশয়জ্ঞানমিতি। এবং প্রত্যক্ষানুমানাগম-স্মৃতি-জ্ঞানেষু। সেয়মাবরণাদ্যনুপলব্ধিরুপলব্ধ্যভাবঃ স্বসংবেদ্যো—নাস্তি মে শব্দস্যাবরণাদ্যুপলব্ধিরিতি, নোপলভ্যন্তে শব্দস্যাগ্রহণকারণান্যাবরণাদীনীতি। তত্র যদুক্তং তদনুপলব্ধেরনুপলম্ভাদভাবসিদ্ধিরিত্যেতন্নোপপদ্যতে।

অনুবাদ। "অহেতুঃ" এই পদ আছে অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্র হইতে "অহেতুঃ" এই পদের অনুবৃত্তি এই সূত্রে বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক শরীরে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানসমূহের ভাব ও অভাব সংবেদনীয় অর্থাৎ মনের দ্বারা বোধ্য। যথা—আমার সংশয়জ্ঞান আছে, আমার সংশয়জ্ঞান নাই। [অর্থাৎ কোন বিষয়ে সংশয়রূপ জ্ঞান জন্মিলে সমস্ত বোদ্ধাই 'আমার সংশয়রূপ জ্ঞান হইয়াছে', এইরূপে মনের দ্বারা ঐ জ্ঞানের সত্তা প্রত্যক্ষ করে এবং ঐ জ্ঞান না জন্মিলে 'আমার সংশয়রূপ জ্ঞান হয় নাই' এইরূপে মনের দ্বারা উহার অভাবেরও প্রত্যক্ষ করে] এইরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাব্দবোধও স্মৃতিরূপ জ্ঞানসমূহে বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ ঐ সমস্ত জ্ঞানেরও ভাব ও অভাব সমস্ত বোদ্ধাই মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে)। সেই এই আবরণাদির অনুপলব্ধি (অর্থাৎ) উপলব্ধির অভাব স্বসংবেদ্য অর্থাৎ নিজের মনোগ্রাহ্য। যথা—'আমার শব্দের আবরণাদিবিষয়ক উপলব্ধি নাই', 'শব্দের অশ্রবণপ্রয়োজক আবরণাদি উপলব্ধ হইতেছে না'। (অর্থাৎ উক্তপ্রকারে সমস্ত বোদ্ধাই শব্দের আবরণাদির অনুপলব্ধির অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবেরও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে)। তাহা হইলে 'সেই অনুপলব্ধির অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত অভাব-সিদ্ধি হয়' এই যে উক্ত হইয়াছে, ইহা উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "অনুপলব্ধিসম" প্রতিষেধের যে উত্তর বলিয়াছেন, উহা তাঁহার নিজসিদ্ধান্তানুসারে প্রকৃত উত্তর নহে। কারণ, তাঁহার নিজমতে অনুপলব্ধি অভাব পদার্থ হইলেও মনের দ্বারা উহার উপলব্ধি হয়। উহা উপলব্ধির অযোগ্য পদার্থ নহে। তাই মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার ঐ নিজসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত "অনুপলব্ধি-

সম" প্রতিষেধের খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বসূত্র হইতে "অহেতুঃ" এই পদের অনুবৃত্তি করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে যে, শব্দের আবরণাদির অনুপলব্ধির যে অনুপলব্ধি, তাহা ঐ অনুপলব্ধির অভাব সাধনে হেতু হয় না। কেন হেতু হয় না ? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের যে বিকল্প অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সবিকল্পক জ্ঞান, তাহার ভাব ও অভাবের সংবেদন অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান অতীন্দ্রিয় হইলেও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেরই মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে এবং উহার অভাবেরও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে। মহর্ষি "জ্ঞানবিকল্প" বলিয়া সর্ব্বপ্রকার সবিকল্পক জ্ঞানই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির বক্তব্য প্রকাশ করিতে প্রথমতঃ সংশয়রূপ জ্ঞান ও উহার অভাব যে প্রকারে মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা বলিয়া প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান স্থলেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়াছেন। পরে প্রকৃত স্থলে মহর্ষির বক্তব্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, উচ্চারণের পূর্ব্বে কেহই শব্দের আবরণাদির উপলব্ধি করে না, এ জন্য 'আমার শব্দের আবরণাদিবিষয়ক উপলব্ধি নাই', 'শব্দের অশ্রবণ-প্রয়োজক কোন আবরণাদি উপলব্ধ হইতেছে না' এইরূপে সকলেই মনের দ্বারা ঐ আবরণাদির অনুপলব্ধিকেও প্রত্যক্ষ করে। উহা সকলেরই স্বসংবেদ্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদী যে শব্দের আবরণাদির অনুপলব্ধিরও অনুপলব্ধি বলিয়াছেন, তাহা নাই। কারণ, উহার উপলব্ধিই হইয়া থাকে। সুতরাং উহা আবরণাদির উপলব্ধি সাধনে হেতু হয় না। যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহা কখনই হেতু বলা যায় না। পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞানবিকল্পের ভাব ও অভাব যে সমস্ত শরীরী বোদ্ধাই মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, সুতরাং ঐ মানস প্রত্যক্ষ অস্বীকার করা যায় না, ইহা প্রকাশ করিতেই মহর্ষি সূত্রশেষে বলিয়াছেন—"অধ্যাত্মং"। অর্থাৎ প্রত্যেক শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে ঐ প্রত্যক্ষ জন্মে। শরীরশূন্য মুক্ত আত্মার ঐ প্রত্যক্ষ জন্মে না। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "আত্মন্" শব্দের দ্বারা শরীরই গ্রহণ করিয়া "অধ্যাত্মং" এই পদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শরীরে শরীরে"। "শরীরে শরীরিণাং" এইরূপ পাঠই প্রচলিত পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকায় "শরীরে শরীরে" এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত দেখা যায়। প্রত্যেক শরীরীর নিজ নিজ শরীরাবচ্ছেদেই ঐ প্রত্যক্ষ জন্মে ; কেবল কোন ব্যক্তিবিশেষেরই জন্মে না—ইহাই উক্ত পাঠের দ্বারা ব্যক্ত হয় এবং উহাই মহর্ষির এখানে বক্তব্য। নচেৎ "অধ্যাত্মং" এই পদ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন থাকে না। "আত্মন্" শব্দের শরীর অর্থেও প্রমাণ আছে। "তদাত্মানং সৃজাম্যহং"—ইত্যাদি প্রসিদ্ধ প্রয়োগও আছে। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের যে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহার নাম অনুব্যবসায়। মহর্ষি গোতমের এই সূত্রের দ্বারা ঐ অনুব্যবসায় যে তাঁহার সম্মত, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ভট্ট কুমারিল উক্ত মত অস্বীকার করিয়া সমস্ত জ্ঞানের অতীন্দ্রিয়ত্ব মতই সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কোন বিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মিলে তজ্জন্য সেই বিষয়ে "জ্ঞাততা" নামে একটী ধর্ম্ম জন্মে, উহার অপর নাম "প্রাকট্য"। তদ্দ্বারা সেই জ্ঞানের অনুমান হয়। বস্তুতঃ কোন জ্ঞানেরই প্রত্যক্ষ জন্মে না। জ্ঞানমাত্রই অতীন্দ্রিয়। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বিশদ বিচার দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত গোতমমত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সেখানে পরে

তিনি মহর্ষি গোতমের এই সূত্রটীও উদ্ধৃত করিয়াছেন[১]। মূলকথা, উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের যে কোন আবরণাদির উপলব্ধি হয় না, ইহা সকলেরই মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ঐ অনুপলব্ধির দ্বারা আবরণাদির অভাবই সিদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদী মীমাংসক আবরণাদির সত্তা সিদ্ধ করিতে পারেন না। আবরণাদির অনুপলব্ধিরও অনুপলব্ধি গ্রহণ করিয়া তিনি আবরণাদির উপলব্ধিও সিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, ঐ আবরণাদির অনুপলব্ধিরও উপলব্ধি হওয়ায় উহার অনুপলব্ধি অসিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদী যদি ইহা অস্বীকার করিয়াই উক্তরূপ প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে তুল্যভাবে তাঁহার ঐ উত্তরে দোষ আছে, ইহাও প্রতিপন্ন করা যায়। কারণ, তিনি যখন বলিবেন যে, আমার এই উত্তরে কোন দোষের উপলব্ধি না হওয়ায় কোন দোষ নাই, তখন তুল্যভাবে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, দোষের অনুপলব্ধিরও উপলব্ধি না হওয়ায় অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত দোষের উপলব্ধি আছে, সুতরাং তৎপ্রযুক্ত দোষ আছে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর ঐ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে অসদুত্তর, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্তরূপে স্বব্যাঘাতকত্বই এই "অনুপলব্ধিসমা" জাতির সাধারণ দুষ্টত্বমূল।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে এই "অনুপলব্ধিসমা" জাতির অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া, ইহার বহুবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে মহর্ষির সূত্রে "অনুপলব্ধি" শব্দটী উপলক্ষণ বা প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা উপলব্ধি, অনুপলব্ধি, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, দ্বেষ অদ্বেষ, কৃতি, অকৃতি, শক্তি, অশক্তি, উপপত্তি, অনুপপত্তি, ব্যবহার, অব্যবহার, ভেদ ও অভেদ, ইত্যাদি বহু ধর্ম্মই গৃহীত হইয়াছে। ঐ সমস্ত ধর্ম্ম নিজের স্বরূপে তদ্রূপে বর্ত্তমান আছে অথবা তদ্রূপে বর্ত্তমান নাই, এইরূপ বিকল্প করিয়া উভয় পক্ষেই উহার নিজস্বরূপের ব্যাঘাতের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান করিলে তাহাকে বলে "অনুপলব্ধিসমা" জাতি। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ নানা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয়পরীক্ষায় "বিপ্রতিপত্তৌ চ সম্প্রতিপত্তেঃ" এবং "অব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্বাচ্চাব্যবস্থায়াঃ" (১।৩।৪) এই সূত্র দ্বারা এবং পরে "অন্যদন্যস্মাৎ" ইত্যাদি সূত্র (২।২।৩১) এবং "অনিয়মে নিয়মান্নানিয়মঃ" (২।২।৫৫) এই সূত্রের দ্বারা এই "অনুপলব্ধিসমা" জাতিরই উদাহরণবিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও বরদরাজ বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত মতে এই জাতির পূর্ব্বোক্তরূপেই স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই মতে পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক উচ্চারণের পূর্ব্বে অনুপলব্ধিবশতঃ শব্দ নাই, এই কথা বলিলে বাদী মীমাংসক যদি বলেন যে, ঐ অনুপলব্ধি কি নিজের স্বরূপে তদ্রূপে অর্থাৎ অনুপলব্ধি স্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে? অথবা তদ্রূপে বর্ত্তমান থাকে না? ইহা বক্তব্য। অনুপলব্ধি স্বস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে না, ইহা বলিলে উহাকে অনুপলব্ধিই বলা যায় না। কারণ, যাহা স্বস্বরূপে বর্ত্তমান নাই, তাহা কোন পদার্থই হয় না। সুতরাং উহা অনুপলব্ধিস্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে ঐ অনুপলব্ধিরও

১। অথ তথাপি জ্ঞানং প্রত্যক্ষমিত্যত্র কিং প্রমাণং? প্রত্যক্ষমেব। যদসূত্রয়ৎ "জ্ঞানানবকপ্লানাঞ্চ ভাবাভাব-সংবেদনাদধ্যাত্ম"মিতি।—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, চতুর্থ স্তবক, চতুর্থকারিকাব্যাখ্যার শেষ।

কথনও উপলব্ধি হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, অনুপলব্ধিরও উপলব্ধি হইলে উহার অনুপলব্ধি-স্বরূপেরই ব্যাঘাত হয়। সুতরাং যাহা সতত অনুপলব্ধিস্বরূপেই ব্যবস্থিত, তাহাতে সতত অনুপলব্ধিই আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে সেই অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত উহা সতত নিজেরও অভাবরূপ, অর্থাৎ উপলব্ধিস্বরূপ, ইহাও স্বীকার্য্য হওয়ায় উহার স্বরূপের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের উপলব্ধিও সিদ্ধ হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত তখন শব্দের সত্তাও সিদ্ধ হয়। সুতরাং অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দ নাই, ইহা বলা যায় না। উক্ত স্থলে মীমাংসকের এইরূপ প্রত্যবস্থান "অনুপলব্ধিসমা" জাতি। পূর্ব্বোক্ত "তদনুপলব্ধেরনুপলম্ভাৎ" ইত্যাদি (২৯শ) লক্ষণসূত্রেরও উক্তরূপই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। উক্ত সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দই গ্রহণ করিতে হইবে এবং "বিপরীত" শব্দের দ্বারা উক্ত স্থলে শব্দের উপলব্ধি বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকারও পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর অভিমত উক্তরূপ যুক্তি অনুসারেই জাতিবাদীর মতে অনুপলব্ধি নিজের অভাবরূপ অর্থাৎ উপলব্ধিরূপ, ইহা বলিয়াছেন বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার ঐ ভাবে জাতিবাদীর অভিমতের ব্যাখ্যা না করায় তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যব্যাখ্যায় ঐরূপ কথা কেন বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ অন্য ভাবে পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অনুপলব্ধি স্বস্বরূপে অনুপলব্ধি, এই কথার অর্থ কি? অনুপলব্ধি স্বয়ং অনুপলব্ধিরূপ, ইহাই অর্থ হইলে তাহা স্বীকার্য্য। যদি বল, অনুপলব্ধি নিজবিষয়ক অনুপলব্ধি, ইহাই অর্থ; কিন্তু ইহা বলাই যায় না। কারণ, অনুপলব্ধি উপলব্ধির অভাবাত্মক। সুতরাং অভাব পদার্থ হওয়ায় উহার বিষয় থাকিতে পারে না। জ্ঞানের ন্যায় অভাবের কোন বিষয় নাই। অনুপলব্ধি স্বস্বরূপে অনুপলব্ধি না হইলে অর্থাৎ নিজবিষয়ক অনুপলব্ধি না হইলে, উহার অনুপলব্ধিত্ব থাকে না, উহার স্বরূপের ব্যাঘাত বা বিরোধ হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ঘট পদার্থের কোন বিষয় না থাকায় উহা নিজবিষয়ক নহে, তাই বলিয়া কি উহা ঘট নহে? তাহাতে কি উহার ঘটস্বরূপের ব্যাঘাত হয়? তাহা কখনই হয় না ॥৩১॥

অনুপলব্ধি-সম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৩॥

সূত্র। সাধর্ম্ম্যাত্তুল্যধর্ম্মোপপত্তেঃ সর্ব্বানিত্যত্ব-প্রসঙ্গাদনিত্যসমঃ ॥৩২॥৪৯৩॥

অনুবাদ। সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত (সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের) তুল্য ধর্ম্মের সিদ্ধি-বশতঃ সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান (২২) **অনিত্যসম** প্রতিষেধ।

ভাষ্য। অনিত্যেন ঘটেন সাধর্ম্ম্যাদনিত্যঃ শব্দ ইতি ব্রুবতোঽস্তি

ঘটেনানিত্যেন সর্ব্বভাবানাং সাধর্ম্ম্যমিতি সর্ব্বস্যানিত্যত্বমনিষ্টং সম্পদ্যতে, সোঽয়মনিত্যত্বেন প্রত্যবস্থানাদ**নিত্যসম** ইতি।

অনুবাদ। অনিত্য ঘটের সহিত সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা যিনি বলেন, তাঁহার অনিত্য ঘটের সহিত সমস্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য আছে, এ জন্য সমস্ত পদার্থের অনিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার অস্বীকৃত অনিত্যত্ব সম্পন্ন হয় অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেরই অনিত্যত্বের আপত্তি হয়। অনিত্যত্বপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানবশতঃ সেই ইহা (২২) "অনিত্যসম" প্রতিষেধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা "অনিত্যসম" প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নজন্যত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগস্থলেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা সূত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন বাদী ঐরূপ প্রয়োগ করিয়া ঘট ও শব্দের প্রযত্নজন্যত্বরূপ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ সাধর্ম্ম্যরূপ হেতুর দ্বারা ঘটের ন্যায় শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটের সহিত প্রযত্নজন্যত্বরূপ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত যদি শব্দে তুল্যধর্ম্ম অর্থাৎ অনিত্যত্বের উপপত্তি বা সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে সমস্ত পদার্থেরই অনিত্যত্ব সিদ্ধ হউক? কারণ, অনিত্য ঘটের সহিত সমস্ত পদার্থেরই সত্তা প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য আছে। সুতরাং ঘটের ন্যায় সমস্ত পদার্থেরই অনিত্যত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না? কিন্তু সকল পদার্থের অনিত্যত্ব পূর্ব্বোক্ত বাদীর অনিষ্ট অর্থাৎ অস্বীকৃত। সুতরাং তিনি প্রতিবাদীর ঐ আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি বলিতে পারিবেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল পদার্থের অনিত্যত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ উহার আপত্তি প্রকাশ করিয়া, উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করায় ইহার নাম অনিত্যসম প্রতিষেধ। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্বাপত্তি স্থলেই "অনিত্যসম" প্রতিষেধ হয়। সূত্রে মহর্ষির "সর্ব্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ" এইরূপ উক্তির দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরেরও ইহাই মত বুঝা যায়। কারণ, পূর্ব্বোক্ত "অবিশেষসমা" জাতি হইতে এই "অনিত্যসমা" জাতির ভেদ কিরূপে হয়? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "অবিশেষসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী সামান্যতঃ সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু এই "অনিত্যসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বিশেষ করিয়া সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। সুতরাং ভেদ আছে।

কিন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে সাধর্ম্ম্য শব্দটী উপলক্ষণ। উহার দ্বারা বৈধর্ম্ম্যও বিবক্ষিত। এবং সূত্রে মহর্ষির "সর্ব্বানিত্যত্ব-প্রসঙ্গাৎ" এই বাক্যও প্রদর্শন মাত্র। অর্থাৎ যেখানে কোন পদার্থে অনিত্যত্বই সাধ্যধর্ম্ম, সেই স্থল গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি উদাহরণ প্রদর্শনার্থ ঐরূপ বাক্য বলিয়াছেন। উহার দ্বারা সকল পদার্থের সাধ্যধর্ম্মবত্ত্ব প্রসঙ্গই মহর্ষির বিবক্ষিত। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় সূচনার জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

"তুল্যধর্ম্মোপপত্তেঃ"। কেবল অনিত্যত্বধর্ম্মই মহর্ষির বিবক্ষিত হইলে তিনি "অনিত্যত্বোপপত্তেঃ" এই কথাই বলিতেন। সুতরাং "তুল্যধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা বাদীর দৃষ্টান্তের সহিত তাঁহার সাধ্যধর্ম্মীর তুল্যধর্ম্ম সাধ্যধর্ম্মবত্ত্বই মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদী কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতুর দ্বারা কোন ধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার কথিত এই সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত যদি তোমার সাধ্যধর্ম্মীতে তোমার দৃষ্টান্তের তুল্যধর্ম্ম অর্থাৎ তোমার অভিমত সাধ্যধর্ম্ম সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তোমার ঐ দৃষ্টান্তের কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সকল পদার্থই তোমার ঐ সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট হউক ? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে "অনিত্যসমা" জাতি। উক্ত মতে কোন বাদী "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ যথা মহানসং" এইরূপ প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী যদি বলেন যে, মহানসের সহিত সমস্ত পদার্থেরই সত্তা বা প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য থাকায় তৎপ্রযুক্ত সমস্ত পদার্থই মহানসের ন্যায় বহ্নিমান্ হউক ? এইরূপ উত্তরও "অনিত্যসমা" জাতি। ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে উক্তরূপ উত্তর জাত্যন্তর হইতে পারে না অথবা অন্য জাতি স্বীকার করিতে হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহাই বলিয়া প্রাচীন ব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়াছেন। উক্ত মতে "অনিত্যসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী সমস্ত পদার্থেই বাদীর সাধ্যধর্ম্মবত্তার আপত্তি প্রকাশ করিয়া, সমস্ত বিপক্ষেরও সপক্ষত্বাপত্তি সমর্থন করেন, উহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু "অবিশেষসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য নহে। সুতরাং ঐ উভয় জাতির ভেদ আছে ॥৩২॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং।

অনুবাদ। এই "অনিত্যসম" প্রতিষেধের উত্তর।

সূত্র। সাধর্ম্ম্যাদসিদ্ধেঃ প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ প্রতিষেধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ ॥৩৩॥৪৯৪॥

অনুবাদ। সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অসিদ্ধি হইলে তৎপ্রযুক্ত "প্রতিষেধে"র অর্থাৎ প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেরও সিদ্ধি হয় না, যেহেতু প্রতিষেধ্য বাক্য অর্থাৎ প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য বাদীর স্বপক্ষস্থাপক বাক্যের সহিত (তাহার প্রতিষেধক বাক্যের) সাধর্ম্ম্য আছে।

ভাষ্য। প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বযুক্তং বাক্যং পক্ষনিবর্ত্তকং প্রতিপক্ষলক্ষণং প্রতিষেধঃ। তস্য পক্ষেণ প্রতিষেধ্যেন সাধর্ম্ম্যং প্রতিজ্ঞাদিযোগঃ। তদ্‌যদ্যনিত্যসাধর্ম্ম্যাদনিত্যত্বস্যাসিদ্ধিঃ, সাধর্ম্ম্যাদসিদ্ধেঃ প্রতিষেধস্যাপ্যসিদ্ধিঃ, প্রতিষেধ্যেন সাধর্ম্ম্যাদিতি।

অনুবাদ। পক্ষনিষেধক প্রতিপক্ষলক্ষণ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত বাক্য "প্রতিষেধ", অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্তরূপ বাক্যই সূত্রোক্ত "প্রতিষেধ" শব্দের অর্থ। প্রতিষেধ্য পক্ষের সহিত অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক বাক্যের সহিত তাঁহার সাধর্ম্ম্য প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্তত্ব। তাহা হইলে যদি অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত অনিত্যত্বের সিদ্ধি না হয়—সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অসিদ্ধিবশতঃ প্রতিষেধক বাক্যেরও সিদ্ধি হয় না,—যেহেতু প্রতিষেধ্য বাক্যের সহিত (উহার) সাধর্ম্ম্য আছে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "অনিত্যসম" প্রতিষেধের উত্তর বলিতে প্রথমে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন,—"প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ"। অর্থাৎ প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর করিলে তাঁহার প্রতিষেধক বাক্যেরও সিদ্ধি হয় না। যে বাক্যের দ্বারা প্রতিবাদী বাদীর পক্ষস্থাপক বাক্যের প্রতিষেধ করেন, এই অর্থে প্রতিবাদীর সেই বাক্যই সূত্রে "প্রতিষেধ" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথমেই উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, পক্ষের নিবর্ত্তক অর্থাৎ বাদীর স্বপক্ষস্থাপক বাক্যের নিষেধক প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত যে বাক্য, তাহাই সূত্রোক্ত "প্রতিষেধ"। উহাকে "প্রতিপক্ষ"ও বলে, তাই বলিয়াছেন—"প্রতিপক্ষলক্ষণং"। প্রতিবাদী বাদীর নিজপক্ষস্থাপক যে বাক্যকে প্রতিষেধ করেন, উহাই তাঁহার প্রতিষেধ্য বাক্য। উহা বাদীর পক্ষস্থাপক বলিয়া "পক্ষ" নামেও কথিত হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"পক্ষেণ প্রতিষেধ্যেন"। ভাষ্যকারের মতে সূত্রে "প্রতিষেধ্য" শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য বাদীর ঐ বাক্যই গৃহীত হইয়াছে। জয়ন্ত ভট্টও উহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। প্রতিবাদী বাদীর ঐ বাক্যের প্রতিষেধ করিতে অর্থাৎ অসাধকত্ব সাধন করিতে পরে বলেন যে, তোমার এই বাক্য অসাধক অর্থাৎ বিবক্ষিত অর্থের প্রতিপাদক নহে; যেহেতু উহাতে অসাধকের সাধর্ম্ম্য আছে ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্তরূপে পরে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ করিয়াই বাদীর ঐ বাক্যের প্রতিষেধ করেন এবং তাহাই করিতে হইবে। নচেৎ প্রতিবাদীর অন্য কোন কথায় মধ্যস্থগণ উহা স্বীকার করিবেন না। ফলকথা, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ বাক্যই তাঁহার প্রতিষেধক বাক্য। বাদীর স্বপক্ষস্থাপক বাক্য যেমন প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত, তদ্রূপ প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক বাক্যও প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত। সুতরাং প্রতিষেধ্য বাক্য অর্থাৎ বাদীর বাক্যের সহিত প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক বাক্যের প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্তত্বরূপ সাধর্ম্ম্য আছে। তাহা হইলেও প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক বাক্যের কেন সিদ্ধি হয় না? মহর্ষি ইহা সমর্থন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"সাধর্ম্ম্যাদসিদ্ধেঃ"। অর্থাৎ যে হেতু উক্ত প্রতিবাদীর মতে সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসিদ্ধি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী অনিত্য ঘটের সহিত সকল পদার্থেরই সত্তাদি কোন সাধর্ম্ম্য আছে বলিয়া, সকল পদার্থই ঘটের ন্যায় অনিত্য হউক? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করায় তাঁহার বক্তব্য বুঝা যায় যে, ঘটের সহিত সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দে অনিত্যত্ব সাধ্যের সিদ্ধি হয় না। কারণ, তাহা হইলে সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। মহর্ষি প্রথমে "সাধর্ম্ম্যাদসিদ্ধেঃ" এই বাক্যের দ্বারা প্রতিবাদীর

ঐ বক্তব্য বা অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত প্রতিবাদী ঐরূপ বলিলে তাঁহার প্রতিষেধক বাক্যের ও সিদ্ধি হয় না, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য। কারণ, তাঁহার নিজ মতানুসারে তিনি অসাধকের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্তও অসাধকত্ব সিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত কোন সাধ্যসিদ্ধি হয় না। প্রতিবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, যে স্থলে আমার পূর্ব্বোক্তরূপ কোন অনিষ্টাপত্তি হয়, সেই স্থলেই আমি সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসিদ্ধি স্বীকার করি না। কারণ, ঐরূপ স্থলে তাহা করা যায় না। কিন্তু যে স্থলে কোন অনিষ্টাপত্তি হয় না, সেই স্থলে কেন উহা স্বীকার করিব না? এ জন্য মহর্ষি পরে চরম হেতু বলিয়াছেন, "প্রতিষেধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ"। অর্থাৎ তুল্যভাবে প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও অসাধকত্বের আপত্তি হয়। কারণ, প্রতিষেধ্য বাক্যের সহিত উহার সাধর্ম্ম্য আছে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে তুল্যভাবে বাদীও বলিতে পারেন যে, তোমার এই প্রতিষেধক বাক্যও অসাধক হউক? যদি অসাধকের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আমার বাক্য অসাধক হয়, তাহা হইলে আমার বাক্যের ন্যায় তোমার বাক্যও কেন অসাধক হইবে না? কারণ, তোমার মতে আমার বাক্য অসাধক এবং আমার বাক্যের সহিত তোমার বাক্যের প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্তত্বরূপ সাধর্ম্ম্যও আছে। অতএব তোমার ন্যায় আমিও ঐরূপ আপত্তি সমর্থন করিতে পারি। কিন্তু ঐ আপত্তি তোমার ইষ্ট নহে। অতএব তোমার বাক্যেও উক্তরূপ আপত্তিবশতঃ অসাধকের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আমার বাক্যেও অসাধকত্ব সিদ্ধ হয় না—ইহা তোমার অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তোমার ঐ প্রতিষেধকবাক্যেরও সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ তুমি ঐ বাক্যের দ্বারা আমার বাক্যের প্রতিষেধ করিতে পার না, ইহাও তোমার স্বীকার্য্য। অতএব স্বব্যাঘাতকত্ববশতঃ তোমার ঐ উত্তর জাত্যুত্তর, ইহা স্বীকার্য্য। মুদ্রিত তাৎপর্য্যটীকা ও "ন্যায়সূত্রোদ্ধার" প্রভৃতি কোন কোন পুস্তকে উদ্ধৃত সূত্রশেষে "প্রতিষেধ্যসামর্থ্যাচ্চ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু "ন্যায়বার্ত্তিক", "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" ও "ন্যায়মঞ্জরী" প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত সূত্রপাঠে "চ" শব্দ নাই ॥৩৩॥

সূত্র। দৃষ্টান্তে চ সাধ্যসাধনভাবেন প্রজ্ঞাতস্য ধর্ম্মস্য হেতুত্বাত্তস্য চোভয়থাভাবান্নাবিশেষঃ ॥৩৪॥৪৯৫॥

অনুবাদ। এবং দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের সাধনস্বরূপে প্রজ্ঞাত ধর্ম্মের হেতুত্ববশতঃ এবং সেই ধর্ম্মের (হেতুর) উভয় প্রকারে সত্তাবশতঃ অবিশেষ নাই। [অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত সাধর্ম্ম্য হেতু প্রযত্নজন্যত্ব হইতে প্রতিবাদীর অভিমত সত্তা প্রভৃতি সাধ্যধর্ম্ম্যের বিশেষ আছে। কারণ, উহা সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না, উহা অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্টই নহে।]

ভাষ্য। দৃষ্টান্তে যঃ খলু ধর্ম্মঃ সাধ্যসাধনভাবেন প্রজ্ঞায়তে, স হেতুত্বেনাভিধীয়তে। স চোভয়থা ভবতি, কেনচিৎ সমানঃ কুতশ্চিদ্বিশিষ্টঃ। সামান্যাৎ সাধর্ম্ম্যং বিশেষাচ্চ বৈধর্ম্ম্যং। এবং সাধর্ম্ম্যবিশেষো হেতুর্নাবিশেষেণ সাধর্ম্ম্যমাত্রং বৈধর্ম্ম্যমাত্রং বা। সাধর্ম্ম্যমাত্রং বৈধর্ম্ম্যমাত্রঞ্চাশ্রিত্য ভবানাহ **সাধর্ম্ম্যাত্তুল্যধর্ম্মোপপত্তেঃ সর্ব্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গাদনিত্যসম** ইতি, এতদযুক্তমিতি। অবিশেষসমপ্রতিষেধে চ যদুক্তং তদপি বেদিতব্যম্।

অনুবাদ। যে ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যসাধন ভাবে অর্থাৎ ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্যত্বরূপে প্রজ্ঞাত হয়, সেই ধর্ম্ম হেতুত্বরূপে কথিত হয় অর্থাৎ ঐরূপ ধর্ম্মবিশেষকেই হেতু বলে। সেই ধর্ম্ম অর্থাৎ হেতু, উভয় প্রকারে হয়। (১) কোন পদার্থের সহিত সমান, (২) কোন পদার্থ হইতে বিশিষ্ট। সমানতাপ্রযুক্ত সাধর্ম্ম্য, এবং বিশেষপ্রযুক্ত বৈধর্ম্ম্য। (অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য হেতু ও বৈধর্ম্ম্য হেতু নামে হেতু উভয় প্রকার হয়) এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ হেতুলক্ষণাক্রান্ত সাধর্ম্ম্য বিশেষ হেতু হয়, অবিশেষে সাধর্ম্ম্যমাত্র অথবা বৈধর্ম্ম্যমাত্র হেতু হয় না। সাধর্ম্ম্যমাত্র এবং বৈধর্ম্ম্যমাত্রকে আশ্রয় করিয়া আপনি "সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত তুল্যধর্ম্মের উপপত্তিবশতঃ সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তিপ্রযুক্ত অনিত্যসম", ইহা অর্থাৎ মহর্ষি গোতমের ঐ সূত্রোক্ত উত্তর বলিতেছেন, ইহা অযুক্ত। এবং "অবিশেষসম" প্রতিষেধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাও বুঝিবে অর্থাৎ উক্ত প্রতিষেধের যে উত্তর কথিত হইয়াছে, তাহাও এখানে উত্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা "অনিত্যসমা" জাতির সাধারণ দুষ্টত্বমূল স্বব্যাঘাতকত্ব প্রদর্শন করিয়া, পরে এই সূত্রের দ্বারা উহার অসাধারণ দুষ্টত্বমূল যুক্তাঙ্গহানিও প্রদর্শন করিয়াছেন। মহর্ষির বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত "অনিত্যসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যে সকল পদার্থের সত্তা প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, ঐ সাধর্ম্ম্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্য নহে, উহা সাধর্ম্ম্যমাত্র। সুতরাং উহা অনিত্যত্বের সাধক হেতুই হয় না। কারণ, উহাতে প্রকৃত হেতুর যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা নাই। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী যে, শব্দে অনিত্যত্ব সাধন করিতে প্রযত্নজন্যত্বরূপ সাধর্ম্ম্যকে হেতু বলিয়াছেন, উহাতে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি থাকায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হেতু হয়। মহর্ষি ইহাই সমর্থন করিতে প্রকৃত হেতুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যের সাধন ভাবে অর্থাৎ ব্যাপ্যত্বরূপে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, তাহাই হেতু। যেমন "শব্দোঽনিত্যঃ" এইরূপ অনুমানে প্রযত্নজন্যত্ব।

ঐ স্থলে দৃষ্টান্ত পদার্থ ঘটাদিতে ঐ প্রযত্নজন্যত্ব সাধ্যধর্ম্ম অনিত্যত্বের সাধন অর্থাৎ ব্যাপ্য বলিয়া যথার্থরূপে জ্ঞাত। কারণ, ঘটাদি পদার্থে প্রযত্নজন্যত্ব আছে এবং অনিত্যত্বও আছে, ইহা বুঝা যায় এবং কোন নিত্য পদার্থে প্রযত্নজন্যত্ব আছে, ইহা কখনই বুঝা যায় না। সুতরাং ব্যভিচারজ্ঞান না থাকায় ঘটাদি দৃষ্টান্ত পদার্থে সহচার জ্ঞানজন্য প্রযত্নজন্যত্ব যে, অনিত্যত্বের সাধন বা ব্যাপ্য, এইরূপ নিশ্চয় হয়—উহার নাম অন্বয়ব্যাপ্তিনিশ্চয়। এইরূপ ঐ স্থলে যে সমস্ত পদার্থ অনিত্য নহে অর্থাৎ নিত্য, সে সমস্ত পদার্থ প্রযত্নজন্য নহে—যেমন আকাশ, এইরূপে বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত দ্বারাও ঐ হেতু যে অনিত্যত্বের ব্যাপ্য, এইরূপ নিশ্চয় হয়। উহার নাম ব্যতিরেক ব্যাপ্তিনিশ্চয়। তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন যে, সেই হেতু উভয় প্রকারে হয়। ভাষ্যকারের মতে উক্ত স্থলে ঘটাদি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে ঐ প্রযত্নজন্যত্ব হেতু সাধর্ম্ম্য হেতু। কারণ, উহা শব্দ ঘটাদির সমান ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাত হয়। এবং আকাশাদি কোন নিত্য পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে সেখানে ঐ হেতুই বৈধর্ম্ম্য হেতু। ভাষ্যকারের মতে যে ঐ একই হেতু দৃষ্টান্তভেদে পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকারে সাধর্ম্ম্য হেতু এবং বৈধর্ম্ম্য হেতু হয় এবং ঐ স্থলে হেতুবাক্যও সাধর্ম্ম্য হেতু ও বৈধর্ম্ম্য হেতু নামে দ্বিবিধ হয়, ইহা প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় (প্রথম খণ্ড, ২৪৮—৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ভাষ্যকারের উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এখানে এই সূত্রের দ্বারা ভাষ্যকারের উক্ত মত যে, মহর্ষি গোতমেরও সম্মত, ইহাও সমর্থন করা যায়। মহর্ষি বলিয়াছেন, সেই হেতু উভয় প্রকারে হয়। ভাষ্যকার উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কোন পদার্থের সহিত সমান এবং কোন পদার্থ হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাবৃত্ত। যেমন শব্দে পূর্ব্বোক্ত প্রযত্নজন্যত্বরূপ হেতু ঘটের সহিত সমান, এবং আকাশ হইতে ব্যাবৃত্ত। যে ধর্ম্ম যাহাতে নাই, সেই ধর্ম্মকে সেই পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত ধর্ম্ম বলে, এবং উহাকেই সেই পদার্থের বৈধর্ম্ম্য বলে। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের "সূক্তি" টীকার প্রারম্ভে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার ইতরব্যাবৃত্ত ধর্ম্মকেই বৈধর্ম্ম্য বলিয়াছেন। ঐ ইতরব্যাবৃত্তত্বরূপ বিশেষ-বশতঃই সেই ধর্ম্ম ইতরের বৈধর্ম্ম্য হয়। ভাষ্যকার ঐ তাৎপর্য্যেই বলিয়াছেন, "বিশেষাচ্চ বৈধর্ম্ম্যাৎ"। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত যে সাধর্ম্ম্যবিশেষ অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে সাধর্ম্ম্যবিশেষ, তাহাই হেতু এবং উহা কোন পদার্থের বৈধর্ম্ম্য হইলেও উহা হেতু হয়, কিন্তু সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিশূন্য সাধর্ম্ম্য মাত্র অথবা বৈধর্ম্ম্য মাত্র হেতু নহে। ভাষ্যকার পরে ইহা বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে, সকল পদার্থের সাধর্ম্ম্য সত্তা ও প্রমেয়ত্বাদি ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থের অনিত্যত্বাপত্তি সমর্থন করেন, ঐ সাধর্ম্ম্য যে অনিত্যত্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার পরে উহাই ব্যক্ত করিতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বাদীর বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আপনি কেবল সাধর্ম্ম্য ও কেবল বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিশূন্য সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়া মহর্ষি গোতমের "সাধর্ম্ম্যাত্তুল্যধর্ম্মোপা-পত্তেঃ" ইত্যাদি (৩২শ) সূত্রোক্ত জাত্যুত্তর বলিতেছেন, ইহা অযুক্ত। এখানে ভাষ্যকারের

এই কথায় মহর্ষির ঐ সূত্রোক্ত "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা যে বৈধর্ম্ম্যও গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ কোন বৈধর্ম্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়াও যে প্রতিবাদী উক্ত জাতির প্রয়োগ করিতে পারেন, ইহা ভাষ্যকারেরও সম্মত বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমি ত কোন সাধর্ম্ম্য মাত্র গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সাধন করিতেছি না। কিন্তু ঘটের সাধর্ম্ম্য প্রযত্নজন্যত্ব আছে বলিয়া ঘটের ন্যায় শব্দ অনিত্য, ইহা বলিলে ঘটের সহিত সত্তাদি সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সকল পদার্থের অনিত্যত্বাপত্তি হয়। সুতরাং ঘটের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই আমার বক্তব্য। মহর্ষি এই জন্য সূত্রশেষে বলিয়াছেন যে, অবিশেষ নাই। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত সাধর্ম্ম্য প্রযত্নজন্যত্ব এবং প্রতিবাদীর গৃহীত সাধর্ম্ম্য সত্তাদিতে বিশেষ আছে। বাদীর গৃহীত ঐ সাধর্ম্ম্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া উহা বিশেষ হেতু। সুতরাং উহার দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু সত্তাদি সাধর্ম্ম্য ঐরূপ না হওয়ায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হয় না। সুতরাং প্রতিবাদীর ঐ আপত্তি সমর্থনে তাঁহার কোন প্রমাণই নাই। প্রমাণ ব্যতীত তিনি ঐরূপ আপত্তি সমর্থন করিতেই পারেন না। তিনি যদি পরে বাধ্য হইয়া আবার সত্তাদি সাধর্ম্ম্যকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, উহা দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্বের সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আবার বলিব, উহা অনিত্যত্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না। উহা সাধর্ম্ম্য হেতুও নহে, বৈধর্ম্ম্য হেতুও নহে। পরন্তু সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সাধন করিতে গেলে প্রতিবাদী কোন উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। কারণ, সমস্ত পদার্থই তাঁহার প্রতিজ্ঞার্থ। পরন্তু সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সাধন করিলে শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকৃতই হইবে। সুতরাং প্রতিবাদী আর উহার প্রতিষেধ করিতেও পারিবেন না। পূর্ব্বোক্ত "অবিশেষসমা" জাতির উত্তরসূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার এই যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাও এখানে এই "অনিত্যসমা" জাতির উত্তর বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার নিজেও পরে এখানে তাহাও বলিয়াছেন ॥৩৪॥

অনিত্যসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১১॥

সূত্র। নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যে নিত্যত্বোপ-পত্তের্নিত্যসমঃ ॥৩৫॥৪৯৬॥

অনুবাদ। নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা অনিত্যত্ববশতঃ অনিত্য পদার্থে নিত্যত্বের সত্তাপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২৩) **নিত্যসম** প্রতিষেধ।

ভাষ্য। অনিত্যঃ শব্দ ইতি প্রতিজ্ঞায়তে। তদনিত্যত্বং কিং শব্দে নিত্যমথানিত্যং? যদি তাবৎ সর্ব্বদা ভবতি, ধর্ম্মস্য সদাভাবাদ্ধর্ম্মিণোঽপি

সদাভাব ইতি নিত্যঃ শব্দ ইতি। অথ ন সর্ব্বদা ভবতি, অনিত্যত্বস্যাভাবা-ন্নিত্যঃ শব্দঃ। এবং নিত্যত্বেন প্রত্যবস্থানান্নিত্যসমঃ।

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, ইহা প্রতিজ্ঞাত হইতেছে। সেই অনিত্যত্ব কি শব্দে নিত্য অথবা অনিত্য? অর্থাৎ সেই অনিত্যত্ব কি শব্দে সর্ব্বদা থাকে অথবা সর্ব্বদা থাকে না? যদি সর্ব্বদা থাকে, ধর্ম্মের সর্ব্বদা সত্তাবশতঃ ধর্ম্মীরও অর্থাৎ শব্দেরও সর্ব্বদা সত্তা স্বীকার্য্য, এ জন্য শব্দ নিত্য। আর যদি সর্ব্বদা না থাকে অর্থাৎ কোন সময়ে শব্দে অনিত্যত্ব না থাকে, তাহা হইলে অনিত্যত্বের অভাববশতঃ শব্দ নিত্য, (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার্য্য) নিত্যত্বপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানবশতঃ (২৩) নিত্যসম প্রতিষেধ।

টিপ্পনী। ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা "নিত্যসম" প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ এই সূত্রেও "প্রত্যবস্থানং" এই পদের অনুবৃত্তি বা অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। ভাষ্য-কার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্থলেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা সূত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্দে অনিত্যত্ব সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার প্রতিজ্ঞার্থ যে, শব্দের অনিত্যত্ব, তাহা কি শব্দে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে? অথবা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে না? যদি বল, সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মী শব্দও সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, ধর্ম্মী না থাকিলে আশ্রয়ের অভাবে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। সুতরাং শব্দের সর্ব্বদা সত্তা স্বীকার্য্য হওয়ায় শব্দ নিত্য, ইহাই স্বীকার্য্য। আর যদি বল, অনিত্যত্ব সর্ব্বদা শব্দে বর্ত্তমান থাকে না, তাহা হইলেও শব্দ নিত্য, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, যে সময়ে শব্দে অনিত্যত্ব নাই, তখন তাহাতে নিত্যত্বই আছে। কারণ, অনিত্যত্বের অভাবই নিত্যত্ব। উক্তরূপে নিত্যত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ শব্দে নিত্যত্ব সমর্থন করিয়া প্রত্যবস্থান করায় উহাকে বলে "নিত্যসম" প্রতিষেধ। পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার্য্য হইলে আর তাহাতে অনিত্যত্বের সাধন করা যায় না, ইহাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য। সুতরাং বাদীর উক্ত অনুমানে বাধ অথবা সৎপ্রতি-পক্ষদোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই বৃত্তিকার প্রভৃতি এই জাতিকে বলিয়াছেন,—"বাধসৎপ্রতিপক্ষান্যতরদেশনাভাসা"। সূত্রে "নিত্যং" ইহার ব্যাখ্যা সর্ব্বদা। "অনিত্যভাব" শব্দের অর্থ অনিত্যত্ব।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে এই "নিত্যসমা" জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যায় বহু প্রকারে প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়া, ঐ সমস্তই "নিত্যসমা" জাতি বলিয়াছেন এবং তদনুসারে মহর্ষির এই সূত্রেরও সেইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার উদ্ভাবিত সেই সমস্ত প্রত্যবস্থান অন্য কোন জাতির লক্ষণাক্রান্ত না হওয়ায় জাত্যন্তর হইতে পারে না, অথচ উহা সদুত্তরও নহে। কিন্তু অন্যান্য জাতির ন্যায়ই স্বব্যাঘাতক উত্তর। "তার্কিকরক্ষা"কার

বরদরাজ উক্ত মতানুসারে এই "নিত্যসম" জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে পরে আরও কএক প্রকার প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দের অনিত্যত্ব যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে ঐ নিত্য ধর্ম্ম অনিত্যত্ব শব্দকে কিরূপে অনিত্য করিবে? যাহা স্বয়ং নিত্য, তাহা অপরকে অনিত্য করিতে পারে না। রক্তবর্ণ জবাপুষ্পের সম্বন্ধবশতঃ স্ফটিক মণি রক্ত হইতে পারে, কিন্তু নীল হইতে পারে না। যদি বল, ঐ অনিত্যত্বও অনিত্য, সুতরাং উহার সম্বন্ধবশতঃই শব্দ অনিত্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে যেমন রক্তজবা-পুষ্পের সম্বন্ধবশতঃ স্ফটিক মণিতে রক্ত রূপের ভ্রম হয়, তদ্রূপ, ঐ অনিত্যত্বের সম্বন্ধবশতঃ শব্দ অনিত্য, এইরূপ ভ্রম হয়, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, অন্য পদার্থের সম্বন্ধপ্রযুক্ত যে জ্ঞান, তাহা ভ্রমই হইয়া থাকে। আর যদি তদাকার বস্তুর সহিত সম্বন্ধবশতঃ তদাকারত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ঘটাকার দ্রব্যের সম্বন্ধ হইলে তৎপ্রযুক্ত পটেরও ঘটত্বাপত্তি হয়। পরন্তু অনিত্য বস্তু কি অপর অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধপ্রযুক্ত অনিত্য অথবা স্বভাবতঃই অনিত্য। প্রথম পক্ষে অনবস্থাদোষ। কারণ, সেই অপর অনিত্য বস্তুও অপর অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধপ্রযুক্ত অনিত্য, এইরূপই বলিতে হইবে। স্বভাবতঃই অনিত্য, এই দ্বিতীয় পক্ষে ঘটাদি পদার্থের অনিত্যত্ব হইতে পারে না। কারণ, অনিত্যত্ব ঘটাদির স্বভাব বলা যায় না। কারণ, নিত্যত্বের অভাবই অনিত্যত্ব। উহা অভাব পদার্থ। উহা ঘটাদি দ্রব্যের স্বভাব বলিলে তাহাতে ভাবরূপ দ্রব্যত্বের ব্যাঘাত হয়। এইরূপ কোন বাদী "শব্দো নিত্যঃ" এইরূপ প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দ যে নিত্যত্বের সম্বন্ধবশতঃ নিত্য, ঐ নিত্যত্ব শব্দ হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন? ভিন্ন বলিলে ভিন্নত্ব ধর্ম্মের সম্বন্ধবশতঃ ভিন্ন, ইহা বক্তব্য। সেই ভিন্নত্ব ধর্ম্মও অপর ভিন্নত্ব ধর্ম্মের সম্বন্ধবশতঃ ভিন্ন, এইরূপ বলিতে হইবে। সুতরাং অনবস্থাদোষ। নিত্যত্ব ধর্ম্মকে শব্দ হইতে অভিন্ন, ইহা বলিলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর মধ্যে একটী মাত্রই পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। তন্মধ্যে নিত্যত্বধর্ম্ম মাত্রই স্বীকার করিলে শব্দরূপ ধর্ম্মী না থাকায় উক্ত অনুমানে আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ। আর যদি ধর্ম্মী শব্দ মাত্রই স্বীকার্য্য হয়, অর্থাৎ নিত্যত্ব ধর্ম্মই না থাকে, তাহা হইলে সাধ্য ধর্ম্মের অভাববশতঃ বাধদোষ। এইরূপ "শব্দোঽনিত্যঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিত্যত্ব কি শব্দে উৎপন্ন হয়? অথবা উৎপন্ন হয় না। উৎপন্ন হইলেও উহা কি শব্দের সহিত উৎপন্ন হয় অথবা শব্দের পূর্ব্বে অথবা শব্দের পশ্চাৎ উৎপন্ন হয়? শব্দরূপ কারণ পূর্ব্বে না থাকায় শব্দের সহিত অথবা শব্দের পূর্ব্বেই তাহাতে অনিত্যত্ব উৎপন্ন হইতে পারে না। শব্দের পরে তাহাতে অনিত্যত্ব উৎপন্ন হয়, এই তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করিলে অনিত্যত্বের উৎপত্তির পূর্ব্বে শব্দের নিত্যতা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে আর উহাতে অনিত্যত্ব সাধন করা যায় না। আর যদি ঐ অনিত্যত্বের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে সে পক্ষেও শব্দের নিত্যতা স্বীকার্য্য। কারণ, তাহা হইলে শব্দও উৎপন্ন হয় না, উহাও সর্ব্বদা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ বাদী "ঘটঃ" এই বাক্যের প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটত্বের সম্বন্ধবশতঃই ঘট। কিন্তু ঐ ঘটত্ব কি নিত্য অথবা অনিত্য? নিত্য হইলে

নিত্যধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া ঘটও নিত্য হউক? অনিত্য হইলে উহার জাতিত্ব ব্যাঘাত হয়। কারণ, ঘটত্বাদি জাতি নিত্য, ইহাই সিদ্ধান্ত। বরদরাজ এই সমস্ত প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, "ইত্যাদি সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ"।

"সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে মাধবাচার্য্যও মাধ্বমতের ব্যাখ্যায় এই "নিত্যসমা" জাতির উল্লেখ করিয়া, উদয়নাচার্য্যের মতানুসারেই ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন। তিনি সেখানে বরদরাজের "তার্কিকরক্ষা"র কারিকা উদ্ধৃত করিয়া, পরে উদয়নাচার্য্যের "প্রবোধসিদ্ধি"র সন্দর্ভও উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যাখ্যানুসারেই জাতির ত্রিবিধ দুষ্টত্বমূল প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং জাতিতত্ত্ব বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের সূক্ষ্ম বিচারমূলক মতই যে পরে অন্য সম্প্রদায়ও গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং।

অনুবাদ। এই "নিত্যসম" প্রতিষেধের উত্তর।

সূত্র। প্রতিষেধ্যে নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যেঽনিত্যত্বোপপত্তেঃ প্রতিষেধাভাবঃ ॥৩৬॥৪৯৭॥

অনুবাদ। প্রতিষেধ্য পদার্থে সর্ব্বদা "অনিত্যভাব" অর্থাৎ অনিত্যত্ববশতঃ অনিত্য পদার্থে অনিত্যত্বের স্বীকারপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ অনিত্যত্ব স্বীকৃতই হওয়ায় প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। প্রতিষেধ্যে শব্দে নিত্যমনিত্যত্বস্য ভাবাদিত্যুচ্যমানেঽনুজ্ঞাতং শব্দস্যানিত্যত্বং। অনিত্যত্বোপপত্তেশ্চ নানিত্যঃ শব্দ ইতি প্রতিষেধো নোপপদ্যতে। অথ নাভ্যুপগম্যতে নিত্যমনিত্যত্বস্য ভাবাদিতি হেতুর্ন ভবতীতি হেত্বভাবাৎ প্রতিষেধানুপপত্তিরিতি।

উৎপন্নস্য নিরোধাদভাবঃ শব্দস্যানিত্যত্বং, তত্র পরিপ্রশ্নানুপপত্তিঃ। সোঽয়ং প্রশ্নঃ, তদনিত্যত্বং কিং শব্দে সর্ব্বদা ভবতি? অথ নেত্যনুপপন্নঃ। কস্মাৎ? উৎপন্নস্য যো নিরোধাদভাবঃ শব্দস্য তদনিত্যত্বম্। এবঞ্চ সত্যধিকরণাধেয়-বিভাগো ব্যাঘাতান্নাস্তীতি। **নিত্যানিত্যত্ববিরোধাচ্চ**। নিত্যত্বমনিত্যত্বঞ্চ একস্য ধর্ম্মিণো ধর্ম্মাবিতি বিরুধ্যেতে ন সম্ভবতঃ। তত্র যদুক্তং নিত্যমনিত্যত্বস্য ভাবান্নিত্য এব, তদবর্ত্তমানার্থমুক্তমিতি।

অনুবাদ। প্রতিষেধ্য শব্দে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপে প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য শব্দে সর্ব্বদা অনিত্যত্বের সত্তাপ্রযুক্ত, এই কথা বলিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী ঐ হেতু বলিলে শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকৃতই হয়। অনিত্যত্বের স্বীকারপ্রযুক্তই 'শব্দ অনিত্য নহে' এই প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। আর যদি স্বীকৃত না হয় অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি শব্দে সর্ব্বদা অনিত্যত্বের সত্তা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সর্ব্বদা অনিত্যত্বের সত্তা—এই হেতু নাই, সুতরাং হেতুর অভাববশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না।

উৎপন্ন শব্দের নিরোধপ্রযুক্ত অভাব অনিত্যত্ব। তদ্বিষয়ে প্রশ্নের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, সেই অনিত্যত্ব কি শব্দে সর্ব্বদা থাকে অথবা সর্ব্বদা থাকে না? এইরূপ সেই এই প্রশ্ন উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) উৎপন্ন শব্দের নিরোধপ্রযুক্ত যে অভাব অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তির পরে উহার ধ্বংস হওয়ায় উহার যে অভাব সিদ্ধ হয়, তাহা (শব্দের) অনিত্যত্ব। এইরূপ হইলে ব্যাঘাতবশতঃ আধারাধেয় বিভাগ নাই। [অর্থাৎ শব্দের অভাব বা ধ্বংসই যখন উহার অনিত্যত্ব, তখন শব্দ ঐ অনিত্যত্বের আধার হইতে পারে না, সুতরাং ঐ অনিত্যত্বও শব্দে আধেয় হইতে পারে না। কারণ, শব্দের ধ্বংসরূপ অনিত্যত্ব যখন জন্মে, তখন শব্দই থাকে না। অতএব পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না]।

নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিরোধপ্রযুক্তও (পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না)। বিশদার্থ এই যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব একই ধর্ম্মীর ধর্ম্মদ্বয়, ইহা বিরুদ্ধ হয়, সম্ভব হয় না অর্থাৎ একই শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া থাকিতে পারে না। তাহা হইলে যে উক্ত হইয়াছে—'সর্ব্বদা অনিত্যত্বের সত্তাপ্রযুক্ত (শব্দ) নিত্যই,' তাহা অবর্ত্তমানার্থ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐ কথার অর্থ অবর্ত্তমান বা অসৎ অর্থাৎ উহার কোন অর্থই নাই।

টীপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "নিত্যসম" প্রতিষেধের উত্তর বলিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রতিষেধ হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দ অনিত্য নহে, এইরূপ যে প্রতিষেধ প্রতিবাদীর অভিমত, তাহা উপপন্ন হয় না। কেন হয় না? তাই প্রথমে বলিয়াছেন, "প্রতিষেধ্যে নিত্যমনিত্যভাবাৎ"। উক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্দই বাদীর সাধ্যধর্ম্মী। সুতরাং অনিত্যত্বরূপে শব্দই প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য ধর্ম্মী। তাই ঐ তাৎপর্য্যে সূত্রে উক্ত স্থলে শব্দই "প্রতিষেধ্য" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য শব্দে নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই অনিত্যভাব (অনিত্যত্ব) থাকিলে উক্ত প্রতিষেধ কেন উপপন্ন হয় না? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি

পরে বলিয়াছেন,—"অনিত্যেহনিত্যত্বোপপত্তেঃ"। অর্থাৎ তাহা হইলে অনিত্য শব্দে অনিত্যত্বের উপপত্তি অর্থাৎ স্বীকারপ্রযুক্ত উক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে মহর্ষি ঐ বাক্যের দ্বারা অনিত্য পদার্থে অনিত্যত্বের উপপত্তিই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য সুব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শব্দের অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিতে শব্দে সর্ব্বদা অনিত্যত্ব আছে, ইহাই হেতু বলিলে শব্দের অনিত্যত্ব তাঁহার স্বীকৃতই হয়। সুতরাং তিনি আর উহার প্রতিষেধ করিতে পারেন না। আর যদি প্রতিবাদী শব্দে সর্ব্বদা অনিত্যত্ব আছে, ইহা স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার কথিত ঐ হেতু তাঁহার মতেও নাই। সুতরাং হেতুর অভাববশতঃও তাঁহার ঐ প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিবাদী যদি তাঁহার ঐ হেতু স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার 'শব্দ অনিত্য নহে', এই প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হয় ; আর যদি ঐ প্রতিজ্ঞা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ হেতু ব্যাহত হয়। ফল কথা, প্রতিবাদীর ঐ উত্তর উক্তরূপে স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা সদুত্তর নহে, উহা জাত্যুত্তর। বরদরাজ প্রভৃতি কেহ কেহ এই সূত্রে "অনিত্যে নিত্যত্বোপপত্তেঃ" এইরূপই পাঠ গ্রহণ করিয়া, অনিত্য পদার্থে নিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিয়া, প্রতিবাদীর কৃত যে প্রতিষেধ, তাহা হয় না, এইরূপেই সূত্রের ঐ শেষোক্ত অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পরে উক্ত ব্যাখ্যান্তরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ভাষ্যকার পরে নিজে স্বতন্ত্রভাবে উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, শব্দে অনিত্যত্ব কি সর্ব্বদাই থাকে অথবা সর্ব্বদাই থাকে না ? এইরূপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না। কারণ, শব্দের উৎপত্তির পরে তাহার নিরোধ অর্থাৎ ধ্বংস হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত উহার যে অভাব সিদ্ধ হয়, তাহাই শব্দের অনিত্যত্ব। অর্থাৎ উৎপত্তির পরে শব্দের ধ্বংসনামক অভাবই উহার অনিত্যত্ব। তাহা হইলে শব্দ ও অনিত্যত্বের আধারাধেয়ভাবই নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্য এই যে, শব্দের ধ্বংসের সহিত শব্দের প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধবশতঃই শব্দের ধ্বংস বা শব্দের অনিত্যত্ব, এইরূপ কথিত হয়। কিন্তু একই সময়ে শব্দ ও উহার ধ্বংসের সত্তা ব্যাহত বা বিরুদ্ধ বলিয়া, ঐ উভয়ের আধারাধেয়-ভাব সম্ভবই হয় না। প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন কালীন পদার্থদ্বয়ের আধারাধেয়ভাব হইতে পারে না। সুতরাং শব্দের ধ্বংসরূপ যে অনিত্যত্ব, তাহা শব্দে বর্ত্তমানই না থাকায় উহা কি শব্দে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে অথবা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে না, এইরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না। যাহা শব্দে বর্ত্তমানই থাকে না, শব্দ যাহার আধারই নহে, তদ্বিষয়ে ঐরূপ প্রশ্ন উপপন্ন হয় না। জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অনিত্যত্ব, নিরোধ ও ধ্বংসাভাব একই পদার্থ। অনিত্যত্বপ্রযুক্ত অভাব, ইহা যে বলা হয়, উহা ব্যবহার মাত্র। শব্দের পক্ষে সেই অনিত্যত্ব শব্দে থাকে না, অর্থাৎ শব্দ উহার আধার নহে। শব্দের ধ্বংসরূপ অনিত্যত্ব উহার প্রতিযোগি শব্দকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। বস্তুতঃ শব্দের আধার আকাশই উহার ধ্বংসের আধার। ভাষ্যকার পরে প্রকৃত কথা বলিয়াছেন যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিরোধবশতঃও পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, একই ধর্ম্মীতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিরুদ্ধ অর্থাৎ উহা সম্ভব হয়

না। সুতরাং শব্দকে নিত্য বলিলে অনিত্য বলা যাইবে না। অনিত্য বলিলেও নিত্য বলা যাইবে না। সুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে বলিয়াছেন, শব্দে সর্ব্বদাই অনিত্যত্ব থাকিলে তৎপ্রযুক্ত শব্দ নিত্যই হয়, এই কথার কোন অর্থ নাই। কারণ, শব্দে সর্ব্বদা অনিত্যত্ব থাকিলে তাহার নিত্যত্ব অসম্ভব। যাহা অসম্ভব, তাহা কোন বাক্যার্থ হইতে পারে না। প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমি ত একই শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব স্বীকার করিতেছি না। কিন্তু তুমি শব্দ অনিত্য, এই কথা বলায় তোমার পক্ষেই শব্দের নিত্যত্বাপত্তি প্রকাশ করিয়া উক্ত বিরোধ দোষ প্রদর্শনই আমার উদ্দেশ্য। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর কথিত ঐ দোষ বাদীর পক্ষ-দোষও নহে, হেতু-দোষও নহে। কারণ, প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের কোন দোষ উদ্ভাবন করেন নাই। তবে তিনি বিরোধ-দোষের উদ্ভাবন করিলে তাহার উত্তর পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সে উত্তর এই যে, তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না। উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ উক্ত স্থলে আরও যে প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়া উহাকেও "নিত্যসমা" জাতি বলিয়াছেন, এই সূত্রের দ্বারা তাহারও উত্তর সূচিত হইয়াছে, ইহাও তিনি বলিয়াছেন এবং সংক্ষেপে তাহা প্রকাশও করিয়াছেন। যেমন প্রতিবাদী যখন বাদীকে বলিবেন যে, তোমার এই বাক্য অথবা হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অসাধক, তখন প্রতিবাদীর ন্যায় বাদীও তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, অসাধকত্ববিশিষ্ট হইলে তাহাকে অসাধক বলে। কিন্তু ঐ অসাধকত্ব কি তদাকার অথবা তদাকার নহে? এবং উহা কি ধর্ম্মী হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? অথবা উহা কি কার্য্য অথবা অকার্য্য; কার্য্য হইলে উহা কোন্ সময়ে জন্মে ইত্যাদি। ফল কথা, প্রতিবাদীর নিজের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তিনিও উহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে না পারিয়া নিরস্ত হইবেন। সর্ব্বত্র ধর্ম্মধর্ম্মিভাব স্বীকার না করিলে তাঁহারও হেতু ও সাধ্য থাকিবে না। উহা স্বীকার করিলেও প্রতিবাদীর ঐ সমস্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হইবে না। সর্ব্বত্র প্রতিবাদীর অভিমত হেতুতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি না থাকায় যুক্তাঙ্গহানি প্রযুক্তও তাঁহার ঐ সমস্ত উত্তর সদুত্তর হইতে পারে না। সাধারণ দুষ্টত্বমূল স্বব্যাঘাতকত্ব সর্ব্বত্রই আছে ॥৩৭॥

নিত্যসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৫॥

সূত্র। প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ কার্য্যসমঃ ॥৩৭॥৪৯৮॥

অনুবাদ। প্রযত্নকার্য্যের অনেকত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রযত্নসম্পাদ্য পদার্থের নানা-বিধত্বপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২৪) **কার্য্যসম** প্রতিষেধ।

ভাষ্য। **প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদনিত্যঃ শব্দ** ইতি। যস্য প্রযত্না-নন্তরমাত্মলাভস্তৎ খল্বভূত্বা ভবতি, যথা ঘটাদিকার্য্যং। অনিত্যমিতি চ ভূত্বা ন ভবতীত্যেতদ্‌বিজ্ঞায়তে। এবমবস্থিতে **প্রযত্নকার্য্যানেকত্বা-**

দিতি প্রতিষেধ উচ্যতে। প্রযত্নানন্তরমাত্মলাভশ্চ দৃষ্টো ঘটাদীনাম্। ব্যবধানাপোহাচ্চাভিব্যক্তির্ব্যবহিতানাম্। তৎ কিং প্রযত্নানন্তরমাত্মলাভঃ শব্দস্যাহোঽভিব্যক্তিরিতি বিশেষো নাস্তি। কার্য্যাবিশেষেণ প্রত্যবস্থানং **কার্য্যসমঃ**।

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু (শব্দে) প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব আছে। প্রযত্নের অনন্তর যে বস্তুর আত্মলাভ হয়, তাহা (পূর্ব্বে) বিদ্যমান না থাকিয়া জন্মে, যেমন ঘটাদি কার্য্য। "অনিত্য" এই শব্দের দ্বারাও উৎপন্ন হইয়া থাকে না অর্থাৎ বিনষ্ট হয়, ইহা বুঝা যায়। এইরূপে (বাদী) অবস্থিত হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে হেতু ও উদাহরণাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক বাদী শব্দে অনিত্যত্বরূপ নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে (প্রতিবাদী কর্ত্তৃক) প্রযত্নকার্য্যের অনেকত্ব, এই হেতুপ্রযুক্ত প্রতিষেধ কথিত হয়। যথা—প্রযত্নের অনন্তর ঘটাদি কার্য্যের আত্মলাভ অর্থাৎ উৎপত্তিও দৃষ্ট হয়। ব্যবধানের অপোহ অর্থাৎ ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণপ্রযুক্ত ব্যবহিত পদার্থসমূহের অভিব্যক্তিও দৃষ্ট হয়। তবে কি প্রযত্নের অনন্তর শব্দের আত্মলাভ (উৎপত্তি) হয় ? অথবা অভিব্যক্তি (উপলব্ধি) হয় ? ইহাতে বিশেষ নাই, [অর্থাৎ প্রযত্নদ্বারা পূর্ব্বে অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহা যেমন বলা হইতেছে, তদ্রূপ, প্রযত্নদ্বারা বিদ্যমান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয়, ইহাও বলিতে পারি। শব্দে এমন কোন বিশেষ অর্থাৎ বিশেষক ধর্ম্ম নাই, যদ্দ্বারা উহা প্রযত্নদ্বারা উৎপন্নই হয়, ইহা নির্ণয় করা যায়] কার্য্যের অবিশেষপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২৪) **কার্য্যসম** প্রতিষেধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্র দ্বারা "কার্য্যসম" প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কথিত চতুর্ব্বিংশতি জাতির মধ্যে সর্ব্বশেষোক্ত চতুর্ব্বিংশ জাতি। পূর্ব্ববৎ এই সূত্রেও "প্রত্যবস্থানং" এই পদের অনুবৃত্তি বা অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। প্রথমে বাদী যে নিজপক্ষ স্থাপন করেন, তাহাকে বলে বাদীর অবস্থান। পরে প্রতিবাদীর যে প্রতিষেধ বা উত্তর, তাহাকে বলে প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান। বাদী প্রথমে কিরূপে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপনরূপ অবস্থান করিলে প্রতিবাদী এই সূত্রোক্ত প্রতিষেধ বলেন, অর্থাৎ কিরূপ স্থলে এই "কার্য্যসমা" জাতির প্রয়োগ হয়, ইহা প্রথমে প্রকাশ করিয়া, ভাষ্যকার উক্ত প্রতিষেধের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। বাদী প্রথমে "অনিত্যঃ শব্দঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করিয়া পরে "প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিলেন। পরে উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিলেন যে, প্রযত্নের অনন্তর যে বস্তুর আত্মলাভ অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকিয়া জন্মে, যেমন ঘটাদি কার্য্য। অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্য পূর্ব্বে কোনরূপেই বিদ্যমান থাকে না।

কর্ত্তার প্রযত্নজন্য পূর্ব্বে অসৎ বা অবিদ্যমান ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং শব্দও যখন প্রযত্নের অনন্তর উৎপন্ন হয়, তখন উহাও উৎপত্তির পূর্ব্বে কোনরূপেই বিদ্যমান থাকে না। প্রযত্নজন্য অবিদ্যমান শব্দেরই উৎপত্তি হয়। অতএব শব্দ অনিত্য। যাহা উৎপন্ন হইয়া চিরকাল থাকে না অর্থাৎ কোন কালে বিনষ্ট হয়, ইহাই অনিত্য শব্দের অর্থ। উৎপন্ন বস্তুর ধ্বংসই তাহার অনিত্যত্ব, ইহা পূর্ব্বসূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। বাদী উক্তরূপে "প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব" হেতু ও ঘটাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বরূপ নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তার প্রযত্নবিশেষের অনন্তর অর্থাৎ তজ্জন্য অবিদ্যমান ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি দেখা যায়। কিন্তু প্রযত্নবিশেষপ্রযুক্ত ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ হইলে বিদ্যমান ব্যবহিত পদার্থের অভিব্যক্তিও দেখা যায় অর্থাৎ উহাও স্বীকার্য্য। যেমন ভূগর্ভে জলাদি বহু পদার্থ বিদ্যমানই আছে; কিন্তু মৃত্তিকার দ্বারা ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না। মৃত্তিকারূপ ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ করিলে তখন ঐ সমস্ত বিদ্যমান পদার্থেরই অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং প্রযত্নকার্য্য অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ কাহারও প্রযত্ন ব্যতীত প্রকাশিত হয় না, তাহা অনেক অর্থাৎ অনেক প্রকার। কারণ, তন্মধ্যে কোন পদার্থ পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু কর্ত্তার প্রযত্নবিশেষজন্য তাহার উৎপত্তি হয় এবং কোন পদার্থ পূর্ব্বে বিদ্যমানই থাকে,—কিন্তু প্রযত্নবিশেষজন্য ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ হইলে তখন তাহার অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং বক্তার প্রযত্নবিশেষপ্রযুক্ত বিদ্যমান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয়, ইহাও বলিতে পারি। প্রযত্নের অনন্তর কি ঘটাদি কার্য্যের ন্যায় অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয় অথবা ভূগর্ভস্থ জলাদির ন্যায় বিদ্যমান শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, এ বিষয়ে কোন বিশেষ নাই। অর্থাৎ শব্দে এমন কোন বিশেষ বা বিশেষক ধর্ম্ম নাই, যদ্দ্বারা অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয়, এই পক্ষেরই নির্ণয় করা যায়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রত্যবস্থানকে বলে "কার্য্যসম" প্রতিষেধ বা "কার্য্যসমা" জাতি। ভাষ্যকার উক্তরূপে ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, কার্য্যের অবিশেষপ্রযুক্ত ঐরূপ প্রত্যবস্থান হওয়ায় উহার নাম "কার্য্যসম"। তাৎপর্য্য এই যে, সূত্রে "প্রযত্নকার্য্য" শব্দের দ্বারা প্রযত্ন ব্যতীত যাহার প্রকাশ হয় না, সেই সমস্ত পদার্থই গৃহীত হইয়াছে, এবং "অনেকত্ব" শব্দের দ্বারা অনেকপ্রকারত্বই মহর্ষির বিবক্ষিত। অর্থাৎ প্রযত্ন ব্যতীত যে সমস্ত পদার্থের স্বরূপ প্রকাশ হয় না, তন্মধ্যে অবিদ্যমান বহু পদার্থের উৎপত্তি এবং বিদ্যমান বহু পদার্থের অভিব্যক্তি, এই উভয় প্রকারই আছে। সুতরাং প্রযত্নকার্য্য পদার্থগুলি অনেক অর্থাৎ অনেক প্রকার, এক প্রকার নহে। তন্মধ্যে ভূগর্ভস্থ জলাদি পদার্থরূপ যে সমস্ত কার্য্য অর্থাৎ প্রযত্নকার্য্য, তাহার সহিত শব্দের কোন বিশেষ প্রমাণ সিদ্ধ না হওয়ায় অবিশেষপ্রযুক্তই প্রতিবাদী শব্দে ঐ সমস্ত প্রযত্নকার্য্যের সাম্য সমর্থন করিয়া উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করায় উহার নাম "কার্য্যসম"।

তাৎপর্য্যটীকাকার উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদীর হেতু যে প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব, তাহা কি প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি অথবা প্রযত্নের অনন্তর উপলব্ধি।

প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি বলিলে ঐ হেতু অসিদ্ধ। কারণ, প্রযত্নজন্য যে অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয়, ইহা নির্ণীত বা সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং প্রযত্নের অনন্তর উপলব্ধিই বাদীর হেতু পদার্থ, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু বিদ্যমান পদার্থেরও যখন প্রযত্নজন্য অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তখন শব্দ যে ঐরূপ বিদ্যমান পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত না হইলে বাদীর ঐ হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকারও এখানে প্রযত্নের অনন্তর শব্দের কি উৎপত্তি হয়? অথবা অভিব্যক্তি হয়? এইরূপ সংশয় ব্যক্ত করিয়া প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়াছেন। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও এখানে প্রতিবাদীর উক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিতে শব্দে উক্তরূপ সংশয় জন্মে, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "সংশয়সমা" জাতি হইতে এই "কার্য্যসমা" জাতির বিশেষ কি? এতদুত্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, "সংশয়সমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী কোন নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যবিশেষের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রযুক্ত শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে সংশয় সমর্থন করেন। কিন্তু এই "কার্য্যসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু পদার্থের বিকল্প করিয়া অর্থাৎ প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব কি প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি অথবা অভিব্যক্তি, এইরূপ বিকল্প করিয়া উহার নিরূপণ দ্বারা প্রযত্নের-অনন্তর শব্দের কি উৎপত্তি হয়? অথবা অভিব্যক্তি হয়? এইরূপ সংশয় সমর্থন করেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "সংশয়সমা" জাতি হইতে এই "কার্য্যসমা" জাতির বিশেষ আছে। বস্তুতঃ উক্ত স্থলে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তিমত্ত্বই বাদীর অভিমত হেতু। কিন্তু প্রতিবাদী উহা অসিদ্ধ বলিয়া প্রযত্নের অনন্তর উপলব্ধিকেই বাদীর হেতু বলিয়া আরোপ করিয়া উক্ত হেতুতে "অনৈকান্তিকত্ব" দোষের উদ্ভাবন করেন। উক্তরূপ স্থলেই প্রতিবাদীর ঐরূপ প্রত্যবস্থানকে "কার্য্যসম" প্রতিষেধ বলা হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। তিনি উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর "অনৈকান্তিকদেশনা"র উল্লেখ করিয়া উহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রযত্নের অনন্তর উপলব্ধিরূপ যে হেতু, তাহা অনৈকান্তিক, অর্থাৎ বাদীর সাধ্যধর্ম্ম অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। কারণ, প্রযত্নের অনন্তর যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা অনিত্য ও নিত্য, এই দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়। বিদ্যমান অনেক নিত্য পদার্থেরও প্রযত্নের অনন্তর উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। আর যদি প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তিমত্ত্বই বাদীর হেতু পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহা শব্দে অসিদ্ধ। সুতরাং উহার দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই পক্ষে বাদীর হেতুতে প্রতিবাদীর অসিদ্ধি দোষের উদ্ভাবনকে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—"অসিদ্ধদেশনা"। উদ্দ্যোতকর পরে পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" ও "সংশয়সমা" জাতি হইতে এই "কার্য্যসমা" জাতির ভেদ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত "সংশয়সমা" জাতির প্রয়োগ হয়। এই "কার্য্যসমা" জাতি ঐরূপ নহে। এবং বাদীর যাহা অভিমত হেতু নহে, তাহাই বাদীর অভিমত হেতু বলিয়া আরোপ করিয়া এই "কার্য্যসমা" জাতির প্রয়োগ হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতির ঐরূপে প্রয়োগ হয় না। বস্তুতঃ "সংশয়সমা" জাতিরও ঐরূপে প্রয়োগ হয় না।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতু অথবা পক্ষ অথবা দৃষ্টান্ত, ইহার যে কোন পদার্থের অসিদ্ধত্ব প্রকাশ করিয়া পরে নিজে উহার সাধকরূপে কোন হেতুর উল্লেখপূর্ব্বক তাহাতেও ব্যভিচার দোষের উদ্ভাবন করিয়া, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত হেতু প্রভৃতির অসিদ্ধত্ব সমর্থন করেন, তাহা হইলে সেই স্থলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "কার্য্যসম" প্রতিষেধ। যেমন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে কার্য্যত্ব অসিদ্ধ। উহার সাধক হেতু যে প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব, তাহাও উহার ব্যভিচারী। কারণ, ভূগর্ভস্থ জলাদিতে প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি আছে। তাহাতে কার্য্যত্ব অর্থাৎ প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তিমত্ত্ব নাই। সুতরাং শব্দে ঐ কার্য্যত্ব হেতুর কোন অব্যভিচারী সাধক না থাকায় উহা অসিদ্ধ। এইরূপ বাদীর গৃহীত পক্ষ শব্দ এবং দৃষ্টান্ত ঘটকে অনিত্যত্বরূপে অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিবাদী যদি ঐ অনিত্যত্বের সাধকরূপে কোন হেতুর উল্লেখপূর্ব্বক তাহাতে অনিত্যত্বের ব্যভিচার সমর্থন করিয়া, ঐ পক্ষ এবং দৃষ্টান্তেরও অসিদ্ধি সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ উত্তরও সেখানে "কার্য্যসম" প্রতিষেধ হইবে। মহর্ষির এই সূত্র দ্বারা উক্তরূপ অর্থ কিরূপে বুঝা যায়? ইহা বুঝাইতে বরদরাজ বলিয়াছেন যে, সূত্রে "প্রযত্নকার্য্য" শব্দের দ্বারা যাহা প্রযত্নের কার্য্য অর্থাৎ বিষয় হয় অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ হেয় অথবা গ্রাহ্য বলিয়া প্রযত্নের বিষয় হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উহার দ্বারা বাদীর হেতুর ন্যায় পক্ষ ও দৃষ্টান্তও বুঝা যাইবে। সর্ব্বত্র বাস্তব সত্তা ও অসত্তাই ঐ সমস্ত পদার্থের অনেকত্ব। অথবা পূর্ব্বোক্ত স্থলে জন্যত্ব ও ব্যঙ্গ্যত্বরূপ নানাত্বই উহার অনেকত্ব। সেই অনেকত্বপ্রযুক্ত ব্যভিচার দোষের উদ্ভাবন দ্বারা প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে "কার্য্যসম" প্রতিষেধ, ইহাই সূত্রার্থ।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রথমে সূত্রোক্ত "প্রযত্নকার্য্য" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—প্রযত্নসম্পাদ্য, এবং "অনেকত্ব" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন অনেকবিষয়ত্ব। কিন্তু পরে তিনি অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রযত্নরূপ যে কার্য্য অর্থাৎ কর্ত্তব্য যে সমস্ত প্রযত্ন, তাহার অনেকত্ব অর্থাৎ অনেকপ্রকারত্ববশতঃ যে সমস্ত প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে "কার্য্যসম"। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জাতি ভিন্ন আরও যে নানাপ্রকার স্বব্যাঘাতক উত্তর হয়, তাহাকেই মহর্ষি সর্ব্বশেষে "কার্য্যসম" নামক প্রতিষেধ বলিয়াছেন। জিগীষু প্রতিবাদী বাদীকে নিরস্ত করিতে আরও অনেক প্রকারে প্রযত্ন করেন। সুতরাং তাঁহার ঐ বিষয়ে প্রযত্নের অনেকপ্রকারত্ববশতঃ আরও অনেক প্রকার জাত্যুত্তর হইতে পারে ও হইয়া থাকে। মহর্ষি সেই সমস্ত না বলিলে তাঁহার বক্তব্যের ন্যূনতা হয়। সুতরাং তাঁহার এই সূত্রের উক্তরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে। ইহাই বৃত্তিকারের শেষে উক্তরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যার মূলযুক্তি। বৃত্তিকার পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সূত্রোক্ত জাতি "আকৃতিগণ"। অর্থাৎ ইহার দ্বারা ইহার সমানাকার বা তুল্য অনেক জাতি, যাহা মহর্ষির অন্যান্য সূত্রে উক্ত হয় নাই, সেই সমস্ত জাতিও সংগৃহীত হইয়াছে। বৃত্তিকার ইহার উদাহরণস্বরূপে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যেখানে বাদীর

পক্ষের কোন দোষ প্রদর্শন করিতে না পারিয়া বলেন যে, তোমার পক্ষেও কোন দোষ থাকিতে পারে। তোমার পক্ষে যে কোন দোষই নাই, ইহা নিশ্চয় করিবার কোন উপায় না থাকায় সর্ব্বদা উহার শঙ্কা বা সন্দেহ থাকিবেই। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরকে বৃত্তিকার বলিয়াছেন,—"পিশাচী-সমা" জাতি। যেমন পিশাচীর প্রদর্শন করিতে না পারিলেও অনেকে উহার শঙ্কা করে, তদ্রূপ প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের দোষ প্রদর্শন করিতে না পারিলেও উহার শঙ্কা করায় উক্তরূপ জাতির নাম বলা হইয়াছে—"পিশাচীসমা"। বৃত্তিকার এইরূপ "অনুপকারসমা" ইত্যাদি নামেও অন্য জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সমস্ত জাতিই মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে। "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও এখানে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যারই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা, বৃত্তিকারের চরম ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার নিজমত বুঝা যায় যে, মহর্ষির অনুক্ত আরও বহুপ্রকারে যে সমস্ত জাত্যন্তর হইতে পারে, তাঁহাও মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সূচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত অনুক্ত জাতির সামান্য নাম "কার্য্যসমা" এবং বিশেষ নাম "পিশাচীসমা", "অনুপকারসমা" ইত্যাদি। অবশ্য বৃত্তিকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যায় অনুক্ত সর্ব্বপ্রকার জাতিরই এই সূত্রের দ্বারা সংগ্রহ হয়। এবং প্রতিবাদী বাদীর হেতু প্রভৃতিতে অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করিলে উদয়নাচার্য্য উহাকেও "প্রসঙ্গসমা" জাতি বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি তাহা না বলায় তাঁহাদিগের মতে উহা এই সূত্রোক্ত আকৃতিগণের অন্তর্ভূত, ইহাও (পূর্ব্ববর্ত্তী নবম সূত্রের ব্যাখ্যায়) বৃত্তিকার বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি এই সূত্রের উক্তরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারা এই জাতিকে আকৃতিগণও বলেন নাই। মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা সরলভাবে তাঁহার উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝাও যায় না। অন্যান্য বহু প্রকারে অনেক জাত্যন্তর সম্ভব হইলেও সেই সমস্তেরই "কার্য্যসম" এই নামকরণও সংগত হয় না। তাহা হইলে মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য জাত্যন্তরকেও "কার্য্যসম" বলা যাইতে পারে। সুধীগণ প্রণিধান করিয়া এই সমস্ত কথা চিন্তা করিবেন।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ এই "কার্য্যসমা" জাতির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বরদরাজ সেই ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পরে "বৌদ্ধাস্তু" বলিয়া যে কারিকাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা তৎপর্য্য-টীকাকার "কীর্ত্তিরপ্যাহ" বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন[১]। তাৎপর্য্যটীকাকার অন্যত্রও কেবল "কীর্ত্তি" বলিয়া প্রখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যেন উহাঁর বহু কীর্ত্তি স্বীকার করিলেও উহাঁকে ধর্ম্মকীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সে যাহাই হউক, ধর্ম্মকীর্ত্তি যে গ্রন্থে উক্ত কারিকাটী বলিয়াছেন, তাহা এখন আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহার "ন্যায়বিন্দু" গ্রন্থের সর্ব্বশেষে তিনি সংক্ষেপে জাতির স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্মত জাতির বিভাগ ও বিশেষলক্ষণাদি বলেন নাই। উক্ত কারিকার দ্বারা তাঁহার সম্মত "কার্য্যসম"

১। "কীর্ত্তিরপ্যাহ—সাধ্যেনানুগমাৎ কার্য্যসামান্যেনাপি সাধনে।
সম্বন্ধিভেদাদ্ভেদোক্তির্দোষঃ কার্য্যসমো মতঃ।"

প্রতিষেধের লক্ষণ বুঝা যায় যে, সাধাধর্ম্ম অনিত্যত্বের সহিত অনুগম অর্থাৎ ব্যাপ্তিবশতঃ কার্য্য সামান্য অর্থাৎ সামান্যতঃ কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা অনিত্যত্বের সাধন করিলে প্রতিবাদী যদি ঐ কার্য্যত্ব হেতুর সম্বন্ধি-ভেদপ্রযুক্ত ভেদ বলিয়া ঐ হেতু পক্ষে নাই অর্থাৎ উহা পক্ষে অসিদ্ধ, এইরূপ দোষ বলেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম "কার্য্যসম" প্রতিষেধ। যেমন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটের যে কার্য্যত্ব, তাহা অন্যরূপ অর্থাৎ মৃত্তিকা ও দণ্ডাদিপ্রযুক্ত। কিন্তু শব্দের যে কার্য্যত্ব, তাহা অন্যরূপ অর্থাৎ কণ্ঠ তালু প্রভৃতির ব্যাপারপ্রযুক্ত। সুতরাং উক্ত স্থলে কার্য্যত্বের সম্বন্ধি যে ঘট ও শব্দ, তাহার ভেদপ্রযুক্ত কার্য্যত্ব ভিন্ন। অর্থাৎ ঘটে যে কার্য্যত্ব আছে, তাহা শব্দে নাই। সুতরাং ঘটকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া যে কার্য্যত্বকে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা শব্দে না থাকায় উহা স্বরূপাসিদ্ধ। পক্ষে হেতু না থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। সুতরাং উক্ত কার্য্যত্বহেতু শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হয় না। প্রতিবাদীর এইরূপ প্রত্যবস্থানই উক্ত স্থলে "কার্য্যসম" প্রতিষেধ। তাৎপর্য্য-টীকাকার প্রথমে এইরূপে উক্ত মতের প্রকাশপূর্ব্বক উক্ত মতপ্রতিপাদক একটী কারিকার পূর্ব্বার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—"তৎকার্য্যসমমিতি ভদন্তেনোক্তং"। পরে ধর্ম্মকীর্ত্তির কারিকাও উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যদি "কার্য্যসমা" জাতি উক্তরূপই হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মকীর্ত্তি যে আমাদিগের ঈশ্বরসাধক অনুমানের (ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ) খণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্যত্ব হেতুর ভেদ সমর্থন করিয়া দোষ বলিয়াছেন, উহাও তাঁহার এই কার্য্যসমা জাতি, অর্থাৎ উহাও তাঁহার জাত্যুত্তর, সদুত্তর নহে, ইহা তাঁহার নিজেরই স্বীকার্য্য হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার পরে কার্য্যত্ব হেতুর স্বরূপ যে অভিন্ন, সর্ব্বত্রই উহা একরূপ, ইহাও প্রতিপাদন করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে চরমকথা বলিয়াছেন যে, যদি "কার্য্যসমা" জাতি উক্তরূপই হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "উৎকর্ষসমা" ও "অপকর্ষসমা" জাতি হইতে উহার ভেদ থাকে না। সুতরাং মহর্ষি গোতমোক্ত "কার্য্যসমা" জাতিই অসংকীর্ণ অর্থাৎ অন্যান্য জাতি হইতে ভিন্ন বলিয়া উহাই গ্রাহ্য। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও এইরূপ বলিয়া এবং উহা বুঝাইয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এখানে তাঁহাদিগের কথা সংক্ষেপেই লিখিত হইল ॥৩৭॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং।

অনুবাদ। এই "কার্য্যসম" প্রতিষেধের উত্তর।

সূত্র। কার্য্যান্যত্বে প্রযত্নাহেতুত্বমনুপলব্ধি-কারণোপপত্তেঃ ॥৩৮॥৪৯৯॥

অনুবাদ। কার্য্যের ভেদ থাকিলে অর্থাৎ শব্দ কার্য্য বা জন্য পদার্থ না হইয়া অভিব্যঙ্গ্য পদার্থ হইলে (শব্দের অভিব্যক্তিতে) অনুপলব্ধি-কারণের অর্থাৎ

অনুপলব্ধির প্রয়োজক আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত প্রযত্নের হেতুত্ব নাই। [অর্থাৎ যে পদার্থের অনুপলব্ধির প্রযোজক কোন আবরণ থাকে, তাহারই অভিব্যক্তির নিমিত্ত প্রযত্ন আবশ্যক হয়। সুতরাং সেখানে উহার অভিব্যক্তিতে প্রযত্নের যে হেতুত্ব, তাহা উহার অনুপলব্ধির প্রযোজক আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত। কিন্তু উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের কোন আবরণ না থাকায় উহার অভিব্যক্তিতে প্রযত্ন হেতু হইতে পারে না। সুতরাং শব্দের উৎপত্তিই হয়, তাহাতেই প্রযত্ন হেতু।]

ভাষ্য। সতি কার্য্যান্যত্বে অনুপলব্ধিকারণোপপত্তেঃ প্রযত্নস্যাহেতুত্বং শব্দস্যাভিব্যক্তৌ। যত্র প্রযত্নানন্তরমভিব্যক্তিস্তত্রানুপলব্ধিকারণং ব্যবধানমুপপদ্যতে। ব্যবধানাপোহাচ্চ প্রযত্নানন্তরভাবিনোঽর্থস্যোপলব্ধিলক্ষণাঽভিব্যক্তির্ভবতীতি। নতু শব্দস্যানুপলব্ধিকারণং কিঞ্চিদুপপদ্যতে। যস্য প্রযত্নানন্তরমপোহাচ্ছব্দস্যোপলব্ধিলক্ষণাঽভিব্যক্তির্ভবতীতি। তস্মাদুৎপদ্যতে শব্দো নাভিব্যজ্যত ইতি।

অনুবাদ। কার্য্যের ভেদ থাকিলে অর্থাৎ শব্দ কার্য্য বা জন্য পদার্থ না হইলে অনুপলব্ধির কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ অনুপলব্ধিপ্রযোজক আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত শব্দের অভিব্যক্তিতে প্রযত্নের হেতুত্ব নাই। (তাৎপর্য্য) যে পদার্থ বিষয়ে প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি হয়, তাহাতে অনুপলব্ধিপ্রযোজক ব্যবধান অর্থাৎ কোন আবরণ থাকে। কারণ, ব্যবধানের অপসারণপ্রযুক্ত প্রযত্নের অনন্তরভাবী অর্থাৎ প্রযত্নব্যঙ্গ্য পদার্থের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু শব্দের অনুপলব্ধিপ্রযোজক কিছু অর্থাৎ কোন আবরণ নাই, যাহার প্রযত্নের অনন্তর অর্থাৎ প্রযত্নজন্য অপসারণপ্রযুক্ত শব্দের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয়। অতএব শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "কার্য্যসম" প্রতিষেধের উত্তর বলিয়া জাতি নিরূপণ সমাপ্ত করিয়াছেন। "কার্য্যান্যত্ব" শব্দের দ্বারা বুঝা যায় কার্য্যভিন্নত্ব। কার্য্য শব্দের অর্থ এখানে জন্য পদার্থ। সুতরাং যাহা জন্য নহে, কিন্তু ব্যঙ্গ্য, তাহাকে কার্য্যান্য বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদীর মতে শব্দ প্রযত্নজন্য, কিন্তু প্রতিবাদীর মতে উহা প্রযত্নব্যঙ্গ্য। অর্থাৎ বক্তার প্রযত্নবিশেষ দ্বারা বিদ্যমান শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না। সুতরাং প্রতিবাদীর মতে শব্দ কার্য্যান্য। তাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, কার্য্যান্যত্ব থাকিলে অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তি অস্বীকার করিয়া অভিব্যক্তিই স্বীকার করিলে শব্দের অভিব্যক্তিতে প্রযত্নের হেতুত্ব নাই অর্থাৎ উহাতে প্রযত্ন হেতু হইতে পারে না। কারণ, অভিব্যক্তিতে যে প্রযত্নের হেতুত্ব, তাহা

অনুপলব্ধির কারণের অর্থাৎ যে আবরণপ্রযুক্ত বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না, সেই আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত। কিন্তু উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের কোন আবরণই না থাকায় আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত যে প্রযত্নের হেতুত্ব, তাহা শব্দের অভিব্যক্তিতে নাই। সুতরাং শব্দ প্রযত্নব্যঙ্গ্য, ইহা বলা যায় না। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার উক্তরূপই তাৎপর্য্য বুঝা যায়। ভাষ্যকার পরে এই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যে বিষয়ে প্রযত্নজন্য অভিব্যক্তি হয়, তাহাতে অনুপলব্ধিপ্রযোজক ব্যবধান অর্থাৎ কোন আবরণ থাকে। কারণ, সেই আবরণের অপসারণপ্রযুক্ত প্রযত্নব্যঙ্গ্য সেই পদার্থের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ঐরূপ স্থলে সেই আবরণের অপসারণের জন্যই প্রযত্ন আবশ্যক হয়। তাহার পরে সেই বিদ্যমান পদার্থের প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং তাহাতে পরম্পরায় প্রযত্ন হেতু হয়। যেমন ভূগর্ভে জলাদি অনেক পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও মৃত্তিকারূপ ব্যবধান বা আবরণবশতঃ উহার প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তি হয় না। কিন্তু প্রযত্নবিশেষের দ্বারা ঐ আবরণের অপসারণ করিলেই সেই বিদ্যমান জলাদি পদার্থের প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং তাহাতে পরম্পরায় প্রযত্ন হেতু হয়। কিন্তু উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের ঐরূপ কোন আবরণ নাই, প্রযত্নবিশেষের দ্বারা যাহার অপসারণপ্রযুক্ত শব্দের শ্রবণরূপ অভিব্যক্তি হইবে। অতএব বিদ্যমান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয়, ইহা বলা যায় না। সুতরাং বক্তার প্রযত্নবিশেষজন্য অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। ফলকথা, যেখানে পদার্থের কোন ব্যবধান বা আবরণ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, সেখানে প্রযত্নজন্য উহার অভিব্যক্তি সমর্থন করা যায় না। উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের আবরণ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই।

তাৎপর্য্যটীকাকার এই সূত্রের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,[১] "কার্য্যান্যত্ব" হইলে অর্থাৎ অভিব্যক্তিরূপ কার্য্য হইতে উৎপত্তিরূপ কার্য্যের ভেদ থাকায় অভিব্যক্তির প্রতি প্রযত্নের হেতুত্ব নাই। কেন হেতুত্ব নাই? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"অনুপলব্ধিকারণোপপত্তেঃ"। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, অনুপলব্ধির কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ অনুপলব্ধিপ্রযোজক আবরণাদির সত্তা থাকিলেই তৎপ্রযুক্ত অভিব্যক্তির প্রতি প্রযত্নের হেতুত্ব হইতে পারে। কিন্তু শব্দের অনুপলব্ধি বা অশ্রবণের প্রযোজক কোন আবরণাদি নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার মহর্ষির সূত্রোক্ত হেতুবাক্যের পরে "প্রযত্নস্যাভিব্যক্তিহেতুত্বং স্যাৎ" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া, ঐরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বুঝা যায়। তিনি "সতি কার্য্যান্যত্বে" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভেরও উক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য, ইহাও বলিয়াছেন এবং পরে ভাষ্যে "যত্র" ও "তত্র" শব্দের বিপরীত ভাবে যোজনা করিয়া "তত্র"

১। কার্য্যস্য উৎপত্তিলক্ষণস্য অন্যত্বেঽভিব্যক্তিলক্ষণাৎ কার্য্যাৎ প্রযত্নস্যাভিব্যক্তিং প্রত্যহেতুত্বং। কস্মাদভিব্যক্তিং প্রতি হেতুত্বং ন ভবতীত্যত আহ অনুপলব্ধিকারণস্যাবরণাদেরুপপত্তেরভিব্যক্তিহেতুত্বং স্যাৎ, এবস্তু নাস্তীতি ব্যতিরেকপরং দ্রষ্টব্যং। "সতি কার্য্যান্যত্বে" ইতি ভাষ্যং সূত্রবদ্‌যোজনীয়ং। "যত্র প্রযত্নানন্তর"মিত্যত্র 'যত্রতত্রয়ো'র্ব্যত্যাসঃ। তত্র প্রযত্নানন্তরমভিব্যক্তির্যত্রানুপলব্ধিকারণং ব্যবধানমুপপদ্যতে। কস্মাদনুপলব্ধিকারণোপপত্তেঃ প্রযত্নাভিব্যঙ্গ্যত্বমিত্যত আহ "ব্যবধানাপোহাচ্চে"তি। চো হেত্বর্থে। প্রযত্নানন্তরভাবিন ইতি বিষয়েণ বিষয়িণমুপলক্ষয়তি" ইত্যাদি। —তাৎপর্য্যটীকা।

অর্থাৎ সেই বিষয়ে প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি হয়, যে বিষয়ে অনুপলব্ধিপ্রয়োজক আবরণ থাকে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের ঐরূপই তাৎপর্য্য হইলে তিনি প্রথমে "তত্র" না বলিয়া "যত্র" বলিবেন কেন ? এবং তাঁহার উক্ত সন্দর্ভের ঐরূপ ব্যাখ্যার এখানে প্রয়োজনই বা কি ? ইহা সুধীগণ বিচার করিবেন। পরন্তু ভাষ্যকার তাৎপর্য্যটীকাকারের ন্যায় সূত্রোক্ত হেতুবাক্যের পরে উক্ত বাক্যের অধ্যাহার না করায় সূত্রার্থ ব্যাখ্যায় তাঁহারও যে উক্তরূপই তাৎপর্য্য, ইহা কিরূপে বুঝিব, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যায় "শব্দস্যাভিব্যক্তৌ" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়াছেন। মহর্ষির বক্তব্যানুসারে উহা তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। কারণ, শব্দের আবরণ না থাকায় শব্দের অভিব্যক্তিতে বক্তার প্রযত্নের হেতুত্ব নাই, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সূত্রে মহর্ষির নিষেধ্য যে প্রযত্ন হেতুত্ব, তাহা অনুপলব্ধিপ্রয়োজক আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত, ইহাই মহর্ষি পরে ঐ হেতুবাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, প্রযোজকের অভাববশতঃই প্রযোজ্য প্রযত্ন-হেতুত্বের অভাব সমর্থন করিয়াছেন। সূত্রে অনেক স্থলে ঐরূপ একদেশান্বয়ও সূত্রকারের অভিপ্রেত থাকে। সুতরাং ভাষ্যকার সূত্রোক্ত হেতুবাক্যের পরে উহার সংগতির জন্য অন্য কোন বাক্যের অধ্যাহার করেন নাই। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সূত্রপাঠ অসংগত বুঝিয়া 'অনুপলব্ধিকারণানুপপত্তেঃ' এইরূপই সূত্রপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত পাঠে উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের অনুপলব্ধিপ্রয়োজক আবরণাদির অনুপপত্তি অর্থাৎ অসত্তাবশতঃ শব্দের অভিব্যক্তিতে বক্তার প্রযত্নের হেতুত্ব নাই, এইরূপে সরল ভাবেই মহর্ষির বক্তব্য ব্যক্ত হওয়ায় সরল ভাবেই সূত্রার্থ সংগত হয়। কিন্তু আর কেহই ঐরূপ সূত্রপাঠ গ্রহণ করেন নাই। "অনুপলব্ধিকারণোপপত্তেঃ" এইরূপ সূত্রপাঠই ভাষ্যকার প্রভৃতির পরিগৃহীত।

ফলকথা, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা শব্দের অভিব্যক্তি পক্ষের খণ্ডন দ্বারা উৎপত্তি পক্ষের সমর্থন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত হেতু "প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব" যে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি,— অভিব্যক্তি নহে, এবং ঐ হেতু বাদীর গৃহীত সাধ্যধর্ম্মী শব্দে সিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্ভাবিত স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যভিচার দোষ খণ্ডিত হইয়াছে। কারণ, শব্দে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তিমত্ত্বরূপ হেতু সিদ্ধ হওয়ায় উহাতে স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ নাই। প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি বাদীর অভিমত হেতুই নহে, সুতরাং ব্যভিচারদোষের আপত্তিরও কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, বাদী যাহা হেতু বলেন নাই, তাহাকেই বাদীর হেতু বলিয়া আরোপ করিয়া তাহাতে বাদীর সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাদীর অভিমত হেতু দুষ্ট হয় না। পরন্তু প্রতিবাদী যদি ঐরূপ আরোপ করিয়াই ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি যে, পরে বাদীর হেতুর অসাধকত্ব সাধন করিতে হেতু বলিবেন, তাহাতেও ঐরূপ আরোপ করিয়া ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শন করা যাইবে। সুতরাং তাঁহার নিজের সেই হেতুরও দুষ্টত্ব সিদ্ধ হইলে তিনি আর তদ্দ্বারা বাদীর হেতুর অসাধকত্ব সাধন করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার ঐ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা সদুত্তর হইতেই পারে না। উহা জাত্যুত্তর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। পূর্ব্ববৎ স্বব্যাঘাতকত্বই এই "কার্য্যসমা" জাতির সাধারণ দুষ্টত্বমূল।

মহর্ষির শেষোক্ত এই "কার্য্যসমা" জাতি আকৃতিগণ, এই মতেও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও প্রকৃতার্থ-ব্যাখ্যা বলিয়া বুঝা যায় না। তবে গৌতমোক্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতির আন্তর্গণিক ভেদ যে বহু প্রকারে সম্ভব হয় অর্থাৎ উহা অনন্ত প্রকার, ইহা উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণও বলিয়াছেন। সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও "সাধর্ম্ম্যসমা" প্রভৃতি জাতির প্রকার-ভেদ যে, অতি বহু, ইহা বলিয়া গিয়াছেন[১]। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য গৌতমের সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াই ঐ সমস্ত জাতির বহু প্রকার ভেদ ও তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় যে জগতের মিথ্যাত্ব সমর্থন করিয়াছেন, তাহার খণ্ডন করিতে মাধ্ব সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, ঐ মিথ্যাত্ব কি মিথ্যা অথবা সত্য? জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে জগতের সত্যত্বই স্বীকার করিতে হয়। আর ঐ মিথ্যাত্ব সত্য হইলে ব্রহ্ম ও মিথ্যাত্ব, এই সত্যদ্বয়-স্বীকারে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হয়। এতদুত্তরে উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারেই অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় মাধ্ব সম্প্রদায়ের ঐ উত্তরকে "নিত্যসমা" জাতি বলিয়াছিলেন। তদুত্তরে মাধ্ব সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের ঐ উত্তর জাত্যুত্তর নহে। কারণ, জাত্যুত্তরের যে সমস্ত দুষ্টত্বমূল, তাহা কিছুই উহাতে নাই। "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" মাধ্বমতের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্য মাধ্ব সম্প্রদায়ের ঐ কথাও বলিয়াছেন। মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য মহানৈয়ায়িক ব্যাসতীর্থ "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থে নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। পরে অদ্বৈতবাদী মহানৈয়ায়িক মধুসূদন সরস্বতী "অদ্বৈতসিদ্ধি" গ্রন্থে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থ বুঝিতে হইলে গৌতমোক্ত "জাতি"-তত্ত্বও সম্যক্ বুঝা আবশ্যক। প্রাচীন কাল হইতেই সমস্ত সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণই এবং প্রাচীন আলঙ্কারিকগণও অত্যাবশ্যকবশতঃ পূর্ব্বোক্ত "জাতি"তত্ত্বের বিশেষ চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য উক্ত বিষয়ে নানা মত ভেদও হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সমস্ত মত ও উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। অতঃপর "কথাভাসে"র কথা বলিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

কার্য্যসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৬॥

ভাষ্য। হেতোশ্চেদনৈকান্তিকত্বমুপপাদ্যতে, অনৈকান্তিকত্বাদসাধকঃ স্যাদিতি। যদি চানৈকান্তিকত্বাদসাধকং[২]—

অনুবাদ। যদি হেতুর অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুর অনৈকান্তিকত্ব

১। জাতয়ো দূষণাভাসাস্তাঃ সাধর্ম্ম্যসমাদয়ঃ।
তাসাং প্রপঞ্চো বহুধা ভূয়স্ত্বাদিহ নোদিতঃ ॥—
ভামহপ্রণীত কাব্যালঙ্কার, ৫ম পঃ, ২৯শ।

২। তদেতৎ সূত্রাবতারপরং ভাষ্যং—"হেতোশ্চেদনৈকান্তিকত্বমুপপাদ্যতে" প্রতিবাদিনা—"অনৈকান্তিকত্বাদসাধকঃ স্যাদিতি। যদি চানৈকান্তিকত্বাদসাধকং" বাদিনো বচনং "প্রতিষেধেহপি সমানো দোষঃ" ইত্যাদি তাৎপর্য্যটীকা।

(ব্যভিচারিত্ব) উপপাদন করেন, অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অসাধক হয়। কিন্তু যদি অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত (বাদীর বাক্য) অসাধক হয়, (তাহা হইলে)—

সূত্র। প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ ॥৩৭॥৫০০॥

অনুবাদ। প্রতিষেধেও (প্রতিষেধক ব্যাক্যেও) দোষ সমান, অর্থাৎ প্রতিবাদীর জাত্যুত্তররূপ প্রতিষেধবাক্যও অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অসাধক হয়।

ভাষ্য। প্রতিষেধোঽপ্যনৈকান্তিকঃ, কিঞ্চিৎ প্রতিষেধতি কিঞ্চিন্নেতি। অনৈকান্তিকত্বাদসাধক ইতি। অথবা শব্দস্যানিত্যত্বপক্ষে প্রযত্নানন্তরমুৎপাদো নাভিব্যক্তিরিতি বিশেষহেত্বভাবঃ। নিত্যত্বপক্ষেঽপি প্রযত্নানন্তরমভিব্যক্তির্নোৎপাদ ইতি বিশেষহেত্বভাবঃ। সোঽয়মুভয়পক্ষসমো বিশেষহেত্বভাব ইত্যুভয়মপ্যনৈকান্তিকমিতি।

অনুবাদ। "প্রতিষেধ"ও অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যও অনৈকান্তিক। (কারণ) কিছু প্রতিষেধ করে, কিছু প্রতিষেধ করে না। অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অসাধক। [অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যও বাদীর কথিত হেতু বা বাক্যের অসাধকত্ব সাধন করিতে পারে না। কারণ, ঐ বাক্য নিজের স্বরূপের প্রতিষেধ না করায় সমস্ত পদার্থেরই প্রতিষেধক নহে। অতএব প্রতিষেধের পক্ষে উহা ঐকান্তিক হেতু নহে, উহা অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী।]

অথবা শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি, অভিব্যক্তি নহে, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। নিত্যত্ব পক্ষেও প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি, উৎপত্তি নহে, এ বিষয়েও বিশেষ হেতু নাই। সেই এই বিশেষ হেতুর অভাব উভয় পক্ষে তুল্য, এ জন্য উভয়ই অর্থাৎ বাদীর বাক্যের ন্যায় প্রতিবাদীর বাক্যও অনৈকান্তিক।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার উদ্দিষ্ট চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতির নিরূপণ করিয়া, পরে এই সূত্র হইতে ৫ সূত্রের দ্বারা "কথাভাস" প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই শেষোক্ত এই প্রকরণের নাম "কথাভাস"-প্রকরণ। বাদী ও প্রতিবাদীর ন্যায়ানুগত যে সমস্ত বিচারবাক্য তত্ত্ব-নির্ণয় অথবা একতরের জয়লাভের যোগ্য, তাহার নাম "কথা"। উহা "বাদ", "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামে ত্রিবিধ (প্রথম খণ্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারবাক্যের দ্বারা কোন তত্ত্ব নির্ণয়ও হয় না, একতরের জয়লাভও হয় না, হইতেই পারে না, সেই স্থলে তাঁহাদিগের ঐ বিচারবাক্য "কথা" নহে, তাহাকে বলে "কথাভাস"। এই কথাভাসে বাদীর প্রথমোক্ত বাক্য হইতে ছয়টী পক্ষ হইতে পারে। এ জন্য, ইহার অপর নাম "ষট্‌পক্ষী"।

"ষণ্ণাং পক্ষাণাং সমাহারঃ" এই বিগ্রহবাক্যানুসারে "ষট্পক্ষী" শব্দের অর্থ ষট্পক্ষের সমাহার। কিরূপ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর "ষট্পক্ষী"রূপ "কথাভাস" হয়, ইহা প্রদর্শন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বাদীর বক্তব্য তৃতীয় পক্ষটী প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী প্রথমে নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার জাত্যুত্তর করেন, তাহা হইলে বাদী তখন সদুত্তরের দ্বারাই তাহার খণ্ডন করিবেন। তাহা হইলে তাঁহার জয়লাভ হইবে, তত্ত্বনির্ণয়ও হইতে পারে। কিন্তু বাদীও যদি সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া প্রতিবাদীর ন্যায় জাত্যুত্তরই করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ফলদ্বয়ের মধ্যে কোন ফলই হইবে না। পরন্তু ঐরূপ স্থলে মধ্যস্থগণের বিচারে প্রতিবাদীর ন্যায় বাদীও নিগৃহীত হইবেন। সুতরাং ঐরূপ ব্যর্থ ও নিগ্রহজনক বিচার একেবারেই অকর্ত্তব্য, ইহা উপদেশ করিবার জন্যই মহর্ষি গোতম শিষ্যগণের হিতার্থ পরে এখানে পূর্ব্বোক্ত "কথাভাস" বা "ষট্পক্ষী" প্রদর্শন করিয়াছেন[১]।

প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে বাদী কিরূপে জাত্যুত্তর করিতে পারেন? অর্থাৎ বাদী কিরূপ উত্তর করিলে তাঁহার জাত্যুত্তর হইবে? মহর্ষি ইহাই ব্যক্ত করিতে সূত্র বলিয়াছেন, "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ।" অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীকে যদি বলেন যে, তোমার প্রতিষেধক বাক্যেও অনৈকান্তিকত্বদোষ তুল্য, তাহা হইলে বাদীর ঐ উত্তর জাত্যুত্তর হইবে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "কার্য্যসমা" জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদীর জাত্যুত্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তিই বাদীর হেতু বলিয়া সমর্থন করিয়া, তাহাতে অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যভিচারিত্ব দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে সেখানে বাদী মহর্ষির পূর্ব্বসূত্রোক্ত সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া যদি বলেন যে, "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ"—তাহা হইলে উহা বাদীর জাত্যুত্তর হইবে। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুর অনৈকান্তিকত্ব উপপাদন করেন, তাহা হইলে অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত উহা অসাধক হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদীর হেতু অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচারী হওয়ায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হয় না, সুতরাং বাদীর নিজ পক্ষস্থাপক বাক্যও সেই বাক্যার্থের ব্যভিচারী হওয়ায় উহাও তাঁহার নিজ পক্ষের সাধক হয় না, ইহাই উক্ত স্থলে জাত্যুত্তরবাদী প্রতিবাদীর কথা, উহাই তাহার প্রতিষেধক বাক্য এবং উহাই উক্ত বিচারে দ্বিতীয় পক্ষ। বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারবাক্যই এখানে "পক্ষ" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় পক্ষ প্রকাশ করিয়া, পরে উক্ত স্থলে বাদীর জাত্যুত্তররূপ তৃতীয় পক্ষের প্রকাশ করিতে "যদি অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত বাদীর নিজপক্ষস্থাপক বাক্য অসাধক

১। সদুত্তরেণ জাতীনামুদ্ধারে তত্ত্ব-নির্ণয়ঃ। জয়েতরব্যবস্থেতি সিধ্যেদেতৎ ফলদ্বয়ং।
পণ্ডসম্ভোগতুল্যাঃ স্যুরন্যথা নিষ্ফলাঃ কথাঃ। ইতি দর্শয়িতুং সূত্রৈঃ ষট্পক্ষীমাহ গোতমঃ।
অসদুত্তররূপা সা দ্রষ্টব্যা পরিশিষ্টতঃ ॥—তার্কিকরক্ষা।

হয়”—এই কথা বলিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রতিবাদীকে বলিতে পারেন যে, অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত আমার বাক্য অসাধক হইলে তোমার পূর্ব্বোক্ত যে প্রতিষেধ অর্থাৎ প্রতিষেধক বাক্য, তাহাও অসাধক। কারণ, উহাও ত অনৈকান্তিক। প্রতিবাদী যে বাক্যের দ্বারা বাদীর বাক্যের সাধকত্বের প্রতিষেধ অর্থাৎ অভাবের সমর্থন করেন,' এই অর্থে সূত্রে “প্রতিষেধ” শব্দের অর্থ প্রতিবাদীর সেই প্রতিষেধক বাক্য। প্রতিবাদী উহাকে অনৈকান্তিক বলিবেন কিরূপে? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কিছু প্রতিষেধ করে, কিছু প্রতিষেধ করে না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক বাক্য বাদীর হেতুর বা বাক্যের সাধকত্বের প্রতিষেধ করিলেও নিজের স্বরূপের প্রতিষেধ করে না, ইহা প্রতিবাদীরও অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং বাদী তাঁহাকে বলিতে পারেন যে, তোমার ঐ বাক্য যখন নিজের স্বরূপের প্রতিষেধক নহে, তখন উহা প্রতিষেধমাত্রের সাধক না হওয়ায় সামান্যতঃ প্রতিষেধের পক্ষে উহা অনৈকান্তিক। উহা যদি সমস্ত পদার্থেরই প্রতিষেধক হইত, তাহা হইলে অবশ্য উহা প্রতিষেধ-সাধনে ঐকান্তিক হেতু হইত। কিন্তু তাহা না হওয়ায় উহাও অনৈকান্তিক, সুতরাং উহা বস্তুতঃ প্রতিষেধক বাক্যই নহে। অতএব উহা আমার হেতু বা বাক্যেরও সাধকত্বের প্রতিষেধ করিতে পারে না। ভাষ্যকার পরে প্রকারান্তরে প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যের অনৈকান্তিকত্ব প্রদর্শন করিতে অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অথবা শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে যেমন বিশেষ হেতু নাই, তদ্রূপ নিত্যত্ব পক্ষেও প্রযত্নের অনন্তর শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না, এ বিষয়েও বিশেষ হেতু নাই। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী পূর্ব্বোক্ত “প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব” হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বলেন যে, প্রযত্নের অনন্তর শব্দের যে উৎপত্তি হয়, অভিব্যক্তি হয় না, ইহা অসিদ্ধ। কারণ, কোন বিশেষ হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ করা হয় নাই। উহার সাধক কোন বিশেষ হেতুও নাই। সুতরাং তুল্যভাবে বাদীও পরে বলিতে পারেন যে, তোমার অভিমত যে শব্দের নিত্যত্বপক্ষ, তাহাতে ত প্রযত্নের অনন্তর শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না, এ বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু নাই। কোন বিশেষ হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ করা হয় নাই। অতএব বিশেষ হেতুর অভাব উভয় পক্ষেই তুল্য। সুতরাং আমার বাক্য অনৈকান্তিক হইলে তোমার বাক্যও অনৈকান্তিক হইবে। কারণ, তোমার প্রতিষেধক বাক্যও প্রযত্নের অনন্তর শব্দের অভিব্যক্তি পক্ষেরই সাধন করিতে পারে না। কারণ, শব্দের উৎপত্তি পক্ষেও প্রযত্নের সাফল্য উপপন্ন হয়। শব্দের উৎপত্তি সাধনে আমি যেমন কোন বিশেষ হেতু বলি নাই, তদ্রূপ তুমিও শব্দের অভিব্যক্তি-সাধনে কোন বিশেষ হেতু বল নাই। সুতরাং তোমার কথিত যুক্তি অনুসারে আমার বাক্য ও তোমার বাক্য, এই উভয়ই অনৈকান্তিক, ইহা তোমার অবশ্য স্বীকার্য্য। ভাষ্যকারের চরম ব্যাখ্যায় মহর্ষির এই সূত্রের উক্তরূপই তাৎপর্য্য। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উত্তরের ন্যায় বাদীর উক্তরূপ উত্তরও জাত্যুত্তর ॥৩৭॥

সূত্র। সর্ব্বত্রৈবং ॥৪০॥৫০১॥

অনুবাদ। সর্ব্বত্র অর্থাৎ "সাধর্ম্ম্যসমা" প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জাতি স্থলেই এইরূপ অর্থাৎ বাদীর পূর্ব্বোক্ত উত্তরের তুল্য অসদুত্তর সম্ভব হয়।

ভাষ্য। সর্ব্বেষু "সাধর্ম্ম্যসম"প্রভৃতিষু প্রতিষেধহেতুষু যত্রাবিশেষো দৃশ্যতে তত্রোভয়োঃ পক্ষয়োঃ সমঃ প্রসজ্যত ইতি।

অনুবাদ। "সাধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষেধহেতুতে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার জাত্যুত্তর স্থলেই যে বিষয়ে অবিশেষ দৃষ্ট হয়, সেই বিষয়ে উভয় পক্ষে তুল্য অবিশেষ প্রসক্ত হয় অর্থাৎ বাদী যে অবিশেষ দেখেন, সেই অবিশেষেরই তুল্যভাবে আপত্তি প্রকাশ করেন।

টিপ্পনী। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেবল কি পূর্ব্বোক্ত "কার্য্যসমা" জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদী উক্তরূপে জাত্যুত্তর করিলে "কথাভাস" হয়? অন্য কোন জাতির প্রয়োগস্থলে উহা হয় না? তাই মহর্ষি পরে এখানেই এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদী পূর্ব্ববৎ কোন প্রকার জাত্যুত্তর করিতে পারেন। সুতরাং সর্ব্বত্রই উক্তরূপে "কথাভাস" হয়। প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে বাদী যে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বোক্ত স্থলের ন্যায় প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যের অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন, ইহা মহর্ষির তাৎপর্য্য নহে। কারণ, সর্ব্বত্র উহা সম্ভব হয় না। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "এবং" শব্দের অভিমতার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যে বিষয়ে অবিশেষ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে বাদী সেখানে যে বিষয়ে যে অবিশেষ বুঝেন, সেখানে সেই অবিশেষেরই তুল্যভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া জাত্যুত্তর করেন। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বাক্যে নিজবাক্যের সহিত অনৈকান্তিকত্বরূপ অবিশেষ বুঝিয়াই তুল্যভাবে উহারই আপত্তি প্রকাশ করেন। এইরূপ অন্য জাতির প্রয়োগস্থলে অন্যরূপ অবিশেষের আপত্তি প্রকাশ করেন। ফলকথা, প্রতিবাদীর জাত্যুত্তরের পরে বাদীও জাত্যুত্তর করিলে সর্ব্বত্রই কথাভাস হয়, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য। যেমন কোন বাদী "শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাদ্‌ঘটবৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, যদি ঘটের সাধর্ম্ম্য কার্য্যত্বপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্বপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য হউক? উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐ উত্তর জাত্যুত্তর, উহার নাম "সাধর্ম্ম্যসমা" জাতি। মহর্ষি গোতম পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় সূত্রের দ্বারা উক্ত জাতির যে সদুত্তর বলিয়াছেন, তদ্দ্বারাই উহার খণ্ডন করা বাদীর কর্ত্তব্য। কিন্তু বাদীর ঐ সদুত্তরের স্ফূর্ত্তি না হইলে তিনি যদি পরাজয়-ভয়ে নীরব না থাকিয়া বলেন যে, শব্দ যদি আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্বপ্রযুক্ত নিত্য হয়, তাহা হইলে শব্দ আকাশের ন্যায় বিভুও হউক? উক্ত স্থলে বাদীর ঐ উত্তরও জাত্যুত্তর। উক্ত স্থলে বাদী শব্দে

অবিদ্যমান ধর্ম্ম বিভুত্বের আপত্তি প্রকাশ করায় তাঁহার ঐ উত্তরের নাম "উৎকর্ষসমা" জাতি। সুতরাং উক্ত স্থলেও "কথাভাস" হইবে। এইরূপ উক্ত স্থলে এবং অন্যান্য স্থলে বাদী আরও অনেক প্রকার জাত্যুত্তর করিতে পারেন এবং পূর্ব্ববৎ ষট্‌পক্ষীও হইতে পারে। সুতরাং সেই সমস্ত স্থলেও "কথাভাস" হইবে। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ ইহার অন্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ত "ষট্‌পক্ষী"রূপ কথাভাস প্রদর্শন করিয়া, তাহার পরেই তাঁহার বলা উচিত। তিনি "ষট্‌পক্ষী" প্রদর্শন করিতে তৃতীয় পক্ষ প্রকাশ করিয়াই মধ্যে এই সূত্রটি বলিয়াছেন কেন ? এতদুত্তরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, "ত্রিপক্ষী" প্রভৃতি সূচনা করিবার জন্যই মহর্ষি এখানেই এই সূত্রটী বলিয়াছেন। অর্থাৎ কোন স্থলে তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ বাদীর পুর্ব্বোক্তরূপ জাত্যুত্তরের পরে প্রতিবাদী আর কোন উত্তর করিতে অসমর্থ হইলে সেখানেই বিচারের সমাপ্তি হইবে। তাহা হইলে সেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর ঐ পর্য্যন্ত বিচারবাক্যও "কথাভাস" হইবে, উহার নাম "ত্রিপক্ষী"। আর যদি প্রতিবাদী ঐ স্থলে আবার পূর্ব্ববৎ কোন জাত্যুত্তর করেন এবং বাদী তাহার কোন প্রকার উত্তর করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে সেখানেই ঐ বিচারের সমাপ্তি হওয়ায় ঐ পর্য্যন্ত বিচার বাক্যও "কথাভাস" হইবে, উহার নাম "চতুষ্পক্ষী"। এইরূপে বাদীর বাক্য হইতে ক্রমশঃ ষট্‌পক্ষ পর্য্যন্ত হইতে পারে। তাই মহর্ষি পরে ক্রমশঃ চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পক্ষের প্রকাশ করিয়া "ষট্‌পক্ষী" প্রদর্শন করিয়াছেন। ষষ্ঠ পক্ষের পরে মধ্যস্থগণ আর ঐরূপ ব্যর্থ বিচার শ্রবণ করেন না। তাঁহারা তখন নিজের উদ্‌ভাব্য নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিয়া বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই পরাজয় ঘোষণা করেন। সেখানেই ঐ কথাভাসের সমাপ্তি হয়। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥৪০॥

সূত্র। প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধ-দোষবদ্দোষঃ ॥৪১॥৫০২॥

অনুবাদ। প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত দ্বিতীয় পক্ষরূপ "প্রতিষেধে"র সম্বন্ধে বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ যে প্রতিষেধ, তাহাতেও প্রতিষেধের দোষের ন্যায় দোষ। (অর্থাৎ বাদীর ঐ তৃতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক বাক্যও অনৈকান্তিক। প্রতিবাদী পুনর্ব্বার এইরূপ উত্তর করিলে উহা উক্ত স্থলে চতুর্থ পক্ষ)।

ভাষ্য। যোঽয়ং প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষোঽনৈকান্তিকত্ব-মাপাদ্যতে সোঽয়ং প্রতিষেধস্য প্রতিষেধেঽপি সমানঃ।

তত্রানিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদিতি সাধনবাদিনঃ স্থাপনা

প্রথমঃ পক্ষঃ। **প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ কার্য্যসম** ইতি দূষণবাদিনঃ প্রতিষেধহেতুনা দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। স চ **প্রতিষেধ** ইত্যুচ্যতে। তস্যাস্য **প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষ** ইতি তৃতীয়ঃ পক্ষো **বিপ্রতিষেধ** উচ্যতে। তস্মিন্ **প্রতিষেধবিপ্রতিষেধেঽপি সমানো দোষোঽ**-নৈকান্তিকত্বং চতুর্থঃ পক্ষঃ।

অনুবাদ। এই যে, "প্রতিষেধে"ও অর্থাৎ প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও সমান দোষ অনৈকান্তিকত্ব (বাদী কর্তৃক) আপাদিত হইতেছে, সেই এই দোষ প্রতিষেধের প্রতিষেধেও অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত প্রতিষেধক বাক্যের প্রতিষেধক বাদীর বাক্যেও সমান। অর্থাৎ বাদীর অভিমত যুক্তি অনুসারে তাঁহার নিজবাক্যও অনৈকান্তিক। সেই স্থলে অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ "কথাভাস" স্থলে (১) "অনিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সাধনবাদীর স্থাপনা অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক "অনিত্যঃ শব্দঃ" ইত্যাদি ন্যায়বাক্য প্রথম পক্ষ। (২) "প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ কার্য্যসমঃ" এই (৩৭শ) সূত্রোক্ত প্রতিষেধহেতুর দ্বারা ("কার্য্যসম" নামক জাত্যুত্তরের দ্বারা) দূষণবাদীর (প্রতিবাদীর) দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত জাত্যুত্তররূপ বাক্যই ঐ স্থলে দ্বিতীয় পক্ষ। তাহাই "প্রতিষেধ" ইহা কথিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত জাত্যুত্তরই এই সূত্রে "প্রতিষেধ" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। (৩) "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ" এই তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ঐ সূত্রোক্ত বাদীর প্রতিষেধক বাক্য, সেই ইহার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদীর বাক্যরূপ দ্বিতীয় পক্ষের "বিপ্রতিষেধ" উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই সূত্রে "বিপ্রতিষেধ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাদীর বাক্যরূপ তৃতীয় পক্ষ গৃহীত হইয়াছে। (৪) সেই প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধেও অর্থাৎ বাদীর ঐ বাক্যরূপ তৃতীয় পক্ষেও সমান দোষ অনৈকান্তিকত্ব, অর্থাৎ প্রতিবাদীর এইরূপ বাক্য চতুর্থ পক্ষ।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা বাদীর যে উত্তর কথিত হইয়াছে, তদুত্তরে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমার প্রতিষেধের যে বিপ্রতিষেধ আপনি বলিতেছেন, তাহাতেও ঐ প্রতিষেধের দোষের ন্যায় দোষ অর্থাৎ অনৈকান্তিকত্বদোষ। তাৎপর্য্য এই যে, আমার প্রতিষেধক বাক্য যেমন নিজের স্বরূপের প্রতিষেধক না হওয়ায় প্রতিষেধ-সাধনে উহা ঐকান্তিক নহে—অনৈকান্তিক, ইহা আপনি বলিয়াছেন, তাহা হইলে তদ্রূপ আপনার ঐ প্রতিষেধক বাক্যও নিজের স্বরূপের প্রতিষেধক না হওয়ায় প্রতিষেধ-সাধনে ঐকান্তিক নহে; সুতরাং অনৈকান্তিক, ইহাও স্বীকার্য্য। সুতরাং উক্ত বাক্যের দ্বারাও আপনি আমার বাক্যের সাধকত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। মহর্ষি এই সূত্রের

দ্বারা উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত "কথাভাস" স্থলে প্রতিবাদীর এই উত্তরই চতুর্থ পক্ষ। সূত্রে "প্রতিষেধ" শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত জাত্যুত্তররূপ দ্বিতীয় পক্ষ গৃহীত হইয়াছে। পরে "বিপ্রতিষেধ" শব্দের দ্বারা বাদীর পূর্ব্বোক্ত জাত্যুত্তররূপ তৃতীয় পক্ষ গৃহীত হইয়াছে। প্রতিবাদী তাহাতেও প্রতিষেধের দোষের ন্যায় দোষ অর্থাৎ অনৈকান্তিকত্বদোষ, ইহা বলিলে তাঁহার ঐ উত্তর হইবে চতুর্থ পক্ষ। সর্ব্বাগ্রে বাদীর নিজ পক্ষস্থাপক "অনিত্যঃ শব্দঃ" ইত্যাদি ন্যায়বাক্য প্রথম পক্ষ। ভাষ্যকার পরে এখানে যথাক্রমে ঐ পক্ষচতুষ্টয় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন ॥৪১॥

সূত্র। প্রতিষেধং সদোষমভ্যুপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতি-ষেধে সমানো দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা ॥৪২॥৫০৩॥

অনুবাদ। প্রতিষেধকে সদোষ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ প্রতিবাদী তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত দ্বিতীয় পক্ষরূপ "প্রতিষেধ"কে বাদীর কথানুসারে অনৈকান্তিক বলিয়া স্বীকার করিয়াই প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে অর্থাৎ বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক বাক্যেও তুল্য দোষপ্রসঙ্গ "মতানুজ্ঞা।" (অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে নিজ পক্ষে অনৈকান্তিকত্ব দোষ স্বীকার করিয়া বাদীর পক্ষেও ঐ দোষের প্রসঞ্জন বা আপত্তি প্রকাশ করায় তাঁহার "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান হয়। উক্ত স্থলে পরে বাদীর এইরূপ উত্তর পঞ্চম পক্ষ)।

ভাষ্য। "প্রতিষেধং" দ্বিতীয়ং পক্ষং "সদোষমভ্যুপেত্য" তদুদ্ধার-মকৃত্বাঽনুজ্ঞায় "প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে" তৃতীয়পক্ষে সমানমনৈকান্তিকত্ব-মিতি সমানং দূষণং প্রসঞ্জয়তো দূষণবাদিনো মতানুজ্ঞা প্রসজ্যত ইতি পঞ্চমঃ পক্ষঃ।

অনুবাদ। প্রতিষেধকে (অর্থাৎ) দ্বিতীয় পক্ষকে সদোষ স্বীকার করিয়া (অর্থাৎ) তাহার উদ্ধার না করিয়া, মানিয়া লইয়া প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে (অর্থাৎ) তৃতীয় পক্ষে অনৈকান্তিকত্ব সমান, এইরূপে তুল্য দূষণপ্রসঞ্জনকারী অর্থাৎ বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষও অনৈকান্তিক, এইরূপ আপত্তিপ্রকাশকারী দূষণবাদীর (প্রতিবাদীর) "মতানুজ্ঞা" প্রসক্ত হয়, ইহা পঞ্চম পক্ষ।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা প্রতিবাদীর যে উত্তর (চতুর্থ পক্ষ) কথিত হইয়াছে, তদুত্তরে বাদীর যাহা বক্তব্য (পঞ্চম পক্ষ), তাহা এই সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সূত্রে "প্রতিষেধ" শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর জাত্যুত্তররূপ প্রতিষেধক বাক্য। "প্রতিষেধ-

বিপ্রতিষেধ" শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ" এই (৩৯শ) সূত্রোক্ত বাদীর উত্তরবাক্য। বাদী ঐ তৃতীয় পক্ষের দ্বারা প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক বাক্যে প্রতিবাদীর ন্যায় যে অনৈকান্তিকত্বদোষ বলিয়াছেন, প্রতিবাদী উহার খণ্ডন না করিয়া অর্থাৎ স্বীকার করিয়াই বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ উত্তরবাক্যেও তুল্যভাবে ঐ দোষেরই আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হওয়ায় তিনি নিগৃহীত হইয়াছেন, ইহাই ঐ স্থলে বাদীর বক্তব্য পঞ্চম পক্ষ। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় আহ্নিকে "স্বপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা" এই (২০শ) সূত্রের দ্বারা মহর্ষি "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থানের উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। তদনুসারেই এখানে মহর্ষি বাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর (পঞ্চম পক্ষ) প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে বাদী মধ্যস্থগণের নিকটে বলিবেন যে, আমি প্রতিবাদীর পক্ষেও যে অনৈকান্তিকত্ব দোষ বলিয়াছি, তাহা তিনি খণ্ডন করেন নাই। তিনি ঐ দোষ খণ্ডনে সমর্থ হইলে অবশ্যই তাহা করিতেন। সুতরাং তিনি যে তাঁহার পক্ষেও ঐ দোষ স্বীকার করিয়াই তুল্যভাবে আমার পক্ষেও ঐ দোষ বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার স্বীকার্য্য। সুতরাং তাঁহার পক্ষে "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহ-স্থান প্রসক্ত হওয়ায় তাঁহার নিগ্রহ স্বীকার্য্য। জয়ন্ত ভট্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি অপরকে চোর বলিলে, সেই অপর ব্যক্তি যে চোর নহেন, ইহাই তাঁহার প্রতি-পন্ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইয়া যদি সেই ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমিও চোর, তাহা হইলে তাঁহার নিজের চৌরত্ব স্বীকৃতই হয়। সুতরাং সে স্থলে তিনি অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী তাঁহার নিজ পক্ষে বাদীর কথিত দোষ খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া, উহা মানিয়া লইয়াই বাদীর পক্ষেও তুল্যভাবে ঐ দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় তিনি নিগৃহীত হইবেন। তাঁহার পক্ষে ঐ নিগ্রহস্থানের নাম "মতানুজ্ঞা" ইহা মনে রাখিতে হইবে ॥৪২॥

সূত্র। স্বপক্ষ-লক্ষণাপেক্ষোপপত্ত্যুপসংহারে হেতু-নির্দ্দেশে পরপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ সমানো দোষঃ ॥ ॥৪৩॥৫০৪॥

অনুবাদ। "স্বপক্ষলক্ষণে"র অর্থাৎ বাদীর প্রথম কথিত নিজপক্ষ হইতে উত্থিত দোষের (প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষোক্ত দোষের) "অপেক্ষা"প্রযুক্ত অর্থাৎ সেই দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া, "উপপত্তি"প্রযুক্ত "উপসংহার" করিলে অর্থাৎ "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ" এই কথা বলিয়া বাদী প্রতিবাদীর পক্ষেও উপপদ্যমান দোষ প্রদর্শন করিলে এবং হেতুর নির্দ্দেশ করিলে অর্থাৎ উক্ত উপসংহারে অনৈকান্তিকত্ব হেতু বলিলে পরপক্ষের দোষের স্বীকারবশতঃ

অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীর পক্ষে যে দোষ বলিয়াছেন, নিজ পক্ষেও তাহা স্বীকার করায় সমান দোষ। (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বাদীর পক্ষেও "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হয়। প্রতিবাদীর এই উত্তর উক্ত স্থলে ষষ্ঠ পক্ষ)।

ভাষ্য। স্থাপনাপক্ষে **প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাদিতি** দোষঃ স্থাপনা-হেতুবাদিনঃ **স্বপক্ষলক্ষণো** ভবতি। কস্মাৎ? স্বপক্ষসমুত্থত্বাৎ। সোঽয়ং স্বপক্ষলক্ষণং দোষ**মপেক্ষমাণো**ঽনুদ্ধৃত্যানুজ্ঞায় **প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষ** ইত্যুপপদ্যমানং দোষং পরপক্ষে **উপসংহরতি**। ইত্থঞ্চানৈকান্তিকঃ প্রতিষেধ ইতি **হেতুং নির্দ্দিশতি**। তত্র স্বপক্ষলক্ষণাপেক্ষয়োপপদ্যমানদোষো**পসংহারে হেতুনির্দ্দেশে** চ সত্যনেন **পরপক্ষদোষোঽভ্যুপগতো ভবতি**। কথং কৃত্বা? যঃ পরেণ **প্রযত্নকার্য্যানে**কত্বাদিত্যাদিনাঽনৈকান্তিক-দোষ উক্তস্তমনুদ্ধৃত্য **প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষ** ইত্যাহ। এবং স্থাপনাং সদোষামভ্যুপেত্য প্রতিষেধেঽপি সমানং দোষং প্রসঞ্জয়তঃ পরপক্ষাভ্যুপগমাৎ **সমানো দোষো ভবতি**। যথাপরস্য প্রতিষেধং সদোষমভ্যুপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতিষেধেঽপি **সমানো দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা** প্রসজ্যত ইতি তথাঽস্যাপি স্থাপনাং সদোষামভ্যুপেত্য প্রতিষেধেঽপি সমানং দোষং প্রসঞ্জয়তো মতানুজ্ঞা প্রসজ্যত ইতি। স খল্বয়ং **ষষ্ঠঃ পক্ষঃ**।

তত্র খলু স্থাপনাহেতুবাদিনঃ প্রথম-তৃতীয়-পঞ্চম-পক্ষাঃ। প্রতিষেধ-হেতুবাদিনো দ্বিতীয়-চতুর্থ-ষষ্ঠ-পক্ষাঃ। তেষাং সাধ্বসাধুতায়াং মীমাংস্য-মানায়াং চতুর্থষষ্ঠয়োরর্থাবিশেষাৎ পুনরুক্তদোষপ্রসঙ্গঃ। চতুর্থপক্ষে সমান-দোষত্বং পরস্যোচ্যতে **প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদোষবদ্দোষ** ইতি। ষষ্ঠেঽপি **পরপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ সমানো দোষ** ইতি সমানদোষত্বমেবোচ্যতে, নার্থবিশেষঃ কশ্চিদস্তি। সমান-তৃতীয়পঞ্চমযোঃ পুনরুক্তদোষপ্রসঙ্গঃ। তৃতীয়পক্ষেঽপি **প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষ** ইতি সমানত্বমভ্যুপগম্যতে। পঞ্চমপক্ষেঽপি

প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে সমানো দোষপ্রসঙ্গোঽভ্যুপগম্যতে। নার্থবিশেষঃ কশ্চিদুচ্যত ইতি। তত্র পঞ্চমষষ্ঠপক্ষয়োরর্থাবিশেষাৎ পুনরুক্তদোষপ্রসঙ্গঃ। তৃতীয়-চতুর্থয়োর্মতানুজ্ঞা। প্রথমদ্বিতীয়য়োর্ব্বিশেষ-হেত্বভাব ইতি ষট্পক্ষ্যামুভয়োরসিদ্ধিঃ।

কদা ষট্পক্ষী ? যদা **প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষ** ইত্যেবং প্রবর্ত্ততে। তদোভয়োঃ পক্ষয়োরসিদ্ধিঃ। যদা তু **কার্য্যান্যত্বে প্রযত্না-হেতুত্বমনুপলব্ধিকারণোপপত্তে**রিত্যনেন তৃতীয়পক্ষো যুজ্যতে, তদা বিশেষহেতুবচনাৎ প্রযত্নানন্তরমাত্মলাভঃ শব্দস্য নাভিব্যক্তিরিতি সিদ্ধঃ প্রথমপক্ষো ন ষট্পক্ষী প্রবর্ত্তত ইতি।

ইতি শ্রীবাৎস্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে পঞ্চমাধ্যায়স্যাদ্যমাহ্নিকম্ ॥

অনুবাদ। "স্থাপনাপক্ষে" (বাদীর কথিত প্রথম পক্ষে) "প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রোক্ত দোষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষ, স্থাপনার হেতুবাদীর (প্রথমে নিজপক্ষস্থাপনকারী বাদীর) "স্বপক্ষলক্ষণ" হয়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যে হেতু স্বপক্ষ হইতে সমুত্থিত হয়। (অর্থাৎ বাদী পক্ষ স্থাপন করিলেই প্রতিবাদী বাদীর ঐ স্বপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় ঐ স্বপক্ষ হইতেই উক্ত দোষের উত্থিতি হয়। সুতরাং ঐ তাৎপর্য্যে সূত্রে "স্বপক্ষলক্ষণ" শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর কথিত ঐ দোষই গৃহীত হইয়াছে)। সেই এই বাদী "স্বপক্ষলক্ষণ" দোষকে অপেক্ষা করতঃ (অর্থাৎ) উদ্ধার না করিয়া স্বীকার করিয়া "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ" এই বাক্যের দ্বারা উপপদ্যমান দোষকে পরপক্ষে অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে উপসংহার করিতেছেন। এইরূপই প্রতিষেধ অর্থাৎ প্রতিষেধক বাক্য অনৈকান্তিক, এই হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন। "স্বপক্ষলক্ষণে"র অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত পূর্ব্বোক্ত দোষের অপেক্ষা (স্বীকার)প্রযুক্ত সেই উপ-পদ্যমান দোষের উপসংহার এবং হেতুর নির্দ্দেশ হইলে এই বাদী কর্তৃক পরপক্ষের দোষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে তাঁহার নিজের কথিত দোষ স্বীকৃত হয়। (প্রশ্ন) কেমন করিয়া ? (উত্তর) পরকর্ত্তৃক অর্থাৎ প্রতিবাদী কর্তৃক "প্রযত্নকার্য্যা-নেকত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যে অনৈকান্তিকত্বদোষ উক্ত হইয়াছে, সেই দোষকে উদ্ধার না করিয়া (বাদী) "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ" ইহা বলিয়াছেন। এইরূপ

হইলে স্থাপনাকে অর্থাৎ নিজ পক্ষস্থাপক বাক্যকে সদোষ স্বীকার করিয়া প্রতিষেধেও অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যেও তুল্য দোষ-প্রসঞ্জনকারীর (বাদীর) পর-পক্ষ স্বীকারবশতঃ তুল্য দোষ হয়। (তাৎপর্য্য) যেমন প্রতিষেধকে সদোষ স্বীকার করিয়া প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধেও তুল্যদোষপ্রসঙ্গরূপ "মতানুজ্ঞা" পরের অর্থাৎ প্রতিবাদীর সম্বন্ধে প্রসক্ত হয়, তদ্রূপ স্থাপনাকে অর্থাৎ নিজের পক্ষস্থাপক বাক্যকে সদোষ স্বীকার করিয়া প্রতিষেধেও (প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও) তুল্য দোষপ্রসঞ্জনকারী এই বাদীর সম্বন্ধেও "মতানুজ্ঞা" প্রসক্ত হয়। সেই ইহা ষষ্ঠ পক্ষ অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এই শেষ উত্তর ষষ্ঠ পক্ষ।

তন্মধ্যে (পূর্ব্বোক্ত ষট্‌পক্ষের মধ্যে) স্থাপনার হেতুবাদীর অর্থাৎ প্রথমে নিজ পক্ষস্থাপক বাদীর—প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষ। প্রতিষেধ-হেতুবাদীর অর্থাৎ জাত্যুত্তরবাদী প্রতিবাদীর দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ পক্ষ। সেই ষট্‌পক্ষের সাধুতা ও অসাধুতা মীমাংস্যমান হইলে চতুর্থ ও ষষ্ঠ পক্ষের অর্থের অবিশেষপ্রযুক্ত পুনরুক্ত-দোষের প্রসঙ্গ হয়। (কারণ) চতুর্থ পক্ষে "প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধের দোষের ন্যায় দোষ" এই বাক্যের দ্বারা (প্রতিবাদী কর্তৃক) পরের অর্থাৎ বাদীর সম্বন্ধে সমানদোষত্ব কথিত হইতেছে। ষষ্ঠ পক্ষেও "পরপক্ষ-দোষের স্বীকারবশতঃ সমান দোষ," এই বাক্যের দ্বারা সমানদোষত্বই কথিত হইতেছে, কোন অর্থবিশেষ নাই। তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষেও পুনরুক্ত-দোষপ্রসঙ্গ সমান। (কারণ) তৃতীয় পক্ষেও "প্রতিষেধেও দোষ তুল্য" এই বাক্যের দ্বারা সমানত্ব স্বীকৃত হইতেছে; পঞ্চম পক্ষেও প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে সমান-দোষ-প্রসঙ্গ স্বীকৃত হইতেছে। কোন অর্থ বিশেষ কথিত হইতেছে না। তন্মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পক্ষেরও অর্থের অবিশেষপ্রযুক্ত পুনরুক্ত-দোষ-প্রসঙ্গ। তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষে মতানুজ্ঞা। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাব, এ জন্য যট্‌পক্ষী স্থলে উভয়ের অসিদ্ধি, অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই পক্ষসিদ্ধি হয় না।

(প্রশ্ন) কোন্ সময়ে ষট্‌পক্ষী হয়? (উত্তর) যে সময়ে "প্রতিষেধেও সমান দোষ" এইরূপ উত্তর প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাদীও ঐরূপ জাত্যুত্তর করেন। সেই সময়ে উভয় পক্ষের সিদ্ধি হয় না। কিন্তু যে সময়ে "কার্য্যান্যত্বে প্রযত্নাহেতুত্ব-মনুপলব্ধিকারণোপপত্তেঃ" এই (৩৮শ) সূত্রের দ্বারা অর্থাৎ মহর্ষির ঐ সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা তৃতীয় পক্ষ যুক্ত হয় অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীর জাত্যুত্তর খণ্ডন করিতে

তৃতীয় পক্ষে ঐ সূত্রোক্ত সদুত্তরই বলেন, সেই সময়ে প্রযত্নের অনন্তর শব্দের আত্মলাভ অর্থাৎ উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু কথিত হওয়ায় প্রথম পক্ষ সিদ্ধ হইয়া যায়। (সুতরাং) "ষট্‌পক্ষী" প্রবৃত্ত হয় না।

শ্রীবাৎস্যায়নপ্রণীত ন্যায়-ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত ॥

টিপ্পনী। মহর্ষি শেষে এই সূত্রের দ্বারা উক্ত "কথাভাস" স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য ষষ্ঠ পক্ষ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"পরপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ সমানো দোষঃ"। অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথা এই যে, আমি বাদীর পক্ষে যে দোষ বলিয়াছি, বাদীও আমার ন্যায় ঐ দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া, আমার পক্ষেও আবার ঐ দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় সমান দোষ। অর্থাৎ আমার ন্যায় বাদীর পক্ষেও "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হওয়ায় তিনিও নিগৃহীত হইবেন। উক্ত স্থলে বাদী প্রতিবাদীর কথিত দোষ স্বীকার করিয়াছেন, ইহা কিরূপে বুঝিব? ইহা প্রদর্শন করিতে মহর্ষি সূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,—"স্বপক্ষলক্ষণাপেক্ষোপপত্ত্যুপসংহারে হেতুনির্দ্দেশে।" স্বপক্ষ বলিতে এখানে বাদীর পক্ষ, অর্থাৎ বাদীর প্রথম কথিত "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" ইত্যাদি স্থাপনাবাক্য। বাদী ঐ স্বপক্ষ বলিলে প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত "প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ" ইত্যাদি (৩৭শ) সূত্রোক্ত জাত্যুত্তরের দ্বারা বাদীর হেতু এবং স্বপক্ষরূপ বাক্যে যে অনৈকান্তিকত্বদোষ বলিয়াছেন, তাহাই ভাষ্যকারের মতে সূত্রে "স্বপক্ষলক্ষণ" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিষয় অর্থেও "লক্ষণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে স্বপক্ষ যাহার লক্ষণ অর্থাৎ বিষয়, ইহা "স্বপক্ষলক্ষণ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং স্বপক্ষকে বিষয় করিয়াই যে দোষের উত্থান হয় অর্থাৎ বাদী প্রথমে স্বপক্ষ না বলিলে প্রতিবাদী যে দোষ বলিতেই পারেন না, এই তাৎপর্য্যে উক্ত দোষকে "স্বপক্ষলক্ষণ" বলা যায়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"স্বপক্ষসমুত্থত্বাৎ।" জয়ন্ত ভট্টও লিখিয়াছেন,—"তল্লক্ষণস্তৎসমুত্থানস্তদ্বিষয়ঃ।" কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, বরদরাজ এবং বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর জাত্যুত্তররূপ দ্বিতীয় পক্ষকেই সূত্রোক্ত "স্বপক্ষলক্ষণ" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছন।[১] পূর্ব্বোক্ত "স্বপক্ষলক্ষণে"র অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষের

১। স্বপক্ষেণ লক্ষ্যতে তদুত্থানত্বাজ্জাতিঃ স্বপক্ষলক্ষণা অনৈকান্তিকত্বোদ্ভাবনলক্ষণা, তামভ্যুপেতা. অনুদ্ধৃত্য, প্রতিষেধেঽপি জাতিলক্ষণে সমানোঽনৈকান্তিকত্বদোষ ইত্যুপপদ্যমানং স্বপক্ষেঽপি দোষং পরপক্ষে জাতিবাদিপক্ষে সাধনবাদ্যুপসংহরতি, তত্র চানৈকান্তিকং হেতুং ব্রূতে ইত্যাদি তাৎপর্য্যটীকা। স্বপক্ষো মূলসাধনবাদ্যুক্তঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদনিত্যঃ শব্দ ইতি। তল্লক্ষণস্তৎসমুত্থানস্তদ্বিষয়ঃ "প্রযত্নকার্য্যানেকত্বা"দিতি প্রতিষেধঃ। তমপেক্ষমাণস্তমনুদ্ধৃত্যানুজ্ঞায় প্রবৃত্তঃ "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষ" ইত্যুপপদ্যমানঃ পরপক্ষেঽনৈকান্তিকত্বদোষোপসংহারস্তস্য চ হেতুনির্দ্দেশ ইত্যয়মনৈকান্তিকঃ প্রতিষেধ ইতি—ন্যায়মঞ্জরী।

"স্ব"শব্দেন বাদী নির্দ্দিশ্যতে। তস্য পক্ষঃ স্থাপনা, তং লক্ষীকৃত্য প্রবৃত্তো দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ স্বপক্ষলক্ষণঃ, তস্যাপেক্ষাঽভ্যুপগমঃ। ততঃ পরপক্ষেঽপ্যুপপত্ত্যুপসংহারে "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষ" ইতি পরাপাদিতদোষোপসংহারে এবত্বাদিতি হেতুনির্দ্দেশে চ ক্রিয়মাণে সমানো মতানুজ্ঞাদোষ ইতি।—তার্কিকরক্ষা।

অথবা তাঁহার কথিত ঐ জাত্যুত্তররূপ দ্বিতীয় পক্ষের যে অপেক্ষা অর্থাৎ স্বীকার, তাহাই "স্বপক্ষলক্ষণাপেক্ষা"। ভাষ্যকার "অনুদ্ধৃত্য অনুজ্ঞায়" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রোক্ত "অপেক্ষা" শব্দের স্বীকার অর্থই ব্যক্ত করিয়াছেন। বরদরাজ উহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে অপেক্ষা শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সমাদর। তাহাতেও স্বীকার অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু "অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ" গ্রন্থে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এখানে "অপেক্ষা" শব্দের উপেক্ষা অর্থ গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,[১] বাদী প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষরূপ জাত্যুত্তরকে উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ উহার খণ্ডন না করিয়া, উহার পরে "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ" এই উপপত্তির উপসংহার করিলে অর্থাৎ উক্ত দোষ প্রদর্শন করিলে, তাহাতেও প্রতিবাদীর কথিত দূষণরূপ হেতুর নির্দ্দেশ করিলে অর্থাৎ তাহাতেও কোন দোষ না বলিয়া পঞ্চম পক্ষে যে "মতানুজ্ঞা" নামক দোষ বলিয়াছেন, তাহা বাদীর পক্ষেও সমান। সমান কেন? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন, "পরপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ" অর্থাৎ যেহেতু চতুর্থপক্ষস্থ প্রতিবাদী বাদীর তৃতীয় পক্ষে যে দোষ বলিয়াছেন, তাহা পঞ্চমপক্ষস্থ বাদী স্বীকারই করিয়াছেন।

ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "উপপত্তি" ও "উপসংহার" শব্দের দ্বারা পরপক্ষে পূর্ব্বোক্ত "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ" এই সূত্রোক্ত উপপদ্যমান দোষের উপসংহার, এইরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও তুল্য দোষ কেন? এ বিষয়ে বাদী হেতু বলিয়াছেন যে, প্রতিষেধও অনৈকান্তিক। বাদীর ঐরূপ উক্তিই সূত্রে "হেতুনির্দ্দেশ" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির বক্তব্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, "স্বপক্ষলক্ষণে"র অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত পূর্ব্বোক্ত দোষের উদ্ধার না করিয়া বাদী প্রতিবাদীর পক্ষেও উপপদ্যমান দোষের উপসংহার করিলে এবং তাহাতে হেতু বলিলে বাদী কর্ত্তৃক প্রতিবাদীর পক্ষে কথিত দোষ স্বীকৃতই হয়। কারণ, প্রতিবাদী দ্বিতীয়পক্ষস্থ হইয়া প্রথমে "প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রোক্ত যে অনৈকান্তিকত্ব দোষ বলিয়াছেন, বাদী তাহার উদ্ধার না করিয়া "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ" এই কথা বলিয়াছেন। এইরূপ হইলে বাদী তাঁহার নিজের স্থাপনাকে সদোষ বলিয়া মানিয়া লইয়াই প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও ঐ দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় প্রতিবাদীর পক্ষের স্বীকারবশতঃ তুল্য দোষ হয়। অর্থাৎ বাদী যে কারণে প্রতিবাদীর সম্বন্ধে "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, ঐ কারণে উক্ত স্থলে বাদীর সম্বন্ধেও "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান

১। স্বপক্ষঃ স্থাপনাবাদিন আদ্যঃ পক্ষঃ, তল্লক্ষণো দ্বিতীয়ঃ পক্ষো জাত্যুত্তরং, স্বপক্ষলক্ষণায়ত্বাৎ, তস্যাপেক্ষা উপেক্ষা অনুদ্ধারঃ তদনন্তরমুপপত্তেঃ "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষ" ইত্যস্যা উপসংহারে প্রতিপাদনবিষয়ে যো দূষণরূপো হেতুর্ময়া নির্দ্দিষ্ট উক্তশ্চতুর্থকক্ষাস্থেন, তত্র দোষমনুক্ত্বা ত্বয়া পঞ্চমকক্ষাস্থেন যো মতানুজ্ঞারূপো দোষ উক্তঃ স তবাপি সমানস্তবাপি মতানুজ্ঞা। কুতঃ? "পরপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ"। তৃতীয়কক্ষায়াং চতুর্থকক্ষাস্থেন ময়া যো দোষ উক্তস্ত্বয়া তদভ্যুপগমাদিতি সূত্রার্থঃ।—অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ।

হয়। ভাষ্যকার পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইয়াছেন। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐ শেষ উত্তর ষষ্ঠ পক্ষ।

পূর্ব্বোক্ত ষট্‌পক্ষের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষ বাদীর পক্ষ এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ পক্ষ প্রতিবাদীর পক্ষ। "পক্ষ" শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যবিশেষই উক্ত স্থলে গৃহীত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানে যথাক্রমে উক্ত ষট্‌পক্ষ প্রদর্শন করিতেছি।

১। সর্ব্বাগ্রে বাদী বলিলেন,—"শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" ইত্যাদি। বাদীর ঐ স্থাপনাবাক্যই প্রথম পক্ষ।

২। পরে প্রতিবাদী সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া, পূর্ব্বোক্ত "প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ" ইত্যাদি (৩৭শ) সূত্রোক্ত জাত্যুত্তর করিলেন। অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন যে, প্রযত্নের অনন্তর শব্দের কি উৎপত্তিই হয়, অথবা অভিব্যক্তি হয়? প্রযত্নের অনন্তর শব্দের উৎপত্তি কিন্তু অসিদ্ধ। কারণ, কোন বিশেষ হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ করা হয় নাই। সুতরাং শব্দের অনিত্যত্ব-সাধনে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি হেতু হইতে পারে না। যাহা অসিদ্ধ, তাহা হেতু হয় না। অতএব বাদী প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তিই হেতু বলিয়াছেন। কারণ, শব্দে উহা সিদ্ধ, উহা আমারও স্বীকৃত। কিন্তু উহা অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী। কারণ, অনেক বিদ্যমান পদার্থেরও প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি হয়। অনেক নিত্য পদার্থেরও প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তিও শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে হেতু হয় না। অতএব বাদীর ঐ সমস্ত বাক্য দ্বারাও শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, উক্ত অর্থে তাঁহার ঐ সমস্ত বাক্যও অনৈকান্তিক। যে বাক্যোক্ত হেতু অনৈকান্তিক, সেই বাক্যও অনৈকান্তিক হইবে। প্রতিবাদীর এই জাত্যুত্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীয় পক্ষ।

৩। পরে বাদী সদুত্তরের দ্বারা উক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব-দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া বলিলেন,—"প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ"। অর্থাৎ বাদী বলিলেন যে, যদি অনৈকান্তিক বলিয়া আমার ঐ বাক্য সাধক না হয়, তাহা হইলে আপনার যে, প্রতিষেধক বাক্য, তাহাও আমার বাক্যের অসাধকত্বের সাধক হয় না। কারণ, আপনার ঐ প্রতিষেধক বাক্যও ত অনৈকান্তিক। বাদীর এইরূপ জাত্যুত্তর উক্ত স্থলে তৃতীয় পক্ষ।

৪। পরে প্রতিবাদী উক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া অর্থাৎ নিজবাক্যে বাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া বলিলেন,—"প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদোষবদ্দোষঃ।" অর্থাৎ আমার প্রতিষেধক বাক্যের যে বিপ্রতিষেধ, অর্থাৎ আপনার "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ" এই বাক্য, তাহাতেও আপনার কথিত দোষের তুল্য দোষ। অর্থাৎ তাহাও আমার প্রতিষেধক বাক্যের ন্যায় অনৈকান্তিক। প্রতিবাদীর এইরূপ জাত্যুত্তর, উক্ত স্থলে চতুর্থ পক্ষ।

৫। পরে বাদী তাঁহার নিজবাক্যে প্রতিবাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ উহা মানিয়া লইয়া বলিলেন যে, আপনার নিজের প্রতিষেধক বাক্যে আমি যে অনৈকান্তিকত্ব দোষ বলিয়াছি, তাহা আপনি মানিয়া লইয়া, আমার পক্ষেও ঐ দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় আপনার সম্বন্ধে "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হইয়াছে। অতএব আপনি মধ্যস্থগণের বিচারে নিগৃহীত হইবেন।

৬। পরে প্রতিবাদীও তুল্যভাবে বলিলেন যে, আপনিও আপনার প্রথম পক্ষরূপ নিজবাক্যে আমার কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ উহা মানিয়া লইয়া, আমার কথিত দ্বিতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক বাক্যেও "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ" এই কথা বলিয়া অর্থাৎ আপনার তৃতীয় পক্ষের দ্বারা ঐ অনৈকান্তিকত্ব দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় আপনার সম্বন্ধেও "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হইয়াছে। অতএব মধ্যস্থগণের বিচারে আপনিও কেন নিগৃহীত হইবেন না? প্রতিবাদীর এই শেষ উত্তর উক্ত স্থলে ষষ্ঠ পক্ষ।

পূর্ব্বোক্ত ষট্‌পক্ষী স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই মতসিদ্ধি হয় না। সুতরাং উহার দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়ও হয় না, একতরের জয়লাভও হয় না। অতএব উহা নিষ্ফল। ভাষ্যকার পরে ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত ষট্‌পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ সাধু এবং কোন্ পক্ষ অসাধু, ইহা মীমাংস্যমান হইলে অর্থাৎ মধ্যস্থগণ কর্ত্তৃক বিচার্য্যমাণ হইলে, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, প্রতিবাদীর কথিত চতুর্থ পক্ষ ও ষষ্ঠ পক্ষে অর্থের বিশেষ না থাকায় পুনরুক্ত-দোষ। কারণ, প্রতিবাদী চতুর্থ পক্ষে "প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদোষবদ্দোষঃ" এই বাক্যের দ্বারা বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষে সমানদোষত্ব বলিয়াছেন এবং ষষ্ঠ পক্ষেও তিনি "পরপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ সমানো দোষঃ" এই কথা বলিয়া বাদীর পঞ্চম পক্ষে সমানদোষত্বই বলিয়াছেন। কোন অর্থ বিশেষ বলেন নাই। এইরূপ বাদীর কথিত তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষেও পুনরুক্ত-দোষ। কারণ, বাদী তৃতীয় পক্ষেও "প্রতিষেধেঽপি·সমানো দোষঃ" এই বাক্যের দ্বারা দোষের সমানত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং পঞ্চম পক্ষেও "প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে সমানো দোষপ্রসঙ্গঃ" ইহা বলিয়া তুল্যদোষপ্রসঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন। কোন অর্থ বিশেষ বলেন নাই। এইরূপ বাদীর পঞ্চম পক্ষ ও প্রতিবাদীর ষষ্ঠ পক্ষে কোন অর্থ বিশেষ না থাকায় পুনরুক্ত-দোষ। বাদীর তৃতীয় পক্ষ ও প্রতিবাদীর চতুর্থ পক্ষে মতানুজ্ঞাদোষ। কারণ, নিজপক্ষে দোষ স্বীকার করিয়া, পরপক্ষে তুল্যভাবে ঐ দোষের প্রসঙ্গকে "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান বলে। বাদীর প্রথম পক্ষ ও প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষে বিশেষ হেতু নাই। অর্থাৎ বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া, তাঁহার অভিমত হেতু যে শব্দে অসিদ্ধ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতে প্রযত্নের অনন্তর শব্দের যে উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষে প্রতিবাদীও প্রযত্নের অনন্তর শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না, এ বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই। অতএব উক্ত ষট্‌পক্ষী স্থলে পুনরুক্ত-দোষ, মতানুজ্ঞা-দোষ এবং বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই পক্ষসিদ্ধি হয় না। উদ্দ্যোতকর পরে ইহার হেতু বলিয়াছেন,—"অযুক্তবাদিত্বাৎ"। অর্থাৎ

উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই অযুক্তবাদী। সুতরাং উক্ত স্থলে মধ্যস্থগণের বিচারে উভয়েই নিগৃহীত হইবেন।

কোন্ সময়ে উক্ত "ষট্‌পক্ষী" প্রবৃত্ত হয়? অর্থাৎ উক্তরূপ ষট্‌পক্ষীর মূল কি? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, যে সময়ে বাদী ও প্রতিবাদীর ন্যায় "প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ" এই কথা বলিয়া জাত্যুত্তর করেন, সেই সময়েই ষট্‌পক্ষী প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ বাদীর উক্ত জাত্যুত্তরই উক্ত স্থলে ষট্‌পক্ষীর মূল। কারণ, বাদী তৃতীয় পক্ষে ঐ জাত্যুত্তর করাতেই প্রতিবাদীও চতুর্থ পক্ষে ঐরূপ জাত্যুত্তর করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার ঐরূপ চতুর্থ পক্ষের অবসরই হইত না; ভাষ্যকার পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের সেই কথার তাৎপর্য্য এই যে, বাদীর পূর্ব্বোক্ত "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" ইত্যাদি প্রথম পক্ষের পরে প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত "প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রোক্ত জাত্যুত্তর করিলে বাদী যে উত্তরের দ্বারা উহার খণ্ডন করিবেন, তাহা মহর্ষি পরে "কার্য্যান্যত্বে প্রযত্নাহেতুত্বমনুপলব্ধিকারণোপপত্তেঃ" এই (৩৮শ) সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। বাদী মহর্ষি-কথিত ঐ সদুত্তর বলিলে প্রযত্নের অনন্তর শব্দের যে উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু কথিত হওয়ায় তদ্দ্বারা তাঁহার প্রথম পক্ষই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং তখন আর প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ চতুর্থ পক্ষের প্রবৃত্তি সম্ভবই হইবে না। অতএব ঐ স্থলে পূর্ব্বোক্তরূপে ষট্‌পক্ষীর প্রবৃত্তি হইতে পারে না। ফলকথা, প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে বাদী মহর্ষি-কথিত সদুত্তরের দ্বারাই উহার খণ্ডন করিবেন। তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্তরূপে "ষট্‌পক্ষী"র সম্ভাবনাই থাকিবে না। পূর্ব্বোক্তরূপ ষট্‌পক্ষী বা কথাভাস একেবারেই নিষ্ফল। কারণ, উহার দ্বারা কোন তত্ত্ব-নির্ণয়ও হয় না, একতরের জয়লাভও হয় না; সুতরাং উহা কর্ত্তব্য নহে। মহর্ষি ইহা উপদেশ করিবার জন্যই জাতি নিরূপণের পরে এই প্রকরণের দ্বারা ঐ ব্যর্থ "ষট্‌পক্ষী" প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু কোন স্থলে প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে পরে সদুত্তরের স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় বাদীও জাত্যুত্তর করিলে পরে সদুত্তর শ্রবণের সম্ভাবনা করিয়া ঐ স্থলে মধ্যস্থগণ ষট্‌পক্ষী পর্য্যন্তই শ্রবণ করিবেন। তাহার পরে তাঁহারা বাদী ও প্রতিবাদীকে ঐ ব্যর্থ বিচার হইতে নিবৃত্ত করিয়া, উভয়েরই পরাজয় ঘোষণা করিবেন। মহর্ষি এইরূপ উপদেশ সূচনার জন্যও এখানে ষট্‌পক্ষী পর্য্যন্তই প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং উক্তরূপে শতপক্ষী ও সহস্রপক্ষী প্রভৃতি কেন হইবে না? এইরূপ আপত্তিও হইতে পারে না। তবে কোন স্থলে যে পূর্ব্বোক্তরূপে "ত্রিপক্ষী" প্রভৃতি হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি ॥৪৩॥

ষট্‌পক্ষীরূপ কথাভাস-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৭॥

এই আহ্নিকের প্রথম তিন সূত্র (১) সৎপ্রতিপক্ষদেশনাভাস-প্রকরণ। পরে তিন সূত্র (২) জাতিষট্‌কপ্রকরণ। পরে দুই সূত্র (৩) প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিযুগনদ্ধবাহিবিকল্পোপক্রমজাতিদ্বয়-প্রকরণ। পরে তিন সূত্র (৪) যুগনদ্ধবাহিপ্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তসমজাতিদ্বয়প্রকরণ। পরে দুই

সূত্র (৫) অনুৎপত্তিসমপ্রকরণ। পরে দুই সূত্র (৬) সংশয়সম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (৭) প্রকরণসম প্রকরণ। পরে তিন সূত্র (৮) অহেতুসম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (৯) অর্থাপত্তিসম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (১০) অবিশেষসম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (১১) উপপত্তিসম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (১২) উপলব্ধিসম প্রকরণ। পরে তিন সূত্র (১৩) অনুপলব্ধিসম প্রকরণ। পরে তিন সূত্র (১৪) অনিত্যসম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (১৫) নিত্যসম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (১৬) কার্য্যসম প্রকরণ। তাহার পরে পাঁচ সূত্র (১৭) কথাভাস-প্রকরণ।

১৭ প্রকরণ ও ৪৩ সূত্রে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় আহ্নিক।

ভাষ্য। বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যোর্ব্বিকল্পান্নিগ্রহস্থান-বহুত্বমিতি সংক্ষেপেণোক্তং, তদিদানীং বিভজনীয়ম্। নিগ্রহস্থানানি খলু পরাজয়বস্তূন্যপরাধাধিকরণানি প্রায়েণ প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বাশ্রয়াণি,—তত্ত্ববাদিনমতত্ত্ববাদিনঞ্চাভিসংপ্লবন্তে।

অনুবাদ। বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্পবশতঃ অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধজ্ঞানরূপ ভ্রম ও অজ্ঞতার নানাপ্রকারতাপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থানের বহুত্ব, ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, তাহা এখন বিভজনীয়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থানের বিভাগাদির দ্বারা সেই বহুত্ব প্রতিপাদনীয়। নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয়-বস্তু (অর্থাৎ) অপরাধের আশ্রয়, প্রায়শঃ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বাশ্রিত,—তত্ত্ববাদী ও অতত্ত্ববাদী পুরুষকে অর্থাৎ "কথা" স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী পুরুষকেই নিগৃহীত করে।

টিপ্পনী। "জাতি"র পরে "নিগ্রহস্থান"। ইহাই গোতমোক্ত চরম পদার্থ। মহর্ষি গোতম প্রথম অধ্যায়ের শেষে "বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং" (২।১৯) এই স্থত্রের দ্বারা বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলিয়া সর্ব্বশেষ স্থত্রের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বহুপ্রকারতাবশতঃ ঐ নিগ্রহস্থান যে বহু, ইহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কিন্তু সেখানে ইহার প্রকারভেদ ও তাহার সমস্ত লক্ষণ বলেন নাই। এই অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "জাতি" নামক পঞ্চদশ পদার্থের সবিশেষ নিরূপণপূর্ব্বক শেষে অবসর-সংগতিবশতঃ এই দ্বিতীয় আহ্নিকে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের সবিশেষ নিরূপণ করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থানের প্রকারভেদ ও তাহার সমস্ত লক্ষণ বলাই মহর্ষির এই শেষ আহ্নিকের প্রয়োজন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে ঐ প্রয়োজন প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার পরে এখানে নিগ্রহস্থানগুলির সামান্য পরিচয় প্রকাশ করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয়বস্তু অর্থাৎ "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামক কথায় বাদী ও প্রতিবাদীর বাস্তব পরাজয়ের বাস্তব স্থান বা কারণ। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে,[1] যাহাদিগের মতে বাদী ও প্রতিবাদীর সমস্ত সাধন ও দূষণপ্রকার বাস্তব

১। তত্র য এবমাহুঃ—সর্ব্বোঽয়ং সাধনদূষণপ্রকারো বুদ্ধ্যারূঢ়ো ন বাস্তব ইতি তান্ প্রত্যাহ—"পরাজয়-বস্তূনী"তি। পরাজয়ো বসত্যেম্বিতি পরাজয়স্থানানীত্যর্থঃ। কাল্পনিকত্বে কল্পনায়াঃ সর্ব্বত্র সুলভত্বাৎ সাধনদূষণ-ব্যবস্থা ন স্যাদিতি ভাবঃ। নিগ্রহস্থানানি পর্য্যায়ান্তরেণ 'পঠয়তি "অপরাধে"তি।—তাৎপর্য্যটীকা।

নহে, ঐ সমস্তই কাল্পনিক, সেই বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার নিগ্রহস্থানগুলিকে বলিয়াছেন পরাজয়বস্তু। বাদী অথবা প্রতিবাদীর পরাজয় যাহাতে বাস করে অর্থাৎ যাহা পরাজয়ের বাস্তব স্থান বা কারণ, ইহাই ঐ কথার অর্থ। "বস"ধাতুর উত্তর "তুন্"প্রত্যয়নিষ্পন্ন "বস্তু" শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার সূচনা করিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সমস্ত সাধন ও দূষণপ্রকার এবং জয়-পরাজয়াদি সমস্তই বাস্তব, ঐ সমস্ত কাল্পনিক নহে। কাল্পনিক হইলে বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও দূষণের ব্যবস্থা বা নিয়ম হইতে পারে না, সুতরাং জয়পরাজয়ব্যবস্থাও হইতে পারে না। কারণ, কল্পনা সর্ব্বত্রই সুলভ। যাহার জয় হইয়াছে, তাহারও পরাজয় কল্পনা করিয়া পরাজয় ঘোষণা করা যায়। তাহা হইলে কুত্রাপি জয় পরাজয় নির্ণয় হইতেই পারে না। সুতরাং নিগ্রহস্থানগুলির দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বাস্তব অপরাধই নির্ণীত হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার তাঁহার বিবক্ষিত এই অর্থই ব্যক্ত করিতে পরে আবার বলিয়াছেন,—"অপরাধাধিকরণানি"। অর্থাৎ নিগ্রহস্থানগুলি বাদী বা প্রতিবাদীর বাস্তব অপরাধের স্থান। উহার মধ্যে "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি অধিকাংশ নিগ্রহস্থানই প্রতিজ্ঞাদি কোন অবয়বকে আশ্রয় করিয়াই সম্ভব হয়, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—"প্রায়েণ প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বাশ্রয়াণি"। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

এখন এই "নিগ্রহস্থান" শব্দের অন্তর্গত "নিগ্রহ" শব্দের অর্থ কি? এবং কোথায় কাহার কিরূপ নিগ্রহ হয়, এই সমস্ত বুঝা আবশ্যক। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, "নিগ্রহ" শব্দের অর্থ পরাজয়। উদয়নাচার্য্য ঐ পরাজয় পদার্থের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, "কথা"স্থলে যে বাদী বা প্রতিবাদীর নিজের অহঙ্কার খণ্ডিত হয় নাই, তৎকর্ত্তৃক যে অপরের অর্থাৎ তাঁহার প্রতিবাদীর অহঙ্কারের খণ্ডন, তাহাই তৎকর্ত্তৃক অপরের পরাজয় এবং উহারই নাম নিগ্রহ। "বাদ," "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামে যে ত্রিবিধ কথা, তাহাতেই নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে। অন্যত্র "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহস্থান নহে। উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে বরদরাজ এবং শঙ্কর মিশ্রও পূর্ব্বোক্তরূপ কথাই বলিয়াছেন[১]। প্রশ্ন হয় যে, জিগীষাশূন্য শিষ্য ও গুরুর কেবল তত্ত্বনির্ণয়োদ্দেশ্যে যে "বাদ" নামক কথা হয়, তাহাতে বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই অহঙ্কার না থাকায় পূর্ব্বোক্ত পরাজয়রূপ নিগ্রহ কিরূপে হইবে? জিগীষা না থাকিলে সেখানে ত জয় পরাজয় বলাই যায় না। ন্যায়দর্শনের সর্ব্বপ্রথম সূত্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যায় বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর উক্তরূপ প্রশ্নের

১। অখণ্ডিতাহঙ্কৃতিনঃ পরাহঙ্কারখণ্ডনম্।
নিগ্রহস্তন্নিমিত্তস্য নিগ্রহস্থানতোচ্যতে॥

অত্র কথায়ামিত্যুপস্কর্ত্তব্যং। অন্যথা ইতি প্রসঙ্গাৎ। যথোক্তমাচার্য্যৈঃ—'কথায়ামখণ্ডিতাহঙ্কারেণ পরস্যাহঙ্কারখণ্ডনমিহ পরাজয়ো নিগ্রহ"ইতি।—তার্কিকরক্ষা। অখণ্ডিতাহঙ্কারিণঃ পরাহঙ্কার-শাতনমিহ পরাজয়ঃ, স এব নিগ্রহঃ। স এতেষু প্রতিজ্ঞাহান্যাদিষু বসতীতি নিগ্রহস্য পরাজয়স্য স্থানমুন্নায়কমিতি যাবৎ। অতএব কথাবাহ্যানামমীষাং ন নিগ্রহস্থানত্বং।—বাদিবিনোদ।

অবতারণা করিয়া,[১] তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, "বাদ"কথাতে শিষ্য বা আচার্য্যের বিবক্ষিত অর্থের অপ্রতিপাদকত্বই অর্থাৎ বিবক্ষিত বিষয় প্রতিপন্ন করিতে না পারাই নিগ্রহ। বাচস্পতি মিশ্র ইহাকে "খলীকার" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরও পরে (১৭শ সূত্রের বার্ত্তিকে) "খলীকার" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। ফলকথা, "বাদ"কথাতে কাহারও পরাজয়-রূপ নিগ্রহ না হইলেও বিবক্ষিত অর্থের অপ্রতিপাদকত্বরূপ নিগ্রহকে গ্রহণ করিয়াই নিগ্রহস্থান বলা হইয়াছে। "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামক কথায় জিগীষু বাদী বা প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত পরাজয়-রূপ নিগ্রহই হয় এবং তাহাতে যথাসম্ভব "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি সমস্তই ঐ নিগ্রহের স্থান বা কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু "বাদ"নামক কথায় ঐ সমস্তই নিগ্রহস্থান হয় না। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

নিগ্রহস্থানগুলি বাদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষেরই নিগ্রহের কারণ হয়। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষই প্রমাদবশতঃ যাহা প্রযোজ্য নহে, তাহা প্রয়োগ করিয়া এবং যাহা প্রযোজ্য, তাহার প্রয়োগ না করিয়া নিগ্রহের যোগ্য হন। উদ্দ্যোতকর প্রথমে বিচারপূর্ব্বক ইহা প্রতিপাদন করিতে বলিয়াছেন যে, বিচারকর্ত্তা বাদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষেরই বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তি-মূলক নিগ্রহ হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের সেই বিচাররূপ কর্ম্ম এবং তাহার করণ যে প্রতিজ্ঞাদি বাক্য, তাহার নিগ্রহ হয় না। কারণ, সেই কর্ম্ম ও করণের কোন অপরাধ নাই। সেই কর্ম্ম ও করণ নিজ বিষয়ে প্রযুজ্যমান হইলে তখন উহা সেই বিষয়ের সাধনে সমর্থই হয়। কিন্তু বিচারকর্ত্তা বাদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষ তাঁহাদিগের সাধনীয় বিষয়ের সাধনে অসমর্থ কর্ম্ম ও করণকে গ্রহণ করায় তাঁহাদিগেরই নিগ্রহ হয়। তাঁহাদিগের সেই প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দ্বারা আত্মগত বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি-দোষের অর্থাৎ ভ্রম ও অজ্ঞতার অনুমান হওয়ায় উহা প্রতিজ্ঞাদির দোষ বলিয়া কথিত হয়। বস্তুতঃ ঐ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের কোন দোষ নাই। "প্রতিজ্ঞাদিদোষ" ইহা ভাক্ত প্রয়োগ। অবশ্য "অজ্ঞান" প্রভৃতি কোন কোন নিগ্রহস্থান বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষেরই আত্মগত ধর্ম্ম বলিয়া, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধেই সেই পুরুষকে নিগৃহীত করে। নিগ্রহস্থানগুলি যে বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষকেই নিগৃহীত করে, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকারও এখানে শেষে বলিয়াছেন,—"তত্ত্ববাদিনমতত্ত্ববাদিনঞ্চাভিসংপ্লবন্তে"। অর্থাৎ নিগ্রহস্থানগুলি প্রায় সর্ব্বত্র যিনি অতত্ত্ববাদী পুরুষ অর্থাৎ যিনি অসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকেই নিগৃহীত করে এবং কদাচিৎ যিনি তত্ত্ববাদী পুরুষ অর্থাৎ যিনি প্রকৃত সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকেও নিগৃহীত করে। কারণ, কদাচিৎ তিনিও প্রতিবাদীর কথিত দূষণাভাসের খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া নিগৃহীত হন। একই স্থলে তাঁহাদিগের বহু নিগ্রহস্থানও হইতে পারে, ইহা প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার "অভিসংপ্লবন্তে" এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিয়াছেন।

১। কঃ পুনঃ শিষ্যাচার্য্যয়োর্নিগ্রহঃ? বিবক্ষিতার্থাপ্রতিপাদকত্বমেব।—ন্যায়বার্ত্তিক। উত্তরং বিবক্ষিতার্থাপ্রতি-পাদকত্বমেব খলীকার ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

বহু পদার্থের সংকরই "অভিসংপ্লব," ইহা অন্যত্র ভাষ্যকারের নিজের ব্যাখ্যার দ্বারাই বুঝা যায়। (প্রথম খণ্ড, ১১২-১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। তেষাং বিভাগঃ—

অনুবাদ। সেই নিগ্রহস্থানসমূহের বিভাগ—

সূত্র। প্রতিজ্ঞাহানিঃ, প্রতিজ্ঞান্তরং, প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসো হেত্বন্তরমর্থান্তরং, নিরর্থকমবিজ্ঞাতার্থমপার্থকমপ্রাপ্তকালং, ন্যূনমধিকং, পুনরুক্তমননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভা, বিক্ষেপো মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণং, নিরনুযোজ্যানুযোগোঽপসিদ্ধান্তো হেত্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থানানি ॥১॥৫০৫॥

অনুবাদ। (১) প্রতিজ্ঞাহানি, (২) প্রতিজ্ঞান্তর, (৩) প্রতিজ্ঞাবিরোধ, (৪) প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, (৫) হেত্বন্তর, (৬) অর্থান্তর, (৭) নিরর্থক, (৮) অবিজ্ঞাতার্থ, (৯) অপার্থক, (১০) অপ্রাপ্তকাল, (১১) ন্যূন, (১২) অধিক, (১৩) পুনরুক্ত, (১৪) অননুভাষণ, (১৫) অজ্ঞান, (১৬) অপ্রতিভা, (১৭) বিক্ষেপ, (১৮) মতানুজ্ঞা, (১৯) পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, (২০) নিরনুযোজ্যানুযোগ, (২১) অপসিদ্ধান্ত, (২২) হেত্বাভাস—এই সমস্ত নিগ্রহস্থান।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বকথিত "নিগ্রহস্থান" নামক চরম পদার্থের বিশেষ লক্ষণগুলি বলিবার জন্য প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা সেই নিগ্রহস্থানের বিভাগ করিয়াছেন। বিভাগ বলিতে পদার্থের প্রকারভেদের নাম কীর্ত্তন। উহাকে পদার্থের বিশেষ উদ্দেশ বলে। উদ্দেশ ব্যতীত লক্ষণ বলা যায় না। তাই মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থানের বিশেষ নাম কীর্ত্তনরূপ বিশেষ উদ্দেশ করিয়া, দ্বিতীয় সূত্র হইতে যথাক্রমে এই সূত্রোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতির লক্ষণ বলিয়াছেন। অনেকের মতে এই সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা আরও অনেক নিগ্রহস্থানের সমুচ্চয় সূচিত হইয়াছে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি মহর্ষির সর্ব্বশেষ সূত্রোক্ত "চ" শব্দের দ্বারাই অনুক্ত সমুচ্চয় বুঝিতে বলিয়াছেন, পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে "চ" শব্দটী "তু" শব্দের সমানার্থক। উহার দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতিই নিগ্রহস্থান। কিন্তু কথামধ্যে বাদী বা প্রতিবাদী সহসা অপস্মারাদি পীড়াবশতঃ নীরব হইলে অথবা ভূতাবেশাদিবশতঃ প্রলাপ বলিলে অথবা

প্রতিবাদী কর্তৃক দোষোদ্‌ভাবনের পূর্ব্বেই অতি শীঘ্র নিজ বুদ্ধির দ্বারা নিজ বাক্য আচ্ছাদন করিয়া, নির্দ্দোষ অন্য বাক্য বলিলে অথবা প্রতিবাদীর উত্তর বলিবার পূর্ব্বেই পার্শ্বস্থ অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহার বক্তব্য উত্তর বলিয়া দিলে, সেখানে কাহারও কোন নিগ্রহস্থান হইবে না। অর্থাৎ উক্তরূপ স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর "অননুভাষণ" ও "অপ্রতিভা" প্রভৃতি নিগ্রহস্থান হইবে না। কারণ, ঐরূপ স্থলে উহা বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমাপক হয় না, অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে তাঁহাদিগের কোন অপরাধ নির্ণয় করা যায় না। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কথা ভিন্ন অন্যত্র অর্থাৎ লৌকিক বিবাদাদি স্থলেও যে উক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহস্থান হইবে না, ইহাও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বলিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহস্থানগুলির স্বরূপ না বুঝিলে সমস্ত কথা বুঝা যায় না। তাই আবশ্যক বোধে এখানেই অতি সংক্ষেপে উহাদিগের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছি।

বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া, পরে যদি প্রতিবাদীর কথিত দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিজের উক্ত কোন পদার্থের পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজ পক্ষেরই ত্যাগ হওয়ায় (১) "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হয়। আর যদি ঐরূপ স্থলে ঐ উদ্দেশ্যে নিজের কথিত হেতু ভিন্ন যে কোন পদার্থে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করেন, তাহা হইলে (২) "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হয়। সেখানে নিজপক্ষের পরিত্যাগ না হওয়ায় "প্রতিজ্ঞা-হানি" হয় না। বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞা এবং তাঁহার কথিত হেতু যদি পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেখানে (৩) "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের খণ্ডন করিলে তখন উহার খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া বাদী যদি নিজের প্রতিজ্ঞার্থ অস্বীকার করেন অর্থাৎ আমি ইহা বলি নাই, এইরূপ কথা বলেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (৪) "প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস" নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুতে ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন করিলে বাদী যদি উক্ত দোষ নিবারণের জন্য তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সেই হেতুতেই কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (৫) "হেত্বন্তর" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপনাদি করিতে, মধ্যে যদি কোন অসম্বদ্ধার্থ বাক্য অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের (৬) "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী যদি নিজপক্ষ স্থাপনাদি করিতে অর্থশূন্য অর্থাৎ যাহা কোন অর্থের বাচক নহে, এমন শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (৭) "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী কর্তৃক যে বাক্য তিনবার কথিত হইলেও অতি দুর্ব্বোধার্থ বলিয়া মধ্যস্থ সভ্যগণ ও প্রতিবাদী কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না, সেইরূপ বাক্য-প্রয়োগ বাদীর পক্ষে (৮) "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। যে পদসমূহ অথবা যে বাক্য-সমূহের মধ্যে প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বাক্যের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ের অর্থ নাই অর্থাৎ সেই পদসমূহ অথবা বাক্যসমূহ মিলিত হইয়া কোন একটী অর্থবোধ জন্মায় না, তাদৃশ পদসমূহ অথবা

বাক্যসমূহের প্রয়োগ (৯) "অপার্থক" নামক নিগ্রহস্থান। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্য অথবা অন্যান্য বক্তব্য যে কোন বাক্যের নির্দ্দিষ্ট ক্রম লঙ্ঘন করিলে অর্থাৎ যে কালে যাহা বক্তব্য, তাহার পূর্ব্বেই তাহা বলিলে (১০) "অপ্রাপ্তকাল" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ-স্থাপনে তাঁহাদিগের নিজসম্মত যে কোন একটী অবয়বও কথিত না হইলে অর্থাৎ সমস্ত অবয়বের প্রয়োগ না করিলে (১১) "ন্যূন" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপনে বিনা প্রয়োজনে হেতুবাক্য বা উদাহরণবাক্য একের অধিক বলিলে অথবা দূষণাদিও একের অধিক বলিলে (১২) "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান হয়। নিষ্প্রয়োজনে কোন শব্দ বা অর্থের পুনরুক্তি হইলে (১৩) "পুনরুক্ত" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী নিজ পক্ষ-স্থাপনাদি করিলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত বাক্যার্থ বা তাঁহার দূষণীয় পদার্থের প্রত্যুচ্চারণ অর্থাৎ অনুভাষণ করিয়া উহার খণ্ডন করিবেন। কিন্তু বাদী তিনবার বলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ তাঁহার বাক্যার্থ বুঝিলেও প্রতিবাদী যদি তাঁহার দূষণীয় পদার্থের অনুভাষণ না করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৪) "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী তিন বার বলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ বাদীর সেই বাক্যার্থ বুঝিলে প্রতিবাদী যদি তাহা বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৫) "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝিলেও এবং তাহার অনুভাষণ করিলেও যদি উত্তরকালে তাঁহার উত্তরের স্ফূর্ত্তি বা জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে সেখানে (১৬) "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী নিজ পক্ষস্থাপনাদি করিলে প্রতিবাদী যদি তখনই অথবা নিজ বক্তব্য কিছু বলিয়াই ভাবী পরাজয় সম্ভাবনা করিয়া, আমার বাড়ীতে অমুক কার্য্য আছে, এখনই আমার যাওয়া অত্যাবশ্যক, পরে আসিয়া বলিব, এইরূপ কোন মিথ্যা কথা বলিয়া আরব্ধ কথার ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৭) "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী যদি নিজপক্ষে বাদীর প্রদর্শিত দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ উহা স্বীকার করিয়া লইয়াই বাদীর পক্ষে তত্তুল্য দোষের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৮) "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার প্রতিবাদী যদি উহার উদ্ভাবন করিয়া, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ, ইহা না বলেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৯) "পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। এই নিগ্রহস্থান পরে মধ্যস্থগণ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রকাশ করিবেন অর্থাৎ ইহা মধ্যস্থগণেরই উদ্ভাব্য। যাহা যেখানে বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া প্রতিবাদী অথবা বাদী যদি তাঁহার প্রতিবাদীকে এই নিগ্রহস্থান দ্বারা তুমি নিগৃহীত হইয়াছ, এই কথা বলেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (২০) "নিরনুযোজ্যানুযোগ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রথমে কোন শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, উহার সমর্থন করিতে পরে যদি উহার বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সেখানে (২১) "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রথম অধ্যায়ে "সব্যভিচার" প্রভৃতি পঞ্চবিধ হেত্বাভাস যেরূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সেই সমস্ত (২২) হেত্বাভাস সর্ব্বত্রই নিগ্রহস্থান হয়।

পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থানগুলির মধ্যে "অননুভাষণ", "অজ্ঞান", "অপ্রতিভা", "বিক্ষেপ", "মতা-

মুক্ত্বা" এবং "পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ", এই ছয়টি বাদী বা প্রতিবাদীর অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতামূলক। উহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত বিষয়ে অপ্রতিপত্তির অনুমান হয়। এ জন্য ঐ ছয়টি নিগ্রহ-স্থান অপ্রতিপত্তিনিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। অবশিষ্ট নিগ্রহস্থানগুলির দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তির অনুমান হয়। কারণ, সেগুলি বিপ্রতিপত্তিমূলক। তাই সেগুলি বিপ্রতিপত্তিনিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের শেষ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারও ইহা বলিয়াছেন। তবে ভাষ্যকারের মতে "অপ্রতিপত্তি" বলিতে বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞানের অভাবরূপ অজ্ঞতা নহে, কিন্তু সেই অজ্ঞতামূলক নিজ কর্ত্তব্যের অকরণই অপ্রতিপত্তি। জয়ন্ত ভট্টও ভাষ্যকারের মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। কিন্তু অন্য মতে মহর্ষি বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত বিষয়ে অজ্ঞতারূপ অপ্রতিপত্তির অনুমাপক নিগ্রহস্থানগুলিকেই "অপ্রতিপত্তি" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা বাদী বা প্রতিবাদীর আত্মগত ভ্রমজ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তি এবং জ্ঞানের অভাবরূপ অপ্রতিপত্তি, তাহা অপরে উদ্ভাবন করিতে পারে না, উদ্ভাবিত না হইলেও তাহা নিগ্রহস্থান হয় না। সুতরাং বাদী বা প্রতিবাদীর ঐ বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তির যাহা অনুমাপক লিঙ্গ, তাহাই নিগ্রহস্থান, ইহাই উক্ত মতে মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহস্থানগুলি বাদী বা প্রতিবাদীর নিগ্রহের মূল কারণের অনুমাপক হইয়া, তদ্দ্বারা পরম্পরায় নিগ্রহের অনুমাপক হয়, এ জন্য শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি কেহ কেহ "নিগ্রহস্থান" শব্দের দ্বারা নিগ্রহের স্থান অর্থাৎ অনুমাপক, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ মহর্ষির কথিত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতিতে মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থানের সামান্য লক্ষণের সমন্বয়ের জন্য বলিয়াছেন যে, মহর্ষির "বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং" এই সূত্রে "বিপ্রতিপত্তি" ও "অপ্রতিপত্তি" শব্দের দ্বারা "কথা"স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর প্রকৃত তত্ত্বের অপ্রতিপত্তিই অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অজ্ঞতাই লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু উহা বাদী বা প্রতিবাদীর আত্মগত ধর্ম্ম বলিয়া, অন্যে উহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারায় উহা উদ্ভাবন করিতে পারে না, উহা উদ্ভাবনের অযোগ্য। সুতরাং স্বরূপতঃ উহা নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। অতএব ঐ অপ্রতিপত্তি বা প্রকৃত তত্ত্বে অজ্ঞতার দ্বারা উহার অনুমাপক লিঙ্গই লক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত ঐ সূত্রে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি শব্দে লক্ষণার দ্বারা প্রথমে তত্ত্বের অপ্রতিপত্তি বুঝিয়া, পরে আবার লক্ষণার দ্বারা উহার অনুমাপক লিঙ্গ বুঝিতে হইবে। উক্ত-রূপে "লক্ষিত-লক্ষণা"র দ্বারা যাহা বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত তত্ত্বে অপ্রতিপত্তির লিঙ্গ অর্থাৎ যদ্দ্বারা সেই অপ্রতিপত্তি অনুমিত হয়, তাহাই নিগ্রহস্থান, ইহাই মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত ঐ সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। তাহা হইলে মহর্ষির কথিত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি সমস্তই পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থানের সামান্য লক্ষণাক্রান্ত হয়। নচেৎ ঐ সমস্ত নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। সুতরাং মহর্ষিও তাহা বলিতে পারেন না। অতএব মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত সূত্রের উক্তরূপই তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে।

কিন্তু মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত সূত্রের দ্বারা তাঁহার ঐরূপ তাৎপর্য্য মনে হয় না এবং উক্ত ব্যাখ্যায় ঐ সূত্রে "বিপ্রতিপত্তি" শব্দ এবং "চ" শব্দের প্রয়োগও সার্থক হয় না। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার

প্রভৃতিও মহর্ষির সূত্রানুসারে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি, এই উভয়কেই নিগ্রহের মূল কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট ভাষ্যকারের মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহা বস্তুতঃ সাধন নহে, কিন্তু তত্তুল্য বলিয়া প্রতীত হওয়ায় সাধনাভাস নামে কথিত হয়, তাহাতে সাধন বলিয়া যে ভ্রমাত্মক বুদ্ধি এবং যাহা দূষণ নহে, কিন্তু দূষণাভাস, তাহাতে দূষণ বলিয়া যে ভ্রমাত্মক বুদ্ধি, তাহাই বিপ্রতিপত্তি। এবং আরম্ভ বিষয়ে যে অনারম্ভ অর্থাৎ নিজ কর্ত্তব্যের অকরণ, তাহা অপ্রতিপত্তি। বাদী নিজ পক্ষ সাধন করিলে তখন উহার খণ্ডনই প্রতিবাদীর কর্ত্তব্য, এবং প্রতিবাদী খণ্ডন করিলে তখন উহার উদ্ধার করাই বাদীর কর্ত্তব্য। বাদী ও প্রতিবাদীর যথানিয়মে ঐ নিজ কর্ত্তব্য না করাই তাঁহাদিগের অপ্রতিপত্তি। বিপরীত বুঝিয়া অথবা যথাকর্ত্তব্য না করিয়া, এই দুই প্রকারেই বাদী ও প্রতিবাদী পরাজিত হইয়া থাকেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি, এই উভয়ই তাঁহাদিগের পরাজয়ের মূল কারণ। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও মহর্ষির সূত্রোক্ত "বিপ্রতিপত্তি" ও "অপ্রতিপত্তি" এই উভয়কেই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সামান্যতঃ নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ। যদি বল, "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি অনেক নিগ্রহস্থান কথিত হওয়ায় নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ, ইহা উপপন্ন হয় না, এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সামান্যতঃ নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ হইলেও উহার ভেদবিস্তর বিবক্ষাবশতঃই অর্থাৎ ঐ দ্বিবিধ নিগ্রহস্থানের আরও অনেক প্রকার ভেদ বলিবার জন্যই মহর্ষি পরে উহার দ্বাবিংশতি প্রকার ভেদ বলিয়াছেন। কিন্তু উহাও উদাহরণ মাত্র; সুতরাং উহার ভেদ অনন্ত। অর্থাৎ ঐ সমস্ত নিগ্রহস্থানের আন্তর্গণিক ভেদ অনন্ত প্রকার সম্ভব হওয়ায় নিগ্রহস্থান অনন্ত প্রকার।

বৌদ্ধসম্প্রদায় গৌতমোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি অনেক নিগ্রহস্থান স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা উহার মধ্যে অনেক নিগ্রহস্থানকে বালকের প্রলাপতুল্য বা উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন এবং শাস্ত্রকারের পক্ষে উহার উল্লেখ করাও নিতান্ত অনুচিত বলিয়া মহর্ষি গৌতমকে উপহাসও করিয়াছেন। পরবর্ত্তী প্রখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তি উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে,[১] বাদী ও প্রতিবাদীর "অসাধনাঙ্গবচন" অর্থাৎ যাহা নিজপক্ষসাধনের অঙ্গ নহে, তাহাকে সাধন বলিয়া উল্লেখ করা এবং "অদোষোদ্ভাবন" অর্থাৎ যাহা দোষ নহে, তাহাকে দোষ বলিয়া উদ্ভাবন করা, ইহাই নিগ্রহস্থান। ইহা ভিন্ন আর কোন নিগ্রহস্থান যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় তাহা স্বীকার করা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত কথার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেও প্রথমে ধর্ম্মকীর্ত্তির "অসাধনাঙ্গবচনং" ইত্যাদি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারাই সংক্ষেপে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু

১। অসাধনাঙ্গবচনমদোষোদ্ভাবনং দ্বয়োঃ।
নিগ্রহস্থানমন্যত্তু ন যুক্তমিতি নেষ্যতে॥

ধর্ম্মকীর্ত্তির "প্রমাণবিনিশ্চয়" নামক যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল, তাহাতেই তিনি উক্ত কারিকা ও উক্ত বিষয়ে বিচার প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা মনে হয়। কিন্তু ঐ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। তিব্বতীয় ভাষায় উহার সম্পূর্ণ অনুবাদ আছে। কেহ কেহ তাহা হইতে মূল উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

উদ্দ্যোতকর ধর্ম্মকীর্ত্তির কোন কারিকা উদ্ধৃত করেন নাই, তিনি তাঁহার নামও করেন নাই। জয়ন্ত ভট্ট ধর্ম্মকীর্ত্তির উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া প্রথমে উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপতঃ নিগ্রহস্থান যে দ্বিবিধ, ইহা ত মহর্ষি গোতমও "বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং" (১।২।১৯) এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। পরন্ত মহর্ষির ঐ সূত্রোক্ত সামান্য লক্ষণের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নিগ্রহস্থানই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তির কথিত লক্ষণের দ্বারা তাহা হয় না। কারণ, যেখানে বাদী বা প্রতিবাদীর উত্তরের স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় তাঁহারা কেহ পরাজিত হইবেন, সেখানে তাঁহার "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে যাঁহার উত্তরের স্ফূর্ত্তি হয় না, তিনি ত যাহা দোষ নহে, তাহা দোষ বলিয়া উদ্ভাবন করেন না এবং যাহা সাধনের অঙ্গ নহে, তাহাও সাধন বলিয়া উল্লেখ করেন না। সুতরাং সেখানে ধর্ম্মকীর্ত্তির মতে তিনি কেন পরাজিত হইবেন? তাঁহার অপরাধ কি? যদি বল, ধর্ম্মকীর্ত্তি যে "অদোষোদ্ভাবন"কে নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, উহার দ্বারা কোন দোষের উদ্ভাবন না করা, এই অর্থও তাঁহার বিবক্ষিত। সুতরাং যে বাদী বা প্রতিবাদী উত্তরের স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় কোন উত্তর বলেন না, সুতরাং কোন দোষোদ্ভাবন করেন না, তিনি ধর্ম্মকীর্ত্তির মতেও নিগৃহীত হইবেন। বস্তুতঃ যাহা দোষ নহে, তাহাকে দোষ বলিয়া উদ্ভাবন এবং দোষের অনুদ্ভাবন, এই উভয়ই "অদোষোদ্ভাবন" শব্দের দ্বারা ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। জয়ন্ত ভট্ট এই কথারও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে শব্দান্তরের দ্বারা গোতমোক্ত "বিপ্রতিপত্তি" ও "অপ্রতিপত্তি"ই নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, কোন দোষের উদ্ভাবন না করা ত গোতমোক্ত অপ্রতিপত্তিই। এইরূপ ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রথমোক্ত "অসাধনাঙ্গবচনং" এই বাক্যের দ্বারা সাধনের অঙ্গ বা সাধনের উল্লেখ না করাও নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইলে উহাও ত অপ্রতিপত্তিই। অতএব শব্দান্তর দ্বারা মহর্ষি অক্ষপাদপাদের নিকটেই শিক্ষা করিয়া তাঁহারই কথিত "বিপ্রতিপত্তি" ও "অপ্রতিপত্তি"রূপ নিগ্রহস্থানদ্বয়কে ধর্ম্মকীর্ত্তি উক্ত শ্লোকের দ্বারা নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কিছুমাত্র নূতন বুঝেন নাই ও বলেন নাই।

ধর্ম্মকীর্ত্তি বলিয়াছেন যে, গোতম প্রথমে সামান্যতঃ নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ বলিলেও পরে যে "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলিই অযুক্ত। যেমন তাঁহার প্রথমোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" কখনই নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্য তাঁহাদিগের নিজপক্ষ সাধনের অঙ্গই নহে, উহা অনাবশ্যক। সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞাবচনই নিগ্রহস্থান। কিন্তু প্রতিজ্ঞার হানি নিগ্রহস্থান নহে। এবং যেরূপ স্থলে "প্রতিজ্ঞাহানি"র উদাহরণ প্রদর্শিত হয়, সেখানে বস্তুতঃ বাদীর প্রতিজ্ঞার হানিও হয় না। পরন্ত সেই স্থলে বাদী ব্যভিচারী হেতুর প্রয়োগ করায় হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের দ্বারাই নিগৃহীত হন, প্রতিজ্ঞাহানির দ্বারা নিগৃহীত হন না। সুতরাং "প্রতিজ্ঞাহানি"র অন্য কোন স্থল বক্তব্য। কিন্তু তাহা নাই, অতএব "প্রতিজ্ঞাহানি" কোনরূপেই নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। এইরূপ গোতমোক্ত "প্রতিজ্ঞান্তর"ও নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কারণ, যিনি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার্থ সাধন

করিতে না পারিয়া সহসা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা বলেন, তিনি ত উন্মত্ত। তাঁহার ঐ উন্মত্তপ্রলাপ শাস্ত্রে লক্ষিত হওয়া উচিত নহে। এইরূপ অর্থশূন্য অবাচক শব্দ প্রয়োগকে যে "নিরর্থক" নামে নিগ্রহস্থান বলা হইয়াছে, উহা ত একেবারেই অযুক্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ঐরূপ নিরর্থক শব্দ প্রয়োগ করে, সে ত বিচারে অধিকারীই নহে। তাহার ঐরূপ উন্মত্তপ্রলাপকেও নিগ্রহস্থান বলা নিতান্তই অযুক্ত। আর তাহা হইলে বাদী বা প্রতিবাদী কোন দুরভিসন্ধিবশতঃ হস্ত দ্বারা নিজের কপোল বা গণ্ডদেশ প্রভৃতি বাজাইয়া অথবা ঐরূপ অন্য কোন কুচেষ্টার দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, সেই কপোলবাদন প্রভৃতিও নিগ্রহস্থান বলা উচিত। গৌতম তাহাও কেন বলেন নাই? তাহাও ত অর্থশূন্য শব্দ অথবা ব্যর্থ কর্ম্ম। উহা করিলেও ত বাদী বা প্রতিবাদী সেখানে অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন। এইরূপ আরও অনেক নিগ্রহস্থান বৌদ্ধসম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।

"ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট পরে যথাস্থানে ধর্ম্মকীর্ত্তির সমস্ত কথার উল্লেখ করিয়া বিচার-পূর্ব্বক সর্ব্বত্রই তাহার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরবর্ত্তী সূত্রোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি"র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্য অবশ্যই তাহাদিগের স্বপক্ষসাধনের অঙ্গ। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী নিজের প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতেই হেতু ও উদাহরণ প্রভৃতি প্রয়োগ করেন। নচেৎ হেতু প্রভৃতি প্রয়োগ করা অসংগত ও অনাবশ্যক। অতএব প্রতিজ্ঞা-বাক্যই যে, স্বপক্ষ সাধনের প্রথম অঙ্গ, ইহা স্বীকার্য্য। তাই উহা প্রথম অবয়ব বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্ম্মকীর্ত্তি উহাকে অবয়বের মধ্যে গ্রহণ না করিলেও পূর্ব্বে অবয়ব ব্যাখ্যায় নানা যুক্তির দ্বারা উহার অবয়বত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগই নিগ্রহ-স্থান, অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাবাক্যের উচ্চারণ করিলেই নিগৃহীত হইবেন, ইহা নিতান্ত অযুক্ত। কিন্তু যে কোন রূপে বাদী বা প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের ত্যাগ হইলে তাঁহারা নিজের প্রতিজ্ঞার্থ সিদ্ধ করিতে না পারায় অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন। সুতরাং "প্রতিজ্ঞাহানি" অবশ্যই নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে। অবশ্য প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুতে ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন করিলে তখন যদি বাদী ঐ দোষের উদ্ধারের জন্য কোন উত্তর না বলেন, তাহা হইলে সেখানে তিনি হেত্বাভাসের দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু "প্রতিজ্ঞাহানি" স্থলে বাদী সেই ব্যভিচার দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই কোন উত্তর বলিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করায় সেখানে তিনি "প্রতিজ্ঞাহানি"র দ্বারাই নিগৃহীত হন। কারণ, প্রতিবাদী সেখানে পরে তাঁহার সেই "প্রতিজ্ঞাহানি"রই উদ্ভাবন করিয়া, তাঁহাকে নিগৃহীত বলেন। অতএব "প্রতিজ্ঞাহানি" নামে পৃথক্ নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে এবং উক্ত যুক্তি অনুসারে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

ধর্ম্মকীর্ত্তি ও তাঁহার সম্প্রদায় যে, গৌতমোক্ত "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহস্থানকে উন্মত্ত-প্রলাপ বলিয়াছেন, তদুত্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, "প্রতিজ্ঞান্তর" স্থলে বাদী তাঁহার হেতুতে প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার-দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই আর কোন পন্থা না দেখিয়া কোন

বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা বলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সাধ্যসিদ্ধির অনুকূল বুঝিয়াই ঐ প্রতিজ্ঞান্তরের প্রয়োগ করায় উহা কখনই তাঁহার উন্মত্ত প্রলাপ বলা যায় না। আর উহাও যদি উন্মত্তপ্রলাপ হয়, তাহা হইলে তোমরা যে "উভয়াসিদ্ধ' নামক হেত্বাভাস স্বীকার করিয়া উহার উদাহরণ বলিয়াছ—"অনিত্যঃ শব্দঃ চাক্ষুষত্বাৎ," এই বাক্য কেন উন্মত্তপ্রলাপ নহে? শব্দের চাক্ষুষত্ব, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই অসিদ্ধ। তাই তোমরা উক্ত স্থলে চাক্ষুষত্বহেতু "উভয়াসিদ্ধ" নামক হেত্বাভাস বলিয়াছ। কিন্তু কোন বালকও কি শব্দকে চাক্ষুষ পদার্থ বলে? তবে অনুন্মত্ত বাদী কেন ঐরূপ প্রয়োগ করিবেন? কোন বাদীই কোন স্থলে ঐরূপ প্রয়োগ না করিলে বা ঐরূপ প্রয়োগ একেবারে অসম্ভব হইলে তোমরা কিরূপে উহা উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছ? তোমাদিগের কথিত ঐ বাক্য উন্মত্তপ্রলাপ নহে, কিন্তু মহর্ষি গোতমোক্ত "প্রতিজ্ঞান্তর" উন্মত্তপ্রলাপ, ইহা বলা ভিক্ষুর পক্ষে নিজের দর্শনে অপূর্ব্ব অনুরাগ অথবা গৌতমের দর্শনে অপূর্ব্ব বিদ্বেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। জয়ন্ত ভট্ট গৌতমোক্ত "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা করিতেও বৌদ্ধসম্প্রদায়কে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি তোমরা এই "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থানের স্পষ্ট উদাহরণ প্রশ্ন কর এবং ক্রুদ্ধ না হও, তাহা হইলে বলি যে, তোমাদিগের সমস্ত বাক্যই "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থানের উদাহরণ। কারণ, বিজ্ঞানমাত্রবাদী তোমাদিগের মতে অর্থ বা বাহ্য পদার্থ অলীক, কোন শব্দেরই বাস্তব বাচ্য অর্থ নাই, শব্দপ্রমাণও নাই। কিন্তু পরলোক-তত্ত্বদর্শী পরিশুদ্ধবোধী মহাবিদ্বান্ শাক্য ভিক্ষুগণও যেমন অর্থশূন্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াও উন্মত্ত নহেন, তদ্রূপ প্রমাদাদিবশতঃ অন্য কোন বাদীও নিরর্থক ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ করিলে তাহাকেও উন্মত্ত বলা যায় না। আর যে, কপোলবাদন ও গণ্ডবাদন প্রভৃতি কেন নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হয় নাই? ইহা বলিয়াছ, কিন্তু উহা ত বাক্যই নহে, উহা "কথা"-স্বভাবই নহে, সুতরাং উহার নিগ্রহস্থানত্ব বিষয়ে কোন চিন্তাই উপস্থিত হইতে পারে না। জয়ন্ত ভট্ট পরে উক্ত সম্প্রদায়কে তিরস্কার করিতেই বলিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর "কথা"র প্রসঙ্গেও যাহার মনে কপোলবাদন, গণ্ডবাদন প্রভৃতিও উপস্থিত হয়, তাহার মনে উহার অপেক্ষায় অতি জঘন্যও আর কিছু উপস্থিত হইতে পারে। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র গৌতমোক্ত "নিরর্থক" নামক নিগ্রহ-স্থানের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কপোলবাদন প্রভৃতি যে উহার লক্ষণাক্রান্তই হয় না, ইহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ "কথা" স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর দুর্ব্বচন ও কপোল-বাদন্ প্রভৃতিকেও নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শেষ কথা এই যে, যে ভাবে "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহস্থানের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, ঐ ভাবে ভেদ স্বীকার করিলে অসংখ্য নিগ্রহস্থান স্বীকার করিতে হয়। নিগ্রহস্থানের পরিগণনাই হইতে পারে না। এতদুত্তরে জয়ন্ত ভট্ট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, নিগ্রহস্থান অসংখ্য প্রকারেই সম্ভব হওয়ায় উহা যে অসংখ্য, ইহা গৌতমেরও সম্মত। কিন্তু তিনি অসংকীর্ণ নিগ্রহস্থানের প্রকারভেদ বলিবার জন্যই উহার দ্বাবিংশতি প্রকারভেদ বলিয়াছেন। একই স্থলে অনেক নিগ্রহস্থানের সঙ্কর হইলে সংকীর্ণ নিগ্রহস্থান অসংখ্য প্রকার হইতে পারে।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "জাতি"র ন্যায় "নিগ্রহস্থান"ও অনন্ত। বস্তুতঃ অসংকীর্ণ নিগ্রহস্থানও আরও অনেক প্রকার হইতে পারে। মহর্ষি গোতমও সর্ব্বশেষ সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা তাহা সূচনা করিয়াছেন, ইহাও বলা যায়। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, যাঁহারা উত্তমবুদ্ধি, তাঁহাদিগের পক্ষে কোন নিগ্রহস্থান সম্ভব না হওয়ায় তাঁহারা অবশ্য নিগৃহীত হন না এবং যাহারা অধমবুদ্ধি, তাহারা "কথা"র অধিকারী না হওয়ায় তাহাদিগের পক্ষে নিগ্রহস্থানের কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু যাঁহারা মধ্যমবুদ্ধি এবং কথার অধিকারী, তাঁহাদিগের পক্ষে নিগ্রহস্থান সম্ভব হওয়ায় তাঁহারাই নিগৃহীত হন। "কথা"স্থলে অনেক সময়ে তাঁহাদিগেরও সভাক্ষোভ বা প্রমাদাদিবশতঃ এবং কোন স্থলে ভাবী পরাজয়ের আশঙ্কায় অনেক প্রকার নিগ্রহস্থান ঘটিয়া থাকে। তাঁহাদিগের পক্ষে সভাক্ষোভ বা প্রমাদাদি অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ মধ্যমবুদ্ধি বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীষামূলক "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামক কথায় কাহারও পরাজয়রূপ নিগ্রহ অবশ্যই হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন নিগ্রহস্থানও অবশ্যই ঘটে। যে যে প্রকারে সেই নিগ্রহস্থান ঘটিতে পারে এবং কোন স্থলে সত্যই ঘটিয়া থাকে, মহর্ষি তাহারই অনেকগুলি প্রকার প্রদর্শন করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় ও জয়-পরাজয় নির্ণয়ের উপায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা যাহাতে বাদী বা প্রতিবাদীর ঐরূপ কোন নিগ্রহস্থান না ঘটে, তজ্জন্য সতত তাঁহাদিগকে অবহিত থাকিবার জন্যও উপদেশ সূচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার বর্ণিত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার "জাতি" ও দ্বাবিংশতি প্রকার "নিগ্রহস্থানে"র মধ্যে কোনটীই একেবারে অসম্ভব মনে করেন নাই। কারণ, সভামধ্যে মধ্যমবুদ্ধি বাদী ও প্রতিবাদীদিগের জিগীষামূলক বিচারে তাঁহাদিগের তৎকালীন বিচিত্র বুদ্ধি বা বিচিত্র অবস্থা তিনি সম্পূর্ণরূপেই জানেন। আর তিনি জানেন,—"কালো হ্যয়ং নিরবধির্ব্বিপুলাচ পৃথ্বী"॥ ১॥

ভাষ্য। তানীমানি দ্বাবিংশতিধা বিভজ্য লক্ষ্যন্তে।

অনুবাদ। সেই এই সমস্ত নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতি প্রকারে বিভাগ করিয়া লক্ষিত হইতেছে অর্থাৎ পরবর্ত্তী দ্বিতীয় সূত্র হইতে মহর্ষি তাঁহার বিভক্ত নিগ্রহস্থান-গুলির যথাক্রমে লক্ষণ বলিতেছেন।

সূত্র। প্রতিদৃষ্টান্ত-ধর্ম্মাভ্যনুজ্ঞা স্বদৃষ্টান্তে প্রতিজ্ঞাহানিঃ॥ ॥২॥৫০৬॥

অনুবাদ। স্বকীয় দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রতিদৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্ম্মের স্বীকার প্রতিজ্ঞা-হানি। অর্থাৎ বাদী নিজ দৃষ্টান্তে প্রতিদৃষ্টান্তের ধর্ম্ম স্বীকার করিলে তৎপ্রযুক্ত তাঁহার "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হয়।

ভাষ্য। সাধ্যধর্ম্মপ্রত্যনীকেন ধর্ম্মেণ প্রত্যবস্থিতে প্রতিদৃষ্টান্তধর্ম্মং

স্বদৃষ্টান্তেহভ্যনুজানন্ প্রতিজ্ঞাং জহাতীতি (১) প্রতিজ্ঞাহানিঃ। নিদর্শনং—'ঐন্দ্রিয়কত্বাদনিত্যঃ শব্দো ঘটব'দিতি কৃতে অপর আহ,—দৃষ্টমৈন্দ্রিয়কত্বং সামান্যে নিত্যে, কস্মান্ন তথা শব্দ ইতি প্রত্যবস্থিতে ইদমাহ —যদ্যৈন্দ্রিয়কং সামান্যং নিত্যং কামং ঘটো নিত্যোহস্ত্বিতি। স খল্বয়ং সাধকস্য দৃষ্টান্তস্য নিত্যত্বং প্রসঞ্জয়ন্ নিগমনান্তমেব পক্ষং জহাতি। পক্ষং জহৎ প্রতিজ্ঞাং জহাতীত্যুচ্যতে, প্রতিজ্ঞাশ্রয়ত্বাৎ পক্ষস্যেতি।

অনুবাদ। সাধ্যধর্ম্মের বিরোধী ধর্ম্মের দ্বারা (প্রতিবাদী) প্রত্যবস্থান করিলে অর্থাৎ বাদীর হেতুতে কোন দোষ বলিলে (বাদী) স্বকীয় দৃষ্টান্তে প্রতিদৃষ্টান্তের ধর্ম্ম স্বীকার করত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেন, এ জন্য (১) "প্রতিজ্ঞাহানি" হয়।

উদাহরণ যথা—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বপ্রযুক্ত শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য, এইরূপে (বাদী নিজ পক্ষ স্থাপন) করিলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন, নিত্যসামান্যে অর্থাৎ ঘটত্ব প্রভৃতি নিত্য জাতি পদার্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব দৃষ্ট হয়, শব্দ কেন সেইরূপ নহে ? অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাতির ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দও কেন নিত্য হইবে না ? এইরূপ প্রত্যবস্থান করিলে (বাদী) ইহা বলিলেন,—যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামান্য (ঘটত্বাদি) নিত্য হয়, আচ্ছা ঘটও নিত্য হউক ? অর্থাৎ আমার নিজদৃষ্টান্ত যে ঘট, তাহার নিত্যত্বই স্বীকার করিব। সেই এই বাদী অর্থাৎ উক্ত স্থলে যিনি ঐরূপ বলেন, তিনি সাধক দৃষ্টান্তের অর্থাৎ অনিত্য বলিয়া গৃহীত নিজদৃষ্টান্ত ঘটের নিত্যত্ব প্রসঞ্জন করায় নিগমন পর্য্যন্ত পক্ষই ত্যাগ করেন। পক্ষ ত্যাগ করায় প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলেন—ইহা কথিত হয়। কারণ, পক্ষ প্রতিজ্ঞাশ্রিত।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার প্রথমোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের পরে প্রতিবাদী বাদীর সেই সাধ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্মের দ্বারা বাদীর হেতুতে কোন দোষ প্রদর্শন করিলে, তখন যদি বাদী তাঁহার নিজ দৃষ্টান্তে প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিদৃষ্টান্তের ধর্ম্ম স্বীকারই করেন, তাহা হইলে তখন তাঁহার সেই নিগমন পর্য্যন্ত পক্ষেরই ত্যাগ হওয়ায় "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হয়। যেমন কোন বাদী "শব্দোহনিত্য ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি ন্যায়বাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্দের অনিত্যত্ব সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বলিলেন যে, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব হেতুর দ্বারা ঘটদৃষ্টান্তে শব্দকে অনিত্য বলিয়া সাধন করিতেছ, ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব ত ঘটত্বাদি জাতিতেও আছে। কারণ, ঘটাদির ন্যায় তদ্গত ঘটত্বাদি জাতিরও প্রত্যক্ষ হয় এবং ঐ জাতি নিত্য বলিয়াই স্বীকৃত। তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব হেতুর দ্বারা ঘটত্বাদি জাতির ন্যায় শব্দের নিত্যত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না ? যদি বল, অনিত্য ঘটাদি পদার্থেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব থাকায়

উহা নিত্যত্বের ব্যভিচারী। তাহা হইলে উহা নিত্য ও অনিত্য, উভয় পদার্থেই বিদ্যমান থাকায় উহা অনিত্যত্বেরও ব্যভিচারী। সুতরাং ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রতিবাদী উক্তরূপে বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিলে তখন বাদী যদি বলেন যে, আচ্ছা, ঘট নিত্য হউক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটত্বজাতি যখন নিত্য, তখন তদ্দৃষ্টান্তে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটকেও নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিব। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্ম্ম যে অনিত্যত্ব, তাহার বিরুদ্ধ নিত্যত্ব ধর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ ঘটত্বাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাতিতে নিত্যত্ব ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া, বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিলে তখন বাদী, প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিদৃষ্টান্ত যে, ঘটত্বাদি জাতি, তাহার ধর্ম্ম যে নিত্যত্ব, তাহা নিজ দৃষ্টান্ত ঘটে স্বীকার করায় এই সূত্রানুসারে তাঁহার "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হয়।

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, উক্ত স্থলে বাদীর দৃষ্টান্তহানিই হয়, প্রতিজ্ঞাহানি কিরূপে হইবে? তিনি ত তাঁহার "অনিত্যঃ শব্দঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্য পরিত্যাগ করেন না। এ জন্য ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার কথিত দৃষ্টান্ত ঘটের নিত্যত্ব স্বীকার করায় ফলতঃ তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে নিগমনবাক্য পর্য্যন্ত পক্ষই ত্যাগ করেন। সুতরাং তিনি তখন প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলেন, ইহা কথিত হয়। কারণ, যাহা পক্ষ, তাহা প্রতিজ্ঞাশ্রিত। এখানে বাদীর নিজ পক্ষের সাধন প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত ন্যায়বাক্যই "পক্ষ" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিলে ঐ ন্যায়বাক্যরূপ পক্ষ বলা যায় না। তাই ঐ পক্ষকে বলা হইয়াছে প্রতিজ্ঞাশ্রিত। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী প্রথমে অনিত্য ঘটকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া শব্দকে অনিত্য বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন। পরে প্রতিবাদী বাদীর কথিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বরূপ হেতুতে অনিত্যত্বের ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে বাদী তখন তাঁহার কথিত দৃষ্টান্ত ঘটকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করায় ঘটের ন্যায় শব্দ অনিত্য, এই কথা তিনি আর বলিতে পারেন না। পরন্তু ঘটের ন্যায় শব্দও নিত্য, ইহাই তাঁহার স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে উক্ত স্থলে তিনি ঘট নিত্য হউক, এই কথা বলিয়া ফলতঃ তাঁহার পূর্ব্বকথিত "অনিত্যঃ শব্দঃ" এই প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যরূপ পক্ষই পরিত্যাগ করায় তাঁহার "প্রতিজ্ঞা-হানি" অবশ্যই হইবে।

কিন্তু বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, বাদী উক্ত স্থলে স্পষ্ট কথায় শব্দ অনিত্য, এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরিত্যাগ না করায় তাঁহার "প্রতিজ্ঞাহানি" বলা যায় না। উক্ত স্থলে তাঁহার দৃষ্টান্তহানিই হয়। সুতরাং দৃষ্টান্তা-সিদ্ধি দোষপ্রযুক্তই তাঁহার নিগ্রহ হইবে। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী যদি স্পষ্ট কথায় বলেন যে, তাহা হইলে শব্দ নিত্যই হউক? শব্দকে নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিব? তাহা হইলেই বাদীর "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের যুক্তি সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদি দৃষ্টান্তের পরিত্যাগবশতঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসিদ্ধি না হওয়ায় পক্ষ ত্যাগপ্রযুক্তই প্রতিজ্ঞাহানি বলা যায়, তাহা হইলে সমস্ত দোষ স্থলেই পক্ষত্যাগপ্রযুক্ত

"প্রতিজ্ঞাহানি" স্বীকার করিতে হয়। উদ্দ্যোতকর পরে তাঁহার উক্ত মতানুসারে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,[১] সূত্রে "স্বদৃষ্টান্ত" শব্দের অর্থ এখানে স্বপক্ষ এবং "প্রতিদৃষ্টান্ত" শব্দের অর্থ প্রতিপক্ষ। বাদীর সাধ্য ধর্ম্মীই এখানে "স্বপক্ষ" শব্দের দ্বারা তাঁহার অভিমত এবং সাধ্যধর্ম্মশূন্য বিপক্ষই "প্রতিপক্ষ" শব্দের দ্বারা অভিমত। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দ বাদীর স্বপক্ষ এবং ঘটত্বাদি জাতি প্রতিপক্ষ। সুতরাং উক্ত স্থলে বাদী যদি শব্দ নিত্য হউক ? এই কথা বলিয়া তাঁহার স্বপক্ষ শব্দে প্রতিপক্ষ জাতির ধর্ম্ম নিতান্ত স্বীকার করেন, তাহা হইলে মহর্ষির এই সূত্রানুসারে তাঁহার "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্তু মহর্ষির এই সূত্রদ্বারা সরলভাবে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার উদ্দ্যোতকরের ন্যায় কষ্টকল্পনা করিয়া উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট এবং "ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে"র "লঘুবৃত্তি"কার মণিভদ্র সূরি প্রভৃতিও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য অন্যান্য দোষ স্থলেও বাদীর প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত বাক্যরূপ পক্ষের পরিত্যাগপ্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সমস্ত স্থলে বাদী তাঁহার নিজের দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রতিদৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্ম্ম স্বীকার না করায় তৎপ্রযুক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে না। যেখানে নিজ দৃষ্টান্তে প্রতিদৃষ্টান্তের ধর্ম্ম স্বীকার করায় পক্ষত্যাগপ্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ হয়, সেখানেই "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা তাহাই বুঝা যায়।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে "প্রতিজ্ঞাহানি" শব্দ দ্বারাই "প্রতিজ্ঞাহানি"র লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। প্রতিজ্ঞার হানিই সূত্রার্থ। কিন্তু "প্রতিজ্ঞাহানি" শব্দের নিরুক্তির দ্বারাই "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সিদ্ধ হইলেও মহর্ষি যখন "প্রতিদৃষ্টান্তধর্ম্মাভ্যনুজ্ঞা স্বদৃষ্টান্তে" এই বাক্যও বলিয়াছেন, তখন উহার দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার "প্রতিজ্ঞাহানি"র লক্ষণ সূচিত হইয়াছে বুঝা যায়। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী শব্দ নিত্য হউক ? এই কথা বলিলে যেমন তাঁহার "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে, তদ্রূপ ঘট নিত্য হউক ? এই কথা বলিলেও তাঁহার "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। উহা দ্বিতীয় প্রকার "প্রতিজ্ঞাহানি"। উদয়নাচার্য্যের কথানুসারে যদি মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য্যই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের প্রদর্শিত উদাহরণদ্বয়ই সংগৃহীত হওয়ায় উভয় মতের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

বস্তুতঃ মহর্ষির এই সূত্রে "প্রতিজ্ঞা" শব্দ ও "দৃষ্টান্ত" প্রভৃতি শব্দ প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা বাদী অথবা প্রতিবাদীর কথিত পক্ষ, সাধ্য, হেতু, দৃষ্টান্ত ও তদ্ভিন্ন দূষণাদি সমস্তই বুঝিতে হইবে। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের উক্তরূপ মতানুসারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদী অথবা প্রতিবাদী প্রথমে যে পক্ষ, সাধ্য, হেতু দৃষ্টান্ত ও দূষণ বলেন,

---

১। দৃষ্টশ্চাসাবন্তে (নিগমনে) ব্যবস্থিত ইতি দৃষ্টান্তঃ, স্বশ্চাসৌ দৃষ্টান্তশ্চেতি "স্বদৃষ্টান্ত"শব্দেন স্বপক্ষ এবাভিধীয়তে। "প্রতিদৃষ্টান্ত"শব্দেন চ প্রতিপক্ষঃ, প্রতিপক্ষশ্চাসৌ দৃষ্টান্তশ্চেতি। এতদুক্তং ভবতি,] পরপক্ষস্য যো ধর্ম্মস্তং স্বপক্ষ এবাভ্যনুজানাতীতি, ইত্যাদি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

তন্মধ্যে পরে উহার যে কোন পদার্থের পরিত্যাগ করিলেই সেই স্থলে "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহ-স্থান হইবে। অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদীর নিজের উক্তহানিই প্রতিজ্ঞাহানি। উক্তহানিই উহার সার্থক সামান্য নাম। "প্রতিজ্ঞাহানি" এইটি উপলক্ষণ নাম। ফলকথা, বাদী বা প্রতিবাদী কণ্ঠতঃ স্পষ্ট ভাষায় অথবা অর্থতঃ তাঁহাদিগের কথিত পক্ষ প্রভৃতি যে কোন পদার্থের অথবা তাহাতে কথিত বিশেষণের পরিত্যাগ করিলেই সেই সমস্ত স্থলেই তুল্য যুক্তিতে "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে, সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণও "প্রতিজ্ঞাহানি" বলিয়া স্বীকার্য্য। বরদরাজ উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সমস্ত উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়া পঞ্চবিধ "প্রতিজ্ঞাহানি"র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যাহাতে স্বকীয় দৃষ্টান্ত আছে, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস গ্রহণ করিয়া সূত্রোক্ত "স্বদৃষ্টান্ত" শব্দের দ্বারা স্বপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহাতে প্রতিকূল দৃষ্টান্ত আছে, এই অর্থে "প্রতিদৃষ্টান্ত" শব্দের দ্বারা পর-পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে "প্রতিজ্ঞাহানি"র অন্যান্য উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। অন্যান্য কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে ॥২॥

সূত্র। প্রতিজ্ঞাতার্থ-প্রতিষেধে ধর্ম্মবিকল্পাত্তদর্থ-নির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞান্তরম্ ॥৩॥৫০৭॥

অনুবাদ। প্রতিজ্ঞাতার্থের প্রতিষেধ করিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার প্রতিজ্ঞাতার্থের অসিদ্ধি সমর্থন করিলে ধর্ম্মবিকল্পপ্রযুক্ত অর্থাৎ কোন ধর্ম্মবিশেষকে সেই প্রতিজ্ঞাতার্থের বিশেষণরূপে উল্লেখ করিয়া (বাদী কর্ত্তৃক) "তদর্থনির্দ্দেশ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাতার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার সাধ্য নির্দ্দেশ (২) প্রতিজ্ঞান্তর।

ভাষ্য। প্রতিজ্ঞাতার্থো'ঽনিত্যঃ শব্দ ঐন্দ্রিয়কত্বাদ্‌ঘটব'দিত্যুক্তে যোঽস্য প্রতিষেধঃ প্রতিদৃষ্টান্তেন হেতুব্যভিচারঃ সামান্যমৈন্দ্রিয়কং নিত্যমিতি তস্মিংশ্চ প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধে, "ধর্ম্মবিকল্পা"দিতি দৃষ্টান্ত-প্রতিদৃষ্টান্তয়োঃ সাধর্ম্ম্যযোগে ধর্ম্মভেদাৎ সামান্যমৈন্দ্রিয়কং সর্ব্বগত-মৈন্দ্রিয়কস্ত্বসর্ব্বগতো ঘট ইতি ধর্ম্মবিকল্পাৎ, "তদর্থনির্দ্দেশ" ইতি সাধ্য-সিদ্ধ্যর্থং। কথং? যথা ঘটোঽসর্ব্বগত এবং শব্দোঽপ্যসর্ব্বগতো ঘটব-দেবানিত্য ইতি। তত্রানিত্যঃ শব্দ ইতি পূর্ব্বা প্রতিজ্ঞা। অসর্ব্বগত ইতি দ্বিতীয়া প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞান্তরং।

তৎ কথং নিগ্রহস্থানমিতি? ন প্রতিজ্ঞায়াঃ সাধনং প্রতিজ্ঞান্তরং, কিন্তু হেতুদৃষ্টান্তৌ সাধনং প্রতিজ্ঞায়াঃ। তদেতদসাধনোপাদানমনর্থকমিতি, আনর্থক্যান্নিগ্রহস্থানমিতি।

অনুবাদ। "প্রতিজ্ঞাতার্থ" (যথা)—শব্দ অনিত্য, যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যেমন ঘট, ইহা কথিত হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী কর্ত্তৃক যে পদার্থ প্রতিজ্ঞাত হয়, ইহার যে প্রতিষেধ (অর্থাৎ) প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারা হেতুর ব্যভিচার (যেমন) সামান্য (জাতি) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিত্য। সেই "প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধ" প্রদর্শিত হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর কথিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব হেতুতে তাহার সাধ্য ধর্ম্ম অনিত্যত্বের ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে। "ধর্ম্মবিকল্পাৎ" এই বাক্যের অর্থ—দৃষ্টান্ত ও প্রতিদৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্য সত্ত্বে ধর্ম্মভেদপ্রযুক্ত। (যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে) সামান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব্বগত, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘট অসর্ব্বগত, এইরূপ ধর্ম্মবিকল্পপ্রযুক্ত। "তদর্থনির্দ্দেশ" এই বাক্যের অর্থ সাধ্যসিদ্ধ্যর্থ নির্দ্দেশ। (প্রশ্ন?) কিরূপ? অর্থাৎ পুনর্ব্বার বাদীর সেই নির্দ্দেশ কিরূপ? (উত্তর) যেমন ঘট অসর্ব্বগত, এইরূপ শব্দও অসর্ব্বগত ও ঘটের ন্যায়ই অনিত্য। সেই স্থলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দ অনিত্য, ইহা (বাদীর) প্রথম প্রতিজ্ঞা, শব্দ অসর্ব্বগত, ইহা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা (২) প্রতিজ্ঞান্তর।

(প্রশ্ন) তাহা কেন নিগ্রহস্থান হইবে? (উত্তর) প্রতিজ্ঞান্তর প্রতিজ্ঞার সাধন নহে, কিন্তু হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রতিজ্ঞার সাধন। সেই এই অসাধনের উপাদান নিরর্থক, নিরর্থকত্বপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থান।

টিপ্পনী। "প্রতিজ্ঞাহানি"র পরে এই সূত্রের দ্বারা "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক দ্বিতীয় প্রকার নিগ্রহস্থানের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্থলেই যথাক্রমে সূত্রোক্ত "প্রতিজ্ঞাতার্থ" শব্দ, "প্রতিষেধ" শব্দ, "ধর্ম্মবিকল্প" শব্দ এবং "তদর্থনির্দ্দেশ" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া, উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে কোন নৈয়ায়িক বাদী "শব্দোহনিত্য ঐন্দ্রিয়কত্বাদ্‌ঘটবৎ" ইত্যাদি ন্যায়বাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্দে অনিত্যত্ব ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলেন। উক্ত স্থলে শব্দে অনিত্যত্ব বা অনিত্যত্বরূপে শব্দই বাদীর প্রতিজ্ঞাতার্থ। পরে প্রতিবাদী মীমাংসক দ্বিতীয় পক্ষস্থ হইয়া বলিলেন যে, ঘটত্বাদি জাতিও ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু তাহা অনিত্য নহে—নিত্য। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হওয়ায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হইতে পারে না। উক্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতুতে প্রতিবাদী উক্তরূপে যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলেন, উহাই বাদীর প্রতিজ্ঞাতার্থের প্রতিষেধ। পরে উক্ত

ব্যভিচার নিরাকরণের উদ্দেশ্যে বাদী নৈয়ায়িক তৃতীয় পক্ষস্থ হইয়া বলিলেন যে, ঘটত্বাদি জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বগত অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ের সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ঘট সর্ব্বগত নহে—অসর্ব্বগত। এইরূপ শব্দও অসর্ব্বগত, এবং ঘটের ন্যায়ই অনিত্য। বাদী এই কথা বলিয়া তাঁহার নিজ দৃষ্টান্ত ঘট এবং প্রতিদৃষ্টান্ত জাতির যে অসর্ব্বগতত্ব ও সর্ব্বগতত্বরূপ ধর্ম্মভেদ প্রকাশ করিলেন, ঐ ধর্ম্মভেদই উক্ত স্থলে সূত্রোক্ত "ধর্ম্মবিকল্প"। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "ধর্ম্মবিকল্প" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—দৃষ্টান্ত ও প্রতিদৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্য সত্ত্বে ধর্ম্মভেদ এবং পরে প্রকৃত স্থলে ঐ ধর্ম্মবিকল্প ব্যক্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাতি সর্ব্বগত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘট অসর্ব্বগত। অর্থাৎ জাতি ও ঘটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বরূপ সাধর্ম্ম্য আছে এবং সর্ব্বগতত্ব ও অসর্ব্বগতত্বরূপ ধর্ম্মভেদ আছে। সুতরাং উহা ধর্ম্মবিকল্প। ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত "তদর্থনির্দ্দেশ" শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে "তদর্থ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সাধ্যসিদ্ধ্যর্থ। অর্থাৎ বাদী তাঁহার সাধ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার যে নির্দ্দেশ করেন, তাহাই সূত্রোক্ত "তদর্থনির্দ্দেশ"। উক্ত স্থলে তাহা কিরূপ নির্দ্দেশ? ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষ্যকার নিজেই প্রশ্নপূর্ব্বক পরে বলিয়াছেন যে, যেমন ঘট অসর্ব্বগত, তদ্রূপ শব্দও অসর্ব্বগত ও ঘটের ন্যায়ই অনিত্য। উক্ত স্থলে "শব্দ অনিত্য" ইহা বাদীর প্রথম প্রতিজ্ঞা। "শব্দ অসর্ব্বগত" ইহা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা। ভাষ্যকার ঐ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাকেই উক্ত স্থলে বাদীর "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। কিন্তু বার্ত্তিককার উক্ত স্থলে "অসর্ব্বগতঃ শব্দোঽনিত্যঃ" এইরূপ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাকেই "প্রতিজ্ঞান্তর" বলিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী মীমাংসক বাদীর হেতুতে যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ ব্যভিচার নিরাকরণের জন্য পরে "অসর্ব্বগতত্বে সতি ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ" এইরূপ হেতুবাক্যই বাদীর বিবক্ষিত। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর বিবক্ষা এই যে, যাহা অসর্ব্বগত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা অনিত্য। ঘটত্বাদি জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও অসর্ব্বগত নহে। সুতরাং তাহাতে ঐ বিশিষ্ট হেতু না থাকায় প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ঐ ব্যভিচার নাই। কিন্তু প্রতিবাদী মীমাংসক শব্দকেও জাতির ন্যায় সর্ব্বগতই বলেন। কারণ, তাঁহার মতে বর্ণাত্মক শব্দের কোন স্থানবিশেষে উৎপত্তি হয় না। উহা সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। সুতরাং উহা নিত্য বিভু। তাহা হইলে বাদীর বিবক্ষিত ঐ বিশিষ্ট হেতু শব্দে না থাকায় উহা শব্দের অনিত্যত্বসাধক হয় না। যে হেতু প্রতিবাদীর মতে অসিদ্ধ, তাহা সিদ্ধ না করিলে তাহাকে হেতু বলা যায় না। তাই বাদী নৈয়ায়িক শব্দ অসর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই পরে "শব্দোঽসর্ব্বগতঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করায় উহা তাঁহার "প্রতিজ্ঞান্তর"-নামক নিগ্রহস্থান হইবে। উক্ত স্থলে বাদী "অসর্ব্বগতত্বে সতি ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ" এইরূপ হেতু-বাক্য প্রয়োগ করিলে তাঁহার "হেত্বন্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্তু বাদী তাহা করেন না। তিনি পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে "শব্দোঽসর্ব্বগতঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যমাত্র প্রয়োগ করিয়াই বিরত হন। তাঁহার ঐ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হেতুশূন্য হইলেও প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় উহা প্রতিজ্ঞান্তর

বলা যায়। উক্ত স্থলে বাদী যখন প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই পরে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তখন উক্ত স্থলে তিনি তাঁহার হেতুর ব্যভিচারিত্বপ্রযুক্ত নিগৃহীত হইবেন না। কিন্তু প্রতিজ্ঞান্তরপ্রযুক্তই নিগৃহীত হইবেন। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও ভাষ্যকারের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

উক্ত স্থলে বাদীর ঐ প্রতিজ্ঞান্তর নিগ্রহস্থান হইবে কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে প্রশ্নপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রথমে যে, "শব্দোঽনিত্যঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, উহার সাধন নাই। তাঁহার শেষোক্ত প্রতিজ্ঞান্তর ঐ প্রতিজ্ঞার সাধন নহে। কিন্তু প্রকৃত নির্দ্দোষ হেতু ও দৃষ্টান্তই উহার সাধন। তিনি তাহা না বলিয়া, যে প্রতিজ্ঞান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, উহা অসাধনের গ্রহণ, সুতরাং নিরর্থক। নিরর্থকত্ববশতঃ উহা তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান। বস্তুতঃ উক্ত স্থলে বাদী পরে "অসর্ব্বগতঃ শব্দোঽনিত্যঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা বলিলেও উক্ত যুক্তিতে "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। এবং বাদী মীমাংসক "শব্দো নিত্যঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক যদি ধ্বন্যাত্মক শব্দে নিত্যত্ব নাই বলিয়া অংশতঃ বাধদোষ প্রদর্শন করেন, তখন ঐ বাধদোষের উদ্ধারের জন্য বাদী মীমাংসক যদি "বর্ণাত্মকঃ শব্দো নিত্যঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা বলেন, তাহা হইলে উহাও তখন তাঁহার "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার সাধ্যধর্ম্মী শব্দে বর্ণাত্মকত্ব বিশেষণের উল্লেখ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা বলেন, উহা তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা, সুতরাং প্রতিজ্ঞান্তর। উক্ত স্থলে তিনি তাঁহার প্রথম প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলেও একেবারে নিজের পক্ষ বা কোন পদার্থের ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু প্রথম প্রতিজ্ঞার্থই ঐরূপ বিশেষণবিশিষ্ট করিয়া দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত স্থলে তাঁহার "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে না। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাকে একেবারে ত্যাগ করিলেই সেখানে "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হয়। কিন্তু "প্রতিজ্ঞান্তর" স্থলে বাদী নিজপক্ষ ত্যাগ না করায় পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার পরিত্যাগ হয় না, ইহাই বিশেষ।

এইরূপ বাদী বা প্রতিবাদী যদি তাঁহাদিগের হেতু ভিন্ন সাধ্যধর্ম্ম বা দৃষ্টান্ত প্রভৃতি যে কোন পদার্থেও কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিয়া, পরে নিজের অনুমানের সংশোধন করেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত স্থলেও তাঁহাদিগের "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের সূক্ষ্ম বিচারানুসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ উক্তরূপেই "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া, তদনুসারে অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়া অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, সূত্রে "প্রতিজ্ঞাতার্থস্য" এই বাক্যটি প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর অনুমান প্রয়োগ স্থলে হেতু ভিন্ন সমস্ত পদার্থই বুঝিতে হইবে। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির যুক্তি এই যে, বাদী বা প্রতিবাদী তাঁহাদিগের কথিত হেতু পদার্থে পরে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিলে সেখানে "হেত্বন্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহা মহর্ষি পরে পৃথক্ উল্লেখ করায় উহা তাঁহার মতে "প্রতিজ্ঞান্তর"নামক নিগ্রহস্থান হইতে ভিন্ন, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু সাধ্যধর্ম্ম বা

দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অন্যান্য যে কোন পদার্থে পরে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিলে, সেই সমস্ত স্থলে যে নিগ্রহস্থান, তাহাও মহর্ষির মতে "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহস্থানেরই অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। কারণ, "হেত্বন্তরে"র ন্যায় "উদাহরণান্তর" ও "উপনয়ান্তর" প্রভৃতি নামে মহর্ষি পৃথক্ কোন নিগ্রহস্থান বলেন নাই। কিন্তু তুল্য যুক্তিতে ঐ সমস্তও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। কারণ, তুল্য যুক্তিতে ঐ সমস্ত দ্বারাও বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তি বুঝা যায়। সুতরাং উক্তরূপ স্থলেও তাঁহারা নিগ্রহার্হ ॥৩॥

সূত্র। প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্ব্বিরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ ॥ ॥৪॥৫০৮॥

অনুবাদ। প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধ অর্থাৎ হেতুবাক্যের সহিত প্রতিজ্ঞা-বাক্যের বিরোধ অথবা প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত হেতুবাক্যের বিরোধ (৩) "প্রতিজ্ঞা-বিরোধ"।

ভাষ্য। "গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্য"মিতি প্রতিজ্ঞা। "রূপাদিতোঽর্থান্তর-স্যানুপলব্ধে"রিতি হেতুঃ। সোঽয়ং প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্ব্বিরোধঃ। কথং? যদি গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং, রূপাদিভ্যোঽর্থান্তরস্যানুপলব্ধির্নোপপদ্যতে। অথ রূপাদিভ্যোঽর্থান্তরস্যানুপলব্ধির্গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যমিতি নোপ-পদ্যতে। গুণব্যতিরিক্তঞ্চ দ্রব্যং, রূপাদিভ্যশ্চার্থান্তরস্যানুপলব্ধির্ব্বিরুধ্যতে ব্যাহন্যতে ন সম্ভবতীতি।

অনুবাদ। 'গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং'—ইহা প্রতিজ্ঞাবাক্য। 'রূপাদিতো-ঽর্থান্তরস্যানুপলব্ধেঃ'—ইহা হেতুবাক্য। সেই ইহা প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্যের বিরোধ। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যদি দ্রব্য, গুণব্যতিরিক্ত অর্থাৎ রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন হয়, রূপাদি হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলব্ধি উপপন্ন হয় না। আর যদি রূপাদি হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলব্ধি হয়, তাহা হইলে গুণব্যতিরিক্ত দ্রব্য অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থ তাহার রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন, ইহা উপপন্ন হয় না। দ্রব্য গুণ হইতে ভিন্ন এবং রূপাদি হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলব্ধি বিরুদ্ধ হয় (অর্থাৎ) ব্যাহত হয়, সম্ভব হয় না।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামক তৃতীয় নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, তদ্দ্বারা সূত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন কোন বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলেন,—"গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং"। বাদীর প্রতিজ্ঞার্থ এই

যে, ঘটাদি দ্রব্য তাহার রূপরসাদি গুণ হইতে ভিন্ন, গুণ ও গুণী ভিন্ন পদার্থ। বাদী পরে হেতুবাক্য বলিলেন,—"রূপাদিতোঽর্থান্তরস্যানুপলব্ধেঃ"। অর্থাৎ যেহেতু রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থের উপলব্ধি হয় না; রূপাদি গুণেরই উপলব্ধি হয়। কিন্তু এখানে বাদীর ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধার্থক বলিয়া বিরুদ্ধ। কারণ, ঘটাদি দ্রব্যকে তাহার গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিলে ভিন্নরূপে উহার উপলব্ধিই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে পরে আর উহার ঐরূপে অনুপলব্ধি বলা যায় না। কারণ, তাহা বলিলে আবার দ্রব্য ও গুণকে অভিন্নই বলা হয়। সুতরাং ঘটাদি দ্রব্য তাহার গুণ হইতে ভিন্ন এবং ঐ গুণ হইতে ভিন্ন দ্রব্যের অনুপলব্ধি, ইহা পরস্পর ব্যাহত অর্থাৎ সম্ভবই হয় না। অতএব উক্ত স্থলে বাদীর ঐ হেতুবাক্যের সহিত তাঁহার ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধবশতঃ উহা তাঁহার পক্ষে "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামক নিগ্রহস্থান।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এখানে এই সূত্র দ্বারা "প্রতিজ্ঞাবিরোধে"র ন্যায় "হেতুবিরোধ" এবং "দৃষ্টান্তবিরোধ" প্রভৃতি নিগ্রহস্থানেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতিও এই সূত্রের প্রথমোক্ত "প্রতিজ্ঞা"শব্দ ও "হেতু"শব্দকে প্রতিযোগী মাত্রের উপলক্ষণ বলিয়া, উহার দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রভৃতি প্রতিযোগী পদার্থও গ্রহণ করিয়াছেন এবং সূত্রের "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" শব্দের অন্তর্গত "প্রতিজ্ঞা" শব্দকেও উপলক্ষণার্থ বলিয়া, উহার দ্বারা "হেতুবিরোধ" ও "দৃষ্টান্তবিরোধ" প্রভৃতিকেও লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ঐ সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই সংগ্রহের জন্য সূত্রতাৎপর্য্যার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যগত যে সমস্ত পদার্থের পরস্পর বিরোধ প্রতীত হয়, সেই সমস্ত বিরোধই নিগ্রহস্থান। উহা প্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেতুবিরোধ, দৃষ্টান্তবিরোধ প্রভৃতি নামে বহুবিধ। বাদীর হেতুবাক্যের সহিত তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধ হইলে উহা হেতুবিরোধ। উদ্দ্যোতকর ইহার পৃথক্ উদাহরণ বলিয়াছেন। উক্ত মতে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণও "হেতুবিরোধ"। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য স্ববচন-বিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যের অন্তর্গত পদদ্বয়েরই পরস্পর বিরোধ হইলে, সেখানে উহা "প্রতিজ্ঞাবিরোধ"। উদ্দ্যোতকর ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন,—"শ্রমণা গর্ভিণী" অর্থাৎ কোন বাদী "শ্রমণা গর্ভিণী" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে উহার অন্তর্গত পদদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ। কারণ, শ্রমণা (সন্ন্যাসিনী) বলিলে তাহাকে গর্ভিণী বলা যায় না। গর্ভিণী বলিলে তাহাকে শ্রমণা বলা যায় না। এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত দৃষ্টান্তের বিরোধ, দৃষ্টান্তাদির সহিত হেতুর বিরোধ, এবং প্রতিজ্ঞা ও হেতুর প্রমাণবিরোধও বুঝিতে হইবে। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উক্তরূপ বহুপ্রকার বিরোধকেই এই সূত্র দ্বারা নিগ্রহস্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, তুল্য যুক্তিতে ঐ সমস্ত বিরোধও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উক্ত যুক্তি অনুসারে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সূত্রের প্রথমোক্ত "প্রতিজ্ঞা" শব্দ ও "হেতু" শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর কথা-কালীন বাক্যমাত্রই বিবক্ষিত। অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর যে কোন নিজ বাক্যার্থবিরোধই "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামক নিগ্রহস্থান।

এখানে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণে বাদীর নিজমতে তাঁহার হেতুই অসিদ্ধ।

কারণ, যিনি ঘটাদি দ্রব্যকে রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থই বলেন, তাঁহার মতে উক্ত হেতুই নাই। উক্ত স্থলে বাদী যদি প্রমাণ দ্বারা উহা সিদ্ধ করেন, তাহা হইলেও উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। কারণ, যে হেতু স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, তাহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেমন শব্দনিত্যত্ববাদী মীমাংসক "শব্দো নিত্যঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়া যদি "কার্য্যত্বাৎ" এই হেতুবাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কথিত ঐ কার্য্যত্ব হেতু বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। কারণ, শব্দে নিত্যত্ব থাকিলে তাহাতে কার্য্যত্ব থাকিতে পারে না। কার্য্যত্ব নিত্যত্বের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত স্থলেও "বিরুদ্ধ" নামক হেত্বাভাস হওয়ায় উহাই বাদীর পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে। সুতরাং "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামে পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকার অনাবশ্যক ও অযুক্ত। বৌদ্ধসম্প্রদায় পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তির দ্বারা এই "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামক নিগ্রহস্থানেরও খণ্ডন করিয়াছিলেন। পরে বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি তাঁহাদিগের সমস্ত কথারই প্রতিবাদ করিয়া সমাধান করিয়া গিয়াছেন। এখানে তাঁহাদিগের সমাধানের মর্ম্ম এই যে, পূর্ব্বোক্তরূপ স্থলে বাদীর হেতু বস্তুতঃ অসিদ্ধ বা বিরুদ্ধ হইলেও সেই হেত্বাভাস-জ্ঞানের পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞাবিরোধের জ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেমন কেহ প্রথমে "অস্তি" বলিয়া, পরেই "নাস্তি" বলিলে তখনই ঐ বাক্যদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ বুঝা যায়, তদ্রূপ উক্ত স্থলে ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে ঐ হেতুবাক্যের উচ্চারণ করিলেই তখন ঐ হেতুতে ব্যাপ্তি-চিন্তার পূর্ব্বেই ঐ বাক্যদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু "বিরুদ্ধ" নামক হেত্বাভাসের জ্ঞানস্থলে ব্যাপ্তি স্মরণের পরে তৎপ্রযুক্তই হেতুতে সাধ্যের বিরোধ প্রতীত হয়। সুতরাং উক্ত স্থলে পূর্ব্ব-প্রতীত "প্রতিজ্ঞাবিরোধ"ই নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। কারণ, প্রথমেই উহার দ্বারাই বাদীর বিপ্রতিপত্তির অনুমান হওয়ায় উহার দ্বারাই সেই বাদী নিগৃহীত হন। পরে হেত্বাভাসজ্ঞান হইলেও সেই হেত্বাভাস আর সেখানে নিগ্রহস্থান হয় না। কারণ, যেমন কাষ্ঠ ভস্মীকৃত হইলে তখন আর অগ্নি তাহার দাহক হয় না, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত স্থলে যে বাদী পূর্ব্বেই নিগৃহীত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেখানে আর কিছু নিগ্রহস্থান হয় না। উদয়নাচার্য্যও "তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি"গ্রন্থে পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়াছেন,—"নহি মৃতোঽপি মার্য্যতে"। অর্থাৎ যে মৃতই হইয়াছে, তাহাকে কেহ আর মারে না। ভাসর্ব্বজ্ঞের "ন্যায়সারে"র টীকাকার জয়সিংহ সূরিও "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" ও "বিরুদ্ধ" নামক হেত্বাভাসের পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষই স্পষ্ট বলিয়াছেন[১]। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রতিজ্ঞাবিরোধের সহিত হেত্বাভাসের সাংকর্য্যও স্বীকার করিয়া সংকীর্ণ নিগ্রহস্থানও স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি অসংকীর্ণ "প্রতিজ্ঞাবিরোধে"রও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ যেখানে প্রতিবাদী হেত্বাভাসের উদ্ভাবন না করিয়া, প্রথমে বাদীর প্রতিজ্ঞা-বিরোধেরই উদ্ভাবন করিবেন, সেখানেও তদ্দ্বারা তখনই সেই বাদীর নিগ্রহ স্বীকার্য্য। সুতরাং "প্রতিজ্ঞাবিরোধ"কেও পৃথক্ নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য ॥৪॥

১। নম্বয়ং বিরুদ্ধো হেত্বাভাসো ন পুনঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধ ইতি চেন্ন, বিরুদ্ধহেত্বাভাসে ব্যাপ্তিস্মরণাদ্বিরোধোহব-ধার্য্যতে, অত্র তু প্রতিজ্ঞাহেতুবচনশ্রবণমাত্রাদেবেতি মহান্ ভেদঃ।—ন্যায়সার টীকা।

সূত্র। পক্ষপ্রতিষেধে প্রতিজ্ঞাতার্থাপনয়নং প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসঃ ॥৫॥৫০৭॥

অনুবাদ। পক্ষের প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার পক্ষ খণ্ডন করিলে (বাদী কর্ত্তৃক) প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাপ অর্থাৎ অস্বীকার (৪) প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস।

ভাষ্য। 'অনিত্যঃ শব্দ ঐন্দ্রিয়কত্বা'দিত্যুক্তে পরো ব্রূয়াৎ 'সামান্যমৈন্দ্রিয়কং ন চানিত্যমেবং শব্দোঽপ্যৈন্দ্রিয়কো ন চানিত্য' ইতি। এবং প্রতিষিদ্ধে পক্ষে যদি ব্রূয়াৎ—'কঃ পুনরাহ অনিত্যঃ শব্দ' ইতি। সোঽয়ং প্রতিজ্ঞাতার্থনিহ্নবঃ **প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস** ইতি।

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইহা (বাদী কর্ত্তৃক) উক্ত হইলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন, জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু অনিত্য নহে, এইরূপ শব্দও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু অনিত্য নহে। এইরূপে বাদীর পক্ষ খণ্ডিত হইলে (বাদী) যদি বলেন,—"অনিত্যঃ শব্দঃ" ইহা আবার কে বলিয়াছে, অর্থাৎ আমি ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলি নাই। সেই এই প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাপ অর্থাৎ নিজকৃত প্রতিজ্ঞার অস্বীকার (৪) "প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস" নামক নিগ্রহস্থান।

টিপ্পনী। "প্রতিজ্ঞাবিরোধে"র পরে এই সূত্রের দ্বারা "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস" নামক চতুর্থ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের পরে প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া, ঐ পক্ষের প্রতিষেধ করিলে, তখন বাদী যদি সেই দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই নিজের প্রতিজ্ঞাতার্থের "অপনয়ন" অর্থাৎ অপলাপ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস"নামক নিগ্রহস্থান হইবে। যেমন কোন বাদী "শব্দোঽনিত্য ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, তখন প্রতিবাদী বলিলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাতি নিত্য, এইরূপ শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও নিত্য হইতে পারে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, উহা অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। তখন বাদী প্রতিবাদীর কথিত ঐ ব্যভিচার-দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই বলিলেন যে, 'শব্দ অনিত্য, ইহা কে বলিয়াছে ? আমি ত উহা বলি নাই'। উক্ত স্থলে বাদীর যে নিজ প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাপ বা অস্বীকার, উহা তাঁহার বিপ্রতিপত্তির অনুমাপক হওয়ায় নিগ্রহস্থান হইবে। উহার নাম "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস"। "প্রতিজ্ঞাহানি" স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী নিজের প্রতিজ্ঞাতার্থ অথবা নিজের উক্ত যে কোন পদার্থ পরিত্যাগ করিলেও উহা অস্বীকার করেন না, কিন্তু "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস" স্থলে উহা অস্বীকারই করেন। সুতরাং "প্রতিজ্ঞাহানি" ও "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসে"র ভেদ আছে।

উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে যেমন বাদী বা প্রতিবাদী নিজের উক্ত যে কোন পদার্থের পরিত্যাগ করিলেই "প্রতিজ্ঞাহানি" হইবে, তদ্রূপ নিজের উক্ত যে কোন পদার্থের অপলাপ করিলেই "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস" হইবে। অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি কোন পদার্থের অপলাপ করিলেও উহাও প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস বলিয়াই গ্রাহ্য। কারণ, তুল্য যুক্তিতে উহাও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। উক্ত মতানুসারে বরদরাজ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, সূত্রে "পক্ষ" শব্দ ও "প্রতিজ্ঞাতার্থ" শব্দের দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর নিজের উক্ত মাত্রই মহর্ষির বিবক্ষিত। নিজের উক্ত যে কোন পদার্থের প্রতিষেধ হইলে তাহার পরিহারের উদ্দেশ্যে সেই উক্ত পদার্থের সন্ন্যাস বা অস্বীকারই প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত সূত্রার্থ। সেই উক্ত সন্ন্যাস চতুর্ব্বিধ, যথা—(১) কে ইহা বলিয়াছে ? অর্থাৎ আমি ইহা বলি নাই। অথবা (২) আমি ইহা অপরের মত বলিয়াছি, আমার নিজমত উহা নহে। অথবা (৩) তুমিই ইহা বলিয়াছ, আমি ত বলি নাই। অথবা (৪) আমি অপরের কথারই অনুবাদ করিয়াছি, আমিই প্রথমে ঐ কথা বলি নাই।

বৌদ্ধসম্প্রদায় এই "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস"কেও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সভামধ্যে সকলের সম্মুখে কোন্ বাদী ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরেই আবার উহা অস্বীকার করে ও করিতে পারে ? ধর্ম্মকীর্ত্তি পরে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে উক্ত বাদী ব্যভিচারী হেতুর প্রয়োগ করায় তিনি হেত্বাভাসের দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন। "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস" নামক পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকার অনাবশ্যক। আর তাহা স্বীকার করিলে উক্তরূপ স্থলে বাদী যেখানে একেবারে নীরব হইবেন, সেখানে তাঁহার "তূষ্ণীম্ভাব" নামেও পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকার করিতে হয় এবং কোন প্রলাপ বলিলে "প্রলপিত" নামেও পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকার করিতে হয়। বাচস্পতি মিশ্র ধর্ম্মকীর্ত্তির ঐ কথার উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার হেতুতে প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বোক্তরূপে "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস" করেন। তিনি তখন মনে করেন যে, আমি এখানে আমার প্রতিজ্ঞার অপলাপ করিতে পারিলে প্রতিবাদী আর আমার হেতুতে পূর্ব্ববৎ ব্যভিচার দোষের উদ্ভাবন করিতে পারিবেন না। আমি পরে অন্যরূপেই আবার প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রয়োগ করিব, যাহাতে আমার কথিত হেতু ব্যভিচারী হইবে না। সুতরাং উক্ত স্থলে কোন বাদীর ঐ "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস" তাঁহার প্রমাদমূলক মিথ্যাবাদ হইলেও উক্তরূপ উদ্দেশ্যে উহা কাহারও পক্ষে হইতে পারে, উহা অসম্ভব নহে। কিন্তু উক্ত স্থলে তিনি যখন প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার-দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই ঐরূপ উত্তর করেন, তখন সেখানে প্রতিবাদী আর তাঁহাকে সেই ব্যভিচার বা হেত্বাভাসের উদ্ভাবন করিয়া নিগৃহীত বলিতে পারেন না। সুতরাং তিনি আর তখন উহার উদ্ভাবনও করেন না। কিন্তু তখন তিনি বাদীর সেই "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসে"রই উদ্ভাবন করেন। পরন্তু পরে তিনি ঐ ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিতে গেলেও তৎপূর্ব্বে বাদীর সেই প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহাকে বলিতেই হইবে এবং বাদী উহা অস্বীকার করিলে তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসের উদ্ভাবনও

অবশ্য তখনই করিতে হইবে। নচেৎ তিনি বাদীর কথিত হেতুতে ব্যভিচার-দোষের সমর্থন করিতে পারেন না। সুতরাং পরে বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিতে হইলে যখন তৎপূর্ব্বে তাঁহার উক্ত "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসে"র উদ্ভাবন অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে, তখন পূর্ব্বে উদ্ভাবিত সেই "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস"ই উক্ত স্থলে বাদীর পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে। সেখানে হেত্বাভাস নিগ্রহস্থান হইবে না। প্রতিবাদীও পরে আর উহার উদ্ভাবন করিবেন না। কিন্তু উক্তরূপ স্থলে বাদীর তূষ্ণীম্ভাব বা প্রলাপ দ্বারা তাঁহার হেতুর ব্যভিচার দোষের উদ্ধার সম্ভবই হয় না এবং তূষ্ণীম্ভাব প্রভৃতি প্রতিবাদীর হেত্বাভাসোদ্ভাবনের পরেই হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সমস্ত পৃথক্ নিগ্রহস্থান বলা অনাবশ্যক। তাই মহর্ষি তাহা বলেন নাই ॥৫॥

সূত্র। অবিশেষোক্তে হেতৌ প্রতিষিদ্ধে বিশেষমিচ্ছতো হেত্বন্তরং ॥৬॥৫১০॥

অনুবাদ। অবিশেষে উক্ত হেতু প্রতিষিদ্ধ হইলে বিশেষ ইচ্ছাকারীর "হেত্বন্তর" হয় (অর্থাৎ বাদী নির্ব্বিশেষণ সামান্য হেতুর প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী ঐ হেতুতে ব্যভিচারাদিদোষ প্রদর্শন করিয়া যদি উহার খণ্ডন করেন, তখন বাদী সেই দোষের উদ্ধারের জন্য তাঁহার পূর্ব্বোক্ত হেতুতে কোন বিশেষণ বলিলে তাদৃশ বিশিষ্ট হেতুকথন তাঁহার পক্ষে "হেত্বন্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে।)

ভাষ্য। নিদর্শনং—'একপ্রকৃতীদং ব্যক্ত'মিতি প্রতিজ্ঞা। কস্মাদ্ধেতোঃ? একপ্রকৃতীনাং বিকারাণাং পরিমাণাৎ। মৃৎপূর্ব্বকাণাং শরাবাদীনাং দৃষ্টং পরিমাণং, যাবান্ প্রকৃতের্ব্যূহো ভবতি, তাবান্ বিকার ইতি। দৃষ্টঞ্চ প্রতিবিকারং পরিমাণং। অস্তি চেদং পরিমাণং প্রতিব্যক্তং। তদেকপ্রকৃতীনাং বিকারাণাং—পরিমাণাৎ পশ্যামো ব্যক্তমিদমেকপ্রকৃতীতি।

অস্য ব্যভিচারেণ প্রত্যবস্থানং—নানাপ্রকৃতীনামেকপ্রকৃতীনাঞ্চ বিকারাণাং দৃষ্টং পরিমাণমিতি।

এবং প্রত্যবস্থিতে আহ—একপ্রকৃতিসমন্বয়ে সতি শরাবাদিবিকারাণাং পরিমাণদর্শনাৎ। সুখ-দুঃখ-মোহসমন্বিতং হীদং ব্যক্তং পরিমিতং গৃহ্যতে। তত্র প্রকৃত্যন্তররূপসমন্বয়াভাবে সত্যেকপ্রকৃতিত্বমিতি।

তদিদমবিশেষোক্তে হেতৌ প্রতিষিদ্ধে বিশেষং ব্রুবতো হেত্বন্তরং ভবতি

সতি চ হেত্বন্তরভাবে পূর্ব্বস্য হেতোরসাধকত্বান্নিগ্রহস্থানং। হেত্বন্তরবচনে সতি যদি হেত্বর্থনিদর্শনো, দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে নেদং ব্যক্তমেকপ্রকৃতি ভবতি—প্রকৃত্যন্তরোপাদানাৎ। অথ নোপাদীয়তে—দৃষ্টান্তে হেত্বর্থস্যা-নিদর্শিতস্য সাধকভাবানুপপত্তেরানর্থক্যাদ্ধেতোরনিবৃত্তং নিগ্রহস্থানমিতি।

অনুবাদ। "নিদর্শন" অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত "হেত্বন্তর" নামক নিগ্রহস্থানের উদাহরণ যথা—এই ব্যক্ত, এক প্রকৃতি, ইহা প্রতিজ্ঞা। (প্রশ্ন) কোন্ হেতু-প্রযুক্ত ? (উত্তর) একপ্রকৃতি বিকারসমূহের পরিমাণপ্রযুক্ত। (উদাহরণ) মৃত্তিকাজন্য শরাবাদি দ্রব্যের পরিমাণ দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির ব্যূহ অর্থাৎ উপাদান-কারণের সংস্থান যে পর্য্যন্ত হয়, বিকার অর্থাৎ তাহার কার্য্য শরাবাদি সেই পর্য্যন্ত হয় অর্থাৎ সেই সমস্ত বিকারে ঐরূপ পরিমাণ হয়। প্রত্যেক বিকারে পরিমাণ দৃষ্টও হয়। (উপনয়) এই পরিমাণ প্রত্যেক ব্যক্ত পদার্থেই আছে। (নিগমন) সুতরাং একপ্রকৃতি বিকারসমূহের পরিমাণপ্রযুক্ত এই ব্যক্ত এক প্রকৃতি, ইহা আমরা বুঝি। [অর্থাৎ সাংখ্যমতানুসারে কোন বাদী উক্তরূপে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রকাশ করিয়া, তাঁহার নিজ পক্ষের সংস্থাপন করিলেন যে, মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি ব্যক্ত জগতের মূল উপাদান এক, যে হেতু তাহাতে পরিমাণ আছে, যেমন একই মৃত্তিকাজন্য ঘটাদি দ্রব্যের পরিমাণ আছে এবং উহার মূল উপাদান এক। ব্যক্ত পদার্থমাত্রেই পরিমাণ আছে, সুতরাং তাহার মূল উপাদান এক। উহা অব্যক্ত ও মূল প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে]।

ব্যভিচার দ্বারা ইহার প্রত্যবস্থান যথা—নানাপ্রকৃতি ও একপ্রকৃতি বিকার-সমূহের পরিমাণ দৃষ্ট হয়। [অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বাদী উক্তরূপে তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী উহার প্রত্যবস্থান করিলেন যে, পার্থিব ঘটাদি দ্রব্য এবং সুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি দ্রব্যেও পরিমাণ আছে, কিন্তু সেই সমস্ত দ্রব্য একপ্রকৃতি নহে, ঐ সমস্ত নানাজাতীয় দ্রব্যের উপাদান-কারণ ভিন্ন, অতএব বাদীর কথিত যে পরিমাণরূপ হেতু, তাহা তাঁহাব সাধ্য ধর্ম্ম একপ্রকৃতিত্বের ব্যভিচারী]।

(প্রতিবাদী) এইরূপে প্রত্যবস্থিত হইলে অর্থাৎ বাদীর উক্ত হেতুতে ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শন করিলে (বাদী) বলিলেন, যেহেতু একস্বভাবের সমন্বয় থাকিলে

১। হেতুঃ সাধনং, অর্থঃ সাধ্যঃ তৌ হেত্বর্থৌ নিদর্শ্যেতে ব্যাপ্যব্যাপকভাবেনেতি নিদর্শনঃ। হেত্বর্থয়োর্নিদর্শনো হেত্বর্থনিদর্শনো দৃষ্টান্তঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

শরাবাদি বিকারের পরিমাণ দেখা যায় (অর্থাৎ) যেহেতু সুখ-দুঃখ-মোহ-সমন্বিত এই ব্যক্ত, পরিমিত বলিয়া গৃহীত হয়। তাহা হইলে অন্য প্রকৃতির রূপের অর্থাৎ অন্য উপাদানের স্বভাবের সমন্বয়ের অভাব থাকিলে একপ্রকৃতিত্ব সিদ্ধ হয় [অর্থাৎ বাদী উক্ত ব্যভিচার-দোষ নিবারণের জন্য পরে অন্য হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলেন,—"একস্বভাবসমন্বয়ে সতি পরিমাণাৎ"। পার্থিব ঘটাদি ও সুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি বিজাতীয় দ্রব্যসমূহে পরিমাণ থাকিলেও এক স্বভাবের সমন্বয় নাই। সুতরাং তাহাতে উক্ত বিশিষ্ট হেতু না থাকায় ব্যভিচারের আশঙ্কা নাই, ইহাই বাদীর বক্তব্য]।

অবিশেষে উক্ত হেতু প্রতিষিদ্ধ হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বিশেষণশূন্য পরিমাণরূপ হেতু ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিবাদী কর্ত্তৃক দূষিত হইলে বিশেষবাদীর অর্থাৎ উক্ত হেতুতে একস্বভাবসমন্বয়রূপ বিশেষণবাদী প্রতিবাদীর সেই ইহা "হেত্বন্তর" হয়। হেত্বন্তরত্ব থাকিলেও পূর্ব্বহেতুর অসাধকত্বপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থান হয়। হেত্বন্তর-বচন হইলে অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদী ঐ বিশেষণবিশিষ্ট অন্য হেতু বলিলেও যদি "হেত্বর্থনিদর্শন" অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবপ্রদর্শক দৃষ্টান্ত গৃহীত হয়, তাহা হইলে এই ব্যক্ত জগৎ একপ্রকৃতি হয় না,—কারণ, অন্য প্রকৃতির অর্থাৎ সেই দৃষ্টান্তের অন্য উপাদানের গ্রহণ হইয়াছে। আর যদি দৃষ্টান্ত গৃহীত না হয়, তাহা হইলে দৃষ্টান্তে অনিদর্শিত অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া অপ্রদর্শিত হেতুপদার্থের সাধকত্বের অনুপপত্তিবশতঃ হেতুর আনর্থক্যপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থান নিবৃত্ত হয় না।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা "হেত্বন্তর" নামক পঞ্চম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"একপ্রকৃতীদং ব্যক্তমিতি প্রতিজ্ঞা", অর্থাৎ সংখ্যমত সংস্থাপন করিবার জন্য কোন বাদী উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা বলিলেন যে, এই ব্যক্ত জগৎ একপ্রকৃতি। এখানে "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ উপাদানকারণ। "একা প্রকৃতির্যস্য" এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসে ঐ "একপ্রকৃতি" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের মূল উপাদানকারণ এক। সাংখ্যমতে মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি জড় তত্ত্বের নাম ব্যক্ত এবং উহার মূল উপাদান অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি অব্যক্ত। ঐ অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি এক। ব্যক্ত পদার্থমাত্রই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, সুতরাং উহার মূল উপাদানও সুখদুঃখ-মোহাত্মক, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। তাই সাংখ্যমতে ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতিই ব্যক্ত পদার্থমাত্রের মূল উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করিয়া, বাদী হেতুবাক্য বলিলেন,—"পরিমাণাৎ"। বাদীর বক্তব্য এই যে, একই মৃত্তিকা হইতে

ঘট ও শরাব প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য জন্মে, তাহাতে সেই উপাদানের পরিমাণের তুল্য পরিমাণ দেখা যায়। ব্যক্ত পদার্থমাত্রেই যখন পরিমাণ আছে, তখন ঐ হেতু ও উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত পদার্থমাত্রেরই মূল উপাদান এক, ইহা সিদ্ধ হয়। বাদী উক্তরূপে তাঁহার নিজপক্ষ সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘটাদি দ্রব্যে যেমন পরিমাণ আছে, তদ্রূপ সুবর্ণাদিনির্ম্মিত অলঙ্কারবিশেষেও পরিমাণ আছে। কিন্তু সেই সমস্ত দ্রব্যেরই উপাদান এক নহে। সুতরাং পরিমাণরূপ হেতু একপ্রকৃতিত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচারী। প্রতিবাদী উক্তরূপে বাদীর কথিত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে, তখন বাদী ঐ ব্যভিচারের উদ্ধারের জন্য বলিলেন যে, একপ্রকৃতির সমন্বয় থাকিলে শরাবাদি দ্রব্যের পরিমাণ দেখা যায়। এখানে "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ স্বভাব। অর্থাৎ বাদী উক্ত ব্যভিচার-দোষ নিবারণের জন্য তাঁহার পূর্ব্বকথিত পরিমাণরূপ হেতুতে এক-স্বভাব-সমন্বয়রূপ বিশেষণ প্রবিষ্ট করিয়া, পুনর্ব্বার হেতুবাক্য বলিলেন,—"একস্বভাবসমন্বয়ে সতি পরিমাণাৎ"[১]। বাদীর বক্তব্য এই যে, যাহাতে একস্বভাবের সমন্বয় থাকিয়া পরিমাণ আছে, তৎসমস্তই একপ্রকৃতি। যেমন একই মৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন ঘট ও শরাব প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যেই সেই মৃত্তিকাস্বভাবের সমন্বয় আছে, সেই সমস্ত দ্রব্যই সেই মৃৎপিণ্ড-স্বভাব এবং পরিমাণবিশিষ্ট, এবং তাহার উপাদানকারণ এক, তদ্রূপ এই ব্যক্ত জগতে সর্ব্বত্রই একস্বভাবের সমন্বয় ও পরিমাণ আছে বলিয়া ব্যক্ত পদার্থমাত্রের মূল উপাদান এক, ইহা ঐ হেতুর দ্বারা অনুমানসিদ্ধ হয়। ব্যক্ত পদার্থমাত্রে কিরূপ একস্বভাবের সমন্বয় আছে, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার বাদীর কথা বলিয়াছেন যে, এই ব্যক্ত জগৎ সুখদুঃখমোহসমন্বিত ও পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়। অর্থাৎ ব্যক্ত জড় জগতে সর্ব্বত্রই সুখদুঃখ ও মোহ আছে, সমগ্র জগৎই সুখদুঃখমোহাত্মক, সুতরাং উহার মূল উপাদানও সুখদুঃখমোহাত্মক। তাহাই মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্ত। তাহার কার্য্য ব্যক্ত পদার্থমাত্রেই যখন সুখদুঃখ-মোহাত্মকত্বরূপ একস্বভাবের সমন্বয়বিশিষ্ট পরিমাণ আছে, তখন ঐ বিশিষ্ট হেতুর দ্বারা ব্যক্ত পদার্থমাত্রেরই মূল উপাদান এক, ইহা সিদ্ধ হয়। পার্থিব ঘটাদি এবং সুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি বিজাতীয় দ্রব্যসমূহে পরিমাণ থাকিলেও সেই সমস্ত দ্রব্যেই মৃত্তিকা অথবা সুবর্ণের একস্বভাবের সমন্বয় নাই। সুতরাং সেই সমস্ত বিজাতীয় দ্রব্যসমূহে উক্ত বিশিষ্ট হেতু না থাকায় ব্যভিচারের আশঙ্কা নাই। অবশ্য সেই সমস্ত বিজাতীয় দ্রব্যসমূহে সুখদুঃখ-মোহাত্মকত্বরূপ একস্বভাবের সমন্বয় আছে। কিন্তু প্রতিবাদী তাহা স্বীকার করিলে সেই সমস্ত দ্রব্যেরও মূল উপাদান যে, আমার সম্মত সেই

১। এবং প্রত্যবস্থিতে প্রতিবাদিনি বাদী পশ্চাৎ পরিমিতত্বং হেতুং বিশিনষ্টি, একপ্রকৃতিসমন্বয়ে সতি শরাবাদিবিকারাণাং পরিমাণদর্শনাদিতি। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ, একস্বভাবসমন্বয়ে সতীত্যর্থঃ।" "তদেবং যত্রৈকস্বভাবসমন্বয়ে সতি পরিমাণং তত্রৈকপ্রকৃতিত্বমেব, তদ্যথা এক মৃৎপিণ্ড-স্বভাবেষু ঘটশরাবোদঞ্চনাদিষু। ঘটরুচকাদয়স্তু নৈকস্বভাবা মার্দ্দবসৌবর্ণাদীনাং স্বভাবানাং ভেদাৎ।—তাৎপর্য্যটীকা।

ত্রিগুণাত্মক এক মূল প্রকৃতি, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য। সুতরাং সেই সমস্ত দ্রব্যেও আমার সাধ্যধর্ম্ম থাকায় ব্যভিচারের আশঙ্কা নাই, ইহাই বাদীর চরম বক্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী শেষে উক্তরূপ অন্য বিশিষ্ট হেতুর প্রয়োগ করায় উহা তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে। কেন উহা নিগ্রহস্থান হইবে? অর্থাৎ বাদী পরে অব্যভিচারী সৎ হেতুর প্রয়োগ করিয়াও নিগৃহীত হইবেন কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, বাদীর প্রথমোক্ত হেতুর অসাধকত্ববশতঃ উহা নিগ্রহস্থান হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে বাদীর প্রথমোক্ত হেতু তাঁহার সাধ্যসাধনে সমর্থ হইলে, পরে তাঁহার হেত্বন্তর প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। সুতরাং তিনি যখন উক্তরূপ হেত্বন্তর প্রয়োগ করেন, তখন উহাদ্বারা তাঁহার প্রথমোক্ত হেতু যে, তাঁহার সাধ্যসাধনে অসমর্থ, উহা ব্যভিচারী হেতু, ইহা তিনি স্বীকারই করায় অবশ্যই তিনি নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু তাঁহার প্রথমোক্ত হেতু ব্যভিচারী বলিয়া হেত্বাভাস হইলেও তিনি উক্ত স্থলে ঐ হেত্বাভাস দ্বারা নিগৃহীত হইবেন না, অর্থাৎ উক্ত স্থলে তাঁহার পক্ষে হেত্বাভাস নিগ্রহস্থান হইবে না। কারণ, পরে তিনি তাঁহার উক্ত হেতুতে বিশেষণ প্রবিষ্ট করিয়া বাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার-দোষ নিবারণ করিয়াছেন। অতএব উক্ত স্থলে হেত্বন্তর-প্রয়োগই তাঁহার বিপ্রতিপত্তির অনুমাপক হওয়ায় উহাই তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে। উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রও এখানে ইহাই বলিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রথমে নিগৃহীত হইলেও পরে অব্যভিচারী হেত্বন্তরের প্রয়োগ করায় তখন তাঁহার কি জয়ই হইবে? এতদুত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী পরে হেত্বন্তর প্রয়োগ করিলেও তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান নিবৃত্ত হইবে না অর্থাৎ তাঁহার পক্ষ-সিদ্ধিবশতঃ তিনি জয়ী হইবেন না। কারণ, উক্ত হেতুর দ্বারাও তাঁহার পক্ষ সিদ্ধি হয় না। কারণ, তিনি সমস্ত বিশ্বকেই একপ্রকৃতি বলিয়া সাধন করিতে গেলে তিনি কোন দৃষ্টান্ত বলিতে পারিবেন না। যাহা সাধ্যধর্ম্মী, তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। সুতরাং যদি তিনি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য কোন অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই পদার্থের "প্রকৃত্যন্তর" অর্থাৎ অন্য উপাদান স্বীকার করায় সেই পদার্থেই তাঁহার ঐ শেষোক্ত হেতুরও ব্যভিচারবশতঃ উহার দ্বারাও তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। আর তিনি যদি কোন দৃষ্টান্ত গ্রহণ না করিয়া কেবল ঐ হেত্বন্তরেরই প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেও উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, যে পদার্থ কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া নিদর্শিত না হয়, তাহা কখনও সাধক হইতে পারে না। সুতরাং তাহা অনর্থক বলিয়া ঐরূপ দৃষ্টান্তশূন্য ব্যর্থ হেতুপ্রয়োগকারী পরেও নিগৃহীত হইবেন। তাঁহার পক্ষে পরেও নিগ্রহস্থান নিবৃত্ত হইবে না॥ ৬॥

প্রতিজ্ঞা-হেত্বন্যতরাশ্রিত-নিগ্রহস্থান-পঞ্চক-বিশেষলক্ষণ-প্রকরণ সমাপ্ত॥ ১॥

সূত্র। প্রকৃতাদর্থাদপ্রতিসম্বদ্ধার্থমর্থান্তরং ॥৭॥৫১১॥

অনুবাদ। প্রকৃত অর্থকে অপেক্ষা করিয়া[১] অপ্রতিসম্বদ্ধার্থ অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য অর্থের বোধক বচন (৬) অর্থান্তর।

ভাষ্য। যথোক্তলক্ষণে পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহে হেতুতঃ সাধ্যসিদ্ধৌ প্রকৃতায়াং ব্রূয়াৎ—নিত্যঃ শব্দোঽস্পর্শত্বাদিতি হেতুঃ। হেতুর্নাম হিনোতেস্তুনিপ্রত্যয়ে কৃদন্তং পদং। পদঞ্চ নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাঃ। (১) অভিধেয়স্য ক্রিয়ান্তরযোগাদ্বিশিষ্যমাণরূপঃ শব্দো নাম, ক্রিয়াকারক-সমুদায়ঃ কারকসংখ্যাবিশিষ্টঃ। (২) ক্রিয়াকালযোগাভিধায্যাখ্যাতং ধাত্বর্থমাত্রঞ্চ কালাভিধানবিশিষ্টং। (৩) প্রয়োগেষ্বর্থাদভিদ্যমানরূপা নিপাতাঃ। (৪) উপসৃজ্যমানাঃ ক্রিয়াবদ্যোতকা উপসর্গা ইত্যেবমাদি। তদর্থান্তরং বেদিতব্যমিতি।

অনুবাদ। যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ স্থলে হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি প্রকৃত হইলে বাদী যদি বলেন, "নিত্যঃ শব্দঃ, অস্পর্শত্বাদিতি হেতুঃ", "হেতুঃ" এই পদটি "হি" ধাতুর "তুন্" প্রত্যয়নিষ্পন্ন কৃদন্ত পদ। পদ বলিতে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, অর্থাৎ পদ ঐ চারি প্রকার। অভিধেয়ের অর্থাৎ বাচ্য অর্থের ক্রিয়াবিশেষের সহিত সম্বন্ধপ্রযুক্ত "বিশিষ্যমাণরূপ" অর্থাৎ যাহার রূপভেদ হয়, এমন শব্দ (১) নাম। কারকের সংখ্যাবিশিষ্ট ক্রিয়াও কারকের সমুদায় (সমষ্টি)। (অর্থাৎ কর্তৃকর্ম্মাদি কারকের একত্বাদি সংখ্যা এবং জাত্যাদি ও কারক, "নাম" পদের অর্থ)। ক্রিয়া অর্থাৎ ধাত্বর্থ এবং কালের সম্বন্ধের বোধক পদ (২) আখ্যাত। কালাভিধান-বিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে কালবাচক প্রত্যয়ার্থের অন্বয়সম্বন্ধ আছে, এমন ধাত্বর্থমাত্রও ("আখ্যাত" পদের অর্থ)। সমস্ত প্রয়োগেই অর্থবিশেষপ্রযুক্ত "অভিদ্যমানরূপ" অর্থাৎ অর্থভেদ থাকিলেও যাহার কুত্রাপি রূপভেদ হয় না, এমন শব্দসমূহ (৩) নিপাত। "উপসৃজ্যমান" অর্থাৎ "আখ্যাত" পদের সমীপে পূর্ব্বে প্রযুজ্যমান ক্রিয়াদ্যোতক শব্দসমূহ (৪) উপসর্গ ইত্যাদি। তাহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদীর শেষোক্ত এই সমস্ত বচন (৫) অর্থান্তর নামক নিগ্রহস্থান জানিবে।

১। সূত্রে—প্রকৃতমর্থমপেক্ষ্য (প্রস্তুতমর্থং প্রকৃত্য) এই অর্থে ল্যপ্‌লোপে পঞ্চমী বিভক্তি বুঝিতে হইবে। বরদরাজ চরম কল্পে ইহাই বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা "অর্থান্তর" নামক ষষ্ঠ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে বাদলক্ষণসূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার যে পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহের লক্ষণ বলয়াছেন, সেই লক্ষণাক্রান্ত পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ স্থলে হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধিই প্রকৃত বা প্রস্তুত। বাদী বা প্রতিবাদী যদি প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপনের আরম্ভ করিয়া, সেই বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য অর্থের বোধক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হয়। অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদীর যাহা নিজপক্ষ-সাধন বা পরপক্ষসাধনের অঙ্গ অর্থাৎ উপযোগী নহে, এমন বাক্যই (৬) "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান। যেমন কোন নৈয়ায়িক "শব্দ অনিত্য" এই প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং হেতুবাক্য প্রয়োগ করিয়া পরে বলিলেন,—"সেই শব্দ আকাশের গুণ"। এখানে তাঁহার শেষোক্ত বাক্যের সহিত তাঁহার প্রকৃত সাধ্যসিদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই, উহা তাঁহার নিজপক্ষ সাধনে অঙ্গ বা উপযোগীই নহে। অতএব ঐ বাক্য তাঁহার পক্ষে "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান। উক্ত স্থলে বাদী নৈয়ায়িক তাঁহার নিজ মতানুসারেই 'শব্দ আকাশের গুণ' এই বাক্য বলায়, উহা তাঁহার পক্ষে "স্বমত" অর্থান্তর। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি ইহাকে স্বমত, পরমত, উভয়মত, অনুভয়মত—এই চতুর্ব্বিধ বলিয়া ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণকে বলিয়াছেন "অনুভয়মত"। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে ভাষ্যকারের ঐ সমস্ত বাক্য বাদী মীমাংসক এবং প্রতিবাদী নৈয়ায়িক, এই উভয়েরই সম্মত নহে, উহা শাব্দিকসম্মত।

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ দ্বারাই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন মীমাংসক বাদী "নিত্যঃ শব্দঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিলেন,—"অস্পর্শত্বাদিতি হেতুঃ"। পরে তিনি তাঁহার কথিত "হেতুঃ" এই পদটী "হি" ধাতুর উত্তর "তুন্"প্রত্যয়নিষ্পন্ন কৃদন্ত পদ, ইহা বলিয়া, ঐ পদ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চারি প্রকার, ইহা বলিলেন। পরে ঐ নাম, আখ্যাত, নিপাত ও উপসর্গের লক্ষণ বলিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী মীমাংসক শব্দের নিত্যত্ব সাধন করিতে স্পর্শশূন্যত্ব হেতুর প্রয়োগ করিয়াই বুঝিলেন যে, সুখ-দুঃখাদি অনেক পদার্থও স্পর্শশূন্য, কিন্তু তাহা নিত্য নহে। অতএব স্পর্শশূন্যত্ব যে নিত্যত্বের ব্যভিচারী, ইহা প্রতিবাদী অবশ্যই বলিবেন। পূর্ব্বোক্ত বাদী ইহা মনে করিয়াই পরে ঐ সমস্ত অসম্বদ্ধার্থ বা অনুপযোগী বাক্য বলিলেন। প্রতিবাদী উহা শ্রবণ করিয়া, ঐ সমস্ত বাক্যার্থেরই কোন দোষ বলিয়া, সেই বিষয়েই বিচারারম্ভ করিলে বাদীর পূর্ব্বোক্ত হেতুতে ব্যভিচার-দোষ প্রচ্ছাদিত হইয়া যাইবে, এবং তিনি চিন্তার সময় পাইয়া, চিন্তা করিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সাধ্যসিদ্ধির জন্য কোন অব্যভিচারী হেতুরও প্রয়োগ করিতে পারিবেন, ইহাই উক্ত স্থলে বাদীর গূঢ় উদ্দেশ্য। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদীর ঐ সমস্ত বাক্য তাঁহার সাধ্য সাধনের অঙ্গ না হওয়ায় উহা তাঁহার পক্ষে "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহ-স্থান হইবে। কারণ, উক্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতু তাঁহার সাধ্য-সাধনে সমর্থ হইলে তিনি কখনই পরে ঐ সমস্ত অনুপযোগী অতিরিক্ত বাক্য বলিতেন না। সুতরাং তাঁহার উক্ত হেতু যে তাঁহার সাধ্যসাধক নহে, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীও

বাদীর কথিত ঐ সমস্ত বাক্যার্থের বিচার করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে গেলে তাঁহার পক্ষেও "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। অর্থাৎ উক্তরূপ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েই নিগৃহীত হইবেন। বস্তুতঃ কোন বাদী যদি নির্দ্দোষ হেতুর প্রয়োগ করিয়াও পরে যে কোন দোষের আশঙ্কা করিয়া, ঐরূপ অনুপযোগী কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানেও তাঁহার পক্ষে উহা "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, সেখানেও তিনি যাহা দোষ নহে, তাহা দোষ বলিয়া বুঝিয়া, ঐরূপ ব্যর্থ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। উহাও তাঁহার বিপ্রতিপত্তির অনুমাপক হওয়ায় নিগ্রহস্থান। সুতরাং হেত্বাভাস হইতে পৃথক্ "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, যাহা সাধনের অঙ্গ নহে, তাহার বচনও তিনি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছি।

ভাষ্যকার এখানে বাদীর বক্তব্য "নাম" প্রভৃতি পদের লক্ষণ বলিতে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে অনেক বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত বুঝা আবশ্যক। সে সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা এখানে সম্ভব নহে। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এখানে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। "বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষা" গ্রন্থে নাগেশ ভট্ট বাচস্পতি মিশ্রের যেরূপ সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও মুদ্রিত "তাৎপর্য্যটীকা" গ্রন্থে যথাযথ দেখিতে পাই না। অনেক সন্দর্ভ মুদ্রিত হয় নাই, ইহাই বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারোক্ত "ক্রিয়া-কারকসমুদায়ঃ" এই বাক্যের দ্বারা আখ্যাত পদের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া, পরে ঐ লক্ষণের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই দোষবশতঃই "কারকসংখ্যাবিশিষ্টক্রিয়াকালযোগাভিধা-য্যাখ্যাতং" এই বাক্যের দ্বারা আখ্যাত পদের অন্য লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন। পরে ঐ লক্ষণেরও দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই দোষবশতঃই পরে "ধাত্বর্থমাত্রঞ্চ কালাভিধানবিশিষ্টং" এই বাক্যের দ্বারা "আখ্যাত" পদের নির্দ্দোষ চরম লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে বাদীর বক্তব্য বলিতে "আখ্যাত" পদের ঐরূপ লক্ষণত্রয় বলিবেন কেন? এবং যে লক্ষণদ্বয় দুষ্ট, বৈয়াকরণ মতেও যাহা লক্ষণই হয় না, তাহাই বা বাদী কেন বলিবেন? ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। পরন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে মহর্ষির "তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদং" (৫৮শ) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের ন্যায় "নাম" পদের উক্ত লক্ষণ বলিয়া "যথা ব্রাহ্মণ ইতি" এই বাক্যের দ্বারা উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে ঐ "নাম" পদের অর্থ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"ক্রিয়াকারকসমুদায়ঃ কারকসংখ্যাবিশিষ্টঃ"। বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে "অস্যার্থমাহ" এই কথা বলিয়াই উদ্দ্যোতকরের উক্ত বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর সেখানে পরে "ক্রিয়াকালযোগাভিধায়ি ক্রিয়াপ্রধানমাখ্যাতং পচতীতি যথা" এই বাক্যের দ্বারা আখ্যাত পদের লক্ষণ ও উদাহরণ বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে "আখ্যাতলক্ষণমাহ" এই কথা বলিয়া উদ্দ্যোতকরের উক্ত বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভ এবং সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারা এখানে ভাষ্যকারও যে, "ক্রিয়াকারকসমুদায়ঃ কারকসংখ্যাবিশিষ্টঃ" এইরূপ বিসর্গান্ত সন্দর্ভই বলিয়া

তদ্দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "নাম" পদের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে "ক্রিয়াকাল" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারাই "আখ্যাত" পদের লক্ষণ বলিয়া "ধাত্বর্থমাত্রঞ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উহারও অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। নাগেশ ভট্টের উদ্ধৃত সন্দর্ভের দ্বারাও ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়[১]। "কলা টীকা"কার বৈদ্যনাথ ভট্টও সেখানে ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভপ্রকাশ করিতে "অভিধেয়স্য" ইত্যাদি "বিশিষ্ট ইত্যন্তমুক্ত্বা" এইরূপ লিখিয়াছেন। মুদ্রিত পুস্তকে "বিশিষ্টেত্যন্তং" এই পাঠ প্রকৃত নহে। ফলকথা, বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারের যেরূপ সন্দর্ভ গ্রহণ করিয়া, যেরূপে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সুধীগণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২।৫৮শ সূত্রে) উদ্দ্যোতকরের সন্দর্ভ এবং সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা এবং এখানে তাঁহার ভাষ্যব্যাখ্যা দেখিয়া, তিনি এখানে তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা কেন করেন নাই, তাহা চিন্তা করিবেন।

ভাষ্যকার এখানে বাদীর বক্তব্য নামপদের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যে শব্দের অভিধেয় অর্থাৎ বাচ্য অর্থের ক্রিয়াবিশেষের সহিত সম্বন্ধপ্রযুক্ত নানা বিভক্তি-প্রয়োগে রূপভেদ হয়, সেই শব্দকে "নাম" বলে। ভাষ্যে "ক্রিয়ান্তর" শব্দের অর্থ ক্রিয়াবিশেষ। বাচস্পতি মিশ্রও "অন্তর" শব্দের বিশেষ অর্থ, ইহা বলিয়াছেন। "বৃক্ষস্তিষ্ঠতি" "বৃক্ষৌ তিষ্ঠতঃ" "বৃক্ষং পশ্যতি" ইত্যাদি বাক্যে ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধপ্রযুক্ত "বৃক্ষ" প্রভৃতি শব্দের নানা বিভক্তি-প্রয়োগে রূপভেদ হওয়ায় বিভক্ত্যন্ত "বৃক্ষ" প্রভৃতি শব্দ নামপদ। মহর্ষি গৌতমের সূত্রানুসারে ভাষ্যকার এবং বার্ত্তিক-কারও বিভক্ত্যন্ত শব্দকেই পদ বলিয়াছেন এবং উপসর্গ ও নিপাতের পদসংজ্ঞার জন্য ব্যাকরণশাস্ত্রে ঐ সমস্ত অব্যয় শব্দের উত্তরও "সু" "ঔ" "জস্" প্রভৃতি বিভক্তির উৎপত্তি এবং তাহার লোপ অনুশিষ্ট হইয়াছে, এই কথা বলিয়া উপসর্গ এবং নিপাতেরও পদত্ব সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে নব্যনৈয়ায়িকগণের মত পূর্ব্বে বলিয়াছি (দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উপসর্গ এবং নিপাত পদ হইলেও কুত্রাপি কোন বিভক্তির প্রয়োগেই উহার রূপভেদ হয় না, এ জন্য শাব্দিকগণ উহাকে নামপদ বলেন নাই। তাঁহাদিগের মতে পদ চতুর্ব্বিধ—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত। "কাত্যায়নপ্রাতিশাখ্যে" উক্ত শাব্দিক মতের উল্লেখ এবং উক্ত চতুর্ব্বিধ পদের পরিচয় কথিত হইয়াছে[২]। ভাষ্যকার উক্ত মতানুসারেই বাদীর শেষোক্ত ঐ সমস্ত বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত সূত্রের বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকরও ঐরূপ সন্দর্ভ বলায় নামপদ ও আখ্যাত পদের উক্তরূপ লক্ষণাদি তাঁহারও সম্মত বুঝা যায়, তাই নাগেশ ভট্ট উদ্দ্যোত-করের উক্ত সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। নাগেশ ভট্টের "সিদ্ধান্তমঞ্জুষা"র

১। পঞ্চমে ন্যায়ভাষ্যেঽপি ক্রিয়াকালযোগাভিধায্যাখ্যাতং, ধাত্বর্থমাত্রঞ্চ কালাভিধানবিশিষ্টমিতি। কালেনা-ভিধানেন কারকেণ বিশিষ্টং ধাত্বর্থমাত্রমাখ্যাতার্থ ইতি তদর্থঃ। তস্যৈব ব্যাখ্যানং "ক্রিয়াপ্রধান"মিতি বার্ত্তিককৃতাত্র কৃতং। বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষা, তিঙর্থনিরূপণ, ৮০৪ পৃষ্ঠা।

২। নামাখ্যাতমুপসর্গো নিপাতশ্চত্বার্যাহুঃ পদজাতানি শাব্দাঃ—ইত্যাদি কাত্যায়নপ্রাতিশাখ্য।

"কুঞ্চিকা" টীকায় দুর্ব্বলাচার্য্য উদ্দ্যোতকরের "ক্রিয়াকারকসমুদায়ঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় জাতি প্রভৃতিকেই ক্রিয়া শব্দের অর্থ বলিয়াছেন[১] এবং নাগেশ ভট্টের উদ্ধৃত বাচস্পতি মিশ্রের সন্দর্ভে[২]ও ঐরূপ ব্যাখ্যাই দেখা যায়। সুতরাং তদনুসারে এখানে ভাষ্যকারেরও তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, নামপদের দ্বারা জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং দ্রব্য, ইহার অন্যতম এবং তাহার আশ্রয় কর্ত্তৃকর্ম্মাদি যে কোন কারক এবং তদ্‌গত কোন সংখ্যার বোধ হওয়ায় ঐ সমষ্টিই নাম পদের অর্থ। ভাষ্যকার "ক্রিয়াকারকসমুদায়ঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার পরে উক্ত স্থলে বাদীর বক্তব্য "আখ্যাত" পদের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, ক্রিয়া ও কালের সম্বন্ধবোধক পদ আখ্যাত। আখ্যাত বিভক্তিকেও আখ্যাত বা আখ্যাত প্রত্যয় বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত বিভক্ত্যন্ত পদকেই বলা হইয়াছে "আখ্যাত" নামক পদ। সেই সমস্ত বিভক্তির দ্বারা বর্ত্তমানাদি কোন কালের এবং ধাতুর দ্বারা ধাত্বর্থরূপ ক্রিয়ার বোধ হওয়ায় আখ্যাত পদ ক্রিয়া ও কালের সম্বন্ধের বোধক হয়। "ভুক্ত্বা" ইত্যাদি কৃদন্ত পদের দ্বারা ক্রিয়ার সহিত কালের সম্বন্ধ বোধ না হওয়ায় উহা উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। ভাষ্যকার পরে আখ্যাত পদের অর্থ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, কালাভিধানবিশিষ্ট ধাত্বর্থমাত্রও উহার অর্থ। নাগেশ ভট্ট ভাষ্যকারোক্ত ঐ "অভিধান" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—কারক। তাঁহার মতে কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকও প্রত্যয়ার্থ। কিন্তু "অভিধান" শব্দের কারক অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। যদ্বারা কোন অর্থ অভিহিত হয়, এই অর্থে "অভিধান" শব্দের দ্বারা বুঝা যায় বাচক শব্দ। পরন্তু কারক বলিতে ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বে "কারক" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। নাগেশ ভট্টের মত সমর্থন করিতে "কলা" টীকাকার বৈদ্যনাথ ভট্ট বাৎস্যায়ন ও উদ্দ্যোতকরের "ধাত্বর্থমাত্রঞ্চ" এই বাক্যে "মাত্র" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন সংখ্যা এবং "ধাত্বর্থমাত্রং" এই প্রয়োগে সমাহার দ্বন্দ্বসমাস বলিয়া, উহার দ্বারা ধাত্বর্থ এবং সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা আমরা একেবারেই বুঝিতে পারি না। আমাদিগের মনে হয় যে, ভাষ্যে কালবাচক আখ্যাত প্রত্যয়ই "কালাভিধান" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। এবং যে মতে "স্থীয়তে," এবং "সুপ্যতে" ইত্যাদি ভাববাচ্য আখ্যাত প্রত্যয়ান্ত আখ্যাত পদের দ্বারা বর্ত্তমান কালবিশিষ্ট ধাত্বর্থমাত্রেরই বোধ হয়, সেই মতানুসারেই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, কালবাচক প্রত্যয়বিশিষ্ট অর্থাৎ সেই প্রত্যয়ার্থ কালের সহিত অন্বয়-সম্বন্ধযুক্ত ধাত্বর্থমাত্রও আখ্যাত পদের অর্থ। তাৎপর্য্য এই যে, আখ্যাত পদের দ্বারা অনেক স্থলে কারক ও তদ্‌গত সংখ্যা প্রভৃতির বোধ হইলেও কোন মতে কোন কোন আখ্যাত পদের দ্বারা যখন কেবল কাল-বিশিষ্ট ধাত্বর্থ মাত্রও বুঝা যায়, তখন তাহারও সংগ্রহের জন্যই আখ্যাত পদের পূর্ব্বোক্তরূপ সামান্য

১। ক্রিয়েতি,—ক্রিয়ানাম জাত্যাদিঃ, কারকং, কারকগতা সংখ্যা চ তদ্বিশিষ্টো নামার্থ ইত্যর্থঃ।—"কুঞ্চিকা" টীকা।

২। অথ নামার্থমাহ "ক্রিয়েত্যাদি। ক্রিয়া জাত্যাদি। কারকং তদাশ্রয়ঃ। সচ ব্যক্তিগতসংখ্যাযুতো নামার্থঃ। —সিদ্ধান্তমঞ্জুষা, ৮০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লক্ষণই কথিত হইয়াছে। "ধাত্বর্থমাত্রঞ্চ" এই বাক্যে "চ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ভাষ্যকার অন্যত্র কারক প্রভৃতি অর্থেরও প্রকাশ করিয়াছেন। কালবাচক প্রত্যয়ের অর্থ কালের সহিত ধাত্বর্থের অন্বয়-সম্বন্ধ হওয়ায় ঐরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে ধাত্বর্থকে কালবাচক প্রত্যয়বিশিষ্ট বলা যায় এবং ঐরূপ বলিলে তদ্দ্বারা কালবাচক আখ্যাত প্রত্যয়ান্ত ধাতুই আখ্যাতপদ, এইরূপ ফলিতার্থও সূচিত হয়। সুধীগণ এখানেও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য চিন্তা করিবেন।

ভাষ্যকার পরে বাদীর বক্তব্য বলিতে অর্থভেদ হইলেও যে সমস্ত শব্দের কুত্রাপি কোন প্রয়োগে রূপভেদ হয় না, সেই সমস্ত শব্দ নিপাত, এবং যে সমস্ত শব্দ ক্রিয়াবিশেষের দ্যোতক এবং আখ্যাত পদের সমীপে, পূর্ব্বে অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রযুজ্যমান হয়, তাহা উপসর্গ, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারোক্ত নিপাতলক্ষণের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেও বাচস্পতি মিশ্র সরল অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন কেন? তাহাও সুধীগণ দেখিয়া বিচার করিবেন। "চ" "তু" প্রভৃতি নিপাত শব্দেরও অর্থ আছে। কিন্তু অব্যয় শব্দ বলিয়া উহার উত্তর সর্ব্বত্র সমস্ত বিভক্তির লোপ হওয়ায় উহার রূপভেদ হয় না। উপসর্গগুলিরও উক্ত কারণে কুত্রাপি রূপভেদ হয় না। কিন্তু উপসর্গগুলি ক্রিয়াবিশেষের দ্যোতক মাত্র, উহার অর্থ নাই, এই মতানুসারেই নিপাত হইতে উপসর্গের পৃথক্ নির্দ্দেশ হইয়াছে বুঝা যায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র এখানে উপসর্গেরও কোন স্থলে অধিক অর্থ এবং কোন স্থলে বিপরীত অর্থ বলিয়াছেন। উহাও মত আছে। বাহুল্যভয়ে এখানে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয়েই সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে পারিলাম না। বিশেষ জিজ্ঞাসু নাগেশ ভট্টের "মঞ্জুষা" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন॥৬॥

সূত্র। বর্ণক্রমনির্দ্দেশবন্নিরর্থকং ॥৮॥৫১২॥

অনুবাদ। বর্ণসমূহের ক্রমিক নির্দ্দেশের তুল্য বচন **নিরর্থক**, অর্থাৎ বাদী অথবা প্রতিবাদীর অর্থশূন্য বচন (৭) "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। যথাঽনিত্যঃ শব্দঃ ক চ ত পা নাং,[১] জ ব গ ড দ শ ত্বাৎ, ঝ ভ ঞ ঘ ঢ ধ ষ বদিতি, এবম্প্রকারং নিরর্থকং। অভিধানাভিধেয়ভাবানুপপত্তাবর্থগতেরভাবাদ্বর্ণা এব ক্রমেণ নির্দ্দিশ্যন্ত ইতি।

অনুবাদ। যেমন "অনিত্যঃ শব্দঃ ক চ ত পা নাং, জ ব গ ড দ শ ত্বাৎ, ঝ ভ ঞ ঘ ঢ ধ ষ বৎ", এবম্প্রকার বচন নিরর্থক নামক নিগ্রহস্থান। বাচ্যবাচক ভাবের

১। "কচটতপাঃ" এইরূপ পাঠ অনেক পুস্তকে থাকিলেও "কচটতপানাং" এইরূপ পাঠে উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত বর্ণের অর্থশূন্যতা ব্যক্ত হয়। "ন্যায়মঞ্জরী", "ন্যায়সার" এবং "ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে"র লঘুবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থেও ঐরূপ পাঠই আছে। ন্যায়সারের টীকাকার জয়সিংহ সূরি লিখিয়াছেন,—"অত্র কচটতপানাং শব্দোঽনিত্য এতাবান্ পক্ষঃ।"

অনুপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থবোধ না হওয়ায় (উক্ত স্থলে) বর্ণসমূহই ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট (উচ্চরিত) হয়।

টিপ্পনী। অর্থান্তরের পরে এই সূত্র দ্বারা "নিরর্থক" নামক সপ্তম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। যে শব্দের কোন অর্থ নাই অর্থাৎ শক্তি, লক্ষণা অথবা কোন পরিভাষার দ্বারা যে শব্দের কোন অর্থ বুঝা যায় না, তাহাকে অর্থশূন্য শব্দ বলে। বাদী বা প্রতিবাদী ঐরূপ অর্থশূন্য শব্দের প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা কোন অর্থবোধ না হওয়ায় উহা সেখানে "নিরর্থক" নামক নিগ্রহ-স্থান। সে কিরূপ শব্দপ্রয়োগ ? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"বর্ণক্রমনির্দ্দেশবৎ"। অর্থাৎ যেমন ক্রমশঃ উচ্চরিত বর্ণ মাত্র। ভাষ্যকার ইহার উদারণ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রকার বচন নিরর্থক। পরে উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত বর্ণ কোন অর্থের বাচক নহে। সুতরাং ঐ সমস্ত বর্ণ এবং কোন অর্থের অভিধানাভিধেয়ভাব অর্থাৎ বাচকবাচ্যভাব না থাকায় উহার দ্বারা "অর্থগতি" অর্থাৎ কোন অর্থ বোধ হয় না। সুতরাং উক্ত স্থলে কতকগুলি বর্ণমাত্রই ক্রমশঃ উচ্চরিত হয়। ঐরূপ নিরর্থক শব্দ প্রয়োগই "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান। পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত "অর্থান্তর" স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর অসম্বদ্ধার্থ বচনগুলি প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী হইলেও উহার অন্তর্গত কোন শব্দই অর্থশূন্য নহে। কিন্তু এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণে ক্রমশঃ উচ্চরিত ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণের কোন অর্থ নাই। যে স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর ক্রমশঃ উচ্চরিত বর্ণসমূহেরও কোন অর্থ আছে এবং প্রকরণজ্ঞানাদিবশতঃ সেই অর্থের বোধ হয়, সেখানে সেই সমস্ত বর্ণের প্রয়োগ "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইবে না। কিন্তু অর্থশূন্য ঐরূপ শব্দের প্রয়োগ স্থলেই উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্য্য।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ নিরর্থক শব্দ প্রয়োগকে নিগ্রহস্থানের মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অর্থশূন্য শব্দ প্রয়োগ উন্মত্তপ্রলাপ। সুতরাং শাস্ত্রে উহার উল্লেখ করা বা উহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া গ্রহণ করা অযুক্ত। পরন্তু তাহা হইলে বাদী বা প্রতিবাদীর নিরর্থক কপোলবাদন, গণ্ডবাদন, কক্ষতাড়ন প্রভৃতিও নিগ্রহস্থান বলিয়া কেন কথিত হয় নাই ? "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট এই সমস্ত কথার উত্তর দিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে অনেক উপহাসও করিয়াছেন। তাঁহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে "বর্ণক্রম-নির্দ্দেশবৎ" এই বাক্যে সাদৃশ্যার্থক 'বতি' প্রত্যয়ের দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চরিত নিরর্থক বর্ণসমূহ দৃষ্টান্ত-রূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, বৌদ্ধসম্প্রদায় যে নিরর্থক বর্ণোচ্চারণকে উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়াছেন, মহর্ষি তাহাকে নিগ্রহস্থান বলেন নাই। কিন্তু তত্তুল্য অবাচক শব্দপ্রয়োগই "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান, ইহাই মহর্ষির সূত্রার্থ। বাচস্পতি মিশ্র ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, যেমন কোন দ্রাবিড় বাদী আর্য্যভাষা জানিয়াও অথবা তাহাতে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার নিজ ভাষার দ্বারা সেই ভাষায় অনভিজ্ঞ আর্য্যের নিকটে শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন করিলে, সেখানে তাঁহার "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, ঐ দ্রাবিড় ভাষা বা সেই সমস্ত শব্দ পরে মনুষ্য-

কল্পিত, উহা প্রথমে কোন অর্থবিশেষে ঈশ্বর কর্তৃক সংকেতিত নহে। সুতরাং উহা কোন অর্থের বাচক নহে। "সাধুভির্ভাষিতব্যং নাপভ্রংশিতবৈ ন ম্লেচ্ছিতবৈ" এই শ্রুতি অনুসারে সাধু শব্দরূপ সংস্কৃত শব্দই আর্য্যভাষা, উহাই প্রথমে অর্থবিশেষ-বোধের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক সংকেতিত, অপভ্রংশাদি শব্দ সাধু শব্দ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত। বাচস্পতি মিশ্র পরে বিচারপূর্ব্বক এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। এই মতে অপভ্রংশাদি শব্দ উচ্চরিত হইলে তদ্দ্বারা সেই সাধু শব্দের অনুমান হয়। পরে সেই অনুমিত সাধু শব্দের দ্বারাই তাহার অর্থবোধ হইয়া থাকে এবং যাহাদিগের সেই সাধু শব্দের জ্ঞান হয় না, তাহারা সেই অপভ্রংশাদি শব্দকে অর্থবিশেষের বাচক বলিয়া ভ্রমবশতঃই তদ্দ্বারা সেই অর্থবিশেষ বুঝিয়া থাকে এবং সেই অর্থবিশেষ বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই সেই সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং উহা উন্মত্তপ্রলাপ বলা যায় না। কিন্তু ক চ ট ত প, ইত্যাদি নিরর্থক বর্ণসমূহের উচ্চারণ এবং কপোলবাদন প্রভৃতির দ্বারা কাহারই কোন অর্থের বোধ না হওয়ায় তাহা ঐরূপ নহে। সুতরাং উহা "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কারণ, যে সমস্ত শব্দ অর্থশূন্য বা অবাচক, কিন্তু তদ্দ্বারাও কাহারও কোন অর্থ বোধ হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাহার প্রয়োগ হয়, এমন শব্দের প্রয়োগই "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান। অবশ্য বৈয়াকরণ সম্প্রদায় উক্ত মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে অপভ্রংশাদি শব্দেরও বাচ্য অর্থ আছে। কিন্তু উক্ত মতেও পূর্ব্বোক্ত স্থলে "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, উক্তরূপ স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী নিজ পক্ষ-সমর্থনে তাঁহার অসামর্থ্য বুঝিয়াই, তখন সেই অসামর্থ্য প্রচ্ছাদনের জন্যই অপরের অজ্ঞাত ভাষার দ্বারা নিজ বক্তব্য বলেন, অথবা তিনি সংস্কৃত ভাষাই জানেন না। সুতরাং উক্তরূপ স্থলেও তাঁহার সেই ভাষা-প্রয়োগের দ্বারাই তাঁহার বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমান হওয়ায় উহা তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান হয়। কিন্তু যে স্থলে প্রথমে যে কোন ভাষার দ্বারা বিচার হইতে পারে অথবা অপভ্রংশ ভাষার দ্বারাই বিচার কর্ত্তব্য, এইরূপ "সময়বন্ধ" বা প্রতিজ্ঞাবন্ধ হয়, সেখানে বাদী বা প্রতিবাদী কাহারই পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থান হইবে না। কারণ, উক্তরূপ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই প্রথমে ঐরূপ ভাষাপ্রয়োগ স্বীকার করায় কেহই কাহারও অবাচক শব্দ প্রয়োগজন্য বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমান করিতে পারেন না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পরে এই কথা বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র এখানে পরে ভাষ্যকারেরও উক্তরূপ তাৎপর্য্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, এই জন্যই ভাষ্যকারও বলিয়াছেন,—"এবম্প্রকারং নিরর্থকং"। অর্থাৎ তিনি "ইদমেব নিরর্থকং" এই কথা না বলিয়া "এবম্প্রকারং নিরর্থকং" এই কথা বলায় তাঁহার মতেও তাঁহার প্রদর্শিত নিরর্থক বর্ণমাত্রের উচ্চারণই "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান নহে। কিন্তু তত্তুল্য অবাচক শব্দ প্রয়োগই "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান, ইহাই তাঁহারও তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তভাবে এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহাদিগের ব্যাখ্যার দ্বারা অর্থশূন্য ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণমাত্রের উচ্চারণ যে "নিরর্থক" নামক

নিগ্রহস্থান, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকর পরে "অপার্থক" হইতে ইহার ভেদ সমর্থন করিতে এই "নিরর্থক" স্থলে যে বর্ণমাত্রের উচ্চারণ হয়, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং এখানে ইহার নিগ্রহস্থানত্ব সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রকৃত পঞ্চাবয়ব বাক্যরূপ সাধনের গ্রহণ না করিয়া, কেবল নিরর্থক বর্ণমাত্রের উচ্চারণ করায় তিনি সাধ্য ও সাধন জানেন না, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় নিগৃহীত হইবেন। উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও এখানে অনেক প্রকারে অবাচক শব্দের উদাহরণ প্রকাশ করিতে প্রথমে অর্থশূন্য বর্ণমাত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে তিনি ম্লেচ্ছভাষা প্রভৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং কোন দাক্ষিণাত্য তাঁহার নিজ ভাষায় অনভিজ্ঞ আর্য্যের নিকটে নিজ ভাষার দ্বারা বক্তব্য বলিলে যে, তাঁহারও "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহাও শেষে বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এখানে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতদিগকেই কেন ঐ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন[১] এবং পক্ষান্তরে আর্য্যভাষায় অনভিজ্ঞতাবশতঃ ও আর্য্যের নিকটে কিরূপ দ্রাবিড়ের নিজ ভাষায় নিজ পক্ষ স্থাপন বলিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয় ॥৮॥

সূত্র। পরিষৎ-প্রতিবাদিভ্যাং ত্রিরভিহিতমপ্যবিজ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থং ॥৯॥৫১৩॥

অনুবাদ। (বাদী কর্ত্তৃক) তিনবার কথিত হইলেও পরিষৎ অর্থাৎ মধ্যস্থ সভ্যগণ ও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক যে বাক্য অবুদ্ধ হয়, তাহা (৮) "অবিজ্ঞাতার্থ" অর্থাৎ "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। যদ্বাক্যং পরিষদা প্রতিবাদিনা চ ত্রিরভিহিতমপি ন বিজ্ঞায়তে— শ্লিষ্টশব্দমপ্রতীতপ্রয়োগমতিদ্রুতোচ্চরিতমিত্যেবমাদিনা কারণেন, তদবিজ্ঞাতার্থমসামর্থ্যসংবরণায় প্রযুক্তমিতি নিগ্রহস্থানমিতি।

অনুবাদ। যে বাক্য (বাদিকর্ত্তৃক) তিনবার কথিত হইলেও শ্লিষ্ট শব্দযুক্ত, অপ্রসিদ্ধ-প্রয়োগ, অতি দ্রুত উচ্চরিত, ইত্যাদি কারণবশতঃ পরিষৎ ও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক বিজ্ঞাত হয় না অর্থাৎ প্রতিবাদী ও সভ্যগণ কেহই উহার অর্থ বুঝেন না, সেই বাক্য (৮) "অবিজ্ঞাতার্থ," অসামর্থ্য প্রচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়, এ জন্য নিগ্রহস্থান।

১। যদা দ্রাবিড়ঃ স্বভাষয়া তদ্ভাষানভিজ্ঞমার্য্যং প্রতি শব্দানিত্যত্বং প্রতিপাদয়তি, তদা নিরর্থকং নিগ্রহস্থানং, স খল্বার্য্যভাষাং জানন্নসামর্থ্যপ্রচ্ছাদনায় তদ্ভাষানভিজ্ঞতয়া বা স্বভাষয়া সাধনং প্রযুক্তবান্ ইত্যাদি—তাৎপর্য্যটীকা। স্বভাষয়া প্রত্যবতিষ্ঠমানে দাক্ষিণাত্যে তূষ্ণীস্থিতে এব শরণমার্য্যস্তেত্তাজ্ঞানেনাবশিষ্যত ইতি গতং কথাব্যসনেন। —তার্কিকরক্ষা।

টিপ্পনী। এই সূত্রদ্বারা "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক অষ্টম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। সূত্রে "ত্রিরভিহিতং" এই বাক্যের পূর্ব্বে "বাদিনা" এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদী তাঁহার যে বাক্য তিনবার বলিলেও পরিষৎ অর্থাৎ সেই সভাস্থানে উপস্থিত সভ্যগণ ও প্রতিবাদী, কেহই তাহার অর্থ বুঝেন না, বাদীর সেই বাক্য তাঁহার পক্ষে "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিগ্রহস্থান। এইরূপ প্রতিবাদীর ঐরূপ বাক্যও তুল্য যুক্তিতে ঐ নিগ্রহ-স্থান হইবে। বাদী তিনবার বলিলেও অন্য সকলে কেন তাহার অর্থ বুঝিবেন না ? এবং না বুঝিলে তাহাতে বাদীর অপরাধ কি ? উক্ত স্থলে তিনিই কেন নিগৃহীত হইবেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্য-কার বলিয়াছেন যে, বাদীর সেই বাক্য শ্লিষ্ট শব্দযুক্ত হইলে এবং তাহার প্রয়োগ অপ্রতীত অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ হইলে এবং অতি দ্রুত উচ্চরিত হইলে, ইত্যাদি কারণবশতঃ বাদীর ঐ বাক্যার্থ অন্য কেহ বুঝিতে পারেন না। এবং বাদী তাঁহার স্বপক্ষ সমর্থনে নিজের অসামর্থ্য বুঝিয়াই সেই অসামর্থ্য প্রচ্ছাদনের জন্য অন্যের অবোধ্য ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করেন। প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণ তাঁহার সেই বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়া নিরস্ত হইবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে বাদীর দুরভিসন্ধিমূলক ঐরূপ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার বিপ্রতিপত্তি অথবা অজ্ঞতার অনুমান হওয়ায় উহা তাঁহার পক্ষেই নিগ্রহস্থান হইবে। সুতরাং তিনিই নিগৃহীত হইবেন। যে কোনরূপে প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিবার জন্য বাদী ঐরূপ প্রয়োগ অবশ্যই করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোন দোষ হইতে পারে না, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে পরাজয় সম্ভাবনা স্থলে শেষে বাদী বা প্রতিবাদী অতি দুর্ব্বোধার্থ কোন একটি বাক্যের উচ্চারণ করিয়াই সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতে পারেন। সুতরাং বাদী দুরভিসন্ধিবশতঃ ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন না। তাহা করিলে সেখানে তিনিই নিগৃহীত হইবেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারোক্ত শ্লিষ্ট শব্দযুক্ত বাক্যের উদাহরণ বলিয়াছেন,—"শ্বেতো ধাবতি"। "শ্বেত" শব্দের দ্বারা শ্বেত রূপ-বিশিষ্ট এই অর্থ বুঝা যায় এবং "শ্বা × ইতঃ" এইরূপ সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া বুঝিলে উক্ত বাক্যের দ্বারা, এই স্থান দিয়া কুক্কুর ধাবন করিতেছে, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু উক্ত স্থলে প্রকরণাদি নিয়ামক না থাকিলে বাদীর বিবক্ষিত অর্থ কি ? তাহা নিশ্চয় করা যায় না। এইরূপ বেদে যে "জর্ফ রী" ও "তুর্ফ রী" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা অপ্রতীত অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সকলে উহা বুঝিতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র ঐ সমস্ত শব্দকেই এখানে "অপ্রতীত-প্রয়োগ" বলিয়াছেন।

কিন্তু উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন ; যথা—(১) কোন অসাধারণ শাস্ত্রমাত্রপ্রসিদ্ধ এবং (২) রূঢ় শব্দকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল যৌগিক শব্দযুক্ত, এবং (৩) প্রকরণাদি-নিয়ামকশূন্য শ্লিষ্টশব্দযুক্ত। তন্মধ্যে বাদী যদি মীমাংসাশাস্ত্র-মাত্রে প্রসিদ্ধ "স্ফ্য", "কপাল" ও "পুরোডাশ" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করেন অথবা বৌদ্ধ শাস্ত্রমাত্রে প্রসিদ্ধ "পঞ্চস্কন্ধ", "দ্বাদশ আয়তন" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করেন এবং প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণ কেহই তাহার অর্থ না বুঝেন, তাহা হইলে সেখানে বাদীর সেই বাক্য পূর্ব্বোক্তপ্রকার "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক

নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্তু যে স্থলে মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ বা বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ মধ্যস্থ নাই এবং প্রতিবাদীও ঐ সমস্ত শাস্ত্র জানেন না, সেইরূপ স্থলেই বাদী দুরভিসন্ধিবশতঃ ঐরূপ প্রয়োগ করিলে তিনি নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু যদি সেখানেও বাদী বা প্রতিবাদী কেহ দম্ভপূর্ব্বক অপরকে বলেন যে, আপনি যে কোন পরিভাষার দ্বারা বলিতে পারেন, তাহা হইলে সেখানে কেহ অন্য শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিলেও তিনি নিগৃহীত হইবেন না। রূঢ় শব্দকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল যৌগিক শব্দের দ্বারা দুর্ব্বোধার্থ বাক্য-রচনা করিয়া বলিলে সেই বাক্য দ্বিতীয় প্রকার "অবিজ্ঞাতার্থ"। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন,—"কশ্যপতনয়া-ধৃতি-হেতুরয়ং ত্রিনয়ন-তনয়-যান-সমাননামধেয়বান্ তৎকেতুমত্ত্বাৎ"। "পর্ব্বত" এই রূঢ় শব্দ গ্রহণ করিয়া যেখানে "পর্ব্বতোঽয়ং" এইরূপ প্রয়োগই বাদীর কর্ত্তব্য, সেখানে তিনি দুরভিসন্ধিবশতঃ বলিলেন,—"কশ্যপতনয়া-ধৃতিহেতুরয়ং"। কশ্যপের তনয়া পৃথিবী, এ জন্য পৃথিবীর একটী নাম কাশ্যপী। কশ্যপতনয়া পৃথিবীর ধৃতির হেতু অর্থাৎ ধারণকর্ত্তা ভূধর অর্থাৎ পর্ব্বত, ইহাই উক্ত যৌগিক শব্দের দ্বারা বাদীর বিবক্ষিত। পরে "বহ্নিমান্" এইরূপ প্রয়োগ বাদীর কর্ত্তব্য হইলেও তিনি বলিলেন,—"ত্রিনয়ন-তনয়-যান-সমাননামধেয়বান্।" ত্রিনয়ন মহাদেব, তাঁহার তনয় কার্ত্তিকেয়, তাঁহার যান অর্থাৎ বাহন ময়ূর; সেই ময়ূরের একটী নাম শিখী। বহ্নির একটী নামও শিখী। তাহা হইলে ময়ূরের নামের সমান নাম যাহার, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে "ত্রিনয়নতনয়যানসমান-নামধেয়" শব্দের দ্বারা বহ্নি বুঝা যায়। পরে "ধূমবত্ত্বাৎ" এইরূপ হেতুবাক্য না বলিয়া বাদী বলিলেন, "তৎকেতুমত্ত্বাৎ"। ঐ "তৎ"শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বহ্নিই বাদীর বুদ্ধিস্থ। বহ্নির কেতু অর্থাৎ অসাধারণ চিহ্ন বা অনুমাপক ধূম। সুতরাং "তৎকেতু" শব্দের দ্বারা ধূম বুঝা যায়। প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণ বাদীর ঐ বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়াই নিরস্ত হইবেন, এইরূপ দুরভিসন্ধিবশতঃই বাদী ঐরূপ প্রয়োগ করায় পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে তিনিই উক্ত স্থলে নিগৃহীত হইবেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে শঙ্কর মিশ্রের প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রিত "বাদি-বিনোদ" ও বিশ্বনাথবৃত্তি পুস্তকে সর্ব্বাংশে প্রকৃত পাঠ মুদ্রিত হয় নাই। তৃতীয় প্রকার "অবিজ্ঞা-তার্থে"র উদাহরণ "শ্বেতো ধাবতি" ইত্যাদি শ্লিষ্ট শব্দযুক্ত বাক্য। কিন্তু ভাষ্যকার যে অতি দ্রুত উচ্চরিত বাক্যকেও "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিগ্রহস্থানের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে অবশ্য গ্রাহ্য। উদয়নাচার্য্য ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতির মতে এই সূত্রে 'ত্রিঃ" এই পদের দ্বারা বাদী তিনবারের অধিক বলিতে পারিবেন না, তিনবার মাত্রই তাঁহার বাক্য শ্রাব্য, এইরূপ নিয়ম সূচিত হইয়াছে[১]। কিন্তু ভাসর্ব্বজ্ঞের "ন্যায়সারে"র মুখ্য টীকাকার ভূষণের মতে সভ্যগণের অনুজ্ঞা হইলে তদনুসারে বাদী আরও অধিকবার বলিতে পারেন, ইহাই মহর্ষি গোতমের ঐ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে। বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ত্রিলোচনেরও উহাই মত। বাচস্পতি মিশ্রের কথার

১। অতস্ত্রিভিরিতি নিয়ম ইত্যাচার্য্যাণামাশয়ঃ। পরিষদনুজ্ঞোপলক্ষণং ত্রিরভিধানমিতি ভূষণকারঃ। চতুরভি-ধানেঽপি ন কশ্চিদ্দোষ ইতি বদতস্ত্রিলোচনস্যাপি স এবাভিপ্রায়ঃ।—তার্কিকরক্ষা।

দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। উক্ত বিষয়ে আরও মতভেদ আছে। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান-স্থলে বাদী অবাচক শব্দেরই প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ তাঁহার উচ্চারিত শব্দ অর্থশূন্য। কিন্তু "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিগ্রহস্থান-স্থলে বাদীর উচ্চারিত শব্দ অর্থশূন্য নহে। অর্থাৎ তিনি বাচক শব্দেরই প্রয়োগ করেন, ইহাই বিশেষ ॥ ৯ ॥

সূত্র। পৌর্ব্বাপর্য্যাযোগাদপ্রতিসম্বদ্ধার্থমপার্থকং ॥ ॥১০॥৫১৪॥

অনুবাদ। পূর্ব্বাপরভাবে অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে অন্বয় সম্বন্ধের অভাব-বশতঃ অসম্বদ্ধার্থ (৯) অপার্থক, অর্থাৎ ঐরূপ পদ বা বাক্য "অপার্থক" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। যত্রানেকস্য পদস্য বাক্যস্য বা পৌর্ব্বাপর্য্যেণান্বয়যোগো নাস্তীত্যসম্বদ্ধার্থত্বং গৃহ্যতে তৎসমুদায়ার্থস্যাপায়াদপার্থকং। যথা "দশ দাড়িমানি ষড়পূপাঃ"। "কুণ্ডমজাজিনং পললপিণ্ডঃ, অথ রৌরুকমেতৎ কুমার্য্যাঃ পায্যং, তস্যাঃ পিতা অপ্রতিশীন" ইতি।

অনুবাদ। যে স্থলে অনেক পদ অথবা অনেক বাক্যের পূর্ব্বাপরভাবে অন্বয়-সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ সেই সমস্ত অনেক পদার্থ বা অনেক বাক্যার্থের পরস্পর অন্বয়-সম্বন্ধ অসম্ভব, এ জন্য অসম্বদ্ধার্থত্ব গৃহীত হয়, সেই পদ বা বাক্য, সমুদায়ার্থের অপায়বশতঃ অর্থাৎ সেই সমস্ত নিরাকাঙ্ক্ষ পদ বা বাক্য মিলিত হইয়া কোন একটি বাক্যার্থের বোধক হইতে না পারায় তাহা (৯) অপার্থক নামক নিগ্রহস্থান। যেমন "দশ দাড়িমানি" ও "ষড়পূপাঃ" এই বাক্যদ্বয়। অর্থাৎ ঐ বাক্যদ্বয়ের অর্থের পরস্পর অন্বয় সম্বন্ধ না থাকায় উহা বাক্যাপার্থক। এবং "কুণ্ডং" "অজা" "অজিনং" "পললপিণ্ডঃ" "রৌরুকং" ইত্যাদি পদ। অর্থাৎ ঐ সমস্ত পদগুলির অর্থের পরস্পর অন্বয় সম্বন্ধ না থাকায় উহা পদাপার্থক।

টিপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা "অপার্থক" নামক নবম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে স্থলে অনেক পদ অথবা অনেক বাক্যের পূর্ব্বাপরভাবে অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবে অন্বয় সম্বন্ধ না থাকায় উহা অসম্বদ্ধার্থ, ইহা বুঝা যায়, সেই স্থলে সেই সমস্ত পদ বা বাক্য "অপার্থক" নামক নিগ্রহস্থান। ঐ সমস্ত পদ বা বাক্যের অর্থ থাকিলেও উহাকে অপার্থক কিরূপে বলা যায়? তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"সমুদায়ার্থস্যাপায়াৎ"। অর্থাৎ উহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বাক্যের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ার্থ নাই। কারণ, ঐ সমস্ত পদ ও

বাক্য মিলিত হইয়া কোন একটি বাক্যার্থ-বোধ জন্মায় না, এ জন্য উহার নাম "অপার্থক"। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোন বাক্যার্থ-বোধনই অনেক পদ-প্রয়োগের প্রয়োজন এবং কোন মহাবাক্যার্থ-বোধনই অনেক বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন। কিন্তু যে সমস্ত পদ বা বাক্যের সমুদায়ার্থ নাই, যাহারা মিলিত হইয়া কোন বাক্যার্থ অথবা মহাবাক্যার্থ বোধ জন্মাইতে পারে না, সেই সমস্ত পদ ও বাক্য নিষ্প্রয়োজন বলিয়া উহা "অপার্থক" নামক নিগ্রহস্থান। পূর্ব্বোক্ত অপার্থক দ্বিবিধ,—(১) পদাপার্থক ও (২) বাক্যাপার্থক। তন্মধ্যে ভাষ্যকার প্রথমে সুপ্রসিদ্ধ বাক্যাপার্থকেরই উদাহরণ বলিয়াছেন,—"দশ দাড়িমানি", "ষড়পূপাঃ"। "দশ দাড়িমানি" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়—দশটী দাড়িম্বফল এবং "ষড়পূপাঃ" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, ছয়খানা অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক। কিন্তু দশটী দাড়িম্বফলই ছয়খানা পিষ্টক, এইরূপ কোন অর্থ ঐ বাক্যদ্বয়ের দ্বারা বুঝা যায় না। ঐ বাক্যদ্বয়ের পরস্পর অন্বয়সম্বন্ধই নাই অর্থাৎ পূর্ব্ববাক্যের অর্থের সহিত পরবাক্যের অর্থের বিশেষ্যবিশেষণভাবে অন্বয়-সম্বন্ধ না থাকায় ঐ বাক্যদ্বয় যে অসম্বদ্ধার্থ, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত বাক্যদ্বয় নিরাকাঙ্ক্ষ বলিয়া, উহার দ্বারা একটী সমুদায়ার্থের বোধ না হওয়ায় উহার একবাক্যতা সম্ভবই হয় না। এ জন্য উক্ত বাক্যদ্বয় "অপার্থক" বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সুপ্রাচীন কাল হইতেই উহা "অপার্থকে"র উদাহরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ভাষ্যকার পরে "পদাপার্থকে"র প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শন করিতে "কুণ্ডং" ইত্যাদি কতিপয় পদের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত পদেরও প্রত্যেকের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ার্থ নাই। কারণ, ঐ সমস্ত পদ মিলিত হইয়া কোন একটী সমুদায়ার্থ বা বাক্যার্থের বোধক হয় না। সুতরাং ঐ সমস্ত পদেরও একবাক্যতা সম্ভব না হওয়ায় উহা অপার্থক বলিয়া কথিত হইয়াছে। পদসমূহ এবং বাক্যসমূহ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ হইলেই তাহাদিগের সমুদায়ার্থের একত্ববশতঃ একবাক্যতা হয়, নচেৎ তাহা অপার্থক, ইহা মহর্ষি জৈমিনিও "অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষঞ্চেদ্বিভাগে স্যাৎ" এই সূত্রের দ্বারা সূচনা করিয়া গিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বোক্ত পদগত ও বাক্যগত অপার্থকত্ব দোষ সর্ব্বসম্মত। ভারতের কবিগণও উহার উল্লেখ করিয়াছেন[১]। সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও অপার্থকের পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন[২]।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও পাণিনির "বৃদ্ধিরাদৈচ্" এবং "অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকং" (১।২।৪৫) এই সূত্রের ভাষ্যে "দশ দাড়িমানি" ইত্যাদি সন্দর্ভের উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্ত

১। "ন চ সামর্থ্যমপোহিতং ক্বচিৎ"।—কিরাতার্জ্জুনীয়—২।২৭। তথা ক্বচিদপি সামর্থ্যং গিরাং অন্যোন্য-সামর্থ্যং সাকাঙ্ক্ষত্বাম্নাপোহিতং ন বর্জ্জিতং। অন্যথা দশ দাড়িমাদিশব্দবদেকবাক্যতা ন স্যাৎ। যথাহুঃ—"অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষঞ্চেদ্বিভাগে স্যা"দিতি। মল্লিনাথকৃতটীকা

২। সমুদায়ার্থশূন্যং যৎ তদপার্থকমিষ্যতে।
দাড়িমানি দশাপূপাঃ ষড়িত্যাদি যথোদিতং।—ভামহপ্রণীত কাব্যালঙ্কার, চতুর্থ পঃ, ৮ম শ্লোক।

অপার্থকের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন[১]। তিনি উহাকে "অনর্থক" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থ থাকিলেও অনর্থক কিরূপে হইবে? তাই তিনি সেখানে পরে বলিয়াছেন, "সমুদায়োঽস্যানর্থকঃ" অর্থাৎ প্রত্যেক পদ বা বাক্যের অর্থ থাকিলেও সমুদায় পদ বা সমুদায় বাক্যের কোন অর্থ না থাকায় সেই সমুদায়ই সেখানে অনর্থক। সেই সমস্ত পদার্থের পরস্পর সমন্বয় না থাকায় সেই সমুদায়ের কোন অর্থ নাই। তাই বলিয়াছেন, "পদার্থানাং সমন্বয়াভাবাদত্রানর্থক্যং"। শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ "অপার্থক"কেই অনাকাঙ্ক্ষ, অযোগ্য এবং অনাসন্ন, এই তিন প্রকার বলিয়াছেন। তন্মধ্যে নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্যসমূহ বা পদসমূহই মুখ্য অপার্থক। যেমন "দশ দাড়িমানি, ষড়পূপাঃ" ইত্যাদি বাক্য এবং "কুণ্ডং" "অজা" "অজিনং" ইত্যাদি পদ। দ্বিতীয় অযোগ্য অপার্থক; যথা—"বহ্নিরনুষ্ণঃ" ইত্যাদি বাক্য। বহ্নি অনুষ্ণ হইতেই পারে না, সুতরাং যোগ্যতা না থাকায় উক্ত বাক্যের দ্বারা কোন বোধ জন্মে না। তৃতীয় অনাসন্ন অপার্থক। বাক্যের অন্তর্গত যে পদের সহিত যে পদের সম্বন্ধ বক্তার অভিপ্রেত, সেই পদদ্বয়ের সন্নিধান বা অব্যবধানকে "আসত্তি" বলে। উহা না থাকিলে তাহাকে বলে অনাসন্ন পদ। অনাসন্ন পদস্থলেও আসত্তিজ্ঞানের অভাবে সমুদায়ার্থবোধ জন্মে না। যেমন "সরসি স্নাত ওদনং ভুক্ত্বা গচ্ছতি" এইরূপ বক্তব্য স্থলে বক্তা বলিলেন, "ওদনং সরসি ভুক্ত্বা স্নাতো গচ্ছতি"। উহা অনাসন্ন নামে তৃতীয় প্রকার পদাপার্থক। বস্তুতঃ ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণে প্রণিধান করিলেও পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার পদাপার্থক বুঝিতে পারা যায়। কারণ, "কুণ্ডং", "অজা", "অজিনং", "পললপিণ্ডঃ" এই সমস্ত পদের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা না থাকায় উহা নিরাকাঙ্ক্ষ "পদাপার্থক"। পললপিণ্ড শব্দের অর্থ মাংসপিণ্ড। বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারের শেষোক্ত পদত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"রৌরুকং রুরুসম্বন্ধি, পায্যং পায়য়িতব্যং অপ্রতিশীনো বৃদ্ধঃ"। উক্ত ব্যাখ্যানুসারে "রৌরুকং অজিনং" এইরূপ বাক্য বলিলে রুরু অর্থাৎ মৃগবিশেষসম্বন্ধী অজিন, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভে "অজিনং" এই পদটী "রৌরুকং" এই পদের সন্নিহিত বা অব্যবহিত না হওয়ায় উক্ত স্থলে ঐ পদদ্বয়ের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থের বোধ হয় না। সুতরাং উক্ত পদদ্বয়কে অনাসন্ন পদাপার্থক বলা যায়। এবং স্তন্যপায়িনী শিশুকুমারীর পিতা "অপ্রতিশীন" অর্থাৎ বৃদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং "তস্যাঃ পিতা অপ্রতিশীনঃ" এই পদত্রয়কে অযোগ্য পদাপার্থক বলা যায়। উক্ত স্থলে ভাষ্যকারের উহাই বিবক্ষিত কি না, ইহা সুধীগণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিবেন।

পরন্তু উক্ত স্থলে ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এখানে মহাভাষ্যোক্ত দশ দাড়িমানি ইত্যাদি সন্দর্ভই যথাযথ উদ্ধৃত করেন নাই। এখানে বাৎস্যায়নের উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে

১। "যথা লোকেঽর্থবন্তি চানর্থকানিচ বাক্যানি দৃশ্যন্তে"। অনর্থকানি—দশ দাড়িমানি ষড়পূপাঃ; কুণ্ডমজাজিনং পললপিণ্ডঃ, অধরোরুকমেতৎ, কুমার্য্যাঃ স্ফৈয়কৃতস্য, পিতা প্রতিশীনঃ"।—মহাভাষ্য। স্ফ্যকৃতোঽপত্যং স্ফৈয়কৃতঃ। নাগেশ ভট্টকৃত বিবরণ। "স্ফ্য"শব্দেন খড়্গাকারং কাষ্ঠমুচ্যতে"।—জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর—১১২ পৃষ্ঠা।

"স্ফৈয়কৃতস্য" এই পদ নাই। বাচস্পতি মিশ্রও এখানে উক্ত পদের কোন অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যার দ্বারা এখানে বাৎস্যায়নের উদ্ধৃত পাঠ যেরূপ বুঝা যায়, তাহা সর্বাংশে মহাভাষ্যোক্ত পাঠের অনুরূপ নহে। বস্তুতঃ সুচিরকাল হইতেই অপার্থকের উদাহরণরূপে "দশ দাড়িমানি" ইত্যাদি সন্দর্ভ কথিত হইয়াছে। নানা গ্রন্থে কোন কোন অংশে উহার পাঠভেদও দেখা যায়। সুতরাং ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যে, এখানে মহাভাষ্যোক্ত পাঠই গ্রহণ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পতঞ্জলির পূর্ব্বে "অপার্থ"কের উদাহরণরূপে ঐরূপ সন্দর্ভ আর কেহই বলেন নাই, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সে যাহা হউক, মূল কথা, বাদী বা প্রতিবাদী যদি নিজের পক্ষস্থাপনাদি করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন পদসমূহ বা বাক্যসমূহের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে উহা "অপার্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, উহার দ্বারা তাঁহাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ না হওয়ায় উহা নিষ্প্রয়োজন। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইতে ইহার বিশেষ কি ? নিরর্থক স্থলেও ত পরবোধনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত "নিরর্থক" স্থলে বর্ণমাত্র উচ্চারিত হয়, তাহার কোন অর্থই নাই। কিন্তু "অপার্থক" স্থলে প্রত্যেক পদেরই অর্থ আছে। অর্থাৎ "নিরর্থক" স্থলে অবাচক শব্দের প্রয়োগ হয়, কিন্তু "অপার্থক" স্থলে বাচক শব্দেরই প্রয়োগ হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত "অর্থান্তর" স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর কথিত বাক্যগুলি প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী না হইলেও তাহার অর্থের পরস্পর অন্বয়-সম্বন্ধ আছে। কিন্তু অপার্থক স্থলে তাহা নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "নিরর্থক" ও "অর্থান্তর" হইতে এই "অপার্থক" ভিন্ন প্রকার নিগ্রহস্থান ॥১০॥

অভিমতবাক্যার্থপ্রতিপাদক-নিগ্রহস্থান-চতুষ্টয়-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

সূত্র। অবয়ব-বিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্তকালং ॥১১॥৫১৫॥

অনুবাদ। অবয়বের বিপর্য্যাসবচন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-প্রয়োগের যে ক্রম যুক্তিসিদ্ধ আছে, তাহা লঙ্ঘন করিয়া বিপরীতভাবে অবয়বের বচন (১০) **অপ্রাপ্তকাল** অর্থাৎ অপ্রাপ্তকাল নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। প্রতিজ্ঞাদীনামবয়বানাং যথালক্ষণমর্থবশাৎ ক্রমঃ। তত্রাবয়ব-বিপর্য্যাসেন বচনমপ্রাপ্তকালমসম্বদ্ধার্থং নিগ্রহস্থানমিতি।

অনুবাদ। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবয়বসমূহের লক্ষণানুসারে অর্থবশতঃ ক্রম আছে। তাহা হইলে অবয়বের বিপরীতভাবে বচন অসম্বদ্ধার্থ হওয়ায় "অপ্রাপ্তকাল" নামক নিগ্রহস্থান হয়।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা "অপ্রাপ্তকাল" নামক দশম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপনের জন্য যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যের প্রয়োগ করিবেন,

তাহার লক্ষণ ও তদনুসারে তাহার ক্রম প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। বাদী বা প্রতিবাদী যদি সেই ক্রম লঙ্ঘন করিয়া, বিপরীত ভাবে কোন অবয়বের প্রয়োগ করেন অর্থাৎ প্রথম বক্তব্য প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিয়াই হেতুবাক্য বা উদাহরণাদি বাক্য বলেন অথবা প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়া, পরে উদাহরণবাক্য এবং তাহার পরে হেতুবাক্য বলেন অথবা প্রথমেই নিগমনবাক্য বলিয়া পরে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলেন, এইরূপে ক্রম লঙ্ঘন করিয়া যে অবয়ববচন, তাহা "অপ্রাপ্তকাল" নামক নিগ্রহস্থান। কারণ, অপরের আকাঙ্ক্ষানুসারেই তাঁহাকে নিজপক্ষ বুঝাইবার জন্য বাদীর পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা তাঁহার সাধ্যনির্দ্দেশ করিয়া, পরে তাহার সাধক হেতু কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষানুসারেই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়া, হেতু বক্তব্য। পরে ঐ হেতু যে সেই সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য, ইহা কিরূপে বুঝিব? এইরূপ আকাঙ্ক্ষানুসারেই উদাহরণবাক্যের প্রয়োগ করিয়া দৃষ্টান্ত বক্তব্য। বাদী এইরূপে অপরের আকাঙ্ক্ষানুসারেই যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ করিলেই ঐ সমস্ত বাক্যের পরস্পর অর্থসম্বন্ধ বুঝা যায়। কিন্তু উক্তরূপ ক্রম লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিপরীত ভাবে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ করিলে তাহা বুঝা যায় না। তাই ভাষ্যকার উক্তরূপ তাৎপর্য্যেই পরে বলিয়াছেন,—"অসম্বদ্ধার্থং" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিপরীত ক্রমে প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব বলিলে একের অর্থের সহিত দূরস্থ অপর অবয়বের অর্থের সম্বন্ধ-বোধ না হওয়ায় সেখানে ঐ সমস্ত বাক্যের দ্বারা একটী মহাবাক্যার্থ-বোধ হয় না। সুতরাং সেখানে বাদীর ঐরূপ বচন তাঁহার প্রয়োজনসাধক না হওয়ায় উহা নিগ্রহস্থান।

বৌদ্ধসম্প্রদায় উক্ত নিগ্রহস্থান স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অর্থবোধে পদের বর্ণাদিক্রমের অপেক্ষা থাকিলেও বাক্যের ক্রমের কোন অপেক্ষা নাই। দূরস্থ বাক্যের সহিতও অপর বাক্যের অর্থসম্বন্ধ থাকিতে পারে। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে (২।৯ সূত্রভাষ্যে) উক্ত বৌদ্ধ মতানুসারেই একটী প্রাচীন কারিকার[১] উল্লেখপূর্ব্বক উক্ত মতানুসারে কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের ব্যাখ্যাত সূত্রার্থ যে সেখানে সূত্রার্থ হইতে পারে না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকারের নিজমতে যে, বিপরীত ক্রমে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ করিলে, সেখানে পরস্পরের অর্থসম্বন্ধ থাকে না, ইহা এখানে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারা বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকর এবং জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতিও এখানে বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অনেক স্থলে অর্থবোধে বাক্যের ক্রম আবশ্যক না হইলেও পরার্থানুমান-স্থলে যে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ কর্ত্তব্য, তাহার ক্রম আবশ্যক। বস্তুতঃ যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ না করিলে তাহা "ন্যায়"বাক্যই হয় না। রঘুনাথ শিরোমণিও ন্যায়বাক্যের লক্ষণ দ্বারা ইহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বাদী বা প্রতিবাদী ক্রম লঙ্ঘন করিয়া প্রতিজ্ঞাদি বাক্য বলিলে অবশ্যই নিগৃহীত

১। প্রথম অধ্যায়ে ভাষ্যকারের উদ্ধৃত "যস্য যেনার্থসম্বন্ধঃ" ইত্যাদি কারিকাটী কোন বৌদ্ধ-রচিত কারিকা মনে হয়। কিন্তু "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থে ব্যাসযতি "বার্ত্তিক" বলিয়া উহার উল্লেখ করিয়াছেন। উহা কাত্যায়নের বার্ত্তিকও হইতে পারে।

হইবেন। ভাসর্বজ্ঞের "ন্যায়সারে"র প্রধান টীকাকার ভূষণ ও জয়সিংহ সূরি প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদী শাস্ত্রোক্ত ক্রম রক্ষা করিয়াই বিচার করিব, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করেন, অর্থাৎ যাহাকে "নিয়মকথা" বলে, তাহাতেই কেহ ক্রম লঙ্ঘন করিলে তাঁহার পক্ষে "অপ্রাপ্তকাল" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। অন্য স্থলে অর্থাৎ যাহাকে "প্রপঞ্চকথা" বা "বিস্তরকথা" বলে, তাহাতে কেহ ক্রম লঙ্ঘন করিলেও এই নিগ্রহস্থান হইবে না। কিন্তু কথা-মাত্রেই যে সর্ব্বত্র প্রতিজ্ঞাদি বাক্য ও অন্যান্য সাধন ও দূষণাদির ক্রম আবশ্যক, ইহা সমর্থন করিয়া বরদরাজ প্রভৃতি উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতিও প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ক্রমের আবশ্যকতা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাঁহাদিগের সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

"প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে "অবয়ব" শব্দের দ্বারা কেবল প্রতিজ্ঞাদি অবয়বই গৃহীত হয় নাই। উহার দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর কথা বা বিচার-বাক্যের অংশমাত্রই বিবক্ষিত। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী সাধন ও দূষণের ক্রম লঙ্ঘন করিলেও নিগৃহীত হইবেন। সুতরাং সেই স্থলেও এই "অপ্রাপ্তকাল" নামক নিগ্রহস্থানই স্বীকার্য্য। যেমন বাদী প্রথমে তাঁহার নিজপক্ষ স্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ করিবেন। পরে তাঁহার প্রযুক্ত হেতু যে, সেই স্থলে হেত্বাভাস নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবেন। পরে প্রতিবাদী বাদীর উক্ত বাক্যার্থের অনুবাদ করিয়া, তিনি যে বাদীর কথা সমস্ত শুনিয়া, তাঁহার বক্তব্য ঠিক বুঝিয়াছেন, ইহা মধ্যস্থগণের নিকটে প্রতিপন্ন করিবেন। পরে বাদীর প্রযুক্ত হেতুর খণ্ডন করিয়া, প্রতিজ্ঞাদি বাক্য দ্বারা নিজের পক্ষ স্থাপন করিবেন। পরে তাঁহার নিজের প্রযুক্ত হেতু যে, হেত্বাভাস নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবেন। "জল্প"নামক কথায় বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও দূষণের উক্তরূপ ক্রম যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ ও বর্ণিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য উহা বিশদরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও উহা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বাদী বা প্রতিবাদী উক্ত-রূপ ক্রমের লঙ্ঘন করিলেও সেখানে "অপ্রাপ্তকাল" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। যেমন প্রতিবাদী যদি প্রথমেই তাঁহার বক্ষ্যমাণ হেতুর দোষশূন্যতা প্রতিপাদন করিয়া, পরে সেই হেতুর প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার সেখানে উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে। সুতরাং এই সূত্রে "অবয়ব" শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর কথার অংশমাত্রই বিবক্ষিত। বরদরাজ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এই সূত্রের উক্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ উক্তরূপ ব্যাখ্যায় "অপ্রাপ্তকাল" নামক নিগ্রহস্থানের আরও বহুবিধ উদাহরণ সংগৃহীত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত "অপার্থক" হইতে ইহার পৃথক্ নির্দ্দেশও সম্পূর্ণ সার্থক হয়, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক ॥১১॥

সূত্র। হীনমন্যতমেনাপ্যবয়বেন ন্যূনং ॥১২॥৫১৬॥

অনুবাদ। অন্যতম অবয়ব অর্থাৎ যে কোন একটি অবয়ব কর্ত্তৃকও হীন বাক্য (১১) "ন্যূন" অর্থাৎ "ন্যূন" নামক নিগ্রহস্থান হয়।

ভাষ্য। প্রতিজ্ঞাদীনামবয়বানামন্যতমেনাপ্যবয়বেন হীনং ন্যূনং নিগ্রহস্থানং। সাধনাভাবে সাধ্যাসিদ্ধিরিতি।

অনুবাদ। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবয়বসমূহের মধ্যে যে কোন একটি অবয়ব কর্ত্তৃকও হীন বাক্য "ন্যূন" নামক নিগ্রহস্থান হয়। (কারণ) সাধনের অভাবে সাধ্যসিদ্ধি হয় না।

টিপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা "ন্যূন" নামক একাদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদী যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিবেন, তন্মধ্যে যে কোন একটী অবয়ব ন্যূন হইলেও সেখানে "ন্যূন" নামক নিগ্রহস্থান হয়। উহা নিগ্রহস্থান হইবে কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, সাধনের অভাবে সাধ্যসিদ্ধি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, নিজপক্ষ স্থাপনায় প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী অবয়বই মিলিত হইয়া সাধন হয়। সুতরাং উহার একটীর অভাব হইলেও মিলিত পঞ্চাবয়বরূপ সাধনের অভাবে সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং কোন বাদী বা প্রতিবাদী যদি সভাক্ষোভাদিবশতঃ যে কোন একটী অবয়বেরও প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে সেখানে অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন। "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ সিদ্ধান্তসিদ্ধ অবয়বের মধ্যেই যদি একটীমাত্রও ন্যূন হয়, তাহা হইলে সেখানেই "অবয়বন্যূন" নিগ্রহস্থান হয়। সুতরাং যে বৌদ্ধসম্প্রদায় উদাহরণ এবং উপনয়, এই দুইটী মাত্র অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন এবং মীমাংসকসম্প্রদায় যে প্রতিজ্ঞাদিত্রয় অথবা উদাহরণাদিত্রয়কে অবয়ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ পক্ষ-স্থাপনে তাঁহাদিগের অস্বীকৃত কোন অবয়বের প্রয়োগ না করায় তাঁহাদিগের পক্ষে উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে না। বরদরাজ প্রভৃতিও এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার ঐরূপ কথা বলেন নাই। পরন্তু বার্ত্তিককার "প্রতিজ্ঞান্যূন"কেও নিগ্রহস্থান বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। পরন্তু ঐরূপ বলিলে যে স্থলে উদাহরণ-বাক্য ব্যতীতও ব্যাপ্তির বোধ হয়, বৌদ্ধসম্প্রদায় যে স্থলে ঐ ব্যাপ্তিকে বলিয়াছেন "অন্তর্ব্যাপ্তি," সেই স্থলে উদাহরণবাক্য না বলিলেও "ন্যূন" নামক নিগ্রহস্থান হইবে না, ইহাও বলা যায়। কিন্তু সে কথা কেহই বলেন নাই। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য এই সূত্রেও "অবয়ব" শব্দের দ্বারা কথার অংশমাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে বরদরাজও এই সূত্রে "অবয়ব" দ্বারা কথারম্ভ, বাদাংশ, বাদ এবং প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত "ন্যূন" নামক নিগ্রহস্থানকে চতুর্ব্বিধ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে "জল্প" নামক কথায় বাদী প্রথমে ব্যবহার-নিয়মাদি কথারম্ভ না করিয়াই প্রতিজ্ঞাদির প্রয়োগ করিলে, উহার নাম (১) কথারম্ভ-ন্যূন। হেতুর প্রয়োগ করিয়া উহার নির্দ্দোষত্ব প্রতিপন্ন না করিলে অথবা হেতুর প্রয়োগ না করিয়াই প্রথমেই বক্ষ্যমাণ সেই হেতুর নির্দ্দোষত্ব প্রতিপন্ন করিলে উহার নাম (২) বাদাংশন্যূন। এইরূপ প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ স্থাপনার খণ্ডন না করিয়া, নিজ পক্ষ স্থাপনা করিলে অথবা নিজ-পক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিলে উহার নাম (৩) বাদন্যূন।

প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মধ্যে যে কোন অবয়ব না বলিলে উহার নাম (৪) অবয়বন্যূন। পূর্ব্বোক্ত কোন স্থলেই "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান বলা যায় না। কারণ, কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণই "অপসিদ্ধান্ত" নহে। কিন্তু প্রথমে কোন শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, পরে উহার বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকারপূর্ব্বক সেই আরব্ধ কথার প্রসঙ্গই "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি "প্রতিজ্ঞান্যূন"কে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। দিঙ্‌নাগ বলিয়াছেন যে, বাদীর নিজ সিদ্ধান্ত-পরিগ্রহই প্রতিজ্ঞা, উহা কোন বাক্যরূপ অবয়ব নহে। সুতরাং "প্রতিজ্ঞান্যূন" বলিয়া কোন নিগ্রহস্থান হইতেই পারে না। দিঙ্‌নাগের মতানুসারে সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও তাঁহার "কাব্যালঙ্কার" গ্রন্থে ঐ কথাই বলিয়াছেন[১]। উদ্দ্যোতকর এখানে দিঙ্‌নাগের পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যে বাদী নির্দ্দোষ হেতুর প্রয়োগ করিলেও প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করেন নাই, তিনি নিগৃহীত হইবেন কি না? নিগৃহীত হইলে সেখানে তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান কি? যদি বল, তিনি সেখানে নিগৃহীত হইবেন না, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্যহীন হেতুবাক্য প্রভৃতিও অর্থসাধক হয়, ইহা স্বীকার করিয়া, সাধনের অভাবেও সাধ্যসিদ্ধি স্বীকার করিতে হয়। উদ্দ্যোতকর পরে ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য দিঙ্‌নাগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্ত-পরিগ্রহই প্রতিজ্ঞা, এই যে কথা বলিতেছ, তাহা কিন্তু আমরা বুঝি না। কারণ, যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা সিদ্ধার্থ, আর যাহা প্রতিজ্ঞা, তাহা সাধ্যার্থ। সুতরাং সিদ্ধান্তপরিগ্রহই প্রতিজ্ঞা, ইহা কখনই বলা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, বাদীর প্রথম বক্তব্য সাধ্যার্থ বাক্যবিশেষই প্রতিজ্ঞা। ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিবার জন্যই হেতু ও উদাহরণ-বাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ করা হয়। ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ ব্যতীত অন্যান্য বাক্য কখনই সাধ্যসাধক হইতে পারে না। সুতরাং ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যও সাধ্য-সাধনের অঙ্গ বলিয়া সাধনেরই অন্তর্গত। অতএব প্রতিজ্ঞাহীন অন্যান্য বাক্য কখনই সাধ্যসাধক না হওয়ায় "প্রতিজ্ঞান্যূন"ও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। যিনি নির্দ্দোষ হেতু প্রয়োগ করিয়াও এবং উদাহরণবাক্য প্রভৃতি বলিয়াও প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলেন নাই, তিনিও ঐ নিগ্রহস্থানের দ্বারা অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন॥ ১২ ॥

সূত্র। হেতূদাহরণাধিকমধিকং ॥১৩॥৫১৭॥

অনুবাদ। যে বাক্যে হেতু অথবা উদাহরণ অধিক অর্থাৎ একের অধিক বলা হয়, তাহা (১২) "অধিক" অর্থাৎ অধিক নামক নিগ্রহস্থান।

১। দূষণন্যূনতাহ্যুক্তির্ন্যূনং হেত্বাদিনাত্র চ।
তস্য লম্বাৎ কথায়াশ্চ ন্যূনং নেষ্টং প্রতিজ্ঞয়া॥ —"কাব্যালঙ্কার", পঞ্চম পঃ, ২৮।

ভাষ্য। একেন কৃতত্বাদন্যতরস্যানর্থক্যমিতি। তদেতন্নিয়মাভ্যুপগমে বেদিতব্যমিতি।

অনুবাদ। একের দ্বারাই কৃতত্ব (নিষ্পন্নত্ব) বশতঃ অন্যতরের অর্থাৎ দ্বিতীয় অপর হেতু বা উদাহরণ-বাক্যের আনর্থক্য। সেই ইহা অর্থাৎ এই "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান, নিয়ম স্বীকার স্থলে জানিবে।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা "অধিক" নামক দ্বাদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদী পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিতে একের অধিক হেতুবাক্য অথবা একের অধিক উদাহরণ-বাক্য বলিলে সেই পঞ্চাবয়ব বাক্য "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান হয়। উহা নিগ্রহস্থান হইবে কেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, একের দ্বারাই কর্ত্তব্য কৃত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হওয়ায় অপর হেতু বা উদাহরণ-বাক্য অনর্থক। অর্থাৎ যে কর্ম্মের ক্রিয়া পূর্ব্বেই নিষ্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে আবার অপর সাধন বলিলে, উহা সেখানে সাধনই না হওয়ায় উহা অনর্থক হয়। কিন্তু যে স্থলে পূর্ব্বে বাদী বা প্রতিবাদী একের অধিক হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্য বলিব না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করেন, সেই "নিয়মকথা"তেই এই নিগ্রহস্থান হইবে। অর্থাৎ ঐরূপ স্থলেই সেই বাদী বা প্রতিবাদী একের অধিক হেতু বা উদাহরণ-বাক্য বলিলে নিগৃহীত হইবেন। ভাষ্যকারও এখানে ঐ কথা বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ইহার যুক্তি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্থ, বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমার এই সাধ্য বিষয়ে কি কি সাধন আছে ? সেই স্থলে সমস্ত সাধনই বাদীর বক্তব্য। কারণ, ঐরূপ স্থলে বাদী অন্যান্য সাধন না বলিলে তাঁহার নিগ্রহ হয়। সুতরাং সর্ব্বত্রই একাধিক হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ দোষ নহে। পরন্তু কোন কোন স্থলে উহা কর্ত্তব্য। জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মকীর্ত্তিও "প্রপঞ্চকথায়ান্তু ন দোষঃ" এই বাক্যের দ্বারা ঐরূপই বলিয়াছেন। বাদী ও প্রতিবাদী নানা হেতু ও নানা উদাহরণাদির দ্বারা স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া যে বিচার করেন, তাহা "প্রপঞ্চকথা" ও "বিস্তরকথা" নামেও কথিত হইয়াছে। উহাতে হেতু ও উদাহরণাদির আধিক্য দোষ নহে। কেহ কেহ উহাতেও দ্বিতীয় হেতু ও উদাহরণাদি ব্যর্থ বলিয়া, উহা দোষ বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বত্রই বোধের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য হেতু বা উদাহরণ অধিক বলিলে উহা দোষ হইতে পারে না। সুতরাং "অধিক" নামক কোন নিগ্রহস্থান নাই। উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, হেতু-বাক্যদ্বয় অথবা উদাহরণবাক্যদ্বয়ই এক অর্থের জ্ঞাপক, ইহা স্বীকার করিলেও একের দ্বারাই যখন তাহা জ্ঞাপিত হয়, তখন অন্যের উল্লেখ ব্যর্থ। সুতরাং উহা অবশ্যই নিগ্রহস্থান। তাৎপর্য্য এই যে, যিনি অজিজ্ঞাসিত জ্ঞাত অর্থেরই পুনর্জ্ঞাপন করেন, তিনি অবশ্যই অপরাধী। তবে প্রতিবাদী বা মধ্যস্থগণের জিজ্ঞাসাস্থলে বাদী অপর হেতুবাক্য বা অপর উদাহরণবাক্য প্রয়োগ

করিলে সেখানে তজ্জন্য তাঁহার নিগ্রহ হইবে না। তাই ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম স্বীকার স্থলেই "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান জানিবে। জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, হেতু বা উদাহরণ অধিক বলিব না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়া, পরে ঐ স্বীকৃত নিয়মের পরিত্যাগ করিলে তৎপ্রযুক্তও বাদী বা প্রতিবাদী নিগ্রহার্হ হইবেন। বস্তুতঃ বাদী বা প্রতিবাদী পঞ্চাবয়ব ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিতে যদি সেই বাক্যের মধ্যেই একাধিক হেতু অথবা একাধিক উদাহরণবাক্য বলেন, তাহা হইলে ঐরূপ স্থলেই সেই বাক্য "অধিক" নামক নিগ্রহ-স্থান, ইহাই মহর্ষির এই সূত্র দ্বারা বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকরও ঐ ভাবেই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের সূক্ষ্ম বিচারানুসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ প্রভৃতি দূষণাদির আধিক্য স্থলেও "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য ও নিগমন-বাক্যের আধিক্যস্থলে পরবর্ত্তী সূত্রোক্ত পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থানই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্য বা নিগমনবাক্য একের অধিক বলিলে সেই অধিকবচন পুনরুক্ত-লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় সেখানে পুনরুক্তই নিগ্রহস্থান বলা যায়। কিন্তু হেতুবাক্য বা উদাহরণবাক্য অধিক বলিলে তাহা পুনরুক্তলক্ষণাক্রান্ত না হওয়ায় উহা "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার্য্য। যেমন "ধূমাৎ" বলিয়া আবার "আলোকাৎ" বলিলে অথবা "যথা মহানসং" বলিয়া আবার "যথা চত্বরং" বলিলে উহা শব্দপুনরুক্তও হয় না, অর্থপুনরুক্তও হয় না। সুতরাং উহা পুনরুক্ত হইতে ভিন্ন নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। কিন্তু "যথা মহানসং" বলিয়া, পরে "মহানসবৎ" এই বাক্য বলিলে উহা পুনরুক্তের লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় "পুনরুক্ত" বলিয়াই স্বীকার্য্য। এইরূপ উপনয়বাক্য অধিক বলিলেও "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। বরদরাজ উহাকেও "হেত্বধিক" বলিয়াই এই নিগ্রহস্থানমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে বরদরাজ এই "অধিক" নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যে বাক্য অন্বিত অর্থাৎ অপর বাক্যের সহিত সম্বদ্ধার্থ এবং প্রকৃতোপযোগী এবং অপুনরুক্ত, এমন কৃতকর্ত্তব্য বাক্যের উক্তিই "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান। যে বাক্যের কর্ত্তব্য বা ফলসিদ্ধি পূর্ব্বেই অন্য বাক্যের দ্বারা কৃত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই বাক্যকে "কৃতকর্ত্তব্য" ও "কৃতকার্য্যকর" বাক্য বলে। সপ্রয়োজন পুনরুক্তিকে অনুবাদ বলে। সুতরাং পূর্ব্ববাক্যের দ্বারা অনুবাদবাক্যের ফলসিদ্ধি না হওয়ায় উহা "কৃতকর্ত্তব্য" বাক্য নহে। কৃতকর্ত্তব্য বাক্যের প্রয়োগ করিলেও যদি ঐ বাক্য সম্বদ্ধার্থ না হয়, তাহা হইলে উহা পূর্ব্বোক্ত "অপার্থক" হয় এবং ঐ বাক্য প্রকৃতোপযোগী না হইলে উহা পূর্ব্বোক্ত "অর্থান্তর" হয় এবং অপুনরুক্ত না হইলে পূর্ব্বোক্ত "পুনরুক্ত" নামক নিগ্রহস্থান হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "অপার্থক" প্রভৃতির ব্যবচ্ছেদের জন্য পূর্ব্বোক্ত বিশেষণত্রয়ের উল্লেখ কর্ত্তব্য। বরদরাজ ঐরূপ "অনুবাদ" বাক্যের অধিক উক্তিও "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি হেতুতে ব্যর্থ বিশেষণের উক্তিকেও "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। যেমন "নীলধূমাৎ" এইরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলে সেখানে ধূমে নীলরূপ ব্যর্থ বিশেষণের উক্তি।

রঘুনাথ শিরোমণির মতে নীলধূমত্বরূপে নীল ধূমেও বহ্নির ব্যাপ্তি আছে। উহা ব্যপ্যত্বাসিদ্ধ নহে১ ॥১৩॥

স্বসিদ্ধান্তানুরূপপ্রয়োগাভাসনিগ্রহস্থানত্রিকপ্রকরণ সমাপ্ত ॥৩॥

সূত্র। শব্দার্থয়োঃ পুনর্ব্বচনং পুনরুক্তমন্যত্রানুবাদাৎ ॥ ॥১৪॥৫১৮॥

অনুবাদ। অনুবাদ হইতে ভিন্ন স্থলে শব্দ অথবা অর্থের পুনরুক্তি (১৩) "পুনরুক্ত" অর্থাৎ "পুনরুক্ত" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। অন্যত্রানুবাদাৎ—শব্দপুনরুক্তমর্থপুনরুক্তং বা। নিত্যঃ শব্দো নিত্যঃ শব্দ—ইতি শব্দপুনরুক্তং। অর্থপুনরুক্তং,—অনিত্যঃ শব্দো নিরোধধর্ম্মকো ধ্বনিরিতি। অনুবাদে ত্বপুনরুক্তং শব্দাভ্যাসাদর্থবিশেষোপপত্তেঃ। যথা—"হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমন"মিতি।

অনুবাদ। অনুবাদ হইতে ভিন্ন স্থলে শব্দপুনরুক্ত অথবা অর্থপুনরুক্ত হয়। যথা—"নিত্যঃ শব্দঃ, নিত্যঃ শব্দঃ" এইরূপ উক্তি শব্দপুনরুক্ত। "অনিত্যঃ শব্দঃ, নিরোধধর্ম্মকো ধ্বনিঃ" এইরূপ উক্তি অর্থপুনরুক্ত। কিন্তু অনুবাদ স্থলে পুনরুক্ত হয় না। কারণ, শব্দের অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শব্দের পুনরাবৃত্তিবশতঃ অর্থবিশেষের বোধ জন্মে। যেমন "হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনং" এই সূত্রের দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা "পুনরুক্ত" নামক ত্রয়োদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ ও বিভাগ সূচিত হইয়াছে। সপ্রয়োজন পুনরুক্তির নাম অনুবাদ, উহা পুনরুক্ত দোষ নহে। পুনরুক্ত হইতে অনুবাদের বিশেষ আছে। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে ভাষ্যকারও এখানে পরে বলিয়াছেন যে, অনুবাদ স্থলে শব্দের পুনরাবৃত্তিরূপ অভ্যাসপ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ তজ্জন্যই পূর্ব্বোক্ত শব্দের পুনরুক্তি করা হয়। সুতরাং উহা সপ্রয়োজন পুনরুক্তি বলিয়া দোষ নহে, উহার নাম অনুবাদ। ভাষ্যকার পরে মহর্ষি গোতমের প্রথমাধ্যায়োক্ত "হেত্বপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রটী উদ্ধৃত করিয়া নিগমনবাক্যকেই ইহার উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে নিগমনবাক্যে

১। "নীলধূমত্বাদের্ব্বারণীয়ত্বে তু"। রঘুনাথ শিরোমণিকৃত বিশেষব্যাপ্তিদীধিতি। "বারণীয়ত্বে ত্বি"তি। বস্তুতঃ স্বমতে নীলধূমত্বমপি ব্যাপ্তিরেব। তাদ্রূপেণ হেতুপ্রয়োগে তু "অধিকে"নৈব নিগ্রহস্থানেন পুরুষো নিগৃহ্যত ইতি ভাবঃ।—জগদীশী টীকা।

পূর্ব্বোক্ত হেতুবাক্যেরই পুনরুক্তি হইয়া থাকে (প্রথম খণ্ড, ২৮৩—৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু উহা সপ্রয়োজন বলিয়া অনুবাদ। সুতরাং উহা পুনরুক্তদোষ বা পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থান নহে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজন পুনরুক্তিই দোষ এবং উহাই নিগ্রহস্থান। এই পুনরুক্তি দ্বিবিধ, সুতরাং পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থানও দ্বিবিধ। যথা—শব্দপুনরুক্ত ও অর্থপুনরুক্ত। একার্থক একাকার শব্দের পুনরাবৃত্তি হইলে তাহাকে বলে শব্দপুনরুক্ত। যেমন কোন বাদী "নিত্যঃ শব্দঃ" বলিয়া প্রমাদবশতঃ আবারও "নিত্যঃ শব্দঃ" এই বাক্য বলিলে—উহা হইবে "শব্দপুনরুক্ত"। এবং "অনিত্যঃ শব্দঃ" বলিয়া, পরে উহার সমানার্থক বাক্য বলিলেন, "নিরোধধর্ম্মকো ধ্বনিঃ।" ধ্বনিরূপ শব্দ নিরোধ অর্থাৎ বিনাশরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট, এই অর্থ পূর্ব্বেই "অনিত্যঃ শব্দঃ" এই বাক্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। শেষোক্ত বাক্যের দ্বারা সেই অর্থেরই পুনরুক্তি হইয়াছে, সুতরাং উহা অর্থপুনরুক্ত। এইরূপ "ঘটো ঘটঃ" এইরূপ বলিলে শব্দপুনরুক্ত হয় এবং "ঘটঃ কলসঃ" এইরূপ বলিলে অর্থপুনরুক্ত হয়। জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, যদিও শব্দপুনরুক্ত স্থলেও অর্থের পুনরুক্তি অবশ্যই হয়, তথাপি অর্থের প্রত্যভিজ্ঞা শব্দপূর্ব্বক। অর্থাৎ শব্দের পুনরুক্তি হইলে প্রথমে সেই শব্দেরই প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় উহা শব্দপুনরুক্তি বলিয়াই কথিত হইয়াছে। আর ঐ শব্দপুনরুক্তির ব্যবহার জাত্যপেক্ষ। অর্থাৎ পূর্ব্বোচ্চারিত সেই শব্দেরই পুনরুচ্চারণ হয় না, তাহা হইতে পারে না, কিন্তু তজ্জাতীয় শব্দেরই পুনরুক্তি হয়, তাই উহা শব্দপুনরুক্ত নামে কথিত হইয়াছে ॥১৪॥

সূত্র। অর্থাদাপন্নস্য স্বশব্দেন পুনর্ব্বচনং ॥১৫॥৫১৭॥

অনুবাদ। অর্থতঃ আপন্ন পদার্থের অর্থাৎ কোন বাক্যের অর্থতঃই যাহা বুঝা যায়, তাহার স্ব শব্দের দ্বারা অর্থাৎ বাচক শব্দের দ্বারা পুনর্ব্বচনও (১৩) পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। "পুনরুক্ত"মিতি প্রকৃতং। নিদর্শনং—"উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বাদনিত্য"মিত্যুক্ত্বা অর্থাদাপন্নস্য যোঽভিধায়কঃ শব্দস্তেন স্বশব্দেন ব্রূয়াদনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যমিতি, তচ্চ পুনরুক্তং বেদিতব্যং। অর্থসম্প্রত্যয়ার্থে শব্দপ্রয়োগে প্রতীতঃ সোঽর্থোঽর্থাপত্ত্যেতি।

অনুবাদ। "পুনরুক্ত" এই পদটি প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণলব্ধ। নিদর্শন অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত পুনরুক্তের উদাহরণ যথা—"উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যং" এই বাক্য বলিয়া অর্থতঃ আপন্ন পদার্থের অর্থাৎ ঐ বাক্যের অর্থতঃই যাহা বুঝা যায়, তাহার বাচক যে শব্দ, সেই "স্বশব্দে"র দ্বারা (বাদী) যদি বলেন, "অনুৎপত্তি-

ধর্ম্মকং নিত্যং", তাহাও পুনরুক্ত জানিবে, (কারণ) অর্থবোধার্থ শব্দপ্রয়োগে সেই অর্থ অর্থাপত্তির দ্বারাই প্রতীত হইয়াছে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা দ্বিবিধ পুনরুক্ত বলিয়া, পরে আবার এই সূত্রদ্বারা তৃতীয় প্রকার পুনরুক্ত বলিয়াছেন। বাদী কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে উহার অর্থতঃই যাহা বুঝা যায় অর্থাৎ অর্থাপত্তির দ্বারাই যে অনুক্ত অর্থের বোধ হয়, যাহা তাহার বাচক শব্দরূপ স্বশব্দের দ্বারা আর বলা অনাবশ্যক, সেই অর্থের স্বশব্দের দ্বারা যে পুনরুক্তি, তাহাই তৃতীয় প্রকার পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থান। পুনরুক্ত প্রকরণবশতঃ পূর্ব্বসূত্র হইতে এই সূত্রে "পুনরুক্তং" এই পদটির অনুবৃত্তি মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়। তাই ঐ তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার প্রথমেই বলিয়াছেন,—"পুনরুক্ত-মিতি প্রকৃতং"। ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ দ্বারা সূত্রার্থ বর্ণনও করিয়াছেন। যেমন কোন বাদী "উৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যং" এই বাক্য বলিয়া, আবার যদি বলেন,—"অনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যং", তাহা হইলে উহাও "পুনরুক্ত" হইবে। কারণ, উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তুমাত্রই অনিত্য, এই বাক্য বলিলে উহার অর্থতঃই বুঝা যায় যে, অনুৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু নিত্য। কারণ, অনুৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু নিত্য না হইলে উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তুমাত্র অনিত্য, ইহা উপপন্নই হয় না। সুতরাং অর্থাপত্তির দ্বারাই বাদীর অনুক্ত ঐ অর্থ প্রতীত হওয়ায় আবার স্বশব্দের দ্বারা অর্থাৎ উহার অভিধায়ক "অনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যং" এই বাক্যের দ্বারা ঐ অর্থের পুনরুক্তি ব্যর্থ। সুতরাং উহাও নিগ্রহ-স্থান। ভাষ্যকার পরে এই যুক্তি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, অর্থ-বোধার্থই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং অর্থের বোধ হইয়া গেলে আর শব্দ প্রয়োগ অনাবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদীর শেষোক্ত বাক্যার্থ—অর্থাপত্তির দ্বারাই প্রতীত হইয়াছে। মহর্ষি গোতম অর্থাপত্তিকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিলেও প্রকৃত অর্থাপত্তিকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে উহা অনুমানের অন্তর্গত। এই অর্থাপত্তি "আক্ষেপ" নামেও কথিত হইয়াছে। তাই বরদরাজ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, এই পুনরুক্ত ত্রিবিধ—(১) শব্দপুনরুক্ত, (২) অর্থপুনরুক্ত ও (৩) আক্ষেপপুনরুক্ত। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, পুনরুক্ত নামক একই নিগ্রহস্থান কথঞ্চিৎ অবান্তরভেদবিবক্ষাবশতঃ ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, অর্থপুনরুক্ত হইতে ভিন্ন শব্দপুনরুক্ত উপপন্ন হয় না। কারণ, দ্ব্যর্থ শব্দ স্থলে শব্দের পুনরুক্তি হইলেও অর্থের ভেদ থাকায় শব্দপুনরুক্ত দোষ হয় না। জয়ন্ত ভট্ট উক্ত মত স্বীকার করিয়াই সমাধান করিয়াছেন যে, যে বাদী নিজের অধিক শক্তি খ্যাপনের ইচ্ছায় অর্থভেদ থাকিলেও আমি নিজের উক্ত কোন শব্দেরই পুনঃ প্রয়োগ করিব না, সমস্ত শব্দেরই একবার মাত্র প্রয়োগ করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ প্রথমে উক্তরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়া জল্পবিচারের আরম্ভ করেন, তিনি কোন শব্দের পুনঃ প্রয়োগ করিলে সেখানে "শব্দপুনরুক্তে"র দ্বারাও নিগৃহীত হইবেন, ইহা সূচনা করিবার জন্যই মহর্ষি অর্থপুনরুক্ত হইতে শব্দপুনরুক্তের পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়মকথাতেই সর্ব্বপ্রকার পুনরুক্ত নিগ্রহস্থান হইবে,

অন্যত্র উহা নিগ্রহস্থান হইবে না। বরদরাজ ইহা জয়ন্ত ভট্টের ন্যায় বিশ্বরূপের মত বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিশ্বরূপের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ভাসর্ব্বজ্ঞের "ন্যায়সারে"র টীকাকার জয়সিংহ সূরিও উক্তরূপ সিদ্ধান্তই স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র এখানে ঐরূপ কোন কথাই বলেন নাই। পরন্তু উদ্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, কোন সম্প্রদায় পুনরুক্তকে নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার করেন না। কারণ, কোন বাদী পুনরুক্তি করিলেও তদ্দ্বারা তাঁহার প্রকৃত বিষয়ের কোন বাধ বা হানি হয় না। পরন্তু পুনরুক্তির দ্বারা অপরে সেই বাক্যার্থ সম্যক্ বুঝিতে পারে। সুতরাং অপরকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই যে বাক্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য, তাহাতে সর্ব্বত্র পুনরুক্তির সার্থকতাও আছে। অতএব পুনরুক্ত কখনই নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যে অর্থ পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহারই পুনঃ প্রতিপাদনের জন্য পুনরুক্তি ব্যর্থ। সুতরাং বৈয়র্থ্যবশতঃই পুনরুক্তকে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্দ্যোতকরের এই "বৈয়র্থ্য"শব্দের পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ প্রয়োজনবত্ত্বরূপ অর্থও গ্রহণ করিয়া তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বাদী পুনরুক্তি করিলে সেখানে প্রতিবাদী উহার প্রয়োজন চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, প্রথমোক্ত বাক্য হইতে আপাততঃ প্রতীত অর্থও অপ্রতীত অর্থের ন্যায় মনে করিয়া, কিছু নিশ্চয় করিতে পারেন না। সুতরাং বাদী তাঁহাকে পুনর্ব্বার বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াও তখন তাঁহার পক্ষে প্রতিপাদক হন না। অর্থাৎ তখন তিনি সেই প্রতিবাদীকে তাঁহার সাধনের বিষয় সাধ্য পদার্থ নিঃসংশয়ে বুঝাইতে পারেন না। অতএব তাঁহার সেই পুনরুক্তির বিরুদ্ধ প্রয়োজনবত্ত্বরূপ বৈয়র্থ্য হয়। কারণ, বাদী তাঁহার সাধ্য বিষয়ের নিশ্চয়কে যে পুনরুক্তির প্রয়োজন মনে করিয়া পুনরুক্তি করেন, তদ্দ্বারা প্রতিবাদীর সংশয়ই উৎপন্ন হইলে উহার প্রয়োজন বিরুদ্ধ হয়। অতএব পুনরুক্ত অবশ্যই নিগ্রহস্থান। মূলকথা, উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহাদিগের মতে "পুনরুক্ত" সর্ব্বত্রই নিগ্রহস্থান। তবে কেবল তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যে "বাদ"বিচার হয়, তাহাতে "পুনরুক্ত" নিগ্রহস্থান হইবে না। কিন্তু জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামক কথাতেই পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে "পুনরুক্ত" নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা মনে রাখিতে হইবে ॥১৫॥

পুনরুক্তনিগ্রহস্থানপ্রকরণ সমাপ্ত ॥৪॥

সূত্র। বিজ্ঞাতস্য পরিষদা ত্রিরভিহিতস্যাপ্যপ্রত্যুচ্চারণমননুভাষণং ॥১৬॥৫২০॥

অনুবাদ। (বাদী কর্ত্তৃক) তিনবার কথিত হইলেও সভ্য বা মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিজ্ঞাত বাক্যার্থের অপ্রত্যুচ্চারণ (১৪) "অননুভাষণ" অর্থাৎ "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। "বিজ্ঞাতস্য" বাক্যার্থস্য "পরিষদা", বাদিনা "ত্রিরভিহিতস্য" য"দপ্রত্যুচ্চারণং", তদনমুভাষণং নাম নিগ্রহস্থানমিতি। অপ্রত্যুচ্চারয়ন্ কিমাশ্রয়ং পরপক্ষপ্রতিষেধং ক্রয়াৎ।

অনুবাদ। বাদী কর্ত্তৃক তিনবার কথিত, মধ্যস্থ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাত বাক্যার্থের যে অপ্রত্যুচ্চারণ, তাহা (১৪) "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান। (কারণ) প্রত্যুচ্চারণ না করিয়া (প্রতিবাদী) কোন্ আশ্রয়বিশিষ্ট পরপক্ষ প্রতিষেধ বলিবেন ? অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর সেই বাক্যার্থের অনুবাদ না করিলে তাহার উত্তরের আশ্রয়াভাবে তিনি উত্তরই বলিতে পারেন না, সুতরাং বাদীর ঐরূপ বাক্যার্থের অনুবাদ না করা তাঁহার পক্ষে অবশ্যই নিগ্রহস্থান।

টিপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা "অননুভাষণ" নামক চতুর্দ্দশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। জিগীষু বাদী প্রথমে তাঁহার নিজপক্ষ স্থাপনাদি সমাপ্ত করিলে, জিগীষু প্রতিবাদী প্রথমে তাঁহার দূষণীয় সেই বাক্যার্থের অনুবাদ করিয়া তাহার খণ্ডন করিবেন। প্রতিবাদীর সেই অনুবাদের নাম প্রত্যুচ্চারণ এবং উহা না করার নাম অপ্রত্যুচ্চারণ। সেই অপ্রত্যুচ্চারণই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর পক্ষে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান। অনুভাষণের অর্থাৎ অনুবাদের অভাব অথবা অনুবাদের বিরোধী কোন ব্যাপারই অননুভাষণ। বাদী তিনবার বলিলেও যদি প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণ কেহই তাঁহার বাক্যার্থ না বুঝেন, তাহা হইলে সেখানে বাদীর পক্ষেই "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহা পুর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান-স্থলে মধ্যস্থগণ কর্ত্তৃক বাদীর বাক্যার্থ বিজ্ঞাত হওয়ায় ইহা "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিগ্রহস্থান হইতে ভিন্ন। তাই মহর্ষি এই সূত্রে বলিয়াছেন, "বিজ্ঞাতস্য পরিষদা"। প্রতিবাদী বাদীর প্রথম বচনের দ্বারা তাঁহার বাক্যার্থ না বুঝিলে, বাদী তিনবার পর্য্যন্ত বলিবেন, ইহাই জয়ন্ত ভট্ট পূর্ব্বে সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে মতভেদও পূর্ব্বে বলিয়াছি। বরদরাজ এখানে বলিয়াছেন যে, তিন বারের ন্যূন বা অধিক বার বচনের নিষেধের জন্য মহর্ষি এখানে "ত্রিঃ" এই পদটী বলেন নাই। কিন্তু যে কয়েকবার বলিলে উহা প্রতিবাদীর উচ্চারণ বা অনুবাদের যোগ্য হয়, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। সূত্রে "বাদিনা" এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। বরদরাজ এখানে ইহাও বলিয়াছেন যে, কদাচিৎ মন্দবুদ্ধি প্রতিবাদীকে বুঝাইবার জন্য মধ্যস্থগণও বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করেন, ইহা সূচনা করিবার জন্য মহর্ষি সূত্রে "বাদিনা" এই পদের উল্লেখ করেন নাই। উক্তরূপ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ না বুঝিলে "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং কোন কার্য্যব্যাসঙ্গ উদ্‌ভাবন করিয়া কথার ভঙ্গ করিলে "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। এ জন্য উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞান প্রকাশ করেন না এবং কথাভঙ্গ করেন না, তাদৃশ প্রতিবাদী কর্ত্তৃক উচ্চারণযোগ্য পূর্ব্বোক্তরূপ বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ না করাই "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান। বরদরাজও উক্ত মতানুসারেই এইরূপ লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৌদ্ধসম্প্রদায় এই "অননুভাষণ"কেও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের কথা এই যে, প্রতিবাদীর উত্তরের গুণ দোষ দ্বারাই তাঁহার অমূঢ়ত্ব ও মূঢ়ত্ব নির্ণয় করা যায়। প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ না করিলেই যে, তিনি সদুত্তর জানেন না, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, পুরুষের শক্তি বিচিত্র। কেহ বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করিতে সমর্থ না হইলেও সদুত্তর বলিতে সমর্থ, ইহা দেখা যায়। ঐরূপ স্থলে তিনি সদুত্তর বলিলে কখনই নিগৃহীত হইতে পারেন না। পরন্তু বাদীর হেতুমাত্রের অনুবাদ করিয়াও প্রতিবাদী তাঁহার খণ্ডন করিতে পারেন। বাদীর সমস্ত বাক্যার্থেরই অনুবাদ করা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক। সুতরাং গৌতমোক্ত "অননুভাষণ" নিগ্রহস্থান হইতেই পারে না। তবে যে প্রতিবাদী, বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, সম্পূর্ণরূপে অনুবাদ করিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে সদুত্তর বলিলেন, তাঁহার "খলীকার" মাত্র হইবে। বিবক্ষিত অর্থের অপ্রতিপাদকত্ব অর্থাৎ বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়াও এবং বুঝাইবার জন্য কিছু বলিয়াও বুঝাইতে না পারাকে "খলীকার" বলে। উদ্দ্যোতকরও এখানে "খলীকার" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন "বাদ"বিচারে কাহারও পরাজয়রূপ নিগ্রহ নাই, কিন্তু খলীকার মাত্রই নিগ্রহ, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্তরূপ স্থলেও প্রতিবাদীর খলীকার মাত্রই হইবে। কিন্তু তিনি পরে সদুত্তর বলায় তাঁহার পরাজয়রূপ নিগ্রহ হইবে না। সুতরাং প্রতিবাদীর অননুভাষণ কোন স্থলেই তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান বলা যায় না। উদ্দ্যোতকর এই বৌদ্ধমতের উল্লেখপূর্ব্বক ইহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ না করিলে তাঁহার উত্তরের বিষয়-পরিজ্ঞানের অভাবে উত্তরই হইতে পারে না। পরপক্ষপ্রতিষেধ-রূপ যে উত্তর, তাহার বিষয়রূপ আশ্রয় না বুঝিলে উত্তর বলাই যায় না। নির্ব্বিষয় নিরাশ্রয় কোন উত্তর হইতে পারে না। যদি বল, প্রতিবাদী সেই উত্তরের বিষয় বুঝিয়াই উত্তর বলেন। কিন্তু তাহা হইলে তিনি তাহা উচ্চারণ করিবেন না কেন? তিনি উত্তরের বিষয়কে আশ্রয় করিয়া উত্তর বলেন, কিন্তু সেই বিষয়ের উচ্চারণ করেন না, ইহা ব্যাহত, অসম্ভব। কারণ, যাহা দূষণীয়, তাহাই দূষণের বিষয়। সুতরাং সেই দূষণীয় বিষয়টী না বলিলে তাহার দূষণ বলাই যায় না। যদি বল, বাদীর সমস্ত বাক্য বা বাক্যার্থই প্রতিবাদীর দূষণীয় নহে। কারণ, বাদীর যে কোন অবয়বের দূষণের দ্বারাই যখন তাঁহার সাধন বা হেতু দূষিত হইয়া যায়, তখন তাহার অন্য দোষ বলা অনাবশ্যক। অতএব প্রতিবাদীর যাহা দূষণীয় বিষয়, তিনি কেবল তাহারই অনুবাদ করিবেন। নচেৎ তাঁহার অদূষ্য বিষয়েরও অনুবাদ করিলে, সেখানে তাহার বিপরীতভাবে অনুভাষণও অপর নিগ্রহস্থান হইয়া পড়ে। উদ্দ্যোতকর এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই পরে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে বাদীর সমস্ত বাক্যের উচ্চারণ কর্ত্তব্য, পরে উত্তর বক্তব্য, ইহা প্রতিজ্ঞা করা হয় নাই। কিন্তু প্রতিবাদীর যে কোনরূপে উত্তর যে অবশ্য বক্তব্য, ইহা ত সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই উত্তরের যাহা আশ্রয় বা বিষয় অর্থাৎ প্রতিবাদীর যাহা দূষণীয়, তাহার অনুবাদ না করিলে আশ্রয়ের অভাবে তিনি উত্তরই বলিতে পারেন না। অতএব সেই উত্তর বলিবার জন্য বাদীর কথিত সেই বিষয়ের অনুবাদ তাঁহার করিতেই হইবে। কিন্তু তিনি যদি তাহারও অনুবাদ না করেন, তাহা হইলে

তাঁহার উত্তর বলাই সম্ভব না হওয়ায় সেইরূপ স্থলে তাঁহার "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান অবশ্য স্বীকার্য্য। ফল কথা, প্রতিবাদীর দূষণীয় বিষয়মাত্রের অনুবাদ না করাই "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান, সমস্ত বাক্যার্থের অনুবাদ না করা ঐ নিগ্রহস্থান নহে, ইহাই উদ্দ্যোতকরের শেষ কথার তাৎপর্য্য। বাচস্পতি মিশ্রও শেষে ঐ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও ইহাই বলিয়াছেন। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য এই "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থানকে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—প্রতিবাদী (১) "যৎ", "তৎ" ইত্যাদি সর্ব্বনাম শব্দের দ্বারাই তাঁহার দূষণীয় বিষয়ের অনুবাদ করিলে অথবা (২) সেই দূষণীয় বিষয়ের আংশিক অনুবাদ করিলে, (৩) অথবা বিপরীত ভাবে অনুবাদ করিলে অথবা (৪) কেবল দূষণমাত্র বলিলে অথবা (৫) বুঝিয়াও সভাক্ষোভাদিবশতঃ স্তম্ভিত হইয়া কিছুই বলিতে না পারিলে "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। অন্যান্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে ॥১৬॥

সূত্র। অবিজ্ঞাতঞ্চাজ্ঞানং ॥১৭॥৫২১॥

অনুবাদ। এবং অবিজ্ঞান অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে পূর্ব্বসূত্রোক্ত বাদিবাক্যার্থের বিজ্ঞানের অভাব (১৫) "অজ্ঞান" অর্থাৎ "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। বিজ্ঞাতস্য পরিষদা বাদিনা ত্রিরভিহিতস্য যদবিজ্ঞাতং, তদজ্ঞানং নাম নিগ্রহস্থানমিতি। অয়ং খল্ববিজ্ঞায় কস্য প্রতিষেধং ব্রূয়াদিতি।

অনুবাদ। বাদী কর্ত্তৃক তিনবার কথিত, মধ্যস্থ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাত বাদিবাক্যার্থের যে "অবিজ্ঞাত" অর্থাৎ উক্তরূপ বাদিবাক্যার্থ বিষয়ে প্রতিবাদীর যে বিজ্ঞানের অভাব, তাহা "অজ্ঞান" অর্থাৎ অজ্ঞান নামক নিগ্রহস্থান। কারণ, ইনি অর্থাৎ প্রতিবাদী বিশেষরূপে না বুঝিয়া কাহার প্রতিষেধ (উত্তর) বলিবেন?

টিপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা "অজ্ঞান" নামক পঞ্চদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। সূত্রে ভাববাচ্য "ক্ত" প্রত্যয়নিষ্পন্ন "বিজ্ঞাত" শব্দের দ্বারা বিজ্ঞানরূপ অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত। তাহা হইলে "অবিজ্ঞাত" শব্দের দ্বারা বুঝা যায় বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানের অভাব। উহাই "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান। কোন্ বিষয়ে কাহার বিশিষ্ট জ্ঞানের অভাব, ইহা বলা আবশ্যক। তাই মহর্ষি এই সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিষয়ের সহিতই ইহার সম্বন্ধ সূচনা করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদী কর্ত্তৃক তিনবার কথিত এবং পরিষৎ অর্থাৎ মধ্যস্থ সভ্য কর্ত্তৃক বিজ্ঞাত যে বাদীর বাক্যার্থ, তদ্বিষয়ে প্রতিবাদীর যে বিজ্ঞানের অভাব, তাহা "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান। পূর্ব্বসূত্রানুসারে এখানে "বিজ্ঞাতস্য পরিষদা বাদিনা ত্রিরভিহিতস্য" এইরূপ ভাষ্যপাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়। প্রতিবাদীর পক্ষে ইহা নিগ্রহস্থান কেন হইবে? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে

বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী বিশেষরূপে বাদীর বাক্যার্থ না বুঝিলে তিনি উহার প্রতিষেধ করিতে পারেন না। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে তিনি নিরুত্তর হইয়া অবশ্য নিগৃহীত হইবেন। বাদীর কথিত বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞানই জন্মে না, ইহা বলা যায় না। কিন্তু যেখানে বাদীর বাক্যার্থের অন্তর্গত কোন পদার্থ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান জন্মিলেও সম্পূর্ণরূপে সেই বাক্যার্থের বোধ না হওয়ায় তিনি বাদীর পক্ষ বুঝিতে পারেন না এবং তজ্জন্য উহার প্রতিষেধ করা সম্ভবই হয় না, সেই স্থলেই তাঁহার "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান হয়। তাই মহর্ষিও সূত্রে "অজ্ঞাতং" না বলিয়া "অবিজ্ঞাতং" বলিয়াছেন। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়া "কি বলিতেছ, বুঝাই যায় না" ইত্যাদি কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা তাঁহার ঐ "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান স্থলে প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞানপ্রকাশক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন না। সুতরাং তিনি সেখানে বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়াও তাঁহার দূষণীয় পদার্থের অনুবাদ করেন না, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং তাহা এই "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান হইতে ভিন্ন। আর যদি ঐরূপ স্থলেও তিনি নিজের অজ্ঞান-প্রকাশক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, অথবা অন্য কোন হেতুর দ্বারা তাঁহার বাদীর বাক্যার্থবিষয়ে অজ্ঞান বুঝা যায়, তাহা হইলে সেখানে "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থানই হইবে। উদ্দ্যোতকর ইহাকে অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট ইহাকে স্বরূপতঃই অপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত "অপ্রতিপত্তি" শব্দের ব্যাখ্যাভেদ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ॥১৭॥

সূত্র। উত্তরস্যাপ্রতিপত্তিরপ্রতিভা ॥১৮॥৫২২॥

অনুবাদ। উত্তরের অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রতিবাদীর উত্তরকালে উত্তরের অস্ফূর্ত্তি বা অজ্ঞান (১৬) "অপ্রতিভা" অর্থাৎ "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। পরপক্ষ-প্রতিষেধ উত্তরং, তদযদা ন প্রতিপদ্যতে তদা নিগৃ-হীতো ভবতি।

অনুবাদ। পরপক্ষের প্রতিষেধ অর্থাৎ বাদীর পক্ষের খণ্ডন উত্তর। যদি (প্রতিবাদী) তাহা না বুঝেন, অর্থাৎ উত্তরকালে তাহার স্ফূর্ত্তি বা বোধ না হয়, তাহা হইলে নিগৃহীত হন।

টিপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা "অপ্রতিভা" নামক ষোড়শ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। উত্তরকালে উত্তরের স্ফূর্ত্তি না হওয়াই "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ যে স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝিলেন এবং তাহার অনুবাদও করিলেন, কিন্তু উত্তরকালে তাঁহার উত্তরের স্ফূর্ত্তি হইল না, তাই তিনি উত্তর বলিতে পারিলেন না, সেই স্থলে তাঁহার পক্ষে "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "অজ্ঞান" ও "অননুভাষণ" হইতে এই "অপ্রতিভা" ভিন্ন প্রকার নিগ্রহস্থান। বৌদ্ধসম্প্রদায় ইহাও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে "অজ্ঞান" ও

"অপ্রতিভা"র কোন ভেদ নাই এবং পূর্ব্বোক্ত "অননুভাষণ"ও অপ্রতিভাবিশেষই। কারণ, "অননুভাষণ" স্থলেও প্রতিবাদী বস্তুতঃ অপ্রতিভার দ্বারাই নিগৃহীত হন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ঐ কথারও উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, পুরুষের শক্তি বিচিত্র। কোন পুরুষ তাঁহার দুষ্য ও দূষণ বুঝিয়াও তাহার অনুভাষণ করিতে পারেন না। কারণ, বহু বাক্‌প্রয়োগে তাঁহার শক্তি নাই। সুতরাং সেখানে অপ্রতিভা না থাকিলেও যখন অননুভাষণ সম্ভব হয়, তখন "অননুভাষণ"কে অপ্রতিভাবিশেষই বলা যায় না, উহা পৃথক্ নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার্য্য। এইরূপ কোন পুরুষ তাঁহার দুষ্য বিষয় বুঝিলেন এবং তাহার অনুভাষণও করিলেন, কিন্তু তাঁহার দূষণের স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় তিনি উহা খণ্ডন করিতে পারিলেন না, ইহাও দেখা যায়। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে তিনি "অপ্রতিভা"র দ্বারাই নিগৃহীত হওয়ায় উহাই নিগ্রহস্থান হইবে। আর কোন স্থলে কোন পুরুষ মন্দবুদ্ধিবশতঃ তাঁহার দুষ্য অর্থাৎ খণ্ডনীয় বাদীর বাক্যার্থ বা হেতু বুঝিতেই পারেন না, ইহাও দেখা যায়। ঐরূপ স্থলে তিনি তদ্বিষয়ে "অজ্ঞান" দ্বারাই নিগৃহীত হওয়ায় "অজ্ঞান"ই নিগ্রহস্থান হইবে। ঐরূপ স্থলে তিনি অজ্ঞানবশতঃ বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করিতে না পারিলেও বাদীর উচ্চারিত বাক্যমাত্রের উচ্চারণ করিতেও পারেন। সুতরাং সেখানে সর্ব্বথা অননুভাষণ বলাও যায় না। তবে অজ্ঞান স্থলে অপ্রতিভাও অবশ্য থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ অজ্ঞান ও অপ্রতিভার স্বরূপভেদ আছে। জয়ন্ত ভট্ট ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহা উত্তরের বিষয় অর্থাৎ বাদীর বাক্যার্থরূপ দুষ্য পদার্থ, তাহার অজ্ঞানই "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান এবং সেই দুষ্য বিষয় বুঝিয়াও তাহার অনুবাদ না করা "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান এবং তাহার অনুবাদ করিয়াও উত্তরের অজ্ঞান বা অস্ফূর্ত্তিই "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহ-স্থান। ফলকথা, উত্তরের বিষয়-বিষয়ে অজ্ঞান এবং উত্তর-বিষয়ে অজ্ঞান; এইরূপে যথাক্রমে বিষয়ভেদে "অজ্ঞান" ও "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থানের স্বরূপভেদ স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহার অসংকীর্ণ উদাহরণস্থলও আছে। কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত "অজ্ঞান", "অপ্রতিভা" ও "অননুভাষণের" সাঙ্কর্য্য হইলে বাদী যাহা নিশ্চয় করিতে পারেন, তাহারই উদ্ভাবন করিবেন।

প্রতিবাদীর অপ্রতিভা কিরূপে নিশ্চয় করা যায়? ইহা বুঝাইতে উদ্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী শ্লোক পাঠাদির দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় তাঁহার উত্তরের বোধ হয় নাই, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়া এবং তাহার অনুবাদ করিয়া উত্তর করিবার সময়ে নিজের অহঙ্কার ও বাদীর প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশক কোন শ্লোক পাঠ করেন অথবা ঐ ভাবে অন্য কাহারও বার্ত্তার অবতারণা প্রভৃতি করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার যে উত্তরের স্ফূর্ত্তি হয় নাই, ইহা বুঝা যায়। কারণ, উত্তরের স্ফূর্ত্তি হইলে তিনি কখনই উত্তর না বলিয়া শ্লোক পাঠাদি করেন না। ভূষণ প্রভৃতি কেহ কেহ বলিয়া-ছিলেন যে, অপ্রতিভাবশতঃ প্রতিবাদী শ্লোক পাঠ বা অন্য কোন কথা বলিলে সেখানে ত "অর্থান্তর" বা "অপার্থক" প্রভৃতি কোন নিগ্রহস্থানই হইবে। সুতরাং "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহ-স্থান স্থলে প্রতিবাদীর তূষ্ণীম্ভাবই নিগ্রহের হেতু। কিন্তু উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে

বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান স্থলে প্রতিবাদী বাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্যই শ্লোক পাঠাদি করেন। "অর্থান্তর" প্রভৃতি স্থলে বাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন হয় না, তাহা উদ্দেশ্যও থাকে না। সুতরাং "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান, উহা হইতে ভিন্ন প্রকার। অপ্রতিভাবশতঃ তূষ্ণীভাব হইলে সেখানে বাচস্পতি মিশ্র পরবর্ত্তী সূত্রোক্ত "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থানই বলিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। "অপ্রতিভা" স্থলে প্রতিবাদী একেবারে নীরব হইয়া কিরূপে সভামধ্যে বসিয়া থাকিবেন? এতদুত্তরে জয়ন্ত ভট্টও তূষ্ণীম্ভাব অস্বীকার করিয়া শ্লোক পাঠাদির কথাই বলিয়াছেন এবং তিনি প্রতিবাদীর আত্মাহঙ্কার ও বাদীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশক দুইটী শ্লোকও উদাহরণরূপে রচনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের "ন্যায়মঞ্জরী" সর্ব্বত্র তাঁহার একাধারে মহাকবিত্ব ও মহানৈয়ায়িকত্বের ঘোষণা করিতেছে।

কিন্তু বরদরাজ "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান স্থলে প্রতিবাদীর তূষ্ণীম্ভাবও গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, তূষ্ণীম্ভাবের ন্যায় ভোজরাজের বার্ত্তার অবতারণা, শ্লোকাদি পাঠ, নিজ কেশাদি রচনা, গগনসূচন ও ভূতলবিলেখন প্রভৃতি যে কোন অন্য কার্য্য করিলেও উক্ত স্থলে প্রতিবাদী নিগৃহীত হইবেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে "খসূচনের" উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তরের স্ফূর্ত্তি না হইলে তখন ঊর্দ্ধ আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া অবস্থান বা আকাশের কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি কিছু বলাই গগনসূচন বা "খসূচন" বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং যিনি ঐ "খসূচন" করেন, তিনি নিন্দাসূচক "খসূচি" নামেও কথিত হইয়াছেন। তাই বিচারস্থলে প্রতিবাদী বৈয়াকরণ প্রভৃতি "খসূচি" হইলে সেখানে কর্ম্মধারয় সমাসে "বৈয়াকরণ-খসূচিঃ" ইত্যাদি প্রয়োগও হইয়াছে। বৈয়াকরণ প্রভৃতি প্রতিবাদী নিন্দিত হইলেই অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হইলেই ঐরূপ কর্ম্মধারয় সমাস হয়, নচেৎ ঐরূপ সমাস হয় না। ব্যাকরণ শাস্ত্রে এই "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থানকে গ্রহণ করিয়াই ঐরূপ সমাস বিহিত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বসম্মত নিগ্রহস্থান। ধর্ম্মকীর্ত্তিও "অদোষোদ্ভাবন" শব্দের দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। গৌতমোক্ত এই "অপ্রতিভা" শব্দকে গ্রহণ করিয়াই "বিচারে অপ্রতিভ হইয়াছেন" ও "অপ্রতিভ হইয়া গেলেন" ইত্যাদি কথার সৃষ্টি হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

সূত্র। কার্য্যব্যাসঙ্গাৎ কথা-বিচ্ছেদো বিক্ষেপঃ ॥ ॥১৯॥৫২৩॥

অনুবাদ। কার্য্যব্যাসঙ্গ উদ্ভাবন করিয়া অর্থাৎ কোন মিথ্যা কার্য্যের উল্লেখ করিয়া কথার ভঙ্গ (১৭) "বিক্ষেপ" অর্থাৎ "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। যত্র কর্ত্তব্যং ব্যাসজ্য কথাং ব্যবচ্ছিনত্তি,—ইদং মে করণীয়ং

বিদ্যতে, তস্মিন্নবসিতে পশ্চাৎ কথয়ামীতি বিক্ষেপো নাম নিগ্রহস্থানং। একনিগ্রহাবসানায়াং কথায়াং স্বয়মেব কথান্তরং প্রতিপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। যে স্থলে ইহা আমার কর্ত্তব্য আছে, তাহা সমাপ্ত হইলেই পরে বলিব, এইরূপে কর্ত্তব্য ব্যাসঙ্গ করিয়া অর্থাৎ মিথ্যা কর্ত্তব্যের উল্লেখ করিয়া (প্রতিবাদী) কথা ভঙ্গ করেন, সেই স্থলে "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। (কারণ) কথা একনিগ্রহাবসান হইলে অর্থাৎ সেই আরব্ধ কথা এক নিগ্রহের পরেই সমাপ্ত হইলে (প্রতিবাদী) স্বয়ংই অন্য কথা স্বীকার করেন।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা "বিক্ষেপ" নামক সপ্তদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। সূত্রে "কার্য্যব্যাসঙ্গাৎ" এই পদে ল্যপ্ লোপে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। উহার ব্যাখ্যা "কার্য্যব্যাসঙ্গমুদ্ভাব্য"। তাৎপর্য্য এই যে, "জল্প" বা "বিতণ্ডা" নামক কথার আরম্ভ করিয়া বাদী অথবা প্রতিবাদী যদি "আমার বাড়ীতে অমুক কার্য্য আছে, এখনই আমার যাওয়া অত্যাবশ্যক, সেই কার্য্য সমাপ্ত করিয়া আসিয়াই পরে বলিব", এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া ঐ আরব্ধ কথার ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। কেন উহা নিগ্রহস্থান? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী অথবা প্রতিবাদীর এক নিগ্রহের পরেই সেই আরব্ধ কথার সমাপ্তি হওয়ায় তাঁহারা নিজেই অন্য কথা স্বীকার করেন। অর্থাৎ তখন কিছু না বলিয়া, পরে আবার বিচার করিব, ইহা বলিয়া, নিজেই সেই আরব্ধ বিচারে নিজের নিগ্রহ স্বীকারই করায় উহা অবশ্য তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান এবং উহা অবশ্য উদ্ভাব্য। নচেৎ অপরের অহঙ্কার খণ্ডন হয় না। অহঙ্কারী জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারে অপরের অহঙ্কার খণ্ডনই নিগ্রহ এবং উহাই সেখানে অপরের পরাজয় নামে কথিত হয়। কোন কার্য্যব্যাসঙ্গের ন্যায় "প্রতিশ্যায় পীড়াবশতঃ আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছে, আমি কিছুই বলিতে পারিতেছি না" ইত্যাদি প্রকার কোন মিথ্যা কথা বলিয়া কথাভঙ্গ করিলে সেখানেও উক্ত "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতিও ইহার উদাহরণরূপে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। অবশ্য উক্ত স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর ঐরূপ কোন কথা যথার্থই হইলে অথবা উৎকট শিরঃপীড়াদি কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ কথার বিচ্ছেদ হইলে, সেখানে এই বিক্ষেপ নামক নিগ্রহস্থান হইবে না। কারণ, সেখানে বাদী বা প্রতিবাদীর কোন দোষ না থাকায় নিগ্রহ হইতে পারে না। কিন্তু বাদী বা প্রতিবাদী নিজের অসামর্থ্য প্রচ্ছাদনের উদ্দেশ্যেই ঐরূপ কোন মিথ্যা বাক্য বলিয়া "কথা"র ভঙ্গ করিলে, সেখানেই তাঁহার নিগ্রহ হইবে। সুতরাং সেইরূপ স্থলেই তাঁহার পক্ষে "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, ঐরূপ স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করায় তাঁহার পক্ষে "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে এবং উত্তর বলিতে না পারায় "অপ্রতিভা"র দ্বারাও তিনি নিগৃহীত হইবেন, "বিক্ষেপ" নামক পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকার করা অনাবশ্যক। এতদুত্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, যে স্থলে কথার আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা-

বাক্য বা হেতুবাক্য বলিয়াই পরে নিজের সাধ্যসিদ্ধির অভিপ্রায় রাখিয়াই বাদী বা প্রতিবাদী প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করেন, সেই স্থলেই "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হয়। কিন্তু এই "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী কথার আরম্ভকালেই পূর্ব্বোক্তরূপ কোন মিথ্যা বাক্য বলিয়া সভা হইতে পলায়ন করেন। সুতরাং "অর্থান্তর" ও "বিক্ষেপ" তুল্য নহে এবং পূর্ব্বোক্ত "অপ্রতিভা" স্থলে প্রতিবাদী বাদীর পূর্ব্বপক্ষের শ্রবণাদি করিয়া, পরে উত্তরের কালে উত্তরের স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় পরাজিত হন। কিন্তু এই "বিক্ষেপ" স্থলে পূর্ব্বপক্ষের স্থাপনাদির পূর্ব্বেই তিনি পলায়ন করায় পূর্ব্বোক্ত "অপ্রতিভা" হইতেও ইহার মহান্ বিশেষ আছে।

জয়ন্ত ভট্ট এইরূপ বলিলেও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা কিন্তু বুঝা যায় যে, জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর কথারম্ভের পরে কাহারও একবার নিগ্রহ হইলে, তখন তিনি তাঁহার শেষ পরাজয় সম্ভাবনা করিয়াই উক্ত স্থলে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন মিথ্যা কথা বলিয়া, সেই আরব্ধ কথার ভঙ্গ করেন এবং পরে অন্য "কথা" স্বীকার করিয়া যান। বস্তুতঃ মহর্ষিও উক্তরূপ কথার বিচ্ছেদকেই "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। কথার আরম্ভ না হইলে তাহার বিচ্ছেদ বলা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, কথার স্বীকার করিয়া অর্থাৎ সাধন ও দূষণের উল্লেখ করিব, ইহা স্বীকার করিয়া বাদী অথবা প্রতিবাদী যদি তাঁহার প্রতিবাদীর দৃঢ়তা অথবা মধ্যস্থ সভ্যগণের কঠোরত্ব বুঝিয়া অর্থাৎ ঐ সভায় ঐ বিচারে তাঁহার পরাজয়ই নিশ্চয় করিয়া সহসা কোন কার্য্যব্যাসঙ্গের উদ্‌ভাবনপূর্ব্বক সেই পূর্ব্বস্বীকৃত কথার ব্যবচ্ছেদ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাচস্পতি মিশ্র পরে বলিয়াছেন যে, অপ্রতিভা-বশতঃ তূষ্ণীম্ভাবও ইহার দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, এই সূত্রে "কার্য্যব্যাসঙ্গাৎ" পদের দ্বারা যে কোনরূপে স্বীকৃত কথার বিচ্ছেদ মাত্রই বিবক্ষিত। সুতরাং উক্ত স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী কোন কার্য্যব্যাসঙ্গের উদ্ভাবন না করিয়া অপ্রতিভাবশতঃ একেবারে নীরব হইলেও তাঁহার "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্তু "অপ্রতিভা" নামক পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থান এইরূপ নহে। কারণ, সেই স্থলে প্রতিবাদী বাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া শ্লোক পাঠাদি করেন। কিন্তু "বিক্ষেপ" স্থলে কেহ ঐরূপ করেন না। এবং "অর্থান্তর" স্থলে প্রকৃত বিষয়-সাধনের অভিপ্রায় রাখিয়াই বাদী বা প্রতিবাদী প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করেন, সেখানে কেহ কথা-ভঙ্গ করেন না। সুতরাং এই "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান "অর্থান্তর" হইতে ভিন্ন। এবং ইহা "নিরর্থক" ও "অপার্থকে"র লক্ষণাক্রান্ত হয় না এবং হেত্বাভাসের লক্ষণাক্রান্তও হয় না। সুতরাং "বিক্ষেপ" নামক পৃথক্ নিগ্রহস্থানই সিদ্ধ হয়। ধর্ম্মকীর্ত্তি এই "বিক্ষেপ"কে হেত্বাভাসের মধ্যেই অন্তর্ভূত বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন যে, কীর্ত্তি যে ইহাকে হেত্বাভাসের অন্তর্ভূত বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অতীব সুভাষিত। কোথায় হেত্বাভাস, কোথায় কার্য্যব্যাসঙ্গ, এই ধারণাই রমণীয়। বাচস্পতি মিশ্র ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়া-ছেন যে, কথাবিচ্ছেদরূপ "বিক্ষেপ" উক্ত স্থলে হেতুরূপে প্রযুক্ত হয় না, উহাতে হেতুর কোন ধর্ম্মও নাই। পরন্তু কোন বাদী বা প্রতিবাদী যদি নির্দ্দোষ হেতুর প্রয়োগ করিয়াও পরে উহার

সমর্থনে অশক্ত হইয়া সভা হইতে চলিয়া যান, তাহা হইলে সেখানে তিনি কি নিগৃহীত হইবেন না? কেন নিগৃহীত হইবেন? সেখানে ত তিনি কোন হেত্বাভাস প্রয়োগ করেন নাই। অতএব হেত্বাভাস হইতে ভিন্ন "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান অবশ্যই স্বীকার্য্য। উক্তরূপ স্থলে তিনি উহার দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন। বাচস্পতি মিশ্রের এই কথার দ্বারাও বাদী ও প্রতিবাদীর কথারম্ভের পরে কেহ নিজের অসামর্থ্য বুঝিয়া চলিয়া গেলেও সেখানে তাঁহার "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ কথারম্ভের পরে যে কোন সময়ে উক্তরূপে কথার বিচ্ছেদ হইলেই উক্ত নিগ্রহস্থান হয়। তাই বরদরাজও বলিয়াছেন যে, "কথা"র আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্তই এই নিগ্রহ-স্থানের অবসর। জয়ন্ত ভট্টের ন্যায় পূর্ব্বপক্ষ শ্রবণাদির পূর্ব্বেই প্রতিবাদীর পলায়ন স্থলেই উক্ত নিগ্রহস্থান হয়, ইহা আর কেহই বলেন নাই ॥১৯॥

উত্তরবিরোধিনিগ্রহস্থানচতুষ্কপ্রকরণ সমাপ্ত ॥৫॥

সূত্র। স্বপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দোষ-প্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা ॥২০॥৫২৪॥

অনুবাদ। নিজপক্ষে দোষ স্বীকার করিয়া, পরপক্ষে দোষের প্রসঞ্জন (১৮) "মতানুজ্ঞা" অর্থাৎ "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। যঃ পরেণ চোদিতং দোষং স্বপক্ষেঽভ্যুপগম্যানুদ্ধৃত্য বদতি—ভবৎপক্ষেঽপি সমানো দোষ ইতি, স স্বপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দোষং প্রসঞ্জয়ন্ পরমতমনুজানাতীতি মতানুজ্ঞা নাম নিগ্রহস্থানমাপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। যিনি নিজপক্ষে পরকর্ত্তৃক আপাদিত দোষ স্বীকার করিয়া (অর্থাৎ) উদ্ধার না করিয়া বলেন, আপনার পক্ষেও তুল্য দোষ, তিনি নিজপক্ষে দোষের স্বীকারপ্রযুক্ত পরপক্ষে দোষ প্রসঞ্জন করতঃ পরের মত স্বীকার করেন, এ জন্য "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হন।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা "মতানুজ্ঞা" নামক অষ্টাদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। নিজপক্ষে অপরের আপাদিত দোষের খণ্ডন না করিয়া, অপরের পক্ষেও সেই দোষ তুল্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করিলে, অপরের মতের অনুজ্ঞা অর্থাৎ স্বীকারই করা হয়। সুতরাং ঐরূপ স্থলে "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান হয়। কারণ, নিজপক্ষে অপরের আপাদিত দোষের উদ্ধার বা খণ্ডন না করিলে, সেখানে সেই দোষ স্বীকৃতই হয় এবং তদ্দ্বারা তিনি যে প্রকৃত উত্তর জানেন না, ইহাও প্রতিপন্ন হয়। প্রথম আহ্নিকে "জাতি" নিরূপণের পরে "কথাভাসে"র নিরূপণে মহর্ষি এই

"মতানুজ্ঞা"র উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার সেখানেই ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি এখানে ইহার একটী সুবোধ উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কোন বাদী বলিলেন, "ভবাংশ্চৌরঃ পুরুষত্বাৎ"। তখন প্রতিবাদী বলিলেন,—"ভবানপি চৌরঃ"। অর্থাৎ পুরুষ হইলেই যদি চোর হয়, তাহা হইলে আপনিও চোর। কারণ, আপনিও ত পুরুষ। বস্তুতঃ পুরুষমাত্রই চোর নহে। সুতরাং পুরুষত্বরূপ হেতু চৌরত্বের ব্যভিচারী। প্রতিবাদী ঐ ব্যভিচারদোষ প্রদর্শন করিলেই তাঁহাতে বাদীর আপাদিত চৌরত্বদোষের খণ্ডন হইয়া যায়। কারণ, বাদীর কথিত পুরুষত্ব হেতুর দ্বারা যে চৌরত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা বাদীও স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব্যভিচারদোষ প্রদর্শন না করিয়া, প্রতিকূল ভাবে "আপনিও চোর" এই কথার দ্বারা বাদীর পক্ষেও ঐ দোষ তুল্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়া, তাঁহার নিজ পক্ষে চৌরত্ব দোষ, যাহা বাদীর মত, তাহার অনুজ্ঞা অর্থাৎ স্বীকারই করায় উক্ত স্থলে তাঁহার "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান হয়।

কিন্তু অন্য সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথানুসারে তাঁহাতে চৌরত্বের প্রসঙ্গ মাত্র অর্থাৎ আপত্তি মাত্রই করেন, উহার দ্বারা তাঁহার নিজের চৌরত্ব বস্তুতঃ স্বীকৃত হয় না। অর্থাৎ তখন তিনি উক্তরূপ আপত্তি সমর্থনের জন্য নিজের চৌরত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও পরে তিনি উহা স্বীকার করেন না। পরন্তু ঐ ভাবে আপত্তি প্রকাশ দ্বারা বাদীর হেতুতে ব্যভিচারের উদ্ভাবনই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং উক্ত স্থলে তিনি কেন নিগৃহীত হইবেন? উক্ত স্থলে বাদীই ব্যভিচারী হেতুর প্রয়োগ করায় নিগৃহীত হইবেন। উদ্দ্যোতকর ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি উক্ত বৌদ্ধ মতের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদীর হেতু যে ব্যভিচারী, ইহাই প্রতিবাদীর বক্তব্য উত্তর। প্রতিবাদী উহা বলিলেই তাহাতে বাদীর আপাদিত দোষের খণ্ডন হইয়া যায়। কিন্তু তিনি যে উত্তর বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত উত্তর নহে, উহা উত্তরাভাস। উত্তর জানিলে কেহ উত্তরাভাস বলে না। সুতরাং উক্ত স্থলে প্রকৃত উত্তর না বলায় তিনি যে উহা জানেন না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, তিনি প্রকৃত উত্তর বলিতে পারিলে তাহা স্পষ্ট কথায় বলিবেন না কেন? অতএব উক্ত স্থলে তাঁহার ঐরূপ মতানুজ্ঞার দ্বারা উদ্ভাব্যমান তাঁহার উত্তর বিষয়ে যে অজ্ঞান, তাহাই "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। তিনি উহার দ্বারা অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী ব্যভিচারী হেতুর প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী ঐ ব্যভিচার দোষ বা হেত্বাভাসের উদ্ভাবন না করায় বাদী ঐ হেত্বাভাসের দ্বারা নিগৃহীত হইবেন না।

শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ "ন্যায়সার" গ্রন্থে[১] গৌতমের এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াই এবং পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই এই "মতানুজ্ঞা"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যিনি নিজপক্ষে কিছুমাত্র

১। "স্বপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা"। যঃ স্বপক্ষে মনাগপি দোষং ন পরিহরতি, কেবলং পরপক্ষে দোষং প্রসঞ্জয়তি, ভবাংশ্চৌর ইত্যুক্তে ত্বমপি চৌর" ইতি তস্যেদং নিগ্রহস্থানং।—"ন্যায়সার", অনুমান পরিচ্ছেদ।

দোষোদ্ধার করেন না, কেবল পরপক্ষে দোষই প্রসঞ্জন করেন, তাঁহার পক্ষে এই (মতানুজ্ঞা) নিগ্রহস্থান। "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ পরে ইহা ভূষণকারের ("ন্যায়সারে"র প্রধান টীকাকার ভূষণের) ব্যাখ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াও ঐ ব্যাখ্যার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। উক্ত ব্যাখ্যায় বাদীর আপাদিত দোষের তুল্যদোষ প্রসঞ্জনের কোন কথা নাই, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। কিন্তু প্রতিবাদী যদি নিজপক্ষে বাদীর আপাদিত দোষের উদ্ধার না করিয়া বাদীর পক্ষেও তত্তুল্য দোষেরই আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই স্থলেই তাঁহার "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহাই মহর্ষি গোতমের মত বলিয়া বুঝা যায়। কারণ, তিনি পূর্ব্ব আহ্নিকের শেষে কথাভাস নিরূপণ করিতে ৪২ সূত্রে বলিয়াছেন—"সমানো দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা" (৩৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতিও এখানে উক্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাসর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি গোতমের মতানুসারে নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা করিতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি না, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন ॥২০॥

সূত্র। নিগ্রহস্থানপ্রাপ্তস্যানিগ্রহঃ পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণং ॥২১॥৫২৫॥

অনুবাদ। নিগ্রহস্থানপ্রাপ্তের অনিগ্রহ অর্থাৎ যে বাদী বা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হওয়ায় পর্য্যনুযোজ্য, তাঁহার অনিগ্রহ বা উপেক্ষণ অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে প্রতিবাদীর সেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করা (১৯) পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ অর্থাৎ "পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। পর্য্যনুযোজ্যো নাম নিগ্রহস্থানোপপত্ত্যা চোদনীয়ঃ। তস্যোপেক্ষণং নিগ্রহস্থানং প্রাপ্তোহসীত্যননুযোগঃ। এতচ্চ কস্য পরাজয় ইত্যনুযুক্তয়া পরিষদা বচনীয়ং। ন খলু নিগ্রহং প্রাপ্তঃ স্বকৌপীনং বিবৃণুয়াদিতি।

অনুবাদ। "পর্য্যনুযোজ্য" বলিতে নিগ্রহস্থানের উপপত্তির দ্বারা "চোদনীয়" অর্থাৎ বচনীয় পুরুষ। তাহার উপেক্ষণ বলিতে "নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইয়াছ" এইরূপ অনুযোগ না করা [অর্থাৎ যে বাদী অথবা প্রতিবাদীর পক্ষে কোন নিগ্রহস্থান উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতিবাদী তখনই প্রমাণ দ্বারা উহার উপপত্তি বা সিদ্ধি করিয়া অবশ্য বলিবেন যে, তোমার পক্ষে এই নিগ্রহস্থান উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি নিগৃহীত হইয়াছ—সেই নিগ্রহস্থানপ্রাপ্ত বাদী বা প্রতিবাদীর নাম পর্য্যনুযোজ্য। তাহাকে উপেক্ষা করা অর্থাৎ তাঁহার সেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করাই "পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ" নামক নিগ্রহস্থান] ইহা কিন্তু "কাহার পরাজয় হইল?" এইরূপে

জিজ্ঞাসিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক বক্তব্য অর্থাৎ উদ্ভাব্য। কারণ, নিগ্রহপ্রাপ্ত পুরুষ নিজের গুহ্য প্রকাশ করিতে পারেন না।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা "পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ" নামক উনবিংশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। মহর্ষি ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন, নিগ্রহস্থানপ্রাপ্ত বাদী অথবা প্রতিবাদীর অনিগ্রহ সে কিরূপ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার "পর্য্যনুযোজ্য" শব্দ ও "উপেক্ষণ" শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিয়া তদ্দ্বারাই উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ বাদী অথবা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার প্রতিবাদী যদি অজ্ঞতাবশতঃ যথাকালে সেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করেন, তাহা হইলে সেখানে তিনিই নিগৃহীত হইবেন। তাঁহার পক্ষে উহা "পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ" নামক নিগ্রহস্থান। যেমন কোন বাদী প্রথমে কোন হেত্বাভাস বা দুষ্ট হেতুর দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলেও প্রতিবাদী যদি যথাকালে সেই হেত্বাভাসের উদ্ভাবন করিয়া, আপনার পক্ষে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান উপস্থিত, সুতরাং আপনি নিগৃহীত হইয়াছেন, এই কথা না বলেন, তাহা হইলে সেখানে তিনি নিগৃহীত হইবেন। কারণ, তিনি তাঁহার পর্য্যনুযোজ্য বাদীকে উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ তাঁহার অবশ্যবক্তব্য পূর্ব্বোক্ত কথা না বলিয়া অন্যান্য বক্তব্য বলায় তদ্দ্বারা বাদীর সেই হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান বিষয়ে তাঁহার অপ্রতিপত্তি বা অজ্ঞতা প্রতিপন্ন হয়।

প্রশ্ন হয় যে, পূর্ব্বোক্ত নিগ্রস্থানের উদ্ভাবন করিবেন কে? উদ্ভাবিত না হইলে ত উহা নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কিন্তু প্রতিবাদীর ন্যায় বাদীও ত উহা উদ্ভাবন করিতে পারেন না। কারণ, উহা তাঁহার পক্ষে গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয়। আমি নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও এই প্রতিবাদী তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তাহার উদ্ভাবন করিয়া আমাকে নিগৃহীত বলেন নাই, অতএব তিনি নিগৃহীত হইয়াছেন, এই কথা বাদী কখনই বলিতে পারেন না। কারণ, তাহা বলিলে তাঁহার নিজের নিগ্রহ স্বীকৃতই হয়। ভাষ্যকার উক্ত যুক্তি অনুসারেই পরে বলিয়াছেন যে, পরিষৎ অর্থাৎ মধ্যস্থ সভ্যগণের নিকটে এই বিচারে কাহার পরাজয় হইয়াছে, এইরূপ প্রশ্ন হইলে, তখন তাঁহারাই এই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন। অর্থাৎ তখন তাঁহারা অপক্ষপাতে ঐকমত্যে বলিয়া দিবেন যে, এই বাদী এই নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও এই প্রতিবাদী যথাসময়ে তাহা বুঝিতে না পারায় তাহা বলেন নাই। সুতরাং ইঁহারই পরাজয় হইয়াছে। ইঁহার পক্ষে উহা "পর্য্যনুযোজ্যো-পেক্ষণ" নামক নিগ্রহস্থান। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, স্বয়ং সভাপতি অথবা বাদী ও প্রতি-বাদী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত মধ্যস্থ সভ্যগণ ইহার উদ্ভাবন করিলে, তখন সেই প্রতিবাদীই উহার দ্বারা নিগৃহীত হইবেন। আর তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ "বাদ" নামক কথায় সভ্যগণ ইহার উদ্ভাবন করিলে সেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই নিগ্রহ হওয়ায় সেই সভ্যগণেরই জয় হইবে। বস্তুতঃ বাদ-বিচারে বাদী ও প্রতিবাদীর অহঙ্কার না থাকায় তাঁহাদিগের পরাজয়রূপ নিগ্রহ হইতে পারে না। সভ্যগণের জয়ও সেখানে প্রশংসা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাচস্পতি মিশ্রেরও ঐরূপই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। পরন্তু "বাদ"বিচারে বাদী স্বয়ং উক্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিলেও দোষ নাই।

কারণ, সেখানে তত্ত্ব নির্ণয়ই উদ্দেশ্য। সুতরাং তাহাতে কাহারই কোন দোষ গোপন করা উচিত নহে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যে "কৌপীন" শব্দের অর্থ গুহ্য। অমর সিংহ নানার্থবর্গে লিখিয়াছেন,—"অকার্য্যগুহ্যে কৌপীনে"।

কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহাকেও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের কথা এই যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী তাঁহার পর্য্যনুযোজ্য বাদীকে নিগৃহীত না বলিলেও তিনি যখন অন্য উত্তর বলেন, তখন তাঁহার ঐ উপেক্ষা কখনও তাঁহার নিগ্রহের হেতু হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর এই মতের উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর যাহা অবশ্যবক্তব্য উত্তর, যাহা বলিলেই তখনই বাদী নিগৃহীত হন, তাহা তিনি কেন বলেন না ? অতএব তিনি যে, অজ্ঞতাবশতঃই তাহা বলেন না, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, নিজের অবশ্যবক্তব্য সদুত্তরের স্ফূর্ত্তি হইলে যিনি বিচারক, যিনি জিগীষু প্রতিবাদী, তিনি কখনই অন্য উত্তর বলেন না। সদুত্তর বলিতে পারিলে অসদুত্তর বলাও কোন স্থলেই কাহারই উচিত নহে। অতএব যিনি অবশ্যবক্তব্য সদুত্তর বলেন না, তিনি যে উহা জানেন না, ইহাই প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন। বরদরাজ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে কোন বাদীর অনেক নিগ্রহস্থান উপস্থিত হয়, সেখানে প্রতিবাদী উহার মধ্যে যে কোন একটীর উদ্ভাবন করিলে তাঁহার এই নিগ্রহস্থান হইবে না। কিন্তু উদ্দ্যোতকরের উক্ত যুক্তি অনুসারে উহা তাঁহার মত বলিয়া মনে হয় না। বাচস্পতি মিশ্রও ঐ কথা কিছুই বলেন নাই। ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত স্থলেও প্রতিবাদীর পক্ষে "অপ্রতিভা"ই বলিয়াছেন। কারণ, উক্ত স্থলে প্রকৃত উত্তরের স্ফূর্ত্তি না হওয়াতেই প্রতিবাদী তাহা বলেন না। সুতরাং তিনি "অপ্রতিভার" দ্বারাই পরাজিত হইবেন, ইহা বলা যায়। উদ্দ্যোতকর এই কথার কোন উল্লেখ করেন নাই। পরবর্ত্তী বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট ঐ কথার উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, যে স্থলে বাদী নির্দ্দোষ হেতুর দ্বারাই নিজপক্ষ স্থাপন করেন, সেখানেই পরে প্রতিবাদীর নিজ বক্তব্য উত্তরের স্ফূর্ত্তি না হইলে তাঁহার পক্ষে "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান হয়। কিন্তু যে স্থলে বাদী প্রথমে হেত্বাভাসের দ্বারাই নিজপক্ষ স্থাপন করেন, সেখানে তিনি প্রথমেই নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিবাদীর পর্য্যনুযোজ্য। সুতরাং তখন প্রতিবাদী তাঁহাকে উপেক্ষা করিলে তাঁহার সেই উপেক্ষার দ্বারা উদ্‌ভাব্যমান তাঁহার সেই উত্তরবিষয়ক অজ্ঞানই "পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষ থাকাতেই উহা পৃথক্ নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির মতে "অপ্রতিভা"স্থলে প্রতিবাদী শ্লোক পাঠাদির দ্বারা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরন্তু এই "পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ" মধ্যস্থগণেরই উদ্ভাব্য বলিয়াও অন্য সমস্ত নিগ্রহস্থান হইতে ইহার ভেদ পরিস্ফুটই আছে ॥২১॥

সূত্র। অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থানাভিযোগো নিরনুযোজ্যানুযোগঃ ॥২২॥৫২৬॥

অনুবাদ। অনিগ্রহ স্থানে অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে, তাহাতে নিগ্রহ-

স্থানের অভিযোগ অর্থাৎ তাহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া তাহার উদ্ভাবন (২০) নিরনু-যোজ্যানুযোগ অর্থাৎ "নিরনুযোজ্যানুযোগ" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। নিগ্রহস্থানলক্ষণস্য মিথ্যাধ্যবসায়াদনিগ্রহস্থানে নিগৃহীতোঽসীতি পরং ব্রুবন্ নিরনুযোজ্যানুযোগান্নিগৃহীতো বেদিতব্য ইতি।

অনুবাদ। নিগ্রহস্থানের লক্ষণের মিথ্যা অধ্যবসায় অর্থাৎ আরোপবশতঃ নিগ্রহস্থান না হইলেও নিগৃহীত হইয়াছ, ইহা বলিয়া (বাদী বা প্রতিবাদী) নিরনুযোজ্যের অনুযোগবশতঃ নিগৃহীত জানিবে।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা "নিরনুযোজ্যানুযোগ" নামক বিংশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। যে বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষের বস্তুতঃ কোন নিগ্রহস্থান হয় নাই অথবা সেই নিগ্রহস্থান হয় নাই, তাঁহাকে 'তুমি এই নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছ', ইহা বলা উচিত নহে। কারণ, তিনি সেখানে নিরনুযোজ্য। তাঁহাকে অনুযোগ করা অর্থাৎ ঐরূপ বলা নিরনুযোজ্য পুরুষের অনুযোগ। তাই উহা "নিরনুযোজ্যানুযোগ" নামে নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহাতে বস্তুতঃ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ নাই, তাহাতে ঐ লক্ষণের আরোপ করিয়া, নিগ্রহস্থান বলিয়া উদ্ভাবন করিলে এবং কোন বাদী অন্য নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও যে নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার সম্বন্ধে সেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিলেও তাঁহার পক্ষে এই "নিরনুযোজ্যানুযোগ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। অসময়ে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনও এই নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহার সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যথাসময়ে যথার্থ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ভিন্ন যে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন, তাহাই "নিরনুযোজ্যানুযোগ" নামক নিগ্রহস্থান। ইহা যে পূর্ব্বোক্ত "অপ্রতিভা" হইতে ভিন্ন, ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, নিগ্রহস্থানের লক্ষণের আরোপবশতঃ এই নিগ্রহস্থান হয়। পরবর্ত্তী বৌদ্ধসম্প্রদায় ইহাকেও "অপ্রতিভা"ই বলিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারোক্ত যুক্তি সুব্যক্ত করিয়া উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উত্তরের অপ্রতিপত্তি বা অজ্ঞানই "অপ্রতিভা"। কিন্তু যাহা উত্তর নহে, তাহাকে উত্তর বলিয়া যে বিপ্রতিপত্তি বা ভ্রম, তৎপ্রযুক্ত এই নিগ্রহস্থান হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "অপ্রতিভা" হইতে ইহার মহান্ বিশেষ আছে। পরন্তু ইহা হেত্বাভাস হইতেও ভিন্ন। কারণ, হেত্বাভাস বাদীর পক্ষেই নিগ্রহস্থান হয়। কিন্তু ইহা প্রতিবাদীর পক্ষে নিগ্রহস্থান হয়। বাচস্পতি মিশ্র পরে এখানে ধর্ম্মকীর্ত্তির "অসাধনাঙ্গবচনং" ইত্যাদি কারিকা উদ্ধৃত করিয়াও ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্প্রদায় যে, এই নিগ্রহস্থান স্বীকার করিতে বাধ্য, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন।

জয়ন্ত ভট্ট উক্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, "নঞ্" শব্দের যে "পর্য্যুদাস" ও "প্রসজ্যপ্রতিষেধ" নামে অর্থভেদ আছে, উহার ভেদ না বুঝিয়াই এই নিগ্রহস্থানকে "অপ্রতিভা" বলা হইয়াছে। যে স্থলে ক্রিয়ার সহিতই নঞের সম্বন্ধ, সেখানে উহার ক্রিয়ান্বয়ী অত্যন্তাভাবরূপ অর্থকে "প্রসজ্যপ্রতিষেধ" বলে। পূর্ব্বোক্ত "অপ্রতিভা" শব্দের অন্তর্গত নঞের অর্থ প্রসজ্য-

প্রাগুক্তবৎ। তাহা হইলে উহার দ্বারা বুঝা যায়, প্রতিভার অত্যন্তাভাব। অর্থাৎ সত্যদোষের অস্ফূর্ত্তি বা অজ্ঞানই "অপ্রতিভা", কিন্তু অসত্যদোষের উদ্ভাবনই "নিরনুযোজ্যানুযোগ"। সুতরাং যাহা দোষ নহে, তাহাকে দোষ বলিয়া যে জ্ঞান, যাহা বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ উক্তরূপ ভ্রমজ্ঞান, তাহাই এই নিগ্রহস্থানের মূল, এ জন্য ইহা বিপ্রতিপত্তিনিগ্রহস্থান। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "অপ্রতিভা" অপ্রতিপত্তিনিগ্রহস্থান। সুতরাং উক্ত উভয় নিগ্রহস্থান এক হইতেই পারে না। কারণ, সত্যদোষের অজ্ঞান এবং অসত্যদোষের ভ্রমজ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। জয়ন্ত ভট্ট পরে ধর্ম্মকীর্ত্তি যে, "অসাধনাঙ্গবচন" এবং "অদোষোদ্ভাবন"কে নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত বাক্যে "নঞ্" শব্দের দ্বারা কেবল "প্রসজ্যপ্রতিষেধ" অর্থ গ্রহণ করিলে যাহা সাধনের অঙ্গ, তাহার অনুক্তি এবং দোষের উদ্ভাবন না করা, এই উভয়ই নিগ্রহস্থান বলা হয়। তাহা হইলে কেবল মূর্খতাই নিগ্রহস্থান হয়। সর্ব্বসম্মত নিগ্রহস্থান হেত্বাভাসও নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। অতএব ধর্ম্মকীর্ত্তির উক্ত বাক্যে নঞের পর্য্যুদাস অর্থও গ্রহণ করিয়া, উহার দ্বারা যাহা বস্তুতঃ সাধনের অঙ্গ নহে, তাহার বচন এবং যাহা বস্তুতঃ দোষ নহে, তাহাকে দোষ বলিয়া উদ্ভাবন, এই উভয়ও তাঁহার মতে নিগ্রহস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং অসত্য দোষের উদ্ভাবন যে নিগ্রহস্থান, ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তিরও স্বীকৃত বুঝা যায়। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "অপ্রতিভা" হইতে ভিন্ন "নিরনুযোজ্যানুযোগ" নামে নিগ্রহস্থান তাঁহারও স্বীকৃত। কারণ, সত্যদোষের অজ্ঞানই "অপ্রতিভা"। কিন্তু অসত্য দোষের উদ্ভাবনই "নিরনুযোজ্যানুযোগ"। অবশ্য এই স্থলেও প্রতিবাদীর সত্যদোষের অজ্ঞানও থাকেই, কিন্তু উহা হইতে ভিন্ন পদার্থ যে অসত্যদোষের উদ্ভাবন, তাহাই উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাদীর নিগ্রহের হেতু হওয়ায় উহাই সেখানে তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য।

এখন এখানে বুঝা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত "ছল" ও "জাতি" নামক যে বিবিধ অসদুত্তর, তাহাও এই "নিরনুযোজ্যানুযোগ" নামক নিগ্রহস্থানেরই অন্তর্গত অর্থাৎ ইহারই প্রকারবিশেষ। কারণ, "ছল" এবং "জাতি"ও অসত্য দোষের উদ্ভাবন। তাই বাচস্পতি মিশ্রও এখানে লিখিয়াছেন, "অনেন সর্ব্বা জাতয়ো নিগ্রহস্থানত্বেন সংগৃহীতা ভবন্তি"। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্য-সমা" প্রভৃতি সমস্ত জাতিও অসত্যদোষের উদ্ভাবনরূপ অসদুত্তর বলিয়া, উহার দ্বারাও প্রতিবাদীর নিগ্রহ হয়। সুতরাং ঐ সমস্তও নিগ্রহস্থান। প্রকারান্তরে বিশেষরূপে উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্যই পৃথক্‌রূপে প্রকারভেদে মহর্ষি উহাদিগের প্রতিপাদন করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের সর্ব্বপ্রথম সূত্রের "বৃত্তি"তে বিশ্বনাথও ইহাই বলিয়াছেন[১]। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি এই "নিরনুযোজ্যানুযোগ" নামক নিগ্রহস্থানকে চতুর্ব্বিধ বলিয়াছেন[২]। যথা,—(১) অপ্রাপ্তকালে

১। অত্র প্রমেয়ান্তঃপাতিবুদ্ধিরূপস্যাপি সংশয়াদের্নিরনুযোজ্যানুযোগরূপনিগ্রহস্থানান্তঃপাতিনোশ্ছল-জাত্যোশ্চ প্রকারভেদেন প্রতিপাদনং শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যার্থমস্তু।—বিশ্বনাথবৃত্তি।

২। অপ্রাপ্তকালে গ্রহণং হান্যাদ্যাভাস এব চ।
ছলানি জাতয় ইতি চতস্রেহস্য বিধা মতাঃ ॥—তার্কিকরক্ষা।

গ্রহণ, (২) প্রতিজ্ঞাহান্যাদ্যাভাস, (৩) ছল, (৪) জাতি। স্ব স্ব অবসরকে প্রাপ্ত না হইয়াই অথবা উহার অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ অসময়ে নিগ্রহস্থানের যে উদ্ভাবন, তাহাই অপ্রাপ্তকালে গ্রহণ। যেমন বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনাদির পরে প্রতিবাদী তাঁহার হেতুতে ব্যভিচারদোষ প্রদর্শন করিয়াই বাদীর উত্তরের পূর্ব্বেই যদি বলেন যে, তুমি এই ব্যভিচারদোষবশতঃ যদি তোমা' কথিত হেতুকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। আর যদি ঐ হেতুতে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট কর, তাহা হইলে তোমার "হেত্বন্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। প্রতিবাদী এইরূপে অসময়ে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিলে উক্ত স্থলে তিনিই নিগৃহীত হইবেন। কারণ, উহা তাঁহার পক্ষে অপ্রাপ্তকালে গ্রহণ। উহা প্রথম প্রকার "নিরনুযোজ্যানুযোগ" নামক নিগ্রহস্থান। সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবনের কালের নিয়ম আছে। তাহার লঙ্ঘন করিলে উহা নিগ্রহের হেতু হয়। সেই উদ্ভাবনকালের নিয়মানুসারেই নিগ্রহস্থানগুলি উক্তগ্রাহ্য, অনুক্তগ্রাহ্য ও উচ্যমানগ্রাহ্য, এই নামত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে[১]। যে সমস্ত নিগ্রহস্থান উক্ত হইলেই পরে বুঝা যায়, তাহা উক্তগ্রাহ্য। আর উক্ত না হইলেও পূর্ব্বেও যাহা বুঝা যায়, তাহা অনুক্তগ্রাহ্য। আর উচ্যমান অবস্থাতেই অর্থাৎ বলিবার সময়েই যাহা বুঝা যায়, তাহা উচ্যমানগ্রাহ্য। এইরূপ "প্রতিজ্ঞাহান্যাভাস" ও "প্রতিজ্ঞান্তরাভাস" প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকার "নিরনুযোজ্যানুযোগ"। যাহা বস্তুতঃ প্রতিজ্ঞাহানি নহে, কিন্তু তত্তুল্য বলিয়া তাহার ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাকে বলে প্রতিজ্ঞাহান্যাভাস। "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই আভাস সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন। উহা বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে। সুতরাং প্রতিবাদী উহার উদ্ভাবন করিলেও তাঁহার পক্ষে "নিরনুযোজ্যানুযোগ" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নের বর্ণিত প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতির আভাসসমূহের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। টীকাকার জ্ঞানপূর্ণ তাহার উদাহরণও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অতিবাহুল্যভয়ে সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বিশেষ জিজ্ঞাসু ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারিবেন॥ ২২॥

সূত্র। সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্যানিয়মাৎ কথাপ্রসঙ্গো- ঽপসিদ্ধান্তঃ ॥২৩॥৫২৭॥

অনুবাদ। সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া অর্থাৎ প্রথমে কোন শাস্ত্রসম্মত কোন সিদ্ধান্তবিশেষ প্রতিজ্ঞা করিয়া, অনিয়মবশতঃ অর্থাৎ সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের

১। উক্তগ্রাহ্যাঃ কেচিদন্যেঽনুক্তগ্রাহ্যাস্তথাপরে।
উচ্যমানদশাগ্রাহ্যা ইতি কালস্ত্রিধা স্থিতঃ।—তার্কিকরক্ষা।

বিপর্য্যয়প্রযুক্ত কথার প্রসঙ্গ (২৩) অপসিদ্ধান্ত অর্থাৎ "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। কস্যচিদর্থস্য তথাভাবং প্রতিজ্ঞায়[১] প্রতিজ্ঞাতার্থবিপর্য্যয়াদনিয়মাৎ কথাং প্রসঞ্জয়তোঽপসিদ্ধান্তো বেদিতব্যঃ।

যথা ন সদাত্মানং জহাতি, ন সতো বিনাশো নাসদাত্মানং লভতে, নাসদুৎপদ্যত ইতি সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য স্বপক্ষমবস্থাপয়তি—একপ্রকৃতীদং ব্যক্তং, বিকারাণাং সমন্বয়দর্শনাৎ। মৃদন্বিতানাং শরাবাদীনাং দৃষ্টমেকপ্রকৃতিত্বং। তথা চায়ং ব্যক্তভেদঃ সুখ-দুঃখমোহান্বিতো দৃশ্যতে। তস্মাৎ সমন্বয়দর্শনাৎ সুখাদিভিরেকপ্রকৃতীদং বিশ্বমিতি।

এবমুক্তবাননুযুজ্যতে—অথ প্রকৃতির্ব্বিকার ইতি কথং লক্ষিতব্যমিতি। যস্যাবস্থিতস্য ধর্ম্মান্তর-নিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরং প্রবর্ত্ততে, সা প্রকৃতিঃ। যদ্ধর্ম্মান্তরং প্রবর্ত্ততে নিবর্ত্ততে বা স বিকার ইতি। সোঽয়ং প্রতিজ্ঞাতার্থবিপর্য্যাসাদনিয়মাৎ কথাং প্রসঞ্জয়তি। প্রতিজ্ঞাতং খল্বনেন—নাসদাবির্ভবতি, ন সত্তিরোভবতীতি। সদসতোশ্চ তিরোভাবাবির্ভাবমন্তরেণ ন কস্যচিৎ প্রবৃত্তিঃ প্রবৃত্ত্যুপরমশ্চ ভবতি। মৃদি খল্ববস্থিতায়াং ভবিষ্যতি শরাবাদিলক্ষণং ধর্ম্মান্তরমিতি প্রবৃত্তির্ভবতি, অভূদিতি চ প্রবৃত্ত্যুপরমঃ। তদেতন্মৃদ্ধর্ম্মাণামপি ন স্যাৎ।

এবং প্রত্যবস্থিতো যদি সতশ্চাত্মহানমসতশ্চাত্মলাভমভ্যুপৈতি, তদাস্যাপসিদ্ধান্তো নাম নিগ্রহস্থানং ভবতি। অথ নাভ্যুপৈতি, পক্ষোঽস্য ন সিধ্যতি।

অনুবাদ। কোন পদার্থের তথাভাব অর্থাৎ তৎপ্রকারতা প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রতিজ্ঞাতার্থের বিপর্য্যয়রূপ অনিয়মবশতঃ কথাপ্রসঞ্জনকারীর (২১) অপসিদ্ধান্ত অর্থাৎ "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান জানিবে।

যেমন সৎবস্তু আত্মাকে ত্যাগ করে না (অর্থাৎ) সৎবস্তুর বিনাশ হয় না, এবং অসৎ আত্মাকে লাভ করে না (অর্থাৎ) অসৎ উৎপন্ন হয় না—এই সিদ্ধান্ত

১। "অভ্যুপেত্য" ইত্যস্য ব্যাখ্যানং "কস্যচিদর্থস্য তথাভাবং প্রতিজ্ঞায়ে"তি। "প্রতিজ্ঞার্থ-বিপর্য্যয়া"দিতি অভ্যুপেতার্থ-বিপর্য্যয়াৎ সিদ্ধান্তবিপর্য্যয়াদিত্যর্থঃ। তদেত"দনিয়মা"দিত্যস্য ব্যাখ্যানং।—তাৎপর্য্যটীকা।

স্বীকার করিয়া (কোন সাংখ্যবাদী) নিজ পক্ষ সংস্থাপন করিলেন, যথা—(প্রতিজ্ঞা) এই ব্যক্ত একপ্রকৃতি, (হেতু) যেহেতু বিকারসমূহের সমন্বয় দেখা যায়। (উদাহরণ) মৃত্তিকান্বিত শরাবাদির একপ্রকৃতিত্ব দৃষ্ট হয়। (উপনয়) এই ব্যক্তভেদ সেইপ্রকার সুখদুঃখমোহান্বিত দৃষ্ট হয়। (নিগমন) সুখাদির সহিত সেই সমন্বয়দর্শনপ্রযুক্ত এই বিশ্ব এক-প্রকৃতি। এইরূপ বক্তা অর্থাৎ যিনি উক্তরূপে নিজপক্ষ সংস্থাপন করিলেন, তিনি (প্রতিবাদী নৈয়ায়িক কর্তৃক) জিজ্ঞাসিত হইলেন,—প্রকৃতি ও বিকার, ইহা কিরূপে লক্ষণীয়? অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকারের লক্ষণ কি? (উত্তর) অবস্থিত যে পদার্থের ধর্ম্মান্তরের নিবৃত্তি হইলে ধর্ম্মান্তর প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রকৃতি। যে ধর্ম্মান্তর প্রবৃত্ত হয় অথবা নিবৃত্ত হয়, তাহা বিকার। সেই এই বাদী (সাংখ্য) প্রতিজ্ঞাতার্থের বিপর্য্যয়রূপ অনিয়মবশতঃ "কথা" প্রসঞ্জন করিলেন। যেহেতু এই বাদী কর্তৃক অসৎ আবির্ভূত হয় না এবং সৎ বস্তু তিরোভূত হয় না, ইহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। কিন্তু সৎ ও অসতের তিরোভাব ও আবির্ভাব ব্যতীত কোন ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির উপরম হয় না। (তাৎপর্য্য) অবস্থিত মৃত্তিকাতে শরাবাদিরূপ ধর্ম্মান্তর উৎপন্ন হইবে, এ জন্য প্রবৃত্তি অর্থাৎ সেই মৃত্তিকাতে শরাবাদির উৎপাদনে প্রবৃত্তি হয় এবং উৎপন্ন হইয়াছে, এ জন্য প্রবৃত্তির উপরম অর্থাৎ নিবৃত্তি হয়। সেই ইহা মৃত্তিকার ধর্ম্মসমূহেরও হইতে পারে না [অর্থাৎ উক্ত সিদ্ধান্তে লোকের যেমন শরাবাদির জন্য প্রবৃত্তি ও উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না, তদ্রূপ ঐ শরাবাদিরও উৎপত্তিরূপ প্রবৃত্তি ও বিনাশরূপ নিবৃত্তি যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহা হইতে পারে না। কারণ, উক্ত সিদ্ধান্তে মৃত্তিকার ধর্ম্ম শরাবাদিও ঐ মৃত্তিকার ন্যায় সৎ, উহারও উৎপত্তি ও বিনাশ নাই]।

এইরূপে প্রত্যবস্থিত হইয়া (বাদী সাংখ্য) যদি সৎবস্তুর বিনাশ ও অসতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে ইহাঁর "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান হয়। আর যদি স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ইহাঁর পক্ষ সিদ্ধ হয় না।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা "অপসিদ্ধান্ত" নামক একবিংশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। কোন শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত যে প্রকার, তৎপ্রকারে প্রথমে উহার প্রতিজ্ঞাই উহার স্বীকার এবং পরে তৎপ্রকারে প্রতিজ্ঞাত সেই সিদ্ধান্তের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরে উহার বিপরীত সিদ্ধান্তের স্বীকারই সূত্রে "অনিয়ম" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "অনিয়মাৎ" এই পদের ব্যাখ্যারূপে বলিয়াছেন,—"প্রতিজ্ঞাতার্থ-বিপর্য্যয়াৎ"। বাদীর প্রতিজ্ঞাত সিদ্ধান্তের বিপর্য্যয়ই প্রতিজ্ঞাতার্থবিপর্য্যয়,

তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরে সেই বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াই আরব্ধ কথার প্রসঙ্গ করিলে তাঁহার "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান হয়। ভাষ্যকার প্রথমে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে কোন সাংখ্য বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের উল্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্যমতে সৎবস্তুর বিনাশ নাই, অসতেরও উৎপত্তি নাই। কোন সাংখ্য উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে নিজ পক্ষ স্থাপন করিলেন যে, এই ব্যক্ত জগৎ একপ্রকৃতি অর্থাৎ সমগ্র জগতের মূল উপাদান এক। কারণ, উপাদান-কারণের যে সমস্ত বিকার বা কার্য্য, তাহাতে উপাদানকারণের সমন্বয় দেখা যায়। যেমন একই মৃত্তিকার বিকার বা কার্য্য যে শরাব ও ঘট প্রভৃতি, তাহাতে সেই উপাদানকারণ মৃত্তিকার সমন্বয়ই থাকে অর্থাৎ সেই শরাবাদি দ্রব্য সেই মৃত্তিকান্বিতই থাকে এবং উহার মূল উপাদানও এক, ইহা দৃষ্ট হয়। এইরূপ এই যে ব্যক্তভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্ত পদার্থ বা জগৎ, তাহাও সুখদুঃখ-মোহান্বিত দেখা যায়। অতএব সুখ, দুঃখ ও মোহের সহিত এই জগতের সমন্বয় দর্শনপ্রযুক্ত এই জগতের মূল উপাদান এক, ইহা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ সমগ্র জগৎ যখন সুখদুঃখ-মোহান্বিত, তখন তাহার মূল প্রকৃতি বা উপাদানও সুখদুঃখমোহাত্মক এক, ইহা পূর্ব্বোক্তরূপে অনুমানসিদ্ধ হয়। তাহা হইলে এই ব্যক্ত জগৎ যে, সেই মূল প্রকৃতিতেই বিদ্যমান থাকে, ইহা সৎ, ইহাও সিদ্ধ হয়। কারণ, অসৎ হইলে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ যাহা মূল কারণে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, তাহারই অন্যরূপে প্রকাশ হইতে পারে। নচেৎ সেই মূল কারণ হইতে তাহার প্রকাশ হইতেই পারে না। সৎকার্য্যবাদী সাংখ্য পূর্ব্বোক্তরূপে নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী নৈয়ায়িক উহা খণ্ডন করিবার জন্য বাদীকে প্রশ্ন করিলেন যে, প্রকৃতি ও তাহার বিকারের লক্ষণ কি? তদুত্তরে বাদী সাংখ্য বলিলেন যে, যে পদার্থ অবস্থিতই থাকে, কিন্তু তাহার কোন ধর্ম্মের নিবৃত্তি ও অপর ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়, সেই পদার্থই প্রকৃতি, এবং যে ধর্ম্মের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয়, সেই ধর্ম্মই বিকার। যেমন মৃত্তিকা প্রকৃতি, ঘটাদি তাহার বিকার। মৃত্তিকা ঘটাদিরূপে পরিণত হইলেও মৃত্তিকা অবস্থিতই থাকে, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া ঘটাদিরূপ অন্য ধর্ম্মের প্রবৃত্তি বা প্রকাশ হয়। বাদী সাংখ্য এইরূপ বলিলে তখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, অসতের আবির্ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি হয় না এবং সতের বিনাশ হয় না, ইহাই আপনার প্রতিজ্ঞাত বা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। কিন্তু সতের বিনাশ ও অসতের উৎপত্তি ব্যতীত কাহারই ঘটাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি এবং উহার উপরম বা নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে মৃত্তিকা অবস্থিত আছে, তাহাতে ঘটাদিরূপ ধর্ম্মান্তর উৎপন্ন হইবে, এইরূপ বুঝিয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঘটাদি নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি কোন কার্য্য উৎপন্ন হইয়া গেলে, উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া সেই কার্য্য হইতে উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত হয়। এই যে, সর্ব্বলোকসিদ্ধ প্রবৃত্তি ও তাহার উপরম, তাহা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, মৃত্তিকাদি উপাদানকারণে ঘটাদি কার্য্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সিদ্ধ পদার্থে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। প্রবৃত্তি অলীক হইলে তাহার উপরমও বলা যায় না। আর উক্ত সিদ্ধান্তে কেবল যে, ঘটাদি কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি হয় না, ইহা নহে, পরন্তু মৃত্তিকার ধর্ম্ম ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি ও

বিনাশরূপ যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাও হইতে পারে না। উৎপত্তি ও বিনাশ ভিন্ন আবির্ভাব ও তিরোভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে আবির্ভাব ও তিরোভাবের কথা বলিয়াছেন। ফল কথা, অসতের উৎপত্তি ও সতের বিনাশ স্বীকার না করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি ও তাহার উপরম কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের এই প্রতিবাদের সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া বাদী সাংখ্য শেষে যদি সতের বিনাশ ও অসতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান হয়। কারণ, তিনি প্রথমে সতের বিনাশ হয় না এবং অসতের উৎপত্তি হয় না, এই সাংখ্য সিদ্ধান্ত স্বীকারপূর্ব্বক নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া, পরে উক্ত সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। তাহা স্বীকার না করিলেও তাঁহার নিজ পক্ষ সিদ্ধ হয় না। তাঁহাকে সেখানেই কথা ভঙ্গ করিয়া নীরব হইতে হয়। তাই তিনি আরব্ধ কথার ভঙ্গ না করিয়া, তাঁহার স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াই সেই কথার প্রসঙ্গ বা অনুবর্ত্তন করিলে "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান দ্বারা নিগৃহীত হইবেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে সংক্ষেপে সরলভাবে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী 'আমি সাংখ্য মতেই বলিব,' এই কথা বলিয়া কার্য্যমাত্রই সৎ, অর্থাৎ ঘটাদি সমস্ত কার্য্যই তাহার উপাদানকারণে বিদ্যমানই থাকে, এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিলে, তখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, তাহা হইলে সেই বিদ্যমান কার্য্যের আবির্ভাবরূপ কার্য্যও ত সৎ, সুতরাং তাহার জন্যও কারণ ব্যাপার ব্যর্থ। আর যদি সেই আবির্ভাবেরও আবির্ভাবের জন্যই কারণ ব্যাপার আবশ্যক বল, তাহা হইলে সেই আবির্ভাবের আবির্ভাব প্রভৃতি অনন্ত আবির্ভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায় অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। তখন বাদী যদি উক্ত অনবস্থাদোষের উদ্ধারের জন্য পরে আবির্ভাবকে অসৎ বলিয়া, উহার উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহ-স্থান হয়। কারণ, তিনি প্রথমে সাংখ্যমতানুসারে কার্য্যমাত্রই সৎ, অসতের উৎপত্তি হয় না, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, উহা সমর্থন করিতে শেষে বাধ্য হইয়া আবির্ভাবরূপ কার্য্যকে অসৎ বলিয়া বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্তরূপ স্থলে "বিরুদ্ধ" নামক হেত্বাভাস অথবা পূর্ব্বোক্ত "প্রতিজ্ঞাবিরোধ"ই নিগ্রহস্থান হইবে, "অপসিদ্ধান্ত" নামক পৃথক্ নিগ্রহস্থান কেন স্বীকৃত হইয়াছে? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র যুক্তির দ্বারা বিচারপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, যে স্থানে প্রতিজ্ঞার্থের সহিত হেতুর বিরোধ হয়, সেখানেই "বিরুদ্ধ" নামক হেত্বা-ভাস বা "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। কিন্তু উক্ত স্থলে প্রতিজ্ঞার্থরূপ প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত শেষোক্ত বিপরীত সিদ্ধান্তেরই বিরোধবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্তবাদিতা-প্রযুক্ত বাদীর অসামর্থ্য প্রকটিত হওয়ায় এই "অপসিদ্ধান্ত" পৃথক্ নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার্য্য। বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই, ইহা এখানে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে আরও অনেক নিগ্রহস্থান স্বীকার করেন নাই, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং তাঁহাদিগের মতের প্রতিবাদও প্রকাশ করিয়াছি ॥২৩॥

সূত্র। হেত্বাভাসাশ্চ যথোক্তাঃ ॥২৪॥৫২৮॥

অনুবাদ। "যথোক্ত" অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে যেরূপ লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট (২২) হেত্বাভাসসমূহও নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। হেত্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থানানি। কিং পুনর্লক্ষণান্তরযোগাদ্ধেত্বাভাসা নিগ্রহস্থানত্বমাপন্না যথা—প্রমাণানি প্রমেয়ত্বমিত্যত আহ **যথোক্তা** ইতি। হেত্বাভাসলক্ষণেনৈব নিগ্রহস্থানভাব ইতি।

ত ইমে প্রমাণাদয়ঃ পদার্থা উদ্দিষ্টা লক্ষিতাঃ পরীক্ষিতাশ্চেতি।

অনুবাদ। হেত্বাভাসসমূহও নিগ্রহস্থান। তবে কি লক্ষণান্তরের সম্বন্ধবশতঃ অর্থাৎ অন্য কোন লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া হেত্বাভাসসমূহ নিগ্রহস্থানত্ব প্রাপ্ত হয়? যেমন প্রমাণসমূহ প্রমেয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, এ জন্য (সূত্রকার মহর্ষি) "যথোক্তাঃ" এই পদটী বলিয়াছেন। (তাৎপর্য্য) হেত্বাভাসসমূহের লক্ষণপ্রকারেই নিগ্রহস্থানত্ব অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে হেত্বাভাসসমূহের যেরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে, সেইরূপেই ঐ সমস্ত হেত্বাভাস নিগ্রহস্থান হয়।

সেই এই প্রমাণাদি পদার্থ অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ উদ্দিষ্ট, লক্ষিত এবং পরীক্ষিত হইল।

টিপ্পনী। মহর্ষি "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি যে দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, তন্মধ্যে হেত্বাভাসই চরম নিগ্রহস্থান। ইহা প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতির ন্যায় "উক্তগ্রাহ্য" নিগ্রহস্থান হইলেও অর্থদোষ বলিয়া প্রধান এবং অন্যান্য নিগ্রহস্থান না হইলে সর্ব্বশেষে ইহার উদ্ভাবন কর্ত্তব্য, ইহা সূচনা করিতেই মহর্ষি সর্ব্বশেষে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি সর্ব্বপ্রথম সূত্রে ষোড়শ পদার্থের মধ্যে হেত্বাভাসত্বরূপে ইহার পৃথক্ উল্লেখও করিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে সেই হেত্বাভাসকে পঞ্চবিধ বলিয়া যথাক্রমে সেই সমস্ত হেত্বাভাসের লক্ষণও বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত হেত্বাভাসকে আবার নিগ্রহস্থান বলায় প্রশ্ন হয় যে, যেমন মহর্ষির কথিত প্রমাণ পদার্থ প্রমেয়ের লক্ষণাক্রান্ত হইলে, তখন উহা প্রমেয় হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত হেত্বাভাসসমূহও কি অন্য কোন লক্ষণাক্রান্ত হইলেই তখন নিগ্রহস্থান হয়? তাহা হইলে সেই লক্ষণও এখানে মহর্ষির বক্তব্য। এ জন্য মহর্ষি এই সূত্রে শেষে বলিয়াছেন,—"যথোক্তাঃ"। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে হেত্বাভাসসমূহ যে প্রকারে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ উহার যেরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপেই উহা নিগ্রহস্থান হয়। সুতরাং এখানে আর উহার লক্ষণ বলা অনাবশ্যক। ভাষ্যকারও মহর্ষির উক্তরূপই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে মহর্ষি আবার প্রথমে হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখ

করিয়াছেন কেন ? তাঁহার কথিত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের মধ্যে হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়া এখানে তাহার সমস্ত লক্ষণ বলিলেই ত হেত্বাভাসের তত্ত্বজ্ঞাপন হয়। এতদুত্তরে মহর্ষির সর্ব্বপ্রথম সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ জিগীষাশূন্য গুরু শিষ্য প্রভৃতির যে "বাদ" নামক কথা, তাহাতেও হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান অবশ্য উদ্ভাব্য, ইহা সূচনা করিবার জন্যই মহর্ষি পূর্ব্বে নিগ্রহস্থান হইতে পৃথক্‌রূপেও হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য সেখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৬৫—৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেখানে বলিয়াছেন যে, হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখের দ্বারা বাদবিচারে কেবলমাত্র হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানই যে উদ্ভাব্য, ইহাই সূচিত হয় নাই। কিন্তু যে সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করিলে বাদবিচারের উদ্দেশ্য তত্ত্ব-নির্ণয়েরই ব্যাঘাত হয়, সেই সমস্ত নিগ্রহস্থানই বাদবিচারে উদ্ভাব্য, ইহাই উহার দ্বারা সূচিত হইয়াছে। তাহা হইলে হেত্বাভাসের ন্যায় "ন্যূন", "অধিক" এবং "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থানও যে, বাদবিচারে উদ্ভাব্য, ইহাও উহার দ্বারা সূচিত হইয়াছে বুঝা যায়। সূচনাই সূত্রের উদ্দেশ্য। সূত্রে অতিরিক্ত উক্তির দ্বারা অতিরিক্ত তত্ত্বও সূচিত হয়। বস্তুতঃ প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে বাদলক্ষণসূত্রে "পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ" এবং "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ" এই পদদ্বয়ের দ্বারাও যে, বাদবিচারে "ন্যূন", "অধিক" এবং "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য বলিয়া সূচিত হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকারও সেখানে বলিয়াছেন এবং পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ ব্যতীতও যে বাদবিচার হইতে পারে, ইহাও পরে বলিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সেখানে ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারাও নিজমত সমর্থন করিয়াছেন যে, বাদবিচারে "ন্যূন" এবং "অধিক" নামক নিগ্রহস্থানেরও উদ্ভাবন উচিত নহে। বস্তুতঃ যে বাদবিচারে পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ হয়, তাহাতে "ন্যূন" এবং "অধিক" নামক নিগ্রহস্থানও উদ্ভাব্য, ইহাই সেখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। নচেৎ সেখানে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথা সংগত হয় না (প্রথম খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বাদবিচারে যে, "ন্যূন" এবং "অধিক" নামক নিগ্রহস্থানও উদ্ভাব্য, ইহা বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ "ন্যূন", "অধিক", "অপসিদ্ধান্ত", "প্রতিজ্ঞাবিরোধ", "অননুভাষণ", "পুনরুক্ত" ও "অপ্রাপ্তকাল", এই সপ্তপ্রকার নিগ্রহস্থান বাদবিচারে উদ্ভাব্য বলিয়াছেন। তবে ঐ সপ্ত প্রকার নিগ্রহস্থান সেখানে কথাবিচ্ছেদের হেতু হয় না, কিন্তু "হেত্বাভাস" ও "নিরনুযোজ্যানুযোগ" এই নিগ্রহস্থানদ্বয়ই বাদবিচার-স্থলে কথাবিচ্ছেদের হেতু হয়, ইহাও তিনি সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এখানে তাঁহার সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।

মহর্ষির এই চরম সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা আরও অনেক নিগ্রহস্থান সূচিত হইয়াছে, ইহা অনেকের মত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে সূত্রে "যথোক্তাঃ" এই পদের উপপত্তি হয় না। কারণ, সেই সমস্ত অনুক্ত নিগ্রহস্থানে যথোক্তত্ব নাই। কিন্তু মহর্ষির কণ্ঠোক্ত হেত্বাভাসেই তিনি যথোক্তত্ব বিশেষণের উল্লেখ করায় বৃত্তিকারোক্ত ঐ অনুপপত্তি হইতে পারে না। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও এই সূত্রোক্ত "চ" শব্দের দ্বারা অনুক্ত সমুচ্চয়ের

কথা বলিয়াছেন। বরদরাজ ঐ "চ" শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্তদোষ, উক্তিদোষ এবং আত্মাশ্রয়াদি তর্কপ্রতিঘাত, এই অনুক্ত নিগ্রহস্থানত্রয়ের সমুচ্চয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র ঐ "চ" শব্দের প্রয়োগে মহর্ষির উদ্দেশ্য বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ গৌতমের এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে ইহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর দুর্ব্বচন এবং কপোলবাদন প্রভৃতি এবং স্থলবিশেষে অপশব্দপ্রয়োগ প্রভৃতিও নিগ্রহস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়াছেন[১]। সুতরাং তিনিও যে ঐ "চ" শব্দের দ্বারাই ঐ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু বরদরাজ যে, "দৃষ্টান্তাভাস"কেও এই সূত্রোক্ত "চ" শব্দের দ্বারাই কেন গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি না। কারণ, দৃষ্টান্ত পদার্থ হেতুশূন্য বা সাধ্যশূন্য হইলে তাহাকে বলে দৃষ্টান্তাভাস, উহা হেত্বাভাসেরই অন্তর্গত। তাই মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে দৃষ্টান্তাভাসের কোন লক্ষণ বলেন নাই। বরদরাজও পূর্ব্বে হেত্বাভাসের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে এই কথা বলিয়াছেন[২] এবং পরে কোন্ হেত্বাভাসে কিরূপ দৃষ্টান্তাভাস কিরূপে অন্তর্ভূত হয়, ইহাও বুঝাইয়াছেন। সুতরাং মহর্ষি হেত্বাভাসকে নিগ্রহস্থান বলায় তদ্দ্বারাই পক্ষাভাস এবং দৃষ্টান্তাভাসও নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। বার্ত্তিককারও পূর্ব্বে (চতুর্থ সূত্রবার্ত্তিকে) এই কথাই বলিয়া, মহর্ষি নিগ্রহস্থানের মধ্যে দৃষ্টান্তাভাসের উল্লেখ কেন করেন নাই, ইহার সমাধান করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র সেখানে উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে মহর্ষির এই চরম সূত্রে "হেত্বাভাস" শব্দের অন্তর্গত "হেতু" শব্দের দ্বারা হেতু ও দৃষ্টান্ত, এই উভয়ই বিবক্ষিত বলিয়া "হেত্বাভাস" শব্দের দ্বারা "হেত্বাভাস" ও "দৃষ্টান্তাভাস", এই উভয়ই মহর্ষির বিবক্ষিত অর্থ, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির ঐরূপ বিবক্ষার প্রয়োজন কি এবং উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত কথার ঐরূপই তাৎপর্য্য হইলে তিনি পরে এই সূত্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যা কেন করেন নাই? বাচস্পতি মিশ্রই বা কেন কষ্টকল্পনা করিয়া ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন, ইহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

ন্যায়শাস্ত্রে হেতু ও হেত্বাভাসের স্বরূপ, প্রকারভেদ ও তাহার উদাহরণাদির ব্যাখ্যা অতি বিস্তৃত ও দুরূহ। বৌদ্ধসম্প্রদায়ও উক্ত বিষয়ে বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া গিয়াছেন। দিঙ্‌নাগ প্রভৃতির মতে পক্ষে সত্তা, সপক্ষে সত্তা এবং বিপক্ষে অসত্তা, এই লক্ষণত্রয়বিশিষ্ট পদার্থই হেতু এবং উহার কোন লক্ষণশূন্য হইলেই তাহা হেত্বাভাস। উক্ত মতানুসারে সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও ঐ কথাই বলিয়াছেন[৩]। বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগের হেতু প্রভৃতির ব্যাখ্যার উল্লেখপূর্ব্বক

১। এতেন দুর্ব্বচনকপোলবাদিত্রাদীনাং সাধনানুপযোগিত্বেন নিগ্রহস্থানত্বং বেদিতব্যং। নিয়মকথায়ামপশব্দাদীনামপীতি।—"ন্যায়সার", অনুমান পরিচ্ছেদের শেষ।

২। ন সূত্রিতং কিমিতি চেদ্দৃষ্টান্তাভাস-লক্ষণম্।
অন্তর্ভাবো যতস্তেষাং হেত্বাভাসেষু পঞ্চসু ॥—তার্কিকরক্ষা।

৩। সন্ পক্ষে সদৃশে সিদ্ধো ব্যাবৃত্তস্তদ্বিপক্ষতঃ।
হেতুস্ত্রিলক্ষণো জ্ঞেয়ো হেত্বাভাসো বিপর্য্যয়াৎ ॥—কাব্যালঙ্কার, ৫ম পঃ, ২১শ।

উদ্দ্যোতকর "ন্যায়বার্ত্তিকে"র প্রথম অধ্যায়ে (অবয়ব ব্যাখ্যায়) তাঁহাদিগের সমস্ত কথারই সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র তাহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের হেত্বাভাসের বহু বিভাগ এবং তাহার উদাহরণ ব্যাখ্যাও অতি দুর্ব্বোধ। সংক্ষেপে ঐ সমস্ত প্রকাশ করা কোন রূপেই সম্ভব নহে। তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও এখানেও যথামতি তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বৌদ্ধযুগে শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞও তাঁহার "ন্যায়সারে" হেত্বাভাসের বহু বিভাগ ও উদাহরণাদির দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাহা বুঝিলেও ঐ বিষয়ে অনেক কথা বুঝা যাইবে। দিঙ্নাগ প্রভৃতি নানা প্রকার প্রতিজ্ঞাভাস ও দৃষ্টান্তাভাস প্রভৃতিরও বর্ণনপূর্ব্বক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দিঙ্নাগের ক্ষুদ্র গ্রন্থ "ন্যায়প্রবেশে"ও তাহা দেখা যায়। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক মহানৈয়ায়িকও বহু প্রকারে "প্রতিজ্ঞাভাস" প্রভৃতিরও বর্ণন করিয়াছেন এবং অনেকে দিঙ্নাগের প্রদর্শিত উদাহরণ-বিশেষেরও খণ্ডন করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডে তাঁহাদিগের কথা কিছু প্রকাশ করিয়াছি এবং "পক্ষাভাস" বা "প্রতিজ্ঞাভাস" প্রভৃতি যে হেত্বাভাসেই অন্তর্ভূত বলিয়া তত্ত্বদর্শী মহর্ষি গোতম তাহার পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই, ইহাও বলিয়াছি। জয়ন্ত ভট্টও সেখানে ঐ কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা ও ২৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার এখানে শেষে তাঁহার ব্যাখ্যাত সমস্ত শাস্ত্রার্থের উপসংহার করিতে বলিয়াছেন যে, সেই এই প্রমাণাদি পদার্থ উদ্দিষ্ট, লক্ষিত ও পরীক্ষিত হইল। অর্থাৎ প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থই ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদ্য। এবং উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদন বা তত্ত্বজ্ঞাপনই ন্যায়দর্শনের ব্যাপার। সেই ব্যাপার দ্বারাই এই ন্যায়দর্শন তাহার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সুতরাং মহর্ষি গোতম সেই প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশপূর্ব্বক লক্ষণ বলিয়া অনেক পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। মহর্ষির কর্ত্তব্য উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়দর্শনও সমাপ্ত হইয়াছে।

মহর্ষির শেষোক্ত দুই সূত্রে "কথকান্যোক্তিনিরূপ্য-নিগ্রহস্থানদ্বয়প্রকরণ" (৭) সমাপ্ত হইয়াছে এবং সপ্ত প্রকরণ ও চতুর্ব্বিংশতি সূত্রে এই পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত হইয়াছে। এবং বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" গ্রন্থানুসারে প্রথম হইতে ৫২৮ সূত্রে ন্যায়দর্শন সমাপ্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্রই যে, "ন্যায়সূচীনিবন্ধে"র কর্ত্তা, ইহা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছি এবং তিনি যে, ঐ গ্রন্থের সর্ব্বশেষোক্ত শ্লোকের সর্ব্বশেষে "বস্বঙ্ক-বসুবৎসরে" এই বাক্যের দ্বারা তাঁহার ঐ গ্রন্থসমাপ্তির কাল বলিয়া গিয়াছেন, ইহাও বলিয়াছি। বাচস্পতি মিশ্রের প্রযুক্ত ঐ "বৎসর" শব্দের দ্বারা যাঁহারা শকাব্দ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের মতানুসারেই আমি পূর্ব্বে কয়েক স্থলে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী তাঁহার কাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু "বৎসর" শব্দ দ্বারা অনেক স্থলে "সংবৎ"ই গৃহীত হইয়া থাকে। তাহা হইলে ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ ৮৪১ খৃষ্টাব্দে বাচস্পতি মিশ্র "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" রচনা করেন, ইহা বুঝা যায় এবং তাহাই প্রকৃতার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কারণ, উদয়নাচার্য্যের "লক্ষণাবলী" গ্রন্থের শেষোক্ত

শ্লোকে তিনি ৯০৬ শকাব্দে (৯৮৪ খৃষ্টাব্দে) ঐ গ্রন্থ রচনা করেন, ইহা কথিত হইয়াছে। এবং উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা"র "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" নামে যে টীকা করিয়াছেন, তাহার প্রারম্ভে তাঁহার "মাতঃ সরস্বতি"—ইত্যাদি প্রার্থনা-শ্লোকের দ্বারা এবং পরে তাঁহার অন্যান্য উক্তির দ্বারা তিনি যে বাচস্পতি মিশ্রের অনেক পরে, তাঁহার ব্যাখ্যাত ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য পরিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" নামে টীকা করিয়াছেন এবং সেই পরিশুদ্ধির জন্যই প্রথমে সরস্বতী মাতার নিকটে ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এইরূপ আরও নানা কারণে বাচস্পতি মিশ্র যে উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহারা উভয়ে সমসাময়িক নহেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং বাচস্পতি মিশ্রের "বস্বঙ্ক-বসুবৎসরে" এই উক্তির দ্বারা তিনি যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তই বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী মিথিলেশ্বরসূরি স্মৃতিনিবন্ধকার বাচস্পতি মিশ্র "ন্যায়সূচীনিবন্ধে"র রচয়িতা নহেন। তিনি পরে নিজমতানুসারে "ন্যায়সূত্রোদ্ধার" নামে পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করেন[১]। তাঁহার মতে ন্যায়দর্শনের সূত্রসংখ্যা ৫৩১। অন্যান্য কথা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য ॥২৪॥

যোঽক্ষপাদমৃষিং ন্যায়ঃ প্রত্যভাদ্বদতাং বরম্।
তস্য বাৎস্যায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্ত্তয়ৎ ॥
ইতি শ্রীবাৎস্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

অনুবাদ। বক্তৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অক্ষপাদ ঋষির সম্বন্ধে যে ন্যায়শাস্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, বাৎস্যায়ন, তাহার এই ভাষ্যসমূহ প্রবর্ত্তন করিলেন অর্থাৎ বাৎস্যায়নই প্রথমে তাহার এই ভাষ্য রচনা করিলেন।

শ্রীবাৎস্যায়নপ্রণীত ন্যায়ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

টিপ্পনী। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে উক্ত শ্লোকের দ্বারা বলিয়াছেন যে, এই ন্যায়শাস্ত্র অক্ষপাদ ঋষির সম্বন্ধে প্রতিভাত হইয়াছিল। অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান আছে। অক্ষপাদ ঋষি ইহার কর্ত্তা নহেন, কিন্তু বক্তা। তিনি বক্তৃশ্রেষ্ঠ, সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের অতিদুর্ব্বোধ তত্ত্ব সূত্র দ্বারা সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে তিনি সমর্থ। তাই ভগবদিচ্ছায় তাঁহাতেই এই ন্যায়শাস্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল। ভাষ্যকার উক্ত শ্লোকের পরার্দ্ধে তিনি যে, বাৎস্যায়ন নামেই সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনিই প্রথমে অক্ষপাদ ঋষির প্রকাশিত ন্যায়শাস্ত্রের এই ভাষ্যসমূহ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহাও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। অহল্যাপতি গৌতম মুনিরই নামান্তর অক্ষপাদ, ইহা "স্কন্দপুরাণে"র বচনানুসারে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছি। সুপ্রাচীন

১। শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ মিথিলেশ্বরসূরিণা।
লিখ্যতে মুনিমূর্দ্ধন্যশ্রীগৌতমমতং মহৎ ॥—"ন্যায়সূত্রোদ্ধারে"র প্রথম শ্লোক।

ভাস কবি তাঁহার "প্রতিমা" নাটকে যে মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন[১], সেই মেধাতিথিও অহল্যাপতি গৌতমেরই নামান্তর, ইহা পরে মহাভারতের বচন[২] দ্বারা বুঝিয়াছি। সুতরাং ভাস কবি যে মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া গৌতমের এই ন্যায়শাস্ত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাকবি কালিদাস তাঁহার প্রথম নাটক "মালবিকাগ্নিমিত্রে" সর্ব্বাগ্রে সসম্মানে যে ভাস কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তিনি যে খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রাচীন, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি এবং তিনি যে কৌটিল্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাও আমরা মনে করি। কারণ, ভাস কবির "প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ" নাটকের চতুর্থ অঙ্কের "নবং শরাবং সলিলস্য পূর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকটি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দশম অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে উদ্ধৃত হইয়াছে। কৌটিল্য সেখানে "অপীহ শ্লোকৌ ভবতঃ"—এই কথা বলিয়াই অন্য শ্লোকের সহিত ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ভাস কবিও যে পরে তাঁহার স্বকৃত নাটকে অন্যের রচিত ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, ভাস কবি যে, খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রাচীন, এ বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ নাই এবং তাঁহার সময়েও যে মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া গৌতমপ্রকাশিত এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল এবং ভারতে ইহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত, ইহাও আমরা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ঐ উক্তির দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও যে, খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রাচীন, এ বিষয়েও পূর্ব্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সময় নির্দ্ধারণ পক্ষে এ পর্য্যন্ত আর কোন প্রমাণ পাই নাই।

বাৎস্যায়নের অনেক পরে বিজ্ঞানবাদী নব্যবৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভ্যুদয়কালে মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর সেই বৌদ্ধ দার্শনিকগণের প্রতিবাদের খণ্ডন করিয়া গৌতমের এই ন্যায়শাস্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁহার "ন্যায়বার্ত্তিকে"র প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—"যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাং শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ। কুতার্কিকাজ্ঞাননিবৃত্তিহেতুঃ করিষ্যতে তস্য ময়া নিবন্ধঃ"॥ টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে দিঙ্‌নাগ প্রভৃতিকেই উদ্দ্যোতকরের বুদ্ধিস্থ কুতার্কিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি জীবিত না থাকিলে উদ্দ্যোতকরের "ন্যায়বার্ত্তিক" নিবন্ধ তাঁহাদিগের অজ্ঞান নিবৃত্তির হেতু হইতে পারে না। পরন্তু পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের দ্বাদশ সূত্রের বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর দিঙ্‌নাগের প্রতিজ্ঞালক্ষণের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—"যত্তু ব্রবীষি সিদ্ধান্তপরিগ্রহ এব প্রতিজ্ঞা" ইত্যাদি। সেখানে বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যত্তু ব্রবীষি দিঙ্‌নাগ"। বাচস্পতি মিশ্রের ঐরূপ ব্যাখ্যানুসারে মনে হয় যে, উদ্দ্যোতকর দিঙ্‌নাগ জীবিত থাকিতেই তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। উদ্দ্যোতকর দিঙ্‌নাগের গুরু বসুবন্ধুর অনেক কথারও উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য অনেক ঐতিহাসিকের

১। রাবণঃ—ভোঃ কাশ্যপগোত্রোঽস্মি, সাঙ্গোপাঙ্গং বেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রং, মাহেশ্বরং যোগশাস্ত্রং, বার্হস্পত্যমর্থশাস্ত্রং, মেধাতিথের্ন্যায়শাস্ত্রং, প্রাচেতসং শ্রাদ্ধকল্পঞ্চ"।—প্রতিমা নাটক, পঞ্চম অঙ্ক।

২। মেধাতিথির্ম্মহাপ্রাজ্ঞো গৌতমস্তপসি স্থিতঃ।
বিমৃশ্য তেন কালেন পত্ন্যাঃ সংস্থাব্যতিক্রমং ॥—শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব, ২৬৫ অধ্যায়।

মতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীই বসুবন্ধুর সময় এবং তাঁহার শিষ্য দিঙ্‌নাগ পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই মত সত্য হইলে উদ্দ্যোতকরও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভেই দিঙ্‌নাগ ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য "ন্যায়বার্ত্তিক" রচনা করেন, ইহাই আমরা মনে করি। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ৩৩শ ও ৩৭শ সূত্রের বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র "সুবন্ধু-লক্ষণে" এবং "অত্র সুবন্ধুনা" এইরূপ উল্লেখ করায় সুবন্ধু নামেও কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন কি না? এইরূপ সংশয় আমি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মুদ্রিত পুস্তকে বসুবন্ধু স্থলে সুবন্ধু মুদ্রিত হইয়াছে অথবা বাচস্পতি মিশ্র যেমন ধর্ম্মকীর্ত্তিকে কীর্ত্তি নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্রূপ বসুবন্ধুকে সুবন্ধু নামেও উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। উপসংহারে আরও অনেক বিষয়ে অনেক কথা লেখ্য ছিল, কিন্তু এই গ্রন্থের আর কলেবরবৃদ্ধি শ্রীভগবানের অভিপ্রেত না হওয়ায় তাঁহারই ইচ্ছানুসারে এখানেই নিবৃত্ত হইলাম। তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে আরব্ধ গ্রন্থান্তরে যথামতি অন্যান্য কথা লিখিতে চেষ্টা করিব।

যুগ্মাষ্ট-দ্ব্যেক-বঙ্গাব্দে যো বঙ্গাঙ্গ-যশোহরে।
গ্রামে 'তালখড়ী'নাম্নি ভট্টাচার্য্যকুলোদ্ভবঃ ॥
পিতা সৃষ্টিধরো নাম যস্য বিদ্বান্ মহাতপাঃ।
মাতা চ মোক্ষদা দেবী দেবীব ভুবি যা স্থিতা ॥
সরোজবাসিনী পত্নী নিজমুক্ত্যর্থমেব হি।
যং কাশীমানয়দ্বদ্ধা পূর্ব্বং পূর্ব্বতপোগুণৈঃ ॥
অশক্তেনাপি তেনেদং সভাষ্যং ন্যায়দর্শনম্।
যথাকথঞ্চিদ্ব্যাখ্যাতং সর্ব্বশক্তিমদিচ্ছয়া ॥
পঠন্তু দোষান্ সংশোধ্য দোষজ্ঞা ইদমাদিতঃ।
পশ্যন্তু তত্তদ্গ্রন্থাংশ্চ টিপ্পন্যামুপদর্শিতান্ ॥
সম্প্রদায়বিলোপেন বিকৃতং যৎ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
বাৎস্যায়নীয়ং তদ্ভাষ্যং সুধিয়ঃ শোধয়ন্তু চ ॥
ভাষ্য-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকাদিগ্রন্থবর্ত্মনাম্।
পরিষ্কারে ন মে শক্তিরন্ধস্যেব সুদুষ্করে ॥
তত্র যস্যাঃ কৃপাবৃষ্টিঃ কেবলং মেঽবলম্বনম্।
পদে পদে কৃপামূর্ত্তৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৮ ॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	যে যুদ্ধি	যে বুদ্ধি
৯	উহার্ং	উহার
	"হেয়ংতন্ত্য	"হেয়ং তস্য
	সম্যগ্র্	সম্যগ্
২৫	"হমেবৈষ বৃণ:তে	"যমেবৈষ বৃণুতে
২৬	"অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা"	মতান্তরে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"
৩১	ক্ষপয়িত্বাহথ	ক্ষপয়িত্বা
৫৭	এই স্থলে	এই সূত্রে
৬৬	"বৈয়াকরণলঘুমঞ্জুষা"	"বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষা"
৭৭	প্রমাশমাহ	প্রমাণমাহ
৮০	ত্রসরেণু রজঃ	ত্রসরেণূরজঃ
৮৫	ত্যাদি	ইত্যাদি
৯২	সর্ব্বাক্ষেপা	সর্ব্বাপেক্ষা
১০২	পঐরমাণুর	ঐ পরমাণুর
১০৫	পরম্পরা	পরস্পরা
১১২	বিভ:জ্যমান	বিভজ্যমান
১১৬	করিবার দ্বারাই	কারিকার দ্বারাই
১২৩	না হাওয়ায়	না হওয়ায়
১২৭	তত্র সর্ব্বভাবা	তত্র ন সর্ব্বভাবা
১৩৭	সূত্রে শেষে	সূত্র-শেষে
১৩৮	জাগরিতাবস্থায়	জাগরিতাবস্থা
১৫৩	উপলব্ধি হয়	উপপত্তি হয়
১৫৪	দৃষ্টান্তরূ:পেই	দৃষ্টান্তরূপে
১৬০	সন্তানস্তচযুক্তোনযুক্তা	সন্তানানিয়ম্য নাপি যুক্তঃ
১৬২	দৃশ্যেতেন্দা	দৃশ্যেতেন্দা
১৬৩	যথোড়ুপঃ।	যথোডুপঃ।
১৬৪	এই পুস্তকের	ঐ পুস্তকের
	জ্ঞেয়বিষয়ের	জ্ঞেয়বিষয়ের কালভেদে

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৮	সমিধ প্রধন্ত্বঃ	সমাধিপ্রযত্নঃ
১৯০	ব্যাখ্যা	ব্যাখ্যা
১৯৬	দবতীর্থ	দেবতীর্থ
১৯৭	চণ্ডালাদিনীচজাতিরও	চণ্ডালাদির নীচজাতিজনক
২০১	যথাকালং	যথাকামং
২০৫	ধারণা ও ধ্যানের সমষ্টির	ধারণা ও ধ্যান, সমাধির
২১০	একবারে স্পষ্টার্থ	স্পষ্টার্থ
২১১	তত্ত্ব-জ্ঞাননির্ণয়রূপ	তত্ত্ব-নির্ণয়রূপ
২১৫	যথার্থরূপে অনুমত	যথার্থরূপে অনুমিত
২২৮	মহর্ষিয়	মহর্ষির
২২৯	দ্বরা	দ্বারা
২৬৮	শব্দ কি অনিত্য	শব্দ অনিত্য
২৭০	গো ব্যাপকত্ব	গোর্ব্যাপকত্ব
২৭৮	সক্রিত্ব	সক্রিয়ত্ব
২৯০	ত্বদ্দষণ	তদ্দূষণ
২৯৭	এইরূপ বাদীর	এইরূপে বাদীর
২৯৮	উদ্ভাবনাই	উদ্ভাবনই
২৯৯	অপ্রাপ্তির পক্ষেও	অপ্রাপ্তিপক্ষেও
৩০৮	ভয্যকারও	ভাষ্যকারও
৩১০	"করাণাভাবাৎ"	"কারণাভাবাৎ"
৩৬৪	হওয়াব	হওয়ায়
	প্রমণাং	প্রমাণং
৩৭৩	র্নাবিশেষণ	র্নাবিশেষেণ
৩৭১	শব্দ ঘটাদির	শব্দ ও ঘটাদির
৩৭৭	ধর্ম্মেব	ধর্ম্মের
৩৭৪	প্রতিবাক্য	প্রতিজ্ঞাবাক্য
৩৮২	পদার্থের	পদার্থের
৪০৭	ইতিপ্রসঙ্গাৎ	হতিপ্রসঙ্গাৎ
৪১৬	নিগ্রহস্থান	নিগ্রহস্থান
৪২৪	কোন পদার্থের	কোন উক্ত পদার্থের
৪৩৬	বলয়াছেন	বলিয়াছেন

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৩৯	আখ্যাতে পদের	আখ্যাত-পদের
৪৫৩	আর যাহ	আর যাহা
	তন্মলত্বাৎ	তন্মূলত্বাৎ
৪৫৪	এই স্থত্র	এই সূত্র
৪৫৬	পনরুক্ত	পুনরুক্ত
৪৫৯	বিরুদ্ধেপ্রয়োজনবত্ত্ব	বিরুদ্ধপ্রয়োজনবত্ত্ব
৪৬৪	সাঙ্কর্ষ্য	সাঙ্কর্য্য
৪৬৭	"কার্য্যব্যাসঙ্গাৎ"পদের	"কার্য্যব্যাসঙ্গাৎ"এই পদের
৪৭৫	ন্যায়শাস্ত্রেইর	ন্যায়শাস্ত্রেরই

পরিশিষ্ট।

প্রথম খণ্ডে—

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ভূমিকায়)	উদ্যোতকর	উদ্দ্যোতকর
৯ ...	দুর্ব্বধাঃ	দুর্ব্বুধাঃ
১৩।১৮ ...	তত্ত্ব-নির্ণীষু	তত্ত্ব-নির্ণীনীষু
২৪ ...	সিঞ্চন্নৎসং	সিঞ্চন্নুৎসং
	আগচ্ছংত	আগচ্ছংতৗ
৩৬ ...	ইচ্ছামঃ কিমপি	ইচ্ছামি কিমপি
৩৭ ...	টীকা হইতে পারিয়াছিল না।	টীকা হয় নাই।
	ইচ্ছাম ইতি।	ইচ্ছামীতি।
৩৯ ...	অনুসন্ধান দ্বারা ফলে	অনুসন্ধান দ্বারা
১৩৭ ...	এই মতটি জৈন ন্যায় গ্রন্থেও দেখা যায়।	এই মতটি কেহ জৈন মতও বলেন, কিন্তু অনেক জৈন গ্রন্থে অন্যরূপ মত আছে।

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৩৯	আখ্যাতে পদের	আখ্যাত-পদের
৪৫৩	আর যাহ	আর যাহা
	তন্মলত্বাৎ	তন্মূলত্বাৎ
৪৫৪	এই সুত্র	এই সূত্র
৪৫৬	পনরুক্ত	পুনরুক্ত
৪৫৯	বিরুদ্ধেপ্রয়োজনবত্ত	বিরুদ্ধপ্রয়োজনবত্ত
৪৬৪	সাঙ্কর্ষ্য	সাঙ্কর্য্য
৪৬৭	"কার্য্যব্যাসঙ্গাৎ"পদের	"কার্য্যব্যাসঙ্গাৎ"এই পদের
৪৭৫	ন্যায়শাস্ত্রেইর	ন্যায়শাস্ত্রেরই

পরিশিষ্ট।

প্রথম খণ্ডে—

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ভূমিকায়)	উদ্যোতকর	উদ্দ্যোতকর
৯ ...	দুর্ব্বধাঃ	দুর্ব্বুধাঃ
১৩।১৮ ...	তত্ত্ব-নির্ণীষু	তত্ত্ব-নির্ণীনীষু
২৪ ...	সিঞ্চন্নৎসং	সিঞ্চন্নুৎসং
	আগচ্ছংত	আগচ্ছংতৌ
৩৬ ...	ইচ্ছামঃ কিমপি	ইচ্ছামি কিমপি
৩৭ ...	টীকা হইতে পারিয়াছিল না।	টীকা হয় নাই।
	ইচ্ছাম ইতি।	ইচ্ছামীতি।
৩৯ ...	অনুসন্ধান দ্বারা ফলে	অনুসন্ধান দ্বারা
১৩৭ ...	এই মতটি জৈন ন্যায় গ্রন্থেও দেখা যায়।	এই মতটি কেহ জৈন মতও বলেন, কিন্তু অনেক জৈন গ্রন্থে অন্যরূপ মত আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে—

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

২৫৭ পৃষ্ঠায় ভাষ্যে (৪ পং) "কেন চ কল্পেনানাগতঃ, কথমনাগতাপেক্ষাতীতসিদ্ধিরিতি নৈতচ্ছক্যং"—এইরূপ পাঠান্তরই গ্রাহ্য।

৩৫৬ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীতে "প্রথমে ত্রিসূত্র ছিল, ইহাও চরক বলিয়াছেন"—এই অংশ পরিত্যাজ্য।

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫৮	প্রমার কর্ত্তা অর্থাৎ	প্রমার কর্ত্তা এই অর্থে
সর্ব্বশেষে শুদ্ধিপত্রের পরিশিষ্টে	অর্থাৎ প্রত্যেককারণত্বের	অর্থাৎ প্রত্যক্ষকারণত্বের

তৃতীয় খণ্ডে—

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দ্বিতীয় সূচীপত্রে—।/০	কণাদসূত্রের প্রতিবাদ।	কণাদসূত্রের
	সমালোচনা ও	সমালোচনা ও প্রতিবাদ
	পুণ্যবাদী	শূন্যবাদী—
৭৪	"অবিভাগাদিতি	"ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি
৩৬৮	শশোর্যতঃ ॥	শিশোর্যতঃ ॥

চতুর্থ খণ্ডে—

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৪	তৎকারিত্বা	তৎকারিতত্বা
	বশ	বশতঃ
	সম্পাদয়তত	সম্পাদয়তীতি
৬১	কল্পান্তরাণ্ন	কল্পান্তরামুপ
৩১০	বার্ত্তিককার কাত্যায়ন	বার্ত্তিককার কুমারিল